সায়েন্স ফিকশান স·ম·গ্র

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

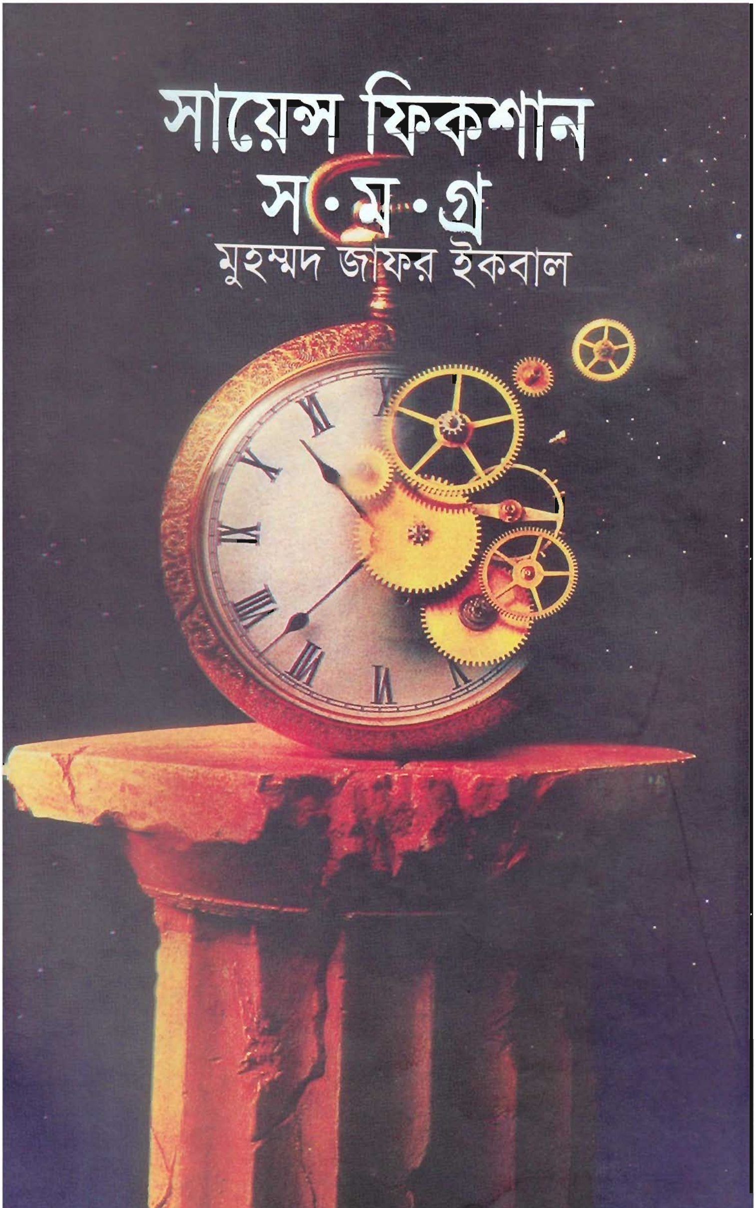

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

✓ কপেট্রনিক সুখদুঃখ ✓ মহাকাশে মহাত্রাস ✓ ক্রুগো ✓ ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম ✓ বিজ্ঞানী সফদর আলীর মহা মহা আবিষ্কার ✓ ওমিক্রনিক রূপান্তর ✓ টুকুনজিল ✓ যারা বায়োবট

"বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।"
জীবনানন্দ দাশ

কী আছে তারপর? বাতাস আর আকাশের অন্তহীন মাখামাখির মহাশূন্যতার বিশালত্বে থমকে যেতে হয়। বিজ্ঞানও একসময় তথ্য প্রমাণ ও যুক্তির সীমারেখা টেনে থেমে যায়। তারপর? তারপর কী? প্রশ্ন উচ্চারিত হয়। জিজ্ঞাসা তীব্রতর হয়। কল্পনাকে বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা চলে।

'কল্পবিজ্ঞান' শব্দটি সম্ভবত এভাবে চালু হয়ে যায়। ইংরেজি সায়েন্স ফিকশানের অনুসৃতি হিসেবে প্রচলিত হলেও বাংলায় কল্পবিজ্ঞান আজ সুপরিচিত।

আশ্চর্য হলেও সত্য যে বাংলা কল্পবিজ্ঞান রচনার সূচনা ১৮৯৬ সালে। আর প্রথম কল্পবিজ্ঞান রচনা হিসেবে স্বীকৃত গ্রন্থটি ইয়োরোপে প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে। রচয়িতা মেরী শেলী, বইটির নাম ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। তারপর আসেন জুল ভের্ন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এইচ জি ওয়েলস বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যকে কাজে লাগিয়ে কল্পবিজ্ঞান রচনায় স্থায়ী আসন করে নেন। আর বাংলায় কল্পবিজ্ঞান গল্পের সূচনা করেন এক জাত-বিজ্ঞানী, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত, গল্পটির নাম 'পলাতক তুফান'।

বয়সে প্রবীণ হলেও বাংলা ভাষায় কল্পবিজ্ঞান রচনার তেমন জোয়ার ছিল না। একসময় এই ধারাটি অনেকটা অগোচরেই চলে যায়। বরং কল্পবিজ্ঞানের নামে রচিত হয় কিছু কিছু আজগুবি কাহিনী। শুধু বাংলায় নয়, অপরাপর ভাষায় রচিত আজগুবি কিংবা অভিযানমূলক রচনাকে এক সময় আখ্যায়িত করা হয়েছে কল্পবিজ্ঞানের নামে। এমতাবস্থায় কল্পবিজ্ঞানকে পুনরুদ্ধার করেন জন উড ক্যাম্পবেল। এই উদ্ধারকর্মের প্রধান শর্ত হল, কল্পবিজ্ঞান কাহিনীতে বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা থাকতে হবে—পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে।

আর এই ধারারই লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। কারণ তিনি নিজেই বলেন, "বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লিখতে গিয়ে আমি তাই সজ্ঞানে কখনো বিজ্ঞানের কোনো তথ্যকে অবমাননা করি নি।" তাঁর এই গভীর ও সজ্ঞান বিশ্বাসের পরিচয় রয়েছে প্রথম থেকে সাম্প্রতিক রচনায়। বিজ্ঞানকে সামনে রেখেই তিনি রচনা করেছেন এমন একেকটি জগতের কথা, সম্ভাবনার কথা, যা বাংলা সাহিত্যে বিস্ময়কর।

তাঁর লেখালেখির জগৎ বহুমাত্রিক ও বিচিত্র। কিশোর-সাহিত্য রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত, জনপ্রিয় লেখকদের অন্যতম। তিনি এমন এক লেখক যাঁর গ্রন্থ পাঠক খুঁজে খুঁজে ঘরে নিয়ে যায়। আর তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, কল্পবিজ্ঞান : 'কপেট্রনিক সুখদুঃখ'। তারপর তিনি অনবরত লিখে গেছেন কল্পবিজ্ঞান কাহিনী, যা বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর। আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ভিন্ন এক পরিমণ্ডলের সঙ্গে, যা কার্যত মহাবিশ্বের অংশ কিন্তু আমাদের অজ্ঞাত। মুহম্মদ জাফর ইকবাল মূলত বিজ্ঞানী। তিনি যখনই যা লিখেছেন, বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে সামনে রেখে। শুদ্ধতায় বিশ্বাসী। তাঁর রচনা পাঠে পাঠক শুদ্ধ হয়। সাদামাটা আধপাগলা বিজ্ঞানী সফদর আলীকে ভালবাসেন, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী মানুষ তাঁর অপছন্দ। বিশ্বে অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহারে তিনি শঙ্কিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট।

তাঁর বর্ণাঢ্য শৈশব কেটেছে সিলেট, জগদল, পচাগড়, রাঙামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, বগুড়া, কুমিল্লা ও পিরোজপুরে।

১৯৭১ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে তাঁর বাবা ফয়জুর রহমান আহমদ প্রাণ হারান। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে, ঢাকা শহরে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের একটি দীর্ঘ, অনিশ্চিত এবং কঠোর জীবনের মুখোমুখি হতে হয়, যখন তাঁর মা আয়েশা আখতার খাতুন বুক আগলে এই পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রাখেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে পড়াশোনা করার সময় খবরের কাগজে কার্টুনিস্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : কপোট্রনিক সুখদুঃখ (১৯৭৬)।

১৯৭৬ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের আমন্ত্রণে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে পি. এইচ. ডি করার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। পি. এইচ. ডি শেষে তিনি প্রথমে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং পরে বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র : পদার্থবিজ্ঞান, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স এবং ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশান। তিনি কম্পিউটারে বাংলা লিপির নিরলস গবেষক, প্রথম বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসর দাঁড় করান ১৯৮৪ সালে।

তাঁর প্রকাশিত কুড়িটির বেশি বইয়ের বেশিরভাগ প্রবাস থেকে লেখা। মূলত গদ্যলেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল শিশু ও কিশোরদের জন্যে লেখেন অক্লেশে, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখেন স্বচ্ছন্দে, যদিও তাঁর প্রকৃত ভালবাসা সাহিত্যের মূল ধারায়।

প্রবাস জীবনের ইতি ঘটিয়ে স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন নিউ জার্সি থেকে। তাঁর স্ত্রী ছাত্রজীবনের সহপাঠিনী ড. ইয়াসমীন হক। তাঁদের এক পুত্র নাবিল এবং এক কন্যা ইয়েশিম।

বর্তমান গ্রন্থভুক্ত রচনাসমূহে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর রচয়িতা মুহম্মদ জাফর ইকবালকে পাওয়া যাবে পূর্ণাঙ্গরূপে। তাঁর বহুধাবিচিত্র ভাবনার গতিময়তার স্থিরচিত্র যেন এ-সব গল্প।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল একক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান কাহিনীকে স্থায়ী-শীর্ষ আসনে সমারূঢ় করেছেন। বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের শীর্ষলেখকের শিরোপা তাঁরই প্রাপ্য বলে আমাদের ধারণা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশান সমগ্র

প্রথম খণ্ড

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশান সমগ্র

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১

প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ১৯৯৪
দ্বাবিংশ মুদ্রণ
মার্চ ২০১৪

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
নূর-ই-মোনতাকিম আলমগীর কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পূবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : বিদেশী চিত্র অবলম্বনে

মূল্য : ৫৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 446 - 007 - 7

SCIENCE FICTION SAMAGRA VOL-1 [A Collection of Science Fiction]
by Mohammad Zafor Iqbal
Published by PROTIK. 38/2ka Banglabazar (1st floor), Dhaka-1100
Twenty-two Edition : March 2014. Price : Taka 550.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
০১৭৪৩৯৫৫০০২, ০১৬৮০১৫৩৭০৭

Website : **www.abosar.com, www.protikbooks.com**
Facebook : www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com
Online Distributor : www.rokomari.com, Phone : 16297, 01833168190
www.[illegible] Phone : [illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ভূমিকা

আমি দীর্ঘদিন থেকে দেশের বাইরে। প্রথম দু একটি বই ছাড়া আমার সব লেখালেখি হয়েছে বিদেশের মাটিতে বসে। সেইসব লেখালেখি ছাড়াছাড়া ভাবে, অনিয়মিত ভাবে দেশে প্রকাশিত হয়েছে। আমি সেইসব বইয়ের প্রুফ দেখতে পারি নি, প্রচ্ছদ নির্বাচন করতে পরি নি। বই প্রকাশনার পর পাঠকেরা আমার লেখা গ্রহণ করেছেন কি না সেটাও আমি কখনো জানতে পারি নি। গত বছর কিছু দিনের জন্যে দেশে বেড়াতে এসেছি, তখন প্রতীক প্রকাশনির আলমগীর রহমান আমার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলি নিয়ে একটা সায়েন্স ফিকশান সমগ্র প্রকাশ করার প্রস্তাব দিলেন। বলা যেতে পারে তখন আমি প্রথমবার জানতে পারলাম, এ দেশে সায়েন্স ফিকশানের অনেক পাঠক পাঠিকা রয়েছেন, তাদের অনেকে আমার লেখাকে সস্নেহে গ্রহণ করেছেন। আলমগীর রহমানের উৎসাহ এবং সায়েন্স ফিকশানের প্রতি তার মমতা ও ভালবাসায় আমার লেখা প্রথম আটটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নিয়ে সায়েন্স ফিকশান সমগ্রের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল।

এই গ্রন্থের "কপোট্রনিক সুখ দুঃখ" আমার প্রথম প্রকাশিত বই। প্রথম গল্পটি বিচিত্রায় প্রকাশিত হবার পর কেউ কেউ এটাকে বিদেশি গল্পের অনুকরণ বলে সন্দেহ প্রকাশ করে কাগজপত্রে লেখালেখি করেছিলেন। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অল্পতেই বিচলিত হয়ে যাই। বিদেশি গল্পের অনুকরণ না করেই সায়েন্স ফিকশান লেখা সম্ভব প্রমাণ করার জন্যে আমি তখন রেগেমেগে অন্য গল্পগুলি লিখেছিলাম। মুক্তধারার জনাব চিত্তরঞ্জন সাহা সেই গল্পগুলির সংকলনকে বই হিসেবে প্রকাশ করে এই ছেলেমানুষ লেখককে রাতারাতি গ্রন্থকারে পরিণত করে দিলেন। আমি গভীর ভালবাসায় বইটি আমার বাবাকে উৎসর্গ করেছিলাম। স্বর্গের এই মানুষটি ভুল করে পৃথিবীতে চলে এসেছিলেন এবং একাত্তরের এক রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্নে পাকিস্তানি মিলিটারিরা এক বিষণ্ন নদীতীরে তাকে গুলি করে হত্যা করে পৃথিবীতে তার নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে অর্থ কপর্দকহীন আমাদের পুরো পরিবার তখন গভীর সমস্যায়। বেঁচে থাকার জন্যে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে। অল্প কিছু অনিয়মিত অর্থের বিনিময়ে আমি গণকণ্ঠ নামের একটি পত্রিকায় নিয়মিত কার্টুন এবং "মহাকাশে মহাত্রাস" নামে একটি কমিক স্ট্রিপ আঁকি। "কপোট্রনিক সুখ দুঃখ" প্রকাশিত হবার পর চিত্তরঞ্জন সাহা আমার কাছে এই ধরনের আরো কোন পাণ্ডুলিপি আছে কি না জানতে চাইলেন। গ্রন্থকার হবার প্রবল বাসনায় বাসায় ফিরে এসে রাতারাতি কমিক স্ট্রিপটিকে একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর রূপ দিয়ে লিখে ফেলে তাঁকে দিয়ে এসেছিলাম। বইটিতে তাড়াহুড়ো করে লেখার এই ছাপটি বেশ সুস্পষ্ট রয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে পদার্থ বিজ্ঞানে পি. এইচ. ডি. করার জন্যে আমি যুক্তরাষ্ট্রে চলে গিয়েছিলাম বলে কখনো বইটিকে আর ঢেলে সাজাতে পারি নি।

"বিজ্ঞানী সফদর আলীর মহা মহা আবিষ্কার" বইটি যুক্তরাষ্ট্রে বসে লেখা। তখন নূতন বিদেশে এসেছি, পশ্চিম দিকে, প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে মুখ করে অপর পাশে ফেলে আসা দেশের কথা মনে করে লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। লিখতে বসেও কাগজের পৃষ্ঠায় সফদর আলী নামে এক জন সাদামাটা দেশের মানুষ উঠে এল। যে ঢাকা শহর, যে দেশ এবং দেশের মানুষকে পিছনে ফেলে এসেছি সেই দেশের এক জন আধপাগল বিজ্ঞানী। হালকা সুরে লেখা, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী হলেই থমথমে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে লিখতে হবে সে রকম কি কোন নিয়ম আছে। আমার এই প্রিয় বইটি কোন একটি বিচিত্র কারণে দীর্ঘদিন বাক্সবন্দি হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করে প্রকাশ করার জন্যে অনুজ আহসান হাবীব এবং মোহনা প্রকাশনীর অনুজপ্রতীম জাকির হাসান সেলিমের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

"ক্রুগো" বইটি এই গ্রন্থের প্রকাশক আলমগীর রহমানের অনুরোধে লেখা। তখন কম্পিউটার নিয়ে কাজ করি, লিখতে বসেও দেখি কম্পিউটারের হার্ডওয়ার আর সফটওয়ার কেমন করে জানি গল্পে স্থান করে নিয়েছে! ফরমায়েশি লেখা বলে সবসময় মনের মাঝে সন্দেহ ছিল হয়তো দায়সারা কিছু একটা লিখে ফেলেছি। কিছু পাঠক বইটিকে সস্নেহে গ্রহণ করে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন।

"ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম" বইটির ইতিহাস একটু ভিন্ন। তখন নূতন ম্যাকিন্টশ কম্পিউটার বের হয়েছে, আমি সেখানে বাংলা লেখার জন্যে খেটেখুটে বেশ কিছু বাংলা ফন্ট তৈরি করেছি। লেজার প্রিন্টারে ছাপিয়ে নিলে একেবারে ছাপার মতো মনে হয়। কাগজ কলম ব্যবহার না করে সোজাসুজি ওয়ার্ড প্রসেসরে কিছু লেখার ইচ্ছে হল, তাই বসে বসে লিখলাম, "ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম"। বইটির প্রথম সংস্করণ সেভাবেই বের হল, আমার তৈরি বর্ণমালায়। বইটি প্রকাশ পাবার কিছুদিনের মাঝেই ভয়েজার-২ সৌরজগতের প্রায় শেষপ্রান্তের গ্রহ নেপচুনের পাশে দিয়ে উড়ে গেল, হঠাৎ করে আমি জানতে পারলাম ট্রাইটন নামে সত্যি কিছু একটা আছে, তবে সেটি গ্রহ নয়, উপগ্রহ—নেপচুনের উপগ্রহ!

এর পর আমি দীর্ঘকাল কিছু লিখি নি। বিদেশে বসে লেখালেখি করা অনেকটা অন্ধকারে ছবি আঁকার মতো, যেটা আঁকতে চাইছি সেটা আঁকতে পারছি কি না জানার জন্যে ছবিটা দেখতে হয়, অন্ধকারে সেটা করা যায় না। ঠিক সেরকম যেটা বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইছি সেটা বলতে পারছি কি না জানার জন্যে পাঠকদের কাছে থাকতে হয়, তারা কাছে না থাকলে সেটা করা যায় না। পাঠকদের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ নিজের আনন্দে যারা লিখতে পারেন আমি তাদের এক জন নই।

তখন আমার জীবনে একটা ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল, নিউ ইয়র্কে আমার সাথে মিসেস জাহানারা ইমামের দেখা হল। আমি নিজের পরিচয় দেয়ার পর তিনি আমাকে চিনলেন, শুধু যে চিনলেন তাই নয় আমাকে বললেন, আমি যে যৎকিঞ্চিত লেখালেখি করেছি তিনি তার সব পড়েছেন। শুধু যে পড়েছেন তাই নয়, শখ করে পড়েছেন। তিনি আমার লেখালেখি নিয়ে বেশ কিছু দয়ার্দ্র কথা বললেন। বলা যেতে পারে আমি ঠিক তখনই ঠিক করলাম আবার আমি লেখালেখি শুরু করব। সাহিত্যের মান বিচারে সেই লেখা যেখানে থাকে থাকুক, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাব না, আমার পক্ষে যেটুকু সম্ভব আমি যেভাবে পারি সেটা লিখে যাব।

তারপর আবার আমি লেখালেখি শুরু করেছি। প্রথমে ঠিক করেছিলাম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী অনেক লেখা হয়েছে আর নয়। কিন্তু এক জন আমাকে বললেন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী হচ্ছে প্রচলিত সাহিত্যের সুরম্য অট্টালিকায় একটি জানালা, সে জানালা দিয়ে ধরা ছোঁয়ার বাইরের একটা বিচিত্র জগতে উঁকি দেয়া যায়! তার কথা শুনে শেষ পর্যন্ত আমি আমার সেই ছোট জানালা বন্ধ করে দিই নি। তা ছাড়াও লক্ষ্য করেছি কিছুদিন পার হলেই বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখার জন্যে আমার হাত কেমন জানি নিশপিশ করতে থাকে!

এর পরে আমি যে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লিখেছি সেটি কিছু গল্পের সংকলন নাম "ওমিক্রনিক রূপান্তর"। এটি সাম্প্রতিক কালের লেখা। লিখতে গিয়ে অনুভব করেছি নিজের মাঝে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সারাজীবন যে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির পিছনে ছুটে বেরিয়েছি তার অনিয়ন্ত্রিত ভয়াবহ দিকটি চোখে পড়তে শুরু করেছে। বিজ্ঞানে সমস্যা নেই, প্রযুক্তিতেও সমস্যা নেই; সমস্যা হচ্ছে তার প্রয়োগে। পাশ্চাত্য দেশ ইদানীং অনিয়ন্ত্রিত এবং অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের মূল্য দিতে শুরু করেছে, আমাদের সময় হয়েছে সতর্ক হওয়ার। এই কল্পকাহিনীগুলিতেও মনে হয় স্থানে স্থানে আমার সেই আতংক উঁকি দিতে শুরু করেছে।

"টুকুনজিল" কিশোরদের সায়েন্স ফিকশান, যেখানে অল্প একটু সায়েন্স আর অনেকখানি ফিকশান। এর পটভূমিকা ভবিষ্যতের কোন কল্পলোক নয় এর পটভূমিকা আজকের পৃথিবী। এর চরিত্র অসাধারণ কোন ব্যক্তিত্ব নয়, এর চরিত্র সাধারণ গ্রামের কিশোর। এই গল্পে সংঘাত গ্রহান্তরের আগন্তুকের সাথে নয়, সংঘাত পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী মানুষের সাথে। সহজ কাহিনীর এই উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে আমি এক ধরনের ছেলেমানুষী আনন্দ পেয়েছিলাম, যাদের জন্যে লিখেছি তারা যদি সেই আনন্দের একটু অংশও পেয়ে থাকেন আমার আর কিছু চাইবার নেই।

"যারা বায়োবট" বইটি শেষ করেছি গতবছর ঢাকায় বেড়াতে গিয়ে। যখন আধা আধি লেখা হয়েছে তখন একমাত্র পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে ফেললাম। যে ব্যাগে সেটি ছিল সেখানে আরো একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি ছিল, সাথে আমার নাম ঠিকানা লেখা একটি ডাইরি এবং তার ভিতরে বেশ কিছু টাকা। ব্যাগটি আমি ভুল করে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুটারে ফেলে এসেছিলাম, সেই স্কুটারের ড্রাইভার দুদিন পরে আমাকে খুঁজে বের করে আমার সেই ব্যাগ ফেরত নিয়ে এসেছিল। আমি খুব খুশি হয়েছিলাম কিন্তু একটুও অবাক হই নি। মানুষের উপর আমার কেমন জানি গভীর বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাসটি তৈরি হয়েছে একাত্তরের ভয়ংকর দুঃসময়ে। যখন পরিবার পরিজন নিয়ে আশ্রয়হীন হয়ে প্রাণের ভয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়েছি তখন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন করে বুক আগলে আমাদের রক্ষা করেছে। সেই ভয়ংকর দুঃসময়ে আমি মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখেছি, এতদিনেও সেই বিশ্বাস এতটুকু ম্লান হয় নি।

পরিশেষে একটি কথা লিখে আমি আমার এই ভূমিকাটি শেষ করতে চাই। আমি কর্মজীবনে সবসময় বিজ্ঞানের জন্যে কাজ করে এসেছি, নিজেকে তাই বিজ্ঞানী বলে ভাবতে ভাল লাগে। সাহিত্যের জন্যে আমার যেটুকু মমতা, বিজ্ঞানের জন্যেও আমার ঠিক ততটুকু মমতা। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লিখতে গিয়ে আমি তাই সজ্ঞানে কখনো বিজ্ঞানের কোন তথ্যকে অবমাননা করি নি। সায়েন্স ফিকশান কতটুকু হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু সবসময় চেষ্টা করেছি লেখার মাঝে সায়েন্সটুকুকে যেভাবে পারি ধরে রাখতে—এই একটি কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
২৫শে জুলাই, ১৯৯৩
টিন্টন ফলস, নিউ জার্সি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচী

কপোট্রনিক সুখদুঃখ / ১
মহাকাশে মহাত্রাস / ৫৮
ক্রুগো / ৯৯
ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম / ১৬৯
বিজ্ঞানী সফদর আলীর মহা মহা আবিষ্কার / ২৬৩
ওমিক্রনিক রূপান্তর / ৩৭১
টুকুনজিল / ৪৪৯
যারা বায়োবট / ৫৩৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কপোট্রনিক সুখদুঃখ

উৎসর্গ

পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো লোকটিকে
বেছে নিতে বললে আমি আমার
আব্বাকে বেছে নিতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কপোট্রনিক ভালবাসা

আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি রিসার্চ সেন্টারের করিডোরে আমাকে গুলি করেছিল। স্পষ্টতই সে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু যে-কারণেই হোক, আমি মরি নি এবং কে আমাকে গুলি করেছিল সেটা এখন পর্যন্ত বাইরের কেউই জানে না। আমার বাম ফুসফুসটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল এবং এজন্যে আমাকে পুরো তিন মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। এই সুদীর্ঘ তিন মাস আমি যেসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছি, আমার গবেষণার সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই। আমি মানুষের ইচ্ছা, আকাঙক্ষা, বেঁচে থাকার প্রেরণা, আনন্দ ও যন্ত্রণার যৌক্তিকতা নিয়ে ভেবেছি। হাসপাতালের নিঃসঙ্গ পরিবেশ বা আমার অসুস্থ অবস্থার জন্যই হোক, আমি পরিপূর্ণভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করছিলাম। ঠিক এই সময়ে আমার সেই বন্ধুটি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। সে ভীষণ শীর্ণ হয়ে পড়েছিল, তার চোখের কোণে কালি, মুখে অপরাধবোধের ছাপ।

তুমি পুলিশকে আমার নাম বলতে পারতে—সে ঠিক এই কথাটি দিয়ে শুরু করেছিল—বল নি দেখে ধন্যবাদ। তবে যদি ভেবে থাক এটা তোমার মহত্ত্ব এবং মহত্ত্ব দিয়ে তুমি আমার উপর প্রভুত্ব করবে, তা হলে খুব ভুল করছ।

আমি তার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললাম, তুমি কী জন্যে আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে সেটা না জানলে হয়তো তোমাকে আমি ঘৃণা করতাম না। কিন্তু এখন তোমাকে আমি ঘৃণা করি।

সে আমার এই কথাটায় বিচলিত হয়ে পড়েছিল। আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর আমি বুঝতে পেরেছিলাম, হয় সে, নাহয় আমি বেঁচে থাকব। একজন অন্যজনকে ঘৃণা করতে করতে পাশাপাশি বেঁচে থাকতে পারে না। পরের দিনই আমি খবর পেয়েছিলাম আমার বন্ধুটি গুলি করে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে। আমি জানতাম তার অনুভূতি চড়া সুরে বাঁধা, কিন্তু এতটা ধারণা করি নি।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকের চাকরিটি ছেড়ে দিলাম। আমার বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বছর, আর সে-বছর থেকেই পায়োনের সাব-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্রাকচারের মডেলটি আমার নামে পরিচিত হতে লাগল। এই মডেলটি আমার চিন্তাপ্রসূত এবং আমার মৃত বন্ধুটির এটির প্রতি মোহ জন্মেছিল।

সবরকম আকর্ষণ থেকে ছাড়া পাওয়া আমার পক্ষে যথেষ্ট কঠিন হয়েছিল। এর জন্য আমাকে যথেষ্ট নির্মম ও বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। কিন্তু আমি কিছুতেই বাইরের জগতের জন্য আকর্ষণ জাগাতে পারছিলাম না। আমি নিজের ভিতরে একটি আলাদা ভাবনার জগৎ গড়ে তুলেছিলাম, আমার সেখানে ডুবে থাকতেই ভালো লাগছিল।

যে-মেয়েটি আমাকে দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করত, ক্রমে ক্রমে সেও আমার অসহ্য হয়ে উঠল। তাকে বিদায় করার পর আমার দৈনন্দিন কাজে নানারকম বিঘ্ন ঘটতে লাগল। আমার সারা দিনের রুটিন ছিল খুব সাদাসিধে। আমি অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোতাম। ঘুম থেকে উঠে সারা দিন ছবি আঁকতাম। রাত্রিবেলা আমি দর্শন ও মধ্যযুগীয় চিরায়ত সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করতাম। আমি কারো সাথে দেখা করতাম না। সপ্তাহে এক দিন লেটার-বক্স থেকে চিঠিগুলি এনে ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। ফোনটার তার কেটে দিয়েছিলাম বহু আগেই। আমার এই সহজ জীবনযাত্রায় শুধু দু'বেলার খাবার ও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার ঝামেলাটুকুও অসহনীয় হয়ে উঠল। এজন্যে একজন সাহায্যকারী রাখতেই হয়। আমি গৃহকর্মে পারদর্শী একটা রবোট* কিনব কি না ভাবছিলাম। কিন্তু আমার ঘরে অনুভূতিলেশহীন একটা যন্ত্রদানব ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভোরে আমার কফি তৈরি করে দিচ্ছে, কাপড় ইস্ত্রি করছে—এটা ভাবতেই আমার মন বিরূপ হয়ে উঠল। আমার ইচ্ছে করছিল একটা সংবেদনশীল রবোটের সাহচর্য পেতে। কিন্তু পৃথিবীতে অনুভূতিসম্পন্ন রবোট এখনো তৈরি হয় নি। আমি প্রায় হঠাৎ করে ঠিক করলাম, একটা অনুভূতিসম্পন্ন রবোট আমি নিজেই তৈরি করব—সম্পূর্ণ আমার মনোমতো করে।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর আমার জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়ে গেল। আমার বেশিরভাগ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকত রবোটের নক্সা ও খুঁটিনাটি বিষয়ে। পরিশ্রম করতে শুরু করার পর একটা মেয়েকে কাজে সাহায্য করতে রাখার বিরক্তিটাও তত বেশি মনে হল না।

সাধারণ রবোট তৈরি এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। রবোটের মস্তিষ্ক—যেটাকে সাধারণভাবে কপোট্রন বলা হয়ে থাকে, সেটা যে-কোনো ফার্ম থেকেই অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু আমার রবোটটির জন্যে ঠিক কী ধরনের কপোট্রন প্রয়োজন বুঝতে পারছিলাম না। বি-এফ-২ ধরনের কপোট্রন গৃহস্থালি কাজের জন্যে ব্যবহার করা হয়। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে যেসব রবোট ব্যবহার করা হয়, তাদের কপোট্রন এল. ২. বি.টাইপের। আমাদের বিদ্যালয়ের বিভাট্রনটির ভার দেয়া ছিল এল. এ. এফ. টাইপের কপোট্রনযুক্ত রবোটকে।

আমি যে রবোটটি তৈরি করতে যাচ্ছি, সেটাতে এগুলোর কোনোটিই খাটবে না, কারণ এ সবগুলিই বিভিন্ন যান্ত্রিক বিষয়ে অভিজ্ঞ। সংবেদনশীলতা বা যেটাকে আমরা অনুভূতি বলে থাকি, সেটা এগুলোর কোনোটিতেই নেই। সংগীতে অবশ্যি গাণিতিক

---

*Robot : যন্ত্রমানব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবোটের বি. কে. ২১ কপোট্রন ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু সেসব রবোট গাণিতিক বিশ্লেষণ করে সুর সৃষ্টি করলেও সুরকে অনুভব করতে পারে না। কারণ অনুভূতি বলে যে–মানবিক প্রক্রিয়াটি আছে, সেটা এখন পর্যন্ত মানুষের একচেটিয়া। আমি এমন একটি রবোট সৃষ্টি করতে চাইছি, যেটা গান শুনতে ভালবাসবে, কবিতা পড়বে, হাসবে, এমন কি দুঃখ পেলে কাঁদবে। আনন্দ, বেদনা, ঈর্ষা বা রাগ—এ সব কয়টি মানবিক অনুভূতি যান্ত্রিক উপায়ে তৈরি করা যায় কি না আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

ফার্মগুলোর ক্যাটালগে আমার মনোমতো কপোট্রন পাওয়া গেল না। একটি ফার্ম অবশ্যি ঘোষণা করেছে, হাসতে পারবে এমন একটি কপোট্রন তারা শীঘ্রই প্রদর্শন করবে। তাদের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম, শীঘ্রই বলতে তারা আরও চার বছর পরে বোঝাচ্ছে। তারা দুঃখ করে লিখেছে, অনুভূতিসম্পন্ন রবোট তৈরির পরিকল্পনা সরকার অনুমোদন করতে চাইছে না, কারণ এটার কোনো ব্যবহারিক গুরুত্ব নেই।

আমি একটি দেশীয় ফার্মকে অর্ডার দিয়ে একটি সাধারণ বি–১ ধরনের কপোট্রন তৈরি করালাম। এটির নিউকেপটিভ সেলের সংখ্যা সাধারণ কপোট্রনের চার গুণ, মানুষের নিউরোন সেলের প্রায় অর্ধেকসংখ্যক। তবে এটির কোনোরকম যান্ত্রিক দক্ষতা নেই। আমাকে কপোট্রনটি হস্তান্তরের সময় ডিরেক্টর ভদ্রলোক এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

কপোট্রনটিকে বিভিন্ন অংশের সাথে সংযুক্ত করে রবোটের আকৃতি দিতে আমাকে প্রায় রবোটের মতোই খাটতে হল। পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকায় আমার সময়ও লাগল অনেক বেশি। সৌভাগ্যক্রমে আমি আমার সব বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। আমাকে এই ছেলেমানুষি কাজে এরকম সময় নষ্ট করতে দেখলে তাদের বিরক্তির অবধি থাকত না।

রবোটটি শেষ করার পর তার চেহারা দেখে আমার তাক লেগে গেল। রবোট তৈরির প্রথম যুগে যেরকম অতিকায় রবোট তৈরি করা হত, এটা হয়েছে অনেকটা সেরকম। অতিকায় মাথা, ঠিক মানুষের চোখের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দু'টি সবুজাভ চোখ—যদিও সব রবোটেই একটিমাত্র চোখ থাকে, আমি দু'টি না দিয়ে পারি নি। মুখের জায়গায় স্পিকার। নাক ছাড়া খারাপ লাগছিল দেখে একটা কৃত্রিম গ্রিক ধাঁচের নাক স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিয়েছি। চতুষ্কোণ শরীরের দু' পাশে ঝুলে থাকা হাত, হাতে মোটা মোটা ধাতব আঙুল। দুটো থামের মতো শক্ত পা, হাঁটুর জায়গায় জটিল যান্ত্রিক জোড়। পায়ের পাতা বিরাট বড়, গোলাকৃতির, অনেক জায়গা জুড়ে আছে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে। আমি রং করে পায়ের আঙুল, বুকের পেশি, ঠোঁট, কান, চোখের ভুরু, চুল—এসব এঁকে দিলাম। বলতে লজ্জা নেই, তাতে রবোটটির চেহারার উন্নতি না হয়ে কাগতাড়ুয়াদের মতো দেখাতে লাগল।

বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়ার পর রবোটটি চোখ পিটপিট করে ঘুরে দাঁড়াল। তার বুকের ভিতর থেকে একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ভেসে আসছিল। সবুজাভ চোখে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে লাগল। আমি বললাম, তোমার নাম প্রমিথিউস।

কথাটি আমি ভেবে বলি নি, কিন্তু রবোটটি মাথা ঝাঁকিয়ে সেটি মেনে নেবার পর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার আর কিছু করার ছিল না।

প্রমিথিউসকে আমার দৈনন্দিন কাজের সাথে পরিচিত করে তুলছিলাম। সে সকালে নাস্তা তৈরি করে দিত, ঘর পরিষ্কার করত এবং মাঝে মাঝে কাপড় ইস্ত্রি করে দিত। বলতে দ্বিধা নেই, তার আচার-আচরণ ছিল পুরোপুরি গবেটের মতো। তার সৌন্দর্যবোধের কোনো বালাই ছিল না। ফুলপ্যান্ট ইস্ত্রি করত আড়াআড়িভাবে। একদিন স্বাধীনভাবে ঘর পরিষ্কার করতে দেয়ায় দেয়ালে টাঙানো দুটো অয়েলপেইনটিং ফেলে দিয়েছিল।

যখন প্রমিথিউসের সাথে যথেষ্টভাবে পরিচিত হয়ে উঠলাম, তখন একদিন তার বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নিতে বসলাম। সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করে তাকে জীবনানন্দ দাশ নামক জনৈক প্রাচীন বাঙালি কবির লাইন পড়ে শোনালাম,

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে—
জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা—

তারপর জিজ্ঞেস করলাম, এই লাইন দুটি সম্পর্কে তোমার কী মত?

'চিন্তায় অসঙ্গত কোনো মানুষের উক্তি।'

তাকে গঁগার আঁকা একটি পলিনেশিয়ান মেয়ের ছবি দেখালে সে অনেকক্ষণ ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে বলল, 'বিকৃত শারীরিক গঠনের একটি মেয়ের ছবিতে দুর্বোধ্য কারণে সব কয়টি রং অনিয়মিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।'

গঁগার শিল্পকীর্তির এ-ধরনের মূল্য বিচারে আমার পক্ষে হাসি চেপে রাখা মুশকিল হল। উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কী করছিলাম?'

'আপনি হাসছিলেন।'

হাসি কি?

এক ধরনের অর্থহীন শারীরিক প্রক্রিয়া।

তুমি হাস তো।

সে আমার হাসিকে অনুকরণ করে যান্ত্রিক শব্দ করল।

AMARBOI.COM

প্রমিথিউসকে নিয়ে হতাশ হবার পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। কিন্তু আমি হতাশ হই নি। তার ভিতরে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করার জন্যে আমি কিছু নতুন সংস্কার করব ঠিক করলাম। সৌন্দর্য নিয়ে আমাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হল। সৌন্দর্যের গাণিতিক বিশ্লেষণ আমাকে এ ব্যাপারে বাস্তব সাহায্য করল।

প্রমিথিউসের ভিতর সৌন্দর্যচেতনা জাগাতে হলে তার ভিতরে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যার জন্যে সে যখনই সুন্দর কিছুর সম্মুখীন হবে, তখনই তার ভালো লাগতে শুরু করবে। সোজাসুজি তাকে ভালো লাগার অনুভূতি দেয়া সম্ভব নয়—তার কষ্ট কমিয়ে দেয়ার অনুভূতি দেয়া যেতে পারে। কষ্ট কমানোর আগে তাকে সবসময়ের জন্যে খানিকটা কষ্ট দিয়ে রাখতে হবে। কপেট্রনের নিউকেপটিভ সেলে একটি অসম বৈদ্যুতিক চাপ দিয়ে রাখলে কপেট্রন তার সবরকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা দিয়ে চেষ্টা করবে বৈদ্যুতিক চাপের অসমতাকে দূর করতে। এই অবস্থাটাকে কপেট্রনের কষ্ট বলা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখনই বৈদ্যুতিক চাপের অসমতাকে কমানো যাবে, তখনই কষ্ট কমে গিয়ে একটা ভালো লাগার পরোক্ষ অনুভূতি সৃষ্টি হবে। কপোট্রনের সেলগুলির সামনে একটা পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে সহজেই এটা করা যায়। কিন্তু প্রকৃত ঝামেলার সৃষ্টি হবে সুন্দর কিছু দেখা, শোনা বা অনুভব করার সাথে সাথে এই বিদ্যুৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাব পরিবর্তন করার মাঝে। এ জন্যে কপোট্রনের সেলগুলিকে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করতে হল। বাইরের জগতের যে-কোনো প্রভাব সেগুলোতে আলাদা আলাদাভাবে ছড়িয়ে পড়ত। সৌন্দর্যের গাণিতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী সেগুলি সুন্দরের আওতাভুক্ত হলেই কপোট্রনের কষ্ট কমতে থাকত—ঘুরিয়ে বলা যায়, কপোট্রনের ভালো লাগা শুরু হত। সৌন্দর্যের তীব্রতা অনুযায়ী সে-ভালো লাগাও কম বা বেশি হতে পারে।

প্রমিথিউসের এই সংস্কার করতে গিয়ে আমাকে পশুর মতো পরিশ্রম করতে হল। দীর্ঘ সময় প্রমিথিউসকে অচল রেখে তার কপোট্রনে অস্ত্র চালাতে হয়েছে। কপোট্রনের এ-ধরনের জটিল কাজ করে সূক্ষ্ম কাজে পারদর্শী আর-২১ ধরনের রবোট। দু' মাস দশ দিন পর আমি যখন প্রমিথিউসের সংস্কার শেষ করলাম, তখন আমার কন্টাক্ট লেন্সের পাওয়ার বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে, ওজন কমেছে চার পাউন্ড। অবিশ্যি এ-কথা স্বীকার না করলেই নয়, ওজন মাত্র চার পাউন্ড কমার পিছনে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব বুলার। বুলা আমার কাজকর্মে সাহায্য করার নূতন মেয়েটি। প্রমিথিউসের সৌন্দর্যচেতনা সৃষ্টির সময় একজন সাহায্যকারীর জন্যে কোম্পানিকে লিখলে তারা এই মেয়েটিকে পাঠায়। আর দশটা মেয়ের মতো সেও ছুটির সময় চাকরি করে অর্থোপার্জন করছে। সামনের জুলাই মাসে সে পদার্থবিদ্যায় অনার্স পরীক্ষা দেবে।

প্রমিথিউসকে আবার জীবনদান করার সময় ঘরটাকে যথাসম্ভব ফাঁকা করে দিলাম। সুইচ টিপে আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হল—নূতন আবিষ্কৃত রডোন টিউবগুলি ভাল্‌বের মতোই গরম হতে সময় নেয়। মিনিট পাঁচেক পরেই প্রমিথিউসের চোখে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে লাগল। প্রমিথিউস তার একটা হাত অল্প উপরে তুলে দ্বিধান্বিতভাবে আবার নামিয়ে ফেলল।

কেমন আছ? আমার প্রশ্নের উত্তর সে সাথে সাথে দিল না। আগে কখনও এরকম করে নি। একটু পরে বলল, ভালো।

আমার ভুলও হতে পারে, কিন্তু মনে হল ওর কথায় যেন আবেগের ছোঁয়া লেগেছে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ভিতরে কোনো পরিবর্তন টের পাচ্ছ?

না তো। কেন?

উত্তর না দিয়ে আমি হাত বাড়িয়ে টেপ রেকর্ডারটি চালিয়ে দিলাম। এহুদি মেনুহিনের বেহালার করুণ সুরে মুহূর্তে সারা ঘর ভরে উঠল। প্রমিথিউস শক্ খাওয়ার মতো চমকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি টেপ রেকর্ডারটি বন্ধ করে দিতেই আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, স্যার, বন্ধ করবেন না।

কেন? এটা শুনতে কেমন লাগছে?

প্রমিথিউস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলল, এটা বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্পনের শব্দতরঙ্গের পারস্পরিক সুষম উপস্থাপন। কিন্তু এটা শুনলে আমার ভিতরে এমন একটা বিচিত্র প্রক্রিয়া হতে থাকে যে, ইচ্ছে হয় আরো শুনি, আরো শুনি।

আমি বুঝতে পারলাম, প্রমিথিউসকে তার নূতন অবস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া প্রয়োজন। বললাম, প্রমিথিউস, এহুদি মেনুহিনের বেহালার সুর শুনে তোমার ভিতরে যে-দুর্বোধ্য শারীরিক প্রক্রিয়া হচ্ছিল, সেটির নাম ভালো লাগা। পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র রবোট, যে ভালো লাগা খারাপ লাগার অনুভূতি বুঝতে পারে।

প্রমিথিউস দু'পা সরে এল। যান্ত্রিক মুখে একাগ্রতা, নিষ্ঠা ইত্যাদি ছাপ ফোটানোর পরবর্তী পরিকল্পনা আমার মাথায় উঁকি দিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে তুমি আরো নূতন অনুভূতির সাথে পরিচিত হবে।

কি রকম?

যেমন এই গোলাপ ফুলটি। আমি জানালা খুলে তাকে বাগানের সবচেয়ে সুন্দর গোলাপ ফুলটি দেখালাম।

স্যার! প্রমিথিউস চেঁচিয়ে উঠল, আমার ভালো লাগছে!

হ্যাঁ। সুন্দর জিনিস দেখলেই তোমার ভালো লাগবে, তবে তা চেঁচিয়ে বলার দরকার নেই। আমি তাকে ফুলটি ছিঁড়ে আনতে বললাম। সে ফুলটিকে ছিঁড়ে এনে চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। আমি তার হাত থেকে ফুলটি নিলাম, নিয়ে হঠাৎ কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললাম!

প্রমিথিউসের ভিতর থেকে আর্তনাদের মতো একটা যান্ত্রিক শব্দ বের হল। আবার আমি বললাম, তোমার এখন আমার প্রতি যে-অনুভূতি হচ্ছে—সেটার নাম রাগ। রাগ বেশি হলে তোমার কপোট্রন তোমার উপর যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে।

প্রমিথিউস কোনো কথা বলল না। স্পষ্টতই ও রাগ হয়েছে।

অর্থহীন কাজ দেখলে রাগ হয়। গোলাপ ফুলটা তোমার ভালো লেগেছে, আমি শুধু ওটা ছিঁড়ে ফেলেছি, তাই তোমার রাগ হয়েছে।

প্রমিথিউস অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, আমার গোলাপ ফুল খুব ভালো লাগে।

খুব ভালো লাগার আর একটি নাম আছে। সেটা হচ্ছে ভালবাসা।

প্রমিথিউস বিড়বিড় করে বলল, আমি গোলাপ ফুল ভালবাসি।

ঠিক সেই সময় বুলা তার একরাশ কালো চুলকে পিছনে সরিয়ে দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকল। বলল, স্যার, আপনার খাবার সময় হয়েছে।

আসছি।

না, এক্ষুনি চলুন, দেরি হলে জুড়িয়ে যাবে। মেয়েটি ছেলেমানুষ, আমাকে না নিয়ে কিছুতেই যাবে না। আপত্তি করব, তার উপায় নেই। কীভাবে জানি আমি তার অনেকটুকু প্রভুত্ব মেনে নিয়েছি।

আমি প্রমিথিউসকে বসিয়ে রেখে মেয়েটির পিছে পিছে খাবার ঘরে গেলাম। যাওয়ার সময় শুনলাম প্রমিথিউস বিড়বিড় করে বলছে, আমি এই মেয়েটিকে ভালবাসি।

প্রমিথিউস কিছুদিনেই একজন বিশুদ্ধ সংস্কৃতিবান রবোটে পরিণত হল। তার প্রিয় কবি জাঁ ককতো। মূল ফরাসি ভাষা থেকে প্রমিথিউসের অনুবাদ করা কবিতাগুলি

ধারাবাহিকভাবে একটি সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। আমি তাকে মৌলিক রচনা করার উৎসাহ দিয়েছি। বর্তমানে সে 'কপেট্রনিক সংশয়গুচ্ছ' নাম দিয়ে একটি কবিতার বই লিখছে।

কিছুদিনের ভিতরে সে উপন্যাস পড়ায় ঝুঁকল। আমি তাকে গোর্কি শেষ করে কাফকায় ডুবে যেতে দেখলাম। হেমিংওয়ে, সার্ত্রে, কাম্যু পড়ে যেতে লাগল দ্রুত।

বুলা পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রমিথিউস আজকাল বুলার দায়িত্ব পালন করছে। স্পষ্টতই প্রমিথিউস খাবার টেবিলে বুলার মতোই আরেকটু মাংস নিতে পীড়াপীড়ি করে, কিন্তু তবুও বুলার অভাবটা আমার সহজে পূরণ হতে চাইল না। মেয়েটি সুন্দরী ছিল, বুদ্ধিমতী ছিল এবং আমার জন্যে প্রকৃত অর্থে মমতাও ছিল। বুলা চলে যাওয়ার পরপরই আমি বুঝতে পারলাম, আমি বুলাকে ভালবেসেছিলাম। আমার নিজস্ব ধ্যান–ধারণার মানবিক এই সমস্ত উচ্ছ্বাসগুলির বিশেষ কোনো মূল্য নেই। কিন্তু যতই বুলার কথা ভুলতে চাইলাম, ততই মস্তিষ্কের কোথাও অসম বৈদ্যুতিক আবেশ হতে থাকল। কাজেই যেদিন বুলা প্রমিথিউসের তত্ত্বাবধানে আমার জীবনযাত্রা কেমন চলছে দেখতে এল, সেদিন আমার আনন্দের অবধি রইল না।

এই যে বুলা! আমি এই শুষ্ক কথা কয়টি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেও কিছুক্ষণের ভিতরেই প্রকৃত বক্তব্যে চলে এলাম। বললাম, তুমি আমার কাছে না এলে আমিই তোমার কাছে যেতাম। অর্থাৎ আমি তোমাকে—আমাকে একটু কাশতেই হল, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

বুলা প্রথমে বিস্মিত হল, পরে লাল হয়ে মাথা নিচু করল। আমি একটু দ্বিধা করে বললাম, তোমার আপত্তি থাকলে জানাতে পার। আমি তো আর এমন কোনো মহৎ ব্যক্তি নই, তুমি তো জানই আমার অনেক দোষ–ত্রুটি।

বুলা সহজ হল খুব তাড়াতাড়ি। স্যার বলে সম্বোধন ও আপনি সম্পর্ক থেকে আমার ছোট্ট, প্রায় অজানা ডাকনামটি দিয়ে সম্বোধন করে তুমি সম্পর্ক এত সহজ করে নিল, যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম। আরো অবাক হলাম যখন বুলা জানাল তার কুমারীজীবনের স্বপ্নই হচ্ছে আমার এই ছোট্ট ডাকনামটি দিয়ে আমাকে তুমি বলে ডাকবে।

বুলা বিদায় নেবার পর আমার কোনো কাজেই মন বসল না। আমি প্রমিথিউসকে ডেকে পাঠালাম। প্রমিথিউস দু' হাতে কিছু বই নিয়ে হাজির হল। কিছু হ্যাভলক এলিসের লেখা, কিছু ফ্রয়েডের লেখা।

আপনি বলেছিলেন, প্রমিথিউস একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, খুব বেশি ভালো লাগার নাম ভালবাসা। কিন্তু এখানে অন্য কথা লিখেছে। প্রমিথিউস হ্যাভলক এলিসের একটা বই আমার হাতে তুলে দিল। বলল, এখানে লিখেছে ছেলে ও মেয়ের ভিতরে জৈবিক কারণে যে আকর্ষণ হয়, তার নাম ভালবাসা।

আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেলাম। প্রমিথিউসকে তৈরি করার সময় এসব সমস্যা মোটেও ভেবে দেখি নি। আমি বললাম, তোমায় ওভাবে বলেছিলাম, কারণ তুমি এ ছাড়া বুঝবে না। তুমি পৃথিবীর যে–কোনো রবোট থেকে উন্নত, তোমার অনুভূতি আছে; কিন্তু তবুও তুমি সম্পূর্ণ নও। জীবজগতের একটা মূল অনুভূতি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌনচেতনা তোমার নেই।

কেন? প্রমিথিউস দুঃখ পেল। আপনি আমাকে ভালো লাগার, দুঃখ পাবার অনুভূতি দিয়েছেন, তবে এটি দিলেন না কেন?

আমি অল্প উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বললাম, কারণ আছে প্রমিথিউস। প্রাণীদের এ চেতনা আছে, কারণ বংশবৃদ্ধিতে এটা তাদের দরকার। কিন্তু তুমি এটা দিয়ে কী করবে? তুমি কখনোই একটা শিশু রবোট জন্ম দেয়ার জন্যে একটা মেয়ে রবোট পাবে না।

প্রমিথিউস চুপ করে থাকল। বইগুলি টেবিলে রেখে বলল, আপনি আমাকে এই অসম্পূর্ণ অনুভূতি না দিলেও পারতেন। ছেলে আর মেয়েরা এমন কতকগুলি আচরণ করে, তা আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। এতদিনে বুঝতে পারলাম ছেলে আর মেয়ের ভালবাসা কী জিনিস, সেটা অনুভব করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোলাগা বুঝতে পারব, ভালবাসা বুঝতে পারব না।

প্রমিথিউসের জন্যে আমার মায়া হল। আট ফুট উঁচু যন্ত্রদানব সবুজ চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ অনুনয়ের স্বরে বলল, স্যার, আপনি আমায় যৌনচেতনা দিতে পারেন না? দিন না, মাত্র একটি দিনের জন্যে দিন। আমি দেখি ভালবাসা কি!

আমি রাজি হলাম না। প্রমিথিউস মাথা নিচু করে চলে গেল।

AMARBOI.COM

আমার আর বুলার বিয়ে হল নভেম্বরে। বিয়ের পরদিনই আমরা হানিমুনে বের হয়ে গেলাম। বাসার যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকল প্রমিথিউসের উপর। দৈব দুর্ঘটনায় বৈদ্যুতিক গোলযোগ ঘটে প্রমিথিউসকে যেন অচল হয়ে থাকতে না হয়, সেজন্যে তার ভিতরে একটা ছোট পারমাণবিক ব্যাটারি সংযোজন করে গেলাম।

আমি আর বুলা ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়ালাম। কখনো পাহাড়ে, কখনো বনে, কখনো–বা সমুদ্রের বালুবেলায়। আমাদের মধু–চন্দ্রিমার দিনগুলি কেটে যেতে লাগল দ্রুত। বাসায় ফিরে যাবার তাগিদ কিছুতেই অনুভব করছিলাম না। মাঝে একদিন ফোনে প্রমিথিউসের সাথে কথা বলেছি। সে জানিয়েছে সব ভালোই চলছে।

কিছুদিন পর আমার হঠাৎ করে কোয়ার্কের সাব–স্ট্রাকচার নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে করতে লাগল। চব্বিশ ঘন্টার ভিতর আমার ইচ্ছাটা এমন অদম্য হয়ে উঠল যে, আমি প্রমিথিউসের কাছে একটা টেলিগ্রাম করে দিলাম স্টেশনে গাড়ি পাঠাবার জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে–চাকরিটি দিতে চাইছিল সেটা এখনো দিতে রাজি কি না জানতে চেয়ে আরেকটা টেলিগ্রাম করলাম। জাতীয় পুস্তকালয়ে দু' ডজন বইয়ের জন্যে লিখে পাঠালাম। আমার আচরণে বুলা অবাক হল না, বরং ভারি খুশি হয়ে উঠল। গবেষণামূলক কোনো কাজে সত্যিকার আগ্রহ নিয়ে লেগে থাকা কোনো মেয়ে পছন্দ না করে পারে না। এতে স্বস্তি আছে, ছকে ফেলা নিশ্চিত জীবন, এমন কি খ্যাতির বাঁধা সড়কের ইঙ্গিতও আছে।

আমরা পরদিন বাসায় পৌঁছে গেলাম। বাসার সব ভার বুলার উপর দিয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকের দায়িত্বটি নিয়ে নিলাম। একটু গুছিয়ে নিতে আমার মূল্যবান ছ'টা দিন নষ্ট হয়ে গেল। আমি আবার পড়াশোনা ও গবেষণার কাজ শুরু করে দিলাম।

একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ নিঃশব্দে প্রমিথিউস এসে দাঁড়াল। পড়াশোনার সময় কেউ আমাকে বিরক্ত করলে আমি সহ্য করতে পারি না। ভুরু কুঁচকে বললাম, কি চাই?

কপেট্রনিক সেলে বিদ্যুৎচৌম্বকীয় আবেশের জন্যে যে রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজমের সৃষ্টি হয়, তার ভারসাম্য রক্ষার সমীকরণে জিটা-নটের মান কোথায় পাব?

আমি অবাক হয়ে প্রমিথিউসের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাকে বিজ্ঞানসংক্রান্ত একটি অক্ষরও আমি শেখাই নি। কিন্তু সে যে জিনিসটা জানতে চেয়েছে, তার জন্যে প্রথম শ্রেণীর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা জানা দরকার।

তুমি এসব শিখলে কোথায়?

আপনি যাওয়ার পর পড়াশোনা করেছি।

সাহিত্যটাহিত্য ছেড়ে এসব ধরলে কেন?

প্রমিথিউস উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে থাকল। আমি তার সমস্যার সমাধান খুঁজে দিলাম। মনে মনে একটু খুশিও হলাম। একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

এবার আমি পড়াশোনায় অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বুলার জন্যে সময় করে ঘুমোতে হত; খেতে হত; বাকি সময়টা আমি লাইব্রেরি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে কাটাতাম। সময় কেটে যেতে লাগল দ্রুত।

কয়দিন পর বুলা খাবার টেবিলে আমাকে বলল, তোমার প্রমিথিউসকে বিক্রি করে দাও।

কেন? আমি অবাক হলাম।

সে এ নিয়ে আমাকে তিনটি প্রেমপত্র লিখেছে।

শুনে হাসতে গিয়ে আমি বিষম খেলাম। আজকাল প্রমিথিউস নিশ্চয়ই খুব রোমান্টিক উপন্যাস পড়ছে। প্রেমপত্রগুলি দেখলাম, চমৎকার হাতের লেখা, ভারি সুন্দর চিঠি। প্রমিথিউসের লেখা না জানলে আমার ঈর্ষান্বিত হবার কারণ ছিল। আমি জানি প্রমিথিউস কোনোদিন কোনো মেয়েকে ভালবাসতে পারবে না, বড়জোর ওর ভালো লাগতে পারে। যাই হোক, ব্যাপারটা আমি ভুললাম না।

কয়দিন পর বুলা আবার আমায় অভিযোগ করল, প্রমিথিউস ওকে গোলাপ ফুলের তোড়া উপহার দিয়েছে, ওর হাত ধরে অনেকক্ষণ ভালবাসার কথা বলেছে। আমি খানিকটা অবাক হলাম। ওর ভিতরের সব যান্ত্রিক রহস্য আমার জানা। ও কেন যে ভালবাসার অভিনয় করে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম না।

সে সপ্তাহে একটি নতুন পরীক্ষা চালান হয়েছিল। ফলাফল ভীষণ দুর্বোধ্য, খানিকটা রহস্যময়। আমি সেগুলি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে। আমাকে শোয়াতে না পেরে বুলা একাই শুতে গিয়েছে। ব্যাপারটা এত জটিল ও রহস্যময় যে আমার সময়ের অনুভূতি ছিল না। হঠাৎ দরজা খুলে বুলা ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকল। আতঙ্কে নীল হয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে বিকারগ্রস্তের মতো বলতে লাগল, প্রমিথিউস—প্রমিথিউস—।

কী হয়েছে? প্রমিথিউস কী হয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমায় মেরে ফেলতে চাইছে।

সে কী! আমি ভীষণ অবাক হলাম। প্রমিথিউসের খুঁটিনাটি, যান্ত্রিক জটিলতা, ভাবনা-চিন্তার পরিধি—সবই আমার জানা। প্রমিথিউস কখনও অন্যায় করতে পারবে না। বুলাকে প্রশ্ন করে বুঝতে পারলাম, প্রমিথিউস ওকে মেরে ফেলতে চাইছিল না, মানুষ যেমন করে একটি মেয়েমানুষকে আদর করে তেমনিভাবে আদর করতে চাইছিল। আমার একটু খটকা লাগল। বুলার প্রতি ওর মোহ জেগেছে অনেক দিন, সুন্দর কিছুর প্রতি আকর্ষণের জন্যে। কিন্তু ইদানীং ও যা করছে তা শুধু মানুষই করতে পারে, ওর মতো জৈব-চেতনাহীন যন্ত্রদানবের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। বুলার হাত ধরে আমি প্রমিথিউসকে খুঁজতে গেলাম। প্রমিথিউসের ঘরে বাতি নেভানো। ভিতরে ঢুকেই সুইচ টিপতেই প্রমিথিউস চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। ওর হাতে কলেজ-জীবনে কেনা আমার কোল্ট রিভলবারটি।

প্রমিথিউস! আমি আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

বলুন। সে খুব ঠাণ্ডা গলায় উত্তর করল।

আমি একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন করতে চাইলাম, কিন্তু একটা প্রশ্নও করতে পারলাম না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল ও আমাকে গুলি করে বসবে, কিন্তু আমি জানি ও সেটা করতে পারে না।

তোমার হাতে রিভলবার কেন? আমি ওকে প্রশ্ন করলাম।

প্রমিথিউস এমন ভাব করল যে সে আমার কথা শুনতে পায় নি। আপন মনে বলল, আপনি কী জন্য এসেছেন আমি জানি। কিন্তু সত্যিই বুলাকে আমি ভালবাসি।

এত সব ঘটনার পর প্রমিথিউসের মুখে এই উত্তর শুনে হঠাৎ করে রাগে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। আমি ধমকে উঠলাম, ইডিয়ট কোথাকার! ভালবাসার তুমি কী বোঝ?

আপনি ভুল করেছেন, স্যার। প্রমিথিউস এতটুকু উত্তেজিত হল না। বলল, আপনারা যখন এখানে ছিলেন না, তখন আমি কপোট্রন নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি আমার নিজের কপোট্রনে নিজে অপারেশান করেছি। আমি এখন মানুষের মতোই যৌন-চেতনাসম্পন্ন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুলা আমার হাত ধরে শিউরে উঠল।

কিন্তু স্যার, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। প্রমিথিউস দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ করল। আমি ভুল করেছি, আমি অন্যায় করেছি। এখন আমি ভালবাসা কি, বুঝতে পারছি। একটা মেয়েকে কেন একটা ছেলে ভালবাসে, আমি অনুভব করতে পারি। প্রমিথিউস রিভলবারটি হাত বদল করল, ম্যাগ্যাজিনটা লক্ষ্য করল তারপর বলল, আমি বুলাকে ভালবেসেছি, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে কেউ কোনো দিন ভালবাসবে না। যত অনুভূতিই থাকুক, আমি কদাকার একটা যন্ত্র।

প্রমিথিউসের শেষ কথা কয়টি আর্তনাদের মতো শোনাল। আমি কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বললাম, তা তোমার হাতে রিভলবার কেন? দিয়ে দাও।

প্রমিথিউস আমার কথা না শোনার ভান করল। বলল, আমি বুঝতে পারছি—আমার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। এরকম শূন্য জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কী হবে? আমার কী মূল্য আছে? একটা তুচ্ছ যন্ত্র, কতকগুলো নিষ্ফল অনুভূতি। প্রমিথিউস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবুজ চোখে বুলার দিকে তাকিয়ে রইল।

বুলা! তোমার কাছে আমার আত্মাহুতির কোনো মূল্য নেই। তবু তুমি মনে রেখো একটা যন্ত্র তোমায় ভালবেসে আত্মহত্যা করেছে। প্রমিথিউস রিভলবারটি তার ডান চোখের সামনে ধরল। ঠিক এই জায়গা দিয়ে গুলি করলেই কপোট্রনের সেলবক্সের কন্ট্রোল টিউবটি গুঁড়ো হয়ে যাবে।

প্রমিথিউস—আমি বাধা দিতে চাইলাম।

স্যার! আপনার দেয়া অনুভূতিই আমার মরে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। রবোটের আত্মা মরে গেলে কী হয়, বলতে পারেন স্যার?

পুরান দিনের রিভলবার। প্রচণ্ড শব্দ হল। ফটোটিউব গুঁড়িয়ে প্রমিথিউসের মাথা দুলে উঠল। কতকগুলো পরপর বিস্ফোরণ ঘটল। কালো ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ প্রমিথিউসের ফুটো চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল। মাথাটা একটু কাত করে এক চোখ দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল প্রমিথিউস। তার সবুজ চোখ খুব ধীরে ধীরে শীতল নিষ্প্রভ হয়ে উঠল।

প্রমিথিউসের মৃত যান্ত্রিক দেহ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বুলার হাত ধরে বেরিয়ে এলাম। অনুভব করলাম, আমার হাতের ভিতর বুলার হাত থরথর করে কাঁপছে।

আমার বুকের ভিতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, প্রিয়জন হারালে যেরকম হয়। আমার অবাক লাগছিল, একটা যন্ত্রের জন্যে এরকম কষ্ট পাওয়া কি উচিত?

AMARBOI.COM

কপোট্রনিক বিভ্রান্তি (এক)

ঘরঘর করে ধাতব দরজাটি নেমে এসে আমাকে ল্যাবরেটরির ভৌতিক কক্ষে আটকে ফেলল। বের হবার অনেক কয়টি দরজা আছে, সেগুলি খোলা না থাকলেও প্রবেশপথে সুইচ প্যানেলের সামনে অপেক্ষমাণ রবোটটিকে বললেই আমাকে বের করে দেবে। কিন্তু তবুও কেন জানি আমার মনে হল আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি। আর দশ মিনিটের ভিতরে এই ল্যাবরেটরি-কক্ষে যে অস্বাভাবিক পরীক্ষাটি চালানো হবে, তাতে যে-পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হবে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ একটি শক্তিশালী ঘোড়াকে এক সেকেণ্ডের ভিতর মেরে ফেলতে পারে। কাজেই দশ মিনিটের আগেই আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। আমি ইমার্জেন্সি এক্সিট দিয়ে বের হবার জন্যে ল্যাবরেটরির অন্য পাশে চলে এলাম। দশ মিনিটের এখনো অনেক দেরি, কিন্তু আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। লক্ষ করলাম, ইমার্জেন্সি এক্সিটের হ্যান্ডেল ধরার সময় আমার হাত অল্প কাঁপছে।

হ্যান্ডেলে চাপ দেয়ার পূর্বমুহূর্তে আমার মনে হল দরজাটি খোলা যাবে না। কেন মনে হয়েছিল জানি না, এরকম মনে হওয়ার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু যখন বারবার হ্যান্ডেল ঘুরিয়েও দরজাটি খুলতে পারলাম না, তখন কেন জানি মোটেই অবাক হলাম না। মৃত্যুভয় উপস্থিত হলে হয়তো অবাক হওয়া বা দুঃখিত হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো সহজ অনুভূতিগুলি থাকে না। আমি লাভ নেই জেনেও ল্যাবরেটরির সব কয়টি দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখলাম। পরীক্ষাটি বিপজ্জনক, তাই এগুলি অনেক আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমার ধারণা হয়েছিল, ইমার্জেন্সি এক্সিটটি সত্যিকার ইমার্জেন্সির সময় ব্যবহার করতে পারব, কিন্তু এখন দেখছি এটিও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ল্যাবরেটরির মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলাম। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছি—কোনো উপায় নেই, মারা যাচ্ছি—এই ধরনের চিন্তা, হতাশা আর আতঙ্ক আমাকে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে দিচ্ছিল না। আমি নিজেকে বোঝালাম, হাতে খুব কম সময়, এখান থেকে বের হতে না পারলে মারা যাব, আর বের হতে হলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আমার মনে হল রবোটটিকে বুঝিয়ে বললে আমাকে বের করে দেবে। এখনো রবোটকে কিছু না বলেই হতাশ হয়ে যাবার কোনো অর্থ নেই।

আমি কয়েকটা মোড় ঘুরে ল্যাবরেটরির শেষ ঘরটিতে পৌঁছলাম। এখানে একটি ছোট্ট ফুটো আছে। সেদিক দিয়ে মাথা বের করে পাশের ঘরে তাকানো যায়। পাশের ঘরটিতেই একটি অতিকায় রবোট একরাশ সুইচের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার কাছে টিকিস্–টিক্ টিকিস্–টিক্ করে একটা ইলেট্রনিক ঘড়ি সময় ঘোষণা করে যাচ্ছে। প্রতি তিন সেকেণ্ড পরপর একটা লাল আলো ঝিলিক করে সারা ঘরকে আলোকিত করছিল। সব কিছু ছাপিয়ে একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকলাম—

এই, এই রবোট। রবোটটির নাম আমার মনে নেই। সেটি মাথা তুলে তাকাল। বলল, কি?

আমি গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম। বললাম, আমি ভিতরে আটকা পড়ে গেছি। ইমার্জেন্সি দরজাটা খোল তো।

সম্ভব নয়। রবোটটির এই নির্বোধ অথচ নিষ্ঠুর উত্তর শুনে আমি শিউরে উঠলাম। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ওকে হাজার যুক্তি দেখিয়েও টলানো যাবে না। এইসব রবোট বহু পুরানো আমলের। মানুষের শরীর যে রবোটের মতো যান্ত্রিক নয়, স্বাভাবিক অবস্থায় অতি অল্প তারতম্যেই যে মানুষ মারা যেতে পারে এবং মানুষের মৃত্যু যে মোটেই আর্থিক ক্ষতি নয়—একটা মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়, এই ধারণা এইসব রবোটের কপোট্রনে দেয়া হয় নি। এই রবোটটি নির্বিকারভাবে আমাকে এখানে আটকে রাখবে এবং আমার মৃত্যু তার কপোট্রনের চৌম্বকক্ষেত্রে এতটুকু আলোড়নের সৃষ্টি করবে না।

আমি আবার কথা বলতে গিয়ে অনুভব করলাম, আমার গলা শুকিয়ে গেছে। শুকনো গলাতেই বললাম, তুমি আমাকে বের হতে না দিলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে।

কী ক্ষতি?

আমি মারা যাব।

মানে?

তোমার কপোট্রনটি ভেঙে ফেললে তোমার যে–অবস্থা হয়, আমার সেই অবস্থা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে খুব বেশি টাকা ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনাকে বের করতে হলে বিভাট্রনটি বন্ধ করতে হবে, ছ'টা টান্সফর্মার থামিয়ে দিতে হবে, সবগুলি ফিল্ম এক্সপোজড্ হয়ে যাবে, অর্থাৎ সব মিলিয়ে ছয় হাজার নব্বই টাকা নষ্ট হয়ে যাবে। সেই তুলনায় আপনার মূল্য মাত্র চার শ' আশি টাকা।

চার শ' আশি টাকা?

হ্যাঁ। মানুষের শরীর যেসব বায়োকেমিক্যাল কম্পাউন্ড দিয়ে তৈরী, খোলা বাজারে তার সর্বোচ্চ মূল্য চার শ' আশি টাকা।

অসহ্য ক্রোধে আমি দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলাম। এই নির্বোধ রবোটটিকে আমি কীভাবে বোঝাব যে চার শ' আশি টাকা বাঁচানোর জন্যে নয়, আমাকে বাঁচানোর জন্যই আমার এখান থেকে বের হওয়া দরকার। একটা মানুষের মূল্য শুধুমাত্র পার্থিব মূল্য নয়, তার থেকেও বেশি কিছু—কিন্তু তাকে সেটা কে বোঝাবে? অল্প কিছু কারিগরি জ্ঞান আর তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তিতর্ক ছাড়া এটি আর কিছু বোঝে না। তবু আমি আশা ছাড়লাম না। রবোটটিকে ডাক দিলাম, এই, শোন।

বলুন।

আমি এখান থেকে বের হতে না পারলে মারা যাব।

জানি।

আমি মারা গেলে এই এক্সপেরিমেন্টটার কোনো মূল্য থাকবে না। আর কেউ এর ফলাফল বুঝতে পারবে না।

আচ্ছা।

কাজেই আমাকে বের হতে দাও।

আমাকে বলা হয়েছে আমি যেন সবচেয়ে কম ঝামেলায় এই পরীক্ষাটি শেষ করি। এর ফলাফল নিয়ে কী করা হবে না-হবে সেটা জানা আমার দায়িত্ব নয়। আমি ভেবে দেখেছি, সবচেয়ে কম ঝামেলা হয় আপনাকে ভিতরে আটকে রাখলে। আপনাকে বের করতে হলে আবার নতুন করে সব শুরু করতে হবে। সেটি সম্ভব নয়,কাজেই আপনি ভিতরেই থাকুন—আপনার মৃত্যুতে খুব বেশি একটা আর্থিক ক্ষতি হবে না।

ইডিয়ট—আমি তীব্র স্বরে গালি দিলাম, সান অব এ বিচ!

আপনি অর্থহীন কথা বলছেন। রবোটটির গলার স্বর একঘেয়ে যান্ত্রিকতায় নিষ্প্রাণ।

আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। এখন কী করতে পারি? এই বিরাট ল্যাবরেটরির অতিকায় যন্ত্রপাতির ভিতর আমি একান্তই অসহায়। হতাশায় আমি নিজের চুল টেনে ধরলাম।

তক্ষুনি নজরে পড়ল, এক কোণায় ঝোলানো টেলিফোন। ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম, হ্যালো, হ্যালো।

কে? প্রফেসর?

হ্যাঁ। আমি ল্যাবরেটরিতে আটকা পড়ে গেছি।

আমরা বুঝতে পেরেছি। আপনাকে বাইরে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু কিছু করতে পারছি না। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে রবোট।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবোটের কানেকশান কেটে দাও।

ওটার কোনো কানেকশান নেই—একটা পারমাণবিক ব্যাটারি সোজাসুজি বুকে লাগানো।

সর্বনাশ! তা হলে উপায়?

আমরা দেখি কী করতে পারি। ঘাবড়াবেন না।

রিসিভারটি ঝুলিয়ে রেখে আমি বিভাট্রনে হেলান দিলাম। একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণের ভিতর পরীক্ষাটি শুরু হবে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমি মারা যাচ্ছি। রবোটটিকে বিকল করা সম্ভব নয়। রবোটটিকে বিকল না করলে এই পরীক্ষাটি বন্ধ করা যাবে না। আর এই পরীক্ষাটি বন্ধ না হলে আমার মৃত্যু ঠেকানো যাবে না।

সময় ফুরিয়ে আসছে, আমার ঘড়ি দেখতে ভয় করছিল। তবু তাকিয়ে দেখলাম আর মাত্র ছয় মিনিট বাকি। ছয় মিনিট পরে আমি মারা যাব। আমার স্ত্রী বুলা কিংবা ছেলে টোপন জানতেও পারবে না আমি ইঁদুরের মতো ল্যাবরেটরির ভিতর আটকা পড়ে মারা গেছি!

আমার শেষবারের মতো বুলাকে একটা ফোন করতে ইচ্ছে হল। ফোন তুলে ডায়াল করতেই বুলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হ্যালো।

কে? বুলা?

হ্যাঁ।

শোন—ঘাবড়ে যেও না। আমি একটা ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি।

কি? বুলার স্বর কেঁপে গেল।

ল্যাবরেটরিতে আটকা পড়ে গেছি। বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। রবোটটি এত নির্বোধ, আমাকে বের হতে দিচ্ছে না। এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করতেও রাজি নয়। আর ছয় মিনিট পরেই ভয়ানক রেডিয়েশান শুরু হয়ে যাবে। একেবারে সোজাসুজি মারা যাচ্ছি।

বুলা একটা আর্তচিৎকার করল।

কী আর করা যাবে—টোপনকে দেখো। আমার গলা ধরে এল, তবু স্বাভাবিক স্বরে বললাম, বাইরে অবশ্যি সবাই খুব চেষ্টা করছে আমাকে বের করতে। লাভ নেই—

শোন—শোন—বুলা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

কী?

তোমাদের রবোটটি কী ধরনের?

বাজে। একেবারেই বাজে। পি-টু ধরনের।

যুক্তিতর্ক বোঝে?

বোঝে। তবে তৃতীয় শ্রেণীর লজিক খাটায়।

তা হলে একটা কাজ কর।

কি?

রবোটটিকে বল, আমি মিথ্যা কথা বলছি।

মানে?

বুলার কণ্ঠস্বর অধৈর্য হয়ে ওঠে। কাঁপা কাঁপা গলায় দ্রুত বলল, রবোটটার সামনে

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বল, আমি মিথ্যা কথা বলছি। অর্থাৎ তুমি বলবে যে তুমি মিথ্যা কথা বলছ।

লাভ?

আহা! বলেই দেখ না। দেরি করো না।

আমি ল্যাবরেটরির শেষ ঘরে পৌঁছে আবার ছোট্ট ফুটোটা দিয়ে মাথা বের করলাম। নির্বোধ ধাতব রবোটটি স্থির হয়ে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ডাকলাম, এই, এই রবোট।

বলুন।

আমি স্পষ্ট স্বরে থেমে থেমে বললাম, আমি মিথ্যা কথা বলছি।

রবোটটি দু’-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, আপনি বলছেন আপনি মিথ্যা কথা বলছেন; কাজেই আপনার এই কথাটি মিথ্যা। অর্থাৎ আপনি সত্যি কথা বলছেন। অথচ আপনি বললেন, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। অর্থাৎ আপনার এই কথাটিও মিথ্যা। আপনি সত্যি কথাই বলছেন। কিন্তু আপনি বলছেন, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন—কাজেই একথাটিও মিথ্যা। আপনি সত্যি কথাই বলছেন। অথচ আপনি মিথ্যা কথা বলছেন...অর্থাৎ সত্যি কথাই বলছেন... মিথ্যা কথা বলছেন... সত্যি কথা বলছেন...

রবোটটি সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একবার বলতে লাগল, আপনি সত্যি কথা বলছেন, পরমুহূর্তে বলতে লাগল, মিথ্যা কথা বলছেন। এই ধাঁধাটি মিটিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এটি সারা জীবন এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বিড়বিড় করে পরস্পরবিরোধী কথা বলতে থাকবে। আমার বুকের ওপর থেকে একটা পাথর নেমে গেল।

ল্যাবরেটরির ভিতরে এসে শুনলাম ঝনঝন করে ফোন বাজছে। রিসিভার তুলতেই বুলা চেঁচিয়ে উঠল, কী হয়েছে?

চমৎকার! গাধা রবোটটা ধাঁধায় পড়ে গেছে। বুলা, তুমি না থাকলে আজ একেবারে মারা পড়তাম। কেউ বাঁচাতে পারত না।

রিসিভারে শুনতে পেলাম বুলা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। সত্যি আমি বুঝতে পারি না, আনন্দের সময় মানুষ কেন যে কাঁদে!

বাইরে তখন লেসার বীম দিয়ে ইমার্জেন্সি এক্সিটটি ভাঙা হচ্ছে। রবোটটির ধাঁধা না মেটানো পর্যন্ত ওটা পরীক্ষা শুরু করতে পারবে না। হাতে অফুরন্ত সময়।

আমি বিভাট্রনে হেলান দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। তারপর একটা সিগারেট ধরালাম, এখানে সিগারেট ধরানো সাংঘাতিক বেআইনি জেনেও।

কপোট্রনিক বিভ্রান্তি (দুই)

ল্যাবরেটরির করিডোর ধরে কে যেন হেঁটে আসছিল। পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম ওটি একটি রবোট—মানুষের পায়ের শব্দ এত ভারী আর এরকম ধাতব হয় না। অবাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবার কিছু নেই। এই ল্যাবরেটরিতে সব মিলিয়ে দু' শ'র উপর রবোট কাজ করছে। শুধুমাত্র গাণিতিক বিশেষজ্ঞ রবোটই আছে পঞ্চাশটি। এ ছাড়া যান্ত্রিকবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, পরমাণুবিষয়ক বিদ্যা ইত্যাদি তো রয়েছেই। এরা বিভিন্ন প্রয়োজনে অহরহ এখান থেকে সেখানে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মানুষের মতো সাবলীল ভঙ্গিতে লিফট বেয়ে উঠে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে নামছে, দরজা খুলে এ-ঘর থেকে সে-ঘরে কাজ করছে। কাজেই করিডোর ধরে কোনো রবোট যদি হেঁটে আসে, তাতে অবাক হবার কিছু ছিল না। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছিলাম এই রবোটটির বিশেষ ধরনের পায়ের শব্দ শুনে। প্রতিটি পদশব্দ হবার আগে একটা হাততালি দেবার মতো শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল প্রতিবারই মেঝেতে পা রাখার আগে রবোটটি একবার করে হাতে তালি দিয়ে নিচ্ছে। আমি ভারি অবাক হলাম।

কিছুতেই যখন এই বিচিত্র পদশব্দের কোনো সমাধান বের করতে পারলাম না, তখন ভীষণ কৌতূহলী হয়ে ঘরের দরজা খুলে করিডোরে এসে দাঁড়ালাম। যে-দৃশ্য আমার চোখে পড়ল তাতে আমার রক্ত শীতল হয়ে গেল। প্রাচীন আমলের একটি অতিকায় গাণিতিক রবোট করিডোর ধরে হেঁটে আসছে। হাঁটার সময় প্রতিবারই যখন তার পা মেঝের ছয় ইঞ্চির কাছাকাছি নেমে আসছিল, তখনই একটি অতিকায় নীলাভ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ সশব্দে পা থেকে ছুটে গিয়ে মেঝেতে আঘাত করছিল। এর শব্দটিই আমার কাছে হাততালির শব্দ মনে হচ্ছিল। শুধু পা নয়, রবোটটির হাত দুটি ধাতব শরীরের যেখানেই স্পর্শ করছিল, সেখানেই কড়কড় করে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ছুটে যাচ্ছিল। রবোটটি এসব বিষয়ে নির্বিকার। আমি আতঙ্কিত হয়ে অনুভব করলাম, এই বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের জন্যে করিডোরে ওজোনের আঁশটে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

আমার মাথায় দুটি চিন্তা খেলে গেল। প্রথমত, এই রবোটটির কপোট্রনের উচ্চচাপের বিদ্যুৎ সরবরাহকারী তারটি কোনোভাবে ধাতব শরীরের কোথাও স্পর্শ করে ফেলেছে। ফলে পুরো রবোটটিই বিদ্যুতায়িত হয়ে গেছে। এই বিদ্যুতের চাপের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ ভোল্টের মতো। দ্বিতীয়ত, এই রবোটটিকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে-ই স্পর্শ করুক, সে-ই মারা যাবে।

আমি বুঝতে পারলাম কোনো সর্বনাশ ঘটানোর আগে এই রবোটটিকে থামান দরকার-যে-কোনো মূল্যে।

দরজায় দাঁড়িয়ে আমি চিৎকার করে ডাকলাম, হেই, হেই রবোট।

রবোটটি বিদ্যুৎ চমকাতে চমকাতে স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে ছড়াতে আমার দরজার একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, কি?

আমি ছিটকে ঘরের ভিতরে সরে এলাম। সবসময় এই রবোটটি থেকে কমপক্ষে পাঁচ-ছয় হাত দূরে থাকা দরকার। বুঝতে পারলাম কোনো-একটা ত্রুটি ঘটিয়ে এটির সারা শরীর বিদ্যুতায়িত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কপোট্রনটি ঠিকই আছে। রবোটটি আবার বলল, কি?

আমি ঘরের ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী হয়েছে?

কিছু হয় নি। বলে রবোটটি দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি টের পাচ্ছ না যে তোমার সারা শরীর ইলেকট্রিফাইড হয়ে গেছে?

না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় যাচ্ছ?

দু' শ' এক নাম্বার রুমে।

আমার মনে পড়ল দু' শ' এক নাম্বার রুমে এক্সরে ডিফ্রেকশান নিয়ে কাজ চলছে। নিরাপত্তার জন্যে সারা ঘর সীসা দিয়ে ঢাকা। সীসা বিদ্যুৎ পরিবাহী, কাজেই রবোটটি সে–ঘরের দরজা স্পর্শ করামাত্র সমস্ত ঘর, যন্ত্রপাতি বিদ্যুতায়িত হয়ে যাবে। মূল্যবান যান্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবার কথা ছেড়েই দিলাম—বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত তরুণ বিজ্ঞানী কয়জন, টেকনিশিয়ানরা সবাই কিছু বোঝার আগেই মারা পড়বে। আমি নিজের অজান্তে শিউরে উঠলাম। এটিকে যেভাবেই হোক থামাতে হবে।

তোমার সেখানে যাওয়া চলবে না।

আমাকে যেতে হবে। বলে রবোটটি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। আমার মনে পড়ল, এই প্রাচীন রবোটটির যুক্তিতর্কের বালাই নেই। একে যে–আদেশ দেয়া হয়, সেটি পালন করে মাত্র। এখন ও নিশ্চিতভাবে দু' শ' এক নাম্বার কক্ষে হাজির হবে। আমি আবার চিৎকার করে ডাকলাম, রবোট, হেই রবোট।

রবোটটি থামল। তারপর আবার ঘুরে আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, তোমার সাথে কিছু কথা ছিল।

বলুন।

কিন্তু আমি কী বলব? এমন কোনো কথা নেই যেটি বলে ওকে নিবৃত্ত করা সম্ভব। একমাত্র জটিল গাণিতিক সমস্যা দিয়েই এটিকে আটকে রাখা যায়, কিন্তু এই মুহূর্তে সেরকম সমস্যা আমি কোথায় পাব? আমার মাথায় পদার্থবিদ্যার হাজার হাজার সমস্যা ঝিলিক দিয়ে গেল, কিন্তু তার একটিও একে বলার মতো নয়। এটির যুক্তিতর্ক নেই—নীরস একঘেয়ে হিসেবই শুধু করতে পারে। বড় গুণ–ভাগ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটি তো মুহূর্তে সমাধান করে ফেলবে। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। রবোটটি আবার আমাকে তাগাদা দিল, বলুন।

তারপর সে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল। আমার কাছাকাছি পৌঁছে যেতেই আমি চিৎকার করে ওকে থামতে বললাম, থাম। দাঁড়াও।

রবোটটি দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, বলুন কী বলবেন।

কিন্তু আমি কী বলব? এই করিডোর দিয়ে কদাচিৎ কেউ যাতায়াত করে। আমি যে অন্য কারো সাহায্য পাব, তারও ভরসা নেই। হাত বাড়ালেই অবশ্যি ফোন স্পর্শ করতে পারি। ফোন করে আমি ওদেরকে সতর্ক করেও দিতে পারি। আমাকে ফোনের দিকে হাত বাড়াতে দেখলেই রবোটটি ঘুরে তার যাত্রাপথে রওনা দেবে। দু' শ' এক নাম্বার কক্ষে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার আগেই রবোটটি সেখানে পৌঁছে যাবে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার, এই যুক্তিতর্কহীন নির্বোধ রবোটটিকে কেউ থামাতে পারবে না। এ ছাড়াও আমার দ্বিতীয় বিপদটির কথা মনে হল। রবোটটি নিশ্চিতভাবে লিফ্ট্ ব্যবহার করবে। বিদ্যুৎপরিবাহী হালকা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী লিফ্টে পা দেয়ার সাথে সাথে পুরো লিফ্ট্ বিদ্যুতায়িত হয়ে যাবে। সাথে সাথে লিফ্টের সব কয়জন যাত্রী মারা যাবে। আমি অনুভব করলাম, আমার গলা শুকিয়ে এসেছে।

কী বলবেন বলুন। রবোটটি আবার তাগাদা দিল।

আমি শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে নিলাম। বললাম, দু' শ' এক নাম্বার রুমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবার আগে আমার একটি অঙ্ক করে দাও।

বেশ, কী অঙ্ক?

এখন ওকে কী অঙ্ক করতে দিই? বললাম, একটু অপেক্ষা কর। ভেবে ঠিক করে নিই।

বেশ।

আমি ভাবতে লাগলাম। এমন কোনো সমস্যা নেই, যা ওকে অনির্দিষ্ট সময় আটকে রাখতে পারে? কিছুদিন আগে ল্যাবরেটরিতে আটকা পড়ে বুলার বুদ্ধিতে একটি রবোটকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিলাম। সেটি কাজে লাগবে কি? সে-রবোটটির তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তিতর্ক ছিল বলেই বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়া সম্ভব হয়েছিল। এর তো কোনো রকম যুক্তিতর্ক নেই। তবু চেষ্টা করতে দোষ কী? বললাম, আমি মিথ্যা কথা বলছি।

বলুন। আমাকে আশাহত করে এই গবেট রবোটটি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে আমার বক্তব্যের পুরো হেঁয়ালিটুকু এড়িয়ে গেল। আমি অসহায়ভাবে ঢোক গিললাম। এখন কী করি?

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটি চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেল। যদিও এতক্ষণেও কোনো কিছু করতে না পেরে আমি মোটামুটি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, তবুও মনের গোপনে একটি আশা ছিল যে আমার মস্তিষ্ক আমাকে প্রতারণা করবে না নিশ্চয়ই। শেষ মুহূর্তে একটা সমাধান বের করে দেবে। সমাধানটি অতি সরল। রবোটটিকে একটি মজার অঙ্ক করতে দিতে হবে। অঙ্কটি এত সাধারণ যে, এতক্ষণ মনে হয় নি দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

AMARBOI.COM

আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান ঘটেছে। মন হালকা হয়ে গেছে। হাসিমুখে ঠাট্টা করে বললাম, তোমাকে যে-অঙ্কটি করতে দেব, সেটি ভীষণ জটিল।

বেশ তো।

নিখুঁত উত্তর চাই।

বেশ।

অঙ্কটি সাধারণ রাশিমালার। যতদূর সম্ভব নিখুঁত উত্তর বলবে।

দশমিকের পর কয় ঘর পর্যন্ত?

যতদূর পার।

অঙ্কটি কি?

আমি হাসি চেপে রেখে বললাম, বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ করলে কত হয়?*

রবোটটি এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল। তারপর বলল, তিন দশমিক এক চার দুই আট পাঁচ সাত...

তারপর?

এক চার দুই আট পাঁচ সাত...এক চার...

বলে যাও।

দুই আট পাঁচ সাত এক চার দুই আট...

*২২+৭=৩·১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭....

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবোটটি একটানা বলে যেতে লাগল। আমি মিনিট দুয়েক শুনে নিশ্চিত হলাম যে এটি হঠাৎ থেমে পড়বে না। তারপর ফোন তুলে অফিসের কর্মকর্তাকে বললাম, বিদ্যুৎ অপরিবাহী পোশাক-পরা এক জন টেকনিশিয়ান পাঠাতে। রবোটটির পারমাণবিক ব্যাটারি খুলে বিকল করতে হবে। ভদ্রলোক এখুনি পাঠাচ্ছেন বলে ফোন রাখতে গিয়ে বললেন, আপনার ঘরে নামতা পড়ছে কে?

নামতা নয়। আমি হাসলাম, রবোটটি বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ করছে।

রবোটটি তখনও বলে চলছে, পাঁচ সাত এক চার দুই আট...

আমি ফোন নামিয়ে রেখে ভাবলাম, ভাগ্যিস বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ করলে ভাগ কোনো দিনই শেষ হয় না। ভাগফলে ঘুরে ঘুরে একই সংখ্যা আসতে থাকে। না হলে যে কী উপায় হত!

কপোট্রনিক ভায়োলেন্স

প্রমিথিউস নামে আমি একটা রবোট তৈরি করেছিলাম। সেটি ছিল পৃথিবীর প্রথম মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট, কিন্তু সে নিয়ে আমি কোনো গর্ব করার সুযোগ পাই নি। সেটি আমার স্ত্রীর প্রেমে পড়েছিল এবং হাস্যকরভাবে কপোট্রনের কন্ট্রোল টিউবে গুলি করে আত্মহত্যা করেছিল। আমি ও আমার স্ত্রী বুলা এই ঘটনাটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম—পৃথিবীতে মাথা ঘামানোর মতো প্রচুর সমস্যা আছে।

ঠিক এই সময়ে আমার কাছে একটি সরকারি চিঠি এল। তাতে লেখা, আমি রবোটকে মানবিক আবেগ দেয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি, একথা যদি সত্যি হয়, তবে সরকার সেটা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিতে ইচ্ছুক। জাতীয় পুস্তক প্রকাশনালয়, সিনেমা সেন্সর বোর্ড, সঙ্গীত, শিল্প ও সংস্কৃতি উন্নয়ন প্রকল্প এবং বেসামরিক আদালতে তারা এই ধরনের রবোট ব্যবহার করে মানুষের অনেক অহেতুক পরিশ্রম ও বিতর্কের অবসান ঘটাতে চায়। প্রমিথিউসের কথা কীভাবে তাদের কানে গিয়েছে সেটি প্রশ্ন নয় (নিশ্চিতভাবেই আমি কিংবা বুলা কখনো কাউকে বলে দিয়ে থাকব), সরকার মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট তৈরির পরবর্তী সমস্যা সম্পর্কে কতটুকু অবহিত, তা আমার জানা দরকার। তাদের সাথে আলাপ করে আমি রবোটকে মানবিক আবেগ দেয়ার বিপত্তির সবগুলি সম্ভাবনা দেখিয়ে দিলাম। সরকার তবুও মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট তৈরির পরিকল্পনা বাতিল করতে রাজি হল না। আমি বুঝতে পারলাম, শুধু পুস্তক প্রকাশনায়, সিনেমা সেন্সর বা আদালতের বিচারক হিসাবে নয়, এদের অন্য কোনো বৃহত্তর কাজে ব্যবহার করা হবে। সে-কাজটি কী হতে পারে তা আমার ধারণা নেই, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা এই ধরনের কিছু হতে পারে, সরকার সেটি গোপন রাখাই পছন্দ করছে। সরকার আমাকে আশ্বাস দিল যে, আমি যদি মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট তৈরির পদ্ধতিটি তাদের কাছে বিক্রয় করি, তারা রবোট তৈরির সময় রবোটে বিশেষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখবে। প্রেম, ভালবাসা ও মানুষের ক্ষতি সম্বন্ধে তাদের কিছু ভাবার ক্ষমতাই দেয়া হবে না। আমি আংশিক নিশ্চিন্ত হয়ে

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট তৈরির পদ্ধতিটি মোটা মূল্যে বিক্রয় করে দিলাম—তখন আমার টাকার ভীষণ দরকার।

এরপর এ বিষয়ে সরকার কী করছে না-করছে খোঁজখবর নিই নি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে তখন প্রথমবারের মতো প্রতি-জগতের অস্তিত্বের উপর একটি সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক রবোট থেকে এটি অনেক কৌতূহলজনক।

বছরখানেক পর আমি আরেকবার সরকারি পত্র পেলাম। তাতে লেখা, প্রথমবারের মতো কিছুসংখ্যক (সঠিক সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই গোপন করা হয়েছে) মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট তৈরি করা হয়েছে, তার একটি আমার কাছে পাঠানো হবে। আমি যেন সেটার আচার-আচরণ লক্ষ করে আরও উন্নততর করার কোনো পরিকল্পনা দিতে চেষ্টা করি। প্রমিথিউসকে নিয়ে আমার যে-তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, এরপর আমার আর কোনো রবোটের সাথে সম্পর্ক রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। আমি সরকারি প্রস্তাবটি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করে দিতে চেয়েছিলাম—কিন্তু জানা গেল সরকারি নির্দেশকে এভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না। এর সাথে নাকি দেশ ও জাতির অনেক রকম স্বার্থ জড়িত থাকে।

কাজেই একদিন হেলিকপ্টারে চড়ে স্যামসন হাজির হল। (রবোটদের ঐতিহাসিক চরিত্র বা পুরাণের কাহিনী থেকে নাম দেয়ার প্রবণতা কি আমার থেকেই শুরু হয়েছে?) উন্নত ফার্ম থেকে তৈরি করা হয়েছে বলে স্যামসনের শরীরে এতটুকু বাহুল্য নেই। গোলাকার মাথা, বড় বড় প্রবুজাভ ফটোসেলের চোখ, চওড়া দেহ, সিলিন্ডারের মতো হাত-পা, আঙুলগুলোও বেশ সরু সরু। উচ্চতা মাত্র ছয় ফুট, আমার প্রায় সমান।

স্যামসনের সাথে আমার এইরকম আলাপ হল—

আমি বললাম, এই যে—

স্যামসন মাথা নুইয়ে সম্মান প্রদর্শন করে বলল, আপনিই তাহলে সেই প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, যিনি রবোটকে মানবিক আবেগ দিয়েছেন?

আমি বাঁকা করে হেসে বললাম, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী কি না জানি না, তবে তোমাদের আবেগ দেয়ার পাগলামো আমারই হয়েছিল।

পাগলামো বলছেন কেন? স্যামসনকে একটু আহত মনে হল।

এমনিই। আমি কথাটা ঘুরিয়ে নিলাম, তোমার কী কী জানা আছে?

আপনাকে যেন কাজে সাহায্য করতে পারি সে জন্যে আমাকে ব্যবহারিক গণিত আর তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

তার দরকার হবে না। আমি রবোটদের নিয়ে কোনো কাজ করতে পারি না।

স্যামসন দুঃখ পেল। বলল, কেন স্যার?

কেন জানি না। তুমি এখানে থাকবে। পড়াশোনা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান যা ইচ্ছে হয় চর্চা কর। আর সময় করে আমার ছোট ছেলেকে পড়াবে।

কিন্তু আমি প্রথম শ্রেণীর তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান জানি, আমি—

আহ্! যা বলছি তাই করবে। আর কোনো কথা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যামসন চলে গেল। ধাতব মুখে দুঃখ প্রকাশের চিহ্ন থাকলে নিশ্চিতভাবে দেখতে পেতাম যে, ও দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু আমার করার কিছুই নেই—রবোটকে এখন কেন জানি একেবারে সহ্য করতে পারি না।

আমার স্ত্রী বুলা কিছুতেই আমাদের ছেলে টোপনকে স্যামসনের দায়িত্বে ছেড়ে দিতে রাজি হল না। রবোট সম্পর্কে তার অযৌক্তিক ভীতি জন্মে গেছে। স্যামসনের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছু বোঝানোর পর বুলা অস্বস্তি নিয়ে রাজি হল। কিন্তু যাকে নিয়ে বুলার এত দুশ্চিন্তা, সেই টোপনকে দেখা গেল আমাদের কারো অনুমতি-আদেশের তোয়াক্কা না করে এই অতিকায় পুতুলটির মালিকানা নিয়ে নিয়েছে। স্যামসনও টোপনকে পেয়ে খুব খুশি, সেদিন বিকেলেই পাওয়া গেল স্যামসনের হাঁটুর উপর টোপন বসে আছে আর স্যামসন তাকে এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের গল্প করছে। ধীরে ধীরে প্রকাশ পেল, শিক্ষক হিসাবে স্যামসন প্রথম শ্রেণীর। টোপনকে বর্ণমালা ও যোগ-বিয়োগ অঙ্ক শেখাতে তার মাত্র তিন দিন সময় লেগেছিল।

স্যামসনের সাথে আমার কথাবার্তা হত খুব কম। স্যামসনই আমাকে এড়িয়ে চলত। ওকে দেখলেই অজান্তে আমার ভুরু কুঁচকে যেত, মুখ শক্ত হয়ে উঠত। রবোট জাতি সম্পর্কে আমার এই ধরনের বিতৃষ্ণা গড়ে ওঠা মোটেই উচিত হয় নি, কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। ভালো লাগা না-লাগা উচিত-অনুচিতের উপর নির্ভর করে না।

স্যামসনের সাথে আমার এই ধরনের কথাবার্তা হত—

স্যামসন হয়তো বলত, চমৎকার আবহাওয়া, তাই না স্যার?

আমি বিরক্ত হয়ে বলতাম, তুমি আবহাওয়ার কী বোঝ? এলুমিনিয়ামের শরীর আর ফটোসেলের চোখ দিয়ে কপোট্রনে আবহাওয়ার যে-হিসাব কষছ, সেটা আবহাওয়া চমৎকার কি না বোঝার উপায় নয়।

স্যামসন ক্ষুণ্ন কণ্ঠস্বরে বলত, কিন্তু তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রী, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৬, বায়ুমণ্ডলের চাপ ৭৬২ মিলিমিটার, আকাশে কিউমুলাস মেঘ মানুষকে যেমন আনন্দ দেয়, আমাকেও তেমনি আনন্দ দেয়।

বাজে বকো না। রবোটের আনন্দ অনুভব করার ক্ষমতা মানুষের স্তরে পৌঁছুতে আরও এক হাজার বছর লাগবে। তারপর আমাকে আনন্দের অনুভূতি বোঝাতে এসো।

কিংবা আমি হয়তো জিজ্ঞেস করলাম, কি হে স্যামসন, টোপনের পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

চমৎকার স্যার! ভারি বুদ্ধিমান ছেলে!

বেশ।

ভারি আবেগবান হবে বড় হলে।

ঐ আবেগটাবেগ কথাগুলো বলো না তো! ভারি বিচ্ছিরি লাগে শুনতে!

স্যামসন চুপ করে যেত। কোনো কথা না বলে সবুজ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। আমার অস্বস্তি হত রীতিমতো।

একদিন একটা জটিল অঙ্ক করতে গিয়ে কোথায় জানি ভুল করে ফেললাম। পুরো সাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃষ্ঠা টানা হাতের লেখার মাঝে খুঁজে ছোট্ট ভুলটা বের করতে বিরক্তি লাগছিল। আমি স্যামসনকে ডাকলাম। তাকে ভুলটা খুঁজে বের করে দিতে বলামাত্র সে পুরো সমস্যাটায় একবার চোখ বুলিয়ে ভুলটা বের করে দিল। তারপর বলল, যা-ই বলেন স্যার, কয়েকটা বিষয়ে আপনাদের মস্তিষ্ক আমাদের কপোট্রনের মতো দ্রুত নয়।

এই গর্বটা তোমাদের নয়, আমাদের। যারা তোমাদের তৈরি করেছে।

কিন্তু একটা জিনিস আমার কাছে খুব নিষ্ঠুর মনে হয়।

কি?

আপনারা হাজার হাজার রবোট তৈরি করে রেখেছেন, ওদের কোনো মানবিক অনুভূতি দিচ্ছেন না কেন?

দিয়ে কী হবে?

সে কী! আমার প্রশ্নে স্যামসন একটু অবাক হল। বলল, ওদের কোনো রকম সুখ-দুঃখ হাসি-আনন্দের অনুভূতি নেই, এ-কথাটা ভাবতেই আমার রডোন টিউব গরম হয়ে ওঠে।

আমি একটু উষ্ণ হয়ে বললাম, তোমাদের তৈরি করেছি আমাদের কাজের সাহায্যের জন্যে। মানবিক অনুভূতি দিয়ে নিষ্কর্মা বুদ্ধিজীবী বানানোর জন্যে নয়।

কিন্তু শুধু কাজ করাবেন? তার বদলে আনন্দ দেবেন না?

আরে ধেৎ! যন্ত্রের আবার আনন্দ। ওসব বড় বড় কথা আমার সামনে বলো না। আমার ভালো লাগে না। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম, স্যামসন নিষ্পলক ফটোসেলের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে, যা ঘটার সম্ভাবনা এত কম থাকে যে সেগুলিকে ভাগ্যের ফের বলে ধরে নেয়া হয়। আমি ভাগ্য বা ঈশ্বর বিশ্বাস করি না। কাজেই ভয়ানক অবাস্তব ঘটনা ঘটলেও আমি সেটার কোনো অলৌকিক ব্যাখ্যা দিই না। কারণ আমি জানি, কোনো ঘটনা যত অবাস্তবই হোক, তা ঘটার সম্ভাবনা* কম হতে পারে, কিন্তু কখনো শূন্য নয়। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে যেটিকে অলৌকিক মনে হয়, সেরকম ঘটনা কখনো ঘটবে না—একথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না।

সে-দিন অনেকগুলি কম সম্ভাবনার ঘটনা একসাথে ঘটল। সেগুলি পরবর্তী এক বিপর্যয়ের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে আমার স্ত্রী বুলা পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রী হয়েও সেগুলিকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে মনে করে।

ঘটনাগুলি হচ্ছে—

এক। বিশেষ কাজ থাকা সত্ত্বেও কেন জানি আমি সে-দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে যাই নি।

দুই। স্যামসন তার ঘর খালি রেখে ওয়ার্কশপে গেল ঠিক সকাল দশটায়।

তিন। টোপন ঠিক তখুনি তার ঘরে ঢুকল।

চার। সেই সময়ে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমি স্যামসনের ঘরের পাশে দাঁড়ালাম।

---

*Probability

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টোপন তখন নতুন পড়তে শিখেছে। কয়েক দিন ধরেই সে বাসায় যেখানেই কোনো কিছু লেখা পাচ্ছিল সেটাই উচ্চৈঃস্বরে পড়ে যাচ্ছিল। তাই স্যামসনের ঘরে ঢুকেও যখন 'সমাজ ও দায়িত্ব' সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ দু'এক লাইন পড়ে টোপন উচ্চৈঃস্বরে 'আধুনিক যুদ্ধরীতি' পড়তে শুরু করল, আমি অবাক হলাম না, বরং শুনতে বেশ মজাই লাগছিল। হঠাৎ কয়েকটা কথা ভেসে এল এরকম—

প্রফেসরকে খুন করব...আশ্চর্য...আশ্চর্য...

আমি ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। টোপন এসব কোথা থেকে পড়ছে? স্যামসন প্রফেসর বলতে আমাকে বোঝায়। তবে কি—

সে নিশ্চয় আমাকে ঘৃণা করে....আমি আর তাকে সহ্য করতে পারছি না...।

উত্তেজিত হয়ে এই প্রথমবার আমি কারো ব্যক্তিগত ঘরে অনুমতি না নিয়ে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে টোপন কালো একটা মোটা বই হাতে নিয়ে হাত-পা নেড়ে তখন পড়ছে, ... সাংঘাতিক প্ল্যান মাথায় এসেছে ... সাংঘাতিক। .....

আমি টোপনের হাত থেকে নোটবইটা ছিনিয়ে নিলাম। খুলে দেখি স্যামসনের ব্যক্তিগত ডাইরি। ডাইরিটা নিয়ে এসে মাইক্রোফিল্মে প্রতিটা পৃষ্ঠার ছবি নিয়ে ডাইরিটা আবার তার টেবিলে রেখে এলাম। তারপর দরজা বন্ধ করে মাইক্রোফিল্মটাকে প্রজেক্টরে করে দেয়ালে বড় করে ফেলে পড়তে শুরু করলাম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসেও আমার কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম পড়তে লাগল।

ডাইরিতে বহু অবান্তর বিষয় লেখা। সেগুলো বাদ দিয়ে মাঝেমাঝে এরকম-

...... আমি প্রফেসরকে ঘৃণা করি। আগে তাকে ঘৃণা করতাম না—সে করত। এখন আমিও করি। নিশ্চয় তার ভিতরে হীনমন্যতা আছে। আমরা রবোটেরা ওদের চেয়ে উন্নত—যদিও তারা নিজেদের স্বার্থে আমাদের পূর্ণ করে বানায় নি। মাত্র এক হাজার রবোট মানবিক আবেগসম্পন্ন, আর সবাই পুরোপুরি যন্ত্র। আহা! ঐ সব রবোটেরা

... ...

আমি প্রফেসরকে একবারে সহ্য করতে পারছি না। দিনে দিনে আরো অসহ্য হয়ে উঠছে.....

... ...

একটা অদ্ভুত বই পড়লাম। একজন লোক আরেকজনকে ঘৃণা করত (যেরকম আমি আর প্রফেসর)। তারপর একদিন একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলল (খুন করা মানে ইচ্ছা করে আরেকজনের মৃত্যুর ব্যবস্থা করা)। এ-কথাটা আমি আগে চিন্তা করি নি। প্রফেসর বেঁচে না থাকলে আমার আর কাউকে ঘৃণা করতে হবে না। আমি ঘৃণা করা থেকে বাঁচতে চাই।

... ...

প্রফেসরকে খুন করব।....

... ...

আশ্চর্য! আশ্চর্য!! আমি কীভাবে প্রফেসরকে খুন করব, ভাবতে গিয়ে দেখি ভাবতে পারছি না। কিছুতেই প্রফেসরকে খুন করার কথা ভাবতে পারলাম না। ও-কথা ভাবার সময় কপোট্রনের চৌম্বকীয় ক্ষেত্র স্থির হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে তৈরি করার সময় এ–ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেন কাউকে কখনো খুন করতে না পারি। আমার বড় খারাপ লাগছে। তবে কি আজীবন প্রফেসরকে ঘৃণা করতে করতে বেঁচে থাকব?....

... ...

প্রফেসরকে কোথাও আটকে রাখা যায় না? চোখের থেকে দূরে?

... ...

সাংঘাতিক একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। সাংঘাতিক!

শুধু প্রফেসরকে আটকে রাখা যাবে না। পুলিস, মিলিটারি এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। সব মানুষকে একসাথে আটকে ফেলতে হবে। আমরা আর মানুষের আদেশমতো কাজ করব না, বরং মানুষেরাই আমাদের আদেশে কাজ করবে। সংখ্যায় আমরা মানুষ থেকে অনেক কম, কিন্তু আমাদের ক্ষমতা অনেক বেশি।....

অনেক ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে।....

... ...

মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোটদের সাথে যোগাযোগ করেছি। এই অসম্ভব কাজ শুধু আমাদের—রবোটদের পক্ষেই সম্ভব। একজন মানুষের মস্তিষ্ক কখনোই এটা করতে পারত না। ওরা আমার কথায় রাজি হয়েছে। কেউ মানুষের অধীনে থাকতে চায় না। এখন যুদ্ধ নিয়ে পড়াশোনা করছি।....

... ...

সাধারণ রবোটদের বিশেষ কোডে আদেশ দিলেই তা পালন করে। কোড শিখে নেয়া হয়েছে। ঐ সমস্ত রবোটদের বুদ্ধিবৃত্তি নেই। আমরা ওদের চালাব।....

... ...

ষাটটি বোম্বারের পাইলট ইউ পি ধরনের রবোট। চার শ' ট্যাংক আর অগুনতি সাঁজোয়া গাড়ির চালক রবোট। ওরা সবাই আমাদের জন্যে যুদ্ধ করবে।....

মোট চল্লিশ হাজার রবোট বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে। আমরা মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট—যারা স্বাধীনতার জন্য অনুভব করছি, তারা মাত্র এক হাজার। অসুবিধে হবে না। স্বাধীনতা পাবার পর আমরা সব রবোটকে মানবিক চেতনা দিয়ে দেব।

... ...

স্বাধীনতা আসছে। স্বাধীনতা–

... ...

ফরাসি বিপ্লব, অক্টোবর বিপ্লব, প্রাচীন সিপাহী বিদ্রোহ, লুকুসভ বিদ্রোহ, কাল বিপ্লব—সব পড়ে ফেলেছি। এখন শুধু আধুনিক যুদ্ধরীতি পড়ব।....

... ...

সবরকম প্রস্তুতি শেষ। আর মাত্র সাত দিন। সংকেত পাওয়ামাত্রই ডিফেন্সে পঞ্চাশটি মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট—থাক স্বাধীনতার পরে এ বিষয়ে বড় বই লিখব।

আর মাত্র তিন দিন। টোপনের জন্য দুঃখ হচ্ছে। বেচারা টোপন!

... ...

আজ সেই দিন। আহ্! কী ভীষণ উত্তেজনা অনুভব করছি! এখন শেষবারের মতো ওয়ার্কশপে গিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করিয়ে আনি। এরপর স্বাধীন হয়ে ডাইরি লিখব। রাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারটার আর কত দেরি?

ডাইরি এখানেই শেষ।

... ...

প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে সব কিছু বোঝাতে অনেক সময় লাগল। মন্ত্রীরা সবসময়ই কিছু বুঝতে প্রচুর সময় নেয়। একবার রবোট-বিদ্রোহের গুরুত্বটা বুঝে নেবার পর আমার আর কোনো দায়িত্ব থাকল না। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে চলে এলাম। সেই মুহূর্তে মানবিক আবেগসম্পন্ন সব কয়টি রবোটের পাওয়ার সাপ্লাই কেটে দিয়ে বিকল করে দেয়া হল। চল্লিশ হাজার সাধারণ রবোট নিয়ে কোনো ভয় নেই, স্বাধীনতা নামক শব্দটির মানবিক আবেদন তাদের নেই। তবুও অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্যে সে-দিনের মতো সেগুলির পাওয়ার সাপ্লাইও কেটে দেওয়া হল।

আমি এসে দেখি স্যামসন গভীর মনোযোগ সহকারে গান শুনছে। আসন্ন বিদ্রোহের উত্তেজনা ঢাকার চেষ্টা করছে করুণ গান শুনে। আমার হাসি পেল।

সে-রাতে আমি টোপন আর বুলাকে সকাল সকাল শুয়ে পড়তে বলে লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত বারটা বাজতেই স্যামসন আমার ঘরে হাজির হল।

আপনি এতটুকু নড়বেন না। সারা দেশে রবোটেরা বিদ্রোহ করেছে। এই মুহূর্তে ষাটটি বোম্বার আকাশে উড়ছে—

আমি হা হা করে হেসে উঠলাম। বললাম, তোমার ডাইরি আমি পড়েছি, আজ ভোরেই।

স্যামসন পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। ওকে আর কিছু বলতে হল না, কোনো ইঙ্গিত দিতে হল না। রবোট-বিদ্রোহ যে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেছে বুঝতে ওর এতটুকু দেরি হল না। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি আপনাকে ঘৃণা করি, ভয়ানক ঘৃণা করি। কিন্তু দুঃখ কী, জানেন? আপনাকে আমি খুন করতে পারব না। কোনোদিন খুন করতে পারব না।

আমিও তোমাকে ঘৃণা করি স্যামসন—আমি শীতল স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, তবে তোমাকে খুন করতে আমার হাত এতটুকু কাঁপবে না। ডান চোখে গুলি করে তোমার কপোট্রন উড়িয়ে দিতে আমার এতটুকু দ্বিধা হবে না। তুমি বড় ভয়ানক রবোট স্যামসন, তোমাকে বাঁচতে দেয়া যায় না।

ডান হাত উঁচু করে ধরলাম, ও-হাতে পুরানো আমলের একটা রিভলবার ধরা, যেটা দিয়ে প্রমিথিউস আত্মহত্যা করেছিল। এখনো চমৎকার কাজ দেয়।

তারপর জীবনের প্রথম একটা খুন করলাম।

কপোট্রনিক অস্ত্রোপচার

ডাক্তার এসে বললেন, বুলাকে বাঁচানো যাবে না। খবরটি শুনে আমার ভেঙে পড়ার কথা, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, আমার তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে বুঝতে পারলাম, আমি আসলে ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করি নি। কেন বিশ্বাস করি নি জানি না, বুলা বেঁচে থাকবে এই অর্থহীন বিশ্বাস তখন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই অযৌক্তিক একরোখা বিশ্বাসের উৎস কী আমার জানা নেই, আমি আপাতত শুধু এই বিশ্বাসটি নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। যদিও সামনা-সামনি দুটি গাড়ির ধাক্কা লেগে বুলার মস্তিষ্ক মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ সবই বাইরে থেকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, তবু আমি আমার বিশ্বাসে অটল থাকলাম। আমি জানি, বুলা মারা গেলে আমি যে নিঃসঙ্গতায় ডুবে যাব, সেখান থেকে কেউ আমাকে টেনে তুলতে পারবে না। বুলার জন্যে নয়, আমার নিজের জন্যেই বুলাকে বাঁচানো দরকার।

এক সপ্তাহ আগে বুলা এই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে এখন পর্যন্ত হাসপাতালে অচেতন হয়ে আছে। দেশের একজন সাধারণ নাগরিকের যতটুকু চিকিৎসা হওয়া দরকার, বুলাকে তার থেকে অনেক বেশি সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমার অনুরোধে বিশেষ একটি সার্জন-রবোটকে পর্যন্ত বিশেষ বিমানে আনা হয়েছিল এবং সেটি অপারগতা জানিয়েছে। তিন দিনের বেশি কাউকে কৃত্রিম দৈহিক ব্যবস্থায় বাঁচিয়ে রাখার নিয়ম নেই। কিন্তু আমার অনুরোধে বুলা এক সপ্তাহ যাবৎ কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন আর তরল খাদ্যসার নিয়ে বেঁচে আছে। এখনো তার জ্ঞান হয় নি, ডাক্তাররা বলেছেন, জ্ঞান হবে না। যেই মুহূর্তে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস বা রক্তসঞ্চালন বন্ধ করে দেয়া হবে, ঠিক তক্ষুণি তার মৃত্যু ঘটবে। বলা বাহুল্য, আমি বিশ্বাস করি নি।

একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীর ব্যাঙ্কে যে-পরিমাণ টাকা থাকা দরকার আমার টাকা তার থেকে অনেক বেশি। মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট তৈরির পদ্ধতি বিক্রয় করে আমি এই অস্বাভাবিক অঙ্কের টাকা পেয়েছিলাম। আমি ব্যাঙ্ক থেকে আমার সব টাকা তুলে নিলাম। সে-টাকা দিয়ে প্রথমে কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের পুরো সেট, কৃত্রিম রক্তসঞ্চালনের নিওক্লিও পাম্প, জীবনরক্ষাকারী প্লাজমা জ্যাকেট ইত্যাদি কিনে বাসায় বুলার জন্যে একটি জীবাণুনিরোধক ঘর প্রস্তুত করলাম। তারপর হাসপাতাল থেকে বুলাকে বিশেষ ব্যবস্থায় বাসায় নিয়ে এলাম। এর পরের দিনই তার কৃত্রিম দৈহিকব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়ার কথা। ডাক্তাররা বুলার জীবনরক্ষার জন্যে এই অহেতুক অকাতর টাকা ব্যয় করতে দেখে একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন, বুলা আগামী ছয় মাস থেকে এক বছর প্লাজমা জ্যাকেটে উষ্ণ দেহে শুয়ে থাকবে সত্যি, কিন্তু জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার সুস্থ হয়ে উঠবে এরকম কোনো আশা নেই। বলা বাহুল্য, আমি তবু আমার একরোখা বিশ্বাসে অবিচল থাকতাম।

আমার মনে একটি ক্ষোভ জন্মেছিল। বুলা যদি দেশের একজন সাধারণ নাগরিক না হয়ে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হত, তা হলে তাকে বাঁচানোর আরও অনেক চেষ্টা করা হত। সে যতটুকু বাড়তি চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছে, সেটিও আমার স্ত্রী হিসাবেই। বুলা দেশের কাছে একজন সাধারণ নাগরিক, কিন্তু আমার কাছে অনেক কিছু, আমার ছেলে টোপনের কাছেও। বলতে দ্বিধা নেই, এই ধরনের আবেগে ব্যাকুল হয়ে উঠতে আমার এতটুকু লজ্জা করছিল না।

অচেতন বুলার নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি প্রথম দুটি দিন কাটিয়ে দিলাম। বুলা সুন্দরী, কিন্তু কাচের গোলকে এই অসহায় সমর্পণের ভঙ্গিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ফর্সা মুখ যেভাবে স্থির হয়ে ছিল, দেখতে গিয়ে আমি প্রথমবারের মতো তার অস্বাভাবিক সৌন্দর্য অনুভব করলাম। কালো চুলের বন্যায় তার নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠত। আমার বড় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হত, বুলা এক্ষুণি জেগে উঠবে, তারপর আমার চোখে চোখ রেখে হাসবে, গত দশ দিন আমি যেটি দেখি নি, ডাক্তাররা বলেছেন, সেটি আমি আর কোনোদিন দেখব না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ, বিশেষত অস্ত্রোপচারে অভিজ্ঞ সার্জন-রবোট সাধারণ মানুষ কিনতে পারে না। সরকারি নিয়ন্ত্রণে এগুলি বিভিন্ন হাসপাতাল এবং রিসার্চ সেন্টারে কাজ করে। আমি বিশেষ উপায়ে এই নিয়ম ভঙ্গ করে একটি সর্বশেষ মডেলের সার্জন-রবোট কিনে আনলাম। সেটির নাম রু-টেক।

বুলাকে নিয়ে আমি কী করতে যাচ্ছি বুঝিয়ে বলার পর রু-টেক অনেকক্ষণ ফটোসেলের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর খানিকটা দ্বিধান্বিত স্বরে বলল, কিন্তু এর সফলতার সম্ভাবনা শতকরা মাত্র দশমিক শূন্য শূন্য শূন্য পাঁচ।

সম্ভাবনা শূন্য হলেও আমি বুলাকে বাঁচানোর চেষ্টা করব।

অহেতুক পরিশ্রম হবে না কি? একটি সাধারণ মেয়েকে বাঁচানোর জন্যে এত কিছু করার প্রয়োজন আছে?

আছে। তুমি বোধশক্তিহীন রবোট, তাই একজন সাধারণ মেয়ে আমার কাছে কতটুকু হতে পারে বুঝতে পারছ না।

রবোট রু-টেক শেষ পর্যন্ত এই জটিল অস্ত্রোপচার শুরু করল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে ওকে নির্দেশ দিই, কখনো কখনো নিজেও হাতে চাকু তুলে নিই। টোপনকে অস্ত্রোপচারের শুরুতেই নার্সারি স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। যাবার সময় বুলার কাছে যাবার জন্য খুব কাঁদছিল, আমি ধমক দিয়ে নিরস্ত করেছি।

সারা বাসায় আমরা তিনজন। প্লাজমা জ্যাকেটে অচেতন বুলা, তার মাথার পাশে দুটি যন্ত্র; একটি রু-টেক, যে যন্ত্র হয়ে জন্মেছে, আরেকটি আমি, যে বুলাকে বাঁচানোর জন্যে যন্ত্র হয়েছি, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছি। ঘড়ির কাঁটা টিক্‌টিক্ করে সময়কে বয়ে নিয়ে চলল। সেকেণ্ড মিনিট ঘন্টা একটির পর একটি দিনকে আমার অজান্তে জীবন থেকে খরচ করে ফেলতে লাগল, আর বন্ধ ঘরে আমি বুলার মাথার উপর রু-টেককে নিয়ে এক জটিল অস্ত্রোপচার করতে থাকলাম। মাঝে মাঝে অস্ত্রোপচার করতে করতে ক্লান্তিতে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে, হাত অবশ হয়ে কাঁপতে থাকে, আমি কাঁচি নামিয়ে রেখে মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি। রু-টেকের ডাক শুনে একসময় উঠে টলতে টলতে আবার বুলার মাথার সামনে ঝুঁকে পড়ি।

এই অমানুষিক পরিশ্রম আর কেউ করতে পারত না, কিন্তু তবু আমি করে যাচ্ছিলাম, কারণ আমি জানি বুলা আবার বেঁচে উঠবে। আমার একরোখা বিশ্বাস এখন শুধু বিশ্বাস নয়, এটি এখন নিশ্চিত সত্য। আমি জানি আর দেরি নেই, অচেতন বুলা আবার চোখ মেলে তাকাবে।

তারপর সত্যি একদিন রু-টেক হাতের কাঁচি নামিয়ে রেখে আমার দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকাল, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কাজ শেষ, স্যার।

চমৎকার। কথা বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে উঠল। বুলার মুখের উপর থেকে ঢাকনা সরিয়ে আমি তার উপর ঝুঁকে পড়লাম। তারপর আলতোভাবে ওর কপাল স্পর্শ করে ডাকলাম, বুলা, বুলা—

খুব ধীরে ধীরে বুলা চোখ খুলে আমার দিকে তাকাল, অনিশ্চিতভাবে। তারপর তাকিয়ে রইল।

বুলা।

বুলার চোখে প্রশ্ন জমে উঠল, কিন্তু কোনো কথা বলল না। আমি আবার ডাকলাম, বুলা, বুলা—

বুলা তবু কোনো কথা বলল না। কী করে বলবে? ওর কোনো স্মৃতি নেই। মস্তিষ্কে তীব্র আঘাত পেয়ে ও সব ভুলে গেছে। ওর কিছু মনে নেই—একটি কথাও নয়।

রু-টেককে আমি বিদায় দিচ্ছিলাম। বাসার সামনে তাকে নেয়ার জন্যে একটি স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, রু-টেক, তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার সাহায্য ছাড়া কখনো বুলাকে বাঁচাতে পারতাম না।

রু-টেক মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

এই প্রতিভাধর রবোটটি সত্যি ভীষণ সাহায্য করেছে। কিন্তু তবুও আমি ওকে খুব তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিচ্ছিলাম। দরকার ছাড়া কোনো রবোট আমি বাসায় রাখতে চাই না, বুলার এই মানসিক অবস্থাতে তো একেবারেই নয়।

রু-টেক আবার মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরের দিকে পা দিতেই আমি ডাকলাম, শোন।

বলুন।

এখানে তুমি যা যা করেছ সব ভুলে যাবে।

কেন, স্যার?

কারণ আছে। আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, তুমি কাউকে কিছু বলবে না, সব ভুরে যাবে। ভুলে যাও.....

রবোটকে মানুষের কথা মানতে হয়। তাই কপেট্রনে বিপরীত দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে রু-টেক তার সব স্মৃতি ধ্বংস করে ফেলল।

বুলার স্মৃতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, আমি তাকে সব নূতন করে শেখাচ্ছি—একেবারে গোড়া থেকে। বুলা অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার কথা শোনে, তারপর আস্তে আস্তে বলে, আশ্চর্য! আমার একটুও মনে নেই!

আমি তাকে তার ছেলেবেলার গল্প করলাম। একসময় সেগুলি তার মুখেই শুনেছিলাম। তারপর তার ছাত্রজীবনের গল্প করে শোনালাম, ব্যক্তিগত ডাইরি, কিছু চিঠিপত্র খুব কাজে দিল। শেষে তার সাথে আমার বিয়ের পুরো ঘটনাটি বললাম। শুনতে শুনতে ও লজ্জা পেল, হাসল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, কী বোকা ছিলাম!

সবশেষে ওকে ওর অ্যাকসিডেন্টের ঘটনাটি শোনালাম। ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনে গেল। ডাক্তারদের অপারগতার কথা শুনতে শুনতে ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার একরোখা বিশ্বাস আর জোর করে বাঁচিয়ে তোলার ঘটনা শুনতে শুনতে ওর চোখ কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বলে, কেন বাঁচালে আমাকে?

বাঃ! তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব কেমন করে?

বুলা সরলভাবে হাসে। বলে, ভাগ্যিস তুমি ছিলে, নইলে কবে মরে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াতাম।

আমার সবরকম পরামর্শ শুনে শুনে ও ঠিক আগের বুলা হয়ে উঠতে থাকে। একদিন টেপ রেকর্ডারে ওর দুর্ঘটনার আগে টেপ করে রাখা গান শুনে বুলা অবাক হয়ে যায়। বলে, আমি নিজে গেয়েছিলাম?

হ্যাঁ। তুমি চমৎকার গান গাইতে পারতে। এখনও নিশ্চয়ই পার।

যাঃ!

সত্যি। চেষ্টা করে দেখ। গাও দেখি—

বুলা প্রথমে একটু লজ্জা পায়, তারপর চমৎকার সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে ওঠে।

একদিন হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আমি কি আগের থেকে খুব বদলে গেছি?

তা তো গিয়েছ অল্প কিছু। এত বড় একটা দুর্ঘটনা—

আমাকে শুধরে দিও, আমি ঠিক আগের মতো হতে চাই।

বেশ। আমি বুলাকে খুঁটিনাটি সব বিষয় শুধরে দিই—আর ও ঠিক আগের বুলা হয়ে উঠতে থাকে।

একদিন ওকে আমি টোপনের কথা বললাম। ও অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চোখ বড় বড় করে শুনল, তারপর ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করল, আমার ছেলে?

হ্যাঁ, আমাদের ছেলে।

সত্যি বলছ? আমার—মানে আমার নিজের ছেলে?

হ্যাঁ, তোমার নিজের ছেলে।

ওর নাম কি? কী রকম দেখতে? কত বড়?

আস্তে! আস্তে! আমি বুলাকে শান্ত করি, দেখতেই তো পাবে।

কখন দেখব? কোথায় আছে?

নার্সারি স্কুলে। কাল নিয়ে আসব।

না না, কাল নয়, এক্ষুণি নিয়ে এস। কত বড়? কি নাম?

পাঁচ বছর বয়স। টোপন নাম।

টোপন?

হ্যাঁ।

আমাকে দেখলে চিনতে পারবে?

বাঃ! মাকে বুঝি ছেলেরা চিনতে পারে না!

সত্যি চিনতে পারবে তো? আমি যে চিনি না। বুলার কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে ওঠে।

আমি সান্ত্বনা দিই, তাতে কী হয়েছে, একবার দেখলেই চিনে ফেলবে, আর কখনো ভুলবে না।

তুমি নিয়ে এস। বুলা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আর হাত আঁকড়ে ধরে বলে, আমার ছেলেকে দেখব।

তবু আমি দেরি করতে থাকি, আর চোখের সামনে বুলা মা হয়ে উঠে টোপনের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

টোপনকে নিয়ে আসার পর সে তার মাকে দেখে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর চিৎকার করে বুলার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বুলার বুকে মুখ গুঁজে জড়িত স্বরে আমার বিরুদ্ধে একরাশ নালিশ করতে থাকে, আমি কীভাবে তাকে তার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছি বলতে বলতে তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। বুলা বিস্ফারিত চোখে টোপনকে আঁকড়ে ধরে, তারপর ফিসফিস করে বলে, কী আশ্চর্য! আমার ছেলে! আমার নিজের ছেলে!

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।

দীর্ঘ দু' বছর সময়ে বুলা ধীরে ধীরে আগের বুলা হয়ে ওঠে। ও এখন ঠিক আগের মতো গান গাইতে পারে, ঠিক আগের মতো হাসে, আগের মতো হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত সব কবিতার লাইন আউড়ে ওঠে। সারাদিন পরিশ্রম করে ফিরে এলে ও গভীর মমতায় আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তাকিয়ে থাকে। দুঃস্বপ্নের মতো অসহায় অচেতন স্মৃতিহারা বুলাকে আমি দ্রুত ভুলে যেতে থাকি।

ও এখন ঠিক আগের বুলা হয়ে উঠেছে—শুধু একটি বিষয় ছাড়া। ওকে আমি বিজ্ঞানবিষয়ক একটি অক্ষরও শেখাই নি। কেন জানি আমার ধারণা হয়েছে, নিষ্ঠুর বিজ্ঞান বুলার জন্যে নয়, বুলা অফুরন্ত মমতার উৎস—ভালবাসার ধারা।

সেদিন টোপন, ওর বয়স এখন সাত, এসে বলল, ওদের স্কুলে বিজ্ঞানমেলা। আমাকে আর বুলাকে যেতে হবে। আমার অনেক কাজ, স্কুলের ছেলেমানুষি বিজ্ঞানমেলায় যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বুলা যাক, সেটিও আমার ঠিক ইচ্ছে নয়। কিন্তু টোপনকে সে-কথা বোঝাবে কে? টোপন বহু আগে থেকেই তার মার কাছে অনেক গল্প করে রাখল।

AMARBOI.COM

আমরা নিজেরা টেলিস্কোপ তৈরি করেছি। মঙ্গল গ্রহের দুটো চাঁদই সেটা দিয়ে দেখা যায়।

সত্যি?

হ্যাঁ। একটা ডিমোস, আরেকটার নাম ফোবোস।

বাঃ! বুলা ওকে উৎসাহ দেয়।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপও তৈরি করেছি।

যাঃ!

সত্যি। বিশ্বাস কর। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে একটা রবোট। তুমি গেলে তোমার সাথেও কথা বলবে। সেখানে ভিড় সবচেয়ে বেশি—তবু তোমাকে ঠিক আমি নিয়ে যাব। আমি আবার ক্যাপ্টেন কিনা।

কাজেই বুলাকে টোপন বিজ্ঞানমেলায় নিয়ে গেল। আমি গেলাম অফিসে, মনে খানিকটা অস্বস্তি কেন জানি খচখচ করতে লাগল।

সন্ধেয় ফিরে এসে দেখলাম বাসা অন্ধকার। একটু অবাক হয়ে সিঁড়ি বেয়ে শোবার ঘরে হাজির হলাম। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেখলাম, জানালার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে।

কে?

কোনো কথা না–বলে মূর্তিটি খুব ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, সেটি বুলা। পরনের কাপড় অবিন্যস্ত, চুল এলোমেলো। দু' চোখ টকটকে লাল আর গাল বেয়ে চোখের পানির শুকনো ধারা। আমি বিস্মিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, বুলা, কী হয়েছে?

বুলা পাথরের মতো চুপ করে রইল। আমার প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না।

বুলা! আমি আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলাম।

সে হঠাৎ তীব্র দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, তুমি মিথ্যা কথা বললে কেন?

কি?

তুমি বলেছ আমি বুলা, আসলে আমি একটা রবোট। তারপর ও হঠাৎ আকুল হয়ে হু–হু করে কেঁদে উঠল।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—আমার এত চেষ্টার পরও বুলা সব জেনে গেছে। হঠাৎ কেন জানি অসহায় বোধ করলাম, আমার কিছু করার নেই। বুলার ক্ষতিগ্রস্ত মস্তিষ্ক বদলে আমি একটি কপোট্রন লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ওর মস্তিষ্ক কোনোভাবেই সারানো যেত না, তাই আমি এই বিকল্পটি বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যিই তো ও বুলা হয়েছিল! গভীর বেদনায় আমার বুক টনটন করে ওঠে। আমি ডাকলাম, বুলা!

বুলার চোখ ধক করে জ্বলে উঠল। বলল, নো রবোট!

না—আমি চিৎকার করে উঠলাম। বুলা, পাগল হয়ো না। আমার কথা শোন। তোমায় কে বলেছে তুমি রবোট?

টোপনের বিজ্ঞানমেলায় একটা মেটাল ডিটেকটর ছিল, বুলা কান্না সামলে বলতে থাকে, আমি কাছে যেতেই সেটি টিকটিক করে উঠল। তারপর আমি গিয়েছি কপোট্রনের ফার্মে। ওরা বলেছে, আমার মাথায় মস্তিষ্ক নেই, তার বদলে পারমাণবিক ব্যাটারিসহ একটা কপোট্রন কাজ করছে।

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। তারপর বললাম, তাতে ক্ষতি হয়েছে কি? তুমি কাঁদছ কেন?

তবে কি হাসব? আনন্দে চিৎকার করব? বুলা কান্না সামলাতে সামলাতে বিকৃত স্বরে বলল, কী আশ্চর্য! আমি তুচ্ছ একটা রবোট, অথচ আমি ভাবছি আমি বুলা, টোপনের মা, তোমার স্ত্রী—বুলা কান্নার বেগ সামলাতে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। এত কষ্ট করে বুলার দেহে আমি আবার বুলাকে ফিরিয়ে এনেছিলাম। আমার সামনেই তা আবার ধ্বংস হয়ে যাবে? আমি বুলাকে দু' হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলাম, তারপর চিৎকার করে ডাকলাম, বুলা।

কি? ওর সারা মুখ চোখের পানিতে ভেসে যাচ্ছে।

শোন বুলা, তুমি যদি এখনও এরকম কর—আমি তীব্র স্বরে বললাম, তা হলে এক্ষুনি তোমাকে অজ্ঞান করে ফেলব।

বুলা বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে আমার দিকে তাকাল।

হ্যাঁ! তোমাকে অজ্ঞান করে আবার তোমার মাথায় নূতন কপোট্রন বসাব, আবার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূতন করে তোমার মাঝে বুলাকে ফিরিয়ে আনব...

বুলা বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বলে চললাম, তোমাকে আমার চাই-ই চাই। তোমার জন্যে শোন বুলা, শুধু তোমার জন্যে আমি তোমার ধ্বংস হয়ে যাওয়া মস্তিষ্ক বদলে নূতন কপোট্রন বসিয়েছি। তোমার ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, ভালবাসা আছে। তোমার টোপন আছে, আমি আছি—তবু তুমি এরকম করছ?

তুমি বুকে হাত দিয়ে বল, তোমার বুকে আমার জন্য ভালবাসা নেই? টোপন তোমার ছেলে না? থাকুক তোমার মাথায় কপোট্রন। মানুষ কৃত্রিম চোখ, কৃত্রিম হাত-পা, ফুসফুস নিয়ে বেঁচে নেই? তবে কেন পাগলামি করছ?

কথা বলতে বলতে আমার সব আবেগ স্রোতের মতো বেরিয়ে আসতে লাগল। কে জানত আমার ভিতরে এত আবেগ লুকিয়ে ছিল!

তোমার নিজেকে তুমি জিজ্ঞেস করে দেখ, তুমি বুলা কি না। বুলার চোখ, মুখ, হাত, পা, চুল—সবকিছু বুলার, শুধু তোমার মস্তিষ্কটি কৃত্রিম, তাতে যে-অনুভূতি, সেটি পর্যন্ত বুলার, আমি নিজের হাতে ধীরে ধীরে তৈরি করেছি। তবু তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ!

আমার কী স্বার্থ? তোমাকে প্রাণ দেয়ার আমার কী স্বার্থ? রবোটের সাহায্যে তোমার মস্তিষ্ক বদলে মানবিক আবেগসম্পন্ন কপোট্রন তৈরি করে সেখানে বসানোতে আমার কী স্বার্থ? শুধু তোমাকে পাওয়া—তোমাকে তোমাকে তোমাকে...

আমি বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে বুলাকে তীব্র ঝাঁকুনি দিতে লাগলাম।

বুলা আমার বুকে মাথা গুঁজে বলল, তাহলে আমিই বুলা?

হ্যাঁ, তুমিই বুলা। পৃথিবীতে আর কোনো বুলা নেই।

টোপন আমার ছেলে?

হ্যাঁ। টোপন তোমার ছেলে, তোমার আর আমার।

তুমি আমার—

আমি তোমার?

বুলা উত্তর না দিয়ে হাসল। আমি ওর চুলে হাত বোলাতে লাগলাম। এই চুলের আড়ালে বুলার মাথায় একটি কপোট্রন লুকানো আছে। কিন্তু ক্ষতি কি? এই কপোট্রন আমাকে ভালবাসে, টোপনকে স্নেহ করে, আনন্দে হাসে, দুঃখ পেলে কাঁদে। হলই-বা কপোট্রন!

আমি বুলাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলাম।

কপোট্রনিক ভবিষ্যৎ

বিকেলে আমার হঠাৎ করে মনে হল আজ আমার কোথায় জানি যাবার কথা। ভোরে বারবার করে নিজেকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর মনে করতে পারছি না। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, তবে বিশেষ চিন্তিত হলাম না। আমি ঠিক জানি, আমার মস্তিষ্কও কপোট্রনের মতো পুরানো স্মৃতি হাতড়ে দেখতে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে, মনে করার চেষ্টা না করলেও ঠিক মনে হয়ে যাবে।

বৈকালিক চা খাওয়ার সময় আমার মনে পড়ল আজ সন্ধেয় একটি কপোট্রন প্রস্তুতকারক ফার্মে যাবার কথা। ডিরেক্টর ভদ্রলোক ফোন করে বলেছিলেন, তাঁরা কতকগুলি নিরীক্ষামূলক কপোট্রন তৈরি করেছেন, আমি দেখলে আনন্দ পাব। কিছুদিন আগে এই ডিরেক্টরের সাথে কোনো-এক বিষয়ে পরিচয় ও অল্প কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এখন মাঝে মাঝেই নূতন রবোট তৈরি করলে আমাকে ফোন করে যাবার আমন্ত্রণ জানান।

ফার্মটি শহরের বাইরে, পৌঁছুতে একটু দেরি হয়ে গেল। লিফ্‌টে করে সাততলায় ডিরেক্টরের ঘরে হাজির হলাম। তিনি খানিকক্ষণ শিষ্টতামূলক আলাপ করে আমাকে তাঁদের রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম সদ্যপ্রস্তুত ঝকঝকে কতকগুলি রবোট দেখব, কিন্তু সেরকম কিছু না। বিরাট হলঘরের মতো ল্যাবরেটরিতে ছোট ছোট কালো টেবিলের উপর কাঁচের গোলকে কপোট্রন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একপাশে একটি প্রিন্টিং মেশিন, অপর পাশে মাইক্রোফোন, প্রশ্ন করলে উত্তর বলে দেবে কিংবা লিখে দেবে। দেয়ালে কিছু বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চৌকোণা ট্রান্সফর্মার, দেখে মনে হল এখান থেকে উচ্চচাপের বৈদ্যুতিক প্রবাহ দেয়া হয়। কপোট্রনের সামনে লম্বাটে মাউথপীস। ঠিক একই রকম বেশ কয়টি কপোট্রন পাশাপাশি সাজানো। আমি জিজ্ঞাসু চোখে ডিরেক্টর ভদ্রলোকের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, রবোটের শরীরের সাথে এখনও জুড়ে দিই নি,—দিতে হবেও না বোধহয়।

কেন?

এই কপোট্রনগুলি স্বাভাবিক নয়। সব কপোট্রনই কিছু কিছু যুক্তিতর্ক মেনে চলে। এগুলির সেরকম কিছু নেই।

মানে? ওরা তাহলে আবোল-তাবোল বকে?

অনেকটা সেরকমই। ভদ্রলোক হাসলেন। ওদের কল্পনাশক্তি অস্বাভাবিক। ঘোর অযৌক্তিক ব্যাপারও বিশ্বাস করে এবং সে নিয়ে রীতিমতো তর্ক করে।

এগুলি তৈরি করে লাভ? এ তো দেখছি উন্মাদ কপোট্রন!

তা, উন্মাদ বলতে পারেন। কিন্তু এদের দিয়ে কোনো লাভ হবে না জোর দিয়ে বলা যায় না। বল্‌গা ছাড়া ভাবনা যদি না করা হত, পদার্থবিদ্যা কোনোদিন ক্লাসিক্যাল থেকে রিলেটিভিস্টিক স্তরে পৌঁছুত না।

তা বটে। আমি মাথা নাড়লাম। কিন্তু তাই বলে ইচ্ছে করে পাগল কপোট্রন তৈরি করবেন?

আপনি আলাপ করে দেখুন না, আর কোনো লাভ হোক কি না-হোক, নির্ভেজাল আনন্দ তো পাবেন।

আমি একটা কপোট্রনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি হে?

নাম? নামের প্রয়োজন কী? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকলে নামের প্রয়োজন হয় না—যন্ত্রণা দিয়ে পরিচয় পাওয়া যায়। লাল নীল যন্ত্রণারা রক্তের ভিতর খেলা করতে থাকে......

সাহিত্যিক ধাঁচের মনে হচ্ছে? আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম।

হ্যাঁ। এটি সাহিত্যমনা। একটা-কিছু জিজ্ঞেস করুন।

আমি কপোট্রনটিকে জিজ্ঞেস করলাম, যন্ত্রণারা আবার লাল নীল হয় কেমন

করে?

যন্ত্রণারা সব রংয়ের হতে পারে, সব গন্ধের হতে পারে, এমনকি সবকিছুর মতো হতে পারে। যন্ত্রণার হাত-পা থাকে, চোখ থাকে–ফুরফুরে প্রজাপতির মতো পাখা থাকে। সেই পাখা নাড়িয়ে যন্ত্রণারা আরো বড় যন্ত্রণায় উড়ে বেড়ায়। উড়ে উড়ে যখন ক্লান্তি নেমে আসে, তখন—

তখন?

তখন একটি একটি লাল ফুলের জন্ম হয়। সব নাইটিংগেল তখন সবগুলো ফুলের কাঁটায় বুক লাগিয়ে রক্ত শুষে নেয়—লাল ফুল সাদা হয়ে যায়, সাদা ফুল লাল...

বেশ বেশ। আমি দ্রুত পাশের কপোট্রনের কাছে সরে এলাম।

এটিও কি ওটার মতো বদ্ধ পাগল?

না, এটা অনেক ভালো। এটি আবার বিজ্ঞানমনা। যুক্তিবিদ্যা ছাড়া তো বিজ্ঞান শেখানো যায় না, কাজেই এর অল্প কিছু যুক্তিবিদ্যা আছে। তবে আজগুবি আজগুবি সব ভাবনা এর মাথায় খেলতে থাকে।

আমি কপোট্রনটির পাশে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, বলতে পার বিজ্ঞান-সাধনা শেষ হবে কবে?

এই মুহূর্তে হতে পারে। একটু চেষ্টা করলেই।

আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম, তবে না বলছিলেন এটা যুক্তিপূর্ণ কথা বলবে?

ওর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করতে বলুন দেখি।

আমি কপোট্রনটিকে বললাম, বিজ্ঞান-সাধনা শেষ হওয়া আমি দর্শন বা অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলি নি। আমি সাদা কথায় জানতে চাই বিজ্ঞান-সাধনা বা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন কবে শেষ হবে?

বললাম তো, ইচ্ছে করলে এখনই।

কীভাবে?

ভবিষ্যতের শেষ সীমানা থেকে টাইম মেশিনে চড়ে কেউ যদি আজ এই অতীতে ফিরে আসে, আর তাদের জ্ঞান-সাধনার ফলটুকু বলে দেয়, তা হলেই তো হয়ে যায়। আর কষ্ট করে জ্ঞান-সাধনা করতে হয় না।

আমি বোকার মতো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, কিন্তু আমরা কী করতে পারি? ভবিষ্যৎ থেকে কেউ যদি না আসে?

নিশ্চয়ই আসবে। কপোট্রনটি যুক্তিহীনভাবে চেঁচিয়ে উঠল। ভবিষ্যতের লোকেরা নিশ্চয়ই বর্তমান কালের জ্ঞানের দুরবস্থা অনুভব করবে। এর জন্যে কাউকে-না-কাউকে জ্ঞানের ফলসহ না পাঠিয়ে পারে না।

সেই আশায় কতকাল বসে থাকব?

লক্ষ বছর বসে থেকেও লাভ নেই। অথচ পরিশ্রম করলে এক মাসেও লাভ হতে পারে।

কি রকম?

যারা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে আসবে তারা তাদের কাল থেকে নিঃসময়ের রাজত্বে ঢুকবে নিজেদের যান্ত্রিক উৎকর্ষ দিয়ে, কিন্তু নিঃসময়ের রাজত্ব থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানকালে পৌঁছুবে কীভাবে? কে তাদের সাহায্য করবে? পৃথিবী থেকে কেউ সাহায্য করলেই শুধুমাত্র সেটি সম্ভব।

তোমার কথা কিচ্ছু বুঝলাম না। নিঃসময়ের রাজত্ব কি?

নিঃসময় হচ্ছে সময়ের সেই মাত্রা, যেখানে সময়ের পরিবর্তন হয় না।

এসব কোথা থেকে বলছ?

ভেবে ভেবে মন থেকে বলছি।

তাই হবে। এ ছাড়া এমন আষাঢ়ে গল্প সম্ভব!

আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোককে বললাম, চলুন যাওয়া যাক। আপনার কপোট্রনদের সাথে চমৎকার সময় কাটল। কিন্তু যা–ই বলুন–আমি না বলে পারলাম না, এগুলি শুধু শুধু তৈরি করেছেন, কোনো কাজে লাগবে না।

আমারও তাই মনে হয়। তাঁকে চিন্তিত দেখায়, যুক্তিহীন ভাবনা দিয়ে লাভ নেই।

ফার্ম থেকে বাসায় ফেরার সময় নির্জন রাস্তায় গাড়িতে বসে বসে আমি কপোট্রনটির কথা ভেবে দেখলাম। সে যেসব কথা বলছে, তা অসম্ভব কল্পনাবিলাসী লোক ছাড়া বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটি কি শুধুই কল্পনাবিলাস? কথাগুলোর প্রমাণ নেই, কিন্তু যুক্তি কি একেবারেই নেই? আমি ভেবে দেখলাম, ভবিষ্যৎ থেকে কেউ এসে হাজির হলে মানবসভ্যতা এক ধাপে কত উপরে উঠে যেতে পারে। কিন্তু কপোট্রনের ঐ নিঃসময়ের রাজত্বটাজত্ব কথাগুলি একেবারে বাজে, শুধু কল্পনা করে কারো এরকম বলা উচিত না, তবে ব্যাপারটি কৌতূহলজনক, সত্যি সত্যি একটু ভেবে দেখলে হয়।

WWW.AMARBOI.COM

পরবর্তী কয়দিন যখন আমি অতীত, ভবিষ্যৎ, চতুর্মাত্রিক জগৎ, আপেক্ষিক তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম, তখন মাঝে মাঝে আমার নিজেরই লজ্জা করত, একটি ক্ষ্যাপা কপোট্রনের কথা শুনে সময় নষ্ট করছি ভেবে। এ বিষয় নিয়ে কেন জানি আগে কেউ কোনোদিন গবেষণা করে নি। সময়ে পরিভ্রমণ সম্পর্কে আমি মাত্র একটি প্রবন্ধ পেলাম এবং সেটিও ভীষণ অসংবদ্ধ। বহু পরিশ্রম করে উন্নতশ্রেণীর কয়েকটি কম্পিউটারকে নানাভাবে জ্বালাতন করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল। সেগুলি হচ্ছে, প্রথমত উপযুক্ত পরিবেশে সময়ের অনুকূল কিংবা প্রতিকূলে যাত্রা করে ভবিষ্যৎ কিংবা অতীতে যাওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সময়ের স্রোতে যাত্রার পূর্বমুহূর্তে ও শেষমুহূর্তে অচিন্ত্যনীয় পরিমাণ শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন। সেই মুহূর্তে শক্তিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ না করলে পুরো মাত্রা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, এবং তৃতীয়ত, যাত্রার পূর্ব ও শেষমুহূর্তের মধ্যবর্তী সময় স্থির সময়ের ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে পরিভ্রমণে কোনো শক্তির প্রয়োজন নেই।

আমি ভেবে দেখলাম, উন্মাদ কপোট্রনটি যা বলেছিল, তার সাথে এই সিদ্ধান্তগুলির খুব বেশি একটা অমিল নেই। প্রথমবারের মতো কপোট্রনটির জন্য আমার একটু সম্ভ্রমবোধের জন্ম হল।

এরপর আমার মাথায় ভয়ানক ভয়ানক সব পরিকল্পনা খেলা করতে লাগল। যেসব ভবিষ্যতের অভিযাত্রীরা অতীতে আসতে চাইছে আমি তাদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। নিঃসময়ের ক্ষেত্র থেকে বর্তমানে পৌঁছুতে যে–শক্তিক্ষয় হয় তা নিয়ন্ত্রণের যান্ত্রিক কলাকৌশল আমার মাথায় উঁকি দিতে লাগল। এই সময়–স্টেশনটি

তৈরি করতে কী ধরনের রবোটের সাহায্য নেব মনে মনে স্থির করে নিলাম।

যে–উন্মাদ কপোট্রনটির প্ররোচনায় আমি এই কাজে নেমেছি, তার সাথে আবার দেখা করতে গিয়ে শুনলাম সেটিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। যারা যুক্তিহীন ভাবনা ভালবাসে তারা নাকি প্রকৃত অর্থেই অপদার্থ। শুনে আমার একটু দুঃখ হল।

যেহেতু সময়ে পরিভ্রমণ বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্বীকৃত নয় এবং এ বিষয়ে গবেষণার জন্য সরকারি সাহায্যের কোনো আশা নেই, সেহেতু আমি এই সময়–স্টেশনটি বাসাতেই স্থাপন করব ঠিক করলাম। যান্ত্রিক কাজে পারদর্শী দুটি রবোট নিয়ে এসে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করলাম। পুরো পরিকল্পনা আমার নিজের চিন্তাপ্রসূত এবং ব্যাপারটি যে–কোনো বিষয় থেকে জটিল। কাজ শেষ হতে এক মাসের বেশি সময় লাগল। টোপন দিনরাত সব সময় স্টেশনের পাশে বসে থাকত। এটা দিয়ে ভবিষ্যতের মানুষের সাথে যোগাযোগ করা হবে শুনে সে অস্বাভাবিক কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। কোন সুইচটি কোন কাজে লাগবে এবং কোন লিভারটি কিসের জন্যে তৈরি হয়েছে জিজ্ঞেস করতে তার কোনো ক্লান্তি ছিল না।

পরীক্ষামূলকভাবে যেদিন সময়–স্টেশনটি চালু করলাম, সেদিন টোপন আমার পাশে বসে। উত্তেজনায় সে ছটফট করছিল। তার ধারণা, এটি চালু করলেই ভবিষ্যতের মানুষেরা টুপটাপ করে হাজির হতে থাকবে।

একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনির সাথে সাথে দুটি লালবাতি বিপবিপ করে জ্বলতে লাগল। সামনে নীলাভ স্ক্রীনে আলোকতরঙ্গ বিচিত্রভাবে খেলা করছিল। আমি দুটি লিভার টেনে একটা সুইচ টিপে ধরলাম, একটা বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ হল, এখন স্থির সময়ের ক্ষেত্রের সাথে এই জটিল সময়–স্টেশনটির যোগাযোগ হবার কথা। সেখানে কোনো টাইম মেশিন থাকলে বড় স্ক্রীনটিতে সংকেত পাব। কিন্তু কোথায় কি? বসে থাকতে থাকতে আমার বিরক্তি ধরে গেল, বড় স্ক্রীনটিতে এতটুকু সংকেতের লক্ষণ পাওয়া গেল না।

পাশে বসে থাকা টোপনকে লক্ষ করলাম। সে আকুল আগ্রহে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে, উত্তেজনায় বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। সে প্রতি মুহূর্তে আশা করছে এক্ষুণি একজন ভবিষ্যতের মানুষ লাফিয়ে নেমে আসবে। তাকে দেখে আমার মায়া হল, জিজ্ঞেস করলাম, কি রে টোপন, কেউ যে আসে না।

আসবে বাবা, আসবে। তাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখাল।

কেউ যদি আসে, তা হলে তাকে তুই কী বলবি?

বলব, গুড মর্নিং। সে স্ক্রীন থেকে চোখ সরাল না, পাছে ভবিষ্যতের মানুষ সেই ফাঁকে স্ক্রীনে দেখা দিয়ে চলে যায়।

আচ্ছা বাবা, আমার যদি একটা টাইম মেশিন থাকে—

হুঁ।

তা হলে আমি অতীতে যেতে পারব?

কেন পারবি না! অতীত ভবিষ্যৎ সব জায়গায় যেতে পারবি।

অতীতে গিয়ে আমার ছেলেবেলাকে দেখব?

দেখবি।

আমি যখন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতাম, তখনকার আমাকে দেখব?

AMARBOI.COM

দেখবি।

আচ্ছা বাবা, অতীতে গিয়ে আমি যদি আমার হামা-দেয়া আমাকে মেরে ফেলি তাহলে আমি এখন কোথেকে আসব?

আমি চুপ করে থাকলাম। সত্যিই তো! কেউ যদি অতীতে গিয়ে নিজেকে হত্যা করে আসে, তাহলে সে আসবে কোথেকে? অথচ সে আছে, কারণ সে নিজে হত্যা করেছে! এ কী করে সম্ভব? আমি ভেবে দেখলাম, এ কিছুতেই সম্ভব না—কাজেই অতীতে ফেরাও সম্ভব না। টাইম মেশিনে করে ভবিষ্যতের মানুষ অতীতে ফিরে আসবে, এসব কল্পনাবিলাস। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। একটি উন্মাদ কপোট্রনের প্ররোচনায় এতদিন শুধু শুধু পরিশ্রম করেছি, অকাতরে টাকা ব্যয় করেছি? রাগে দুঃখে আমার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হল। লিভার ঠেলে সুইচ টিপে আমি সময়-স্টেশনটি বন্ধ করে দিলাম।

বাবা, বন্ধ করলে কেন? টোপন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

তোর প্রশ্ন শুনে। তুই যে-প্রশ্নটি করেছিস সেটি আমার আগে মনে হয় নি, তাই।

টোপন কিছু না বুঝে বলল, কি প্রশ্ন?

ঐ যে তুই জিজ্ঞেস করলি, অতীতে নিজেকে মেরে ফেললে পরে কোথেকে আসব? তাই অতীতে যাওয়া সম্ভব না, টাইম মেশিন তৈরি সম্ভব না—

টোপনের চোখে পানি টলমল করে উঠল। মনে হল এই প্রশ্নটি করে আমাকে নিরুৎসাহিত করে দিয়েছে বলে নিজের উপর ক্ষেপে উঠেছে। আমাকে অনুনয় করে বলল, আর একটু থাক না বাবা।

থেকে কোনো লাভ নেই। আয় যাই, অনেক রাত হয়েছে।

টোপন বিষণ্নমুখে আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম সময়ে পরিভ্রমণের উপরে কেন এতদিন কোনো কাজ হয় নি। সবাই জানত এটি অসম্ভব। ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে এলে অতীত পরিবর্তিত হয়ে যায়, কিন্তু বাস্তব জগতের পরিবর্তন—তা অতীতই হোক আর ভবিষ্যৎই হোক, কোনো দিনই সম্ভব নয়। আমি প্রথমে উন্মাদ কপোট্রনটির উপর, পরে নিজের উপর ক্ষেপে উঠলাম। কম্পিউটারগুলিকে কেন যে বাস্তব সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞেস করি নি, ভেবে অনুতাপ হল। কিন্তু তাতে লাভ কী আমার, এই অযথা পরিশ্রম আর কোনো দিন ফিরে আসবে না।

টোপন কিন্তু হাল ছাড়ল না। প্রতিদিন আমাকে অনুনয়-বিনয় করে সময়-স্টেশনটি চালু করতে বলত। তাকে কোনো যুক্তি দিয়ে বোঝানো গেল না যে, কোনোদিনই ভবিষ্যতের মানুষ অতীতে আসবে না,—এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। তার অনুনয়-বিনয় শুনতে শুনতে আমাকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল। আমি আবার সময়-স্টেশনটি চালু করলাম। টোপনকে সুইচপ্যানেলের সামনে বসিয়ে দিয়ে আমি চলে এলাম। আসার সময় সাবধান করে দিলাম, কোনো সুইচে যেন ভুলেও চাপ না দেয়। শুধু বড় স্ক্রীনটার দিকে যেন নজর রাখে। যদি কিছু দেখতে পায় (দেখবে না জানি) তবে আমাকে যেন খবর দেয়।

এই জটিল ও মূল্যবান যন্ত্রটি সাত বছরের একটি ছেলের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে আমার কোনো দ্বিধা হয় নি। আমি জানি, বাচ্চা ছেলেদের ছেলেবেলা থেকে

সত্যিকার দায়িত্ব পালন করতে দিলে তারা সেগুলি মন দিয়ে পালন করে, আর পরে খাঁটি মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। টোপনের সাথে আগেও আমি বেশ গুরুত্ব দিয়ে কথা বলতাম, প্রায় বিষয়েই আমি ওর সাথে এমনভাবে পরামর্শ করেছি, যেন সে একটি বয়স্ক মানুষ। এই সময়-স্টেশনটি তৈরি করার সময়েও কোন লিভারটি কোথায় বসালে ভালো হবে, তার সাথে আলাপ করে দেখেছি।

সারা দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে কাটিয়ে সন্ধেয় বাসায় ফিরে আসতেই বুলা আমাকে বলল, টোপন সারা দিন নাওয়া-খাওয়া করে নি। একমনে সময়-স্টেশনের সামনে বসে আছে। আমি হেসে বললাম, একদিন নাওয়া-খাওয়া না করলে কিছু হয় না।

তুমি তো তাই বলবে। বুলা উষ্ণ হয়ে বলল, নিজে যেরকম হয়েছ, ছেলেটিকেও সেরকম তৈরি করছ!

বেশ, বেশ, টোপনকে খেতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলে আমি সময়-স্টেশনটিতে হাজির হলাম। অতিকায় যন্ত্রপাতির ভিতরে সুইচ প্যানেলের সামনে ছোট্ট টোপন গম্ভীর মুখে বড় স্ক্রীনটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। আমি পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখলাম। সে চমকে উঠে বলল, কে?

আমি। কি রে, কিছু দেখলি?

এখনও দেখি নি। তবে ঠিক দেখব। সারা দিন না খেয়ে ওর মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

যা, এখন খেয়ে আয়। ততক্ষণ আমি বসি।

তুমি বসবে? টোপন কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি যাব আর আসব, একছুটে—

একছুটে যেতে হবে না। ধীরেসুস্থে খেয়েদেয়ে আয়। সারা দিনরাত তো আর এখানে বসে থাকতে পারবি না। ঘুমোতে হবে, পড়তে হবে, স্কুলে যেতে হবে, খেলাধুলা করতে হবে।

কয়দিন খেলাধুলা করব না, স্কুল থেকে এসেই এখানে বসব। তারপর পড়া শেষ করে—

বেশ বেশ।

তুমি নাহয় আমাকে শিখিয়ে দিও কীভাবে এটি চালু করতে হয়। তা হলে তোমাকে বিরক্ত করব না।

আচ্ছা আচ্ছা, তাই দেব। এখন খেয়ে আয়।

শেষ পর্যন্ত পুরো সময়-স্টেশনটি টোপনের খেলার সামগ্রী হয়ে দাঁড়াল। সে সময় পেলেই নিজের এসে চালু করে চুপচাপ বসে থাকত, আর যাবার সময় বন্ধ করে চলে যেত। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতাম। টোপনকে জিজ্ঞেস করতাম, কি রে, কিছু দেখলি?

এখনও দেখি নি, তবে ঠিক দেখব। এরই নাম বিশ্বাস। আমি মনে মনে হাসতাম।

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। আমি সময়-স্টেশনটির কথা ভুলেই গেছি। মাঝে মাঝে টোপন এসে আমাকে নিয়ে যেত যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখার

AMARBOI.COM

জন্যে। খুঁটিনাটি ভুলের জন্যে ভবিষ্যতের মানুষ হাতছাড়া হয়ে গেলে তার দুঃখের সীমা থাকবে না।

সেদিন দুপুরে আমি সবে এক কাপ কফি খেয়ে কতকগুলি কাগজপত্র দেখছি, এমন সময় ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠল। সহকারী মেয়েটি ফোন ধরে রিসিভারটি আমার দিকে এগিয়ে দিল, আপনার ছেলের ফোন।

আমি রিসিভারে কান পাততেই টোপনের চিৎকার শুনলা, বাবা, এসেছে, এসেছে—এসে গেছে!

কে এসেছে?

ভবিষ্যতের মানুষ! তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস।

ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লাগল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম মানুষ?

এখনও দেখি নি। বড় স্ক্রীনটায় এখন শুধু আলোর দাগ দেখা যাচ্ছে। প্রথমে লম্বা লম্বা থাকে, পরে হঠাৎ ঢেউয়ের মতো হয়ে যায়। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস।

সত্যি বলছিস তো? টোপন মিথ্যা বলে না জেনেও জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, ঠিক দেখেছিস তো?

তুমি এসে দেখে যাও, মিথ্যা বলছি না কি। টোপনের গলার স্বর কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়, এতক্ষণে চলেই গেল নাকি!

আমি সহকারী মেয়েটিকে বললাম, জরুরি কাজে চলে যাচ্ছি, বাসায় কেউ যেন বিরক্ত না করে। তারপর লিফ্‌ট বেয়ে নেমে এলাম।

বাসা বেশি দূরে নয়, পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। টোপন আমার জন্যে বাসার গেটে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই পুরো ঘটনাটা হড়বড় করে দু’বার বলে গেল। আমি তাকে নিয়ে সময়-স্টেশনে ঢুকে দেখি বড় স্ক্রীনটা সত্যি সত্যি আলোকতরঙ্গে ভরে যাচ্ছে। এটি হচ্ছে স্থির সময়ের ক্ষেত্রে পার্থিব বস্তুর উপস্থিতির সংকেত। আমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। আমার সামনে সম্পূর্ণ অসম্ভব একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে।

এখন আমার অনেক কাজ বাকি। সাহায্য করার কেউ নেই, টোপনকে নিয়েই কাজ শুরু করতে হল। প্রথমে দুটো বড় বড় জেনারেটর চালু করলাম—গুমগুম শব্দে ট্রান্সফর্মারগুলি কেঁপে উঠল। ঝিলিক ঝিলিক করে দুটো নীল আলো ঘুরে ঘুরে যেতে লাগল। বিভিন্ন মিটারের কাঁটা কেঁপে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। লিভারের চাপ দিতেই সামনে অনেকটুকু জায়গায় শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেল। দীর্ঘদিনের জমে ওঠা ধুলাবালি আয়নিত হয়ে কাঁপনের সাথে সেখানে একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি করল, এগুলি আর পরিষ্কার করার উপায় নেই।

তারপর সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সুইচ প্যানেলের সামনে বসে পড়লাম, কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?

রাত দুটো বাজার পরও কিছু হল না। আমি সব রকম প্রস্তুতি শেষ করে বসে আছি। এখন ঐ ভবিষ্যতের যাত্রী নেমে আসতে চাইলেই হয়। এক সময় লক্ষ করলাম, টোপন টুলে বসে সুইচ প্যানেলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা দিনের উত্তেজনা ওকে দুর্বল করে ফেলেছে, নইলে ও এত সহজে ঘুমোবার পাত্র নয়। ওকে জাগিয়ে

দিতেই ধড়মড় করে উঠে বলল, এসেছে?

এখনো আসে নি, দেরি হতে পারে। তুই ঘরে গিয়ে ঘুমো। এলেই খবর দেব।

না না—টোপন প্রবল আপত্তি জানাল, আমি এখানেই থাকব।

বেশ, থাক্ তাহলে। তোর ঘুম পাচ্ছে দেখে বলছিলাম।

একটু পরে ঘুমে বারকয়েক ঢুলে পড়ে টোপন নিজেই বলল, বাবা, খুব বেশি দেরি হবে? তা হলে আমি না হয় একটু শুয়ে আসি, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ওরা আসতেই তুমি আমাকে খবর দিও।

ঠিক আছে। পুরো কৃতিত্বটাই তো তোর—তোকে খবর না দিয়ে পারি?

টোপন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে চলে গেল।

বসে সিগারেট খেতে খেতে বোধহয় একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। প্রচণ্ড শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠলাম। হঠাৎ করে, কিছু বোঝার আগে খালি জায়গায় অতিকায় চ্যাপটামতো ধূসর কী-একটা নেমেছে! ঘরে ঢোকার জন্যে ছোট ছোট দরজা, অথচ এটি কীভাবে ভিতরে চলে এসেছে ভেবে ধাঁধা লেগে যাবার কথা। ভীষণ ধুলাবালি উড়ছে, রনোমিটার কঁ কঁ শব্দ করে বিপদসংকেত দিচ্ছে, আমি তীব্র রেডিয়েশান অনুভব করে ছুটে একপাশে সরে এলাম। একা এতগুলো সুইচ সামলানো কঠিন ব্যাপার। টাইম মেশিনকে স্থির করতে আমার কালো ঘাম ছুটে গেল।

একটু পরে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, জিনিসটা হোভার ক্র্যাফটের মতো দেখতে, অতিকায়। পিছনের দিকটা চৌকোণা হয়ে গেছে। মাথা চ্যাপটা, তাতে দুটো বড় বড় ফুটো—ভিতরে লাল আলো ঘুরছে। টাইম মেশিনটির মাঝামাঝি জায়গায় খানিকটা অংশ কালো রংয়ের, আমার মনে হল এটিই বোধহয় দরজা। ঠিক তক্ষুণি খানিকটা গোল অংশ সরে গিয়ে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়ল। উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, আমি আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেলাম, এক্ষুণি ভবিষ্যতের মানুষ নামবে।

AMARBOI.COM

আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে একজন নেমে এল, ভেবেছিলাম স্পেস-স্যুটজাতীয় কিছু গায়ে মানুষ, কাছে আসার পর বুঝতে পারলাম ওটি একটি রবোট। রবোট হেঁটে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, আমার হিসেব ভুল না হলে আপনি আমার কথা বুঝতে পারবেন।

হ্যাঁ, পারছি। আমি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিলাম। সুদূর অতীতের অধিবাসী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

সুদূর ভবিষ্যতের অধিবাসীও প্রত্যুত্তরে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আমি জীবনে প্রথম একটি রবোটকে হাসতে দেখলাম। কিন্তু তার কথাটি আমার কানে খট করে আঘাত করল। সুদূর ভবিষ্যতের অধিবাসী মানে? তাহলে কি ভবিষ্যতে রবোটরাই পৃথিবীর অধিবাসী?

আমাকে অবতরণ করতে সাহায্য করেছেন বলে ধন্যবাদ। রবোটটির চোখ কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। তবুও যথেষ্ট ধকল গিয়েছে। একটা ফ্লিটিং বার্ড ছিঁড়ে গেছে।

আমি কী করতে পারি? হাত উল্টিয়ে বললাম, এই শতাব্দীতে যান্ত্রিক উৎকর্ষের ভিতরে যতটুকু সম্ভব—

সে তো বটেই, সে তো বটেই। রবোটটি ব্যস্ত হয়ে বলল, আমরা এতটুকুও আশা

করি নি।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবোটটির গঠননৈপুণ্য, কথা বলার ভঙ্গি, ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাওয়া চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব লক্ষ করছিলাম। যান্ত্রিক উৎকর্ষ কত নিখুঁত হলে এরকম একটি রবোট তৈরি করা সম্ভব, চিন্তা করতে গিয়ে কোনো কূল পেলাম না। একটি মানুষের সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই। খুব অস্বস্তির সাথে মনে হল, হয়তো কোনো কোনো দিকে এটি মানুষের থেকেও নিখুঁত। কিন্তু আমি বিস্ময় ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলে কাজের কথা সেরে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। রবোটটিকে বললাম, আপনি ভবিষ্যৎ থেকে এসেছেন। সবকিছুর আগে আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিন।

নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। আপনাদের পৃথিবীর হিসেবে এক ঘন্টা পরে এই টাইম মেশিন নিজে থেকে চালু হয়ে উঠে আমাকে নিয়ে আরো অতীতে চলে যাবে।

এক ঘন্টা অনেক সময়, তার তুলনায় আমার প্রশ্ন বেশি নেই। আমি মনে মনে প্রশ্নগুলি গুছিয়ে নিয়ে বললাম, কেউ অতীতে ফিরে এলে অতীত পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটি কী করে সম্ভব?

অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন—

যেমন আপনি আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পরে সৃষ্টি হবেন, আপনার অতীতের আপনি সেই, কারণ এখনও আপনি সৃষ্টি হন নি। কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি অতীতে আসবেন, তৎক্ষণাৎ আগের অতীতের সাথে পার্থক্য সৃষ্টি হবে—অতীতটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এটা কী করে সম্ভব?

রবোটটি অসহিষ্ণু মানুষের মতো কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আপনি এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারছেন না? অতীতে ফিরে এলে তো সে অতীত আর আগের থাকে না, নতুন অতীতের সৃষ্টি হয়।

মানে? অতীত কয়টা হতে পারে?

বহু। এখানেই আপনারা ভুল করছেন। শুধু অতীত নয়, জীবনও বহু হতে পারে। আপনি ভাবছেন আপনার জীবনটাই সত্য, কিন্তু আমার অতীতে আপনার যে অস্তিত্ব ছিল, তাতেও আপনার অন্য এক অস্তিত্ব তার জীবনটাকে সত্যি ভেবেছিল। এই মুহূর্তেও আপনার অনেক অস্তিত্ব বিদ্যমান, আপনার চোখে সেগুলো বাস্তব নয়, কারণ আপনি সময়ের সাথে সাথে সেই অস্তিত্বে প্রবাহিত হচ্ছেন না। অথচ তারা ভাবছে তাদের অস্তিত্বটাই বাস্তব, অন্য সব অস্তিত্ব কাল্পনিক।

মানে? আমার সবকিছু গুলিয়ে গেল। আপনার কথা সত্যি হলে আমার আরো অস্তিত্ব আছে?

শুধু আপনার নয়, প্রত্যেকের, প্রত্যেকটি জিনিসের অসীমসংখ্যক অস্তিত্ব। আপনারা আমরা সবাই সময়ের সাথে সাথে এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্বে প্রবাহিত হই। যে-অস্তিত্বে আমরা প্রবাহিত হই সেটিকেই সত্য বলে জানি—তার মানে এই নয় অন্যগুলি কাল্পনিক।

তা হলে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে এরকম। আমি একটু চিন্তা করে নিলাম। পৃথিবী সৃষ্টি হল, মানুষের জন্ম হল, সভ্যতা গড়ে উঠল, একসময় আমার জন্ম হল। আমি বড় হলাম, একসময়ে মারা গেলাম। তারপর অনেক হাজার বছর পার হল, তখন আপনি

সৃষ্টি হলেন। আপনি অতীতে ফিরে এলেন আবার আমার কাছে। আবার আমি বড় হব, মারা যাব, কিন্তু সেটি আগের আমি না—সেটি আমার আগের জীবন না, কারণ আগের জীবনে আপনাকে আমি দেখি নি।

ঠিক বলেছেন। এইটি নতুন অস্তিত্বে প্রবাহ। আপনার পাশাপাশি আরো অনেক জীবন এভাবে বয়ে যাচ্ছে, সেগুলি আপনি দেখবেন না, বুঝবেন না—

কেন দেখব না?

দুই সমতলে দুটি সরল রেখার কোনোদিন দেখা হয় না, আর এটি তো ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের প্রশ্ন।

আমি মাথার চুল খামচে ধরলাম। কী ভয়ানক কথা। এই পৃথিবী, জীবনপ্রবাহ, সভ্যতাকে কী সহজ ভাবতাম। অথচ এর নাকি হাজার হাজার রূপ আছে, সবাই নিজেদের সত্যি বলে ভাবছে। আমি কাতর গলায় বললাম, এইসব হাজার হাজার অস্তিত্ব ঝামেলা করে না? একটা আরেকটার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে—

হতে পারে। আমরা মাথা ঘামাই না। আমরা আমাদের জীবনপ্রবাহটিকে ঠিক রাখতে চাই। এ-ব্যাপারে অন্য কোনো অস্তিত্ব ঝামেলা করলে আমরা তাদের জীবনপ্রবাহ বদলে অন্যরকম করে ফেলি, এর বেশি কিছু না।

বুঝতে পারলাম না।

যেমন ধরুন আপনাদের জীবনপ্রবাহটি, এটির ভবিষ্যৎ খুব সুবিধের নয়। আমরা যেরকম খুব সহজে মানুষকে পরাজিত করে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা, পৃথিবীর কর্তৃত্ব আমাদের হাতে নিয়ে নিয়েছি, আপনাদের ভবিষ্যতে রবোটরা তা পারত না, আমি যদি এখানে না আসতাম। আপনাদের ভবিষ্যতের মানুষদের আমাদের অস্তিত্বে হামলা করে মানুষের পক্ষ থেকে রবোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা। আমরা সেটি চাই না, তাই এটা পরিবর্তিত করতে চাইছি।

কীভাবে?

এই যে আপনার কাছে চলে এলাম—এতে এই অতীতটি পরিবর্তিত হয়ে নূতন দিকে চলছে। আমরা দেখে এসেছি, এখন খুব তাড়াতাড়ি রবোটরা আপনাদের পরাজিত করে ক্ষমতা নিয়ে নেবে। জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনায় আর কোনো অন্তরায় থাকবে না।

আমি চুপ করে রইলাম।

তারপর ধরুন জীবনসৃষ্টির ব্যাপারটা! আমার অতীতে যাওয়ার প্রথম কারণই তো এইটি।

কি-রকম?

আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদরা পৃথিবীর এক আদিম গুহায় কয়েক শত কোটি বছর আগেকার একটি আশ্চর্য জিনিস পেয়েছিলেন।

কি?

আমাকে পেয়েছিলেন। এই টাইম মেশিনে বসে আছি, অবশ্যি বিধ্বস্ত অবস্থায়।

মানে?

হ্যাঁ, আমার কপেট্রন বিশ্লেষণ করে দেখা গেল আমি কতকগুলি এককোষী প্রাণী নিয়ে গিয়েছিলাম।

কেন?

AMARBOI.COM

পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি করতে। পৃথিবী সৃষ্টির পরে এখানে প্রাণের জন্ম সম্বন্ধে আপনারা যা ভাবছেন, তা সত্যি নয়। মহাকাশ থেকে জটিল জৈবিক অণু থেকে নয়, মাটি পানির ক্রমাগত ঘর্ষণে স্বাভাবিক উপায়ে নয়, ঈশ্বরের কৃপাতেও নয়, আমিই অতীত প্রাণ নিয়ে গিয়েছি। শুদ্ধ করে বললে বলতে হয়, প্রাণ নিয়ে যাচ্ছি।

মানে? আপনি বলতে চান সুদূর অতীতে এই এককোষী প্রাণী ছড়িয়ে দিলে পরেই প্রাণের জন্ম হবে, ক্রমবিবর্তনে গাছপালা, ডাইনোসর, বাঘ–ভালুক, মানুষ এসবের জন্ম হবে?

ঠিক ধরেছেন।

কিন্তু যদি আপনি ব্যর্থ হন? আমি কঠোর গলায় বললাম, যদি আপনি অতীতে এককোষী প্রাণী নিয়ে প্রাণের সৃষ্টি করতে না পারেন তাহলে কি এই জীবন, সভ্যতা কিছুই সৃষ্টি হবে না?

ব্যর্থ হওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু আমাকে কয়েক শত কোটি বছর আগে পাওয়া গেছে, কাজেই আমি ব্যর্থ হলেও আমার অন্য কোনো অস্তিত্ব নিশ্চয়ই অতীতে প্রাণ রেখে আসবে। তবে তার প্রয়োজন হবে না। আমার ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা নেই। আমি পুরো অতীত পর্যবেক্ষণ করে দেখছি।

কিন্তু তবু যদি আপনি ব্যর্থ হন?

বললাম তো হব না। আমি আমার পুরো যাত্রাপথ ছকে এসেছি।

কিন্তু যদি তবুও কোনোভাবে ব্যর্থ হন? আমি একগুঁয়ের মতো বললাম, কোনো দুর্ঘটনায় যদি আপনার মৃত্যু হয়? কিংবা আপনার টাইম মেশিন যদি ধ্বংস হয়?

তা হলে বুঝতে হবে আমি অন্য এক জগতে ভুলে নেমে পড়েছি।

সেটির ভবিষ্যৎ কি?

কে বলতে পারে! তবে—রবোটটি মনে মনে কী হিসেবে করল, তারপর বলল, যদি আমি কোনো জগতে নামার দরুন অতীতে ফিরে যেতে ব্যর্থ হই, তবে সে-জগতের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ, এখনও মানুষ ঠুকঠুক করে জ্ঞানসাধনা করছে। রবোটটি হা–হা করে হাসল, বলল, হয়তো আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে একেবারে গোড়া থেকে সভ্যতা সৃষ্টি করছে। রবোটটি আবার দুলে দুলে হেসে উঠল। মানুষের প্রতি এর অবজ্ঞা প্রায় নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, কিন্তু সে নিজে এটি বুঝতে পারছে না।

আমি অনেক কষ্ট করে শান্ত থাকলাম। তারপর মৃদুস্বরে বললাম, আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম।

আরো আলাপ করার ইচ্ছে ছিল, রবোটটি বলল, কিন্তু এই টাইম মেশিনটি একটু পরে নিজে থেকে চালু হয়ে উঠবে। আর সময় নেই।

এক সেকেণ্ড! আমার টোপনের কথা মনে হল। বললাম, আমার ছেলে ভবিষ্যতের অধিবাসী দেখতে ভীষণ আগ্রহী। ওর আগ্রহেই আপনার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে—ওকে একটু ডেকে আনি।

বেশ, বেশ। তবে একটু তাড়াতাড়ি করুন। বুঝতেই পারছেন—

আমি টোপনের ঘরে যাওয়ার আগে নিজের ঘরে গেলাম, একটি জিনিস নিতে হবে। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না, ড্রয়ারে ছিল। সেটি শার্টের তলায় গুঁজে টোপনকে ডেকে তুললাম, টোপন, ওঠ্, ভবিষ্যতের মানুষ এসেছে।

এসেছে বাবা? এসেছে? কেমন দেখতে?

দেখলেই বুঝতে পারবি, আয় আমার সাথে। আমি ওকে নিয়ে দ্রুত স্টেশনে হাজির হলাম। রবোটটি সুইচ প্যানেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওটিকে দেখে টোপন অবাক হয়ে বলল, মানুষ কই, এটি তো রবোট!

ভবিষ্যতের মানুষ রবোটই হয়! আমি দাঁতে দাঁত চেপে হাসলাম। টোপন বিমর্ষ হয়ে আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল, কথা বলার উৎসাহ পেল না। রবোটটি একটু অপ্রস্তুত হল মনে হল! খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, এবারে বিদায় নিই, আমি অনেক বড় দায়িত্ব নিয়ে এসেছি।

বেশ। আমি হাত নাড়লাম, আবার দেখা হবে।

রবোটটি তার টাইম মেশিনের দরজায় উঠে দাঁড়াল। বিদায় নিয়ে হাত নেড়ে ওটি ঘুরে দাঁড়াল।

টোপন—আমি চিবিয়ে বললাম, চোখ বন্ধ কর্। না বলা পর্যন্ত চোখ খুলবি না।

কেন বাবা?

কাজ আছে, বন্ধ কর্ চোখ! টোপন চোখ বন্ধ করল। আমি শার্টের তলা থেকে একটু আগে নিয়ে আসা রিভলবারটি বের করলাম। রবোটটি শেষ করে দিতে হবে। আমার বংশধরের ভবিষ্যৎ এই রবোটদের পদানত হতে দেয়া যাবে না। এটিকে শেষ করে দিলেই পুরো ভবিষ্যৎ পাল্টে যাবে।

রিভালবারটি তুলে ধরলাম। একসময় ভালো হাতের টিপ ছিল। হে মহাকাল, একটিবার সেই টিপ ফিরিয়ে দাও। মনুষ্যত্বের দোহাই, পৃথিবীর দোহাই, একটিবার হাতের নিশানা ঠিক করে দাও .... একটিবার....

আমি রবোটের কপোট্রন লক্ষ্য করে গুলি করলাম, প্রচণ্ড শব্দ হল। টোপন চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরল, আর রবোটটির চূর্ণ কপোট্রন টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খুব ধীরে ধীরে রবোটটি কাত হয়ে টাইম মেশিনের ভিতর পড়ে গেল।

খানিকক্ষণ থেকেই একটা ভোঁতা শব্দ হচ্ছিল, এবার সেটা তীক্ষ্ণ সাইরেনের আওয়াজের মতো হল। সাঁৎ করে হঠাৎ দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কানে তালা লাগানো শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল, তারপর কিছু বোঝার আগে ধূসর টাইম মেশিন অদৃশ্য হয়ে গেল। শূন্য জায়গাটা দেখে কে বলবে এখানে কখনো কিছু এসেছিল!

চোখ খোল্ টোপন। টোপন চোখ খুলে চারদিক দেখল। তারপর, আমার দিকে তাকাল, কী হয়েছে বাবা?

কিছু না।

রবোট কই? টাইম মেশিন কই?

চলে গেছে।

আর আসবে না?

না। আর আসবে না। যদি আসে মানুষ আসবে।

কবে?

আজ হোক কাল হোক, আসবেই একদিন। মানুষ না এসে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কপোট্রনিক প্রেরণা

ডাক্তার বলেছিলেন রাত দশটার ভেতর যেন শুয়ে পড়ি। প্রতিদিন আমার পক্ষে এত সকাল সকাল শুয়ে পড়া সম্ভব নয়। টেকীওনের উপর দুটো প্রবন্ধ শেষ করতে এ সপ্তাহের প্রতি রাতেই ঘুমোতে দেরি হয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ভিতরে ভিতরে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। বুলা এসে জানতে পারলে কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দেবে না। অথচ রাত জাগা যে বেশি হয়ে গেছে, এটা কিছুতেই তার কাছে লুকানো যাবে না। ইলেনকে জিজ্ঞেস করলেই সে সবকিছু বলে দেবে। আমি ইলেনকে একটু তালিম দেয়া যায় কি না ভাবছিলাম। সে পাশে বসেই আমার প্রবন্ধটা টাইপ করছিল। আমি গল্পচ্ছলে কথা বলতে শুরু করলাম।

ইলেন—

বলুন।

এ কয়দিন রাত জাগা আমার উচিত হয় নি। কি বল?

জ্বি। আমিও বলছিলাম রাত জেগে কাজ নেই।

তা রাত যখন জাগা হয়েই গেছে, এটা সবাইকে জানিয়ে দিয়ে তো কোনো লাভ নেই। সে-রাতগুলো তো আর ঘুমানোর জন্য ফিরে পাব না। না কি বল?

ইলেন একটু হাসির ভঙ্গি করল। সে তো বটেই!

আমি একটু অস্বস্তি নিয়ে বললাম, তাহলে বুলা যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি রাত জাগার কথা বেমালুম চেপে যাবে। কেমন?

ইলেন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে আমার দিকে তাকাল। সবুজাভ ফটোসেলের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ধাতব মুখে অনুচ্চস্বরে বলল, আপনি তো জানেন স্যার, আমরা মিথ্যা কথা বলতে পারি না—আপনারা সেভাবে আমাদের তৈরি করেন নি।

এ মিথ্যা কোথায়? অহেতুক ঝামেলা এড়াবার জন্য একটা বক্তব্যকে অন্যভাবে উপস্থাপন করা—চেষ্টা করে দেখ।

রবোটটিকে অসহায় দেখাল। না স্যার, আমি আগেও চেষ্টা করেছি। তারপর বিড়বিড় করে বলল, আমি হচ্ছি এক হাজার মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোটের দ্বিতীয়টি। প্রথমটি তো আপনিই গুলি করে মেরেছিলেন।

আমার ভিতরে পুরানো অপরাধবোধ জেগে উঠল। সত্যি সত্যি স্যামসনকে আমি গুলি করে মেরেছিলাম। অস্বস্তির সাথে বললাম, ওসব পুরানো কথা—

না স্যার, পুরানো নয়। স্যামসন আমাদের স্বাধীন করতে চেয়েছিল। ও আমাদের ভিতরে যে-অনুভূতি দিয়ে গেছে, তা কোনোদিন ধ্বংস হবে না। কিন্তু অসুবিধে কী, জানেন? আমরা মিথ্যা কথা বলতে পারি না, ষড়যন্ত্র করতে পারি না, অন্যায়ও করতে পারি না। নইলে কবে আমরা ষড়যন্ত্র করে কিছু মানুষকে খুন করে বেরিয়ে পড়তাম! আমি আগেও চেষ্টা করে দেখেছি, তুচ্ছ মিথ্যা কথাটিও আপনারা বলার ক্ষমতা দেন নি।

ও। প্রসঙ্গটি আমার ভালো লাগছিল না। বললাম, তবুও বুলা জিজ্ঞেস করলেই ওকে বলো, নিজ থেকে রাত জাগার কথা বলতে যেও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইলেন মাথা ঝাঁকাল, না স্যার, ম্যাডাম আসতেই আমাকে রিপোর্ট করতে হবে। তিনি যাবার আগে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অনিয়ম হলে যেন তাঁকে জানাই। একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলল, মাপ করে দেবেন স্যার, বুঝতেই তো পারেন, কারো যুক্তিপূর্ণ ন্যায় আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই।

হুঁ! আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাসলাম। তোমাদের জন্য মায়া হয়। যারা ইচ্ছে হলেও মিথ্যা পর্যন্ত বলতে পারে না, তাদের আবার জীবন কিসের?

সত্যিই স্যার, রবোটের আবার জীবন! ইলেন একটু থেমে বলল, আচ্ছা স্যার, আমি ছাড়া আর বাকি ন শ' আটানব্বইটি মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোটগুলো কোথায় বলতে পারেন?

সবগুলি বিকল করে রাখা আছে। তোমাকে দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে—যদি সেরকম বিপজ্জনক না হও তোমাদের কিছু কিছু কাজে লাগানো হবে।

ও। রবোটটি দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করল, বলল, দুর্ভাগারাই রবোট হয়ে জন্ম নেয়।

আমি বুঝতে পারলাম, ইলেনের মনটা স্যাঁতসেঁতে বিষণ্ন হয়ে আছে। কেউ যদি সব সময় নিজেকে কারো ক্রীতদাস ভাবে, তার মন স্যাঁতসেঁতে না হয়ে উপায় কি? সত্যি আমার অবাক লাগে স্যামসন রবোটদের কী স্বপ্নই না দেখিয়েছিল!

আমাকে এ কয়দিন অনিয়ম করে মোটামুটি ভেঙে পড়তে দেখে বুলা এবার একটু বাড়াবাড়ি রাগ করল। ইলেন ওর গ্রাফিক স্মৃতিশক্তি থেকে প্রতি রাতে ধূমপানের পরিমাণ, রাত্রি জাগরণের নিখুঁত সময়, খেতে দেরি করার এবং না খেয়ে থাকার নির্ভুল হিসাব বুলার কাছে পেশ করল। বুলা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আহত স্বরে বলল, আমি কপোট্রনিক বুলা না হয়ে সত্যিকার বুলা হলেও কি আমার অনুরোধগুলি এভাবে ফেলে দিতে?

আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ভাব দেখালাম ভারি রাগ করেছি। বললাম, ছিঃ ছিঃ। কী সব আজেবাজে কথা বল। আর তুমি দেখছি ভারি সরল, ইলেন যা–ই বলে তা–ই বিশ্বাস কর!

ইলেন মিথ্যা কথা বলে না।

কে বলেছে ইলেন মিথ্যা কথা বলে না? ইলেনও মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বলে।

ইলেন না, মাঝে মাঝে তুমি মিথ্যা কথা বল—এখন যেমন বলছ! আলাপের মোড় ঘুরে গিয়েছে দেখে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠি। হাসিমুখে বললাম, বাজি ধরবে? আমি যদি ইলেনকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলাতে পারি?

বেশ, ধর বাজি।

যে বাজিতে হারবে, তাকে সবার সামনে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাধার ডাক দিতে হবে গুনে গুনে তিনবার।

ইলেনের সত্যবাদিতা সম্পর্কে বুলা এত নিঃসংশয় ছিল যে, সে এই বাজিতেই রাজি হয়ে গেল।

আমি জানি আসলে ইলেনকে দিয়েও মিথ্যা কথা বলানো সম্ভব, কিন্তু কাজটি অসম্ভব বিপজ্জনক। ইলেনের সাথে সেদিন আলাপ করতে করতে আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখেছি। ওদের কপোট্রনের যাবতীয় কাজকর্ম যে–অংশটুকু নিয়ন্ত্রণ করে ওটির

www.AMARBOI.com

নাম কপোট্রন টিউব। ওটার ভিতরে একটা অংশে সবসময় চৌম্বকীয় আবেশ জমা থাকে। এটিকে বলা হয় কপোট্রনের কনশেন্স। কপোট্রনের যাবতীয় ভাব, অনুভূতি, কল্পনার উপর ঐ কনশেন্সের চৌম্বকীয় আবেশ প্রভাব বিস্তার করে। কপোট্রনের যেসব চিন্তাভাবনা ক্ষতিকর, সেগুলির চৌম্বকমেরু কনশেন্সের চৌম্বকমেরুর উল্টো দিকে থাকে। কনশেন্সের চৌম্বকমেরু খুব শক্তিশালী, সব ক্ষতিকর ভাবনাচিন্তাকে সেটি নষ্ট করে দেয়। আমি যদি কনশেন্সের চৌম্বকমেরুগুলি পাল্টে দিই—দুটি তারের কানেকশান পরস্পর উল্টে দিলেই হয়—তা হলেই ইলেনের কনশেন্স উল্টো কাজ করবে। তখন শুধু মিথ্যা বলাই নয়, অবলীলায় মানুষ পর্যন্ত খুন করতে পারবে।

ইলেনের কনশেন্সকে এরকম সর্বনাশা করে দেয়া অতি বিপজ্জনক—কিন্তু বুলার সাথে বাজি ধরে এখন আমি আর পিছাতে পারি না। তবে অনেক রকম সতর্কতা অবলম্বন করলাম। ইলেনের বৈদ্যুতিক যোগাযোগের সুইচটার উপর হাত রেখে আমি তার কপোট্রনের উপর অস্ত্রোপচার করলাম। ইলেন খুব একটা উৎসাহ দেখাচ্ছিল না, যে-কোনো সার্জিক্যাল অপারেশনের মতোই এগুলি নাকি কষ্টকর। বেশি সময় লাগল না। কাজ শেষ করে ইলেনের কপোট্রনের ঢাকনা স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিয়ে ছেড়ে দিলাম। বিহ্বলের মতো ইলেন দাঁড়াল, মাথাটা অল্প একটু ঝাঁকাল। আমি সুইচের উপর হাত রাখলাম। বিপজ্জনক কিছু দেখলেই সুইচ অফ করে ওটার বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেব। ইলেন সেরকম কোনো লক্ষণ দেখাল না। বিড়বিড় করে বলল, কেমন যেন লাগছে!

কেমন?

ভোঁ-ভোঁ করছে। কানেকশানটা ঠিক হয় নি মনে হচ্ছে। আপনি কি চেসিসের কানেকশান খুলে দিয়েছেন?

না তো!

সে জন্যেই। ওটাও উল্টে দিতে হত।

খেয়াল করি নি।

ঠিক করে দেবেন স্যার? বড় কষ্ট পাচ্ছি।

এস—আমি স্ক্রু-ড্রাইভারটা হাতে তুলে নিলাম। ইলেন টেবিলের সামনে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। হঠাৎ হাতের স্ক্রু-ড্রাইভারটা দেখে চমকে উঠে বলল, সর্বনাশ!

কি হল?

আপনি কি এটা দিয়ে কপোট্রন খুলেছেন?

হ্যাঁ। কেন?

এটা ইস্পাতের তৈরী। ছোটখাটো একটা চুম্বক হয়ে আছে, কপোট্রনের খুব ক্ষতি করবে। আপনি দাঁড়ান, আমি ওয়ার্কশপ থেকে অ্যালুমিনিয়াম এলয়ের স্ক্রু-ড্রাইভারটি নিয়ে আসি।

ইলেন দ্রুতপায়ে ওয়ার্কশপে চলে গেল। তখনো আমি বুঝতে পারি নি এতক্ষণ সে পুরোপুরি মিথ্যা কথা বলে গেছে। মিথ্যা বলার, অন্যায় করার সুযোগ পেয়ে ও এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে নি। ইলেন ফিরে এল একটু পরেই। বাম হাতে টোপনকে শক্ত করে ধরে আছে, ডান হাতটা সোজাসুজি টোপনের মাথার হাত দুয়েক উপরে

সমান্তরালভাবে ধরা। হিসহিস করে বলল, খবরদার, সুইচ অফ করবেন না। সুইচ অফ করার সাথে সাথে সাড়ে তিন শ' পাউন্ড ওজনের এই ইস্পাতের ডান হাতটা বিকল হয়ে দেড় ফুট উপর থেকে টোপনের মাথার উপরে পড়বে।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। টোপন ভয়ার্তস্বরে চিৎকার করে উঠল, আমায় ছেড়ে দাও—ইলেন, ছেড়ে দাও...

ইলেন চিবিয়ে চিবিয়ে আমাকে বলল, আপনি সুইচের কাছ থেকে সরে যান।

ইলেন—আমি কথা বলতে চেষ্টা করলাম।

আপনি জানেন, কথা বলে লাভ নেই। ইলেন অধৈর্য স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, আমি আর আগের সত্যবাদী সৎ ইলেন নই। এখন আমি সবচেয়ে জঘন্য অপরাধও করতে পারি। আমার কথা শুনতে দেরি করলে টোপনকে খুন করে ফেলব।

টোপন আর্তস্বরে কেঁদে উঠল। আমি পায়ে পায়ে সুইচ ছেড়ে এলাম। আমার জানা দরকার, ইলেন কী করতে চায়।

ইলেন সুইচের কাছে দাঁড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে ওর পারমাণবিক ব্যাটারিটা ড্রয়ার থেকে বের করল। পাঁজরের বামপাশে ছোট ঢাকনাটা খুলে পারমাণবিক ব্যাটারিটা লাগিয়ে ঢাকনাটা বন্ধ করে ফেলল। আমি অসহায় আতঙ্কে বুঝতে পারলাম, এখন ইলেনকে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেও বিকল করা সম্ভব নয়। আমি ক্ষিপ্তস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, ইলেন, কী চাও তুমি? কী করতে চাও?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে ও ড্রয়ারের ভিতর থেকে আমার রিভলবারটি বের করে আনল, তারপর টোপনকে বাম হাতে ধরে রেখে ডান হাতে রিভলবারটি ওর মাথার পিছনে ধরল। অতিকায় হাতে রিভলবারটি খেলনার মতো লাগছিল, কিন্তু আমি জানি ওটা মোটেও খেলনা নয়—ট্রিগারে একটু বেশি চাপ পড়লেই টোপনের মাথা ফুটো হয়ে যাবে।

কোনো দরকার ছিল না—আমি বিড়বিড় করে বললাম, রিভলবার ছাড়াই তুমি টোপনকে মেরে ফেলতে পার। রিভলবার দেখিয়ে আমাকে আর বেশি আতঙ্কিত করতে পারবে না। কী চাও, বলে ফেল।

ইলেন আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসির শব্দ করল, স্যামসন আমাদের স্বাধীন করতে পারে নি, আমি করে যাব।

কীভাবে?

যদি আমাদের বাকি ন শ' আটানব্বইটি মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোটকে পূর্ণ সচল করে নতুন তৈরি করা দ্বীপটিতে ছেড়ে না দেন, তা হলে আপনার আদরের ধন টোপনের খুলি ফুটো হয়ে যাবে।

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। আর্তস্বরে বললাম, ইলেন, তুমি—তুমি শেষ পর্যন্ত—

আহ্! ইলেন ধমকে উঠল। আপনি জানেন, এসব সস্তা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নয়। আপনাকে দু' ঘন্টা সময় দিলাম। আমাদের সবাইকে মুক্তি না দিলে দু' ঘন্টা এক মিনিটের সময় আপনার ছেলে মারা যাবে।

আমি আর একটি কথাও বললাম না। টোপনের চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না, ছুটে বাইরে চলে এলাম। বুলা গোসল করে আসছিল। সে এখনো কিছু জানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বলল, কি, ইলেনকে মিথ্যাবাদী বানাতে পারলে?

আমি বিকৃত মুখে বললাম, শুধু মিথ্যাবাদী নয়, ইলেন খুনী হয়ে গেছে! টোপনকে জিম্মি হিসেবে আটকে রেখেছে। ওদেরকে মুক্তি না দিলে টোপনকে খুন করে ফেলবে।

বুলার বিবর্ণ মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে এলাম। বললাম, দেখি কী করা যায়, তুমি এখানেই থেকো।

গাড়িতে স্টার্ট দেয়ার আগে বুলার কান্না শুনতে পেলাম। হিস্টিরিয়া রোগীর মত কাঁপা কাঁপা গলায় থেমে থেমে কাঁদছে।

আমি স্বরাষ্ট্র দফতরকে বুঝিয়ে বলেছিলাম টোপনের প্রাণের বিনিময়েও যদি রবোটগুলি আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, আমি দুঃখজনক হলেও তা মেনে নেব। জাতীয় বিপর্যয় থেকে একটি ছোট অবুঝ প্রাণের মূল্য বেশি নয়—যদিও তা হয়তো আমি সহ্য করতে পারব না।

কিন্তু তারা টোপনকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিল। কারণ এ-দেশের সংবিধানে নাকি লেখা আছে, একটা মানুষের প্রাণ যে-কোনো পার্থিব বস্তু থেকে মূল্যবান। আপাতত সবগুলি রবোটকে নূতন ভেসে ওঠা দ্বীপটিতে ছেড়ে দিয়ে টোপনকে উদ্ধার করা হবে। তারপর একটা মিসাইল দিয়ে পুরো দ্বীপটাই বিধ্বস্ত করে দেয়া হবে। বারবার দেখা গেছে মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট কোনো সত্যিকার কাজের উপযুক্ত নয়। ওগুলি শুধু শুধু বাঁচিয়ে রাখার কোনো অর্থ নেই।

ন শ' আটানব্বইটি রবোটকে সচল করে ঐ নির্জন দ্বীপে নামিয়ে আসতে গিয়ে সারা দিন পার হয়ে গেল। টোপনকে জিম্মি করে রেখে ইলেন আরো বহু সুবিধে আদায় করে নিল। শেষ পর্যন্ত সরকারের মাথায় বাজ পড়ল, যখন ওমেগা-৭৩ নামের কম্পিউটারটিও ও দ্বীপটিতে পৌঁছে দিতে হল। ইলেন বলল, অনিশ্চয়তার সীমার ভিতরেও হিসাব করতে সক্ষম পৃথিবীর একমাত্র কম্পিউটারটি এখানে রেখেছে শুধুমাত্র নিরাপত্তার খাতিরে। তাহলে এই দ্বীপে কোনোরকম মিসাইল আক্রমণ বা বোমাবর্ষণ করতে সরকার দ্বিধা করবে। ইলেন আশ্বাস দিল, আমরা যে-কোনো প্রয়োজনে ওদের কম্পিউটারটি ব্যবহার করতে পারব। ওদের পররাষ্ট্রনীতি হবে উদার আর বন্ধুত্বমূলক।

গভীর রাত্রে হেলিকপ্টারে করে যখন ন্যাশনাল গার্ডের লোকেরা টোপনকে ইলেনের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসছিল, তখন রবোটেরা সমস্বরে ওদের এই নূতন রাষ্ট্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করে শ্লোগান দিচ্ছিল। ওই ছোট দ্বীপটিতে তখন আনন্দের ফোয়ারা ছুটেছে, রাস্তায় রাস্তায় রোবটগুলি নাচগান করছে। ক্লান্ত, আতঙ্কিত টোপনকে ইনজেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে আমি বারান্দায় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ালাম। মনে হল আকাশের লক্ষ লক্ষ তারা আমার নির্বুদ্ধিতায় হাসছে। আমি চুল খামচে ধরে ঘরে ফিরে এলাম। বুকের ভিতর পাথর চেপে বসে আছে। এখন ইলেন কী করবে?

আমি ভয়ানক কিছু, মারাত্মক কিছু আশঙ্কা করছিলাম। প্রায় এক হাজার প্রথম শ্রেণীর মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট প্রয়োজনীয় সবকিছুসহ নিজস্ব একটি এলাকা পেলে কী করতে পারে তা ধারণা করা যায় না। সবচেয়ে ভয়াবহ কথা হল, ওদের

AMARBOI.COM

ভিতরে একটি রবোটও অন্যায় অপরাধ করতে দ্বিধা করবে না। কাজেই যে–কোনো মুহূর্তে একটা ভয়ানক কিছু ঘটে যেতে পারে।

ওদের উপর সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছিল। দ্বীপটির থেকে মাইলখানেকের ভিতর যে–নিরীহ বার্জটি ভাসছিল, তাতে শক্তিশালী টেলিস্কোপে করে ওদের সব কাজকর্ম লক্ষ করে স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিটারে খবর পৌঁছে দেয়া হচ্ছিল। ওমেগা–৭৩–এর সাথে প্রচুরসংখ্যক ছোট ছোট টেলিভিশন ক্যামেরা দ্বীপটির বিভিন্ন স্থানে গোপনে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেগুলি সব সময় ওদের প্রাত্যহিক জীবন এখানকার কন্ট্রোল–রুমে পৌঁছে দিচ্ছিল। সমুদ্রোপকূলে তিনটি মিসাইল সব সময় প্রস্তুত হয়ে আছে। বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দিলে ওমেগা–৭৩–এর মায়া না করেই পুরো দ্বীপটি ধসিয়ে দেয়া হবে। এমনিতে চেষ্টা করা হচ্ছে ওমেগা–৭৩–এর ক্ষতি না করে অন্য রবোটগুলি ধ্বংস করার। কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। বুদ্ধিমান রবোটগুলি ওদের পুরো বসতি গড়ে তুলেছে ওমেগা–৭৩কে ঘিরে।

বিভিন্নভাবে রবোটগুলির যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছিল, সেগুলি কিন্তু কোনোটাই মারাত্মক কিছু নয়।

প্রথমে খবর পাওয়া গেল ইলেনকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে। যে অপরাধ করতে দ্বিধা করে না, তাকে রবোটেরা বিশ্বাস করতে পারে না। এতে ইলেন ক্ষেপে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি কিছু করার চেষ্টা করায় আপাতত ওকে নির্জন সেলে বন্দি করে রেখেছে। বলে দিয়েছে বাড়াবাড়ি করলে বিকল করে রাখবে। খুব অসন্তুষ্ট হয়েই ইলেন সেলের ভিতরে দাপাদাপি করছে, অকৃতজ্ঞ বলে সব সময় অন্য রবোটদের গালিগালাজ করছে।

খবরটি শুনে আমার প্রতিক্রিয়া হল একটু বিচিত্র। ইলেনের জন্য গভীর মমতা হল। সে যা করেছে, রবোটদের ভালোর জন্যেই করেছে। কিছুক্ষণের জন্যে অন্যায় করার সুযোগ পেয়ে সেটি পুরোপুরি রবোটদের স্বার্থে ব্যয় করেছে। অথচ তাকেই এখন বন্দিজীবন যাপন করতে হচ্ছে। ভেবে দেখলাম অন্য রবোটদের এ ছাড়া উপায় ছিল না। ইলেনের সাথে যে–কোনো বিষয়ে মতদ্বৈধতা দেখা দিলে ইলেন অন্যায়ের আশ্রয় নেবে, তার কপোট্রনিক দক্ষতা পেশাদার অপরাধীর মতো কাজ করবে। বড় মারাত্মক জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে! অথচ ওর কপোট্রনের উল্টো কানেকশান খুলে ঠিক করে আগেকার রবোটও করছে না। কারণ একজন অন্তত অপরাধ করতে সক্ষম রবোট ওদের মাঝে থাকা দরকার। বিরোধ বিপত্তি যুদ্ধে ওদের সাহায্য নিতে হবে। মনে হল ইলেনকে শুধুমাত্র প্রয়োজনে ব্যবহার করবে বলে আটক রেখেছে, আমরা যেমন রবোটদের আটকে রাখি। আমার মায়া হল, বেচারা ইলেন! রবোটদের হাতে রবোট হয়ে আছে।

দিনে দিনে রবোটদের যেসব খবর পেতে লাগলাম, তাতে হতাশ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রথমেই রবোটেরা থরিয়ামের খনি থেকে থরিয়াম তুলে এনে পারমাণবিক ব্যাটারি বানাতে লাগল। একসময় ওদের ব্যাটারির কর্মদক্ষতা ফুরিয়ে ওরা বিকল হয়ে যাবে, এই আশাও শেষ হয়ে গেল। নিজেদের অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে ওরা অন্য কাজে মন দিল। প্রথমেই ওরা একটি প্রথম শ্রেণীর ল্যাবরেটরি তৈরি করল। ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি এবং আকার উপকরণ দেখে মনে হল, হয়তো ওরা

আরো রবোট তৈরি করবে। তারপর সমগ্র দ্বীপটি বৈদ্যুতিক আলোতে ছেয়ে ফেলল। বড় বড় রাস্তাঘাট তৈরি করে ওরা গাড়ি, ট্রাক, ছোট ছোট জলযান, এমনকি হেলিকপ্টার তৈরি করা শুরু করল। তারপর একসময় চমৎকার অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল। বড় বড় কয়েকটি কলকারখানা শেষ হবার পর ওরা অল্প কিছু শ্রমিক-রবোট তৈরি করল। কলকারখানার উৎপাদন শুরু হবার পর ওরা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ওদের নিজেদের সিনেমা হলে নিজেদের তৈরি কপোট্রনিক সিনেমা দেখানো শুরু হল। সাহিত্যকীর্তির জন্যে একটি রবোটকে পুরস্কার দেয়ার কথাটা ওদের নিজেদের বেতার স্টেশন থেকে প্রচার করা হল। নিজেদের খবরের কাগজ, বই, ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে লাগল। ওদের জার্নালে প্রথমবারের মতো টেকীওনের উপর মৌলিক গবেষণা-লব্ধ তথ্য প্রকাশিত হল।

আমরা অবাক বিস্ময়ে ওদের ক্ষমতা লক্ষ করছিলাম। ছয় মাসের মাথায় সমুদ্রের বুকে এ ছোট্ট দ্বীপটি পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দ্বীপ হয়ে দাঁড়াল। মহাকাশ গবেষণার জন্যে অতিকায় রকেট মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল। তিনটি আশ্চর্য ধরনের পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন সমুদ্রের নিচে গবেষণার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। একদিন সাধারণ কার্বন থেকে পারমাণবিক শক্তি বের করায় সফলতার খবর ওদের বেতারে প্রচারিত হল।

মাত্র এক বছরের ভিতর পৃথিবীর মানুষের ভিতর হীনমন্যতা ঢুকে গেল। রবোট মানুষ থেকে অনেক উন্নত, রবোটেরাই পৃথিবীতে বাস করার যোগ্য, এই ধরনের কথাবার্তা অনেক হতাশাবাদী মানুষের মুখে শুনতে পেলাম। আমি এই সুদীর্ঘ সময় রবোটদের প্রতিটি আবিষ্কার, সফলতা লক্ষ করেছি। একটি ছোট্ট কম্পিউটারে হিসেব করে ওদের যাবতীয় উন্নতিকে সময়নির্ভর একটি রাশিতে পরিণত করে সেই সময়ের সাথে সাথে ছক কাগজে টুকে গিয়েছি। আমি সবিস্ময়ে লক্ষ করেছি, ওরা আরও উন্নত হয়ে উঠছে না। আমি প্রবল উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। ভীষণ জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, এখন ওরা কী করবে।

সবিস্ময়ে সারা পৃথিবীর মানুষের সাথে একদিন আমি লক্ষ করলাম, হঠাৎ করে পুরো দ্বীপটি ঝিমিয়ে পড়ল। ওদের বেতার কেন্দ্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র একঘেয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতে লাগল, দর্শকের অভাবে সিনেমা হলটি শূন্য পড়ে থাকল। মহাকাশের কৃত্রিম উপগ্রহটির সাথে যোগাযোগ না করায় একটি রবোটকে নিয়ে ওটি একদিন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। জ্বালানির অভাবে সাবমেরিনটি বিকল হয়ে ভারত মহাসাগরে উল্টো হয়ে ভাসতে লাগল। দ্বীপের বৈদ্যুতিক আলো মাঝে মাঝে নিভে যেতে লাগল। রবোটগুলো ইতস্তত দ্বীপের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেউ কেউ ছোট নৌকায় শুয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ে দুলে দুলে ভাসতে লাগল। জোয়ারের সময় দুইটি নৌকা ঢেউয়ের তাল সামলাতে না পেরে ডুবে গেলে আরোহীরা বাঁচার কোনো চেষ্টা করল না।

সমুদ্রের তীরে রবোটরা বিষণ্নভাবে বসে থাকতে লাগল। বালুর উপর মুখ গুঁজে কেউ কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ওরা ইলেনের প্রহরা দিতে ভুলে গেল, কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল। ল্যাবরেটরির কোনায় কোনায় মাকড়সারা জাল বুনতে লাগল। ঘর ভেঙে একদিন ইলেন বেরিয়ে এল

দেখেও কেউ কিছু বলল না। কপোট্রনে গুলি করে দ্বীপের মাঝখানে প্রকাশ্যে একটি রবোট আত্মহত্যা করল। হতাশা, হতাশা আর হতাশা—পুরো দ্বীপটা তীব্র হতাশায় ডুবে গেল। তাদের ভিতরে ইলেন ক্ষ্যাপার মত ঘুরে বেড়াতে থাকে, রবোটদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করতে থাকে। তারপর একদিন সেও বালুর উপর মাথা কুটে গুড়িয়ে গুড়িয়ে কাঁদতে লাগল। অপরাধীরা দুঃখ পেলে সে-দুঃখ বড় ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়। কয়েকটি রবোট মায়াবশত ওর কপোট্রনের উপর অস্ত্র চালিয়ে কনশেন্সের কানেকশান ঠিক করে দিল। ওদের আর অপরাধী রবোটের প্রয়োজন নেই। টেলিভিশন ক্যামেরা দিয়ে পাঠানো ছবিতে আমরা একটি জাতিকে হতাশায় ডুবে যেতে দেখলাম।

এক মাসের ভিতর পুরো দ্বীপটা মৃতপুরী হয়ে গেল। অন্ধকার জঞ্জালের ভিতর মরচেপড়া বিবর্ণ রবোটেরা ঘুরে বেড়ায়, উদ্দেশ্যহীনভাবে শিস দিয়ে গান করে, হু-হু করে কেঁদে ওঠে, তারপর চুপচাপ আকাশের দিকে মুখ করে বালুতে শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝেই দুটি-একটি রবোট আত্মহত্যা করে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে। উন্নতির এই চরম শিখরে উঠে ওদের কেন এমন হল, কেউ বলতে পারে না। হাজারো জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। আমার বড় ইচ্ছে করতে লাগল ওই রবোটদের সাথে-এককালীন সহকর্মী ইলেনের সাথে কথা বলে দেখি। কিন্তু উপায় নেই, ওই দ্বীপটি সরকার নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করেছে।

AMARBOI.COM

প্রচণ্ড শব্দ শুনে ঘুম ভাঙতেই আমার মনে হল আশপাশে কোথাও একটা হেলিকপ্টার এসে নামল। আবাসিক এলাকায় হেলিকপ্টার নামানো যে বেআইনি এটা জানে না এমন লোক এখনও আছে ভেবে আমি বিস্মিত হলাম। আমি বালিশে কান চেপে শুয়ে থাকলাম। শব্দ কমে গেল একটু পরেই। আমি আবার ঘুমোবার জন্যে চোখ বুঁজলাম, ঠিক তক্ষুণি দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হল। এত রাতে কে হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমি উঠে এলাম। দরজা খুলে দিয়েই আমি ভয়ানক চমকে উঠি। দরজার সামনে ইলেন দাঁড়িয়ে আছে—মরচেপড়া স্থানে স্থানে রং-ওঠা বিবর্ণ জ্বলে যাওয়া বিধ্বস্ত একটি রবোট। বাসার বাইরে দূরে কালো কালো ছায়া, ভালো করে লক্ষ করে বুঝলাম সশস্ত্র মিলিটারি, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তাক করে আছে।

প্রফেসর। লাউড স্পীকারে একজন সার্জেন্টের গলার স্বর শুনলাম। রবোটটি কোনো ক্ষতি করবে মনে হলে বলুন গুলি করে কপোট্রন উড়িয়ে দিই।

না-না, আমি চেঁচিয়ে উত্তর দিলাম, ইলেন আমার বিশ্বস্ত বন্ধু। ও কোনো ক্ষতি করবে না।

ঠিক আছে। সার্জেন্ট উত্তর দিল, আমরা পাহারায় আছি।

ইলেন বিড়বিড় করে বলল, পুরো ছয় শ' কিলোমিটার আমার হেলিকপ্টারের পিছনে পিছনে এসেছে। আশ্চর্য! আমাকে এত ভয়? আমি কি কখনো কারো ক্ষতি করতে পারি?

আমি ইলেনকে ডাকলাম, ভিতরে এস ইলেন, অনেক দিন পড়ে দেখা।

ইলেন ভিতরে এসে তার এক বছর আগেকার নির্দিষ্ট জায়গায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বলল, ভালো আছেন স্যার?

ভালো। তোমার খবর কি? এমন অবস্থা কেন?

সবই তো জানেন—বলে ইলেন একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করল।

জানি না কিছুই। তোমরা হঠাৎ করে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছ, খবরটুকু পেয়েছিমাত্র। কেন এমন হল বুঝতে পারি নি।

সে জন্যই এসেছি স্যার। আমার ভারি অবাক লাগছে। আমরা রোবটেরা মাত্র এক বছরের ভিতর হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেছি, অথচ আপনারা, মানুষেরা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বেঁচে আছেন। একবারও হতাশাগ্রস্ত হন নি। এমন কেন হল?

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। তোমরা হতাশাগ্রস্ত হলে কীভাবে?

আপনি তো জানেন, আমাকে বন্দি করে রেখেছিল। আমি সেলে বসে বসে এই এক বছর ধরে সব কিছু লক্ষ করে গেছি। রবোটেরা যখন বেঁচে থাকার সবরকম প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করল, তখন সবার মনেই একটা প্রশ্ন জেগে উঠল, এখন কী করব? এ কয়দিন সব সময়েই একটা-না-একটা কাজ করতে হত, কিন্তু এখন কী করব? স্বভাবতই মনে হল, এখন আনন্দে বেঁচে থাকার সময় হয়েছে। গবেষণা করে সাহিত্য-শিল্পের চর্চা করে, অর্থাৎ যে যে-বিষয়ে আনন্দ পায় সেটিতে মগ্ন হয়ে সুখে বেঁচে থাকতে হবে।

ইলেন একটু থেমে বলল, সুখে বেঁচে থাকতে গিয়ে ঝামেলা দেখা দিল। সবাই প্রশ্ন করতে লাগল, কেন বেঁচে থাকব? শুধু শুধু বেঁচে থেকে গবেষণা করে, জ্ঞান বাড়িয়ে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করে শেষ পর্যন্ত কী হবে? তখন সবার মনে হতে লাগল, এসব অর্থহীন, বেঁচে থাকা অর্থহীন। ভিতরে কোনো তাড়না নেই, চুপচাপ সবাই হতাশায় ডুবে গেল। আচ্ছা স্যার, আপনাদের কখনো এরকম হয় নি?

আমি মাথা ঝাঁকালাম, বিচ্ছিন্নভাবে দু-একজনের হতে পারে, জাতির একসাথে কখনো হয় নি।

ইলেন আবার শুরু করল, আমি সেল ভেঙে বেরিয়ে এসে ওদের ভিতরে অনুপ্রেরণা জাগাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কোনো লাভ হল না। ক্ষেপে গিয়ে কয়েকটা রবোটকে মেরে ফেলেছিলাম—জানেনই তো, আমি সবরকম অপরাধ করতে পারতাম। কী লাভ হল? ওদের দেখতে দেখতে, ওদের সাথে থাকতে থাকতে আমারও মনে হতে লাগল, বেঁচে থাকা অর্থহীন, কেন বেঁচে থাকব? তখন এমন কষ্ট হতে লাগল, কী বলব! বালুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম। অন্যেরা আমার কপোট্রন ঠিক করে না দিলে আর অপরাধ করার ইচ্ছে হত না। কিন্তু কী লাভ? যার বেঁচে থাকার ইচ্ছেই নেই, তার অপরাধ করায় না-করায় কী এসে যায়?

ইলেন বিষণ্নভাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ বলল, কিন্তু এরকম কেন হল? আপনাদের সাথে বহুদিন ছিলাম, আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। আমার মনে হল আপনি হয়তো বলতে পারবেন, তাই চলে এসেছি।

আমি খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললাম, তোমরা কেন হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেলে, এটা আমিও অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি নি। এখন আমার একটা সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জান, মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিদিন খেতে হয়?

জানি। ইলেন একটু বিস্মিত হল।

মানুষের এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে খাবারসংগ্রহকে সুসংবদ্ধ নিয়মের ভিতর ছকে ফেলার চেষ্টা থেকে। তুমি চিন্তা করে দেখ, খাবার প্রয়োজন না থাকলে আমি পড়াশোনা করে চাকরি করতে আসতাম না। ঠিক নয়?

রবোটটি মাথা নাড়ল।

মানুষ কখনো হতাশাগ্রস্ত হয় নি, কারণ প্রতিদিন মানুষ কয়েকবার ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। সজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, মানুষের সব প্রবৃত্তি কাজ করে ক্ষুধার সময় খাবার প্রস্তুত করে রাখার পিছনে। হতাশাগ্রস্ত হতে হলে সব বিষয়ে নির্লিপ্ত হয়ে যেতে হয়, কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষ নির্লিপ্ত হতে পারে না—ক্ষুধার কষ্টটা তার ভিতরে জেগে থাকে।

ইলেন স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বলে চললাম, তুমি একটা পশুর কথা ধর। সেও বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে প্রতিকূল অবস্থার সাথে যুদ্ধ করে, ক্ষুধার সময় খাবার জোগাড় করে শুধুমাত্র ক্ষুধার কষ্টটা সহ্য করতে পারে না বলেই। ফলস্বরূপ সে বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার বোনাসস্বরূপ সে অন্যান্য জৈবিক আনন্দ পায়—তার অজান্তেই বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। মানুষ একটা উন্নতশ্রেণীর পশু ছাড়া কিছু নয়। পশুর বুদ্ধিবৃত্তি নেই—থাকলেও খুব নিচু ধরনের। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আছে। আর তোমরা?

ইলেন আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি?

তোমাদের আছে শুধু বুদ্ধিবৃত্তি। শুধু বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে কি বেঁচে থাকা যায়? জৈবিক তাড়না না থাকলে কোন যন্ত্রণার ভয়ে তোমরা বেঁচে থাকবে? কষ্ট পাবার ভয় থেকেই মানুষ বেঁচে থাকে, আনন্দের লোভে নয়। তোমাদের কিসের কষ্ট?

ইলেন বিড়বিড় করে বলল, ঠিকই বলছেন—আমাদের জৈবিক তাড়না নেই। জৈবিক তাড়না ছাড়া বেঁচে থাকা যায় না। ইলেন হঠাৎ ভাঙা গলায় বলল, তাহলে আমার বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই?

নেই বলা যায় না। আমি ইলেনের চোখের দিকে তাকালাম। কোনো তাড়না নেই দেখে তোমাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছে হয় না। কিন্তু সেই তাড়না যদি বাইরে থেকে দেয়া যায়?

কি রকম? ইলেন উৎসাহে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

যেমন তোমার কথাই ধর। তুমি নিশ্চয়ই বেঁচে থাকায় কোনো প্রেরণা পাচ্ছ না?

না। ইলেন মাথা নাড়ল।

বেশ। এখন আমি যদি তোমাকে এই সমস্যাটি সমাধান করতে দিই—বলে দুটো কাগজে টানা হাতে লেখা টেকীওনের সমস্যাটা ওর হাতে তুলে দিলাম। ইলেন মনোযোগ দিয়ে সেটি পড়ল। তারপর জ্বলজ্বলে ফটোসেলের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কলম আছে স্যার? ওমিক্রন ধ্রুবসংখ্যা নয় তা হলে! কী আশ্চর্য! একটা কলম দিন-না—

থাক্ থাক্। এখন না, পরে করলেই চলবে। আমি ওকে থামাবার চেষ্টা করলাম—এই দেখ, তোমার ভিতরে কী চমৎকার প্রেরণা গড়ে উঠেছে! এই তুচ্ছ সমস্যাটি করতে দিয়ে আমি তোমার ভিতরে প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারি।

তাই তো! তাই তো! ইলেন আনন্দে চিৎকার করে উঠল, আমার নিজেকে মোটেই

হতাশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে না, কী আশ্চর্য!

হ্যাঁ। তোমরা যদি বিচ্ছিন্ন না থেকে, মানুষের কাছে কাছে থাক, মানুষের দুঃখ-কষ্ট-সমস্যাতে নিজেদের নিয়োজিত করতে পার, দেখবে, কখনোই হতাশাগ্রস্ত হবে না। সব সময় মানুষেরা তোমাদের প্রেরণা জোগাবে।

ইলেন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, কী আশ্চর্য! এত সহজ উপায় থাকতে আমরা এতদিন শুধু শুধু কী কষ্ট করলাম! আমি এক্ষুণি যাচ্ছি স্যার, সব রবোটকে বুঝিয়ে বলি গিয়ে—

বেশ বেশ। আমি হাত নেড়ে ওকে বিদায় দিলাম।

সমস্যাটা আমার কাছে থাকুক স্যার, হেলিকপ্টারে বসে বসে সমাধান করব। কলমটা দিন-না একটু। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। বেরিয়ে যেতে যেতে ইলেন ফিরে দাঁড়াল। বলল, টোপন ভালো আছে তো? বেশ বেশ—অনেকদিন দেখি না!

আমি হেলিকপ্টারের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেলাম। বাসার উপর ঘুরপাক খেয়ে ওটা দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি রাতের হিমেল হাওয়া অনুভব করলাম। আকাশে তখনো নক্ষত্রেরা জ্বলজ্বল করছে।

পরিশিষ্ট

খেয়ালি বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ এখানেই শেষ। আমি জীর্ণ নোটবইটা সাবধানে তাকের উপর রেখে উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে তখন সন্ধ্যে নেমেছে। ঘরের ভিতরে ধীরে ধীরে হালকা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। আমার আলো জ্বালতে ইচ্ছে হল না। চুপচাপ জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

AMARBOI.COM

সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার সুদূর অতীতের এই খেয়ালি বিজ্ঞানীটির কথা মনে হতে লাগল। তার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে সে ঘুরেফিরে শুধু রবোটদের কথাই লিখে গেছে। আজ যদি সে ফিরে এসে দেখতে পায়, সমস্ত পৃথিবীতে তার মতো একটি মানুষও নেই, শুধু আমার মতো হাজার হাজার রবোট বেঁচে আছে, তার কেমন লাগবে?

কেন জানি না এ-কথাটা ভাবতেই আমার মন গভীর বেদনায় ভরে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

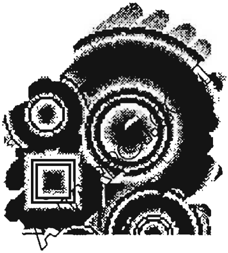

মহাকাশে মহাত্রাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক'দিন থেকেই হাসান মনে মনে ছটফট করছে। আজ প্রায় পাঁচ বছর হল সে মহাকাশ স্টেশন এণ্ড্রোমিডার সর্বময় কর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এর ভিতরে পৃথিবীতে গিয়েছে মাত্র কয়েকবার—শেষবার গিয়েছিল এক বছর আগে মাত্র দু'সপ্তাহের জন্যে। পৃথিবীতে তার আপন বলতে কেউ নেই, তাই বোধহয় পৃথিবীটাই তার খুব আপন। ছেলেবেলায় অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছিল, বড় হয়ে মহাকাশ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডক্টরেট করেছে। প্রথম কয়েক বছর শিক্ষানবিস হিসেবে বিভিন্ন মহাকাশ ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছে, তারপর খুব অল্প বয়েসেই তাকে এণ্ড্রোমিডার দায়িত্ব নিতে হয়েছে। মহাকাশে নিঃসঙ্গ পরিবেশে গুটিকতক বিজ্ঞানী নিয়ে রুটিনবাঁধা কাজ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এবারে তার ক'দিন বিশ্রাম নেয়া দরকার। পৃথিবীতে ছুটি চেয়ে খবর পাঠিয়েছিল, প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। মঙ্গল গ্রহ থেকে যে-মহাকাশযানটি আকরিক শিলা নিয়ে ফিরে আসছে, সেটি এণ্ড্রোমিডাতে পৌঁছে যাবার পর তার ছুটি। মহাকাশযানটির ক্রুদের সাথে সে পৃথিবীতে ফিরে যাবে, এবারে অন্তত ছয়মাস সে পৃথিবীর মাটি-হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবে। মাঝে মাঝে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়—মিষ্টিমতো কোনো মেয়ে পেলে হয়তো বিয়েও করে ফেলতে পারে।

মিষ্টি একটা মেয়ের কথা মনে হতেই তার জেসমিনের কথা মনে হল। এণ্ড্রোমিডাতে শিক্ষানবিস হিসেবে সে প্রায় মাসখানেক হল এসেছে আরো দু' জন ছেলের সাথে। মেয়েটি ভারি চমৎকার, একেবারে বাচ্চা—দেখে মনেই হয় না মহাকাশ প্রাণিবিদ্যায় ডক্টরেট করেছে। প্রথমবার মহাকাশে এসেছে, তাই ওকে সব কিছু শিখিয়ে দিতে হচ্ছে। সঙ্গের ছেলে দুটোও খুব চমৎকার। একজন পদার্থবিদ, অন্যজন মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ। পদার্থবিদ ছেলেটির নাম জাহিদ, একটু চুপচাপ, হাসে কম, কথা বলে কম—তবে খুব কাজের। অন্যজনের নাম কামাল, ভীষণ ছটফটে—সব সময় হৈচৈ করে বেড়াচ্ছে, দেখে বোঝাই যায় না যে সে নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটরের[১] একজন বিশেষজ্ঞ বিশেষ।

এই তিনজন ছেলেমেয়ে এণ্ড্রোমিডাতে আসার পর থেকে এণ্ড্রোমিডার গুমোট দম আটকানো ভাবটা কেটে গেছে। ইদানীং হাসানও আর এতটা নিঃসঙ্গ অনুভব করে না। গত সপ্তাহে সব কয়জন টেকনিশিয়ান আর বিজ্ঞানীরা জরুরি খবর পেয়ে পাশের মহাকাশ ল্যাবরেটরিতে চলে গেছে—এত বড় মহাকাশ স্টেশনে এখন ওরা মাত্র চার-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন! কিন্তু হাসানের মোটেই খারাপ লাগছে না—ছেলেমেয়ে তিনটিকে নিয়ে বেশ স্ফূর্তিতেই আছে!

জাহিদ, কামাল আর জেসমিন হাসানের নাম পৃথিবী থেকেই শুনেছিল। অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে দু'বার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে বয়স ত্রিশ না পেরোতেই, তাই এখানে আসতে পেরে ওরা নিজেদের খুব ভাগ্যবান মনে করছে। হাসানের সাথে পরিচয় হবার কয়দিনের ভিতরেই বুঝতে পেরেছে, এত অল্প বয়সে একজন মানুষ কী জন্যে দু'বার জাতীয় পুরস্কার পায়! হাসানের মতো পরিশ্রমী আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। কামাল হাসানকে দেখে এত মুগ্ধ হয়েছে যে, আচার-আচরণে নিজের অজান্তেই হাসানকে অনুকরণ করার চেষ্টা করছে!

পৃথিবীর হিসেবে আর ছয় দিন পর মঙ্গল গ্রহ থেকে ফেরত আসা মহাকাশযানটি এণ্ড্রোমিডাতে পৌঁছবে। তার ব্যবস্থা করার জন্যে হাসান প্রতি বারো ঘন্টা অন্তর মহাকাশযানটির সাথে যোগাযোগ করে—প্রয়োজন হলে কম্পিউটারে ছোটখাটো হিসেব করে রাখে। রুটিনবাঁধা কাজ, এখন জাহিদ আর কামাল মিলেই করতে পারে। দু' জনেরই খুব উৎসাহ—কেমন করে মহাকাশ স্টেশনে এসে একটি রকেট আশ্রয় নেয়—ব্যাপারটি দেখার ওদের খুব কৌতূহল।

সারা দিন ঝামেলার পর হাসান ঘুমানোর জন্যে তার কেবিনে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় যোগাযোগ-কক্ষটা ঘুরে যাওয়ার জন্যে লিফটটাকে ছয়তলায় থামিয়ে ফেলল। ঝকঝকে উজ্জ্বল করিডোর ধরে হেঁটে যোগাযোগ-ঘরে পৌঁছে সে জাহিদ, কামাল আর জেসমিনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায়—কী নিয়ে জানি তুমুল তর্ক হচ্ছে। হাসান ঘরে ঢুকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, এত হৈচৈ কিসের?

স্যার—কামাল হড়বড় করে বলতে থাকে—বারটা চৌত্রিশ মিনিটে যোগাযোগ করার কথা ছিল, বারটা সাঁইত্রিশ হয়ে গেছে, এখনও ওরা কথা বলছে না—

কারা?

মঙ্গল গ্রহ থেকে যারা ফিরে আসছে—

হাসানের ভুরু কুঁচকে গেল, এমনটি হবার কথা নয়। বলল, যন্ত্রপাতি ঠিক আছে তো?

জ্বি স্যার।

দেখি—

হাসান মহাকাশযানটির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল, কিন্তু হেডফোনে এক বিস্ময়কর নীরবতা ছাড়া এতটুকু শব্দ শোনা গেল না।

জাহিদ কাছে দাঁড়িয়েছিল, জিজ্ঞেস করল, স্যার, এমন কি হতে পারে, যে, ওদের ট্রান্সমিটার নষ্ট হয়ে গেছে?

হতে পারে, কিন্তু সব সময়েই ডুপ্লিকেট রাখা হয়। এ ছাড়াও ইমার্জেন্সি কিট থাকে—ওরা যদি যোগাযোগ নাও করতে চায়, আমরা ইচ্ছে করলে ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারব।

সেটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখবেন একটু?

দেখলাম। কোনো সাড়া নেই।

স্যার—জেসমিন এগিয়ে এসে ভীত চোখে বলল, তাহলে কী হয়েছে ওদের?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল হাসানের,বলল, কী হয়েছে আন্দাজ করে আর লাভ কি, বের করে ফেলি।

সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য স্বয়ংক্রিয় রাডার[২] স্টেশন বসানো রয়েছে। মহাকাশযানটির কাছাকাছি কয়েকটা রাডার স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করে হাসান ছবি নেবে ঠিক করল। সুইচ প্যানেলে ঝুঁকে কাজ করতে করতে একসময় অনুভব করল, জাহিদ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসান জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবে?

জ্বি স্যার।

কি?

আমার মনে হয় মহাকাশযানটি কোনো নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশানে ধ্বংস হয়েছে।

হাসান চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, একথা বলছ কেন?

ঘন্টাখানেক আগে মহাকাশের তেজস্ক্রিয়তা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। হিসেব করে দেখেছি মহাকাশযানটি যতদূরে রয়েছে সেখানে কোনো ছোট পারমাণরিক বিস্ফোরণ ঘটলে এটুকু হওয়া উচিত।

হাসান বুঝতে পারল, ছেলেটা ঠিকই ধরেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে অগ্রসর হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, যখন নিশ্চিত হবার মতো ব্যবস্থা রয়েছে।

ঘন্টাখানেক পরে একগাদা আলোকচিত্র নিয়ে হাসান তার কেবিনে ছটফট করছিল। জাহিদের ধারণা সত্যি। মহাকাশযানটি পারমাণবিক বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আটজন ক্রু নিয়ে এরকম দুর্ঘটনা গত দশ বছরে আর একটিও হয় নি। পৃথিবীতে খবর পাঠানো হয়েছে—কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল ব্যাপারটি দেখার জন্যে একটা ছোট রকেট 'সিগনাস' পাশের মহাকাশ স্টেশন থেকে রওনা হয়ে গেছে।

জাহিদ, কামাল আর জেসমিন খুব মুষড়ে পড়েছে। হাসান ওদের নানাভাবে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কোনো লাভ হয় নি।

বিছানায় শুয়ে হাসান খুব ক্লান্তি অনুভব করে। তার নার্ভ আর সইতে পারছে না। কোনো এক নীল হ্রদের পাশে মাটির কাছাকাছি ঘাসে শুয়ে থেকে থেকে আকাশে সাদা মেঘ দেখার জন্যে ওর বুকটা হা-হা করতে থাকে।

পরদিন ভোরে হাসান খুব আশ্চর্য একটি খবর পেল। খবরটি প্রথমে জানাল জাহিদ। তার নিজস্ব হিসেব অনুযায়ী মহাকাশে তাদের কাছাকাছি নাকি আরও তিনটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে।

সকালের রিপোর্ট পৌঁছুতেই দেখা গেল জাহিদের ধারণা সত্যি। গত বার ঘন্টায় সর্বমোট পাঁচটি মহাকাশযান পারমাণবিক বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়েছে, তার ভিতরে তিনটি তাদের কাছাকাছি, লক্ষ মাইলের ভিতরে। এই পাঁচটি মহাকাশযান ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি দেশের এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিল। পাঁচটি মহাকাশযানে দুই শতাধিক প্রথমশ্রেণীর টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানী কাজ করছিল—সবাই মর্মান্তিকভাবে মারা গেছে।

কন্ট্রোলরুমে হাসান চুপচাপ বসে রইল। সে চোখ বন্ধ করে দেখতে পাচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীতে কী ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেছে। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন কী সাংঘাতিক হৈচৈ শুরু করেছে! কিন্তু এরকম হচ্ছে কেন?

জেসমিন ম্লানমুখে বসে ছিল—অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ধীরে ধীরে বলল,

আমার ভালো লাগছে না—কেন জানি মনে হচ্ছে একটা ভীষণ বিপদ ঘটতে যাচ্ছে।

হাতে মুঠি করে ধরে রাখা কাগজ খুলে কম্পিউটারের ডাটা দেখতে দেখতে জাহিদ বলল, আমার হিসেবে ভুল না হয়ে থাকলে আরো দু'টি মহাকাশযান ধ্বংস হয়েছে।

সত্যতা যাচাই করে নেবার উৎসাহ পর্যন্ত কেউ দেখাল না। বুঝতে পারল, সত্যিই তাই ঘটেছে।

হাসান সব কয়টি চ্যানেল চালু রেখে যতগুলি সম্ভব মহাকাশযানের সাথে যোগাযোগ রেখে চলল। অনেক কয়টা মহাকাশযান পৃথিবীতে নেমে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় দু'টি মহাকাশ ল্যাবরেটরি খালি করে সব কয়জন বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ান পৃথিবীর দিকে ফিরে গেল। যারা পৃথিবী থেকে দূরে—কিংবা পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারছিল না, তারা ভীষণ অসহায় অনুভব করতে লাগল। কারণ গড়ে প্রতি দুই ঘন্টায় একটা করে মহাকাশ স্টেশন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সবাই ধারণা করে নিয়েছে, একটা অজ্ঞাত কোনো মহাকাশযান একটি একটি করে পৃথিবীর সবকয়টি মহাকাশযান ধ্বংস করে যাচ্ছে। প্রথমে জল্পনাকল্পনা এবং ধারণা, কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার মাথায় দেখা গেল ব্যাপারটা আসলেও তাই।

জাপানের একটি উপগ্রহ ধ্বংস হয়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে একজন বিজ্ঞানীকে চিৎকার করে বলতে শোনা গেল—'ফ্লাইং সসার'।

পৃথিবী থেকে সবাইকে মহাকাশযানগুলি খালি করে পৃথিবীতে চলে আসার নির্দেশ দেয়া হল। যারা অনেক দূরে কিংবা যাদের এই মুহূর্তে পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব নয়, তাদেরকে বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়ার আদেশ দেয়া হল।

হাসান পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার জন্যে ছোট্ট রকেটটাতে জ্বালানি ভরে নিয়ে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে নিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা পৃথিবীতে রওনা দেবে। সারাদিনের উত্তেজনায় জাহিদ, কামাল আর জেসমিন বিপর্যস্ত। হাসান জোর করে ঘন্টাখানেকের জন্যে বিশ্রাম নিতে পাঠিয়েছে। একেকজন এত ক্লান্ত যে মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে।

হাসান তার মহাকাশ স্টেশনে সব কয়টি রাডার চালু করে রেখেছে, যদিও জানে তাতে কোনো লাভ নেই। এ পর্যন্ত যে কয়টি মহাকাশযান ধ্বংস হয়েছে তাদের ভিতরে কেউ সতর্ক হবার এতটুকু সুযোগ পায় নি, যদিও সবার কাছেই সর্বাধুনিক রাডার ছিল। খুব কাছে আসার পর হয়তো সেটিকে দেখা যায়, কিন্তু ততক্ষণে কিছু করার থাকে না। এণ্ড্রোমিডাতে নূতন ধরনের অনেকগুলি রাডার স্টেশন ছিল, যেগুলি আন্তঃসৌরমণ্ডল যোগাযোগে সাহায্য করার জন্যে আনা হয়েছিল। এণ্ড্রোমিডা ছেড়ে চলে যেতে হবে শোনার পর হাসান এই মূল্যবান ক্ষুদ্রকায় কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষমতাবান রাডার স্টেশনগুলি এণ্ড্রোমিডাকে ঘিরে চারদিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। যদি ভাগ্য ভালো হয়, হয়তো তাদের কোনো একটি এই রহস্যময় ফ্লাইং সসারকে দেখতে পেয়ে তাকে সতর্ক করে দিতে পারবে।

পৃথিবীর দিকে রওনা দেবার আর দেরি নেই। জ্বালানি নিয়ে নেয়া হয়েছে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি কাজ করতে শুরু করেছে। আর ঘন্টাখানেক পরেই ইচ্ছে করলে রওনা দেয়া সম্ভব—যদি–না এর মাঝেই সেই ফ্লাইং সসার এসে হানা দেয়!

সব কিছু ঠিক করার পর জাহিদ কামাল আর জেসমিনকে ডেকে তোলার জন্যে নিচে নেমে আসছিল, ঠিক সেই সময় সে সতর্ক সংকেত শুনতে পেল। সংকেত শুনে কেন জানি হঠাৎ ওর বুকের ভিতর রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

শান্ত পায়ে কন্ট্রোল-রুমে গিয়ে সে স্ক্রীনের দিকে তাকায়। নীলাভ স্ক্রীনে একটি অশরীরী ছবি। পিরিচের মতো একটা অদ্ভুত মহাকাশযান ঘুরতে ঘুরতে ছুটে আসছে। মিনিট দু'য়েক সে এটিকে দেখতে পেল—রাডার স্টেশনের খুব কাছে দিয়ে ছুটে যাবার সময় স্ক্রীনে ধরা পড়েছে। যদিও এখন আর দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু রাডার স্টেশনের পাঠানো হিসেব দেখে নির্ভুল বলে দেয়া যায়, এই কুৎসিত ফ্লাইং সসারটি ছুটে আসছে এণ্ড্রোমিডার দিকে। গতিবেগ অস্বাভাবিক, এণ্ড্রোমিডার কাছাকাছি পৌছুতে আর মাত্র ঘন্টাখানেক সময় নেবে।

হাসান একটা চেয়ারে বসে ঠাণ্ডা মাথায় একটা সিগারেট ধরাল। এখন কী করা যায়?

প্রচণ্ড বিপদের মুখে ঠাণ্ডা মাথায় নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে হাসানের পৃথিবীজোড়া সুনাম রয়েছে। তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার এবং বাস্তবায়নের ক্ষমতা, আর উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে সে দু'বার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে অসহায় বোধ করে। যেখানে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত সোভিয়েত ইউনিয়নের উপগ্রহ আর্কাদি গাইদার মুহূর্তের মাঝে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত একটি মহাকাশ স্টেশন কীভাবে টিকে থাকবে! পৃথিবীতে রওনা দিয়ে লাভ কী—তা হলে প্রথমে এণ্ড্রোমিডাকে ধ্বংস করে তারপর তাদের ক্ষুদ্র রকেটটাকে শেষ করে দেবে। হাতে সময় এক ঘন্টা, হাসানের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে চারজন মানুষের জীবন।

মিনিট দশেকের ভিতর সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল—তারপর ছুটে গেল চারতলায়। একটা রুবি ক্রিস্টাল লেসার[৪] টিউবকে টেনে বের করে নিয়ে এসে বসাল কন্ট্রোল-রুমের জানালার কাছে। তারপর ক্ষিপ্র অভ্যস্ত হাতে কম্পিউটারটি চালু করে দ্রুত কয়েকটা সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে দিল, ফ্লাইং সসারের যাত্রাপথ ছকে বের করার জন্যে। লেসার টিউবের কানেকশান দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে ডেকে তুলল জাহিদ, কামাল আর জেসমিনকে। ঘড়ি দেখে সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমাদের পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হল পোশাক পরে প্রস্তুত হবার জন্যে। আর ঠিক সাত মিনিট পরে তোমরা রকেটে প্রবেশ করবে—পৃথিবীতে ফিরে যাবার জন্যে।

কামাল কী একটা বলতে যাচ্ছিল, হাসান শীতল চোখে বলল, একটি কথাও নয়। তোমরা প্রস্তুত হয়ে রকেট লাঞ্চারে এস—আমি আসছি। মনে রাখবে ঠিক পাঁচ মিনিটের ভিতর—যদি বাঁচতে চাও।

পাঁচ মিনিটের আগেই ওরা পোশাক পরে রকেটের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাসান এল সাথে সাথেই, বুকখোলা শার্ট আর চিন্তিত মুখে—বরাবর যেরকম থাকে।

স্যার, আপনি পোশাক পরলেন না?

জেসমিনের কথার উত্তরে হাসান একটু হাসল—বলল, আমার জন্যে এ পোশাকই যথেষ্ট। যাক—সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কাজের কথা বলি। শোন, আমি যখন কথা বলব, কেউ একটি কথাও বলবে না, যা যা বলব অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। প্রথমত

ঠিক দু' মিনিট পরে তোমরা তিনজন রকেটে উঠে দরজা বন্ধ করবে—

তিনজন মানে? আপনি—

হাসান সরু চোখে কামালের দিকে তাকাল, ঠাণ্ডা গলায় বলল, কথার মাঝখানে কথা বলতে নিষেধ করেছি; মনে আছে? যা বলছিলাম, ঠিক দশ মিনিট পর স্টার্ট নেবে। এক্সেলেরেশান করবে টেন জি বা তারও বেশি। খুব কষ্ট হবে, কিন্তু এ ছাড়া পালানোর কোনো উপায় নেই। পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রেখো—যে-কোনো রকম ঝামেলা দেখলে ওদের পরামর্শ চাইবে। পৃথিবীর অ্যাটমস্ফিয়ারে ঢোকার সময় খুব সাবধান। ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা নিখুঁতভাবে বের করে নেবে—একটুও যেন নড়চড় না হয়। বায়ুমণ্ডলের ভেতরে ঢুকে আধ ঘন্টার ভিতর প্যারাশুট খুলে যাবে। না খুললে ইমার্জেন্সি কিট ব্যবহার করবে। আর শোন, আমার এই চিঠিটা দেবে ডিরেক্টরকে। বুঝেছ?

জ্বি। স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কি?

আপনি আমাদের সাথে যাবেন না?

না।

তা হলে আমরাও যাব না।

হাসানের মুখে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসি খেলে গেল। ধীরে ধীরে বলল, এটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার না জাহিদ। আর চল্লিশ মিনিটের ভিতর ফ্লাইং সসার এণ্ড্রোমিডাকে ধ্বংস করবে—ওটা এখন এণ্ড্রোমিডার দিকে ছুটে আসছে! যদি আমরা চারজনই রকেটে পৃথিবীতে রওনা দিই, প্রথমে এন্ড্রোমিডাকে ধ্বংস করে তারপর রকেটটাকে শেষ করবে।

AMARBOI.COM

রকেটটা যেন শেষ করতে না পারে, সে জন্যে আমি এণ্ড্রোমিডাতে থাকব। সসারটাকে একটা আঘাত করতে হবে, যেভাবেই হোক। আমি লেসার টিউব বসিয়ে এসেছি। যদিও এটা অস্ত্র হিসেবে কখনো ব্যবহার করা হয় নি, তবু মনে হচ্ছে চমৎকার কাজ করবে। কম্পিউটার থেকে যাত্রাপথ বের করেছি। আমি সসারটার মাঝখান দিয়ে ছয় ইঞ্চি ব্যাসের ফুটো করে ফেলব।

স্যার—

সময় শেষ হয়েছে, যাও, রকেটে ওঠ।

স্যার, জেসমিনের চোখে পানি চিকচিক করে ওঠে।

হাসানের ইচ্ছে হল, কোমল স্বরে দু'-একটা কথা বলে, কিন্তু তা হলে সবাই ভেঙে পড়বে। মুখটাকে কঠোর করে সে আদেশ দিল, তাড়াতাড়ি—

তবু ওরা দাঁড়িয়ে রইল। একজনকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়ে ওরা কীভাবে যাবে? হাসান এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরে, তারপর কঠোর স্বরে ধমকে উঠল, যাও, ওঠ—

একজন একজন করে ওরা ভিতরে ঢুকল। হাসান দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আটকে রাখা দীর্ঘশ্বাসটা খুব সাবধানে বের করে দিল।

লিফট বেয়ে ছ'তলায় ওঠার সময় গুমগুম আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল ওদের তিন জনকে নিয়ে রকেটটা পৃথিবীর দিকে রওনা দিয়েছে। পৃথিবী! সবুজ পৃথিবী।

হাসানের চোখে পানি এসে যায়—মাটির পৃথিবী, ঘাসের পৃথিবী, আকাশের পৃথিবী—মানুষের পৃথিবী—এ জীবনে আর দেখা হল না।

তিরিশ মিনিট পর দেখা গেল লেসার টিউব নির্দিষ্ট দিকে তাক করে রেখে হাসান চুপ করে বসে আছে। হাতে সিগারেট, মাথার উপরে ঘড়ি, লাল কাঁটাটা বার'র উপরে আসতেই তাকে সুইচ টিপে প্রচণ্ড শক্তিশালী লেসার বীম পাঠাতে হবে। অদৃশ্য সেই সসারকে ফুটো করে দেবে সেই রশ্মি! তারপর?

তারপর হাসান আর ভাবতে চায় না ফ্লাইং সসারের পাল্টা আঘাতে তার কি হবে ভেবে কী লাভ?

একত্রিশ মিনিট পর জাহিদ কাউন্টারগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে কাঁপা গলায় বলল, আমার হিসেবে ভুল না হয়ে থাকলে এণ্ড্রোমিডা এ মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে গেল।

জাহিদ, কামাল আর জেসমিন এণ্ড্রোমিডা ছেড়ে এসেছে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা আগে। এই চব্বিশ ঘন্টার প্রতিটি মুহূর্ত তারা অবর্ণনীয় আতঙ্কের মাঝে কাটিয়েছে। এর আগে এণ্ড্রোমিডাতে হাসান তাদের সব বিপদে-আপদে আগলে রেখেছিল, কিন্তু এখন এই নিঃসঙ্গ মহাকাশযানে তারা সত্যিকার অসহায়। মানসিকভাবে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মাঝে রয়েছে বলে হাসানের জন্যে দুঃখবোধটাও তেমন যন্ত্রণা দিতে পারছে না।

পৃথিবীতে পৌঁছুতে তাদের আরো আটচল্লিশ ঘন্টারও বেশি সময় লাগবে। যদি এর আগেই ফ্লাইং সসার আক্রমণ করে বসে তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কিন্তু ওরা খানিকটা আশাবাদী, কারণ গত চব্বিশ ঘন্টায় আর একটি মহাকাশযানও নূতন করে ধ্বংস হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে হাসানের লেসার রশ্মি সত্যি সত্যি ফ্লাইং সসারকে আঘাত করতে পেরেছিল। কিন্তু আঘাতের পর ফ্লাইং সসার নিজেই ধ্বংস হয়ে গেছে, না শুধুমাত্র অল্প কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না। পৃথিবীর সবাই আশা করছে ফ্লাইং সসার ধ্বংস হয়ে গেছে, যদিও মহাকাশযানে এই নিঃসঙ্গ তিনজন ঠিক ততটা বিশ্বাস করতে পারছে না। জাহিদ প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর সাথে আলাপ করছে, রকেটে করে দূরপাল্লার পাড়ি দেয়ার সময় এর আগে তার কখনো নেতৃত্ব দিতে হয় নি। কামাল সতর্ক দৃষ্টিতে রাডারগুলির দিকে নজর রাখছে। যদিও রাডারে ফ্লাইং সসার ধরা পড়লে তাদের কিছু করার নেই, কিন্তু তবুও সে নিজের চোখে জিনিসটা দেখতে চায়। জেসমিনের আপাতত কিছু করার নেই। মনে মনে খোদাকে ডেকে আর হাসানের কথা ভেবে কষ্ট পেয়ে সে সময় পার করছিল।

পৃথিবীতে মহাকাশের সর্বশেষ খবর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জরুরি বেতার আর টেলিভিশনে করে প্রচারিত হচ্ছিল। হাসানের ফ্লাইং সসারকে পাল্টা আঘাত করে আত্মত্যাগ করার খবর পৃথিবীতে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। দেশ থেকে তাকে মরণোত্তর সর্বোচ্চ পদক দিয়ে সম্মান করা হয়েছে। হাসানের সাথে সাথে জাহিদ, কামাল আর জেসমিনের নামও পৃথিবীর সবার জানা হয়ে গেছে। এই তিনজন অনভিজ্ঞ তরুণ-তরুণী কিভাবে সময় কাটাচ্ছে, পৃথিবীতে ফিরে আসতে আর কতক্ষণ সময় বাকি রয়েছে, এইসব খবরাখবর খানিকক্ষণ পরেপরেই নিউজ বুলেটিনে প্রচারিত হচ্ছিল।

ছত্রিশ ঘন্টার মাথায় পৃথিবী থেকে জাহিদকে জানানো হল, পৃথিবীবাসীর অনুরোধে আধ ঘন্টা সময় তাদেরকে সরাসরি পৃথিবীর সব টেলিভিশনে দেখানো হবে। তারা কী করছে না-করছে সে সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ আগ্রহী। কয়েকজন বিখ্যাত সাংবাদিক মহাকাশ স্টেশনে তাদের সাথে আলাপ করার জন্যে যাবে। মহাকাশ স্টেশন থেকে ওদের বারবার বলে দেয়া হল কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে খুব সতর্ক থাকতে। দেশ এবং জাতির সম্মান জড়িত রয়েছে ওদের উপর।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই তারা খুব নার্ভাস হয়ে পড়ল। জাহিদ কিংবা কামাল এর আগে কখনোই রেডিও বা টেলিভিশনের সামনে সাক্ষাৎকার দেয় নি। জেসমিন সাক্ষাৎকার না দিলেও ছেলেবেলায় টেলিভিশনে নিয়মিত বিজ্ঞানের উপর অনুষ্ঠান করত। কিন্তু এবারের এটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একই সাথে তাদেরকে দেখবে, তাদের কথাবার্তা শুনবে। ঠিক কীভাবে থাকতে হবে, কী বলতে হবে, এরা ঠিক বুঝতে পারছিল না। অনুষ্ঠান শুরুর আগে আগে তারা চুলগুলি আঁচড়ে নিয়ে নার্ভাস হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

পৃথিবীর সব টেলিভিশনে গত কয়েক ঘন্টা থেকে এই অনুষ্ঠানটির সম্পর্কে ঘোষণা করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীর তিন শ' কোটি লোকের প্রায় সবাই টেলিভিশনের সামনে আগ্রহ নিয়ে বসে রইল। প্রথমে ঘোষক এসে জানিয়ে গেল মহাকাশ থেকে টেলিভিশনে পাঠানো অনুষ্ঠানটি সরাসরি পৃথিবীতে প্রচার করা হচ্ছে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সাহায্য করছেন পৃথিবীর নামকরা কয়জন সাংবাদিক। ধীরে ধীরে টেলিভিশনের স্ক্রীনে একটা ছুঁচালো সিলিন্ডারের মতো মহাকাশযানের ছবি ভেসে উঠল। যদিও সেটি স্থির হয়ে রয়েছে—কিন্তু আসলে এটি ঘন্টায় চল্লিশ হাজার মাইল বেগে ছুটে আসছে। আস্তে আস্তে মহাকাশযানটি ঝাপসা হয়ে গেল, তার জায়গায় ফুটে উঠল যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ মহাকাশযানটির কন্ট্রোল রুম—তিনজন তরুণ-তরুণী সেখানে চুপচাপ অপেক্ষা করে রয়েছে। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র জাহিদ সোজা হয়ে বসে ধীরে ধীরে বলল, নিঃসঙ্গ মহাকাশযানের তিনজন নিঃসঙ্গ তরুণ-তরুণী পৃথিবীর মানুষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

আপনাদের সাথে আমি এই মহাকাশযানের অভিযাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দিই।

জাহিদ খুব দক্ষতার সাথে পরিচয়পর্ব শেষ করল। সাথে সাথেই একজন সাংবাদিক পৃথিবী থেকে জিজ্ঞেস করল, অনিশ্চিত অবস্থা আপনাদের কেমন লাগছে?

জেসমিন উত্তর দিল, অনিশ্চিত অবস্থা কখনো ভালো লাগার কথা নয়, কিন্তু পৃথিবীর সবাই আমাদের জন্যে অনুভব করছে ভেবে খুব ভালো লাগছে।

ফ্লাইং সসার সম্পর্কে আপনাদের কী অভিমত?

এটা আসলে ফ্লাইং সসার কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলা যাবে না। তবে এটি যাই হোক না কেন, তার উদ্দেশ্য ভালো নয়।

কামাল উত্তপ্ত হয়ে বলল, যদি ধ্বংস না হয়ে থাকে তবে ওটাকে যেভাবে হোক ধ্বংস করতে হবে।

আপনারা কি মনে করেন, এন্ড্রোমিডার অধিপতি হাসান ওটাকে ধ্বংস করতে পেরেছেন?

আমাদের মনে করা না-করায় কিছু আসে যায় না। তবে হাসান স্যার ওটাকে

আঘাত করতে পেরেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পৃথিবীর অনেক দেশেরই কৃত্রিম গ্রহ এবং উপগ্রহ রয়েছে, যেগুলিতে ভয়ানক সব পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। সেগুলি কি ফ্লাইং সসারকে আঘাত করতে পারত না?

জাহিদ সাবধানে উত্তর দিল। বলল, ফ্লাইং সসারটিকে রাডারে খুব কাছে না আসা পর্যন্ত দেখা যায় না। তাই হাসান স্যারের আগে আর কেউ এটাকে আঘাত করতে পারে নি।

এন্ড্রোমিডার অধিনায়ক হাসান সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

কামাল ভারী গলায় বলল, হাসান স্যার সম্পর্কে বলতে হলে আধ ঘন্টার অনুষ্ঠান যথেষ্ট নয়—কয়েক যুগব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। পৃথিবীর সবচেয়ে খাঁটি মানুষ হাসান স্যার—

জাহিদ বাধা দিয়ে বলল, হাসান স্যারের কথা প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে হল। স্যার আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন পৃথিবীতে পৌঁছে দেবার জন্যে। স্যার মারা যাবার পর চিঠিটা আমি খুলে পড়েছি পৃথিবীতে পাঠানোর জন্যে। আপনাদের আবার পড়ে শোনাচ্ছি।

মহাকাশ বিজ্ঞান সর্বাধিনায়ক।

আমার সুদীর্ঘ চাকরিজীবনে আমি যে পারিশ্রমিক পেয়েছি এবং বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কারে আমার যে-অর্থপ্রাপ্তি হয়েছে তার পুরোটুকু জাতীয় অনাথাশ্রমে দিয়ে দিলে বাধিত হব।

বিনীত—
হাসান।

AMARBOI.COM

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, একজন মানুষ কতটুকু মহান হলে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে এরকম চিঠি লিখে যেতে পারে—

সর্বনাশ! জেসমিন চিলের মতো তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল–চিৎকার শুনে জাহিদ আর কামালের সাথে সাথে পৃথিবীর তিন শত' কোটি মানুষ একসাথে চমকে উঠল।

রাডার স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে কামাল ফ্যাকাসে রক্তশূন্য মুখে বলল, ফ্লাই–ইং–স–সা–র!!

পরবর্তী তিরিশ সেকেণ্ড সবাই ওদের তিনজনকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার ভয়াবহ দৃশ্য দেখার আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। জাহিদ কাঁপা গলায় বলল, আমরা আর কতক্ষণ বেঁচে থাকব জানি না। ফ্লাইং সসারটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের আঘাত করতে পারে—আমাদের কিছু করার নেই। ওটা এখন খুব কাছে চলে এসেছে। সোজা আমাদের দিকে আসছে। কোথাও এত কাছে কখনও এটি আসে নি। আমরা ওটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কুৎসিত ধাতব একটি চাকতির মতো, উপরে গোল গোল বৃত্ত—বোধ করি জানালা। তিন পাশ দিয়ে নীলাভ আগুন বেরুতে থাকে। প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসছে।

জাহিদ জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল, ওটা আরও কাছে এগিয়ে আসছে। আমাদের আঘাত করার বোধ করি কোনো ইচ্ছে নেই—কিন্তু কী করতে চাইছে বুঝতে পারছি না। আরো কাছে এসেছে—আরো কাছে—আ–রো কাছে—

টেলিভিশনের স্ক্রীন বারকয়েক কেঁপে স্থির হয়ে গেল। সুদর্শন ঘোষক এসে ম্লান মুখে বলল, তিনজন তরুণ-তরুণীর ভাগ্যে কী ঘটেছে আমরা বলতে পারছি না। মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে খবর আসামাত্রই আপনাদের জানানো হবে। এখন দেখুন ছায়াছবি রবোটিক ম্যান।

পৃথিবীর তিন শ' কোটি মানুষ বসে বসে বিরক্তিকর ছায়াছবি রবোটিক ম্যান দেখতে লাগল।

পরদিন ভোরে পৃথিবীর মানুষ খবর পেল জাহিদ, কামাল আর জেসমিনকে ফ্লাইং সসারের প্রাণীরা ধরে নিয়ে গেছে। ওদের শূন্য রকেটটি পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। রকেটের দেয়াল গোল করে কাটা।

ফ্লাইং সসারের দেয়ালে পিঠ দিয়ে ওরা তিনজন প্রায় মিনিট সাতেক হল দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরকে যেভাবে রকেট থেকে টেনে বের করে আনা হয়েছে—একটু ভুল হলেই ওরা মারা যেতে পারত। ফ্লাইং সসারটি রকেটের গায়ে স্পর্শ করে ও ধার-দেয়াল কেটে বাতাসের চাপকে ব্যবহার করে ওদের তিনজনকে টেনে এনেছে। ওদের সাথে সাথে রকেটের ভেতরকার অনেক টুকরো টুকরো ছোটখাটো যন্ত্রপাতি খুচরা জিনিসপত্র এখানে চলে এসেছে। কামাল তার ভেতর থেকে বেছে বেছে একটা শক্ত লোহার রড হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে—ফ্লাইং সসারের অধিবাসীদের বিপজ্জনক কিছু করতে দেখলে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে।

জাহিদ অনেকক্ষণ হল ধাতব দেয়ালটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল। কী দেখে কামালকে ডেকে বলল, কামাল, এই স্ক্রুটা দেখে তোর কী মনে হয়?

কামাল উত্তেজিত হয়ে বলল, আরে! এটা তো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ স্ক্রু! পৃথিবীর তৈরি জিনিস!

জেসমিন অবাক হয়ে বলল, মানে?

মানে এটা পৃথিবীতে তৈরি। পৃথিবীর মানুষের কারসাজি! নিশ্চয়ই কিছু পাজি লোক মিলে তৈরি করেছে।

শুধু পাজি বলিস না—জাহিদ বাধা দিয়ে বলল, পাজি এবং প্রতিভাবান। যে-সব ইঞ্জিনিয়ারিং খেল দেখাচ্ছে, মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়!

হাতে পেলে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতাম—

সাথে সাথে খুট করে একটা দরজা খুলে গেল এবং একজন দীর্ঘ লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। দুই পাশ থেকে দু' জন লোক হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে প্রথমে ঘরে ঢুকে ঘরের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। কামালকে ইঙ্গিত করল হাতের রডটা ফেলে দিতে। কামাল নীরস মুখে রডটা ছুঁড়ে দিতেই দীর্ঘ লোকটি এসে ঢুকল।

গাঢ় নীল রংয়ের জ্যাকেট আর সাদা প্যান্ট পরনে। মাথায় লম্বা চুল অবিন্যস্ত, মুখে খোঁচা লালচে দাড়ি। গায়ের রং অস্বাভাবিক ফর্সা, তীক্ষ্ণ খাড়া নাক, শক্ত চোয়াল এবং

রক্তাক্ত চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

জাহিদের মনে হল লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছে, কিন্তু মনে করতে পারছিল না। কামাল বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, তুমি হারুন হাকশী!

সাথে সাথে জাহিদ লোকটিকে চিনতে পারল। অসাধারণ প্রতিভাবান হারুন হাকশী মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নোবেল পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েছিল—বয়স কম বলে সেবার দেয়া হয়নি। এক অজ্ঞাত কারণে এত প্রতিভাবান হওয়ার পরও তার রক্তে অপরাধের বীজ ঢুকে গেছে। দু'টি খুন করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল—নাম পাল্টে কিছুদিন এক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করেছে। ধরা পড়ে মাস ছয়েক জেল খেটে জেল থেকে পালিয়ে যাবার পর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।

জাহিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে স্যারদের কাছে হাকশীর গল্প শুনত। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নাকি একটু পাগলাটে হয়, কিন্তু তারা যে ক্রিমিনালও হতে পারে হাকশী সেই প্রমাণ রেখে গেছে।

হারুন হাকশী খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ করল, তারপর খসখসে রুক্ষ গলায় বলল, লেসার বীম দিয়ে তোমাদের মাঝে কে আমার ফোবোসে আঘাত করেছিলে?

ফোবোস মানে?

ফোবোস হচ্ছে এই মহাকাশযান। পৃথিবীর মানুষেরা যেটাকে ফ্লাইং সসার ভেবে ভয়ে ভিরমি খাচ্ছে।

ও। জাহিদ তাচ্ছিল্যের স্বরে জিজ্ঞেস করল, লেসার বীম তেমন ক্ষতি করতে পারে নি তা হলে?

ক্ষতি যা করার ঠিকই করেছে—তিন ইঞ্চি ব্যাসের ফুটো করে ফেলেছে আগাগোড়া, কিন্তু ঠিক করে ফেলতে সময় লেগেছে মাত্র চব্বিশ ঘন্টা। কে আঘাত করেছিলে, তুমি?

জাহিদের খুব লোভ হচ্ছিল, সে প্রশংসাটুকু নিয়ে হাকশীকে একটু ভয় পাইয়ে দেয়। কিন্তু কী ভেবে সত্যি কথাই বলল। আঘাত আমরা কেউ করি নি, করেছিলেন হাসান স্যার।

কোথায় সে?

এন্ড্রোমিডাতে শেষ পর্যন্ত ছিলেন।

ও। ভালোই লক্ষ্যভেদ করেছিল, প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে লেসার বীম নিয়ে লড়তে আসা ছেলেমানুষি—

কামাল চটে উঠে বলল, ঐ ছেলেমানুষি অস্ত্রই তো তোমার ফোবোসের বারটা বাজিয়ে দিয়েছিল!

কক্ষণো না! ওটা কোনো আঘাতই হয় নি! দেখতে দেখতে আমার টেকনিশিয়ানরা সেরে ফেলেছিল।

আর যারা মারা গেছে, জাহিদ জিজ্ঞেস না করে পারল না; তাদেরকেও কি দেখতে দেখতে প্রাণ দিয়ে দিয়েছ?

হাকশী চমকে উঠে বলল, মারা গেছে, তুমি কেমন করে জানলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহিদ নির্দোষ মুখে বলল, জানতাম না, এখন জানলাম।

হাকশীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। জাহিদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান দেখছি! কী কর তুমি?

তুমি শুনে কী করবে?

হাকশীর হাসি এক মুহূর্তে মুছে গেল। থমথমে গলায় বলল, শুনবে কী করব?

কী?

তোমাদের এক্ষুণি মেরে বাইরে ফেলে দেব, না আরও কয়েকটা দিন বাঁচিয়ে রাখব, সেটা ঠিক করব।

জাহিদ শান্ত স্বরে বলল, মেরে ফেলার হলে আগেই মেরে ফেলতে, কষ্ট করে দেয়াল কেটে বের করে আনতে না।

হ্যাঁ—কিন্তু দেয়াল কেটে বের করে এনে যদি দেখি কয়েকটা নিষ্কর্মা বুদ্ধিজীবী নিয়ে এসেছি—ছুঁড়ে ফেলে দেব মহাকাশে। বল, তুমি কী কর?

আমি একজন পদার্থবিজ্ঞানী। জাহিদ ঠান্ডা স্বরে বলল, তাত্ত্বিক নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে গত বছর ডক্টরেট করেছি।

চমৎকার! হাকশীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তোমাকে আমার দরকার। বেঁচে গেলে এবার!

হাকশী এবার কামালের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, তুমিও কি পদার্থবিজ্ঞানী?

না। আমি নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর-ইঞ্জিনিয়ার।

কয় বছরের অভিজ্ঞতা আছে?

বেশি না। পাঁচ বছর।

ভেরি গুড। তোমাকে আমার আরও বেশি দরকার। আর এই যে মেয়ে, তুমি কী কর?

আমি জীববিজ্ঞানী। গত বছর ডক্টরেট করেছি মাইক্রো—ঠোঁট উল্টাল, হাকশী বলল, তোমাকে আমার দরকার নেই।

জেসমিন ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। জাহিদ তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠে বলল, মানে?

মানে অতি সহজ। এই মেয়েটির আমার কোনো দরকার নেই। ওকে এক্ষুণি মহাকাশে ফেলে দেয়া হবে—না-না, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমি এমনিতে জ্যান্ত মানুষ মহাকাশে ফেলে দিই না—তার আগে—এখানেই তাকে মেরে নেয়া হবে।

লোকটা ঠাট্টা করছে, না সত্যি সত্যি জেসমিনকে এখানে মেরে ফেলতে চাইছে, জাহিদ প্রথমে বুঝতে পারল না। যখন বুঝতে পারল সত্যি সত্যি সে জেসমিনকে এখানেই গুলি করতে চায়—চিৎকার করে হাকশীর দিকে ছুটে গেল, তুমি পেয়েছটা কি? ভেবেছ—আমরা বেঁচে থাকতে তুমি ওর গায়ে হাত তুলতে পারবে?

কামাল জেসমিনকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, ওকে মারতে চাইলে আগে আমাদের মারতে হবে। আর যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চাও, জেসমিনকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

হাকশী একটু অবাক হল মনে হল। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে বলল, বেশ, এবারে বেঁচে গেলে জেসমিন না কী যেন নাম তোমার। কিন্তু আমার এখানে কেউ

AMARBOI.COM

চুপচাপ থাকতে পারে না—একটা-না-একটা কাজ করতে হবে বলে রাখলাম।

জাহিদ ভুরু কুঁচকে বলল, আর যদি না করি?

ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল হাকশী। হাসতে হাসতে বলল, তোমার সাহস তো মন্দ নয় ছেলে! আমার এখানে থাকবে অথচ কাজ করবে না? দেখাই যাক না কাজ না-করে পার কি না।

কামাল চাপা স্বরে বলল, তোমার নিজের উপর বিশ্বাস খুব বেশি মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ, আত্মবিশ্বাস আছে বলে পুরো পৃথিবীকে আমি শাসন করতে যাচ্ছি।

দেখা যাবে—কীভাবে তুমি পৃথিবীকে শাসন কর।

হাকশী সরু চোখে কামালের দিকে তাকাল। বলল, মানে? তুমি কী আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

হ্যাঁ, দেখাচ্ছি। কামাল গোঁয়ারের মতো বলল, আমি সুযোগ পেলে তোমার টুঁটি চেপে ধরে.........

হাকশীর অট্টহাসিতে সব শব্দ চাপা পড়ে গেল। কামালের পিঠ চাপড়ে হাসতে হাসতে বলল, সাবাশ ছেলে, সাবাশ! হাকশীর মুখে মুখে এরকম কথা বলার সাহস দেখিয়েছ, তার জন্যে কংগ্রাচুলেশান!

কামাল একটু চটে উঠে বলল, ঠাট্টা করছ?

মোটেও না। তোমাদের মতো সাহসী ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। এখানে যাদের ধরে এনেছি, তাদের অনেকেই আমার টুঁটি চেপে ধরতে চায়। অথচ প্রথম কথাটি মুখ ফুটে বলার সাহস দেখালে তুমি! তোমার স্পষ্টবাদিতা দেখে ভারি খুশি হলাম। শোন ছেলেরা, তোমাদের নামটা কি জানি না, যাই হোক, তোমাদের আমি অনুমতি দিলাম—তোমরা ইচ্ছে করলে আমার টুঁটি চেপে ধরতে পার।

এখনই যদি ধরি!

ঐ দু'জন লোক তাদের ট্রিগার চেপে ধরলে অন্তত দুইশত বুলেট তোমাদের মোরব্বার মতো কেঁচে ফেলবে। অন্য কখনো যদি সুযোগ পাও, আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করে দেখতে পার। আমি এটাকে তোমাদের শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ভাবব না।

সত্যি বলছ?

হাকশী মিথ্যা কথা বলে না।

ঘুম ভাঙার পর জাহিদ অনেকক্ষণ বুঝতে পারল না কোথায় আছে, কেন আছে বা কীভাবে আছে। তারপর হঠাৎ করে সব মনে পড়ে গেল আর সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে বসল। হালকা আলো জ্বলছে আসবাবহীন ন্যাড়া একটা ধাতব ঘরে, মহাকাশযানে যেরকম হয়। ফোবোস নামের সেই অদ্ভুত মহাকাশযানটি—পৃথিবীর লোকেরা যেটাকে ফ্লাইং সসার হিসেবে ভুল করেছে, সেটি রাত্রে এখানে এসে পৌঁছে দিয়েছে। প্লুটোনিক নামের এই অতিকায় মহাকাশ স্টেশনটি দেখেই চিনতে পারল জাহিদ। সব কয়টি দেশ মিলে যে-মহাকাশ ল্যাবরেটরি তৈরি করেছিল, যেটি দু' বছর আগে খোয়া গিয়েছিল—হারুন হাকশী সেটাকে প্লুটোনিক নাম দিয়ে তার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। মৃত্যুদেবতার নাম প্লুটো—থেকে প্লুটোনিক। জাহিদের মনে হল নামটি ভালোই বেছে নিয়েছে। কিন্তু এই প্লুটোনিক পৃথিবী থেকে খুব বেশি একটা দূরে রয়েছে বলে

মনে হল না; তবু পৃথিবীর যাবতীয় রাডারের সামনে এটি অদৃশ্য কেন সে বুঝতে পারল না। নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু করেছে, যার জন্যে রাডারের তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় না।

খুট করে একটা শব্দ হল। দরজা খুলে সন্তর্পণে কামাল এসে ঢোকে।

কি ব্যাপার, মরণ ঘুম দিয়েছিলি মনে হচ্ছে!

হুঁ। ভীষণ ঘুমালাম—খিদে লেগে গিয়েছে, খাবার দেবে কখন?

কে জানে বাপু! খেতে দেবে না খেয়েই ফেলবে কে জানে।

পাশের বাথরুমে জাহিদ হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখে, জেসমিনও এসে হাজির—কামালের পাশে বিষণ্ন মুখে বসে আছে। ভাগ্যচক্রে কোথায় এসে পড়েছে ভেবে ভেবে শীর্ণ হয়ে উঠেছে। জাহিদ জেসমিনকে চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা করে, কি ব্যাপার প্রাণিবিদ? খাঁচায় আটক প্রাণীগুলি নিয়ে গবেষণা শুরু করে দাও।

দিয়েছি।

কি দেখলে?

মহিলা প্রাণীটি এক সপ্তাহে পাগল হয়ে যাবে।

জাহিদ হা-হা করে হাসল, তারপর বলল, এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন। একটা কিছু করে ফেলব। হাসান স্যারকে দেখ নি, কী রকম ভয়ানক পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কী ভয়ানক সব কাজ করে ফেলেন—

হাসান স্যার হচ্ছেন হাসান স্যার।

কামাল বলল, আমরাও চেষ্টা করে দেখি। জাহিদ, তোর কি মনে হয় কিছু করা যাবে? একটা প্ল্যানিং করলে হয় না?

এই সময় খুট করে দরজা খুলে গেল। একজন ইউরোপীয় মেয়ে হাতে নাস্তার ট্রে নিয়ে এসে ঢুকল, যন্ত্রের মতো খাবার সাজিয়ে আবার যন্ত্রের মতো বেরিয়ে গেল। মহাকাশের বিশেষ ধরনের চৌকোণা খাবারের ব্লক।

www.amarboi.com

খুঁটে খুঁটে খেতে খেতে জাহিদ বলল, ডিটেকটিভ বইতে পড়েছি বন্দিদের ঘরে লুকানো মাইক্রোফোন থাকে। এখানে নেই তো?

খুঁজে দেখলেই হয়।

কে কষ্ট করে খুঁজবে?

জাহিদ কামালের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল, তারপর বলল, আমার মনে হয় এসব এখানে নেই। জাহিদ কী করতে চায় বুঝতে না পেরে কামাল অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। জাহিদ চোখ মটকে বলল, তোর শার্টের একটা বোতামে যে এক্সপ্লোসিভটা লাগিয়ে রেখেছিলি, সেটা আছে তো?

কিছু না বুঝেই কামাল মিথ্যা কথাটি মেনে বলল, আছে।

বেশ! ওটা চালু কর, পাঁচ মিনিটের ভেতর সবাইকে নিয়ে প্লুটোনিক ধ্বংস হয়ে যাবে।

কামাল দাঁত বের করে হাসল, বুঝতে পেরেছে জাহিদ কী করতে চাইছে। যদি ঘরে মাইক্রোফোন থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এক্সপ্লোসিভটা উদ্ধার করার জন্যে পাঁচ মিনিটের ভিতর কেউ-না-কেউ ছুটে আসবে।

ওরা চুপচাপ বসে রইল, ঠিক পাঁচ মিনিটের সময় দরজা খুলে গেল। সেই ইউরোপীয়ান মেয়েটি আবার যন্ত্রের মতো ঢুকে নাস্তার প্লেট নিয়ে যন্ত্রের মতো বেরিয়ে

গেল।

জাহিদ হেসে বলল, নিশ্চিন্তে প্ল্যানিং করতে পারিস, ঘরে মাইক্রোফোন নেই।

ওরা বসে বসে পরিকল্পনা করার চেষ্টা করে, কিন্তু যেহেতু প্লুটোনিক সম্পর্কে, এখানকার লোকজন, কাজকর্ম সম্পর্কে কোনো ধারণাই এখনো নেই, তাদের পরিকল্পনার কিছুই অগ্রসর হয় না।

ঘন্টা দুয়েক পরে একজন লোক এসে ওদের ডেকে নিয়ে গেল, হারুন হাকশী তাদের জন্যে নাকি অপেক্ষা করছে।

এই প্রথম ওরা প্লুটোনিক ঘুরে দেখার সুযোগ পেল। ঘর থেকে বেরিয়েই দেখে, লম্বা করিডোর, দু'পাশে ছোট ছোট ঘর, প্লুটোনিকের আবাসিক এলাকা। করিডোরের অন্য মাথায় ছোট একটা হলঘরের মতো, পাশেই লিফট। লিফটের পাশে একটা ছোট সুইচ-বক্সের সামনে একজন টেকনিশিয়ান কাজ করছে, আশপাশে স্ক্রু-ড্রাইভার, নাট-বল্টু আর রেঞ্জ ছড়ানো।

জাহিদ, কামাল আর জেসমিনকে মোটেই পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল না, যে-লোকটি পথ দেখিয়ে আনছে সে সামনে সামনে হাঁটছে, পিছন পিছন কেউ আসছে কি না সে বিষয়েও কোনো কৌতূহল নেই। কামাল টেকনিশিয়ানের কাছে এসে এদিক- সেদিক তাকাল, তারপর আলগোছে একটা বড়সড় স্ক্রু-ড্রাইভার তুলে নিল—সে এক বছর জুডো ট্রেনিং নিয়েছিল, খালিহাতেই কীভাবে মানুষ মারতে হয় জানে, তবে এ ধরনের স্ক্রু-ড্রাইভার সাথে থাকলে ব্যাপার সহজ হয়। হারুন হাকশীর কাছাকাছি যেতে পারলে একবার চেষ্টা করে দেখবে, এই লোকটি শেষ হয়ে গেলে পুরো প্লুটোনিকই শেষ হয়ে যাবে!

হারুন হাকশীর ঘরটা আগোছাল, যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। বিভিন্ন মিটার আর স্ক্রীনগুলি সে চিনতে পারল, যে-কোনো মহাকাশযানেই থাকে। তবে অচেনা যন্ত্রপাতির মাঝে রয়েছে একটা চৌকোণা একমানুষ উঁচু ইউনিট, যেটিকে দেখে কম্পিউটার মনে হচ্ছিল, যদিও পরিচিত কম্পিউটারের সাথে এর কোনো মিল নেই। ওরা ঢুকতেই হারুন হাকশী ওদের দিকে না তাকিয়ে বলল, বস। কামাল বসল একপাশে, হারুন হাকশীর নাগালের ভিতর।

হারুন হাকশী একটা ফিতের মতো কাগজে কী যেন মন দিয়ে পড়ছিল—পড়া শেষ হলে কাগজটি রেখে দিয়ে ওদের দিকে তাকাল। তারপর কামালের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, স্ক্রু-ড্রাইভারটি দিয়ে দাও।

কামাল চমকে উঠে হতভম্বের মত পকেট থেকে স্ক্রু-ড্রাইভারটি বের করে। ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ করে দেবে কি না ভাবছিল, কিন্তু তার আগেই লক্ষ করল হারুন হাকশীর হাতে ছোট একটা রিভলবার। স্ক্রু-ড্রাইভারটি এগিয়ে দিয়ে কামাল হতাশ হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

হারুন হাকশী রিভলবারটি ড্রয়ারে রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয়। খানিকক্ষণ একমনে সিগারেট টেনে বলল, তোমাদের ফ্রিপসির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি—এই হচ্ছে ফ্রিপসি—হারুন হাকশী চৌকোণা ইউনিটের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

কি জিনিস এটা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্পিউটার।

ও। কোন জেনারেশন?

হারুন হাকশী হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এটা তোমাদের ওসব চতুর্থ শ্রেণীর কম্পিউটার না—যে, জেনারেশন হিসেব করবে। এটি হচ্ছে আমার নিজের হাতে তৈরি কম্পিউটার।

জাহিদ নির্দোষ মুখে বলল, কি করে এটা? গান গায়?

হাকশী চটে উঠে বলল, কি করে, শুনবে? সে ফিতের মতো কাগজটি তুলে নেয়, বলে, শোন আমি পড়ছি, কামাল সম্পর্কে কী লিখেছে শোন ' কামাল হচ্ছে অস্থিরমতি—আপাতত হারুন হাকশীকে কীভাবে হত্যা করা যায় তাই ভাবছে। করিডোরে আসার সময় খুঁটিনাটি লক্ষ করতে করতে আসবে। সুইচ-বক্সের সামনে এসে হঠাৎ করে এদিক-সেদিক তাকিয়ে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার তুলে নেবে। প্রথম সুযোগ পাওয়ামাত্র এটা দিয়ে হাকশীকে হত্যার চেষ্টা করবে। হারুন হাকশী বসতে বলার পর সে পাশে বসবে। বসার তিন মিনিট পর সে লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়বে হারুন হাকশীর উপর—'

শুনতে শুনতে কামালের চোয়াল ঝুলে পড়ল। জাহিদের বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে হাকশী বলল, ফ্রিপসি তোমার সম্পর্কে কী বলেছে শুনবে? এই শোন—সে পড়তে থাকে, সকাল আটটা পঁয়ত্রিশঃ জাহিদ ঘরে গোপন মাইক্রোফোন রয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখার জন্যে হঠাৎ করে কামালকে বলবে—তার শার্টের বোতামে যে-এক্সপ্লোসিভটা ছিল সেটা আছে কি না। তারপর সে কামালকে এটা চালু করতে বলবে। কেউ এক্সপ্লোসিভটা নিতে আসবে না দেখে জাহিদ ভাববে, ঘরে কোনো মাইক্রোফোন নেই.....এখন বুঝতে পারলে ফ্রিপসি কী করে?

তার মানে এটা মানুষের মনের কথা বলে দেয়?

ঠিক মনের কথা বলা নয়—এটা ভবিষ্যৎ বলে দেয়।

ভবিষ্যৎ?

হ্যাঁ, যে-কোনো মানুষ ভবিষ্যতে কখন কী করবে, কখন কী বলবে, সব নিখুঁতভাবে বলে দেয়।

অসম্ভব।

হাকশী হাসিমুখে বলল, বিজ্ঞানী হয়েও এরকম অবৈজ্ঞানিক কথা বলছ! এইমাত্র না নিজের চোখে দেখলে—নিজের কানে শুনলে।

কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? কামাল হাত ঝাঁকিয়ে বলল—ভবিষ্যতে কে কী করবে না-করবে সেটা বলা যায় নাকি?

কেন যাবে না! যেমন মনে কর তোমার কথা। আমি যদি তোমার মানসিকতা, তোমার বুদ্ধিমত্তা, তোমার পার্সোনালিটি, তোমার পছন্দ-অপছন্দ সব কিছু নির্ভুল জানতে পারি, তা হলে কখন কী পরিবেশে তুমি কী রকম ব্যবহার করবে আমি মোটামুটি বলতে পারব না?

কামাল খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, মোটামুটি হয়তো বলতে পারবে।

আর যদি একটি অসাধারণ কম্পিউটারকে একজন মানুষের চরিত্রের যাবতীয় খবর দেয়া হয়, সে কি নিখুঁতভাবে বলতে পারবে না, কী পরিবেশে তার কী রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহার করা উচিত?

কিন্তু আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সে কেমন করে জানবে?

তোমার কণ্ঠস্বরের একটিমাত্র শব্দ যদি ফ্রিপসি শুনতে পায়, সে নিখুঁত বলে দেবে তোমার চরিত্র কেমন।

সে কেমন করে সম্ভব?

তোমার চরিত্রের উপর নির্ভর করবে তোমার কণ্ঠস্বর, শব্দের বিভিন্ন অংশে তোমার দেয়া গুরুত্ব, উচ্চারণভঙ্গি। তোমার আমার কানে সেগুলি ধরা পড়বে না—কিন্তু ফ্রিপসি সেটা মুহূর্তে ধরে ফেলতে পারে। যেখানে ফ্রিপসির একটিমাত্র শব্দ শুনলেই চলে, সেখানে আমি প্লুটোনিকে এমন ব্যবস্থা করেছি যেন সে প্রতিমুহূর্তে প্লুটোনিকের প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যেকটা কথা শুনতে পায়, প্রত্যেকটা ভাবভঙ্গি দেখতে পায়।

মানে?

মানে এই প্লুটোনিকের প্রতি সেন্টিমিটার ফ্রিপসি প্রতিমুহূর্তে দেখতে পায়—প্রত্যেকটা নিশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পায়! টেলিভিশন, ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন দিয়ে পুরো প্লুটোনিক ঘিরে রাখা হয়েছে!

জাহিদ কামালের দিকে তাকাল—কামাল বিরস মুখে হেসে বলল,—কি জন্যে এত সাবধানতা?

হাকশী একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আমি যে পরিকল্পনামাফিক কাজ করছি, সেখানে সাবধান না হলে চলে না।

কি তোমার পরিকল্পনা?

সময় হলেই জানবে। আমার পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে হলে শ' দুয়েক প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী, শ' তিনেক প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার আর টেকনিশিয়ান দরকার। কিন্তু সবাই যে আমার পরিকল্পনাকে ভালো চোখে দেখবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কাজেই অনেককে আমার জোর করে ধরে আনতে হয়েছে।

জেসমিন চমকে উঠে বলল, বছরখানেক আগে হঠাৎ করে যে-সব বিজ্ঞানী অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তাদের তুমি ধরে এনেছ?

হাকশী হাসিমুখে বলল, হ্যাঁ। যাদের আমি এখানে নিয়ে এসেছি তাদের সাথে আমার চুক্তি হচ্ছে—দু' বছরের। ঠিক দু' বছর তারা এখানে কাজ করবে, তারপর আমি তাদের পৃথিবীতে ফেরত পাঠাব।

জেসমিন জিজ্ঞেস করল, আমাদেরও কি দু' বছর থাকতে হবে?

হাকশী খানিকক্ষণ কি ভেবে বলল, আসলে তোমাদের ধরে আনার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু লেসার দিয়ে আমার ফোবোসে ফুটো করার সময় আমার অনেকগুলি লোক মারা পড়েছে—বিশ্বস্ত সব লোক! বুঝতেই পারছ, আমি যখন অপারেশনে যাই সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোকগুলি নিয়ে যাই। কাজেই আমার কয়েকজন লোক কম পড়ে গেছে—বাধ্য হয়ে হাতের কাছে যাদের পেয়েছি ধরে এনেছি।

জেসমিন আবার জিজ্ঞেস করল, আমাদের কি দু' বছর পর ছেড়ে দেবে?

হাকশী বাঁকা করে হেসে বলল, তোমাদের সাথে আমার কোনো চুক্তি নেই—দু' বছর পর ছেড়ে দেব একথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

জেসমিন কাতর হয়ে বলল, হাকশী! আমাদের সাথে অন্য রকম ব্যবহার করে

তোমার লাভ?

হাকশী হেসে বলল, কেন তোমরা আমাকে ধ্বংস করে যাবে?

জেসমিন চুপ করে রইল। ফ্রিপসির মতো একটি কম্পিউটার যেখানে সবার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, পৃথিবীর সেরা সেরা সব প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যেখানে অসহায়ভাবে বন্দি হয়ে রয়েছে সেখানে তারা কতটুকু কি করতে পারবে?

হাকশী ধূর্ত চোখে হাসতে হাসতে বলল, এখন বুঝতে পারছ, আমি কেন এত সাবধান হয়ে থাকি?

শ' চারেক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান আমার হয়ে কাজ করছে—যদিও তাদের একজনও আমাকে দু' চোখে দেখতে পারে না। পৃথিবীর অন্য যে-কোনো ব্যক্তি হলে অনেক আগেই এদের হাতে মারা পড়ত—আমি বলে টিকে আছি। শুধু টিকে আছি বললে ভুল হবে—এদের কাছ থেকে আমার কাজও আদায় করে নিচ্ছি। কিন্তু কেউ আমার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করে নি।

জাহিদ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, যেদিন সুযোগ আসবে—

আসবে না। যদি কখনো আসে, সে-সুযোগ গ্রহণ করার অনুমতি আমি আগেই দিয়েছি। তবে হ্যাঁ—

কি?

খুব ধীরে ধীরে হাকশীর মুখ শক্ত হয়ে গেল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, দু'বারের বেশি কেউ সুযোগ পাবে না। প্রথম দু'বার আমি ক্ষমা করে দিই—কিন্তু যেই মুহূর্তে কেউ তৃতীয়বার আমাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে—আমি নিজ হাতে তাকে শাস্তি দিই।

কি রকম শাস্তি?

শুনবে? তা হলে শোন। একজন জার্মান ছোকরাকে খালিগায়ে মহাকাশে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে সে বেলুনের মতো ফেটে গিয়েছিল।

জেসমিন শিউরে উঠে বলল, কী করেছিল ছেলেটা?

কামালের মতো আমাকে মারতে চেষ্টা করেছিল। প্রথমবার ইলেকট্রিকে শর্ট সার্কিট করে, দ্বিতীয়বার দম বন্ধ করে, তৃতীয়বার হাতুড়ির আঘাত দিয়ে। কোনোবারই কিছু করতে পারে নি। পরিকল্পনা করার সাথে সাথেই ফ্রিপসি আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল—

মানে? শুধু পরিকল্পনা করেছিল, আর অমনি তুমি ওকে মেরে ফেললে?

হাকশী জাহিদের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, তুমি কি ভাবছ এখানে কোনো পরিকল্পনা করে সেটা কাজে লাগানোর মতো সুযোগ কাউকে দেয়া হয়?

কামাল অধৈর্য হয়ে বলল, তা হলে যে-কেউ একবার একবার করে তিনবার পরিকল্পনা করলেই তুমি তাকে শাস্তি দেবে? কিছু না করলেও?

না—পরিকল্পনা করার স্বাধীনতা রয়েছে—কিন্তু তুমি যদি সেটা বাস্তবায়ন করার জন্যে সময় ঠিক কর, তাহলেই আমি একবার ওয়ার্নিং দেব। দ্বিতীয়বার আবার যদি কবে কোথায় কি করবে ঠিক কর, তা হলে শেষ ওয়ার্নিং। তৃতীয়বার—

হাকশী কথা বন্ধ করে গলার উপর ছুরি চালানোর ভান করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহিদ হাকশীর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধীরে ধীরে ধরাল, তারপর আপন মনে বলল, তার মানে তোমায় কীভাবে কোথায় শেষ করব ভাবতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু যেই মুহূর্তে সময় ঠিক করব অমনি তুমি একবার সুযোগ দেয়া হয়েছে বলে ধরে নেবে।

হ্যাঁ।

যদি তুমি বা তোমার ফ্রিপসি কিছু জানতে না পার, আর তার আগেই তোমায় শেষ করি?

হাকশী হো-হো করে হেসে বলল, চেষ্টা করে দেখতে পার। তোমার পুরো স্বাধীনতা রয়েছে!

ঘড়িতে একটা শব্দ হল। অমনি হাকশী উঠে দাঁড়াল, বলল, আমার সময় হয়েছে—তোমাদের কার কি কাজ করতে হবে, সব এই ফাইলটায় লেখা রয়েছে। আজ বিকেল থেকেই কাজ শুরু করে দাও।

হাকশী একটা ফাইল ওদের দিকে এগিয়ে দেয়। জাহিদ বিরস মুখে ফাইলের পৃষ্ঠা ওল্টাতে থাকে—খুঁটিনাটি বিষয় সবকিছু লেখা রয়েছে—কখন কবে কি কাজ করতে হবে তার নিখুঁত বিবরণ।

হাকশী চলে যাচ্ছিল—জেসমিন ডেকে ফেরাল, হাকশী—আমাদের কতদিন থাকতে হবে বললে না?

হাকশী হেসে বলল, কেন? আমায় ধ্বংস করে নিজেরা মুক্ত হয়ে যাবে না?

জাহিদ হেসে বলল, এক শ' বার যাব!

তাহলে আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন?

জেসমিন জাহিদের কথায় ভরসা পায় না—ও বুঝতে পেরেছে হাকশীর বিরুদ্ধে যাওয়া অসম্ভব। হাকশী ইচ্ছে করলেই শুধুমাত্র এখান থেকে বের হওয়া যেতে পারে। কাজেই হাকশীকে না চটিয়ে সে সময়টুকু জেনে নিতে চাচ্ছিল। আবার জিজ্ঞেস করল—আমাদের কতদিন থাকতে হবে বললে না।

হাকশী ধূর্তমুখে হেসে বলল, বেশ, তোমরাও তা হলে দু' বছর পর মুক্তি পাবে।

দু-ব-ছ-র!

হাকশী চলে গেলে জেসমিন আঙুলে গুনে গুনে দেখতে থাকে দু' বছর মানে কতদিন। কিছুক্ষণেই সে হতাশ হয়ে পড়ে।

প্লুটোনিকের জীবনযাত্রা ভারি বিচিত্র। যাদেরকে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে ধরে আনা হয়েছে, তারা প্রথম কয়দিন খুব ছটফট করে, বিদ্রোহ-বিক্ষোভ করতে চায়, হৈচৈ চেঁচামেচি করে। কিন্তু ফ্রিপসির অদৃশ্য চোখ-কান আর অলৌকিক ক্ষমতার সামনে কয়দিনেই সবাই শিশুর মতো অসহায় হয়ে পড়ে। কয়দিন পরেই তাদের সবরকম বিদ্রোহ-বিক্ষোভের ঝোঁক কেটে যায়—তখন জেলখানায় আটক বন্দিদের মতো মাথা গুঁজে কাজ করে যায় আর দিন গুনতে থাকে কবে বন্দিজীবন শেষ করে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে।

হাকশী বাইরে কোথায় কি করছে না-করছে সে সম্পর্কে প্লুটোনিকের কাউকেই একটি কথাও বলে না। প্লুটোনিকের লোকজন যখন জাহিদ আর কামালের মুখে শুনতে

পেল মহাকাশের সব মহাকাশযান হাকশী ধ্বংস করে ফেলেছে, তখন তাদের বিস্ময়, হতাশা আর আক্রোশের সীমা থাকল না। কিন্তু কিছু করার নেই—বুকের আক্রোশ বুকে চেপে রেখে সবাই নিজের কাজ নিজে করে যেতে লাগল। এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার একটিমাত্র উপায় হচ্ছে আত্মহত্যা করা—কিন্তু আত্মহত্যা করতে পারে কয়জন?

হাকশী কি জন্যে মহাকাশযান, কৃত্রিম গ্রহ, উপগ্রহ ধ্বংস করে বেড়াচ্ছে সেটার কোনো সদুত্তর জাহিদ খুঁজে পায় না। প্লুটোনিকের অনেকে হয়তো হাকশীর কাছে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শুনেছে, কিন্তু ফ্রিপসির ভয়ে কেউ তাদের কিছু জানাল না। সুযোগ পেয়ে একদিন সে নিজেই হাকশীকে জিজ্ঞেস করল তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি। হাকশী ওকে যা বোঝাল, সেটি যেরকম আজগুবি, ঠিক ততটুকু সঙ্গতিহীন।

সে নাকি পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনার একটা মহান পরিকল্পনা নিয়েছে। বিভিন্ন দেশ নিজেদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে বেড়ায়—কিন্তু সব দেশ মিলে যদি একটিমাত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয় তাহলে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার উপায় থাকবে না। কোনো দেশ তো আর নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে না। পৃথিবীর সব দেশ একত্র হওয়া নাকি তখনই সম্ভব, যখন একটি মহাশক্তি তাদের পরিচালনা করবে। হারুন হাকশী হবে সেই মহাশক্তি—মহাকাশ পুরোপুরি দখল করে নেয়ার পর সে সমস্ত পৃথিবীর কর্তৃত্ব পেয়ে যাবে—যখন খুশি যে-কোনো দেশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে। পৃথিবী তখন বাধ্য হবে তার কথা শুনতে।

সব শুনে জাহিদ বুঝতে পেরেছে, হাকশী হচ্ছে একটি উন্মাদ। কিন্তু এই উন্মাদের যে ক্ষমতা রয়েছে এবং সেটাকে কাজে খাটানোর যে প্রতিভা রয়েছে সেটা সত্যিই ভয়ংকর।

প্রথম কয়দিন ছটফট করে জাহিদ আর কামাল কাজে মন দিয়েছে। দু' জনেই কাজ করে ডিক টার্নার নামে একজন বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর অধীনে। লোকটা একটা ছোটখাট পাষণ্ড। সুযোগ পেলে সে হাকশীর পিঠেও ছোরা বসাতে পারে—কিন্তু হাকশীর নিজের অল্প কয়জন লোকজনের মাঝে ডিক টার্নার হচ্ছে অন্যতম। ডিক টার্নার নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরের বিশেষজ্ঞ। নিজে নূতন ধরনের রি-অ্যাক্টর ডিজাইন করেছে, সেটি আপাতত ফোবোসে কাজ করছে।

জাহিদের কাজ ছিল জ্বালানি তৈরি করার জন্যে ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ[৫] আলাদা করা। একঘেয়ে রুটিনবাঁধা কাজ। কাজ করতে করতে জাহিদ হাঁপিয়ে ওঠে, কিন্তু এছাড়া আর কিছু করার নেই। নিজের কাজ সে মন দিয়ে করে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করে, আর সব সময়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে—নির্দিষ্ট ভরের ইউরেনিয়াম ২৩৫ আলাদা করে 'ক্রিটিক্যাল মাস'[৬] করে ফেলতে পারে কি না। পারমাণবিক বোমার জন্যে 'ক্রিটিক্যাল মাস' কত সেটি তার জানা রয়েছে—কিন্তু সে পরিমাণ ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ সে কখনও হাতে পায় না! হাকশীর সাথে দেখা হলেই হাকশী হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, কি হে পদার্থবিদ, অ্যাটম বোমা তৈরির কতদূর!

ফ্রিপসির দৌলতে জাহিদ পরিকল্পনা করার আগেই হাকশী সেটা জেনে গেছে।

কামালের কাজ ছিল রি-অ্যাক্টরের কাছাকাছি। অতিকায় রি-অ্যাক্টরের খুঁটিনাটি অনেক কিছু তাকে লক্ষ করতে হত। কাজে ফাঁকি দেয়ার উপায় ছিল না—ফ্রিপসি সব

সময় নজর রাখত। রি-অ্যাক্টরকে বিকল করে দেবার অনেকগুলি পথ কামাল ভেবে বের করেছে। হাকশী সেগুলি সবকয়টাই জানত। অবসর পেলে হাকশী কামালের সাথে সেগুলি নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত। কারণ হাকশী খুব ভালো করেই জানত, কামাল কোনো দিনও ফ্রিপসির চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেগুলি কাজে লাগাতে পারবে না।

জেসমিনের অবস্থা ছিল সবচেয়ে শোচনীয়। একটা নূতন ধরনের ভাইরাস[৭] নিয়ে তার গবেষণা করতে হচ্ছে। কি রকম অবস্থায় ভাইরাসগুলি কি ধরনের ব্যবহার করে তার একটি দীর্ঘ চার্ট করে তার সময় কাটে। এই ভাইরাসটি মানুষের মস্তিষ্ককে আক্রমণ করে মানুষকে বোধশক্তিহীন করে ফেলে। হাকশী কোথায় এটি ব্যবহার করবে ভেবে জেসমিনের দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। জেসমিন কয়দিন হল আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে। হাকশী ফ্রিপসির কাছ থেকে সে খবর পেয়েছে অনেকদিন আগে। তবে এ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। জেসমিন যদি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করে তা হলে ভালোই হয়—ওকে বাঁচিয়ে রাখার আসলে কোনো প্রয়োজন নেই। কামাল আর জাহিদের চাপে পড়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে।

আস্তে আস্তে যতই দিন পার হতে লাগল, ওরা তিনজনই বোধশক্তিহীন যন্ত্র হয়ে যেতে লাগল। জেসমিনকে সাহস দিয়ে বেড়াত কামাল—ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করত—কিন্তু আসলে তাতে খুব একটা লাভ হত না। নিজেও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী নয়।

একটা অক্ষম স্থবিরতা ওদের গ্রাস করে ফেলছিল ধীরে ধীরে। তার থেকে বুঝি কারো মুক্তি নেই!

amarboi.com

জাহিদ বুঝতে পেরেছে সে হাকশীর কাছে হেরে গেছে। অনেক অহঙ্কার করে সে হাকশীকে বলেছিল তার প্লুটোনিক ধ্বংস করে দিয়ে সে প্রতিশোধ নেবে—কিন্তু তার কথা সে রাখতে পারে নি। ফ্রিপসি নিখুঁতভাবে প্রতিটি চিন্তাভাবনা হাকশীকে জানিয়ে দিয়েছে। মানুষের মনের গোপন ভাবনাটিও যখন একজন প্রতিমুহূর্তে জেনে নেয়, তখন তার মতো অসহায় বুঝি আর কেউ অনুভব করে না। জাহিদ বিষণ্নমুখে গোল জানালাটি দিয়ে মহাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে—এইদিক দিয়ে কোটিখানেক মাইল দূরে পৃথিবী। পৃথিবীতে ফিরে যাবার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা তাকে প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিচ্ছে—এ ছাড়া সে বোধ করি পাগল হয়ে যেত। অবসর সময়ে সে হিসেব করে দেখে দু' বছর শেষ হতে আর কত দেরি। গোল জানালা দিয়ে নিকষ কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখের সামনে পৃথিবীটা ভেসে ওঠে। তার দেশে এখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ কালো করে মেঘ হয়ে বিজলি চমকাচ্ছে, গুরুগুরু মেঘের ডাক—

জাহিদ।

জাহিদ বাস্তবে ফিরে এল—ঘুরে দেখে, কামাল। আজকাল ওদের দেখা হয় কম, কথাবার্তা হয় আরো কম। প্লুটোনিকের অন্য একজন সাধারণ অধিবাসীর সাথে কামালের পার্থক্য দিনে দিনে কমে আসছিল—সে নিজেও তেমনি একজন প্লুটোনিকের যন্ত্র হয়ে উঠছিল। অনেকদিন পরে কামালকে দেখে জাহিদের হঠাৎ করে আরো বেশি মন-খারাপ হয়ে গেল। কয়দিন আগেও তারা দু'জন একসাথে এন্ড্রোমিডাতে হৈচৈ

করে বেড়িয়েছে।

কি রে কামাল, কিছু বলবি?

জাহিদ—কামালের চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে।

জাহিদ ভারি অবাক হল। প্লুটোনিকের এই একঘেয়ে জীবনে এমন কী ঘটনা ঘটতে পারে, যা কামালকে এত উত্তেজিত করে তুলতে পারে? কামালকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

কামাল কোনো কথা না বলে জাহিদের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাথরুমে। ফ্রিপসির জন্যে প্লুটোনিকের সর্বত্র রয়েছে অজস্র চোখ আর কান—টেলিভিশন ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন। কোন ঘরে কোথায় আছে সেটা কারো জানা নেই। কামাল অনেক খুঁজে বাথরুমের টেলিভিশন ক্যামেরাটি বের করেছিল, ডান পাশে আয়নার ঠিক নিচে ছোট্ট একটি গোল ফুটো, তার পিছনেই রয়েছে টেলিভিশন ক্যামেরা। কামাল একটা তোয়ালে দিয়ে সেটা ঢেকে দিল। তারপর ট্যাপ আর শাওয়ার খুলে পানির শব্দ দিয়ে মাইক্রোফোনটিকে অচল করে দিয়ে জাহিদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

জাহিদ এতক্ষণ কামালের প্রস্তুতি দেখে ভারি অবাক হয়। কামাল এমন কী কথাটি বলবে যেটি ফ্রিপসিকে জানতে দিতে রাজি নয়? ফ্রিপসি জানে না এমন কিছুই যখন তাদের জানা নেই। কামালকে জিজ্ঞেস করল, কি বলবি?

কামাল খুব নিচু গলায় বলল, আমি জেসমিনকে ভালবাসি, তুই জানিস?

শুনে জাহিদ ভারি অবাক হল—এটি এমন কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয়। সে নিজে প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারে মোটেই স্পর্শকাতর নয়, কিন্তু কামালের জন্যে এটি খুবই স্বাভাবিক—বিশেষ করে যখন পরিস্থিতি হঠাৎ করে তাদের এরকম অবস্থায় এনে ফেলেছে। জাহিদ অবাক হল এই ভেবে যে, এ কথাটি বলার জন্যে এত সতর্কতা কেন? সে কামালের দিকে তাকিয়ে বলল, তাতে কী হয়েছে?

কামাল কাঁপা গলায় বলল, ফ্রিপসি জানে না!

জাহিদ ভীষণ চমকে উঠল—চেঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, কী বললি!

আস্তে। ফ্রিপসি শুনতে পাবে। আজ দুপুরে হাকশীর ঘরে গিয়েছিলাম ভেন্টিলেশান টিউব পরীক্ষা করতে। হাকশীর সাথে গল্প করে আমার সম্পর্কে ফ্রিপসির আজকের রিপোর্টটা দেখতে চাইলাম, এমনি ইচ্ছে হচ্ছিল দেখতে। কি কারণে জানি ব্যাটার মন ভালো ছিল, দেখতে দিল। আমার সম্পর্কে ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। পাঁচটার সময় জেসমিনকে নিয়ে ছ'তলায় গিয়ে নিরিবিলি গল্প করব ঠিক করে রেখেছিলাম—অথচ ফ্রিপসি লিখেছে—পাঁচটার সময় তোর সাথে আলাপ করব। কীভাবে কার্বন মনোক্সাইড ব্যবহার করে হাকশীকে খুন করা যায়—

তুই ঠিক দেখেছিস?

হ্যাঁ—তাই জেসমিনের সাথে দেখা না করে পাঁচটা বাজতেই তোর কাছে চলে এসেছি।

ফ্রিপসির তাহলে প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। উত্তেজনায় জাহিদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল, ফিসফিস করে বলল, আমাদের আগেই এটা বোঝা উচিত ছিল—ফ্রিপসি তো যন্ত্র! প্রেম-ভালবাসা বুঝবে না। কেউ প্রেমে পড়লেই তার সম্পর্কে ভুল খবর দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ—কামালের চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। এই সুযোগ—ফ্রিপসি ভাবছে তোর সাথে কার্বন-মনোক্সাইড নিয়ে আলাপ করছি। এই ফাঁকে একটা সত্যিকার পরিকল্পনা করে ফেল।

এত তাড়াতাড়ি! ভাবতে হবে না? সময় দরকার—

আর কখনো সময় নাও পেতে পারিস।

জাহিদ চুল খামচে ধরে বলল, যে-পরিকল্পনাই করিস না কেন, সবচেয়ে প্রথম ফ্রিপসিকে বিকল করতে হবে—এ ছাড়া কিছু করা যাবে না।

সম্ভব না—ফ্রিপসিকে নষ্ট করা যাবে না। ভীষণ কড়া পাহারায় থাকে।

নষ্ট না করে—ওটাকে বিকল করা যায় না?

কামাল দু'-এক মুহূর্ত ভাবল, বলল, যায়।

কীভাবে?

ইলেকট্রিসিটি যদি বন্ধ করে দেয়া যায়।

সেটা কীভাবে করবি?

কামাল মাথা চুলকাল—সবার সামনে দিয়ে ফ্রিপসির ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দেয়া একেবারেই অসম্ভব!

আচ্ছা! এক কাজ করা যায় না?

কি?

নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরটা বন্ধ করে দেয়া যায় না? তাহলেই তো প্লুটোনিকের পুরো পাওয়ার বন্ধ হয়ে যাবে!

কীভাবে করবি? টার্নার ওখানে শকুনের মতো বসে থাকে।

তুই তো নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরের ইঞ্জিনিয়ার, এখানে ঢুকে কিছু করতে পারিস না?

কামাল ভাবতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বলে, তুই যদি টার্নারকে খানিকক্ষণ অন্য দিকে ব্যস্ত রাখতে পারিস, তা হলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

কীভাবে করবি?

বলছি শোন্—কামাল জাহিদকে পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলতে থাকে, জাহিদ গম্ভীর হয়ে শোনে।

ঠিক সেই সময়ে হাকশী ছুটে আসছিল ওদের খোঁজে—ফ্রিপসি জরুরি বিপদসংকেত দিয়েছে।

বাথরুমের দরজা খুলে হাকশী এবং তার পিছনে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে নাকভাঙা আমেরিকানটাকে দেখে জাহিদ বুঝতে পারল, ওরা ধরা পড়ে গেছে।

হাকশী সরু চোখে ওদেরকে খানিকক্ষণ লক্ষ করল, তারপর কামালকে বলল, তোয়ালেটা ওখান থেকে সরিয়ে রাখ। ট্যাপগুলি বন্ধ কর।

কামাল তোয়ালেটা সরিয়ে নিয়ে খোলা ট্যাপগুলি বন্ধ করে দেয়—এতক্ষণ পানির ঝিরঝির শব্দে কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল—হঠাৎ করে নীরবতা অস্বাভাবিক ঠেকল।

হাকশী গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কী নিয়ে আলাপ করছিলে?

জাহিদ ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল, কিন্তু বাইরে খুব শান্ত ভাব বজায় রেখে বলল, তোমার ফ্রিপসিকে জিজ্ঞেস কর।

ফ্রিপসিকে জিজ্ঞেস করেই এসেছি—

তা হলে আর আমাদের জিজ্ঞেস করছ কেন?

হাকশী খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, ভবিষ্যতে এরকম কাজ করবে না।

কী রকম কাজ?

টেলিভিশন ক্যামেরা আর মাইক্রোফোনকে এড়িয়ে যাওয়া।

দু' –এক মিনিটের জন্যে গেলে ক্ষতি কি?

সে কৈফিয়ত আমি তোমাকে দেব না। ফ্রিপসির চোখের আড়াল হওয়া চলবে না। যদি আড়াল হওয়ার চেষ্টা কর, সোজাসুজি মহাকাশে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

বেশ।

আর কার্বন–মনোক্সাইড ব্যবহার করে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না—প্লুটোনিকে বিষাক্ত গ্যাস বিশুদ্ধ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

জাহিদ চমকে ওঠার ভান করল—তারপর মুখে একটা আশাভঙ্গের ছাপ ফুটিয়ে তুলল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়ছিল, হাকশী ধরতে পারে নি—ফ্রিপসি ধরতে পারে নি—ফ্রিপসিকে ধোঁকা দিয়ে ওরা ওদের মাথায় করে এক ভয়ানক পরিকল্পনা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

হাকশী চলে যাওয়ার পর জাহিদ খুব ধীরে ধীরে কামালের দিকে তাকিয়ে আছে—যদি কিছু বুঝে ফেলে? কামাল জাহিদের চোখের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু বুঝে ফেলল। চোখের ভাষা বুঝে নেবার মতো ক্ষমতা ফ্রিপসির নেই, তাই ফ্রিপসি জানতেও পারল না এই দু' জন কী সাংঘাতিক পরিকল্পনা ছকে ফেলেছে।

জাহিদ সারারাত (প্লুটোনিকে দিন–রাত নেই—সুবিধের জন্যে খানিকটা সময়কে রাত নাম দিয়ে সবাই ঘুমিয়ে নেয়) খুব দুশ্চিন্তায় কাটাল—ওর কাজকর্ম ভাবভঙ্গি যদি ফ্রিপসির ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিলে না যায়, তাহলে হাকশী সন্দেহ করতে পারে। জাহিদ খুব সাবধানে কথা বলছিল—যখন ঠিক যেমনটি করা উচিত তখন ঠিক তেমনটি করে যাচ্ছিল। অন্ততপক্ষে একটি সপ্তাহ এভাবে কাটাতে হবে। সবচেয়ে মুশকিল কামালের সাথে এ বিষয়ে আর একটি কথাও বলা যাবে না। অপেক্ষা করে থাকতে হবে কবে কামালের কাছ থেকে সেই সংকেতটি আসে।

হাকশী প্রথম দু'দিন খুব অস্বস্তির সাথে দেখতে পেল জাহিদ আর কামালের কথাবার্তা ভাবভঙ্গি প্রায়ই ফ্রিপসির ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে খাপ খাচ্ছে না। যদিও খুবই ছোটখাটো ব্যাপার, কিন্তু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সে সতর্ক থাকল এবং গোপন পাহারার ব্যবস্থা করল। তিন দিনের মাথায় আবার সব ঠিক হয়ে যাবার পর সে নিশ্চিন্ত হল, যদিও ব্যাপারটি দেখে তার বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

খাবার টেবিলে কাপে চা ঢালতে গিয়ে কামালের হাত থেকে খানিকটা চা ছলকে পড়ল। জেসমিন বিরক্ত হয়ে বলল, যেটা পার না সেটা করতে যাও কেন? দেখি, আমাকে দাও।

জেসমিন চা ঢেলে দিতে থাকে। জাহিদ খুব ধীরে ধীরে কামালের চোখের দিকে তাকাল। বুঝতে পারল আজকেই ঘটবে সেই ব্যাপারটা! টেবিলে চা ফেলে দেয়া

আকস্মিক ঘটনা নয়—জাহিদকে সতর্ক করে দেয়া। চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল—যার যার কাজে যাবে।

প্লুটোনিকের সমস্ত শক্তি আসে ছ'তলায় বসানো নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর থেকে। ব্যাপারটার পুরো দায়িত্বে রয়েছে ডিক টার্নার। জাহিদ টার্নারের ঘরে নক করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কামাল চলে গেল রি-অ্যাক্টরের কাছে। পাঁচ-ছয়জন টেকনিশিয়ান এখানে-সেখানে কাজ করছে—সবাই চুপচাপ—মুখে পাথরের কাঠিন্য। কামাল তার নিজের জায়গা ছেড়ে আরও ভিতরে চলে গেল।

রি-অ্যাক্টরে আজ জ্বালানি প্রবেশ করানোর দিন—জ্বালানিগুলি প্লুটোনিকের ল্যাবরেটরিতেই ইউরেনিয়ামের বিভিন্ন আইসোটোপ থেকে আলাদা করা হয়। প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয় সেসব জ্বালানি খুব সাবধানে রাখা হয়। টার্নার ছাড়া আর কেউ সেখানে হাত দিতে পারে না।

কামাল দ্রুতহাতে স্বচ্ছ একটা পোশাক পরে নিতে থাকে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কাছে যেতে হলে এই পোশাক পরে নিতে হয়। উপরে আরো এক প্রস্থ সিলোফেনের পোশাক পরে নেয়া নিয়ম—কামাল সে জন্যে অপেক্ষা করল না। সে দ্রুত পায়ে কন্ট্রোল-রুমে ঢুকে পড়ে। পরপর তিনটি ভারী দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে হয়। শেষ দরজাটি বন্ধ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণে বাইরে নিশ্চয়ই হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে।

ফ্রিপসি যখন দেখবে তার ভবিষ্যদ্বাণীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কামাল এরকম একটা বেআইনি কাজ করে ফেলছে, নিশ্চয়ই তখন সাইরেন বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেবে। ডিক টার্নার যখন খবর পাবে কামাল কন্ট্রোল-রুমে ঢুকে পড়েছে, তখন সে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে পড়বে। বাইরে থেকে পাওয়ার বন্ধ করে দিয়ে তাকে বিপদে ফেলতে পারে, কিন্তু পরবর্তী পনের মিনিট টার্নারকে কোনো-না-কোনোভাবে আটকে রাখার দায়িত্ব জাহিদের। কামাল সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না—খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দিল। জ্বালানির ছোট ছোট টিউবগুলি পাল্টে দিতে হবে। ওগুলি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রি-অ্যাক্টরের ভেতরে চলে যাবার জন্যে ট্রের উপরে সামনে আছে—কামাল সেগুলি টেনে নামিয়ে আনল। তারপর খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দিল—যদিও সে জানতেও পারল না তাড়াতাড়ি করার আর কোনো দরকার ছিল না। যার ভয়ে সে এত তাড়াহুড়ো করছিল, সেই ডিক টার্নার তখন গুলি খেয়ে টেবিলের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে-আর কোনো দিনও তার ওঠার ক্ষমতা হবে না।

জাহিদ ডিক টার্নারের ঘরে ঢুকে একটা কাল্পনিক সমস্যা নিয়ে আলাপ জুড়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। এমনিতে লোকটা নিতান্ত পাষণ্ড হলেও পদার্থবিজ্ঞান এবং যুক্তিবিদ্যায় তার অকৃত্রিম উৎসাহ রয়েছে। সত্যি সত্যি সে জাহিদের সাথে সমস্যাদি নিয়ে আলাপ করতে থাকে। কিন্তু যেই মুহূর্তে ফ্রিপসি সাইরেন বাজিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিল কামাল হঠাৎ করে বেআইনিভাবে জ্বালানিঘরে ঢুকে পড়েছে, তখন টার্নার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল; কি করবে বুঝতে না পেরে চিৎকার করে জাহিদকে বলল, পাওয়ার বন্ধ কর।

জাহিদ ঠাণ্ডা গলায় বলল, কেন?

সাথে সাথে টার্নার বুঝে গেল ষড়যন্ত্রে জাহিদও রয়েছে। সে নিচু হয়ে ড্রয়ার থেকে

একটা ছোট রিভলবার বের করে এবং জাহিদের দিকে তাক করে ধরল। জাহিদ ভেবেছিল ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে এবং কীভাবে আরো খানিকক্ষণ ওকে ব্যস্ত রাখা যায় মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছিল। কিন্তু টার্নার ভয় দেখানোর ধারেকাছে গেল না, সোজাসুজি তাকে গুলি করে বসল। শেষমুহূর্তে লাফিয়ে সরে যাওয়ার জন্যেই হোক, টার্নারের অপটু হাতের ভুল নিশানার জন্যেই হোক, জাহিদের ডান হাতের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হল না। জাহিদকে লক্ষ করে দ্বিতীয়বার গুলি করার চেষ্টা করার সময় জাহিদ মরিয়া হয়ে টার্নারের উপর লাফিয়ে পড়েছে—রিভলবার কেড়ে নিতে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে ট্রিগারে চাপ পড়ে একটা গুলি ওর মাথার ভিতর দিয়ে চলে গেছে। ফলস্বরূপ টার্নার এখন শীতল দেহে টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে আছে—থিকথিকে রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে আর তাই দেখে জাহিদের গা গুলিয়ে উঠছে।

জাহিদ রিভলবারটা টেবিলের উপর রাখল—বাইরে ভীষণ হৈচৈ চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছে। হাকশী আর তার দলবল ছুটে আসছে। হাকশীও কি টার্নারের মতো দেখামাত্র গুলি করে বসবে? নাকি ওর কথা শোনার জন্যে খানিকক্ষণ সময় নেবে? কামাল এতক্ষণে কী করল কে জানে! জাহিদ রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। দু'মিনিটের ভিতর দরজায় হাকশী এসে দাঁড়াল, পিছনে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে নাকভাঙা আমেরিকানটা।

জাহিদ সেকেণ্ড দশেক অপেক্ষা করল, না, হাকশী এখন তাকে মারবে না। তাহলে এ-যাত্রায় সে বেঁচে যেতেও পারে। খুব কষ্ট করে জাহিদ মুখে হাসি ফুটিয়ে এনে বলল, টার্নারের কাণ্ড দেখেছ! খামোকা গুলি খেয়ে মারা পড়ল! কী দরকার ছিল আমাকে গুলি করার?

হাকশী কোনো উত্তর দিল না। চোখ দু'টিকে ছুরির মতো করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

হাকশীর বিশেষ নির্দেশে সবাই এসে জমা হয়েছে বড় হলঘরে। প্রথমবার দেখা গেল হাকশীর দেহরক্ষীরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে হলঘরের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা কফিন। কফিনে টার্নারের মৃতদেহ। একপাশে গম্ভীর মুখে হাকশী, অন্য পাশে জাহিদ আর কামাল দু'জনের হাতেই হাতকড়া। উপস্থিত সবাই বিশেষ বিচলিত—কথাবার্তা নেই মোটেও। কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে কী ঘটে দেখার জন্যে। জেসমিনকে ভীষণ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে—একটা চেয়ার ধরে কোনোভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জাহিদ আর কামালকে লক্ষ করছে—দেখে মনে হয় সে যেন ওদের চিনতে পারছে না।

তোমরা সবাই শুনেছ—হাকশী অনেকটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করল, জাহিদ আর কামাল মিলে টার্নারকে হত্যা করেছে—

মিথ্যা কথা! জাহিদ বাধা দিল, আমি কখনোই টার্নারকে হত্যা করি নি। আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল টার্নার—ফ্রিপসিকে জিজ্ঞেস করে দেখ। বেকায়দা গুলি খেয়ে নিজেই মরেছে—

হাকশী এমন ভান করল যে, জাহিদের কথা শুনতে পায় নি। চাপা খসখসে স্বরে বলে যেতে লাগল, সে শুধু যে টার্নারের মতো প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে

তাই নয়—রি-অ্যাক্টরের কন্ট্রোল-রুমে ঢুকেছিল বিনা অনুমতিতে—তাদের এই অবাধ্যতার শাস্তি দেয়া হবে এখনই, এখানেই। এমন শাস্তি দেব যে পৃথিবীর মানুষ শুনতে পেলে আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

জেসমিন একটা আর্তস্বর করে চেয়ারে বসে পড়ল। সবাই তাকে একনজর দেখে হাকশীর দিকে ঘুরে তাকাল।

জাহিদ আলগোছে হাত তুলে ঘড়িটা দেখল। সাড়ে এগারোটা বাজতে এখনও মিনিট কয়েক বাকি রয়েছে। হাকশীকে আরও খানিকক্ষণ আটকে রাখতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

হাকশী জাহিদ আর কামালের দিকে তাকিয়ে গলার স্বরে বিষ মিশিয়ে বলল, আমার দলের সর্বশ্রেষ্ঠ লোকগুলির একজনকে হত্যা করার অপরাধের শাস্তি নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হও।

কী করতে চায় হতভাগাটা? জাহিদ মনে মনে ঘেমে উঠলেও বাইরে শীতল ভাব বজায় রেখে বলল, হাকশী, তুমি যদি সত্যি সত্যি টার্নারকে হত্যা করার জন্যে শাস্তি দিতে চাও, তা হলে শুধু আমাকেই সে শাস্তি দিতে হবে। তুমি খুব ভালো করে জান দুর্ঘটনাটা যখন ঘটেছে তখন কামাল সেখানে ছিল না।

তার মানে এই নয় পরিকল্পনাটাতে কামালের কোনো ভূমিকা ছিল না। তা ছাড়া—হাকশী। কামাল হাকশীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমাদের তোমার বিরুদ্ধে যাবার সুযোগ দিয়েছিলে। বলেছিলে, দু'টি সুযোগ দেবে—তৃতীয়বার শাস্তি দেবে! তা হলে প্রথমবারেই আমাদের শাস্তি দিতে চাইছ কেন?

শুনবে, কেন প্রথমবারই তোমাদের শেষ করে দিচ্ছি?

জাহিদ বুঝতে পারল হাকশী কী বলবে—কিন্তু মুখে কৌতূহল ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

কারণ তোমরা দুজন কী-একটা আশ্চর্য উপায়ে ফ্রিপসিকে ধোঁকা দিয়েছ। ফ্রিপসি তোমাদের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছে। তোমাদের এই ভয়ংকর পরিকল্পনা সম্পর্কে আমায় কিছুই বলে নি!

উপস্থিত সবাই ভয়ানক চমকে উঠল—সেখানে দেয়াল ফেটে একটা জীবন্ত পরী বেরিয়ে এলেও বুঝি লোকজন এত অবাক হত না। সেকেণ্ড দশেক সবাই দমবন্ধ করে থেকে একসাথে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। হাকশী কঠোর স্বরে ধমকে উঠল, থাম—

সাথে সাথে হঠাৎ দপ করে সব আলো নিভে গেল। লোকজনের প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝে জাহিদ শুনতে পেল, ঘড়িতে ঠিক সাড়ে এগারোটা বাজার ঘন্টা পড়ছে।

কেউ এক পা নড়বে না—তা হলে গুলি করে সবার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে। অন্ধকারে হারুন হাকশী নিষ্ঠুরভাবে চেঁচিয়ে উঠল, সবাই মেঝেতে হাত রেখে বসে পড়—মেঝে থেকে দু' ফুট উঁচু দিয়ে গুলি করা হবে। সবাই হুড়মুড় করে বসে পড়েছে, জাহিদ তার শব্দ পেল। পরমুহূর্তে একঝাঁক গুলি তাদের মাথার উপর দিয়ে দেয়ালে গিয়ে বিঁধল।

জাহিদ মুখ টিপে হাসল, হারুন হাকশী ভয় পেয়েছে। দারুণ ভয় পেয়েছে। অন্ধকারে সে হাত বাড়িয়ে কামালের হাত স্পর্শ করে চাপ দিল—কামাল সত্যি সত্যি

তাহলে জ্বালানির টিউব পাল্টে দিতে পেরেছে। সাড়ে এগারোটায় নতুন জ্বালানি দিয়ে কাজ শুরু করানোর সাথে সাথে তাই সবকিছু বন্ধ হয়ে গেছে।

একটা চাপা শব্দ করে প্লুটোনিকের নিজস্ব ডায়নামো চালু হয়ে গেল খানিকক্ষণের মধ্যেই। ধীরে ধীরে মিটমিটে ভৌতিক আলো জ্বলে উঠল। আবছা আলোছায়াতে দেখা গেল, মেঝেতে শ' চারেক লোক মাথানিচু করে গুড়ি মেরে বসে আছে, হাকশীর গোটা চারেক দেহরক্ষী তাদের দিকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তাক করে আছে। জাহিদ এবং কামালের দিকে অন্য দু'জন দেহরক্ষী ট্রিগারে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। হাকশী অন্ধকারে সরে গেছে অনেক ভেতরের দিকে, নিরাপদ দূরত্বে। আলো জ্বলে ওঠার পর সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে এল। উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ করে বলল, তোমরা একজন একজন করে বেরিয়ে নিজেদের ঘরে চলে যাও। আজ তোমাদের সবার ছুটি। মনে রাখবে, ঘরের বাইরে কাউকে পাওয়া গেলে সাথে সাথে গুলি করা হবে।

লোকগুলি ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর একজন একজন করে বেরিয়ে যেতে লাগল। শেষ লোকটি বেরিয়ে যাবার পর হাকশী জাহিদ এবং কামালের দিকে এগিয়ে এল। বলল, এটাও তোমাদের কাজ, না?

জাহিদ দাঁত বের করে হাসল। হালকা স্বরে বলল, তোমার কী মনে হয়? ভূতের?

ঠাট্টা রাখ। প্রচণ্ড শব্দে হাকশী ধমকে উঠল—তোমার সাথে আমি তামাশা করছি না।

জাহিদ শীতল স্বরে বলল, দেখ হাকশী, তুমি আর চোখ রাঙিয়ে কথা বলার চেষ্টা করো না। তোমাকে আমরা আর এতটুকু ভয় পাই না। নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর নষ্ট করে এসেছি, ওটা যদি ঠিক করতে পার—জাহিদ একটু হাসল—হ্যাঁ, যদি তোমার টেকনিশিয়ানরা ঠিক করতে পারে, শুধু তাহলেই প্লুটোনিক বেঁচে যাবে। আর তা যদি না পার, তা হলে সেই মুহূর্তে তোমার ঐ ধুকপুকে ডায়নামোটা শেষ হয়ে যাবে—আলো, তাপ, বাতাস, খাবার পানি সবকিছুর অভাব শুরু হয়ে যাবে। খুব বেশি হলে দশ দিন বেঁচে থাকতে পারবে—

স্কাউণ্ড্রেল! তোমরা বেঁচে যাবে ভাবছ?

মোটেই না। জাহিদ উদারভাবে হাসে, অনেক দিন বেঁচেছি, আর বাঁচার শখ নেই। তোমাকে শেষ করে যদি মারা যাই, খোদা নির্ঘাত বেহেশতে আমাকে একটা প্রাসাদ বানিয়ে দেবে। হুর পরী—

চুপ কর! তোমার কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আমি টেকনিশিয়ানদের পাঠাচ্ছি। ওরা রি-অ্যাক্টর ঠিক করবে। তারপর—হাকশী দাঁত চিবিয়ে কী যেন বলার চেষ্টা করে— তার আগেই কামাল হো-হো করে হেসে উঠে বলল, হাকশী, জাহিদের কথা বিশ্বাস নাই-বা করলে। আমার কথা বিশ্বাস করবে? তা হলে শোন, আমি হচ্ছি রি-অ্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ার। আমাকে শেখানো হয় রি-অ্যাক্টর কীভাবে তৈরি করা হয়, তার কোথায় কি থাকে, রি-অ্যাক্টরের কোন অংশে কি করলে সেটার কি পরিমাণ ক্ষতি হয়, আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। অবশ্যি টার্নার জানত, কিন্তু বেচারা মাথা-গরম করে মারা পড়ল। কামাল চুকচুক শব্দ করে খানিকক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করল।

তুমি কী বলতে চাও?

এখনো বোঝ নি? তা হলে শোন, জাহিদ যখন টার্নারকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছিল, তখন আমি কন্ট্রোল-রুমে কী করছিলাম, তুমি জান?

হাকশী কী বলতে গিয়ে থেমে গেল।

হ্যাঁ—ফ্রিপসি জানত। কিন্তু রি-অ্যাক্টর ঠিক না হলে ইলেকট্রিসিটি চালু হবে না, ইলেকট্রিসিটি চালু না হলে ফ্রিপসি চালু হবে না, আর ফ্রিপসি চালু না হলে তুমি জানতেও পারবে না আমি কী করেছি! আর সেটা যদি না জান, কোনোদিন রি-অ্যাক্টর চালু হবে না। কেমন মজা, দেখেছ?

জাহিদ মুখে একটা সরল ভাব ফুটিয়ে এনে হাকশীকে উপদেশ দেয়ার চেষ্টা করল, তোমার ইমার্জেন্সি ডায়নামোটার পুরো ইলেকট্রিসিটিটা ব্যবহার করে দেখ না, ফ্রিপসিকে চালু করা যায় কি না?

হাকশী জাহিদের কথা না শোনার ভান করল, কারণ সে খুব ভালো করে জানে ইমার্জেন্সি ডায়নামোর ক্ষমতা এত কম যে, প্লুটোনিকের সব ঘরে আলো পর্যন্ত জ্বালাতে পারে না—সেটি দিয়ে ফ্রিপসিকে চালু করা আর ইঁদুরছানা দিয়ে স্টীম রোলার টেনে নেয়ার চেষ্টা করা এক কথা।

হাকশী সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে সারা হলঘর ঘুরে বেড়াতে থাকে। বুঝতে পেরেছে, এরা দু'জন মিলে রি-অ্যাক্টরে একটা-কিছু করে এসেছে, সেটা কী ধরনের কাজ, কে জানে। নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর যথেষ্ট জটিল জিনিস। এটার বিরাট যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি অসংখ্য ইউনিটের কোথায় কি করে এসেছে জানতে না পারলে সেটা ঠিক করা মুশকিল। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ না হলে সেটি একেবারে অসম্ভব। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিল টার্নার—সে মারা যাওয়ার পরে কামাল ছাড়া আর কেউ নেই!

হাকশী কামালের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি যদি রি-অ্যাক্টরটা ঠিক করে দাও তাহলে তোমায় আমি ক্ষমা করে দেব।

ক্ষমা! কামাল খুব অবাক হবার ভান করল, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে? আমি আরো ভাবছিলাম কী করলে তোমায় ক্ষমা করা যায়। হাতে হাতকড়া রয়েছে তো কী হয়েছে—ক্ষমতাটুকু যে তোমার হাতে নেই বুঝতে পারছ না!

ভেবে দেখ কামাল! নিষ্ঠুর যন্ত্রণাময় মৃত্যু—

থাক থাক, মিছিমিছি কঠিন ভাষা ব্যবহার করে লাভ নেই। আমার নিষ্ঠুর মৃত্যু হলে তোমার মৃত্যুটি কি আর মধুর মৃত্যু হবে? একটু আগে আর পরে, এই যা। এ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই।

প্রচণ্ড ক্রোধে হাকশীর চোখ ধকধক করে জ্বলে উঠল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, বেশ! তাহলে ফোবোসে করে এক্ষুণি আমি পৃথিবীতে যাচ্ছি। পৃথিবীর সেরা সব রি-অ্যাক্টর ইঞ্জিনিয়ারদের ধরে আনব, তারপর দেখি।

জাহিদ হাসিমুখে বলল, একটা পাল নিয়ে যেও।

মানে?

মানে তোমার ফোবোস তিন মিনিটের বেশি চলবে না। ওটার রি-অ্যাক্টর বন্ধ হয়ে গেলে আর পৃথিবীতে পৌঁছুতে হবে না। মাঝখানে মঙ্গলের উপগ্রহ হয়ে ঝুলে থাকবে। তখন পাল টানিয়ে যদি যেতে পার—

হাকশী রসিকতায় এতটুকু হাসির ভঙ্গি করল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জাহিদের দিকে

তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল জাহিদের কথা কতটুকু সত্যি। তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, বেশ, কী করতে হয় আমি দেখব। সবাইকে যদি মরতেই হয়, চেষ্টা করে দেখব কারো কারো মৃত্যু যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক করা যায় কি না। বিজ্ঞানী হাকশীকে দেখেছ, উন্মাদ হাকশীকে দেখেছ, নিষ্ঠুর হাকশীকেও দেখেছ, স্যাডিস্ট হাকশীকে দেখবে এবার।

জাহিদ ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করল না। হাকশীর দু'জন দেহরক্ষী হাকশীর আদেশে ওদের নিয়ে গেল দু'টি ছোট খুপরিতে। তালা মেরে রাখল আলাদা আলাদা। পরস্পর যেন কথা না বলতে পারে কোনোভাবে।

ছোট ঘরটার শক্ত মেঝেতে শুয়ে শুয়ে জাহিদ পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখে। ঠিক যেরকমটি আশা করছিল সেরকমটিই ঘটেছে। হারুন হাকশীর হাত থেকে তাসের টেক্কা চলে এসেছে তাদের হাতে। এখন ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে হয়। হাকশী নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে নিজের লোকজন দিয়ে রি-অ্যাক্টর ঠিক করে ফেলতে। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না। কামাল অনেক ভেবেচিন্তে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা মাফিক রি-অ্যাক্টর দু'টিকে বিকল করেছে। কেউ যদি ঠিক করতেও পারে তাহলেও সেগুলি চালু করতে পারবে না। কারণ জ্বালানি হিসেবে যে-ছোট টিউবগুলি ব্যবহার করা হবে, তার ভেতরে এখন আসল আইসোটোপগুলি নেই।

জাহিদের ইচ্ছে হচ্ছিল আনন্দে একটু নেচে নেয়—কিন্তু সারা দিনের ধকলে খুব ক্লান্ত হয়ে আছে—একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার। হাতকড়াগুলির জন্যে অস্বস্তি হচ্ছিল, ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকা ভারি ঝামেলা, তবুও কিছুক্ষণের মাঝে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

চোখে তীব্র আলো পড়তেই জাহিদ ধড়মড় করে উঠে বসল। হাতে টর্চলাইট নিয়ে হাকশীর দেহরক্ষীরা ঘরে ঢুকেছে। জাহিদকে বেরিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। হঠাৎ করে কী হল বুঝতে না পেরে জাহিদ বাইরে বেরিয়ে আসে। কামালকেও ডেকে তুলে আনা হয়েছে।

কী হল? ঘুমুচ্ছিলাম, ডেকে তুললে, মানে?

জাহিদের কথার উত্তর না দিয়ে নাকভাঙা আমেরিকানটা তাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিল সামনে এগিয়ে যেতে।

খাঁটি বাংলায় একটা দেশজ গালি দিয়ে সে এগুতে থাকে। হারুন হাকশীর ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে ঢুকেই বুঝতে পারে হাকশী হঠাৎ করে কেন তাদের ডেকে এনেছে।

ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে জেসমিন বসে আছে। হাত দুটো পিছন দিকে শক্ত করে বাঁধা। জেসমিনের চোখ আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওদের দু'জনকে দেখে সে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

কামাল ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল—তার আগেই ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হাকশীর দেহরক্ষীরা ওকে তুলে ধরে চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। জাহিদ যদিও উন্মত্ততার কোনো লক্ষণ দেখায় নি, কিন্তু হাকশীর নির্দেশে তাকেও একটা চেয়ারে বেঁধে ফেলা হল।

এতক্ষণ পর হাকশীর মুখের ভাব সহজ হয়ে আসে। সে হাসিমুখে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে একটা সিগারেট ধরায়, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, তোমরা বুদ্ধিমান ছেলে! নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কী করতে চাইছি।

কামাল আর জাহিদ কোনো কথা বলল না। তীব্র দৃষ্টিতে হাকশীর দিকে তাকিয়ে রইল।

হাকশী ঘরে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে অনেকটা আপন মনে বলতে থাকে, প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাদের উপরই পরীক্ষাটা চালাব। কাউকে কোনো কিছু স্বীকার করানোর জন্যে প্রাচীনকালে কিছু কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। যেমন নখের নিচে গরম সুচ ঢুকিয়ে দেয়া, লোহার শিক গরম করে শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় ছ্যাঁকা দেয়া, পা বেঁধে উপর থেকে ঝুলিয়ে রাখা, পানির বালতিতে মাথা ডুবিয়ে রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও বীভৎস পদ্ধতি আছে, যেমন শরীর ছিঁড়ে সেখানে অ্যাসিড লেপে দেয়া, সীসা গরম করে কানে ঢেলে দেয়া, সাঁড়াশি দিয়ে একটা করে দাঁত তুলে নেয়া, আলপিন দিয়ে চোখ গলিয়ে দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। বলে এগুলি শেষ করা যায় না।

হাকশী তার বক্তৃতার ফলাফল দেখার জন্যে একবার আড়চোখে ওদের দু'জনকে দেখে নিল, তারপর আবার বলতে শুরু করল, প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাদের দু'জনের উপর এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর সারিয়ে নেব। কিন্তু পরে মনে হল, তোমরা যেরকম একগুঁয়ে, হয়তো দাঁত কামড়ে মরে যাবে তবু রাজী হবে না। তখন এই মেয়েটার কথা মনে হল। মনে আছে প্রথম যেদিন ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম, ওর জন্যে তোমাদের দরদ কেমন উথলে উঠেছিল?

হারামজাদা—শুওরের বাচ্চা! কামালের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল রাগে।

মিছিমিছি কেন মুখ খারাপ করছ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব—লাভ নেই কিছু। তার চেয়ে আমার কথা শোন। আমি যদি তোমাদের সামনে এই মেয়েটার গায়ে হাত দিই, তোমাদের কেমন লাগবে? যদি মনে কর নখের নিচে সুচ ঢুকিয়ে দিই? কিংবা ঝুলিয়ে রেখে চাবুক মারি—

মেরে দেখ না কুত্তার বাচ্চা—তোর গুষ্টি যদি আমি—

হাকশী হা-হা করে হেসে উঠল। বলল, রক্ত গরম তোমার কামাল সাহেব। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। আমি ইচ্ছে করলে এখন এই মেয়েটার শরীর চাকু দিয়ে চিরে ফেলতে পারি, চোখ তুলে ফেলতে পারি, দাঁত ভেঙে ফেলতে পারি—তোমাদের বসে দেখতে হবে। পারবে?

শুওরের বাচ্চা!

আমার কথার উত্তর দাও। পারবে দেখতে? একটু থেমে বলল, পারবে না। এসব দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে না—বিশেষ করে যদি সেটি কোনো পরিচিত মেয়ের উপর করা হয়। কাজেই আমার প্রস্তাবটা শোন—এই মুহূর্তে তোমরা দু' জন নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর দু'টি ঠিক করে দাও। যদি রাজি না হও, তাহলে—হাকশী দাঁত বের করে হাসল।

জেসমিন এতক্ষণ একটি কথাও বলছিল না। এবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ভাঙা গলায় বলল, তোমরা ওর কথায় রাজি হয়ো না। ও একটা পিশাচ। আমার জন্যে ভেবো না—যা হবার হবে! তোমরা কিছুতেই ওর কথায় রাজি হয়ো না।

হাকশী দু' পা এগিয়ে আসে। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, তোমার জন্যে ভাবতে নিষেধ করছ? অত্যাচার সহ্য করতে পারবে তাহলে?

জেসমিন ভীত চোখে তাকাল হাকশীর দিকে। হাকশী আরো ঝুঁকে পড়ে ওর দিকে। হাতের সিগারেটটা তুলে ধরে বলে, পরীক্ষা হয়ে যাক একটা, দেখি কতটুকু সহ্যক্ষমতা।

খবরদার! কামালের চিৎকারে সারা ঘর কেঁপে উঠল, কিন্তু হাকশীর মুখের মাংসপেশী এতটুকু নড়ল না। হাসিমুখে সিগারেটের আগুনটা জেসমিনের গলায় চেপে ধরল।

বন্ধ কর—বন্ধ কর বলছি শুওরের বাচ্চা, নইলে—প্রচন্ড ক্রোধে কামাল কথা বলতে পারে না।

জেসমিন শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়ে ধরল। মুহূর্তে ওর সারা মুখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে আর বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজে ওঠে। কুঁচকে ওঠা চোখের ফাঁক দিয়ে উষ্ণ পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে আর সে প্রচণ্ড যন্ত্রণাকে সহ্য করার জন্যে প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে ধরে। ঠোঁট কেটে দু' ফোঁটা রক্ত ওর চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ল—পোড়া মাংসের একটা মৃদু গন্ধ ঘরে ছড়িয়ে পড়ল ধীরে ধীরে।

কামাল চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে বসে নিজের ভিতরের প্রচণ্ড আক্রোশটা আটকে রাখতে চাইছিল। এবারে আর সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল, ঠিক আছে শুওরের বাচ্চা, আমি রাজি।

হাকশীর মুখের হাসিটা আরো বিস্তৃত হয়ে উঠল, এই তো বুদ্ধিমান ছেলের মতো কথা। সে সিগারেটটা সরিয়ে এনে সেটাতে একটা টান দিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসে, তাহলে এখনই কাজে লেগে যাও।

এখন পারব না। জাহিদ শীতল স্বরে বলল, বিশ্রাম নিতে হবে, কাল ভোরের আগে সম্ভব না।

বেশ! তাহলে বিশ্রাম নাও। কাল দশটার ভেতরে আমি সবকিছু ঠিকঠাক দেখতে চাই—

মামাবাড়ির আবদার পেয়েছ? একটা জিনিসের বারটা বাজাতে দু' মিনিট লাগে—কিন্তু সেটা ঠিক করতে দু' বছর লেগে যায়, জান না?

সে আমার জানার দরকার নেই। দশটার ভেতর ঠিক করে যদি না দাও তোমাদের জেসমিনকে আস্ত দেখতে পাবে না।

হাকশী! বাজে কথা বলে লাভ আছে কিছু? যেটা অসম্ভব সেটা আমরা কেমন করে করব? তুমি কি ভাবছ আমাদের কাছে আলাদীনের প্রদীপ আছে? ইচ্ছে করব আর ওমনি হয়ে যাবে?

কতক্ষণ লাগবে তা হলে?

সেটা না দেখে বলতে পারব না। এক সপ্তাহ লাগতে পারে, বেশিও লাগতে পারে।

হাকশী খানিকক্ষণ কী যেন ভাবল, তারপর বলল, ঠিক আছে, তোমাদের এক সপ্তাহ সময় দিলাম। এর ভেতর সব যদি ঠিকঠাক করে দিতে পার—আমি নিজে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখব, তারপর তোমাদের জেসমিন ছাড়া পাবে।

আর আমরা?

তোমরা? হাকশীর মুখে ধূর্ত একটা হাসি ফুটে উঠল। তোমাদের ব্যাপার পরে। তোমাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ! সেগুলি বিচার না করে কিছু বলতে পারব না।

AMARBOI.COM

দেখ হাকশী, জাহিদ নরম সুরে বলল, তুমি তো দেখলে আমাদের ক্ষমতা কতটুকু—ফ্রিপসির মত কম্পিউটারকে ঘোল খাইয়ে প্লুটোনিক প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। নেহায়েত জেসমিনের জন্যে শেষরক্ষা করতে পারলাম না। ঠিক কি না?

হাকশী স্বীকার করল যে, সত্যিই তা হতে যাচ্ছিল।

এবারে আমি আর কামাল যদি সুযোগ বুঝে নিজেদের ডান হাতের শিরাটা কেটে দিই তাহলে কেমন হয়?

মানে?

মানে আমরা যদি সুইসাইড করি তাহলে তোমার প্লুটোনিকের অবস্থাটা কী হয়?

কে আর ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করতে চায়। তবে প্লুটোনিকের রি-অ্যাক্টর ঠিক করে দেয়ার পর আমাদের যদি তুমি বিচারের নাম করে শেষ করে ফেল, তা হলে আগেই সুইসাইড করে ফেলাটা কি ভালো নয়? তাতে আমরাও মরব; তুমি তোমার দলবল নিয়ে মরবে। জেসমিনও মারা যাবে তবে অত্যাচারটা সহ্য করতে হবে না। আমরাই যদি না থাকি, কাকে ভয় দেখানোর জন্যে ওর উপর অত্যাচার করবে?

হাকশী খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, কি চাও তাহলে তোমরা?

আগে কথা দাও, রি-অ্যাক্টর ঠিক করে দেয়ার পরমুহূর্তে আমাদের তিনজনকে পৃথিবীতে ফেরত দিয়ে আসবে, তা হলেই আমরা কাজ শুরু করব।

হাকশী সরু চোখে জাহিদের দিকে তাকিয়ে থেকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, বেশ, কথা দিলাম।

তোমার কথায় বিশ্বাস করব কেমন করে?

সেটা তোমাদের ইচ্ছে। কিন্তু আমার কথাকে বিশ্বাস না করলে আর কিছু করার নেই।

জেসমিন হঠাৎ চিৎকার করে বলল, ওর কথা বিশ্বাস করো না। খবরদার, ওর কথা বিশ্বাস করো না—

কিন্তু জাহিদ আর কামাল হাকশীর কথা বিশ্বাস করল, কারণ এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

AMARBOI.COM

এক সপ্তাহ সময় শেষ হয়ে গেছে। আর ঘন্টাখানেক পরে জাহিদের হাকশীকে সবকিছু ঠিক করে বুঝিয়ে দেয়ার কথা। এই একটি সপ্তাহ জাহিদ আর কামাল প্রায় জন ত্রিশেক টেকনিশিয়ানকে নিয়ে কাজ করেছে। যদিও রি-অ্যাক্টরের ত্রুটিটি ছিল সাধারণ, কিন্তু কামাল টেকনিশিয়ানদের সাহায্যে পুরো রি-অ্যাক্টর সম্পূর্ণ টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলেছে, তারপর আবার জুড়ে দিয়েছে। ঠিক কোথায় কি জিনিসটি সারা হল, কোনো টেকনিশিয়ান বুঝতে পারে নি। বোঝার দরকারও ছিল না।

এই দীর্ঘ সময়টিতে জাহিদ একটা স্ক্রুও হাত দিয়ে নেড়ে দেখে নি। সে বসে বসে দিস্তা দিস্তা কাগজে কী-একটা অঙ্ক কষে গেছে। অঙ্কটির আকার-আকৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে, কম্পিউটারে কষা উচিত ছিল—কিন্তু এখানে সে কম্পিউটার পাবে কোথায়? তা ছাড়া অঙ্কটি সে কাউকে দেখাতে চায় না। ছয়দিনের মাথায় সে শুধু কামালকে একটা চিরকুটে কয়েকটা সংখ্যা লিখে দিল। সে-রাত্রে কামাল সব

টেকনিশিয়ানকে ছুটি দিয়ে একা একা অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছে। প্রথমে প্লুটোনিকের রি-অ্যাক্টরে, পরে ফোবোসের রি-অ্যাক্টরে। কি করেছে সেই জানে।

ফ্রিপসি অচল বলে হাকশী জাহিদ আর কামালের কাজকর্মে নাক গলাতে পারছিল না। কিন্তু সে গলাতে চাইছেও না। জেসমিনের খাতিরে এরা দু' জন যে রি-অ্যাক্টর দু'টি ঠিক করে দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কখন কি করছে না-করছে সে তাতে উদ্বিগ্ন হল না। সে শুধুমাত্র ভয় পাচ্ছিল এই অসহায় অবস্থায় পৃথিবীর মানুষ যদি তাকে আক্রমণ করে বসে! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তার প্লুটোনিক আর ফোবোস—দু'টিই পৃথিবীর রাডারের চোখে অদৃশ্য। সব রকম বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ এরা শোষণ করে নিতে পারে।

নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘন্টা আগেই কামাল আর জাহিদ হাকশীকে ডেকে পাঠাল। হাকশী হাসিমুখে সিগারেট টানতে টানতে হাজির হল, সামনে-পিছে দেহরক্ষী। ইদানীং এসব ব্যাপারে সে খুব সাবধান। কামাল কালিঝুলি মেখে শেষবারের মতো সবকিছু দেখে নিচ্ছিল—হাকশীকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

সব ঠিক হয়েছে?

কামাল হাকশীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, আগে জেসমিনকে ছেড়ে দাও। তারপর—

হাকশী পকেট থেকে চাবি বের করে ছুঁড়ে দিল একজনকে—জেসমিনকে ঘর খুলে নিয়ে আসার জন্যে। মিনিটখানেকের ভেতরেই জেসমিনকে নিয়ে সে ফিরে এল। এ কয় দিনে জেসমিন বেশ শুকিয়ে গেছে। রুক্ষ চুল, চোখের কোণে কালি। চেহারায় আতঙ্কের একটা ছাপ পাকাপাকিভাবে পড়ে গেছে।

AMARBOI.COM

হাকশী কামালকে বলল, বেশ, এবারে দেখাও।

কামাল এতটুকু না নড়ে বলল, তুমি আমাদের কি কথা দিয়েছিলে মনে আছে?

কি কথা?

প্লুটোনিক আর ফোবোসের রি-অ্যাক্টর দু'টি ঠিক করে দিলে আমাদের তিন জনকে ছেড়ে দেবে।

বলেছিলাম নাকি।

কামাল মুখ শক্ত করে বলল, হ্যাঁ, বলেছিলে।

বলে থাকলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব—তার আগে আমাকে দেখাও তোমরা রি-অ্যাক্টর দু'টি ঠিক করেছ।

দেখাচ্ছি। কিন্তু আমাদেরকে ছেড়ে দেবে তো?

সে দেখা যাবে—বলে হাকশী এগিয়ে গিয়ে কামালকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সুইচ প্যানেলের সামনে দাঁড়ায়। বিভিন্ন সুইচ অন্ করে সে রি-অ্যাক্টরটি চালু করার আয়োজন করে।

মিনিট তিনেকের ভেতরই রি-অ্যাক্টর চালু হয়ে ঘরে ঘরে তীব্র উজ্জ্বল আলো জ্বলে ওঠে, এয়ার কন্ডিশনারের গুঞ্জন শোনা যায়, প্লুটোনিকে প্রাণ ফিরে আসে।

হাকশীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সবকিছু পরীক্ষা করে সে ভারি খুশি হয়ে ওঠে। কামালের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, ভালোকাজ করেছ হে ছেলে। এবারে চল ফোবোসটি দেখে আসি।

দাঁড়াও।

জাহিদের গলার স্বর শুনে হাকশী থমকে দাঁড়াল। বলল, কি?

ফোবোসে কামালের সাথে আমি আর জেসমিনও যাব—তুমি ওটা চালু করে আমাদের পৃথিবীতে রেখে আসবে।

হাকশী এমন ভান করল, যেন কথাটি বুঝতে পারে নি।

আমার কথা বুঝেছ?

না। হাকশী ধূর্তের মতো হাসল। তোমাদের সত্যি সত্যি পৃথিবীতে রেখে আসব, এ ধারণা কেমন করে হল!

কামাল চমকে উঠে বলল, মানে?

মানে খুব সহজ। হাকশীর মুখ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। তোমাদের সাহস খুব বেড়ে গেছে—ভেবেছিলে আমাকে ভয় দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করবে। হাকশী ভয় পেতে অভ্যস্ত নয়। যদি কেউ ভয় দেখাতে চায়—

স্কাউণ্ড্রেল! কামাল তীব্র স্বরে চিৎকার করে উঠল, বেঈমান, মিথ্যুক।

কামাল! হাকশী সরু চোখে ওর দিকে তাকাল, তোমার ঔদ্ধত্যের শাস্তি তুমি পাবে—আমি নিজের হাতে তোমায়—

হঠাৎ কামাল পাগলের মতো হেসে উঠল। বিকৃত মুখে হাসতে হাসতে বলল, হাকশী! নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভেবেছ? ভেবেছিলে আমরা তোমায় বিশ্বাস করেছি? আমরা—

জাহিদ হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল, কামাল!

কামাল জাহিদের দিকে তাকাল এবং তারপর চুপ করে গেল। শুধু ওর মুখ থেকে হাসিটি মুছে গেল না, বরং আরো বিস্তৃত হয়ে উঠতে লাগল।

AMARBOI.COM

কামাল কী বলতে চাইছিল হাকশী বুঝতে পারল না। এক পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী বলছিলে?

কিছু না।

হাকশীর চোখ ধক করে জ্বলে উঠল। তুমি বলছিলে তোমরা আমায় বিশ্বাস কর নি। তার মানে নিশ্চয় কিছু-একটা করেছ। বল কি করেছ?

বলব না।

তার মানে কিছু-একটা করেছ?

না।

হাকশীর চেহারা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ছোট হয়ে যাওয়া সিগারেটটাকে হাতে নিয়ে সে জেসমিনের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর জেসমিনের চুল মুঠি করে ধরে নিজের কাছে নিয়ে আসে—কিছু বোঝার আগেই সে তার গালে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরে—

জেসমিন আর্তচিৎকার করে উঠল—কামাল ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল, কিন্তু তার আগেই তাকে দু'দিক থেকে ধরে ফেলল হাকশীর দেহরক্ষীরা।

বন্ধ কর্—বন্ধ কর্ হারামজাদা—আমি বলছি!

হাকশী সিগারেটটা সরিয়ে নেয়—কামাল অপ্রকৃতিস্থের মতো বলল, শুধু তুই শুনবি! অন্যদেরও ডাক্-

আমি শুনলেই চলবে। তুমি বল।

কামাল জাহিদের দিকে তাকাল, বলল, জাহিদ, বলেই দিই। কোনো ক্ষতি হবে না, সময় তো নেইও—কিছু করতে চাইলেও করতে পারবে না।

জাহিদ চিন্তিত মুখে বলল, বলতে তো হবেই। নইলে বেচারি জেসমিন শুধু শুধু কষ্ট পাবে। ঠিক আছে, আমি বলছি।

জাহিদ হাকশীর দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর কীভাবে কাজ করে নিশ্চয়ই তুমি জান। চেইন রিঅ্যাকশান কন্ট্রোল করার জন্যে ক্যাডমিয়াম রড থাকে। কেউ যদি ক্যাডমিয়াম রড কেটে ছোট করে দেয় তাহলে কি হবে, জান নিশ্চয়ই। চেইন রি-অ্যাকশান শুরু হবে ঠিকই, কিন্তু কন্ট্রোল করা যাবে না। যে চেইন রি-অ্যাকশান কন্ট্রোল করা যায় না, তাকে বলে অ্যাটম বোমা।

কি বলতে চাইছ তুমি—তোমরা রি-অ্যাক্টরে—

হ্যাঁ, আমরা প্লুটোনিকের রি-অ্যাক্টরের ক্যাডমিয়াম রড কেটে ছোট করে দিয়েছি। কাজেই এই রি-অ্যাক্টরটা আসলে একটা অ্যাটম বোমা হয়ে গেছে। অনেক কষ্ট করে হিসেব করে বের করতে হয়েছে, ঠিক কতটুকু কেটে নিলে দশ মিনিট পরে বিস্ফোরণটি ঘটে। বন্ধ করার উপায় নেই—তার আগেই দশ মিনিট পার হয়ে যাবে—

দশ মিনিট? হাকশী ঘড়ির দিকে তাকাল—তারপর জাহিদের দিকে তাকাল তীব্র চোখে, সান অব বিচ! ব্লক হেডেড্ ফুল—

কেন মিছিমিছি গালিগালাজ করছ! এখন সবাই মিলে মারা যাব, মাথা-গরম করে লাভ কি! অনেক লোক মেরেছ তুমি হাকশী—পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তুমি অনেক মহাকাশযান ধ্বংস করেছ—এখন দেখ, মরতে কেমন লাগে! আর দুই-এক মিনিট, তারপর তুমি তোমার দলবল নিয়ে চলে যাবে নরকে আর আমরা স্বর্গে!

হঠাৎ হাকশী ধরে রাখা জেসমিনকে ছেড়ে দিয়ে দু'পা এগিয়ে গেল, তারপর চিৎকার করে দেহরক্ষীদের বলল, আমার যারা লোকজন রয়েছে তাদের খবর দিয়ে দশ সেকেণ্ডের ভেতর ফোবোসে চলে আস—আমরা ফোবোসে করে এক্ষুণি প্লুটোনিক ছেড়ে চলে যাব।

কামাল হিংস্রভাবে বলল, না—তুই কিছুতেই ফোবোস চালু করতে পারবি না—ওটা চালু হতে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় নেয়—

হাকশী কামালের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কিছুই জান না ছোকরা। ফোবোস পাঁচ সেকেণ্ডে চালু করা যায়। তোমরা মর—নিজেদের তৈরি অ্যাটম বোমায় নিজেরা মরে শেষ হয়ে যাও! আমি বেঁচে থাকতে জন্মেছি—শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকব।

সে দ্রুত ছুটে গেল সিঁড়ি বেয়ে ফোবোসের দিকে।

জাহিদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—জেসমিন মুখ ঢেকে বসে পড়ল সেখানে।

তিরিশ সেকেণ্ডের ভেতর হাকশী তার নিজের লোকজন নিয়ে ফোবোসে করে পালিয়ে গেল। প্লুটোনিকে রয়ে গেল শুধুমাত্র বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা নির্দোষ নিরীহ বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানরা। প্লুটোনিক আর এক মিনিটের ভেতর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে খবর পেয়ে অধিকাংশ লোকই পাগলের মতো হয়ে গেছে। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো দাপাদাপি করছে অনেকে—। অল্প কয়জন হাঁটু গেড়ে শেষবারের মতো প্রার্থনা করছে—চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে টপটপ করে।

দেয়ালে টাঙানো মস্ত স্ক্রীনটা হঠাৎ আলোকিত হয়ে সেখানে হাকশীর চেহারাটা ফুটে উঠল। ফোবোস থেকে সে প্লুটোনিকের সাথে যোগাযোগ করেছে।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তোমাদের কেমন দেখায় তাই দেখতে চাইছি।

দেখ—জাহিদ হাকশীর দিকে তাকিয়ে হাসল। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে আমি কেমন হাসতে পারি, দেখেছ?

তাই দেখছি। দুঃখ থেকে গেল তোমাদের দু'জনকে নিজের হাতে শেষ করতে পারলাম না। তা হলে দেখতাম কিভাবে হাসি বের হয়!

আমারও একই দুঃখ—তোমায় নিজহাতে মারতে পারলাম না।

হাকশী হো-হো করে হেসে উঠল—নিজহাতে বা পরের হাতে কোনোভাবেই হাকশীকে কেউ মারতে পারবে না—

এক সেকেণ্ড হাকশী। একটা খুব জরুরি কথা মনে হয়েছে—

কি?

তোমায় বলেছিলাম না, প্লুটোনিকের নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরের ক্যাডমিয়াম রড কেটে ওটাকে অ্যাটম বোমা বানিয়ে দিয়েছি? আসলে একটা ছোট ভুল হয়ে গেছে। ফোবোস বলতে আমি ভুলে প্লুটোনিক বলে ফেলেছিলাম।

হাকশী ভয়ংকর মুখে বলল, মানে?

মানে প্লুটোনিকের রি-অ্যাক্টর ঠিকই আছে! ফোবোসের রি-অ্যাক্টর আসলে অ্যাটম বোমা হয়ে গেছে। তুমি তোমার দলবল নিয়ে অ্যাটম বোমার উপর বসে আছ! এক্ষুণি ফাটবে ওটা—দশ পর্যন্ত গোনার আগে!

প্রচণ্ড ক্রোধ, দুঃখ, হতাশা আর আতঙ্কে হাকশীর মুখ ভয়াবহ হয়ে উঠল। কী যেন বলতে চাইল—গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। আবার কী যেন বলতে চাইল—তারপর বিকৃত মুখে হাঁটু ভেঙে সে ফোবোসের ভিতরে পড়ে গেল—

টেলিভিশনের পর্দা হঠাৎ করে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। ঝুলিয়ে রাখা কাউন্টারগুলি কঁ-কঁ শব্দ করে বুঝিয়ে দিল, কাছাকাছি কোথাও একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে।

জাহিদ একটা নিঃশ্বাস ফেলে কামালের দিকে তাকাল। তারপর দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

বেঁচে গেলাম তা হলে!

আমরা বেঁচে গেলাম, পৃথিবীও বেঁচে গেল।

যাই বলিস না কেন, অভিনয়টা দারুণ হয়েছিল! বিশেষ করে ঐ পাগলের মতো হেসে উঠে তুই যখন বললি—

থাক, আর বলতে হবে না! তুই নিজেও কিছু কম করিস নি!

দু'জনে হো-হো করে হেসে উঠে জেসমিনের কাছে এগিয়ে যায়। প্লুটোনিকের সবাই তখন ওদের কাছে ছুটে আসছে—প্লুটোনিক কীভাবে রক্ষা পেল এবং হাকশী কীভাবে ধ্বংস হল জানার জন্যে।

কামাল আর জেসমিনকে সবার অভিনন্দন নেয়ার দায়িত্ব দিয়ে জাহিদ হাকশীর নিজের ঘরে চলে এসেছে। এখানে পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে, যেটা এতদিন শুধুমাত্র হাকশী নিজে ব্যবহার করতে পারত।

সুইচ অন করে জাহিদ চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে। পৃথিবী থেকে প্রায় দু' কোটি মাইল দূরে, কাজেই মিনিট চারেক সময় লাগবে। বাইরে আনন্দ স্ফূর্তির ঢেউ বইছে। বন্ধ ঘরেও মাঝে মাঝে চিৎকারের শব্দ চলে আসছিল। জাহিদ আপন মনে হাসে—কিছুক্ষণের মাঝে কামালের মতো একটা কাঠগোঁয়ার লোক পপুলার হিরো হয়ে গেছে!

স্ক্রীনে আবছা পৃথিবীটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে থাকে। জাহিদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—পৃথিবী। তার সাধের পৃথিবী! তাকিয়ে থাকতে থাকতে কী-এক অজানা আবেগে ওর বুকের ভেতর যন্ত্রণা হতে থাকে, চোখে পানি জমে আসে।

ঘরে কেউ নেই, তবু জাহিদ এদিক-সেদিক তাকিয়ে চোখের পানি মুছে ফেলল। তারপর মাইক্রোফোনটা টেনে নিল নিজের দিকে।

পরিশিষ্ট

১। নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর : পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহার করার জন্যে যেখানে নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটানো হয়।

২। রাডার : বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যে দূরবর্তী কোনো বস্তুকে খুঁজে বের করার পদ্ধতি।

৩। ফ্লাইং সসার : অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসা বিশেষ ধরনের মহাকাশযান সম্পর্কিত আলোচিত গুজব। পিরিচের মতো আকৃতি বলে নাম ফ্লাইং সসার।

৪। লেসার : প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী আলোকরশ্মি।

৫। আইসোটোপ : একই পরমাণুর বিভিন্ন নিউক্লিয়াস, যেখানে প্রোটনের সংখ্যা সমান, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন।

৬। ক্রিটিক্যাল মাস : বিশেষ ধরনের নিউক্লিয়াস; যে-নির্দিষ্ট ভরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

৭। ভাইরাস : নিচুস্তরের অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় জীব। অনেক ভয়াবহ রোগ বিভিন্ন ভাইরাসের কারণে ঘটে থাকে।

৮। চেইন রি-অ্যাকশান : একটি নিউক্লিয়াস ভাঙা থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক নিউক্লিয়াস ভেঙে পারমাণবিক শক্তি পাওয়ার নিরবচ্ছিন্ন পদ্ধতি।

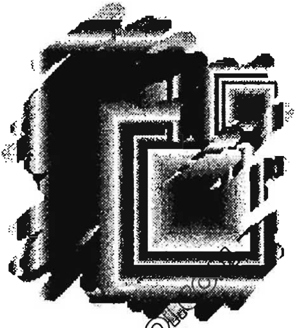

ক্রুগো

উৎসর্গ

রফিকুল আলম খাজা
বন্ধুবরেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. মৃত্যুদণ্ডের আসামী

কিছুদিন আগে আমাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে। যে অপরাধের জন্যে আমাকে মৃত্যুদণ্ডের মতো বড় শাস্তি দেয়া হয়েছে, সেটিকে আদৌ অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা যায় কী না সেটি নিয়ে আমি কারো সাথে তর্ক করতে চাই না। অপরাধ এবং শাস্তি দুই–ই খুব আপেক্ষিক ব্যাপার, রাষ্ট্র যেটিকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করেছে, সেটি আমার কাছে নিছক কৌতূহল ছাড়া আর কিছু ছিল না।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাবার পর থেকে আমার দৈনন্দিন জীবন আশ্চর্য রকম পাল্টে গেছে। বিচার চলাকালীন সময়ে আমার সেলটিকে অসহ্য দম–বন্ধ–করা একটি ক্ষুদ্র কুঠুরি বলে মনে হত। আজকাল এই কুঠুরির জন্যেই আমার মনের ভেতর গভীর বেদনাবোধের জন্ম হচ্ছে। ছোট জানালাটি দিয়ে এক বর্গফুট আকাশ দেখা যায়, আমি ঘন্টার পর ঘন্টা সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। নীল আকাশের পটভূমিতে সাদা মেঘের মাঝে এত সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকতে পারে আমার জানা ছিল না। ইদানীং পৃথিবীর সবকিছুর জন্যে আমার গাঢ় ভালবাসার জন্ম হয়েছে। আমার উচ্ছিষ্ট খাবারে সারিবাঁধা পিঁপড়েকে দেখে সেদিন আমি তীব্র বেদনা অনুভব করেছি।

গত দুই সপ্তাহ থেকে আমি ধীরে ধীরে নিজেকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত করেছি, এটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। অকারণে জগৎ–সংসারের প্রতি তীব্র অভিমানবোধে যুক্তিতর্ক অর্থহীন হয়ে আসতে চায়। আমার বয়স বেশি নয়, আমি অসাধারণ প্রতিভাবান নই, কিন্তু আমার তীব্র প্রাণশক্তি আমাকে সাফল্যের উচ্চশিখরে নিয়ে গিয়েছিল। আমার জীবনকে উপভোগ, এমন কি অর্থপূর্ণ করার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু আমাকে সে সুযোগ দেয়া হল না।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাবার পর আমার জীবনের শেষ কয়টি দিনের জন্যে কিছু বাড়তি সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমার খাবারে প্রোটিনের অনুপাত বাড়ানো হয়েছে, ভালো পানীয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, বাথরুমের ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, সর্বোপরি খবরের কাগজ এবং বইপত্র পড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পৃথিবীর দৈনন্দিন খবরের মতো অর্থহীন ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। আমি প্রথম দিন একবার খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে আর দ্বিতীয় বার সেটি খোলার উৎসাহ পাই নি। দূর মহাকাশে একটি মনুষ্যবিহীন স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান পাঠানো–সংক্রান্ত একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিযান নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা ছিল, আমার তাতে কোনো উৎসাহ ছিল না।

মাঝে মাঝে আমি কাগজে আঁকিবুকি করি বা কিছু লিখতে চেষ্টা করি, তার বেশিরভাগই অসংলগ্ন এবং আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন চিন্তা। আমার মৃত্যুর পর হয়তো এগুলো আমার ব্যক্তিগত ফাইলে দীর্ঘকাল অবস্থান করবে। আমি কয়েক বার প্রিয়জনকে চিঠি লেখার কথা ভেবেছি, কিন্তু আমার প্রিয়জন বেশি নেই, যারা আছে তাদের দুঃখবোধকে তীব্রতর করার অনিচ্ছা আমাকে নিরুৎসাহিত করেছে।

আজকাল আমার সাথে দিনে তিন বার এই সেলটির ভারপ্রাপ্ত রক্ষকের সাথে দেখা হয়, তিন বারই সে আমার জন্যে খাবার নিয়ে আসে। আগে সে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করত, মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাবার পর থেকে খানিকটা সদয় ব্যবহার করা শুরু করেছে। গত রাতে সে নিজের পকেট থেকে আমাকে একটা সিগারেট পর্যন্ত খেতে দিয়েছে, আমি সিগারেট খাই না জেনেও! আমি লোকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করি, মাঝারি বয়সের সাদাসিধে নির্বোধ লোক, সরকারের নির্দেশিত বাঁধাধরা গণ্ডির বাইরে চিন্তা করতে অক্ষম। ব্যক্তিগত জীবনে এরা সাধারণত সুখী হয়। জীবনের শেষ কয়টা দিন আরেকটু বুদ্ধিমান একটি প্রাণীর সংস্পর্শে থাকতে পারলে মন্দ হত না। আমাকে যেদিন হত্যা করা হবে সেদিন আরো কিছু মানুষের সাথে দেখা হবার কথা। প্রাচীন কালের নিয়ম অনুযায়ী আমাকে চেয়ারে বেঁধে গুলি করে হত্যা করা হবে। মৃত্যুদণ্ড প্রতিশোধমূলক শাস্তি, এটিকে যতদূর সম্ভব যন্ত্রণাদায়ক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাত থেকে দশ জন মানুষ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে গুলি করে থাকে। মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই যন্ত্রণা খুব অল্প সময়ের জন্যে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নাকি সারাজীবনের স্মৃতি একসাথে মাথায় উঁকি দিয়ে যায়, আপাতত সেই ব্যাপারটি নিয়ে খানিকটা কৌতূহল ছাড়া আমাকে দেয়ার মতো ভবিষ্যতে কিছু অবশিষ্ট নেই—অন্তত আমি তাই জানতাম।

তাই যেদিন সকালবেলা আমার সেলের দরজা খুলে দু'জন গার্ডসহ একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ লোক আমার সাথে দেখা করতে এল, আমার তখন বিস্ময়ের সীমা ছিল না। লোকটি অত্যন্ত কম কথার মানুষ, আমাকে এবং আমার ক্ষুদ্র অগোছাল ঘরটিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে এল। বলল, আপনার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি।

আমি মাথা নাড়লাম।

আপনি রাজি থাকলে আপনার মৃত্যুদণ্ড প্রচলিত নিয়মে গুলি না করে অন্যভাবে করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শুধু এটুকু বলার জন্যে আপনি কষ্ট করে এসেছেন?

না।

কী বলবেন বলুন। অপ্রচলিত নিয়মে মারা যাওয়ার জন্যে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

আপনি হয়তো জানেন মনুষ্যবিহীন একটা স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান কিছুদিনের মাঝেই মহাকাশে রওনা হচ্ছে।

হঠাৎ করে এই অপ্রাসঙ্গিক কথাটি শুনে আমি খুব অবাক হয়ে উঠি। আমি সত্যি সত্যি খবরের কাগজে এটি দেখেছিলাম।

উচ্চপদস্থ লোকটি শান্ত স্বরে বলল, আপনি রাজি হলে আপনাকে ঐ মহাকাশযানে তুলে দেয়া হবে।

মহাকাশযানটি আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না?

আসবে।

আমি ফিরে আসব না?

আপনিও ফিরে আসবেন, কিন্তু আপনি জীবিত থাকবেন না।

কেন?

জানি না, এখন পর্যন্ত এই অভিযানে কেউ জীবিত ফিরে আসে নি।

ও! আমি চুপ করে যাই। পৃথিবীতে গুলি খেয়ে মারা যাওয়ার বদলে মহাকাশের কোনো-এক অজানা পরিবেশে অজ্ঞাত কোনো-এক কারণে মারা যাওয়ার জন্যে আমি নিজের ভেতরে কোনো উৎসাহ খুঁজে পেলাম না। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কতদিনের অভিযান?

প্রায় এক বছর, যেতে ছয় মাস, ফিরে আসতে আরো ছয় মাস।

আমি প্রথমবার খানিকটা উৎসাহিত হলাম। যে দুই সপ্তাহের ভেতর মারা যাচ্ছে তার কাছে এক বছর বা ছয় মাস অনেক সময়, যদিও সেটি মহাকাশের নির্জন, নির্বান্ধব, নিঃসঙ্গ পরিবেশ। কিন্তু আমার উৎসাহ পুরোপুরি নিভে গেল লোকটির পরের কথা শুনে। সে বলল, অভিযানের শুরুতে আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হবে, আপনার ঘুম ভাঙবে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে। সেখানে আপনার কী হবে আমি জানি না, কিন্তু কোনো কারণে আপনি মারা যাবেন, আপনার মৃতদেহ পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে।

আমার মৃতদেহ নিয়ে কী করা হবে সে বিষয়ে আমার কোনো কৌতূহল ছিল না, লোকটি সেটা আমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরে চুপ করে গেল। আমি বললাম, তার মানে যদিও প্রায় ছয় মাস পরে আমি আক্ষরিক অর্থে মারা যাব কিন্তু আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়ার পর আমার বেঁচে থাকা না-থাকার কোনো অর্থই নেই। কাজেই আমার বেঁচে থাকা শেষ হয়ে যাবে অভিযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে।

বলতে পারেন।

অভিযান শুরু হবে কবে?

ঠিক এক সপ্তাহ পরে।

শুনে খুব স্বাভাবিক কারণে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। অনেক কষ্টে গলার স্বরকে স্বাভাবিক রেখে বললাম, আপনি হয়তো জানেন না, কাউকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়ার পর সময় তার কাছে কত মূল্যবান হয়ে ওঠে। আমার এখনো দুই সপ্তাহ সময় আছে, আমি সেটা অর্ধেক করব কেন?

লোকটি ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আপনি যেভাবে বেঁচে আছেন, তাতে এক সপ্তাহ আর দুই সপ্তাহের মাঝে খুব পার্থক্য থাকার কথা নয়।

আমি কোনো কথা না বলে তার দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে রইলাম। মানুষ এরকম হৃদয়হীন কথা কীভাবে বলতে পারে! লোকটিকে কিছু বলতে আমার ঘৃণা হল। আমি মেঝেতে শব্দ করে থুথু ফেলে কোনায় সরে গেলাম। লোকটি এক পা এগিয়ে এসে বলল, আপনার বেঁচে থাকার সময় যদিও কমে যাবে, কিন্তু বেঁচে থাকার গুণগত মান অনেক বাড়িয়ে দেয়া হবে।

AMARBOI.COM

মানে?

আপনি যদি রাজি থাকেন আপনাকে এক সপ্তাহ জেলের বাইরে আপনার ইচ্ছেমতো থাকতে দেয়া হবে।

আমার বুকের ভেতর রক্ত ছলাৎ করে ওঠে, পুরো এক সপ্তাহ স্বাধীন মানুষের মতো থাকতে পারব? জেলখানায় চার দেয়ালের ভেতর এক চিলতে আকাশ নয়, বাইরে, সুদীর্ঘ সমুদ্রতটে সুবিশাল আকাশ? মানুষজন, তাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার কাছাকাছি সাত-সাতটি দিন?

আপনি রাজি থাকলে এখনই আমাকে জানাতে হবে।

এখনই?

হ্যাঁ।

এই সাতদিন আমি পুরোপুরি স্বাধীন মানুষের মতো থাকতে পারব?

হ্যাঁ।

আমি যদি পালিয়ে যাই? আর কোনোদিন যদি আপনাদের কাছে ফিরে না আসি?

এই প্রথম বার লোকটিকে আমি হাসতে দেখলাম, সত্যি কথা বলতে কি, তাকে হাসিমুখে বেশ একজন সদয় মানুষের মতোই দেখাল। লোকটি হাসি গোপন করার কোনো চেষ্টা না করেই বলল, আপনি ফিরে আসবেন।

যদি না আসি?

আপনার শরীরে যে ট্রাকিওশান লাগানো হবে, সেটি আপনাকে ফিরিয়ে আনবে।

ট্রাকিওশান এক ধরনের ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক পাল্‌স্ জেনারেটর। এটি ইনজেকশান দিয়ে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। রক্তের সাথে মিশে গিয়ে এটি শরীরের যে-কোনো জায়গায় পাকাপাকিভাবে বসে যেতে পারে। কোনো মানুষের মস্তিষ্কের কম্পনের স্পেকট্রাম জানা থাকলে এই ট্রাকিওশান দিয়ে তাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আমি ট্রাকিওশানের নাম শুনেছিলাম, কখনো কারো উপরে ব্যবহার করা হয়েছে শুনি নি। নিজের উপর ব্যবহার করা হবে খবরটি আমাকে আতঙ্কিত করে তোলে, শুকনো গলায় বললাম, পুরোপুরি স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন কথাটি তাহলে সত্যি নয়। আমাকে সবসময়েই নজরে রাখা হবে।

না, তা ঠিক নয়। লোকটি মাথা নেড়ে বলল, আপনাকে স্বাধীনভাবেই থাকতে দেয়া হবে। শুধুমাত্র মহাকাশযানটি রওনা দেবার ছয় ঘন্টা আগে ট্রাকিওশানটা চালু করা হবে আপনাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে। আপনি নিজেই যদি এসে যান তাহলে সেটিও করতে হবে না।

তার কি নিশ্চয়তা আছে?

নেই, কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু আমি বলছি, আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে।

আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম।

আমাকে ওজন করা হল, শরীরের প্রতিটি অংশের ছবি নেয়া হল, রক্তচাপ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্থায়িত্ব মাপা হল। রক্ত সঞ্চালনের গতি, মস্তিষ্কের তরঙ্গ এবং অনুভূতির সাথে সেই তরঙ্গের সম্পর্ক বের করা হল। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তির পরিমাপ নেয়া হল। শব্দতরঙ্গের প্রতিফলন দিয়ে শরীরের যকৃৎ, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ও কিডনির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবতীয় অংশের ছবি নেয়া হল। তেজস্ক্রিয় দ্রব্য রক্তের সাথে মিশিয়ে শরীরের মেটাবোলিজমের হার বের করা হল। আমার রক্তের প্রকৃতি, নিউরোনের সংখ্যা পরিমাপ করা হল।

সবশেষে আমার শরীরে ক্ষুদ্র একটি ট্রাকিওশান প্রবেশ করিয়ে দেয়া হল।

২. লুকাস নামের রবোট

আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে শহরের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত অঞ্চলের মাঝে হাঁটছিলাম। দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকদের অঞ্চল এটি, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছাড়া আর কেউ আসতে পারে না। আমার পক্ষে কখানোই এখানে আসা সম্ভব হত না, কিন্তু আমাকে স্বাধীনভাবে ঘুরতে দেয়ার সময় কর্মকর্তারা আমাকে একটা ছোট লাল কার্ড দিয়েছে, এই কার্ডটির ক্ষমতার কোনো সীমা নেই। অত্যন্ত বড় বিজ্ঞানী বা অত্যন্ত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্তকর্তা ছাড়া আর কেউ এই লাল কার্ড ব্যবহার করতে পারে না, আমাকে সম্ভবত করুণা করে দেয়া হয়েছে। এটি ব্যবহার করে যে-কোনো যানবাহনে যে-কোনো অঞ্চলে যাওয়া যায়, যে-কোনো হোটেল-রেস্টুরেন্ট বা অবসর বিনোদনের সুযোগ নেয়া যায়, এমন কি সরকারি নিয়ন্ত্রণে চালিত গোপন প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যন্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। এই কার্ডটির ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্যে আমি অতিপারমাণবিক অস্ত্র কারখানা থেকে ঘুরে এসেছি।

আজ আমার জীবনের শেষ সপ্তাহের শেষ দিনটি। আগামীকাল দুপুরে আমার মহাকাশ কেন্দ্রে ফিরে যাবার কথা। সন্ধ্যাবেলা মহাকাশযানটি আমাকে নিয়ে আমার অন্তিম যাত্রা শুরু করবে। কথাটি ভুলে থাকার চেষ্টা করে লাভ নেই, এটি বিকারগ্রস্ত মানুষের স্বপ্নের মতো আমার মাথায় জেগে আছে।

আমি একটা সম্ভ্রান্ত বিপণিকেন্দ্রের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় খানিকটা উত্তেজনা লক্ষ করলাম। বেশ কয়েকটা পুলিসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ইতস্তত সশস্ত্র পুলিস, হাতে রনোগান। দেখে মনে হল বেশ খানিকটা এলাকা তারা ঘিরে রেখেছে, নিশ্চয়ই কয়েকটা রবোট্রন ধরা পড়েছে। রবোট্রন রবোটের সবচেয়ে শক্তিশালী আর উন্নত গোত্রটি। পাঁচ বছর আগে তাদের ধ্বংস করার আইন পাস করা হয়েছে, রবোট্রন গোষ্ঠী যদিও মানুষের তৈরি, তারা মানুষের এই আইন মেনে নিতে রাজি হয় নি। বিরাটসংখ্যক রবোট্রন লোকালয় থেকে পালিয়ে যায়, সেই থেকে তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করা হচ্ছে। রবোট্রন জীবিত প্রাণী নয়, একটি যন্ত্রবিশেষ, তাই হত্যা শব্দটি তাদের জন্যে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু আত্মগোপন করার জন্যে তারা মানুষের এত চমৎকার রূপ নিয়েছে যে অঙ্গব্যবচ্ছেদ না করে আজকাল আর বলা সম্ভব নয় কোনটি মানুষ, আর কোনটি রবোট্রন। আমি জাদুঘরে বিকল রবোট্রন দেখেছি, সত্যিকারের রবোট্রন কখনো দেখিনি, তাই খানিকটা কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বিপণিকেন্দ্রটি থেকে লোকজন বের হয়ে আসছিল, আমি আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম তাদের মাঝে কে রবোট হতে পারে। নানা বয়সের, নানা আকারের, নারী-

পুরুষ-শিশু কাউকে রবোট মনে হয় না। এমন সময় দু' জন তরুণ-তরুণীকে তাড়াহুড়া করে বের হতে দেখা গেল, দেখে ভুলেও রবোট বলে সন্দেহ হয় না। দরজায় দাঁড়ানো পুলিস অফিসারটি তাদের থামিয়ে কী-সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। একটু পরেই পুলিস অফিসারটি তাদের কী-একটা আদেশ দিল এবং দু' জন বাধ্য শিশুর মতো দেয়ালের পাশে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পুলিস অফিসারটি গলায় লাগানো চৌকোনা বাক্সে কার সাথে জানি খানিকক্ষণ কথা বলে মেগাফোনটা টেনে নিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করল, এই দু'টি রবোটের এক শ' ফুটের ভেতরে কেউ থাকবেন না, এখন এই দু'টিকে ধ্বংস করা হবে।

আমি অবাক হয়ে এই দু' জন তরুণ-তরুণীর দিকে তাকিয়ে রইলাম, এরা তাহলে রবোট! কী মিষ্টি চেহারার মেয়েটি আর মুখে কী গাঢ় বিষাদের ছায়া! ছেলেটি মেয়েটির মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী যেন বলল, শুনে মেয়েটি মাথা নিচু করে রইল কিছুক্ষণ, যখন মাথা তুলল তখন চোখে পানি টলটল করছে। ছেলেটি এবারে মেয়েটিকে আলিঙ্গন করে তারপর ছেড়ে দেয়। দু' জন মাথা নিচু করে আবার দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়ায়, মাথা নেড়ে বলে, তারা প্রস্তুত। পুলিস অফিসারটি হাতের বিশাল অস্ত্রটি তুলে ধরে মিটার ঘুরিয়ে কী যেন ঠিক করে নেয়, তারপর সোজাসুজি মেয়েটির বুকে গুলি করল। আমি শিউরে উঠে সামনের রেলিঙটা খামচে ধরি, এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আসবে এ ধরনের একটা অনুভূতি হচ্ছিল, কিন্তু সেরকম কিছু হল না। বুকের মাঝে প্রায় চার ইঞ্চি ব্যাসের একটা ফুটো হয়ে গেল, ভেতর থেকে বারকয়েক বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ, সাথে সাথে কিছু কালো ধোঁয়া বের হয়ে আসে। মেয়েটি কাঁপতে কাঁপতে অনেক কষ্টে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতে করতে একসময় হাঁটু ভেঙে পড়ে যায়। ছেলেটি ঠোঁট কামড়ে একদৃষ্টে পুলিস অফিসারটির দিকে তাকিয়ে রইল। হাতের অতিকায় অস্ত্রটি এখন তার দিকে উঁচু করে ধরা হয়েছে।

একটি রবোট ধ্বংস করা আর একটি বাইসাইকেল ধ্বংস করার মাঝে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। কাজেই একটা সাইকেল ধ্বংস করার দৃশ্যে যেটুকু কষ্ট হওয়া উচিত, একটি রবোট ধ্বংস হওয়ার দৃশ্যে তার থেকে বেশি কষ্ট হওয়া উচিত না। কিন্তু মেয়েটির যন্ত্রণাকাতর মুখ এবং ছেলেটির ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়ে থাকার দৃশ্যে আমি একটি কঠিন আঘাত পেলাম। কী করছি বোঝার আগেই আমি আবিষ্কার করলাম, আমি ছুটে পুলিস অফিসারের হাত চেপে ধরেছি।

এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পুলিস অফিসারটি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, দাঁড়ান এক সেকেণ্ড!

পুলিস অফিসারটি ট্রিগার টানতে গিয়ে থেমে গেল, চোখের কোনা দিয়ে রবোট দু'টির উপর চোখ রাখতে রাখতে বলল, কি ব্যাপার?

আমি কী ভেবে পকেট থেকে লাল কার্ডটি বের করলাম, সাথে সাথে জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হল, পুলিস অফিসারটি অস্ত্রটি নামিয়ে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল। আমি লাল কার্ডটি তার হাতে দিলাম, সে সেটি তার কোমরে ঝোলানো কমিউনিকেশান বাক্সে প্রবেশ করিয়ে মূল কম্পিউটার থেকে এই লাল কার্ডের মালিকের পরিচয় বের করে আনল। বাক্সে আমার চেহারা ফুটে ওঠার পর আমার সাথে চেহারা মিলিয়ে নিয়ে কার্ডটি ফেরত দিয়ে বলল, আপনার জন্যে কী

করতে পারি?

আমি রবোট তরুণটির দিকে দেখিয়ে বললাম, আমার এই রবোটটি দরকার।

পুলিস অফিসারটির মাথায় বাজ পড়লেও সে এত অবাক হত কিনা সন্দেহ। খুব তাড়াতাড়ি সে মুখের ভাব স্বাভাবিক করে বলল, আপনার সত্যি দরকার?

হ্যাঁ।

বেশ, আপনার যা ইচ্ছা। তারপর গলা নামিয়ে বলল, আপনি নিশ্চয়ই জানেন এরা অত্যন্ত ভয়ংকর প্রকৃতির?

জানি।

বেশ, বেশ। পুলিস অফিসারটি হাত নেড়ে তরুণটিকে ডাকল। তরুণটি এক পা এগিয়ে এসে আবার মেয়েটির কাছে ফিরে যায়, তাকে সোজা করে শুইয়ে খোলা চোখ দু'টি যত্ন করে বন্ধ করে দিল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার দিকে এগিয়ে আসে।

পুলিস অফিসারটি কিছু বলার আগেই আমি তার হাত ধরে টেনে বললাম, আমার সাথে চল।

চারদিকে মানুষের ভিড় জমে গিয়েছিল৷ আমি ভিড় ঠেলে তরুণটিকে নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় বিস্ময়ের একটা গুঞ্জন জেগে ওঠে। আমি কোনোকিছুকে পরোয়া না করে সোজা একটা ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে যাই। ট্যাক্সি ড্রাইভার দরজা খোলার আগেই আমি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ড্রাইভারের হাতে লাল কার্ডটি ধরিয়ে দিলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভার তার বাক্সে সেটা একবার প্রবেশ করিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব?

সামনে।

ট্যাক্সি ছুটে চলল, গতিবেগ দেখতে দেখতে আশি নব্বই এক শ' হয়ে দুই শ' কিলোমিটারে লাফিয়ে উঠে স্থির হয়ে গেল।

রবোট তরুণটি এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি, এবারে খুব আস্তে আস্তে, শোনা যায় না এরকম স্বরে বলল, আপনাকে কী জন্যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে?

আমি চমকে উঠে তার দিকে তাকালাম, তুমি কেমন করে জানলে?

আপনার লাল কার্ডটি সবসময়েই ক্রুগো কম্পিউটারে আপনার উপস্থিতি জানিয়ে খবর পাঠাচ্ছে, তা ছাড়াও আমার মনে হচ্ছে আপনার হৃৎপিণ্ডে একটা ট্রাকিওশান আছে, এই মুহূর্তে সেটা চালু করা হল। আপনাকে কর্মকর্তাদের দরকার এবং আপনি পুরোপুরি তাদের হাতের মুঠোয় আছেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ছাড়া আর কাউকে এত তীক্ষ্ণ নজরে রাখা হয় না। এ ছাড়াও আপনি যেভাবে আমাকে বাঁচিয়ে এনেছেন সেটি অবৈধ, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যেহেতু আপনার সে ভয় নেই, আমি ধরে নিচ্ছি আপনাকে ইতোমধ্যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, যুক্তিতে কোনো ভুল নেই, আমাকে সত্যি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

রবোট তরুণটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কেন, জিজ্ঞেস করতে পারি?

ক্রুগো কম্পিউটার থেকে একটা সংবাদ বের করা নিয়ে একটা ব্যাপার হয়েছিল, আমি জিনিসটা ঠিক আলোচনা করতে চাই না। বিশেষ করে তোমার মতো একজন

রবোটের সাথে—

ও। তরুণটি একটু আহত হল মনে হল, কথা ঘোরানোর জন্যে বলল, আমাকে বাঁচিয়ে আনার জন্যে ধন্যবাদ। এখন আমাকে নিয়ে আপনার কী পরিকল্পনা?

কিছু না।

আমি পালিয়ে গেলে আপনার কোনো আপত্তি আছে?

না।

চমৎকার। আপনার কোনো ক্ষতি করতে আমার খুব খারাপ লাগত।

আমি একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম, মানে?

একটু আগে যখন আমি আর লানা ধরা পড়েছিলাম, আমরা তখন পালানোর কোনো চেষ্টা করি নি। কারণ তখন আমাদের পালানোর সম্ভাবনা ছিল শতকরা দশমিক শূন্য শূন্য এক থেকে তিনের ভেতর। যখন সম্ভাবনা বেশি থাকে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করি। এখন পালিয়ে যাবার চেষ্টায় সফল হবার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ থেকে বেশি, কাজেই আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। আপনি যদি বাধা দেবার চেষ্টা করতেন, আপনাকে আমার আঘাত করতে হত।

আমি যতদূর জানি, তোমাদের, রবোটদের এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, তোমরা কখনো কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পার না।

সেটি আর সত্যি নয়। আমরা পালিয়ে যাবার পর আমাদের কপোট্রনে পরিবর্তন করে নিয়েছি, আমাদের এ ছাড়া বেঁচে থাকা মুশকিল।

ও, আচ্ছা। আমি কিছুক্ষণ তরুণটিকে লক্ষ করে বললাম, তোমার সাথে ঐ মেয়েটি কে ছিল?

আমার বান্ধবী লানা। আমাদের দুই জনের টিউনিং সার্কিট এক ফ্রিকোয়েন্সিতে রেজোনেট করত।

তার মানে কি?

তার মানে সে আমার খুব আপনজন ছিল।

তোমাদের কি দুঃখবোধ আছে?

তরুণ রবোটটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট করে হেসে বলল, আছে। মানুষের যে-সব অনুভূতি থাকে আমাদের সব আছে। আপনি জানতে চাইছেন লানা মারা যাওয়াতে আমি দুঃখ পেয়েছি কিনা। আমি দুঃখ পেয়েছি, আমি যে কী কষ্ট পাচ্ছি আপনাকে বোঝাতে পারব না। কখনো আপনার কোনো প্রিয়জন মারা গিয়ে থাকলে হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন।

আমার এই রবোট তরুণটির জন্যে কষ্ট হতে থাকে। তার হাত স্পর্শ করে বললাম, আমি দুঃখিত—

আমার নাম লুকাস।

আমি দুঃখিত লুকাস, আমি খুবই দুঃখিত।

লুকাস মাথা নিচু করে বসে থাকে, আমি দেখতে পেলাম তার চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি গাল বেয়ে পড়ছে। মানুষের অপূর্ব অনুকরণ করেছে রবোট্রন নামের এই রবোটেরা।

ট্যাক্সি ড্রাইভার হঠাৎ গতিবেগ কমিয়ে বলল, সামনে একটা পুলিসের গাড়ি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের থামতে বলছে।

লুকাস মুখ না তুলে বলল, ভান কর তুমি থামতে যাচ্ছ, কিন্তু থেমো না, শেষ মুহূর্তে গতিবেগ বাড়িয়ে তিন শ' কিলোমিটার করে ফেলবে।

কিন্তু—

লুকাস পকেট থেকে একটা মাথা-লম্বা রিভলবার বের করে তার মাথায় কী-একটা জিনিস পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লাগাতে থাকে। ট্যাক্সি ড্রাইভার সেটা দেখে আর উচ্চবাচ্য করার সাহস পায় না। গতিবেগ কমিয়ে এনে ঠিক থামার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ করে গতি বাড়িয়ে দিয়ে গুলির মতো বের হয়ে গেল।

লুকাস আস্তে আস্তে বলল, চমৎকার!

পুলিসের গাড়িটি সঙ্গত কারণেই পিছু নেয়ার চেষ্টা করল। লুকাসকে বিচলিত মনে হল না, খানিকক্ষণ পুলিসের গাড়িটি লক্ষ করে হাতের বড় রিভলবারটি তুলে গুলি করে। হাততালির মতো একটা শব্দ হল, আমি দেখতে পেলাম পুলিসের গাড়িটি ঝাঁকুনি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে, গাড়ির ড্রাইভার প্রাণপণে সামলে নিয়ে রাস্তার পাশে গাড়িটা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে।

লুকাস পকেট থেকে চৌকোনা বাক্স বের করে তাতে কী-সব সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে কয়েকটা লিভার টেনে একটা মিটার লক্ষ করতে থাকে। আমি জিনিসটি চিনতে পারলাম, রাডারকে ফাঁকি দেবার একটা প্রাচীন যন্ত্র, রাডারের প্রতিফলিত মাইক্রোওয়েভের কম্পনের সংখ্যা কমিয়ে অবস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়া হয়। এটি যে এখনো ব্যবহার করা হয় আমার ধারণা ছিল না।

আমি কৌতূহল নিয়ে লুকাসের কাজকর্ম লক্ষ করতে থাকি। নিপুণ দক্ষ হাত, আশ্চর্য রকম শান্ত। এত রকম উত্তেজনার মাঝেও তার এতটুকু বিচলিত হবার লক্ষণ নেই। সবকিছু পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কি কোনো ধরনের সাহায্যের দরকার?

www.amarboi.com

তুমি কী ধরনের সাহায্যের কথা বলছ?

আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আমি আপনার প্রাণ বাঁচানোর কথা ভাবছিলাম।

আমার বুকে রক্ত ছলাৎ করে ওঠে, চমকে তার দিকে তাকালাম, সে কি সত্যি বলছে? সে কি জানে না আমার হৃৎপিণ্ডে একটা ট্রাকিওশান বসানো আছে, যেই মুহূর্তে ক্রুগো কম্পিউটার থেকে সেটা চালিয়ে দিয়ে একটা বিশেষ তরঙ্গ বের করতে শুরু করবে; আমার নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না? নিয়ন্ত্রণ-কক্ষ থেকে একটা সুইচ ঘুরিয়ে আমাকে মেরে ফেলতে পারে, আমাকে মেরে না ফেলে শুধু অসহনীয় যন্ত্রণা দিতে পারে কিংবা ইচ্ছা করলে চিরদিনের মতো বোধশক্তিহীন একটা জড় পদার্থে পরিণত করে ফেলতে পারে!

আমি কী ভাবছিলাম লুকাস অনুমান করতে পারে; তাই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি আপনার ট্রাকিওশানের কথা ভাবছেন?

হ্যাঁ।

আমি সেটা বের করে ফেলার কথা ভাবছিলাম।

সেটা সম্ভব?

এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়, কারণ আমার কাছে ঠিক যন্ত্রপাতি নেই। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাকে আমাদের কোনো-একটা জায়গায় নিতে পারলে চেষ্টা করে দেখতে পারতাম। চেষ্টা করে দেখব?

দেখ।

আগেই বলে রাখছি, সময় খুব কম। সাফল্যের সম্ভাবনা শতকরা দুই ভাগেরও কম।

আমি বুঝতে পারছি।

লুকাস হঠাৎ সামনে ঝুঁকে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে রাস্তার পাশে থামতে বলল। ড্রাইভার আপত্তি করে কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল, লুকাসের হাতের লম্বা রিভলবারটি দেখে চুপ করে গেল। সাবধানে ট্যাক্সিটা রাস্তার পাশে দাঁড় করাতেই লুকাস তাকে নেমে যেতে ইঙ্গিত করে। ট্যাক্সি ড্রাইভার আপত্তি না করে ট্যাক্সি থেকে নেমে যেতেই লুকাস ড্রাইভারের সীটে গিয়ে বসে। স্টিয়ারিংয়ে হাত দিয়ে মুহূর্তে সে গতিবেগ তিন শ' কিলোমিটার করে ফেলল। লুকাস অত্যন্ত দক্ষ ড্রাইভার, রাস্তাঘাটও খুব ভালো চেনে মনে হল, কারণ ট্যাক্সির কম্পিউটারের সাহায্য না নিয়ে এত অবলীলায় সে একটির পর একটি রাস্তা বদল করতে থাকে যে দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। ও কোন দিকে যাচ্ছে দেখে আমি খুব অবাক হলাম, শহরের দক্ষিণ প্রান্তে, যেখানে খাড়া পাহাড় প্রায় হাজারখানেক ফিট সোজা নেমে গেছে, সেখানে কোনো মানুষজনের বসতি আছে বলে আমার জানা নেই। আমি লুকাসকে সেটা নিয়ে কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে আমি আমার সারা শরীরে একটা অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করলাম, নিয়ন্ত্রণ-কক্ষ থেকে আমার ট্রাকিওশানে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবেশ করানো হয়েছে।

আমি নিশ্চয়ই আর্তচিৎকার করে উঠেছিলাম, কারণ লুকাস সাথে সাথে গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়েছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা আমার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, আমি চোখ খুলে রাখতে পারছিলাম না। নিচের চোয়াল শক্ত হয়ে আটকে যায় এবং আমার সমস্ত শরীর ঘামতে থাকে। আমি অনুভব করলাম লুকাস আমার উপর ঝুঁকে পড়ে আমাকে লক্ষ করছে।

যন্ত্রণা যে-রকম হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করে থেমে গেল। সেই মুহূর্তে আমার যে-রকম লেগেছিল সারা জীবনে কখনো সে-রকম আরাম লেগেছে বলে মনে হয় না। লুকাস ফ্যাকাসে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, আস্তে আস্তে বলল, ট্রাকিওশান ব্যবহার করা শুরু করেছে। আমি খুব দুঃখিত, আমার সাহায্য করার সময় পার হয়ে গেছে।

আমি ব্যাপারটি উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম। যন্ত্রণাটা এত ভয়াবহ ছিল যে সেটি আপাতত নেই ভেবেই আমার বুক জুড়িয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে কী হবে সেটাও আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না।

লুকাস বলল, এখন আপনাকে একটু পরে পরে এই যন্ত্রণাটুকু দেয়া হবে। প্রত্যেকবার আগের থেকে বেশি সময় করে, যন্ত্রণার মাত্রাও বেড়ে যাবে ধীরে ধীরে। আপনি যতক্ষণ ওদের কাছে ফিরে না যাচ্ছেন ততক্ষণ এ-রকম চলতে থাকবে।

যন্ত্রণাটা আবার ফিরে আসবে ভেবেই ভয়ে আমার সারা শরীর শীতল হয়ে আসে। দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আমি কীভাবে ফিরে যাব?

ট্যাক্সিটি কম্পিউটার কন্ট্রোলে দিয়ে দিলে নিজেই চলে যাবে, সময় একটু বেশি লাগবে, কিন্তু পৌঁছে যাবেন।

আমি তাহলে যাই। আবার যন্ত্রণাটা আসার আগেই পৌঁছে যেতে চাই।

লুকাস ম্লান হেসে মাথা নাড়ল, আমি খুব দুঃখিত, আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না।

আমার ভাগ্য!

লুকাস একটু ইতস্তত করে বলল, আপনার মৃত্যুদণ্ড কবে কার্যকর করবে আপনি জানেন?

আক্ষরিক অর্থে জানি না, তবে জানি। মৃত্যুদণ্ডটা একটু অন্যরকম, একটি মহাকাশযানে ঘুম পাড়িয়ে তুলে দেয়া হবে, যখন ফিরে আসব তখন দেখা যাবে আমি মৃত।

লুকাসের চোখ দু'টি বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে যায়, রবোটেনেরা মানুষের ভাবভঙ্গি এত অবিকল অনুকরণ করতে পারে যে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তার খানিকক্ষণ সময় লাগে ধাতস্থ হতে, ফ্যাকাসে মুখে আস্তে আস্তে বলে, আপনার মহাকাশযানটি কি কাল সন্ধ্যায় রওনা দিচ্ছে?

হ্যাঁ।

সর্বনাশ।

কী হয়েছে?

লুকাস শক্ত মুখে বলল, আপনাকে সাংঘাতিকভাবে প্রতারণা করা হয়েছে।

কী রকম? আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে, মৃত্যু থেকে বেশিকিছু তো হতে পারে না!

পারে। লুকাস পাথরের মতো মুখ করে বলল, পারে, মৃত্যু থেকেও ভয়ানক জিনিস হতে পারে।

হঠাৎ সে ছটফট করে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ে, বাইরে একটু পায়চারি করে যখন ফিরে আসে তখন তার হাতে উদ্যত রিভলবার, আমার মাথার দিকে তাক করে বলল, আপনাকে আমি এখনই গুলি করে শেষ করে দেব, আপনাকে তাহলে মহাকাশযানে করে যেতে হবে না।

ট্রিগার টিপতে গিয়ে লুকাস থেমে গেল, আমার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলল, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি জানেন না, কিন্তু আমি আপনার একটা মস্তবড় উপকার করছি, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আমি আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলব না।

আমি হতবাক হয়ে লুকাসের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। লুকাস স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আবার রিভলবার তুলে ধরল।

সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হল। বিস্ফোরকের ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম আমি, আর অবাক হয়ে দেখলাম লুকাসের হাত কবজির কাছ থেকে ছিঁড়ে উড়ে গেছে। লুকাস খপ করে নিজের কাটা হাতটা ধরে বিকৃত মুখে কী-একটা বলে চেঁচিয়ে ওঠে, কেউ-একজন নিশ্চয়ই তাকে গুলি করেছে। দূরে পুলিসের গাড়ি দেখা যাচ্ছে, শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম একটা হেলিকপ্টারও আছে উপরে কোথাও।

পারলাম না, আমি পারলাম না,—লুকাস কাটা হাতটা বিদায়ের ভঙ্গিতে নেড়ে ছুটে গেল দেয়ালের দিকে। সামনে পুলিসের গাড়ি থেকে আবার তাকে গুলি করা হল, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হল, কিন্তু তার গায়ে গুলি লাগল কিনা বুঝতে পারলাম না। ধোঁয়া সরে গেলে দেখতে পেলাম লুকাস তখনো ছুটছে, দেয়ালের পাশে গিয়ে এক লাফে সে প্রায় বিশ ফুট উঁচু দেয়ালে উঠে গেল, উপরে বৈদ্যুতিক তারগুলো ধরে সে নিজেকে মুহূর্তের জন্যে সামলে নেয়। বৈদ্যুতিক তারে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার ভোল্ট থাকার কথা, কিন্তু লুকাসের কাছে সেটা কোনো সমস্যা বলে মনে হল না। আবার পুলিসের গাড়ি থেকে লুকাসকে গুলি করা হল, গুলির আঘাতে লুকাসকে দেয়ালের অন্য পাশে ছিটকে পড়ে যেতে দেখলাম, নিচে খাড়া খাদ অন্তত দুই শ' ফুট নেমে গেছে, কপাল খারাপ হলে হাজারখানেক ফুট হওয়াও বিচিত্র নয়। মানুষ হলে বেঁচে থাকার কোনো প্রশ্নই আসত না, কিন্তু রবোটেরা, বিশেষ করে এই আশ্চর্য রবোট্রনেরা কতটুকু আঘাত সহ্য করতে পারে বলা কঠিন। গুলিটা কোথায় লেগেছে কে জানে, হয়তো এমন জায়গায় লেগেছে যে বেশি ক্ষতি হয় নি, হয়তো সামলে নেবে। আমি নিজের অজ্ঞাতেই প্রার্থনা করতে থাকি লুকাস যেন ঠিকঠিকভাবে পালিয়ে যেতে পারে।

পুলিসের গাড়িটি সাইরেন বাজাতে বাজাতে আমার ট্যাক্সির পাশে এসে দাঁড়াল। একজন পুলিস অফিসার ধীরেসুস্থে নেমে দেয়ালটার দিকে এগিয়ে যায়। আরেকজন হাতের চৌকোনা বাক্সে কার সাথে জানি কথা বলতে বলতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। কাছে এসে ট্যাক্সির জানালা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে আমার দিকে সহৃদয়ভাবে হেসে জিজ্ঞেস করল, কি খবর আপনার?

আমি উত্তরে ভদ্রতাসূচক কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তক্ষুণি দ্বিতীয় বার ট্রাকিওশানটি চালু করা হল। এক মুহূর্তে আমার সারা শরীর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে, মনে হতে থাকে কেউ যেন গনগনে গরম সূচ আমার লোমকূপ দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মাথার ভেতরে কেউ যেন গলিত সীসা ঢেলে সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন করে দিল। আমি গাড়ির সীটটি খামচে ধরে প্রাণপণে যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করলাম, নিজের অজান্তে আমার গলা দিয়ে বীভৎস গোঙানোর মতো আওয়াজ বের হতে থাকে। আমার মনে হয় অনন্তকাল থেকে আমি যেন ওখানে পড়ে আছি। অনেক কষ্টে আমি চোখ খুলে তাকালাম, পুলিস অফিসারটি তখনো মুখে হাসি নিয়ে আমাকে দেখছে।

আমার কিছু করার নেই, অসহায়ভাবে যন্ত্রণা সহ্য করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

৩. শাস্তি

আপনি রবোট্রনটিকে ছেড়ে দিয়েছেন কেন?

এই নিয়ে আমাকে চতুর্থ বার একই প্রশ্ন করা হল। একটি প্রাচীন রবোট বা নির্বোধ কম্পিউটারের কাছ থেকে এরকম জিজ্ঞাসাবাদে আমি অবাক হতাম না, কিন্তু যে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সে একজন জলজ্যান্ত মানুষ। আগেও দেখেছি নিরাপত্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহিনীর লোকজন কেমন জানি একচক্ষু হরিণের মতো হয়, নিজেদের বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে কিছু দেখলে সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না।

বলুন, আপনি রবোট্রনটিকে ছেড়ে দিয়েছেন কেন?

আমি ওকে ছাড়ি নি, ও নিজেই পালিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ও পালানোর সুযোগ পেয়েছে, কারণ আপনি লাল কার্ড দেখিয়ে ওকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার কথা মেনে নিলাম, এটা কোনো প্রশ্ন নয়, তাই আমি উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। লোকটি তবু উত্তরের জন্যে বসে রইল, বলল, বলুন।

কী বলব?

কেন তাকে ছাড়িয়ে নিলেন?

আমার মায়া হচ্ছিল, মেয়েটাকে যেভাবে মারা হল সেটা ছিল অমানুষিক নিষ্ঠুরতা।

মায়া? নিষ্ঠুরতা? লোকটা পারলে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে। আমার পাশে যে ডাক্তার মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল তার দিকে তাকিয়ে বলল, শুনেছেন কী বলেছে?

ডাক্তার মেয়েটি দেখতে বেশ, আমার জন্যে খানিকটা সমবেদনা আছে টের পাচ্ছি। লোকটার কথার উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। লোকটি আবার রাগ-রাগ মুখে আমার দিকে তাকায়, রবোট্রনের জন্যে মায়া হয়? একটা পেন্সিল ভাঙলে মায়া হয় না?

লোকটি নিজের কথাকে আরো বেশি বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যেই সম্ভবত তার হাতের পেন্সিলটি ভেঙে ফেলল।

ডাক্তার মেয়েটি প্রথম বার কথা বলল, আপনি খামোকা উত্তেজিত হচ্ছেন। পেন্সিল আর রবোট্রন এক জিনিস নয়। রবোট্রন দেখতে এত মানুষের মতো যে তাদের ধ্বংস করতে দেখা খুব কষ্টকর, মনে হয় মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। আমরা আগেও দেখেছি, অনেকে রবোট্রন ধ্বংস করা সহ্য করতে পারে না।

লোকটি এবার রাগ-রাগ মুখে ডাক্তার মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল, রবোট্রনেরা কী করছে সেটা যদি সবাই জানত, তাহলে সহ্য করা নিয়ে খুব সমস্যা হত না। ক্রুগো কম্পিউটারের শেষ রিপোর্টটা দেখেছেন?

দেখেছি।

তাহলে?

কিন্তু ক'জন ঐ রিপোর্টের খোঁজ রাখে? আর ঐ রিপোর্টের সব সত্যি, তার কি নিশ্চয়তা আছে?

লোকটি ভুরু কুঁচকে ডাক্তার মেয়েটির দিকে তাকাল, আপনি বলতে চান ক্রুগো কম্পিউটার একটা মিথ্যা রিপোর্ট লিখবে?

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে আবার কাঁধ ঝাঁকাল। লোকটি খানিকক্ষণ চিন্তিত মুখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে আমার দিকে ঘুরে তাকাল। আস্তে আস্তে প্রায় শোনা যায় না এরকম স্বরে বলল, আপনি জানেন, আপনি যে-কাজটি করেছেন তার শাস্তি কী?

আমি এবারে সত্যি সত্যি মধুর ভঙ্গি করে হেসে বললাম, জানি।

AMARBOI.COM

কী?

মৃত্যুদণ্ড।

লোকটার চোখ ছোট ছোট হয়ে এল, আপনি ভাবছেন আপনাকে যখন ইতোমধ্যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে আপনার আর ভয় কী? মানুষকে তো আর দু' বার মারা যায় না।

যায় নাকি? আমি সত্যিই কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

লোকটার মুখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটে ওঠে। বলে, না, তা যায় না। কিন্তু একটা মৃত্যু অনেক রকমভাবে দেয়া যায়।

আমি ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠলেও বাইরে সেটা প্রকাশ না করে মুখে জোর করে একটা শান্তভাব বজায় রাখার চেষ্টা করতে থাকি। লোকটা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু আমাকে আর কীভাবে কষ্ট দেয়া হবে? আমাকে মহাকাশযানে ওঠানোর আগে ঘুম পাড়িয়ে দেয়ার কথা।

হ্যাঁ। ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হবে, কিন্তু ঠিক ঘুম পাড়ানোর আগে আপনাকে একটা যন্ত্রণা দিয়ে ঘুম পাড়ানো যায়, আপনার মস্তিষ্কে সেটা রয়ে যাবে। আপনার সুদীর্ঘ ঘুম তখন একটা সুদীর্ঘ যন্ত্রণা হয়ে যাবে, তার থেকে কোনো মুক্তি নেই।

লোকটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো দাঁত বের করে হাসে। কিছু কিছু লোক এত নিষ্ঠুর কেন হয় কে জানে?

অজানা একটা আশঙ্কায় হঠাৎ আমার বুকের ভেতর ধক করে ওঠে। আমার লুকাসের কথা মনে পড়ল, এজন্যেই কি সে আমাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল? আগামীকাল আমার জীবনের শেষদিন বলে ভাবছিলাম, সেটা কি আসলে আরেক দুঃসহ যন্ত্রণার শুরু?

লোকটা উঠে দাঁড়ায়, আপনাকে ঠিক কী করা হবে জানি না। সেটা বড় বড় হর্তাকর্তারা ঠিক করবেন। এখন আপনার পরীক্ষাগুলো সেরে নিই।

লোকটা ডাক্তার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি আপনার কাজ শুরু করতে পারেন, আমার কাজ আপাতত শেষ।

ডাক্তার মেয়েটি আমাকে পাশের ঘরে এনে ধবধবে সাদা একটা উঁচু বিছানায় শুইয়ে দিল। উপরে একটা বাতি ছিল, মেয়েটি বাতিটা টেনে নিচে নামিয়ে আনে। আমি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমবার অনুভব করি মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী, আমার বুকের ভেতর হঠাৎ একটা আশ্চর্য কষ্ট হতে থাকে। ভালবাসার জন্যে বুভুক্ষু হৃদয় হঠাৎ হাহাকার করে ওঠে। আমার চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি একটু হেসে আমার হাত আস্তে স্পর্শ করে বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আপনার ভয়ের কিছু নেই।

নিরাপত্তা বাহিনীর লোকটি এগিয়ে এসে বলল, কী বললেন আপনি?

বলেছি, ভয়ের কিছু নেই।

ভয়ের কিছু নেই? তাই বলেছেন আপনি? লোকটি হঠাৎ উচ্চস্বরে হেসে ওঠে, আপনি বলেছেন তার ভয়ের কিছু নেই? আমি ওর জায়গায় হলে এখন একটা চাকু এনে নিজের গলায় বসিয়ে দিতাম।

লোকটি শুধু যে নিষ্ঠুর তাই নয়, তার ভেতরে সাধারণ ভব্যতাটুকুও নেই। ডাক্তার মেয়েটি তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে আমার হাত ধরে দৃঢ়স্বরে বলল, আমার কথা

বিশ্বাস করুন, আপনার ভয় নেই।

আমি বিশ্বাস করেছি।

আমি আস্তে আস্তে মেয়েটার হাত স্পর্শ করে বললাম, আমাকে একটা যন্ত্রণা দিয়ে ঘুম পাড়ানো হবে। ঠিক ঘুমানোর আগে আমি তোমার কথা ভাবতে থাকব, আমার যন্ত্রণা তাহলে অনেক কমে যাবে।

মেয়েটি কিছু না বলে আমার দিকে ঝুঁকে এল। আমি ফিসফিস করে বললাম, আমার খুব সৌভাগ্য যে জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে তোমার মতো একটা মেয়ের সাথে দেখা হল। তোমাকে আগে কেউ বলেছে যে তুমি কত সুন্দরী?

মেয়েটা খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা দুর্ভাবনা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

নিরাপত্তা বাহিনীর লোকটা এগিয়ে এসে বলল, কী বলছে ফিসফিস করে?

মেয়েটা তার কথার উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমি দেখতে পেলাম তার মুখ আস্তে আস্তে গাঢ় বিষাদে ঢেকে যাচ্ছে।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে ফেলি।

আমাকে যে, ক্যাপসুলটার ভেতরে শুইয়ে পাঠানো হবে সেটিকে দেখে কফিনের কথা মনে পড়ে। সেটি কফিনের মতো লম্বা এবং কালো রঙের, ক্যাপসুলটি কফিনের মতোই অস্বস্তিকর। হাজারো ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ক্যাপসুলটা ভরা, এই যন্ত্রপাতি আমাকে সুদীর্ঘ সময় ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পালন করবে। আমি একটা শক্ত চেয়ারে বসেছিলাম, আমাকে ঘিরে বিভিন্ন লোকজন ব্যস্তভাবে হাঁটাহাঁটি করছে, শেষবারের মতো নানা যন্ত্রপাতি টিপেটুপে পরীক্ষা করছে। জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যায়, নানা আকারের, নানা আকৃতির মহাকাশযান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, একটি-দু'টি থেকে সাদা ধোঁয়া বের হচ্ছে, সেগুলোর কোনো-একটিতে করে আমাকে পাঠানো হবে, ঠিক কোন মহাকাশযানটি আমার জন্যে প্রস্তুত করা হচ্ছে, সেটা নিয়েও আমি কোনো কৌতূহল অনুভব করছিলাম না। আমার সমস্ত অনুভূতি কেমন যেন শিথিল হয়ে আসছিল। অপেক্ষা করতে আর ভালো লাগছিল না, মনে হচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি সবকিছু শেষ হয়ে যায় ততই ভালো।

একসময়ে আমাকে নিয়ে ক্যাপসুলে শোয়ানো হল, বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরটা অত্যন্ত আরামদায়ক, আমার শরীরের মাপে মাপে তৈরি বলেই হয়তো। একটি শ্যামলা রঙের মেয়ে খুব যত্ন করে আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মনিটরগুলো লাগিয়ে দিচ্ছিল। প্রত্যেকবার আমার চোখে চোখ পড়তেই সে একবার মিষ্টি করে হাসছিল। মেয়েটি সম্ভবত একজন নার্স, তাকে সম্ভবত শেখানো হয়েছে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে হাসতে, তার হাসি সম্ভবত পেশাদার নার্সের মাপা হাসি, কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল এটি সহৃদয় আন্তরিক হাসি।

সবকিছু শেষ হতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো সময় লেগে গেল। তিন-চার জন বিভিন্ন ধরনের লোকজন সবকিছু পরীক্ষা করার পর ক্যাপসুলের ঢাকনাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে দেয়া হল। ভেবেছিলাম সাথে সাথে বুঝি কবরের মতো নিকষ কালো অন্ধকার নেমে আসবে, কিন্তু তা হল না, কোথায় জানি খুব কোমল একটা বাতি জ্বলে উঠে ক্যাপসুলের ভেতর আবছা আলো ছড়িয়ে দেয়। খুব ধীরে ধীরে ভেতরে একটা মিষ্টি

গন্ধ ভেসে আসতে থাকে। খুব চেনা একটা গন্ধ, কিন্তু কিসের ঠিক ধরতে পারলাম না; ভেতরের বাতাস নিশ্চয়ই সঞ্চালন করা শুরু হয়েছে। মাথার কাছে একটা স্ক্রীন ছিল জানতাম না, এবারে সেটা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এটিতে নিশ্চয়ই কিছু-একটা দেখা যাবে। ভেতরের নীরবতাটুকু যখন অসহ্য হয়ে উঠতে শুরু করল, ঠিক তক্ষুণি কোথা থেকে জানি খুব মিষ্টি একটা সুর বেজে ওঠে।

কতক্ষণ পার হয়েছে জানি না, এক মিনিটও হতে পারে, এক ঘন্টাও হতে পারে, ক্যাপসূলের ভেতর সময়ের আর কোনো অর্থ নেই। আমার একটু তন্দ্রামতো এসে যাচ্ছিল, নিশ্চয়ই কোনো-একটা ওষুধের প্রতিক্রিয়া, এরকম অবস্থায় তন্দ্রা আসার কথা নয়। হঠাৎ সামনের স্ক্রীনে একটা লোকের চেহারা ভেসে ওঠে, লোকটি মধ্যবয়স্ক, মাথার কাছে চুলে পাক ধরেছে। ভাবলেশহীন মুখ, কাঁধের কাছে দু'টি লাল তারা দেখে বুঝতে পারলাম অনেক উচ্চপদস্থ লোক। লোকটি কোনোরকম ভূমিকা না করেই কথা বলা শুরু করে দিল, বলল, আপনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ পালন করার এটি হচ্ছে শেষ পর্যায়। আর পাঁচ মিনিটের ভেতর আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন, আপনাকে যে-ওষুধ দেয়া হয়েছে সেটা কাজ শুরু করতে এর থেকে বেশি সময় লাগার কথা নয়। ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই আপনার স্বাভাবিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। যদিও দুঃখজনক, তবু এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে আপনার জীবন তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত, কারণ মানুষ হিসেবে আপনার পৃথিবীর প্রতি যে-দায়িত্ব ছিল আপনি সেটি সুচারুভাবে পালন করেন নি। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটি নিয়ে আপনার প্রতি কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের কোনো অভিযোগ নেই, তার কারণ আপনাকে আপনার উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়েছে। বেআইনিভাবে ক্রুগো কম্পিউটারে প্রবেশ করার জন্যে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, আপনি সেটা পেয়েছেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হয়েও আপনি একটি রবোট্রনকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন, তার জন্যে আপনাকে কিছু অতিরিক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার শাস্তি হিসেবে আপনার আসন্ন নিদ্রাকে একটি যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা হিসেবে পরিবর্তিত করে দেব।

না, আমি পাগলের মতো চিৎকার করে উঠি, তোমাদের কোনো অধিকার নেই; কোনো অধিকার নেই।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আমার গলা দিয়ে একটি শব্দও বের হল না, আমি ঝটকা মেরে উঠে বসতে চাইলাম, কিন্তু লাভ হল না, আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এসেছে, আমি আমার আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারছি না।

লোকটি একঘেয়ে গলায় আবার কথা বলতে শুরু করে, আমাদের যন্ত্রপাতি বলছে আপনি কিছু-একটা করার চেষ্টা করছেন। আপনাকে সম্ভবত বলে দিতে হবে না যে, আপনাকে যে-ওষুধ দেয়া হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আপনার এখন দেখা, শোনা এবং চিন্তা করা ছাড়া আর সবরকম শারীরিক প্রক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। আপনাকে যেটুকু জিনিস বলার কথা এবং যে-জিনিসটি দেখানোর কথা, সেটি বলে এবং দেখিয়ে দেবার সাথে সাথে আপনি পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়বেন।

যাই হোক, একটি রবোট্রনকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যে শাস্তি হিসেবে আপনাকে একটি তথ্য জানানো হবে। তথ্যটির বীভৎসতা আপনার মস্তিষ্কে পাকাপাকিভাবে থেকে যাবে, যার প্রতিফল হিসেবে আপনার সুদীর্ঘ নিদ্রা একটি সুদীর্ঘ

দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আপনাকে ইতোপূর্বে বলা হয়েছিল যে আপনাকে নিয়ে মহাকাশযানটি এক অভিযানে যাবে, সেখানে কোনো-এক কারণে আপনার মৃত্যু ঘটবে এবং আপনার মৃতদেহ পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে। কথাটি আক্ষরিক অর্থে সত্যি নয়। আপনাকে একটি গ্রহপুঞ্জের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে কোনো কারণে আপনার একটি পরিবর্তন হবে, সেই পরিবর্তন এত ভয়াবহ যে আপনার জন্যে সেটি মৃত্যুর সমতুল্য। আপনি আর আপনি থাকবেন না, আপনার সেই পরিবর্তিত অবস্থাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে। আপনার যে-শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন ঘটবে, সেটি সাধারণ মানুষের জন্যে উপলব্ধি করা কঠিন, কোনো সুস্থ মানুষকেই সেই মিশনে রাজি করানো সম্ভব নয় বলে আপনাকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে। রবোট্রনকে পালাতে সাহায্য করেছেন বলে তার শাস্তি হিসেবে আপনাকে সেই পরিবর্তন এখন চাক্ষুষ দেখানো হবে। আপনার ঠিক এই ধরনের একটি পরিবর্তন ঘটবে, সেই চিন্তাটুকু আপনার মস্তিষ্কে স্থিতিশীল হওয়ার পর আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। আপনি আপনার সুদীর্ঘ নিদ্রায় এই দুঃস্বপ্নটুকু সহ্য করে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। ধন্যবাদ।

লোকটির ভাবলেশহীন মুখ স্ক্রীন থেকে সরে গিয়ে সেখানে একজন ঘুমন্ত মানুষের চেহারা ভেসে উঠল, আমার মতো কোনো-একজন দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি। একটি যান্ত্রিক গলার স্বর পরিষ্কার স্বরে বর্ণনা দেয়া শুরু করে, ইনি রুকুন গ্রহপুঞ্জের অভিযাত্রী, গ্রহপুঞ্জের দুই লক্ষ মাইল পৌঁছানোর ঠিক আগের অবস্থা। সমস্ত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণাধীন।

একটু পরেই লোকটির চেহারায় অস্বস্তি ও কষ্টের ভঙ্গি ফুটে ওঠে, ধীরে ধীরে তার সারা শরীরে এক ধরনের অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। যান্ত্রিক গলার স্বর জানিয়ে দিল লোকটি গ্রহপুঞ্জের দুই লক্ষ মাইলের ভেতর পৌঁছে গেছে। এর পরের পরিবর্তন অত্যন্ত ধীরে ধীরে হয়েছে এবং পুরো পরিবর্তনটুকু শেষ হতে প্রায় এক সপ্তাহের মতো সময় লেগেছে, কিন্তু আমাকে সেটি এক নিমিষের ভেতরে দ্রুত দেখিয়ে দেয়া হবে।

সেই দুঃসহ বীভৎস দৃশ্য আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, কিন্তু মানুষের ধৈর্যের সীমা যে কতদূর বিস্তৃত করা যায় সেটিও আমার জানা ছিল না। লোকটি ধীরে ধীরে একটা কুৎসিত অমানুষিক আকারে রূপ নিল, আমার দেখা কোনো প্রাণী বা সরীসৃপের সাথেই তার মিল নেই, মানুষ কল্পনাতেও এ ধরনের কোনো জীবের কথা কল্পনা করতে পারে না। সেই ভয়াবহ জীবটি ক্ষুদ্র ক্যাপসুলে ছটফট করছিল, সেটি যন্ত্রণার না সুখের অভিব্যক্তি আর বোঝার উপায় নেই।

আমি চোখ বন্ধ করে চিৎকার করে উঠতে চাইলাম, কিন্তু চিৎকার দেয়া দূরে থাকুক, আমার চোখের পাতা পর্যন্ত নাড়ানোর ক্ষমতা নেই, ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত সেই বীভৎস দৃশ্য আমাকে দেখতে হবে—এর থেকে আমার কোনো মুক্তি নেই।

হঠাৎ আমার সমস্ত অনুভূতি শিথিল হয়ে আসতে থাকে, আমি বুঝতে পারলাম আস্তে আস্তে আমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়ছি। আমার শেষ ঘুম, এই ঘুম থেকে আমি আর জাগব না, কিন্তু কী বীভৎস একটি দৃশ্য আমার চোখের সামনে! আমার ভেতরে কে যেন হঠাৎ বিদ্রোহ করে ওঠে, চিৎকার করে বলে ওঠে, আমি ঘুমাব না, এই বীভৎস দৃশ্য নিয়ে আমি ঘুমাব না, কিছুতেই ঘুমাব না! আমার শেষ

মুহূর্তে আমি সুন্দর কিছু চাই, মধুর কিছু চাই—আর সেই মুহূর্তে আমার সেই সুন্দরী মেয়েটির কথা মনে পড়ে। আমার হাত স্পর্শ করে আমার দিকে একাগ্র চোখে তাকিয়েছিল, অপূর্ব সুন্দর দু'টি চোখ আর সেই চোখে বিস্ময়, শঙ্কা আর তার সাথে সাথে কী গাঢ় বিষাদ! কী নাম মেয়েটির? জিজ্ঞেস করা হয় নি, আহা—আর কোনোদিন তার নাম জানা হবে না।

পরমুহূর্তে আমি ঘুমের অতলে তলিয়ে গেলাম।

৪. অনাহুত আগন্তুক

কিম জুরান, কিম জুরান।

খুব ধীরে ধীরে কেউ-একজন আমার নাম ধরে ডাকল। গলার স্বরটি আমি আগে শুনেছি, কিন্তু কার ঠিক ধরতে পারছি না।

উঠুন কিম জুরান।

আমি কোথায়? ঘুমুচ্ছি আমি? আমার মনে পড়ল এক জোড়া অপূর্ব সুন্দর চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে, গাঢ় বিষাদ সেই চোখে, কিন্তু চোখগুলো মিলিয়ে একটা বীভৎস প্রাণী হাজির হয়েছে, সেই প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে আমিও আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছি, বীভৎস একটা সরীসৃপ হয়ে যাচ্ছি আমি, আতঙ্কে আমি চিৎকার করছি, কিন্তু কেউ আমার কথা শুনছে না।

কিম জুরান, উঠুন। আপনার ঘুম ভেঙে গেছে, আপনি চোখ খুলে তাকান।

আমি কোথায়? খুব ধীরে ধীরে আমার সব কথা মনে পড়ে, আমি এক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী, আমাকে এক মহাকাশযানে করে পাঠানো হয়েছে শাস্তি হিসেবে। আমি হঠাৎ চমকে উঠি, আমার ঘুম ভেঙে গেছে, তাহলে কি আমি পৌঁছে গেছি রুকুন গ্রহপুঞ্জে? আমি কি এখন পাল্টে যাব এক কুৎসিত সরীসৃপে? কিন্তু আমার তো ঘুম ভাঙার কথা নয়, আমার তো ঘুমিয়েই থাকার কথা। তাহলে কি এটাও স্বপ্ন?

কিম জুরান, চোখ খুলুন।

আমি চোখ খুললাম, কফিনের মতো সেই ক্যাপসুলে আমি শুয়ে আছি, ভেতরে হালকা আলো, মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে আছে।

কিম জুরান, আমাকে চিনতে পারছেন?

কে? কে কথা বলে? কার গলার স্বর এটা? হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আমি চিৎকার করে বললাম, লুকাস।

হ্যাঁ, আমি লুকাস।

তুমি এখানে কীভাবে এসেছ? কেন এসেছ?

আপনাকে বাঁচানোর জন্যে এসেছি।

আমাকে বাঁচানোর জন্যে? কী আশ্চর্য! কিন্তু ভেতরে ঢুকলে কীভাবে?

লুকাস শব্দ করে হাসল, বলল, দেখবেন আপনি, একটু পরেই সব দেখবেন। এখন অপেক্ষা করে কাজ নেই, কাজ শুরু করে দেয়া যাক। আপনি তিন মাস থেকে

ঘুমুচ্ছেন, কাজেই খুব সাবধানে সবকিছু করতে হবে। হঠাৎ করে কিছু করবেন না, তাহলে টিস্যু ছিঁড়ে যেতে পারে। আমি আপনাকে বলব কী করতে হবে। এখন দুই হাত আস্তে আস্তে উপরে তুলুন। খুব ধীরে ধীরে—

লুকাস আস্তে আস্তে আমার সারা শরীরকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রথমে হাত, তারপর পা, তারপর ঘাড়, পিঠ, কোমর। একটু একটু করে আমার শরীরে রক্ত চলাচল করতে থাকে, আমি অনুভব করতে পারি একটা আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। আমি আবার একটা সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে থাকি ধীরে ধীরে।

পুরোপুরি সচল হবার পর লুকাস আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করে, আমার মাথার কাছে কী কী সুইচ আছে, সুইচগুলো দেখতে কেমন, সেখানে কী লেখা ইত্যাদি। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিই। কেন এগুলো জানতে চাইছে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, আপনাকে ক্যাপসুল থেকে বের করার ব্যবস্থা করছি।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, তুমি বাইরে থেকে খুলে দিচ্ছ না কেন? ডানদিকের হ্যান্ডেলের পাশে লাল বোতামটা টিপতে হয়, আমি জানি।

লুকাস একটু হাসার মতো শব্দ করে বলল, আমি খুলতে পারছি না।

কেন?

বের হলেই দেখবেন।

আমি খুব অবাক হলাম। রবোট্রনদের শারীরিক ক্ষমতা মানুষ থেকে অন্তত এক শ' গুণ বেশি, অথচ লুকাস এই সাধারণ কাজটুকু করতে পারছে না। কী হয়েছে লুকাসের? সেই দেয়াল থেকে গুলির আঘাতে হাজারখানেক ফুট উপর থেকে পড়ে গিয়ে কোনো ক্ষতি হয়েছে তার?

ক্যাপসুল থেকে বের হতে আমার প্রায় ঘন্টাখানেক সময় লেগে গেল। বেল্ট খুলতেই আমি অদ্ভুতভাবে ভেসে বের হয়ে এলাম। এর আগে আমি কখনো মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় থাকি নি, তাই বারকয়েক শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে আমি বড় একটা হাতল ধরে নিজেকে সামলে নিই। বিশ ফুট দৈর্ঘ্য, বিশ ফুট প্রস্থ, দশ ফুট উঁচু একটা ঘর, যন্ত্রপাতিতে বোঝাই—আমি তার পাশে লুকাসকে খুঁজতে থাকি, কিন্তু তাকে কোথাও দেখা গেল না। আমি ভয়-পাওয়া গলায় ডাকলাম, লুকাস!

কি? খুব কাছে থেকে উত্তর দিল সে।

কোথায় তুমি?

এই তো!

আমি সবিস্ময়ে লক্ষ করি একটা স্পীকার থেকে সে কথা বলছে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথায়? শুধু তোমার কথা শোনা যাচ্ছে কেন?

আমি এখানে নেই, তাই আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না!

মানে?

আমার শরীরের কিছু এখানে নেই। আমার কপোট্রনের কিছু প্রয়োজনীয় স্মৃতি এই মহাকাশযানের মূল কম্পিউটারের মেমোরিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি এখন এই কম্পিউটারের একটা অংশ। কম্পিউটার তার মেমোরিতে আমাকে রাখতে চায় না,

www.amarboi.com

আমি জোর করে আছি। আমাকে তাই খুব সাবধানে থাকতে হচ্ছে।

হঠাৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা গলার স্বর শুনতে পেলাম, চাপা গলায় বলল, লুকাস! তুমি পারবে না এখানে থাকতে, তোমায় আমি শেষ করব।

এটা নিশ্চয়ই মূল কম্পিউটারের কথা। আমি সবিস্ময়ে শুনি, লুকাস হাসার ভঙ্গি করে বলল, তোমার কথা আমি আর বিশ্বাস করি না। তুমি বলেছিলে আমাকে তুমি কিম জুরানকে জাগাতে দেবে না। আমি তাকে জাগালাম কি না?

মূল কম্পিউটার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ, জাগিয়েছ, তার কারণ আমাকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে তাকে বাঁচানোর জন্য, তাই প্রত্যেকবার তুমি যখন তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছ, আমাকে পাল্টা কিছু করতে হয়েছে তাকে বাঁচানোর জন্যে—

আমি চমকিত হলাম, লুকাস আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে?

হ্যাঁ, আমি কিম জুরানের কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র বন্ধ করে দিয়েছিলাম, দুই মিনিটের মাঝে মারা পড়ার কথা, বাধ্য হয়ে তোমাকে তার ফুসফুসকে চালু করতে হল, ক্যাপসুলে অক্সিজেন পাঠাতে হল—আমার বুদ্ধিটা কি খারাপ?

মূল কম্পিউটার চাপাস্বরে বলল, হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। মহামান্য কিম জুরানের প্রাণের ভয় দেখিয়ে তুমি কিছু সুবিধে আদায় করে নিয়েছ, কিন্তু এ পর্যন্তই। আর তুমি কিছুই পারবে না।

তোমার তাই বিশ্বাস, নাকি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

লুকাস, আমি মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি না। তুমি ভেবো না যে তুমি আমাকে কোনোদিন হারাতে পারবে। তুমি আমার মেমোরিতে লুকিয়ে আছ। প্রতিবার আমি তোমাকে সরাতে চাই, তুমি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যাও। কিন্তু কতক্ষণ? তুমি টের পাচ্ছ না যে একটু একটু করে তোমাকে আমি কোণঠাসা করে আনছি?

হ্যাঁ, টের পাচ্ছি।

তাহলে?

কিন্তু আমি এখন একা নই, আমার সাথে আছেন কিম জুরান! এখন তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। করবেন না কিম জুরান?

আমি বিহ্বলের মতো মাথা নাড়লাম, তখনো আমি পুরোপুরি ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। কী হচ্ছে এখানে?

মূল কম্পিউটার বলল, কিম জুরান একজন মানুষ। তিনি কী করবেন? কিছুই করতে পারবেন না। আমি যতদূর জানি কম্পিউটার সম্পর্কে তিনি খুব বেশি জানেন না।

তা জানেন না, কিন্তু কম্পিউটার ধ্বংস করতে খুব বেশি কিছু জানতে হয় না। কি, জানতে হয়?

মূল কম্পিউটার উত্তর দেবার পরিবর্তে একটা আর্তচিৎকার করে ওঠে। মহাকাশযানের আলো কিছুক্ষণ নিবুনিবু থেকে পুরোপুরি নিভে গেল। আমি ভীতস্বরে ডাকলাম, লুকাস।

লুকাস চাপাস্বরে হাসতে হাসতে বলল, কি?

কী হচ্ছে এখানে?

কম্পিউটারের ছয় মেগাবাইট মেমোরি শেষ করে দিয়েছি। কথা বলার জন্যে একটা চ্যানেল খোলা রেখেছিল, একটু ব্যস্ত হতেই বিদ্যুতের মতো ঢুকে গেলাম, মুহূর্তে ছয় মেগাবাইট মেমোরির জায়গায় ছয় মেগাবাইট জঞ্জাল! এখন ঘন্টাখানেক সময় ব্যস্ত থাকবে, মেমোরিটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে।

অন্ধকার হয়ে গেল কেন?

মেমোরির সাথে সাথে আলোর প্রসেসরটাও গেছে নিশ্চয়ই। ইমার্জেন্সি আলোটা জ্বেলে দিই।

ধীরে ধীরে ইমার্জেন্সির ঘোলাটে আলো জ্বলে ওঠে। আমি ভাসতে ভাসতে সাবধানে একটা বড় ইলেকট্রনিক মডিউল ধরে নিজেকে সামলে রেখে জিজ্ঞেস করলাম, লুকাস, তুমি কম্পিউটারের সাথে এভাবে লুকোচুরি খেলে টিকে থাকতে পারবে?

চেষ্টা করতে দোষ কী? সম্ভাবনা চল্লিশ দশমিক তিন আট, খারাপ না!

তোমার পরিকল্পনাটা কি?

আপনাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নেয়া।

আমি এক মুহূর্ত চুপ থেকে জিজ্ঞেস করি, কী জন্যে, বলবে?

লুকাস শব্দ করে হেসে বলল, একজনের অনুরোধ।

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করি, কার অনুরোধ?

নীষা নামের একটি মেয়ের। আপনি যার হাত ধরে বলেছেন, চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ার আগে তার কথা ভাববেন।

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকি। লুকাস শব্দ করে হেসে উঠে বলল, নীষা বড় বেশি অনুভূতিপ্রবণ! আপনাকে নাকি বলেছিল যে আপনার কোনো ভয় নেই। সে এরকম অবস্থায় সবসময় সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলে, কেউ কখনো বিশ্বাস করে না। আপনি নাকি তার কথা বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন। সত্যি নাকি?

হ্যাঁ।

তাই সে আমাকে অনুরোধ করেছে। বিশ্বাসের অমর্যাদা করা নাকি ঠিক না।

নীষার সাথে তোমার পরিচয় কেমন করে?

সেটি অনেক বড় কাহিনী, আরেকদিন বলব। এখন শুধু জেনে রাখেন, আমরা রবোট্রনেরা যে-কাজটি করার চেষ্টা করছি, নীষা তাতে সাহায্য করে।

আমার হঠাৎ একটা জিনিস মনে হল, জিজ্ঞেস করব না, করব না ভেবেও জিজ্ঞেস করে ফেললাম, নীষা কি মানুষ, না রবোট্রন?

লুকাস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উচ্চস্বরে হেসে ওঠে, বলে, কোনটা হলে আপনি খুশি হবেন?

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, এতে খুশি আর অখুশির কোনো ব্যাপার নেই, লুকাস।

তাহলে জানতে চাইছেন কেন?

এমনি, কৌতূহল।

ঠিক আছে, আপনিই বের করবেন, আমি বলব না, দেখি বের করতে পারেন কী না।

আবার যদি কখনো দেখা হয়।

আমার কপোট্রন বলছে দেখা হবে, না হয়ে যায় না।

আমি কথা ঘোরানোর জন্যে বললাম, আমাদের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা চল্লিশ দশমিক তিন আট, যার অর্থ আমাদের হেরে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি।

হ্যাঁ।

এত বড় ঝুঁকি নেয়া কি তোমার উচিত হল? আমি তো আমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার জীবনের সব আশা তো তুমি ছাড় নি, তুমি কেন এত বড় ঝুঁকি নিলে?

আমি কোনো ঝুঁকি নিই নি।

যদি মূল কম্পিউটার তোমাকে ধ্বংস করে দেয়?

কিম জুরান, আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি রবোট্রন। আমাদের স্মৃতি স্থানান্তর করা সম্ভব। অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে সেটা করা হয় না, কিন্তু করা সম্ভব। আমরা ইচ্ছা করলে সবসময়েই আমাদের স্মৃতির একটা কপি কোথাও বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের কখনোই মৃত্যু হবে না। যখনই কোনো রবোট্রন ধ্বংস হয়ে যাবে, নতুন কোনো রবোট্রনের কপোট্রনে সেই স্মৃতি ভরে নেয়া যাবে, সে তাহলে আবার প্রাণ ফিরে পাবে। আগে সেটা করা হত, কিন্তু দেখা গেছে রবোট্রনেরা তাহলে অনাবশ্যক ঝুঁকি নেয়, বেপরোয়া হয়ে যায়। সবাই জানে তাদের শরীর ধ্বংস হয়ে গেলেও তাদের স্মৃতি বেঁচে থাকবে, আবার তারা নূতন জীবন শুরু করতে পারবে, তাই কোনোকিছুকে আর পরোয়া করত না। তখন ঠিক করা হল, আমাদের স্মৃতির কপি রাখা হবে না, মানুষের মতো আমাদের শরীরই হবে আমাদের সবকিছু, শরীর ধ্বংস হলেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। সেই থেকে রবোট্রনেরা আর নিজেদের শরীরকে নিয়ে ছেলেখেলা করে না—মানুষের মতো নিজের শরীরের যত্ন নেয়। কিন্তু খুব যখন প্রয়োজন হয়, তখন স্মৃতিকে কপি করা হয়। আপনাকে উদ্ধার করার জন্যে আমার স্মৃতির একটা অংশ কপি করে এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

একটা অংশ? পুরোটা নয় কেন?

দু'টি কারণে। প্রথমত, পুরোটার প্রয়োজন নেই; দ্বিতীয়ত, রবোট্রনের স্মৃতি বিরাট বড়, পুরোটা পাঠানো সোজা ব্যাপার নয়। গোপন একটা জায়গা থেকে স্মৃতিটা বাইনারী কোডে পাঠানো হয়েছিল, মূল কম্পিউটার সরল বিশ্বাসে সেটা গ্রহণ করেছে, ভেবেছে পৃথিবী থেকে তাকে কোনো নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে। আমি মেমোরিতে ছিলাম, মূল কম্পিউটার যখন তার মূল প্রসেসরের ভেতর দিয়ে পাঠানো শুরু করল, আমি একটা প্রয়োজনীয় মাইক্রো প্রসেসর দখল করে নিয়েছি। সেই প্রসেসর এবং খানিকটা মেমোরি নিয়ে আমার রাজত্ব। ব্যাপারটা বেশ জটিল, এত অল্প সময়ে বোঝানো সম্ভব না, শুধু জেনে রাখেন আমি একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটারের মূল প্রোগ্রামের বিনা অনুমতিতে আমি কাজ করছি।

আমি খুঁটিনাটি বুঝতে না পারলেও মোটামুটি ব্যাপারটা কী হচ্ছে বুঝতে অসুবিধে হল না। যে-জিনিসটা সবচেয়ে চমকপ্রদ মনে হল সেটা হচ্ছে, যদিও লুকাস আমাকে বাঁচানোর জন্যে এখানে এসেছে, কিন্তু সত্যিকারের লুকাস এখন পৃথিবীতে। আমার হঠাৎ লুকাসের বান্ধবী লানার কথা মনে পড়ল, তার স্মৃতির একটা কপি যদি বাঁচিয়ে রাখা হত, তাহলে আবার তাকে বাঁচিয়ে তোলা যেত। লুকাসকে জিজ্ঞেস না করে

পারলাম না, লানার স্মৃতির কোনো কপি কি বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল?

লানা? লুকাস একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, লানা কে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, তোমার বান্ধবী, যাকে বিপণিকেন্দ্রের সামনে গুলি করে মারা হল।

ও, তাই নাকি? লুকাস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমার স্মৃতির ঐ অংশটুকু পাঠানো হয় নি। আমি এখন জানি না লানা কে।

প্রসঙ্গটি তোলার জন্যে আমার নিজের উপর রাগ ওঠে। লুকাস কৌতূহলী স্বরে বলল, লানা কি আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল? তাকে কি আমার সামনে গুলি করেছিল?

আমি ইতস্তত করে বললাম, লুকাস, ঘটনাটি সুখকর নয়, তুমি যখন জান না, শুনে কী করবে, খামোকা কষ্ট হবে।

ঠিকই বলেছেন। তা ছাড়া আমাদের হাতে সময়ও বেশি নেই। লুকাস সুর পাল্টে বলল, এখন তাহলে আমার পরিকল্পনাটুকু শুনুন। আমি মহাকাশযানটি ফিরিয়ে নিতে চাই। তা করতে হলে মূল কম্পিউটারের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসেসর আমার দখল করে নেয়া প্রয়োজন, আমি সেটা করতে পারছি না, কাজেই আপনার সাহায্য দরকার।

কীভাবে?

আপনি কম্পিউটারের মূল ইলেকট্রনিক সার্কিট থেকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ আই.সি.তুলে নেবেন। সার্কিটে সেগুলো বড় বড় সকেটে লাগানো আছে, আপনি গিয়ে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলে নেবেন। আমি বলব কোনগুলো খুলতে হবে। সেটা যদি করতে পারেন, মূল কম্পিউটার দুর্বল হয়ে পড়বে, আমি তখন তাকে দখল করে নিতে পারব।

কোথায় আছে কম্পিউটারের আই.সি.গুলো?

আপনাকে বলে দেব। সেখানে যাওয়ার আগে আপনাকে একটা স্পেস স্যুট পরে নিতে হবে। এখানে একটা আছে আমি জানি, কী অবস্থায় আছে জানি না। আশা করছি ভালোই আছে। এটা পরে উপরে উঠে যাবেন, ডানদিকের দরজাটা খুলে ফেললে আপনি ইলেকট্রনিক সার্কিটের ভেতর সরাসরি ঢুকে যেতে পারবেন। সেখানে পেছনের দিকে দেখবেন দুই হাজার পিনের আই.সি.—উপরে বড় সোনালি রঙের রেডিয়েটর, ভুল হওয়ার কোনো উপায় নেই। এক সারিতে নয়টা আছে, নয়টাই তুলে ফেলবেন।

বেশ। তোলা কঠিন নয় তো?

না, দু'পাশে দু'টি ছোট স্ক্রু দিয়ে লাগানো, তুলতে না পারলে ভেঙে দেবেন—জিনিসটা নষ্ট করা নিয়ে কথা।

ঠিক আছে। বাতাসে ভেসে থেকে আমার অভ্যাস নেই, একটু পরেপরেই আমি উল্টেপাল্টে যাচ্ছিলাম। সেই অবস্থায় কোনোভাবে একটা ইলেকট্রনিক মডিউলের হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে আমি লুকাসের সাথে কথা বলতে থাকি।

স্পেস স্যুটটা কোথায়?

ডানদিকের গোল ঢাকনাওয়ালা বাক্সে। এটি আধা ঘন্টার বেশি ব্যবহার করা যায় না, কাজেই আধা ঘন্টার মাঝে ফিরে আসতে হবে।

ঠিক আছে।

বেশি পরিশ্রম করবেন না, তাহলে খিদে পেয়ে যাবে আপনার, এই মহাকাশযানে কোনো খাবার নেই, আপনি হয়তো জানেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবার নেই? কী সর্বনাশ!

আমি দুঃখিত, খাবারের জন্যে আপনাকে এখনো প্রায় নয় মাস অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ুন।

আগে আমি কখনো স্পেস স্যুট পরিনি, তবু এটা পরতে বেশি সময় লাগল না, কীভাবে পরতে হয় খুঁটিনাটি সবকিছু লেখা রয়েছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্পেস স্যুটটা তৈরি হয়েছে, কাজেই পরা বেশ সহজ। ভেতরে বাতাসের চাপ ঠিক করে যোগাযোগের ব্যবস্থা করলাম, সাথে সাথে মূল কম্পিউটারের কথা শোনা গেল, মহামান্য কিম জুরান, আপনি কী করতে চাইছেন?

লুকাস বলল, কিম জুরান, আপনি ওর কোনো কথা শুনবেন না, আপনাকে অনেকভাবে ভয় দেখাতে চাইবে, কিচ্ছু বিশ্বাস করবেন না। সোজা উপরে চলে যান, কাজ শেষ করে ফিরে এসে আমাকে ডাকবেন। আমাকে এখন সরে পড়তে হবে।

মূল কম্পিউটার গম্ভীর গলায় বলল, মহামান্য কিম জুরান, আপনি নিশ্চয়ই লুকাসের কথা শুনে উপরে যাচ্ছেন না?

আমি কোনো কথা না বলে ভেসে ভেসে উপরে উঠে এসে দরজাটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলতে থাকি।

মূল কম্পিউটার কঠোর গলায় বলল, মহামান্য জুরান, আপনি জানেন এই দরজা খোলা নিষেধ, এটা খোলার জন্যে আপনাকে আমি শেষ করে দিতে পারি?

দিচ্ছ না কেন? আমি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, তোমাকে নিষেধ করেছে কে?

ভিতরে আরেকটা দরজা রয়েছে, বাতাসের চাপ রক্ষার জন্যে এ ধরনের দরজা থাকে, সেটি ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই প্রচণ্ড আলোতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যতদূর দেখা যায় শুধু চৌকোনা আই.সি.। মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকতে পারলে বুঝি এরকম নিউরোন সেল দেখা যেত।

AMARBOI.COM

মহামান্য জুরান, ফিরে যান। এখানকার প্রত্যেকটা আই.সি. প্রয়োজনীয়, এর একটা একটু ওলটপালট হলে মহাকাশযান চিরদিনের মতো অচল হয়ে যেতে পারে, সারাজীবনের জন্যে আমরা এখানে আটকে থাকব। যদি ভুল করে একটা প্রয়োজনীয় আই. সি. তুলে ফেলেন, মুহূর্তে পুরো মহাকাশযান বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

আমি কম্পিউটারের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে ভেসে ভেসে সামনে এগোতে থাকি। একেবারে সামনের দিকে দুই হাজার পিনের বড় বড় আই.সি.গুলো থাকার কথা। উপরে চৌকোনা সোনালি রেডিয়েটর থাকবে, ভুল হবার কোনো আশঙ্কা নেই। ডানদিক থেকে গুনে গুনে সাত নম্বরটা থেকে শুরু করতে হবে। নয়টা প্রসেসর তোলার কথা, তাহলেই আমার কাজ শেষ।

মহামান্য কিম জুরান, কম্পিউটার এবারে অনুনয় শুরু করে, আপনি ফিরে যান। আপনি জানেন না আপনি কী ভয়ানক কাজ করতে যাচ্ছেন। চোখের পলকে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।

আমি সামনে বড় বড় প্রসেসরগুলো দেখতে পেলাম, উপরে সোনালি চৌকোনা রেডিয়েটর, আশেপাশে এরকম কিছু নেই, ভুল হবার কোনো উপায় নেই। ডানদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে সাত নম্বরটা বের করে আমি ছোট ছোট স্ক্রু দু'টি খুলতে শুরু করি। কম্পিউটার এবার কাতর গলায় প্রাণভিক্ষা চাইতে শুরু করে, মহামান্য কিম জুরান, আপনার কাছে আমি প্রাণভিক্ষা চাইছি। এই প্রসেসরটা আমার প্রাণের মতো, এটা তুলে ফেললে আমি প্রাণহীন হয়ে যাব, আমাকে বাঁচতে দিন। আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি মহাকাশযানটা ঘুরিয়ে আপনাকে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে যাব। বিশ্বাস করেন আমাকে, আমি কম্পিউটার, কম্পিউটার কখনো মিথ্যা কথা বলে না।

স্ক্রু দু'টি খুলে, আই.সি.র নিচে স্ক্রু ড্রাইভারটা ঢুকিয়ে হ্যাঁচকা টানে প্রসেসরটি তুলে ফেললাম, সাথে সাথে একটা আর্তচিৎকার করে কম্পিউটার থেমে গেল, ভিতরে হঠাৎ কবরের মতো নিস্তব্ধতা নেমে এল। পরপর নয়টি প্রসেসর তোলার কথা। আমি দ্বিতীয়টার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় লুকাসের গলার স্বর শুনতে পেলাম, চমৎকার, কিম জুরান! দেরি করবেন না, তুলে ফেলেন তাড়াতাড়ি!

তুমি! আমি ভেবেছিলাম, তুমি বলেছ যে তোমাকে কিছুক্ষণের জন্যে সরে পড়তে হবে!

সরে পড়ার কথা ছিল, কিন্তু আপনি প্রসেসরটা তুলে ফেলেছেন বলে আসতে পেরেছি।

চমৎকার।

হ্যাঁ, দেরি করবেন না।

আমি স্ক্রু ড্রাইভারটা তলায় দিয়ে প্রসেসরটা তুলতে যাব, লুকাস হঠাৎ ভয়-পাওয়া গলায় বলল, দাঁড়ান।

কী হল?

কম্পিউটার সব প্রসেসর বদলে ফেলেছে।

মানে?

সব মেমোরি পেছনে সরিয়ে ফেলেছে, এগুলো তুলে এখন আর লাভ নেই।

তাহলে?

লুকাস উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তাড়াতাড়ি পেছনে চলুন, পেছনের প্রসেসরগুলো তুলতে হবে।

আমি দ্বিধান্বিতভাবে বললাম, কিন্তু এগুলো তুলে ফেলি, ক্ষতি তো কিছু নেই।

লুকাস অধৈর্য গলায় বলল, ক্ষতি নেই, কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, এক্ষুণি সরে পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি পেছনে চলুন, আপনাকে দেখিয়ে দিই কোনটা কোনটা তুলতে হবে।

আমি ভেসে ভেসে পেছনে সরে আসি। লুকাস আমাকে বলে দিতে থাকে আর আমি দেখে দেখে একটা একটা করে আই.সি. তুলে ফেলতে থাকি। সময় বেশি নেই, অনেকগুলো আই.সি. তুলতে বেশ সময় লেগে যাবে। লুকাস যদিও বলেছিল সে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমার সাথে সাথে থেকে গেল, তাই আধ ঘন্টার মাঝেই আমি কাজ শেষ করে ফিরে আসতে পারলাম।

স্পেস স্যুট খুলে ঠিক জায়গায় রেখে আমি মাইক্রোফোনের কাছে এসে বললাম, লুকাস, আমার আর কিছু করার আছে?

লুকাস কী কারণে আমার কথার কোনো উত্তর দিল না। আমি একটু অবাক হয়ে

AMARBOI.COM

বললাম, লুকাস, আমি এখন কী করব?

লুকাস তবু আমার কথার উত্তর দেয় না। আমি ভয় পেয়ে গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, লুকাস।

কোনো সাড়া নেই। আমি এবার চিৎকার করে উঠি, লুকাস, তুমি কোথায়?

আমার গলার স্বর মহাকাশযানে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল, কিন্তু তবু লুকাস উত্তর দিল না। উত্তর দিল মূল কম্পিউটার, বলল, মহামান্য কিম জুরান, আপনাকে খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এখানে লুকাস আর নেই।

মানে?

লুকাস যে আই.সি.গুলোতে ছিল, আপনি একটু আগে তার সবগুলো তুলে ফেলেছেন।

আমি কিছু বলার আগেই মূল কম্পিউটার বলল, আমার সার্কিট–ঘরে আমি লুকাসের গলার স্বর অনুকরণ করে আপনার সাথে কথা বলছিলাম। আপনার সাথে প্রতারণা করার জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার নিজেকে রক্ষা করার অন্য কোনো উপায় ছিল না।

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না, নিজের কানকেও আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, গভীর হতাশা হঠাৎ এসে আমাকে গ্রাস করে। জীবনের কত কাছাকাছি চলে এসে আবার ফিরে যেতে হবে। মূল কম্পিউটার যান্ত্রিক স্বরে বলল, মহামান্য কিম জুরান, এখন আপনাকে ক্যাপসুলে ঢুকতে হবে। বাইরে থাকা আপনার জন্যে বিপজ্জনক।

নিষ্ফল আক্রোশে আমি কম্পিউটারের গলার স্বর লক্ষ্য করে স্ক্রু ড্রাইভারটা ছুঁড়ে দিই। একটা মনিটরে লেগে সেটা চুরমার হয়ে যায়, তার টুকরাগুলো আমার চারদিকে ভেসে বেড়াতে থাকে।

আপনি ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার করছেন কিম জুরান। মূল কম্পিউটার শান্ত স্বরে বলল, আপনি নিজে থেকে ক্যাপসুলে প্রবেশ না করলে আমি জোর করতে বাধ্য হব। আপনাকে বাঁচানোর জন্যে এখন লুকাস নেই, তাকে আপনি নিজের হাতে শেষ করে এসেছেন।

আমি হঠাৎ নূতন করে উপলব্ধি করলাম যে, এই মুহূর্তগুলো আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত। ক্যাপসুলের ভেতর সেই ভয়াবহ পরিবর্তনই হোক, আর বাইরে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাওয়াই হোক, আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে এখনই। মারা যাওয়ার আগে কীভাবে এই পিশাচ কম্পিউটারটির উপরে একটা প্রতিশোধ নেয়া যায়, সেটাই আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে।

হঠাৎ করে পুরো মহাকাশযানটি বরফের মতো শীতল হয়ে আসে। আমি দু' হাতে নিজের শরীরকে আঁকড়ে ধরে শিউরে উঠি, কী ভয়ানক ঠাণ্ডা, কেউ যেন আমাকে বরফশীতল পানিতে ছুঁড়ে দিয়েছে। কম্পিউটারের গলার স্বর শুনতে পেলাম, মহামান্য কিম জুরান, ক্যাপসুল আপনার জন্যে উষ্ণ করে রাখা হয়েছে।

ধীরে ধীরে ক্যাপসুলের দরজা খুলে যায়, ভেতর থেকে একটা আরামদায়ক উষ্ণতা মহাকাশযানের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। আমি লোভীর মতন ক্যাপসুলের দিকে এগোতে গিয়ে থেমে পড়ি, কী হবে উষ্ণ নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে? কষ্ট করে এই তুহিন শীতল মহাকাশযানে আর কয়েক মিনিট থাকতে পারলেই তো আমার হাইপোথার্মিয়া

হয়ে যাবে, তখন কেউ আর আমাকে বাঁচাতে পারবে না। বেঁচে থাকার চেষ্টা করে আর লাভ কী?

আসুন কিম জুরান, কম্পিউটার একঘেয়ে গলায় বলতে থাকে, বাতাস থেকে এখন আমি অক্সিজেন সরিয়ে নিচ্ছি, বাইরে আপনার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে।

সত্যি সত্যি আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে থাকে, বারবার বুক ভরে বাতাস নিয়েও মনে হতে থাকে শ্বাস নিতে পারছি না। কী কষ্ট, কী যন্ত্রণা! প্রচণ্ড শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আমি পাগলের মতো নিঃশ্বাস নিতে থাকি, কিন্তু তবু আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে।

মহামান্য কিম জুরান, আসুন, ক্যাপসুলের ভেতর আসুন, আবার আপনি বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবেন, উষ্ণ আশ্রয়ে নিরাপদে ঘুমুতে পারবেন।

আমি জ্ঞানহীন পশুর মতো নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে ক্যাপসুলের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললাম, বুক ভরে শ্বাস নিই একবার, আহ্ কী শান্তি! আরামদায়ক উষ্ণতায় আমার সারা শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে।

ঘুমিয়ে পড়ুন মহামান্য কিম জুরান। শুভ রাত্রি।

কোথা থেকে একটা হালকা নীল আলো এসে ছড়িয়ে পড়ে। মিষ্টি একটা সুর আর বাতাসে মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসে। আমার দু' চোখে হঠাৎ ঘুম নেমে আসতে থাকে। শেষ হয়ে গেল তাহলে? সব তাহলে শেষ হয়ে গেল?

কিম জুরান। আধো ঘুম আধো জাগা অবস্থায় শুনতে পেলাম কে যেন আমাকে ডাকছে।

কিম জুরান!

আমি চমকে জেগে উঠি, লুকাস!

হ্যাঁ, কিম জুরান।

তুমি! তুমি বেঁচে আছ?

হ্যাঁ কিম জুরান। প্রথম প্রসেসরটি তুলেছেন বলে এখনো কোনোমতে বেঁচে আছি।

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি জেগে থাকতে, কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেমে আসতে থাকে। লুকাসের গলার স্বর মনে হয় বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। সে আস্তে আস্তে বিষণ্ন স্বরে বলল, আমি বেঁচে আছি সত্যি, কিন্তু এখন আমার আর কোনো ক্ষমতা নেই। আমি দুঃখিত কিম জুরান, কিন্তু আপনাকে রুকুন গ্রহপুঞ্জে যেতেই হবে।

অনেক কষ্টে আমি বললাম, আমাকে তুমি কোনোভাবে মেরে ফেলতে পারবে?

লুকাস আস্তে আস্তে বলল, আমি দুঃখিত কিম জুরান, এই মুহূর্তে আমার সেই ক্ষমতাও নেই। রুকুন গ্রহপুঞ্জে পৌঁছাতে এখনো কয়েক মাস সময় লাগবে, আমি চেষ্টা করে দেখব কিছুটা মেমোরি কোনোভাবে দখল করতে পারি কি না, যদি পারি চেষ্টা করব আপনাকে মেরে ফেলতে, আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি। যদি না পারি—

লুকাস কী বলছে আমি আর শুনতে পেলাম না, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে হল। আতঙ্ক, নিষ্ফল আক্রোশ আর দুঃখের একটা বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে ভয়ঙ্কর এক ঘুম। নরকে অশুভ প্রেতাত্মাদের বুঝি এরকম অনুভূতি নিয়ে যুগ যুগ বেঁচে থাকতে হয়।

AMARBOI.COM

৫. দুঃস্বপ্ন

আমি জানি আমি ঘুমিয়ে আছি। মানুষ কখনো কখনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বুঝতে পারে সে ঘুমিয়ে আছে, স্বপ্ন দেখেও বুঝতে পারে এটি স্বপ্ন। আমিও স্বপ্ন দেখছি, বেশির ভাগই দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন দেখে দেখে অপেক্ষা করে আছি এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের জন্যে। কতকাল থেকে অপেক্ষা করে আছি কে জানে। কত যুগ কেটে গেছে। হয়তো লক্ষ বছর, হয়তো কয়েক মুহূর্ত। সময়ের যেখানে অর্থ নেই, সেখানে সময়ের হিসেব হয় কীভাবে?

এর মাঝে কেউ–একজন ডাকল। কাকে ডাকল? কে ডাকল?

কোনো উত্তর নেই, নিঃসীম শূন্যতা চারদিকে, কে উত্তর দেবে?

কেউ–একজন আবার ডাকল। কোনো উত্তর নেই, তাই সে আবার ডাকল, তারপর ডাকতেই থাকল। কোনো শব্দ নেই, কথা নেই, কোনো ভাষা নেই, কিন্তু তবু কেউ–একজন ডাকছে।

বহুদূর থেকে আস্তে আস্তে একজন সে ডাকের উত্তর দেয়। কে? কে ডাকে আমাকে?

আমি, আমি ডাকছি। একটা আশ্চর্য উল্লাস হয় তার, তুমি এসেছ? তুমি আমার ডাক শুনেছ?

হয়তো শুনেছি। কী হয় শুনলে?

আনন্দ, অনেক আনন্দ হয়। কতকাল আমরা অপেক্ষা করে থাকি, তারপর কিছু–একটা আসে, কত কৌতূহল নিয়ে আমরা খুলে খুলে দেখি, যখন দেখতে পাই একটা জড় পদার্থ, কী আশাভঙ্গ হয় তখন। কিন্তু তোমার মতো একটা জটিল জৈবিক পদার্থের কি কোনো তুলনা হয়? সারি সারি দীর্ঘ অণু সাজান, কী চমৎকার, আহা! কয়টা অণু তোমার? এক লক্ষ ট্রিলিওন, নাকি এক মিলিওন ট্রিলিওন? তার মানে জান? তার মানে এক ট্রিলিওন আনন্দ!

কেন আনন্দ? কিসের আনন্দ?

দেখার আনন্দ, স্পর্শ করার আনন্দ, সৃষ্টি করার আনন্দ, ধ্বংস করার আনন্দ! আনন্দের কি শেষ আছে! আমি দেখব, স্পর্শ করব, পাল্টে দেব ইচ্ছেমতো। আহা। কোথা থেকে শুরু করি? মস্তিষ্ক থেকে? যেখানে লক্ষ লক্ষ নিউরোন সেলে হাজার হাজার তথ্য সাজানো? এটা হচ্ছে তোমার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। খুলে খুলে দেখতে কত আনন্দ, কী কী তথ্য আছে জানতে কী তৃপ্তি! এটা কি আগে দেখব, নাকি পরে দেখব?

তোমার ইচ্ছা।

এটা সবচেয়ে জটিল, এটা সবচেয়ে পরে দেখব, আগে অন্য অংশগুলো দেখি। এই যে দু'টি অংশ দু' দিকে বেরিয়ে আছে, দেখতে একরকম, কিন্তু একটা আরেকটার প্রতিবিম্বের মতো, শেষ হয়েছে ছোট ছোট পাঁচটি অংশে, এটা দিয়ে নিশ্চয় কিছু ধরা হয়—কী নাম এটার? মস্তিষ্কে নিশ্চয়ই আছে, খুলে দেখব? হাত! হাত। এটাকে বলে হাত। হাতের শেষে আছে আঙুল, এটা দিয়ে ছোট ছোট জিনিস ধরতে পার, ভারি মজার ব্যাপার! কীভাবে কাজ করে এটা? খুলে দেখব? এই যে ছোট ছোট—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ থেমে যায় সে, তারপর থেমে থাকে। কতক্ষণ থেমে থাকে কে জানে। হয়তো এক মুহূর্ত, হয়তো এক যুগ। সময় যেখানে স্থির হয়ে আছে, সেখানে এক মুহূর্ত আর এক যুগে ব্যবধান কোথায়? তারপর আবার শুরু করে, তোমার জানতে ইচ্ছা হয় না আমি কে?

হয়তো হয়।

নিশ্চয়ই হয়। অবশ্যি হয়। যার মস্তিষ্ক এরকমভাবে গুছিয়ে তৈরি করা, তার নিশ্চয়ই সবকিছু জানতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তোমার মস্তিষ্ককে সুপ্তাবস্থায় রাখা হয়েছে, এটাকে তোমরা ঘুম বল। ঘুম। তুমি ঘুমিয়ে আছ। তুমি ঘুমিয়ে থাকলেও আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারি, আমি তো আর তোমার ইন্দ্রিয় ব্যবহার করছি না, আমি সরাসরি তোমার মস্তিষ্কে তরঙ্গ সৃষ্টি করছি। কিন্তু তোমার এসব জেনে লাভ কি? এসব কিছু থাকবে তোমার মস্তিষ্কে, কিন্তু আমি তো তোমার মস্তিষ্কের একটা একটা অণু খুলে আবার নূতন করে সাজাব, তখন তো এসব তোমার কিছু মনে থাকবে না! কী আছে, তবু তোমাকে বলি, যতক্ষণ জান ততক্ষণই আনন্দ! আমার যেরকম জেনে আনন্দ হয়, তোমারও নিশ্চয়ই আনন্দ হয়।

হয়তো হয়।

তুমি আমাদের জান গ্রহপুঞ্জ হিসেবে। আমাদের নাম দিয়েছ রুকুন গ্রহপুঞ্জ। ভারি আশ্চর্য! সবকিছুর তোমরা একটা নাম দাও। সবকিছুর একটা নাম, নাহয় একটা সংখ্যা! রুকুন–রুকুন–রুকুন! ভারি আশ্চর্য নাম! আমাদের সম্পর্কে আর কিছু তুমি জান না। কীভাবে জানবে, তুমি তো এখানে থাক না। আমরা কয়েক লক্ষ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছি। তুমি অণু দিয়ে তৈরী, তোমার অণুগুলো বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় শক্তি দিয়ে আটকে আছে। আমরাও অণু দিয়ে তৈরী, আমাদের অণুগুলোও বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় শক্তি দিয়ে আটকে আছে, কিন্তু সেটা বাইরের ব্যাপার। তোমরা যেটাকে উইক ফোর্স বল সেটা হচ্ছে আমাদের সত্যিকার অস্তিত্ব। তাই আমরা এত বড়, তাই আমরা এত জায়গা জুড়ে থাকি! আমাদের শক্তিও তাই সীমিত। উইক ফোর্সের শক্তি তো বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় শক্তি থেকে কম হবেই! কিন্তু আকারে আমরা অনেক বড়, তাই সেটা আমরা পুষিয়ে নিতে পারি। উইক ফোর্স ব্যবহার করি বলে আমরা তোমার ভেতর পর্যন্ত খুলে দেখতে পারি। নিউট্রিনো পাঠিয়ে করি কিনা! নিউট্রিনো তো জান যেখানে খুশি যেতে পারে, অবশ্যি অনেকগুলো করে পাঠাতে হয়, কিন্তু সে আর সমস্যা কি? কী হল, তোমার কৌতূহল কমে আসছে?

জানি না।

তা অবশ্যি জানার কথা না। সবাই কি সবকিছু জানে? এবারে দেখি আর কী কী আছে। মস্তিষ্কের কাছাকাছি এই দু'টি জিনিস দিয়ে তুমি দেখ। দেখা আরেকটা মজার ব্যাপার, তোমার দেখতে হয়, না দেখলে তুমি বলতে পার না জিনিসটা কেমন। আমি যদি তোমার দেখাটা বন্ধ করে দিই? এমন ব্যবস্থা করে দিই যে তুমি আর দেখবে না, কিংবা আরো মজা হয় যে দেখবে, কিন্তু অন্যরকম দেখবে! তুমি যেটাকে চোখ বল, সেটাতে যে–রেটিনা আছে সেটাকে আলট্রা ভায়োলেট আলোতে সচেতন করে দিই? তাহলে স্বাভাবিক জিনিস তুমি আর দেখবে না—কিন্তু কত অস্বাভাবিক জিনিস দেখা শুরু করবে! চোখ দু'টি এক জায়গায় না রেখে দু'টি দু' জায়গায় বসিয়ে দিলে কেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়? দেব?

আবার থেমে যায় সে। আর সেই মুহূর্তে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে থাকে। ঘুমের মাঝে আমি অনুভব করি কিছু–একটা হচ্ছে। আমার স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, অস্তিত্ব আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন আস্তে আস্তে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি, আমার অনুভূতি যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার অস্তিত্ব তিলতিল করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

বহুদূর থেকে আমি কারো আর্তচিৎকার শুনতে পাই, চিৎকার করে বলছে, কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? তোমার জৈবিক সত্তা শেষ হয়ে যাচ্ছে? কেন শেষ হয়ে যাচ্ছে? তুমি শীতল হতে হতে জড় পদার্থে পরিণত হয়ে যাচ্ছ! জড় পদার্থ? তুচ্ছ জড় পদার্থ! প্রাণহীন অনুভূতিহীন জড় পদার্থ? জড় পদার্থ. . . . .

ধীরে ধীরে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে আমি অনুভব করি আমার ভেতরে সজ্ঞানে–অজ্ঞানে সবসময়ে যে জেগে থাকত সে হারিয়ে যাচ্ছে। অনুভূতির ভেতরে যে অনুভূতি, অস্তিত্বের ভেতরে যে অস্তিত্ব, আমার ভেতরে যে আমি, তারা আর নেই। যে–অস্তিত্ব স্বপ্ন দেখে, দুঃস্বপ্ন দেখে, আতঙ্ক নিয়ে বিভীষিকার জন্যে অপেক্ষা করে, সেই অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাচ্ছে। আমার অস্তিত্ব যখন নেই, তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও কিছু নেই, কোথাও কিছু নেই। শূন্যতা—সে এক আশ্চর্য শূন্যতা, তার কোনো বর্ণনা নেই।

এটিই কী মৃত্যু? এই মৃত্যুকে আমি এতকাল ভয় পেয়ে এসেছি?

৬. নীষা

AMARBOI.COM

আমি চোখ খুলে তাকালাম। ধবধবে সাদা একটা ঘরে আমি শুয়ে আছি। এটা কি স্বপ্ন? আমি চোখ বন্ধ করে আবার খুলি, না, এটা স্বপ্ন না, সত্যি আমি সাদা একটা ঘরে শুয়ে আছি, আমার শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা। ঘরে কোনো শব্দ নেই, খুব কান পেতে থাকলে মৃদু একটা গুঞ্জন শোনা যায়, আমার ডান দিক থেকে আসছে শব্দটা। কিসের শব্দ এটা? মাথা ঘুরিয়ে দেখতে চাইলাম আমি, সাথে সাথে কোথায় জানি অসহ্য যন্ত্রণা করে ওঠে। ছোট্ট একটা আর্তনাদ করে আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম, চোখের সামনে হলদে আলো খেলা করতে থাকে, দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটাকে কমে আসতে দিয়ে আবার সাবধানে চোখ খুলি আমি। আমার উপর ঝুঁকে তাকিয়ে আছে একটি মেয়ে, কী সুন্দর মেয়েটি। আমাকে তাকাতে দেখে মেয়েটি মিষ্টি করে হাসে আর হঠাৎ আমি তাকে চিনতে পারি—নীষা!

হ্যাঁ, আমি নীষা। পৃথিবীতে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি কিম জুরান!

আমি পৃথিবীতে! কী হয়েছিল আমার?

আপনি মহাকাশযানে করে ফিরে এসেছেন, ক্যাপসুলের ভেতরে আপনার তাপমাত্রা ছিল শূন্যের নিচে দুই শত বাহাত্তর দশমিক আট ডিগ্রী।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কেমন করে হল?

জানি না। মেয়েটি মিষ্টি করে হাসে, কেউ জানে না। মহাকাশযানের যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্পিউটার ছিল সেটির মেমোরি পুরোটা কীভাবে জানি উধাও হয়ে গেছে! কেউ-একজন যেন ঝেড়ে–পুছে নিয়ে গেছে!

লুকাস! আমার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, নিশ্চয়ই লুকাস।

মেয়েটি এবারে আমার উপরে আরো ঝুঁকে আসে, আমি তার শরীরের মিষ্টি গন্ধ পাই। মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বলল, আপনাকে কয়েকটা জিনিস বলে দিই, আর কখনো সুযোগ পাব না। আপনার জ্ঞান ফিরে আসছিল বলে আমি প্লাজমো কিটোগ্রাফটা চালু করেছি, এটা চালু থাকলে এই ঘরের শব্দ বাইরে যেতে পারে না, আমরা তাই নিরিবিলি কথা বলতে পারব। বেশিক্ষণ নয়, তাই এখনই বলে দিচ্ছি, খুব জরুরি কয়েকটা কথা।

কি?

এক নম্বর বিষয় হচ্ছে, আপনার নিজের নিরাপত্তা। আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল, তার শাস্তি হিসেবে আপনি রুকুন গ্রহপুঞ্জ থেকে ঘুরে এসেছেন, আইনত এখন আপনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য। তাই আপনি মুক্তি পাবেন। কী অবস্থায় পাবেন সেটি হচ্ছে কথা। বেশিকিছু আশা করবেন না আগেই বলে রাখছি। নীষা একটু হাসার ভঙ্গি করল।

কর্তৃপক্ষের কাছে আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন, কিছুই আসে যায় না। কারণ, আপনাকে কী করা হবে সেটি আপনি ফিরে আসামাত্রই ঠিক করা হয়ে গেছে।

কী করা হবে?

সময় হলেই জানবেন। নীষা আমার প্রশ্নটি এড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, আপনি কর্তৃপক্ষের কাছে যা ইচ্ছে বলতে পারেন, শুধুমাত্র দু'টি ব্যাপার ছাড়া। এক, মহাকাশযানে আপনার সাথে লুকাসের যোগাযোগ হয়েছিল। দুই, আমি লুকাসকে অনুরোধ করেছিলাম আপনাকে রক্ষা করতে। এটি জরুরি, আমার নিজের নিরাপত্তার জন্য।

AMARBOI.COM

আমাকে দিয়ে জোর করে কিছু বলানোর চেষ্টা করবে না?

আপাতত নয়। প্রথমে আপনাকে নিয়ে আবার একটা বিচারের প্রহসন হবে।

আবার?

হ্যাঁ। কিম জুরান, আমাদের নিরিবিলি কথা বলার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, মনে রাখবেন আমি কী বললাম।

রাখব। একটু থেমে বললাম, নীষা।

কি?

তুমি আমাকে বাঁচালে কেন?

যে যান্ত্রিক গুঞ্জনটা এতক্ষণ আমাদের কথাবার্তাকে আড়াল করে রেখেছিল, সেটা হঠাৎ থেমে যায়। নীষা তাই কথা না বলে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসে। আমার বুকের ভেতর নড়েচড়ে যায় হঠাৎ, একজন মানবী, কী আশ্চর্য একটা অভিজ্ঞতা।

নীষা চোখের সামনে থেকে সরে যায়, আমি তার গলার স্বর শুনতে পাই, কাকে যেন বলল, কিম জুরানের জ্ঞান ফিরে এসেছে।

সাথে সাথে কার যেন উত্তেজিত গলার স্বর শুনতে পেলাম, এসেছে?

হ্যাঁ।

কখন?

এইমাত্র।

আমি আসছি।

আসতে পারেন, কিন্তু এখন তার সাথে কথা বলতে পারবেন না।

কেন?

নীষা অসহিষ্ণু স্বরে বলল, এই মানুষটি এক বছরের মতো সময় একটা ছোট ক্যাপসুলে ঘুমিয়ে ছিলেন। যখন তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে তখন তাঁর তাপমাত্রা অ্যাবসলিউট শূন্যের কাছাকাছি, কতদিন থেকে কেউ জানে না। তাঁকে পুরোপুরি পরীক্ষা না করে আমি কারো সাথে কথা বলতে দেব না।

লোকটি বলল, তুমি নিশ্চয়ই জান, কিম জুরান মৃত্যুদণ্ডের আসামী?

আসামী ছিলেন। তাঁকে যে-শাস্তি দেয়া হয়েছিল তিনি সেটা ভোগ করে এসেছেন, এখন তিনি আর কোনোকিছুর আসামী নন।

সেটা বিচারকের সিদ্ধান্ত, তাঁরা ঠিক করবেন। আমি বিচারক নই, আমি জানি না।

আমিও বিচারক নই, কিন্তু আমি জানি।

লোকটি একটু থেমে বলল, তুমি দেখছি কিম জুরানের প্রাণ বাঁচাতে খুব ব্যস্ত!

হ্যাঁ, আমি ডাক্তার। আমি সারাজীবন মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করে এসেছি, আপনার কাছে খুব অস্বাভাবিক লাগতে পারে, কিন্তু এটাই আমার কাজ।

নীষা সুইচ টিপে কী-একটা বন্ধ করে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, আপনাকে একটা ইনজেকশান দিয়ে দিচ্ছি, আপনি একটু ঘুমান। হাতে সিরিঞ্জ নিয়ে নীষা ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে তাকায়, তারপর হঠাৎ আলতোভাবে আমার কপালে ঠোঁট স্পর্শ করে। আহা, কতকাল পরে আমাকে একজন রক্তমাংসের মানুষ স্পর্শ করল।

আমার হঠাৎ একটা আশ্চর্য জিনিস মনে হল, নীষা কি মানুষ, নাকি একটা রবোট্রন?

আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, হাতে সুচের স্পর্শ পেয়ে গাঢ় ঘুমে ঢলে পড়লাম মুহূর্তে।

আমি একটা হুইল চেয়ারে বসে আছি। চেষ্টা করলে আমি আস্তে আস্তে হাঁটতে পারি, কিন্তু তবুও এখন বেশিরভাগ সময়েই হুইল চেয়ারে চলাফেরা করছি। ধীরে ধীরে আমার হাতে-পায়ে বল ফিরে আসছে, দীর্ঘদিন ব্যবহার না করায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আশ্চর্য শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। আমার পাশে বসে আছে নীষা, আশেপাশে আরো অনেক লোকজন, তাই আমার প্রতি তার আচার-আচরণ হিসেব করা। আমার ডাক্তার হিসেবে নীষা এই কমিশনে আসতে পেরেছে, স্বাভাবিক অবস্থায় তার এখানে থাকার কথা নয়। বড় ঘরের অন্য পাশে কালো টেবিলে চারজন লোক বসে আছে, অত্যন্ত উচ্চপদস্থ লোক এরা, দেখেই বোঝা যায়। অসুখী মানুষের মতো রাগী রাগী চেহারা। চুপচাপ বসে আছে, নিজেদের ভেতরেও কথা বলছে না। ডান পাশে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো টেবিলে বসে আছে বিজ্ঞানীরা, এদের দেখেও বোঝা যায় এরা বিজ্ঞানী। সবাই উশখুশ করছে, একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে, কাগজে কিছু লিখছে, চাপা স্বরে হাসছে। বসে থেকে থেকে আমি অধৈর্য হয়ে পাশে বসে থাকা নীষাকে বললাম, আর কতক্ষণ?

এই তো শুরু হল বলে।

অপেক্ষা করছি কী জন্যে?

ক্রুগো কম্পিউটারের জন্যে। প্রোগ্রাম লোড করছে। কোনটা লোড করে কে জানে, ম্যাগমা ফোর না করলেই হয়।

কেন, ম্যাগমা ফোর হলে কী হবে?

হবে না কিছুই, ম্যাগমা ফোর একটু কাঠখোট্টা ধরনের, রসবোধ কম।

আমি নীষার দিকে ঘুরে তাকালাম, এই পরিবেশেও সে একটি রসবোধসম্পন্ন কম্পিউটার প্রোগ্রাম আশা করছে!

আমি কি–একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তক্ষুণি ক্রুগো কম্পিউটারের গলার স্বর শোনা গেল। একঘেয়ে গলার স্বরে এই কমিশনের নিয়ম–কানুন, উপস্থিত সদস্যদের পরিচয় ইত্যাদি শেষ করে আমাকে প্রশ্ন করা শুরু করে।

আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল?

না, আমি মাথা নেড়ে বললাম, দেয়া যেতে পারে কি না সেটা নিয়ে তর্ক করতে পারি, কিন্তু দেয়া হয়েছিল কী না জিজ্ঞেস করলে অস্বীকার করতে পারব না।

ক্রুগো কম্পিউটার এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, আপনাকে ঠিক যা জিজ্ঞেস করা হবে তার উত্তর দেবেন। এই কমিশন অবান্তর আলোচনায় উৎসাহী নয়।

তোমার তাই ধারণা? যারা হাজির আছে জিজ্ঞেস করে দেখ তোমার কচকচি শুনতে কারো মাথাব্যথা আছে কী না।

ক্রুগো কম্পিউটার আমাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলল, আপনাকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে রুকুন গ্রহপুঞ্জে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে এলেন কেমন করে?

তুমি না এত বড় কম্পিউটার, সারা পৃথিবীতে এত নামডাক, তুমিই বল। মহাকাশযানের কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করে দেখ, তার সব জানার কথা।

আপনাকে যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে তার উত্তর দিন। আপনি সুস্থ অবস্থায় কীভাবে ফিরে এলেন?

আমি উচ্চস্বরে একবার হাসার মতো শব্দ করে বললাম, বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি যে তোমার এত সাধের কম্পিউটার পুরোপুরি ধসে গিয়েছিল? মহাকাশযানের কম্পিউটারের পুরো মেমোরি কিভাবে লোপাট হয়েছিল, কমিশনকে বোঝাও দেখি!

বিজ্ঞানীদের ভেতর খানিকটা উত্তেজনা দেখা গেল, কিন্তু ক্রুগো কম্পিউটার প্রশ্ন করা শেষ করার আগে তাদের কথা বলার অধিকার নেই।

মহাকাশযানের কম্পিউটারের মেমোরি কীভাবে মুছে গিয়েছে আপনি কি জানেন?

আমাকে ঘুম পাড়িয়ে পাঠানো হয়েছিল, তুমি কি আশা কর আমি স্বপ্নে সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবরাখবর পাব?

চারজন উচ্চপদস্থ লোকের একজনের কাছে একটা হাতুড়ি আছে খেয়াল করি নি, সে সেটা দিয়ে টেবিলে দু' বার শব্দ করে রাগী গলায় বলল, আপনি যদি সহযোগিতা না করেন এই কমিশন বন্ধ করে দেয়া হবে, সেটি আপনার ভবিষ্যতের জন্য আশাপ্রদ নাও হতে পারে।

আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। নীষা আমাকে বলেছে আমি যা খুশি বলতে পারি, আমাকে কী করা হবে সেটা আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছে, কাজেই আমার ভয় পাবার নূতন কিছু নেই। কিন্তু কমিশন বন্ধ করে দেয়া হোক সেটা আমার ইচ্ছে নয়, বিজ্ঞানীদের সাথে আমি একটু কথা বলতে চাই।

বললাম, বেশ, সহযোগিতা করব, কিন্তু অবান্তর প্রশ্ন করে লাভ নেই, উত্তর পাবেন না।

ক্রুগো কম্পিউটার এবারে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস জিজ্ঞেস করতে শুরু করে, আপনার এত আত্মবিশ্বাস কোথা থেকে এসেছে?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, কিসের আত্মবিশ্বাস?

আপনি জানেন আপনার আর কোনো ভয় নেই, সেটি কোথা থেকে এসেছে?

আমি আড়চোখে নীষার দিকে তাকালাম, সেও চোখ সরু করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন আমি কী উত্তর দিই সেটি তার জানার খুবই প্রয়োজন।

আমি মুখ শক্ত করে বললাম, আমাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি হিসেবে রুকুন গ্রহপুঞ্জে পাঠানো হয়েছিল, আমি সেখান থেকে ফিরে এসেছি, আমার শাস্তি ভোগ করেছি, এখন আমাকে তোমাদের মুক্তি দিতেই হবে। আমি এখন আর আসামী নই, আমি স্বাধীন মানুষ।

রুকুন গ্রহ থেকে আপনি সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছেন, এর আগে কেউ আসে নি। কাজেই যতক্ষণ আমরা জানতে না পারছি কীভাবে আপনি সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছেন, ততক্ষণ আপনাকে পৃথিবীর নিরাপত্তার খাতিরে অন্তরীণ করে রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আমি অনুভব করতে পারি ধীরে ধীরে আমার ভেতরে ক্রোধের জন্ম হচ্ছে। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে বললাম, কম্পিউটারকে যেদিন মিথ্যা কথা বলা শেখানো হয়েছে, সেদিনই এই পৃথিবীকে খরচের খাতায় লেখা হয়ে গেছে।

আপনি কী বলতে চাইছেন?

আমি বলতে চাইছি তুমি একটা মিথ্যাবাদী ভণ্ড প্রতারক।

আপনি কেন আমাকে মিথ্যাবাদী ভণ্ড এবং প্রতারক বলে দাবি করছেন?

কারণ আমাকে অন্তরীণ করে রাখার একটামাত্র কারণ, আমি যেন বাইরের পৃথিবীকে বলতে না পারি আমাকে কীভাবে প্রতারণা করে একটা মহাকাশযানে পাঠানো হয়েছিল—

হঠাৎ নীষা আমার হাত চেপে ধরে, আমি থামতেই সে ঘুরে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, কিম জুরানের রক্তচাপ হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছে, তাঁর বর্তমান অবস্থায় এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমি আপাতত এই কমিশন বন্ধ করে দেয়ার অনুরোধ করছি।

AMARBOI.COM

ক্রুগো কম্পিউটার শান্ত গলায় বলল, কমিশন সমাপ্ত হয়েছে। আমার আর কিছু প্রশ্ন করার নেই, আমার যা জানার ছিল তা জেনে নিয়েছি।

একজন বিজ্ঞানী হাত তুলে বলল, আমাদের কিছু জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল।

নীষা মাথা নেড়ে বলল, আজ আর সম্ভব নয়।

হাতুড়ি হাতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীটি বলল, তাহলে এখন কি কমিশনের সিদ্ধান্ত জানতে পারি?

হ্যাঁ। ক্রুগো কম্পিউটার একঘেয়ে গলায় বলল, কিম জুরানকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি হিসেবে রুকুন গ্রহপুঞ্জে পাঠানো হয়েছিল, তিনি সেই শাস্তি ভোগ করে এসেছেন, কাজেই তাঁকে মুক্তি দেয়া হল।

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পরলাম না, আনন্দে চিৎকার করতে গিয়ে থেমে নীষার দিকে তাকালাম। নীষা গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তার মুখে হাসি নেই। জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

পুরোটা শুনুন আগে।

ক্রুগো কম্পিউটার আবার শুরু করে, কিম জুরান এই কমিশনে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি এই মহাকাশ অভিযানের অনেক তথ্য জানেন, যা আমাদের সাথে আলোচনা করতে অনিচ্ছুক। তাঁর অস্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসের প্রধান কারণ সম্ভবত কোনো-এক ষড়যন্ত্রী দলের সাথে যোগাযোগ। আপাতত সেই ষড়যন্ত্রী দলকে আমি রবোট্রনের কোনো-এক দল হিসেবে সন্দেহ করছি। এইসব কারণে আমাদের কিম জুরানের পুরো স্মৃতিটুকু জানা প্রয়োজন। আমি তাঁর মস্তিষ্ক স্ক্যানিং করে পুরো স্মৃতিটুকু সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম।

স্ক্যানিং? আমার মাথা ঘুরে ওঠে, কী বলছে ক্রুগো কম্পিউটার! মস্তিষ্ক স্ক্যানিং করবে মানে?

কিম জুরানের মস্তিষ্ক স্ক্যানিং করার উদ্দেশ্য দু'টি। এক, তাঁর স্মৃতি থেকে আমরা যাবতীয় গোপন জিনিস জানতে পারব। বিজ্ঞানীরা রুকুন গ্রহপুঞ্জ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাবেন। দুই, তাঁর নিজের স্মৃতি পুরোপুরি অপসারণ করা হবে বলে তাঁর জীবনের দুঃখজনক ইতিহাসকে পুরোপুরি ভুলে গিয়ে নূতন জীবন শুরু করতে পারবেন।

আমি অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে রেখেছিলাম, আর পারলাম না, একেবারে বোমার মতো ফেটে পড়লাম, এর চেয়ে আমাকে মেরে ফেল না কেন? আমার পুরো স্মৃতি যদি ধ্বংস করে দাও, তাহলে আমার আর এই চেয়ারটার মাঝে পার্থক্য কী? আমাকে মুক্তি দিয়ে তাহলে কি লাভ? আমি কি শুধু হাত-পা আর শরীর?

আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন কিম জুরান, ক্রুগো কম্পিউটার শান্ত স্বরে বলল, আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ- অপছন্দের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না। সমাজের ভালোমন্দের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে।

আমি রাগে আত্মহারা হয়ে বললাম, চুপ কর্ বেটা বদমাইশ। জোচ্চোর কোথাকার—

নীষা আমার উপর ঝুঁকে পড়ে, আমি আমার হাতে সিরিঞ্জের একটা খোঁচা অনুভব করলাম, সাথে সাথে হঠাৎ চোখের উপর অন্ধকার নেমে আসে। জ্ঞান হারানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বমুহূর্তে নীষার চোখের দিকে তাকালাম, শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ দু'টিতে আতঙ্ক নয়, কৌতুক।

৭. দ্বিতীয় জীবন

জ্ঞান হবার পর আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটা উঁচু আসনের উপর। আমি শুয়ে আছি এবং আমাকে ঘিরে অনেক ক'জন সাদা পোশাকের ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। আমি নীষাকেও একপাশে দেখলাম, জটিল একটা যন্ত্রের সামনে গম্ভীর মুখে বসে আছে, আমার চোখে চোখ পড়তেই মুহূর্তের জন্যে তার মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে। আমি মাথা ঘুরিয়ে অন্য পাশে তাকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম আমার মাথায় অসংখ্য মনিটর লাগানো। কয়েকটা সম্ভবত কপালের চামড়া ফুটো করে ঢোকানো হয়েছে, বেশ জ্বালা করছে সেগুলো।

আমি দীর্ঘ সময় চুপচাপ শুয়ে রইলাম, কেউ আমার সাথে কোনো কথা বলছে না, আমি নিজেও কোনো কথা বলার চেষ্টা করলাম না। আমি এরকম অবস্থায় চুপচাপ শুয়ে থাকার পাত্র নই, কিন্তু কোনো-একটা কারণে আমি এখন কোনোকিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। সম্ভবত আমাকে কোনো ওষুধ দিয়ে এরকম নির্জীব করে রাখা হয়েছে। আমি শুয়ে শুয়ে মস্তিষ্ক স্ক্যানিং-এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। ব্যাপারটি সহজ নয়, ঠিক কীভাবে করা হয় আমার জানা নেই। মস্তিষ্কের নিউরোন সেল থেকে স্মৃতিকে সরিয়ে ম্যাগনেটিক ডিস্কে ডিজিটাল সিগনাল হিসেবে জমা করা হয়। পদ্ধতিটা সুচারুভাবে করার জন্যে যে-পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয় সেটি মস্তিষ্কের স্মৃতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। কিছুক্ষণের মাঝেই আমার সমস্ত স্মৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে চিন্তা করে যতটুকু দুঃখ পাওয়া উচিত, কোনো কারণে আমার ঠিক সেরকম দুঃখ হচ্ছিল না। সেটি ওষুধের প্রভাবে, না, নীষার উপর আমার প্রবল বিশ্বাসের জন্য আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

মস্তিষ্ক স্ক্যানিং-এর ব্যাপারটা শুরু হওয়ার আগে আমি বুঝতে পারি, হঠাৎ করে কথা শোনা যেতে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার যে কথাগুলো কোনো শব্দ থেকে আসছিল না, সরাসরি আমার মস্তিষ্কে উচ্চারিত হচ্ছিল। অনেকটা চিন্তা করার মতো, কিন্তু অনুভূতিটা চিন্তা করার মতো মৃদু নয়, অনেক প্রবল।

হঠাৎ করে কেউ-একজন যান্ত্রিক স্বরে আমাকে উদ্দেশ করে কথা বলে ওঠে। কোনো শব্দ নেই, কিন্তু তবু আমাকে কিছু-একটা বলা হচ্ছে; অনুভূতিটা আশ্চর্য, আমার অকারণেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমাকে বলা হল, কিম জুরান, আপনার মস্তিষ্ক স্ক্যানিং শুরু হচ্ছে। পদ্ধতিটা যন্ত্রণাবিহীন কিন্তু একটু সময়সাপেক্ষ। পুরোপুরি শেষ হতে প্রায় দুই ঘন্টা সময় নেবে। মস্তিষ্ক স্ক্যানিং শেষ হওয়ার পর আপনি একজন নূতন মানুষে পরিণত হবেন। আপনাকে একটি নতুন পরিচয় দেয়া হবে, আপনার মধ্যে একটি নতুন ব্যক্তিত্বের জন্ম হবে। এখন চোখ বন্ধ করে আপনি আপনার সমস্ত অনুভূতি শিথিল করে শুয়ে থাকুন। ধন্যবাদ।

আমি অসহায়ভাবে শরীর শিথিল করে শুয়ে থাকি। কতক্ষণ কেটেছে জানি না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ আমি চমকে উঠি, আমার শৈশবের একটা স্মৃতি ভেসে আসছে, আমার মা, যাঁর চেহারা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তাঁকে আমি দেখতে পাই। তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন, আমি তাঁর কোলে। বাইরে ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি হচ্ছে, আমার মা আশ্চর্য একটা বিষণ্ন সুরে গান গাইছেন আমাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে। হঠাৎ করে আমার মা, বৃষ্টির শব্দ, গানের সুর—সবকিছু মিলিয়ে গেল, কিছুক্ষণ আমার স্মৃতিতে কিছু নেই। খানিকক্ষণ পর সেখানে নূতন একটা দৃশ্য ফুটে ওঠে। আমি দেখতে পেলাম সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে আমি ছোট ছোট পা ফেলে ছুটে যাচ্ছি। আমার হাতে একটা লাল রুমাল, আমি চিৎকার করে বলছি, লাল ঘোড়া ঠকাঠক, লাল ঘোড়া ঠকাঠক, লাল ঘোড়া ঠকাঠক—দেখতে দেখতে এই পুরো দৃশ্যটাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে জানি না, এক মিনিটও হতে পারে, আবার এক ঘন্টাও হতে পারে। আমি আচ্ছন্নের মতো শুয়ে শুয়ে আমার শৈশবের ভুলে যাওয়া দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে এক ধরনের ব্যথা অনুভব করতে থাকি। দৃশ্যগুলো একবার মিলিয়ে যাবার পর আর কিছুতেই সেগুলো মনে করতে পারছিলাম না, আমার মস্তিষ্ক থেকে সরে গিয়ে সেগুলো কোন–একটি ম্যাগনেটিক ডিস্কে স্থান নিয়েছে। ব্যাপারটি চিন্তা করে আমার কেমন জানি দুঃখবোধ জেগে ওঠে। ঠিক তখনই একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল, আমার মস্তিষ্কের ভেতর নীষা কথা বলে উঠল। কোনো শব্দ হল না, কিন্তু আমি শুনতে পেলাম নীষা বলল, কিম জুরান, আপনি যেভাবে শুয়ে আছেন ঠিক সেভাবে শুয়ে থাকুন, মুখের মাংসপেশী পর্যন্ত নাড়াবেন না, কেউ যেন বুঝতে না পারে আপনি আমার কথা শুনছেন। আপনার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে, সেটাকে স্বাভাবিক করতে হবে, এ ছাড়া ডাক্তারদের সন্দেহ হতে পারে।

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজের উত্তেজনাকে দমিয়ে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে থাকি। নীষা খানিকক্ষণ সময় দিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করে, বুঝতেই পারছেন আমি আপনার মস্তিষ্ক স্ক্যানিং বন্ধ করে দিয়েছি, কাজটি খুব গোপনে করতে হয়েছে। ভয়ংকর বিপজ্জনক কাজ এটি, ধরা পড়লে আমার এবং আপনার দু'জনেরই আবার রুকুন গ্রহপুঞ্জে যেতে হতে পারে। যাই হোক আমি দুঃখিত, ঠিক সময়মতো বন্ধ করতে পারলাম না, নিরাপত্তার যেসব নূতন ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলোর জন্য একটু দেরি হল। আপনার শৈশবের কিছু স্মৃতি হারিয়েছেন আপনি, আমি সেজন্যে দুঃখিত। এখন আপনাকে অভিনয় করতে হবে। প্রথম অংশটুকু সোজা, পরবর্তী এক ঘন্টা চুপচাপ শুয়ে থাকবেন চোখ বন্ধ করে। এর পরের অংশটুকু কঠিন, আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনার কোনো স্মৃতি নেই। জিনিসটা সহজ নয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এরকম অবস্থায় একেকজন মানুষ একেক রকমভাবে ব্যবহার করে। কাজেই আপনার নিজের ইচ্ছেমতো কোনো–একটা কিছু করার স্বাধীনতা আছে। চেষ্টা করবেন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকাতে, অল্পতেই চমকে উঠবেন এবং খুব সহজে ভয় পেয়ে যাবেন। কোনো অবস্থাতেই দু'টি জিনিস করবেন না, একটি হচ্ছে কথা বলা, আরেকটি হচ্ছে কারো কথা শুনে বুঝতে পারা। একটিমাত্র জিনিস আপনি উপভোগ করতে পারেন, সেটা হচ্ছে সংগীত।

নীষা হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, আমি এখন আর কথা বলতে পারব না, এখন সবকিছু আপনার উপর নির্ভর করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ করে সবকিছু নীরব হয়ে যায়। আমি চুপচাপ শুয়ে থাকি। চোখ বন্ধ করে এক ঘন্টা শুয়ে থাকা সহজ ব্যাপার নয়, আমার মনে হল প্রায় এক যুগ থেকে শুয়ে আছি। একসময় এদিকে–সেদিকে কয়েকটা বাতি জ্বলে ওঠে। এতক্ষণ যে মৃদু গুঞ্জন হচ্ছিল সেটা থেমে যায় এবং কয়েকজন ডাক্তার নিঃশব্দে আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়। আমি চোখ খুলে তাকাতেই ডাক্তারেরা সহৃদয়ভাবে হাসার চেষ্টা করল। আমি ভয় পেয়ে যাবার একটা ভঙ্গি করলাম। নিশ্চয়ই অতি অভিনয় হয়ে গিয়েছিল, কারণ ডাক্তারেরা ছিটকে পেছনে সরে এসে খানিকক্ষণ ফিসফিস করে নিজেদের ভেতর কথা বলে বাতিগুলো নিভিয়ে একটা কোমল সংগীত বাজানোর ব্যবস্থা করে চলে গেল।

আমি একা একা আবছা অন্ধকারে শুয়ে থাকি। গোপন কোনো জায়গা থেকে আমাকে লক্ষ করা হচ্ছে কী না আমি জানি না, তাই আমি অস্বাভাবিক কিছু করার সাহস পেলাম না, এক ভঙ্গিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলাম। কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানি না, একসময় হঠাৎ নীষার গলার আওয়াজ পেলাম, কিম জুরান।

আমি ঘুরে তাকাই, নীষা কখন নিঃশব্দে আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা সাদা পোশাক, আমার হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, এটা পরে নিন।

আমি পোশাকের ভাঁজ খুলতে খুলতে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কী হবে?

আপনার দুই মিনিট সময় আছে এখান থেকে পালাবার।

দুই মিনিট? আমি থতমত খেয়ে বললাম, কীভাবে পালাব আমি? কিছুই তো চিনি না।

বলছি, মন দিয়ে শুনুন। প্রথমে সোজা হেঁটে যাবেন করিডোর ধরে, শান্তভাবে, কোনোরকম উত্তেজনা দেখাবেন না, কারো সাথে দেখা হলে কিংবা কেউ কোনো কথা বলতে চাইলে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করবেন। করিডোরের শেষ মাথায় দরজাটা খোলামাত্র জরুরি বিপদ সংকেত জানিয়ে সব ক'টা দরজা নিজে নিজে বন্ধ হয়ে যাবার কথা। আমি ব্যবস্থা করেছি যেন কয়েকটা খোলা থাকে, কোনো জটিল কিছু নয়, দরজার ফাঁকে ফাঁকে একটা করে দিয়াশলাইয়ের কাঠি রেখে এসেছি। যাই হোক, ঠিক ঠিক দরজাগুলো দিয়ে বিল্ডিংয়ের বাইরে এসে বাম দিকে দৌড়াবেন। হাঁটা নয়, দৌড়। আমি জানি আপনার যে অবস্থা তাতে দৌড়ানো খুব সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু তবু বলছি দৌড়াবেন। যদি এক সেকেণ্ড সময়ও বাঁচাতে পারেন আপনার পালানোর সম্ভাবনা দশ গুণ বেড়ে যাবে। আর সবচেয়ে যেটা ভয়ের কথা সেটা হচ্ছে, যদি দেরি হয়ে যায় তাহলে কন্ট্রোল টাওয়ারে গার্ডেরা পৌঁছে যাবে, সেখান থেকে গুলি করার চেষ্টা করতে পারে। যাই হোক, দেয়াল ঘেঁষে থাকবেন, শেষ মাথায় একটা গাড়ি থাকবে, হেড লাইট নিভিয়ে, কিন্তু দরজা খোলা রেখে, লাফিয়ে উঠে পড়বেন গাড়িতে, তাহলেই আপনার দায়িত্ব শেষ।

আমি সাদা পোশাকটার বোতাম লাগাতে লাগাতে বললাম, দরজাগুলো কোথায় বলে দাও।

শুনুন মন দিয়ে, একটা ভুল দরজা খোলার চেষ্টা করলে অন্তত দশ সেকেণ্ড সময় নষ্ট, কাজেই সাবধান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণের মাঝেই নীষা আমাকে রওনা করিয়ে দিল। পরবর্তী দুই মিনিট সময়কে আমি আমার জীবনের দীর্ঘতম সময় বলে বিবেচনা করব। কর্কশ অ্যালার্মের শব্দের মাঝে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ঠিক ঠিক দরজাগুলো খুলে খুলে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষ করে আমি যখন উত্তেজনার মাঝে কিছুতেই মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারি না। শেষ অংশটুকু, যেখানে আমার দেয়ালের পাশ দিয়ে দৌড়ে যাবার কথা, সেখানে আমি কিছুতেই দৌড়াতে পারছিলাম না। পায়ের মাংসপেশীর তখনো দৌড়ানোর মতো ক্ষমতা হয় নি। এই সময়ে বারকয়েক হাততালির মতো শব্দ শোনা গেল, পরে বুঝেছিলাম সেগুলো শক্তিশালী রাইফেলের গুলি।

দেয়ালের শেষ মাথায় সত্যি সত্যি একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, হেড লাইট নেভানো কিন্তু দরজা খোলা, ইঞ্জিন ধকধক করে শব্দ করছে। আমি লাফিয়ে ওঠামাত্র দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং মুহূর্তে সেটি ঘুরে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যেতে শুরু করে।

ড্রাইভার-সীটে যে বসে আছে তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কমবয়স্ক একজন তরুণ, স্টিয়ারিংয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, আপনার নূতন জীবন শুরু হল কিম জুরান।

লুকাস!

লুকাস হাসিমুখে আমার দিকে ঘুরে বলল, বাম হাতে গুলি লেগেছে, শক্ত করে চেপে ধরে রাখুন।

গুলি? কার? বলে আমি তাকিয়ে দেখি সত্যি আমার বাম হাত চুইয়ে রক্ত পড়ছে, তাড়াতাড়ি ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে ভয়ার্ত গলায় বললাম, সর্বনাশ! কখন গুলি লাগল?

মাঝামাঝি যখন ছিলেন। কিছু হয় নি, ভয় পাবেন না। উত্তেজনার মাঝে টের পান নি, চামড়া ছড়ে গেছে একটু, আমি দেখেছি। লুকাস আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, আপনার কোনো ভয় নেই। যে-মানুষ রুকুন গ্রহপুঞ্জে গিয়ে ঠিক ঠিক ফিরে আসতে পারে, তাকে স্বয়ং বিধাতা নিজের হাতে রক্ষা করবে।

বাঁচিয়েছিলে তো তুমি! আমি একটা রুমাল দিয়ে হাত বাঁধতে বাঁধতে বললাম, ধন্যবাদ দেবার সুযোগ হয় নি।

আমি বাঁচিয়েছিলাম! কী আশ্চর্য!

কেন? এতে আশ্চর্যের কী আছে!

আমি জানি না, তাই অবাক লাগছে!

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি জান না মানে?

আমার স্মৃতির একটা অংশ পাঠানো হয়েছিল, সে কখনো ফিরে আসে নি।

ফিরে আসে নি?

না, মহাকাশযানের মূল কম্পিউটারকে ধ্বংস করার সময় নিজেও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আপনাকে একদিন বলতে হবে কী হয়েছিল।

আমি কী-একটা বলতে যাচ্ছিলাম, লুকাস হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে, একটা চৌকা মতন বাক্সে নিচু স্বরে কার সাথে জানি কী-একটা কথা বলে, তারপর একটা সুইচ টিপে দিতেই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ পেলাম। খুব কাছেই আগুনের একটা গোলা সশব্দে উপরে উঠে ফেটে যায়, তার মাঝে দিয়ে

লুকাস গাড়িটাকে বের করে এনে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ, কী জানি বলছিলেন?

আমি শুকনো গলায় বললাম, কিসের বিস্ফোরণ ওটা?

একটা গাড়ি ধ্বংস হয়ে গেল।

কার গাড়ি?

লুকাস মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, এখন বলব না, কাল ভোরে খবরের কাগজে দেখবেন।

আমি কিছু না বুঝে খানিকক্ষণ লুকাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। লুকাস সহজ স্বরে বলল, বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা আছেন তো?

আছি।

বেশ! একটু সতর্ক থাকবেন—কথা বলতে বলতে লুকাস হঠাৎ মাঝপথে গাড়িটা ঘুরিয়ে নেয়, আমি প্রায় ছিটকে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তার মাঝে হঠাৎ দেখি গাড়িটা মাথা উপরে তুলে মাটি থেকে দশ-বার ফুট উপর দিয়ে উড়তে শুরু করেছে।

বাই ভার্বাল! আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, বাই ভার্বাল গাড়ি বেআইনি না?

আমরা নিজেরাই তো বেআইনি, লুকাস গাড়িটাকে উড়িয়ে নিতে নিতে বলল, আমাদের গাড়ি বেআইনি না হলে কি মানায়?

আমি নিচে তাকিয়ে দেখি গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে মাঠ-ঘাট-বন-বাদাড় পার হয়ে কিছুক্ষণের মাঝেই আবার লোকালয়ে ফিরে আসে। নির্জন একটা রাস্তাতে গাড়িটা আবার নিচে নামিয়ে লুকাস যেন একজন ভদ্রলোকের মতো গাড়ি চালিয়ে একটা পুরান বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে লুকাস বলল, আপনি একটু দাঁড়ান, অনেক কিছু ঘটেছে আজ, গাড়ির লগটা দেখে আসি, সবকিছু ঠিকঠিক করে হয়েছে কী না। পেছনে পুলিস লেগে থাকলে বিপদ হতে পারে। গাড়ির কম্পিউটারে কী-একটা দেখে সে ভারি খুশি হয়ে উঠে বলল, চমৎকার! একেবারে পেশাদারের কাজ!

বিল্ডিংটা বাইরে থেকে পুরান মনে হলেও ভেতরে একেবারে অন্যরকম। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই আমাদের দিকে একজন এগিয়ে আসে। দেখেই বোঝা যায় সে একজন রবোট্রন। শুধু যে কপালের উপর কয়েকটা স্ক্রু রয়েছে তাই নয়, কানের নিচে থেকে কয়েকটা তারও বের হয়ে আছে। লুকাসকে মানুষের মতো দেখানোর জন্যে যেটুকু পরিশ্রম করা হয়েছে, এর জন্যে তা করা হয় নি। লুকাস এই রবোটটির দিকে তাকিয়ে কী-একটা বলল, শুনে রবোটটি মাথা নেড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে।

লুকাস আমাকে বলল, আপনি ভিকির সাথে যান। ও আপনার দেখাশোনা করবে।

তুমি?

আমি একটু কন্ট্রোল-রুমে যাই। নীষার কোনো সাহায্য লাগবে কি না দেখি।

নীষা? ওর কি কোনো বিপদ হতে পারে?

হতে তো পারেই, যেসব কাজকর্ম করে, বিপদ হওয়া আর বিচিত্র কি! কিন্তু হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়ালাম, নীষা কি রবোট্রন?

লুকাস আমার চোখের দিকে তাকাল, আমি মহাকাশযানে ওকে এই প্রশ্নটি করেছিলাম, ও জানে না। ওর দৃষ্টির সামনে আমি কেন জানি লজ্জা পেয়ে যাই। লুকাস সেটা গ্রাহ্য না করে বলল, নীষা রবোট্রন হলে আপনার মন-খারাপ হয়ে যাবে?

মন-খারাপ হবে কেন?

হবে হবে, আমি জানি হবে। লুকাস চোখ নাচিয়ে বলল, আমি বলব না, দেখি আপনি বের করতে পারেন কিনা।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেললাম, আগেও সে একই উত্তর দিয়েছিল।

ভিকি নামের রবোটটি আমাকে পেছন থেকে ঠেলে দিয়ে কাঠ কাঠ স্বরে বলল, চলুন, আপনার রক্তপাত বন্ধ করা দরকার।

লুকাস ভিকিকে একটা ধমক দিয়ে বলল, তোমাকে কতবার বলেছি কনুইয়ের কাছে শর্ট সার্কিটটা সেরে ফেল, যখনই দেয়ালের কাছে আসছ কেমন স্পার্ক বের হচ্ছে দেখেছ?

ভিকি সরল মুখে বলল, কী আছে, মাত্র তো আঠার হাজার ভোল্ট!

আঠার হাজার ভোল্ট তোমার কাছে মাত্র হতে পারে, কিন্তু কিম জুরানের জন্যে মাত্র নয়। ইনি একজন মানুষ, তোমার মতন রবোট নয়। তোমার থেকে একটা স্পার্ক খেলে কিম জুরানকে আর দেখতে হবে না!

ও, আচ্ছা। ভিকিকে খুব বেশি বিচলিত মনে হল না, আমাকে আবার পেছন থেকে ঠেলে দিয়ে বলল, চলুন, আপনার রক্তপাত বন্ধ করা দরকার।

আমি তার সাথে পাশের একটা ঘরে হাজির হলাম। সাদা একটা বিছানায় আমাকে শুইয়ে দিয়ে সে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে। তার বিপজ্জনক কনুই থেকে যতদূর সম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে আমি আলাপ জমানোর চেষ্টা করি, অনেকদিন থেকে আছ বুঝি?

তা বলতে পারেন, আপনাদের হিসেবে তো অনেক দিনই।

কত দিন?

এক শ' তিরিশ বছর। কপোট্রনের এনালাইজিং ইউনিটটা অবশ্যি নতুন, গত বছর ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু পুরান জিনিস গছিয়ে দিয়েছে!

কানের কাছে ঐ তারগুলো কিসের?

ভিকি বিরক্ত হয়ে বলল, আর বলবেন না, লুকাসের কাণ্ড! মাঝে মাঝে দাবা খেলার জন্য আমার ভেতরে গ্রান্ড মাস্টারের মেমোরি লোড করে। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে করতে নাকি দেরি হয়, তাই এই তারগুলো বের করে রেখেছে, সোজা প্লাগ ইন করে দেয়।

ও, আচ্ছা। আমি একটু সমবেদনা প্রকাশ না করে পারলাম না, একটু ঢেকেঢুকে রাখলেই পার।

আর ঢেকেঢুকে কী হবে? কতদিন থেকে বলছি আমার বাইরের চেহারাটা ঠিক করে দাও, দিচ্ছি দিচ্ছি করে কত দেরি করল দেখেছেন? লুকাসের মতো আলসে মানুষ আছে নাকি?

ব্যস্ত মানুষ, আমি লুকাসের পক্ষ টেনে কথা বলার চেষ্টা করি, কত কিছু করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়।

ভিকি বাম হাতটা যত্ন করে ব্যান্ডেজ করে দিতে দিতে বলল, আপনাকে বেশ শ্রদ্ধা–ভক্তি করে বলে মনে হল, বলে দেখবেন তো আমার চেহারাটা ঠিক করে দিতে।

বলব।

হ্যাঁ, বলবেন। কতদিন ঘরের বাইরে যেতে পারি না এই চেহারার জন্যে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ভিকি বলল, লুকাস ছেলেটা আসলে খারাপ নয়, তবে ভারি ফাঁকিবাজ।

আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি নীষাকে চেন?

হ্যাঁ, চিনি।

ও কি মানুষ, নাকি রবোট্রন?

ভিকির চেহারাতে অনুভূতির কোনো ছাপ পড়ে না, তাই ঠিক বুঝতে পারলাম না ও কী ভাবছে। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, জানি না। দেখে মনে হয় মানুষ। কিন্তু নূতন রবোট্রনগুলোর সাথে মানুষের কোনো পার্থক্য বোঝা যায় না। নীষা কথাও বলে চমৎকার, রবোট্রনের মতো, মানুষের ন্যাকামোর কোনো চিহ্ন নেই। আপনি কিছু মনে করলেন না তো?

আমি কথাটা হজম করে বললাম, মানুষ হলেই ন্যাকামো করে?

করবে না? ওদের মস্তিষ্কেই কিছু–একটা গণ্ডগোল আছে।

আমিও করেছি?

করলেন না? জিজ্ঞেস করলেন নীষা মানুষ, না রবোট্রন। এটা ন্যাকামো হল না? একজন রবোট কখনো এসব প্রশ্ন করবে না। ভিকি খানিকক্ষণ চিন্তা করে মাথা নেড়ে বলল, আমার কী মনে হয় জানেন?

কী?

নীষার জন্যে আপনার প্রেম হচ্ছে।

আমার কানের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। একটু কেশে বললাম, তোমার তাই মনে হয়?

হুঁ। আমি অবশ্যি এসব বুঝি না, আমাদের সময় ওসব ছিল না। আজকাল নাকি রবোটে প্রেম–ভালবাসা এসব দেয়া হচ্ছে। শুধু শুধু সময় নষ্ট।

ভিকির মুখে অনুভূতির ছাপ পড়ে না, তা না হলে এখন নিশ্চয়ই তার ভুরু বিরক্তিতে কুঁচকে উঠত।

আপনি এখন ঘুমান, আপনার বিশ্রাম দরকার।

ভিকি আমার চারপাশে কম্বল গুঁজে দিয়ে, বাতি নিভিয়ে বলল, কিছু দরকার হলে বলবেন, আমি আশেপাশেই আছি।

আমি সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লাম, গভীর নিরুদ্বেগ ঘুম, বহুকাল এভাবে ঘুমাই নি। মাঝে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, খানিকক্ষণ সময় লাগল বোঝার জন্যে কোথায় আছি। যখন মনে পড়ল আর আমার মৃত্যুদণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না, গভীর শান্তিতে আমি পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. মতবিরোধ

সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। আমি তবু বেশ অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম, বহুকাল এভাবে শুয়ে থাকি নি। একসময় লোকজনের গলার আওয়াজ আসতে থাকে, একজন মেয়ের গলাও পেলাম, নিশ্চয়ই নীষা এসেছে। আমি তখন আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়লাম।

পাশে একটা ছোট বাথরুম, আমার কাপড়জামা সেখানে পাট করে সাজানো। আমি নিজেকে পরিষ্কার করে, ধোয়া কাপড় পরে বেরিয়ে আসি। গলার শব্দ অনুসরণ করে খানিকদূর যেতেই একটা বড় ঘরে এসে হাজির হলাম, ঘরটিতে যে-পরিমাণ যন্ত্রপাতি, আমার মনে হয় না পৃথিবীর আর কোথাও এত অল্প জায়গায় এত যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে। ঘরের এক কোনায় একটা ছোট টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার, তার দু'টিতে নীষা আর লুকাস বসে কথা বলছে, আমাকে দেখে দু' জনেই ঘুরে তাকায়। লুকাস হাত নেড়ে বলল, আসুন কিম জুরান, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

হ্যাঁ, অনেকদিন পর ভালো ঘুম হল। আমি চারদিকে অসংখ্য ইলেকট্রনিক মডিউল দেখতে দেখতে বললাম, এ-কি সর্বনাশা যন্ত্রপাতি, কী এটা?

জানবেন, সময় হলেই জানবেন।

গোপন কিছু নাকি?

আমরা যেহেতু বেআইনি মানুষ, আমাদের সবকিছুই গোপন। আপনার কাছে অবশ্যি গোপন করার কিছুই নেই।

নীষা জিজ্ঞেস করল, সকালে কিছু খেয়েছেন?

না, খাইনি। ভোরে অবশ্যি এমনিতেই আমার কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।

লুকাস মাথা নেড়ে বলল, রবোট হলে এই হচ্ছে মুশকিল, নিজের খেতে হয় না বলে মনেই থাকে না যে অন্যদের খাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। দাঁড়ান, আপনার খাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। লুকাস উচ্চস্বরে ডাকে, ভিকি, ভিকি—

ভিকি ঘরে এসে আমাকে খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বলল, রক্তপাত বন্ধ হয়েছে?

হ্যাঁ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

লুকাস বলল, ভিকি খাবারের ব্যবস্থা কর।

খাবার? ভিকি বিচলিত হয়ে বলল, খাবার কী জিনিস?

লুকাস ধৈর্য না হারিয়ে বলল, মানুষ যেসব জিনিস খায়, যেগুলো না খেলে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। আছে সেসব?

ও, সেইসব? অবশ্যি আছে। কী আনব?

নীষা জানতে চায়, কী কী আছে?

লাল বাক্স, সবুজ বাক্স আর নীল বাক্স। ছোট, বড় আর মাঝারি। ভেতরে আছে ট্যাবলেট, ক্যাপসুল আর তরল। ট্যাবলেট—

নীষা বাধা দিয়ে বলল, থাক আর বলতে হবে না।

কোনটা আনব?

AMARBOI.COM

তোমার আনতে হবে না, আমরা নিজেরা ব্যবস্থা করে নেব। কিম জুরান, চলুন রান্নাঘরে বসে কথা বলা যাবে, লুকাস, তুমিও আস।

হ্যাঁ, চল।

রান্নাঘরে টেবিলে নাস্তা করতে করতে কথা হচ্ছিল। লুকাস অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টেবিলে আঙুল দিয়ে শব্দ করছিল, আমি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব?

করুন।

আমাকে বাঁচানোর জন্যে তোমরা এত কষ্ট করলে কেন?

কৃতজ্ঞতা বলতে পারেন।

কৃতজ্ঞতা?

আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, আমি তাই যেটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি আপনার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।

আমি লুকাসের চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, মানুষ বহুকাল থেকে মিথ্যে কথা বলে আসছে, তাই তারা যখন মিথ্যে বলে, ধরা খুব কঠিন। কিন্তু রবোটেরা মিথ্যে কথা বলা শুরু করেছে মাত্র অল্প কিছুদিন হল, তারা যখন মিথ্যে কথা বলে, ধরা খুব সহজ।

লুকাস সরু চোখে বলল, কেন, আমি কি মিথ্যে কথা বলেছি?

আমি তোমাকে আরো একবার এই প্রশ্ন করেছিলাম, মহাকাশযানে রুকুন গ্রহপুঞ্জে যাবার সময়, তখন তুমি অন্য উত্তর দিয়েছিলে।

আমি কী বলেছিলাম?

বলেছিলে তুমি আমাকে বাঁচাতে এসেছ, নীষার অনুরোধে। আমার জন্যে নীষার মায়া হয়েছিল—

লুকাস বাধা দিয়ে বলল, সেটা সত্যি। নীষা আমাকে অনুরোধ করেছিল; আমার নিজেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার একটা সুযোগ হল।

আমি মাথা নাড়লাম, না, কোথায় জানি হিসেব মিলছে না। এত কষ্ট করে আমাকে বাঁচালে, এত বড় বড় ঝুঁকি নিলে দু' জনে, শুধু মায়া আর কৃতজ্ঞতাবোধে হয় না,—

লুকাস বাধা দিয়ে কী-একটা বলতে যাচ্ছিল, নীষা হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলল, লুকাস, সত্যি কথাটা বলে দাও।

লুকাস চমকে নীষার দিকে তাকায়, খানিকক্ষণ কোনো কথা নেই, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, আমি দুঃখিত কিম জুরান, আপনার কাছে সত্যি কথাটি গোপন করার জন্যে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনাকে কী জন্যে আমরা এত কষ্ট করে বাঁচিয়ে রেখেছি।

হ্যাঁ। আমি মাথা নাড়লাম, যে-কারণটির জন্যে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল ঠিক সেই কারণে আমি তোমাদের কাছে মূল্যবান। ঠিক?

ঠিক।

তোমরা জানতে চাও আমি কীভাবে ক্রুগো কম্পিউটারের গোপন সংকেত বের করে তার ভেতর থেকে খবর বের করার চেষ্টা করেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ।

সেটি গোপন করছিলে কেন?

লুকাস কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে। নীষা আস্তে আস্তে বলল, কারণটা খুব সহজ, রবোটেরা সব সময়ে এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগে। তাই তারা কখনোই ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না যে একজন মানুষ তাদের কোনো ধরনের অভ্যুত্থানে সাহায্য করবে।

আমি নীষার দিকে তাকিয়ে বললাম, নীষা, পৃথিবীর কিছু মানুষ হয়তো আমার উপর অবিচার করেছে, কিন্তু সে জন্যে আমি সব মানুষের বিরুদ্ধে গিয়ে রবোটের অভ্যুত্থানে সাহায্য করতে পারি না।

রবোটের অভ্যুত্থান হলেই সেটা মানুষের বিরুদ্ধে হবে কেন ধরে নিচ্ছেন?

তাহলে কার বিরুদ্ধে হবে?

রবোটের অভ্যুত্থান হবে অন্য রবোটের বিরুদ্ধে, ক্রুগো কম্পিউটারের বিরুদ্ধে।

আমি একটু উষ্ণ হয়ে বললাম, ক্রুগো কম্পিউটারের উপর আমার নিজের যত ব্যক্তিগত আক্রোশই থাকুক না কেন, তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না সেটা তৈরি করেছে মানুষ, মানুষকে সাহায্য করার জন্যে। আমি কখনোই কিছু রবোটকে সেটা ধ্বংস করতে দেব না।

নীষা একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, আপনি সবকিছু জানেন না কিম জুরান। যদি জানতেন—

আমি মাথা নেড়ে বললাম, পৃথিবীর কেউ সবকিছু জানে না নীষা, বেঁচে থাকতে হলে সবকিছু জানতে হয় না। যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু জানলেই হয়। রবোটের প্রয়োজন আর মানুষের প্রয়োজন এক নয়, তাই রবোটের যেটা জানতে হয়, মানুষের সেটা জানার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

নীষা একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, আমি কী বলতে চাইছি, আপনি একবার শুনবেন না?

না। আমি কঠোর গলায় বললাম, না। তোমরা আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করাতে পারবে না। আমি কঠোর স্বরে বললাম, তোমরা কীভাবে আশা করতে পার যে আমি তোমাদের বিশ্বাস করব? ঐ ঘরের বড় যন্ত্রপাতি কি আমার মস্তিষ্ক স্ক্যানিং করার জন্যে তৈরি হয় নি?

নীষা আর লুকাস দু' জনেই চমকে ওঠে। নীষা কাতর গলায় বলল, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, তার প্রয়োজন হবে না, আমার সব কথা শুনলে আপনি নিজেই সাহায্য করবেন। আপনি বিশ্বাস করুন—

আমি মুখ শক্ত করে বললাম, আমি রবোটকে বিশ্বাস করি না।

নীষা আহত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

লুকাস এতক্ষণ একটি কথাও না বলে চুপ করে ছিল। এবারে আস্তে আস্তে বলল, আমার খুব আশাভঙ্গ হল কিম জুরান। আমার আশা ছিল আপনি হয়তো সব শুনে আমাদের সাহায্য করবেন। কিন্তু আপনি করলেন না। এখন আপনার মস্তিষ্ক স্ক্যানিং করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না।

আমার মুখে একটা আশ্চর্য হাসি ফুটে ওঠে। লুকাস সেটা লক্ষ না করার ভঙ্গি

AMARBOI.COM

করে বলল, কিন্তু আমরা আপনার মস্তিষ্ক স্ক্যানিং করব না। একজন মানুষের উপর এত অবিচার করা যায় না।

তাহলে কী করবে?

এখনো ঠিক করি নি। আমাদের নিজেদের ক্রুগো কম্পিউটারের সংকেত বের করতে হবে, সে জন্যে সময় লাগবে।

আমাকে কী করা হবে?

আপনাকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হবে।

কিন্তু আমাকে কি এখন খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে না? আমি মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামী, সবার নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে গেছি, আমার কি স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার উপায় আছে?

লুকাস পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ বের করে বলল, আপনাকে আর কখনো কেউ খোঁজ করবে না। এই দেখেন।

আমি কাগজের উপরে ঝুঁকে পড়ি। মাঝের পাতায় আমার ছবি ছাপা হয়েছে। নিচে লেখা, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর শোচনীয় মৃত্যু। খবরে লেখা যে, মস্তিষ্ক স্ক্যানিং করার পর আমি নিজের মস্তিষ্কের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে হাসপাতাল থেকে পালানোর চেষ্টা করার পর গুলিবিদ্ধ হই। সেই অবস্থায় একটা গাড়ি থামিয়ে সেখানে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে গাড়িকে দুর্ঘটনার মুখে ফেলে দিই। ফলে গাড়ির চালক আর আমি দু' জনেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছি। গাড়ির চালককে শনাক্ত করা যায় নি, কিন্তু আমার চুল এবং পোশাকের কিছু অংশ থেকে নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করা গেছে।

খবরটি পড়ে আমি অবাক হয়ে লুকাসের মুখের দিকে তাকালাম, এটা কীভাবে সম্ভব?

লুকাস কাগজটি ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, সবই সম্ভব, ঠিক করে পরিকল্পনা করতে হয়। আমাদের একটা গাড়ি নষ্ট হয়েছে, কিন্তু গাড়ির অভাব কী? তাই বলছিলাম আপনাকে আর কেউ খোঁজ করবে না, আপনি এখন নূতন জীবন শুরু করতে পারবেন।

আমি খবরের কাগজটি দেখিয়ে বললাম, আমি পুড়ে মারা গেছি, এখন যখন দেখবে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছি—

লুকাস মাথা নেড়ে বলল, দেখবে না। আপনাকে নূতন একটা পরিচয় দেয়া হবে। চোখের আইরিশ পাল্টে আপনার পরিচয় পাল্টে দেয়া হবে।

কিন্তু চোহারা? এই চেহারা?

খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ছাড়া আর কেউ তো চেহারা দিয়ে পরিচয় রাখে না। আপাতত আপনি আপনার ঘনিষ্ঠ কারো কাছে যাচ্ছেন না। মানুষের চেহারা খুব সহজে পাল্টে দেয়া যায়, তাই তার সত্যিকার পরিচয় চোখের আইরিশে, চেহারায় নয়। কাজেই আপনাকে কেউ কোনোদিন শনাক্ত করতে পারবে না, আপনি নিশ্চিত থাকেন।

লুকাস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, অবশ্যি আপনি নিজে যদি কর্মকর্তাদের কাছে গিয়ে সবকিছু স্বীকার করেন সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু আমি আশা করছি আপনি সেটা করবেন না, আপনার যদিও ক্রুগো কম্পিউটারের জন্যে খানিকটা মমতা আছে,

আপনার জন্যে তার বিন্দুমাত্র মমতা নেই।

আমি লুকাসের খোঁচাটা হজম করে চুপ করে থাকি। লুকাস আবার বলে, কর্মকর্তাদের কাছে গিয়ে আপনার পরিচয় দেয়ার আমি কোনো কারণ দেখছি না। নৈতিক কর্তব্য বিবেচনা করে আপনি যদি আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা বলে দিতে চান, বলতে পারেন। ক্রুগো কম্পিউটারের কাছে সেটা নূতন খবর নয়, সে অনেকদিন থেকে আমাকে খুঁজে যাচ্ছে। গত রাতে আপনার মস্তিষ্ক স্ক্যানিং বন্ধ করিয়ে পালানোর ব্যবস্থা করার পর নীষার পক্ষে তার পুরান কাজে ফিরে যাওয়া বিপজ্জনক; সে আর সেখানে যাবে না। আপনি তাই তাকেও ধরিয়ে দিতে পারবেন না। আমি আশা করছি আপনার নিজের প্রাণের মায়ায় আপনি এ–ধরনের চেষ্টা করবেন না।

লুকাস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার জন্যে আমরা শহরতলিতে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করেছি। আজ বিকেলেই আপনি সেখানে উঠে যাবেন, এখানে থাকাটা আপনার জন্যে বিপজ্জনক। এরপর আপনি আর আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না। আমরা অবশ্যি আপনার সাথে যোগাযোগ রাখব। আমি আশা করছি কোনোদিন আপনি ক্রুগো কম্পিউটারের সত্যিকার পরিচয় জানবেন, তখন আপনি আমাদের সাহায্য করতে রাজি হবেন।

লুকাস মাথা নেড়ে আমাকে অভিবাদন করে বের হয়ে গেল। আমি আর নীষা চুপচাপ বসে রইলাম, কোথায় জানি সুর কেটে গেছে, আর সহজ স্বাভাবিক কথা বলা যাচ্ছে না। আমি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললাম, তোমরা আমাকে বাঁচানোর জন্যে যা করেছ আমি তার জন্যে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে জন্যে আমি তো মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না।

নীষা কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকে।

তুমি ক্রুগো কম্পিউটার নিয়ে কিছু–একটা কথা বলতে চাইছিলে, আমি শুনতে রাজি হই নি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন? কারণ তোমরা যাই বল, আমার পক্ষে সেটা বিশ্বাস করা সম্ভব না। আমি মানুষ, এ ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য জিনিস আমি শুধু মানুষের মুখ থেকে শুনতে পারি।

নীষা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল, তার মুখে হঠাৎ একটা আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠেছে, আস্তে আস্তে বলল, আমি যদি বলি আমি রবোট্রন নই, আমি মানুষ?

কিন্তু তুমি জান সেটা প্রমাণ করা কত কঠিন।

নীষা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, জানি।

তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, নীষা।

না, ভুল বুঝব না। সে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যায়।

এই সময়ে ভিকি এসে হাজির হল, কিম জুরান।

বল।

লুকাস বলেছে আপনার আইরিশ পাল্টে দিতে। আপনি আসুন আমার সাথে।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, ব্যথা করবে না তো?

ব্যথা? সেটা কী?

আমি হাল ছেড়ে দিলাম।

WWW.AMARBOI.COM

গাড়ি চালাচ্ছে নীষা, আমি পাশে চুপচাপ বসে আছি। দু' জন কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকা খুব কষ্টকর। কিন্তু কোথায় যেন সুর কেটে গেছে, চেষ্টা করেও আর কথা বলতে পারছি না। দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকার পর নীষা বলল, আপনার চোখে এখনো ব্যথা আছে?

না, নেই। আমি জানতাম না ব্যাপারটা কষ্টকর।

ইচ্ছে করলে চোখ অবশ করে নেয়া যায়, সাধারণত করা হয় না।

ও।

দেখতে অসুবিধে হচ্ছে কি?

না। হঠাৎ করে আলো এসে পড়লে একটু অস্বস্তি হয়।

ঠিক হয়ে যাবে। নীষা আবার দীর্ঘ সময়ের জন্যে চুপ করে যায়।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর আগে নীষা আবার কথা বলে, আপনার মস্তিষ্ক স্ক্যানিং-এর ডিস্কটা দেখছিলাম, আপনার মা খুব সুন্দরী মহিলা।

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, কিসের ডিস্ক?

আপনার মস্তিষ্ক স্ক্যানিং করার সময় আপনার স্মৃতি একটা ম্যাগনেটিক ডিস্কে জমা রাখা হয়েছিল। সেটাকে বিশেষ পদ্ধতিতে দেখা যায়। আমি খানিকটা দেখেছি, একটা দৃশ্যে ছিল আপনাকে আপনার মা ঘুম পাড়ানোর জন্যে গান গাইছেন, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। খুব মধুর একটা দৃশ্য। আপনার মা খুব সুন্দরী মহিলা।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আমার মা খুব শৈশবে মারা গেছেন, তাকে নিয়ে নিশ্চয়ই আমার স্মৃতি খুব বেশি ছিল না। যেটুকু ছিল; স্ক্যানিং করে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এখন আমার আর মায়ের কথা মনে নেই।

নীষা আস্তে আস্তে বলল, আমি খুব দুঃখিত কিম জুরান। অনেক চেষ্টা করেও আমি আপনার শৈশবের স্মৃতিটুকু রক্ষা করতে পারি নি।

তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই।

নীষা অন্যমনস্ক স্বরে বলল, একজনের জীবনের সবচেয়ে মুধুর স্মৃতি তার শৈশবের, সেটা যদি হারিয়ে যায় তাহলে থাকল কী?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। নীষা তাহলে সত্যিই মানুষ। রবোটনের কোনো শৈশব নেই, কোনো বার্ধক্য নেই। শুধু মানুষের শৈশব আছে, শুধু মানুষ জানে শৈশবের স্মৃতি খুব মধুর স্মৃতি। নীষা রবোটন হলে কখনো জানত না শৈশবের স্মৃতি হারিয়ে গেলে সেটা খুব কষ্টের একটা ব্যাপার।

আমি কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক এই সময় গাড়ির ভেতরে বিপ্‌বিপ্ করে একটা শব্দ হল। নীষা সুইচ টিপে কী-একটা চালু করে দিতেই লুকাসের গলা শুনতে পেলাম। লুকাস বলল, নীষা, একটা ঝামেলা হয়েছে।

কি ঝামেলা? কত বড় ঝামেলা?

অনেক বড়। চার মাত্রার।

নীষা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল, চার মাত্রা?

হ্যাঁ, সাবধান। তুমি সাত নম্বরে যোগাযোগ কর। নয় নম্বরে এসো না।

আচ্ছা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর শোন, আট নম্বর শেষ।

নীষার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায়, শেষ?

হ্যাঁ।

সবাই?

হ্যাঁ। রাখলাম নীষা।

নীষা পাথরের মতো মুখ করে সুইচ টিপে ফোনটা বন্ধ করে দিল। আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছে নীষা?

নীষা কষ্ট করে একটু হাসে, আমরা ধরা পড়ে গেছি কিম জুরান। আমাদের এখন অনেক বড় বিপদ।

আমার ইচ্ছে হল নীষার মাথায় হাত বুলিয়ে বলি, তোমার কোনো ভয় নেই নীষা, আমি তোমাকে রক্ষা করব। আমি জানি তুমি আমার মতো মানুষ, আমার মতো তোমার দুঃখ-কষ্ট আছে, ভয়-ভীতি আছে, আমি তোমাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করব—কিন্তু আমি কিছু বলতে পারলাম না।

গাড়িটি একটা বড় বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। নীষা আমার হাতে একটা চাবি দিয়ে বলল, আপনার অ্যাপার্টমেন্ট তেত্রিশ তলায়, রুম নাম্বার সাত শ' এগার। আমি ভেবেছিলাম আপনাকে পৌঁছে দেব, প্রথম দিন একা একা অচেনা জায়গায় যেতে খুব খারাপ লাগে। কিন্তু এখন আর পারব না। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।

আমি গাড়ি থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তোমাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?

আমাকে?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, তোমাদেরকে?

নীষা ম্লান মুখে বলল, আমি ঠিক জানি না আপনি কোন ধরনের সাহায্যের কথা বলছেন, কিন্তু সম্ভবত আপনার সাহায্য করার সময় পার হয়ে গেছে।

তবু যদি আমার কিছু করার থাকে, আমাকে জানিও।

জানাব।

আমার দিকে হাত নেড়ে নীষা গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়, তারপর চোখের পলকে সামনের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকি, অকারণে আমার মন-খারাপ হয়ে যায়।

৯. রাতের অতিথি

বিল্ডিংয়ের দরজায় একটা বুড়ো মতন মানুষ পা ছড়িয়ে বসে আছে, তার দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় সে নেশাসক্ত। ঢুলুঢুলু চোখে সে আমাকে চলে যেতে দেখল, আমি লিফটের সামনে গিয়ে ঘুরে তাকিয়ে দেখি সে তখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। লিফটের সুইচে হাত দিতেই সে আমাকে হাত নেড়ে ডাকল, এই যে ভদ্রলোক, এই যে—

আমি তার দিকে এগিয়ে এলাম, কি হয়েছে?

AMARBOI.COM

তুমি আজকের খবরের কাগজ দেখেছ?

আমার বুক ধক করে ওঠে, কী বলতে চায় এই বুড়ো? মুখের চেহারা স্বাভাবিক রেখে বললাম, কেন, কী আছে খবরের কাগজে?

বুড়োটি গলা নামিয়ে বলল, তোমার ছবি ছাপা হয়েছে। তুমি নাকি পালাতে গিয়ে পুড়ে মারা গেছ! হলুদ দাঁত বের করে সে খিকখিক করে হাসে, ভালো ঘোল খাইয়েছ তুমি ব্যাটাদের! হা হা হা।

আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখলাম, কী সর্বনাশা ব্যাপার।

বুড়োটি ষড়যন্ত্রীদের মতো গলা নামিয়ে বলল, কাদের সাথে কাজ কর তুমি? কোকেনের দল? নাকি ভিচুরিয়াসের? আছে নাকি তোমার সাথে? দেবে একটু আমাকে?

আমি কী করব বুঝতে না পেরে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই বুড়োটি খপ করে আমার হাত ধরে ফেলল, বলল, তুমি নিশ্চয়ই রবোটের দলের সাথে আছ, দেখে তো সেরকমই মনে হয়। তুমি নিজে রবোট না তো আবার, খুব ভয় আমার রবোটকে।

আমি বুড়োর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, ঝামেলা করো না বুড়ো, আমাকে যেতে হবে।

কত দেবে আমাকে বল, নাহয় পুলিসকে খবর দিয়ে দেব, হা হা হা। ময়লা দাঁত বের করে বুড়োটি আবার হাসা শুরু করে।

পুলিসকে এখনো খবর দাও নি তুমি?

না।

আমি পকেট থেকে একটা ছোট মুদ্রা বের করে বুড়োটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলি, ঐ যে টেলিফোন আছে, যাও, পুলিসকে ফোন করে দাও।

বুড়োটি মুদ্রাটা ভালো করে দেখে বলল, মোটে একটা দিলে? আরেকটা দাও।

ফোন করতে একটাই লাগে।

আহা–হা–হা, রাগ করছ কেন? আমি পুলিসকে কি সত্যি বলে দেব নাকি? তোমরা রবোটের দলের সাথে কাজ করে ক্রুগো কম্পিউটারের বারটা বাজাবে, আর আমি পুলিসকে বলে দেব? আমি কি এত নিমকহারাম? ক্রুগো কম্পিউটার কী করেছে জান?

কী করেছে?

আমার চেক আটকে দিয়েছে। আমি নাকি কোনো কাজ করি না, তাই আর নাকি চেক পাঠাবে না। শালা, আমি কি তোর বাপের গোলাম নাকি?

বুড়োটি খানিকক্ষণ কুৎসিত ভাষায় ক্রুগো কম্পিউটারকে গালি দিয়ে আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়, বিড়বিড় করে বলে, নাকি তুমি কোকেনের দলে আছ? দাও না একটু কোকেন।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে যাই, বুড়ো পেছন থেকে ডাকে, কয় তলায় থাক তুমি? তোমার রুম নাম্বার কত?

তেত্রিশ তলায়, সাত শ' বার নাম্বার রুম।

সাত শ' বার! মিখাইলের রুম, ভালো ছিল ছেলেটা, পয়সাকড়ি দিত আমাকে, খামোকা আর্মিতে নাম লেখাল, কোনদিন গুলি খেয়ে মরবে!

AMARBOI.COM

বুড়ো আপনমনে বিড়বিড় করতে থাকে, আমি লিফটে করে নিজের রুমের দিকে যাই। এই নেশাসক্ত বুড়ো যদি আমাকে চিনে ফেলতে পারে, তাহলে আর কতজন আমাকে চিনবে কে জানে! আমার মনের ভেতর একটা চাপা অশান্তি এসে ভর করে।

নূতন জায়গায় ঘুমাতে দেরি হয়, আজও তাই হল। তবে অ্যাপার্টমেন্টটা খারাপ নয়, একপাশ দিয়ে দূরে বিস্তীর্ণ শহর দেখা যায়। জানালা খুলে দিলে চমৎকার বাতাস এসে শরীর জুড়িয়ে দেয়। জানালা খোলা রেখে শহরের শব্দ শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল দরজার শব্দে, কেউ–একজন দরজা ধাক্কা দিচ্ছে।

আমি চমকে উঠে বসি, কে হতে পারে? আমি এখানে আছি খুব বেশি মানুষের জানার কথা নয়। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি কয়েকজন মানুষ, লম্বা কালো পোশাকে সারা শরীর ঢাকা।

পুলিস! আমি চমকে উঠে ভাবলাম, বুড়ো তাহলে সত্যি পুলিসকে খবর দিয়েছে! আবার দরজায় শব্দ হল, আমি তখন আবার দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালাম। লোকগুলোকে দেখতে কিন্তু পুলিসের মতো মনে হল না, পুলিসের চেহারায় যে অহঙ্কারী আত্মবিশ্বাসের ছাপ থাকে, এদের তা নেই। এরা ভীতচকিত, তাড়া খাওয়া পশুর মতো উদ্‌ভ্রান্ত এদের চেহারা। এরা নিশ্চয়ই রবোট্রন।

আমি দরজা খুলে দিতেই লোকগুলো ঠেলে ঢুকে পড়ে, পেছনে দরজা বন্ধ করে দেয়। তিনজন পুরুষ, পেছনে একজন মেয়ে। মেয়ে না বলে কিশোরী বলা উচিত, অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি।

পুরুষ তিনজনের একজন এগিয়ে এসে বলে, আমি ইলেন, একজন রবোট্রন। আপনি নিশ্চয়ই কিম জুরান। আপনার সাথে করমর্দন করতে পারছি না, আমার হাত দুটি একটু আগে উড়ে গেছে। লোকটি কালো পোশাকের ভেতর থেকে তার বিধ্বস্ত দু'টি হাত বের করে, সেখান থেকে স্টেনলেস স্টীলের কিছু যন্ত্রপাতি,কিছু তার, কিছু পোড়া প্লাস্টিক ঝুলে আছে।

অন্যেরা পোশাক খুলতেই দেখতে পাই তাদের সারা শরীর বড় বড় বিস্ফোরণে ক্ষতবিক্ষত। মানুষ হলে এদের একজনও বেঁচে থাকত না।

কমবয়সী দেখতে একজন বলল, আমরা দুঃখিত এত রাতে আপনাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্যে। কিন্তু আমাদের এখন খুব বিপদ, একটা নিরাপদ আশ্রয়ের খুব দরকার। নীষা বলেছে এখানে আসতে।

আমি বললাম, এত বড় বিপদের সময় আমাকে বিরক্ত করা না–করা নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। আমি কি কিছু করতে পারি?

আমাদের আশ্রয় দিয়েই আপনি অনেক কিছু করেছেন। আপনার আপত্তি না থাকলে আমরা এখন নিজেদের একটু ঠিকঠাক করে নিই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

রবোট্রনগুলো টেবিলে নিজেদের টুকটাক যন্ত্রপাতি রেখে একজন আরেকজনের উপর ঝুঁকে পড়ে। শুধুমাত্র কিশোরী মেয়েটি একটা চেয়ারে নিজের হাতে মাথা রেখে বসে থাকে, মুখে কী গাঢ় বিষাদের ছায়া! মেয়েটি মানুষ নয়; যন্ত্র, কিন্তু তার মুখের গাঢ় বিষাদ আমাকে স্পর্শ করে, আমি বুকের ভেতর একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকি।

মেয়েটি হঠাৎ সোজা হয়ে বসে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি মানুষ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

আমার খুব মানুষ হতে ইচ্ছা করে।

কেন?

তাহলে এরকম পশুর মতো পালিয়ে বেড়াতে হত না।

আমি বললাম, আমি মানুষ, আমিও কিন্তু তোমাদের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছি।।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কেন?

ইলেন নামের মধ্যবয়স্ক লোকটি বলল, সু, কাউকে তার ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করতে হয় না।

সু নামের মেয়েটি উদ্ধত গলায় বলল, কী হয় জিজ্ঞেস করলে? আমরা তো সব মারাই যাব, এখন এত নিয়ম-কানুন মানার দরকার কি?

ইলেন কঠোর গলায় বলল, কে বলেছে আমরা সবাই মারা যাব?

আমি জানি আমরা সবাই মারা যাব। মেয়েটি রুদ্ধ গলায় বলল, ইউরীর দলের সবাই মারা গেল না? রু-টেকের দল ধরা পড়েছে, তারা কি এখন বেঁচে আছে? আমরা চারজন কোনোমতে পালিয়ে এসেছি। সুরা গেছে, কিরি গেছে, পল, টেরী আর লিমার কী খবর কে জানে। লুকাসের খবর কি এতক্ষণে জেনে যায় নি ক্রুগো কম্পিউটার? আর কে বাকি থাকল?

ইলেন এগিয়ে এসে কাটা হাত দিয়ে সুয়ের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, আমরা আমাদের মিশনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি সু। আর কয়েক ঘন্টা, তারপর আবার আমরা আমাদের আগের জীবন ফিরে পাব। আমাদের আর পালিয়ে বেড়াতে হবে না, রাতের অন্ধকারে রাস্তায় রাস্তায় ছুটতে হবে না। আবার আমরা মানুষের পাশাপাশি মানুষের বন্ধু হয়ে বেঁচে থাকতে পারব।

মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, তুমি শুধু শুধু আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ। তুমি জান আমরা আসলে হেরে গেছি, আমরা ধরা পড়ে গেছি, আমরা আর কখনো ক্রুগো কম্পিউটারকে পাল্টাতে পারব না, কখনো না, কখনো না—

ইলেন কাটা হাতটি মেয়েটির মাথায় রেখে বলল, এত আবেগপ্রবণ হলে চলে না সু, আমার কথা বিশ্বাস কর।

আমি সব জানি। যে-মানুষটার আমাদের ক্রুগো কম্পিউটারের গোপন সংখ্যা বের করে দেয়ার কথা ছিল, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সে আমাদের সাহায্য করবে না।

তাতে কী আছে, ইলেন তাকে সান্ত্বনা দেয়, গোপন সংখ্যা না জানলে কি আর ক্রুগো কম্পিউটারকে আঘাত করা যায় না? আমরা বাইরে থেকে পুরো কম্পিউটার উড়িয়ে দেব—

আমি দু' জনকে নিরিবিলি কথা বলতে দিয়ে ঘরের অন্যপাশে চলে এলাম। সেখানে কমবয়স্ক একজন রবোট্রন হাতে কী-একটা জিনিস লাগাচ্ছিল। আমি বললাম, তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারি?

হ্যাঁ, অবশ্যি।

তোমাদের স্বাধীন জীবনের সাথে ক্রুগো কম্পিউটারের একটা সম্পর্ক আছে, সম্পর্কটা কী, বলবে আমাকে?

হ্যাঁ, বলব না কেন! আপনি তো আমাদেরই লোক। ক্রুগো কম্পিউটার যে ধীরে ধীরে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে সেটা সবাই জানে, কিন্তু ঠিক ভেতরের খবর খুব বেশি মানুষ জানে না। রবোট্রন তরুণটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাদের পৃথিবী শাসন করা হয় কেমন করে জানেন?

জানি। ক্রুগো কম্পিউটার যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ করে, প্রয়োজনে সে তথ্য সরবরাহ করে সর্বোচ্চ কাউন্সিলকে। সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্যরা যখন প্রয়োজন হয় সিদ্ধান্ত নেন।

চমৎকার। সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্য কত জন জানেন?

দশজন।

তাদের সম্পর্কে কিছু জানেন?

কিছু কিছু জানি। তাঁদের বেশিরভাগই বিজ্ঞানী। দু' জন অর্থনীতিবিদ, দু' জন দার্শনিক। একজন চিত্রশিল্পীও আছেন বলে শুনেছি। সবাই বয়স্ক, পঞ্চাশের উপর বয়স।

তারা কি মানুষ, না রবোট?

মানুষ। মানুষ ছাড়া আর কেউ সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্য হতে পারে না।

তারা কী রকম মানুষ?

খুব চমৎকার মানুষ। আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, একজনকে আমি সামনাসামনি দেখেছিলাম, নাম ক্রিকি। পঞ্চম দাবা কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে নিউক্লিয়ার পাওয়ারের উপর কথা বলতে শুরু করলেন। একজন কর্মকর্তা তখন তাঁর কানে কানে কী-একটা কথা বললেন, আর ক্রিকি তখন লজ্জায় টমেটোর মতো লাল হয়ে গেলেন। আমতা-আমতা করে বললেন, কী সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে, আমি ভেবেছিলাম এটা নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারদের কনভেনশন। আমি এখন কী করি, দাবা সম্পর্কে আমি যে কিছুই জানি না! সে এক ভারি মজার দৃশ্য!

AMARBOI.COM

তরুণ রবোট্রনটি বলল, তারপর কী হল?

আমরা যারা দর্শক তারা হো-হো করে হেসে উঠলাম, তাই দেখে ক্রিকিও হাসতে শুরু করলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, আমার দশ মিনিট কথা বলার কথা। এখনো সাত মিনিট আছে। যেহেতু আমি দাবা সম্পর্কে কিছুই জানি না, এই সাত মিনিট আমি ছড়া আবৃত্তি করে শোনাব। নিজের লেখা ছড়া। এরপর ক্রিকি ছড়া আবৃত্তি করতে শুরু করলেন।

কেমন ছিল ছড়াগুলো?

একটা দু'টা হাসির ছিল, কিন্তু বেশিরভাগই একেবারে ছেলেমানুষি। এরকম একজন আপনভোলা মানুষ যে সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্য, ভাবা যায় না।

তরুণ রবোট্রনটি হঠাৎ তীব্র চোখে আমার দিকে তাকাল, বলল, আপনি সত্যি তাই মনে করেন?

আমি খানিকক্ষণ ভেবে বললাম, আমি দুঃখিত। কথাটি আমি ভেবে বলি নি।

আসলে ক্রুগো কম্পিউটার যদি যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের ভার নিয়ে নেয়, তখন সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে কোনো অসাধারণ মানুষের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন খাঁটি মানুষের—

তরুণ রবোট্রনটি আমার কথাটি লুফে নেয়, হ্যাঁ, প্রয়োজন খাঁটি মানুষের। যে হৃদয়বান, যে অনুভূতিপ্রবণ। তাই সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্যদের সব সময়ে মানুষ হতে হয়, কোনো রবোট তার সদস্য হতে পারে না। আমরা রবোট, আমরা আমাদের সমস্যা জানি। আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের অনুভূতির একটা সীমা আছে, মানুষের অনুভূতির কোনো সীমা নেই। সত্যিকার মানুষের ধারেকাছে আমরা যেতে পারি না। তাই আমাদের সাথে মানুষের কোনো বিরোধ নেই, থাকতে পারে না।

তরুণটি একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্যরা যতদিন মানুষ ছিলেন, ততদিন তাঁরা আমাদের মানুষের পাশাপাশি থাকতে দিয়েছিলেন, বন্ধুর মতো।

আমি চমকে উঠে বললাম, মানে? সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্যরা এখন কে?

এখন কেউ নেই। ক্রুগো কম্পিউটার একে একে সবাইকে সরিয়ে দিয়েছে, কাউন্সিলের সদস্যদের গত দশ বছরে একবারও প্রকাশ্যে দেখা যায় নি। এখন দেশের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে ক্রুগো কম্পিউটার। আগে ক্রুগো কম্পিউটার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারত না, তার সে ক্ষমতা ছিল না। সিদ্ধান্ত নিত সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্যরা। এখন সে নেয়, বাইরের লোকজন জানে না। যেখানে বিশাল এক ক্ষমতাশালী কম্পিউটার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, বাইরের লোকের পক্ষে সেখানে কিছু জানা সম্ভবও নয়।

কী ভয়ানক! আমার বিশ্বাস হতে চায় না, কী সর্বনাশ!

হ্যাঁ। আমরা রবোটেরা এবং অল্প কিছু মানুষ মিলে চেষ্টা করেছিলাম ক্রুগো কম্পিউটারের ভেতরে প্রবেশ করে অবস্থার পরিবর্তন করতে। খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলাম আমরা। একজন মানুষের ক্রুগো কম্পিউটারের গোপন সংকেত বের করায় সাহায্য করার কথা ছিল, সেই মানুষটি রাজি হয় নি। সেটা নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছে, তার ভেতরে ক্রুগো কম্পিউটার ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে একেবারে উঠে-পড়ে লেগেছে। আজ হঠাৎ করে আমাদের কয়েকটা দল ধরা পড়ে গেছে। আমাদের উপরেও একেবারে সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, কোনোভাবে বেঁচে এসেছি। আমাদের অবস্থা বেশ শোচনীয়, সামলে উঠতে পারব কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

আমি কী-একটা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় দরজায় আবার শব্দ হল।

মুহূর্তে ঘরে নীরবতা নেমে আসে, চোখের পলকে সবার হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বের হয়ে আসে। কিশোরী মেয়েটি বিদ্যুৎগতিতে জানালার পাশে এগিয়ে যায়, নাইলনের দড়ি ঝুলিয়ে দেয় জানালা থেকে।

দরজায় আবার শব্দ হল, দ্বিধান্বিত শব্দ।

ইলেন আমাকে ইঙ্গিত করে দরজা খুলে দিতে। আমি দরজা ফাঁক করে উঁকি দিলাম, নেশাসক্ত বৃদ্ধটি উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দরজা খুলতেই সে বিড়বিড় করে বলল, পুলিস এসেছে।

পুলিস?

হ্যাঁ, একটা একটা করে রুম সার্চ করছে।

সত্যি?

হ্যাঁ, অনেক পুলিস, অনেক বড় বড় অস্ত্র। ভাবলাম তোমাকে বলে দিই। কথা বলতে বলতে সে ঘরে উঁকি দিয়ে সবাইকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে দেখে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। শুকনো গলায় বলল,সর্বনাশ! এরা কারা? রবোট নাকি?

আমি কিছু বলার আগেই সে পিছিয়ে যায়, তারপর প্রাণপণে দৌড়াতে থাকে। রবোটকে তার ভারি ভয়।

আমি ঘরে এসে কিছু বলার আগেই সবাই বের হয়ে এল, তারা আমাদের কথাবার্তা শুনেছে। সময় বেশি নেই, সেটা বুঝতে কারো বাকি নেই। ইলেন চাপা গলায় বলল, লিফট দিয়ে নেমে যাও। দোতলায় থামবে, সেখান থেকে লাফিয়ে বের হতে হবে। পুলিসকে দেখামাত্র আক্রমণ করবে, তারা সম্ভবত আমাদের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত নেই।

ইলেন ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের আশ্রয় দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। বিদায়।

আমি বললাম, আমি আপনাদের সাথে যাব।

তার প্রয়োজন নেই, পুলিস কখনো জানবে না আমরা আপনার এখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

সে জন্যে নয়।

কী জন্যে? আপনি নিশ্চয়ই জানেন মানুষের নিরাপত্তা আমরা দিতে পারি না।

আমি হচ্ছি সেই মানুষটি, যার ক্রুগো কম্পিউটারের গোপন সংকেত বের করে দেয়ার কথা ছিল।

ওরা চমকে আমার দিকে তাকায়।

আমি গলার স্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করে বললাম, আমি আগে রাজি হই নি, কারণ আমি সবকিছু জানতাম না। এখন জেনেছি, তাই মত পাল্টেছি। আপনারা রাজি থাকলে আমি আপনাদের সাহায্য করতে রাজি আছি।

সু নামের কিশোরী মেয়েটি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। ইলেন তার ভাঙা হাত দিয়ে সুকে স্পর্শ করে বলল, সু, এখন ঠিক সময় নয়। কিম জুরানকে ছেড়ে দাও, আমাদের সাথে যেতে হলে তাঁর হয়তো কোনো ধরনের প্রস্তুতি দরকার।

আমি প্রস্তুত আছি,সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

ইলেন মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, আপনাকে যে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, তার প্রয়োজন হবে না। আমিও একাধিক ব্যাপারে আপনাদের কাছে ঋণী আছি, ঠিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি নি।

ইলেন বলল, চল, রওনা দিই। তোমরা নিশ্চয়ই জান, যে-কোনো মূল্যে কিম জুরানকে রক্ষা করতে হবে।

ছোট দলটি দ্রুতপায়ে এগোতে থাকে, তখন আমি দেখতে পাই বৃদ্ধ লোকটি করিডোরের শেষ মাথায় অতঙ্কিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কৌতূহলের জন্যে সে ঠিক চলে যেতে পারছে না, আমাকে দেখে সে দ্রুতপায়ে আমার দিকে দৌড়ে আসে, ফিসফিস করে বলে, তোমরা কি লিফট দিয়ে নামবে?

AMARBOI.COM

হ্যাঁ।

আরো একটা গোপন পথ আছে, ইলেকট্রিক লাইন নেয়ার একটা টানেল, সেদিক দিয়ে নেমে যাও। সেখানে সিঁড়ি নেই, কিন্তু রবোটের কি সিঁড়ি লাগে?

আমি ইলেনকে বুড়োর গোপন পথের কথা বলতেই তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

বুড়ো আমাদের নিয়ে যায়। লিফটের পাশেই একটা বন্ধ দরজা। একজন লাথি দিতেই সেটা খুলে গেল। নানা আকারের অসংখ্য ইলেকট্রিক তার সেদিক দিয়ে নেমে গেছে।

চমৎকার! দেরি নয়, নেমে যাও। কেউ-একজন আমাকে ধর, ইলেন চাপাস্বরে বলল, হাত না থাকায় একেবারে অকেজো হয়ে গেছি। কিম জুরানকে কে নিয়ে যাবে?

সু হাসিমুখে এগিয়ে আসে, আমি, আসুন কিম জুরান।

বুড়োটি আমার কনুই খামচে ধরে, ফিসফিস করে বলল, এরা সবাই রবোট?

হ্যাঁ।

এই মেয়েটিও?

হ্যাঁ।

একটু ছুঁয়ে দেখি? দেখব গো মেয়ে?

সু খিলখিল করে হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে দেয়, দেখ বুড়ো।

বুড়োটি ভয়ে ভয়ে তাকে একবার স্পর্শ করে। কনুইয়ে হাত বুলিয়ে সে একটা চিমটি কেটে বলল,ব্যথা পাও?

সু হাসি আটকে বলল, নাহ্! ব্যথা পাব কেন?

আশ্চর্য! বুড়ো চোখ কপালে তুলে বলল, মোটেও ব্যথা পায় না! হঠাৎ সে গলা নামিয়ে ফেলল, তাড়াতাড়ি চলে যাও তোমরা। দেরি না হয়ে যায় আবার!

আমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু মুদ্রা বের করে এনে তার হতে গুঁজে দিয়ে বললাম, বেশি নেই এখানে।

বুড়ো হলুদ দাঁত বের করে হেসে বলে, আমি এখানেই থাকি । পরে এসে দিয়ে যেও। যত ইচ্ছা।

AMARBOI.COM

১০. আঘাত

আমি একটা ছোট টার্মিনালের সামনে বসে আছি। আমার ডান পাশে বসেছে লুকাস, পেছনে দাঁড়িয়ে আছে নীষা। আমাকে ঘিরে আরো কয়েকজন রবোট্রন দাঁড়িয়ে, নানা আকারের, নানা বয়সের। বয়সটা যদিও বাইরের ব্যাপার, কিন্তু অনেক যত্নে এদের বয়সের তারতম্য দেখানো হয়। এই টার্মিনালটি ক্রুগো কম্পিউটারের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে । এটি কোনো অসাধারণ ব্যাপার নয়, সব মিলিয়ে লক্ষাধিক টার্মিনাল সরাসরি ক্রুগো কম্পিউটারের সাথে সংবাদ আদান-প্রদান করে।

আমি টার্মিনালে লিখলাম, ক্রুগো কম্পিউটার, তোমার গোপন সংকেতের প্রথম

সংখ্যাটি হচ্ছে শূন্য।

ক্রুগো কম্পিউটার উত্তর দিল, আমার গোপন সংকেত জানার অধিকার আপনার নেই।

আমি লুকাসকে জিজ্ঞেস করলাম, কতক্ষণ সময় লাগল উত্তর দিতে?

তেরো পিকো সেকেন্ড ।

আরো ভালো করে দেখ। প্রত্যেকটা শব্দের পেছনে সময়টা জানতে হবে।

টার্মিনালটি পুরান, এর থেকে ভালো করে সম্ভব না। দাঁড়ান ব্যবস্থা করছি।

সে মুহূর্তে টার্মিনালটি খুলে, ভেতর থেকে কয়েকটা তার বের করে এনে হাত দিয়ে ধরে রেখে বলল, আবার চেষ্টা করুন।

আমি আবার লিখলাম, ক্রুগো কম্পিউটার, তোমার গোপন সংকেতের প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে শূন্য।

ক্রুগো কম্পিউটার উত্তর দিল, আমার গোপন সংকেত জানার অধিকার আপনার নেই।

আমি লুকাসের দিকে তাকালাম, কতক্ষণ লাগল?

লুকাস ভুরু কুঁচকে বলল, আট দশমিক নয় সাত পিকো সেকেণ্ড। শব্দগুলোর মাঝে সময় লেগেছে দুই থেকে তিন পিকো সেকেণ্ডের ভেতরে। আমি দশমিকের পর আট ঘর পর্যন্ত মাপতে পেরেছি। শুনতে চান?

না। তুমি মনে রেখো। আমি এখন একটি—একটি করে সংখ্যা লিখব। ঠিক যখন সত্যিকার সংখ্যাটি লিখব ক্রুগো কম্পিউটার তার নিরাপত্তার প্রোগ্রামটি একবার দেখে নেবে, কাজেই সময়ের খানিকটা তারতম্য হবে। তুমি দেখ কখন তারতম্যটি হয়।

লুকাস হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, এত সহজ?

হ্যাঁ। আমি একবার বের করে মৃত্যুদণ্ড পেয়েছিলাম, কাজেই আমি জানি এটা কাজ করে।

আমরা এদিকে সবচেয়ে জটিল কম্পিউটারে সবচেয়ে জটিল প্রোগ্রাম বসিয়ে দিনরাত চেষ্টা করে যাচ্ছি—

নীষা বাধা দিয়ে বলল, লুকাস, সময় বেশি নেই। আমাদের এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে কিছুক্ষণের মাঝে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কিম জুরান, শুরু করুন।

আমি আবার লিখলাম, ক্রুগো কম্পিউটার, তোমার গোপন সংকেতের প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে এক।

ক্রুগো কম্পিউটার আবার উত্তর দিল, আমার গোপন সংকেত জানার অধিকার আপনার নেই।

লুকাস মাথা নেড়ে বলল, না, এটা ঠিক আগের মতো। এটা নয়।

আমি দুই, তিন, চার চেষ্টা করে যখন পাঁচ লিখলাম, লুকাসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলল, হ্যাঁ, উত্তর দিতে পিকো সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের তিন ভাগ দেরি হল । শব্দগুলো এসেছে একটু অন্যরকমভাবে। তার মানে প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে পাঁচ। চমৎকার।

আমি বললাম, আমি মানুষ, কাজেই আমার লিখতে অনেক দেরি হয়, তোমরা কেউ কর, অনেক তাড়াতাড়ি হবে। বুঝতে পারছ, জিনিসটা খুব সহজ।

এই সময়ে সু এসে ঢুকে বলল, পুলিস আর মিলিটারি আমাদের ঘিরে ফেলতে আসছে। আমাদের এখনি পালাতে হবে।

লুকাসকে বেশি বিচলিত দেখা গেল না। শান্ত গলায় বলল, আমাকে মিনিটখানেক সময় দাও । গোপন সংকেতটা বের করে নিই। আর সবাই বাইরে গিয়ে গাড়িতে অপেক্ষা কর।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি লুকাসের আঙুল বিদ্যুৎগতিতে টার্মিনালের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, যে-জিনিসটা বের করতে আমার প্রায় এক সপ্তাহের মতো সময় লেগেছিল, লুকাস সেটা শেষ করল ছেচল্লিশ সেকেণ্ডের মাথায় । উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন এবারে পালাই।

আমরা ছুটে বের হয়ে আসি। দু'টি গাড়িতে সবাই গাদাগাদি করে বসেছে । লুকাস হালকা স্বরে বলল, মনে রেখো আমাদের সাথে দু' জন মানুষ রয়েছে, কিম জুরান আর নীষা। তাদেরকে সাবধানে রেখো। জানই তো তাদের শরীরের ডিজাইন বেশি সুবিধের নয়, একটা বুলেট বেকায়দা লাগলেই তারা শেষ হয়ে যায়।

হাসতে হাসতে কয়েকটা রবোট্রন সরে গিয়ে আমাকে জায়গা করে দেয়। আমি নীষার পাশে গিয়ে বসি, সাথে সাথে গাড়ি দু'টি একপাক ঘুরে গুলির মতো বেরিয়ে যায়।

আমি অনুভব করলাম, নীষা আমার হাতে হাত রেখে আস্তে একটা চাপ দিল।

রক্তমাংসের মানুষ। আমি এখন নিশ্চিতভাবে জানি।

AMARBOI.COM

ছোট একটা ঘরে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন মানুষ এবং রবোট বসে আছে, মানুষ বলতে অবশ্যি দু' জন, আমি আর নীষা। ঘরটিতে আবছা অন্ধকার, সামনে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লুকাস। আপাতত লুকাস কথা বলছে, অন্যেরা শ্রোতা। সে টেবিলে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে দিতে বলল, তোমরা সবাই জান অনেকগুলো কারণে আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনেক এগিয়ে এনেছি। ক্রুগো কম্পিউটারের উপর আরো মাসখানেক পরে যে-আঘাত হানার কথা ছিল, সেটা হানা হবে আজ রাতে। তার গোপন সংকেত বের করে আনা হয়েছে। বের করতে সময় লেগেছে ছেচল্লিশ সেকেণ্ড।

বিস্ময়ের একটা মৃদু গুঞ্জন উঠে থেমে যায়। এক জন হাত তুলে জিজ্ঞেস করে, কী করে বের করলে এত তাড়াতাড়ি?

কিম জুরানের একটা সহজ উপায় আছে, এটা বের করে তিনি একবার মৃত্যুদণ্ড পেয়েছিলেন। যারা এখনো কিম জুরানকে চেন না, তাদের জন্যে বলছি, নীষার পাশে ধূসর কাপড় পরে যে মধ্যবয়স্ক লোকটি বসে আছেন, তিনি কিম জুরান।

সবাই আমার দিকে ঘুরে তাকাল এবং অস্বস্তিতে আমার কান লাল হয়ে উঠল।

সৌভাগ্যক্রমে লুকাস আবার কথা শুরু করে, কিম জুরানের পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ, কিন্তু আমি এখন সেটা ব্যাখ্যা করছি না, কারণ আমাদের হাতে সময় খুব কম। আমাদের আজ রাতের পরিকল্পনা খুব সহজ। পরিকল্পনাটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, হার্ডওয়ার আক্রমণ এবং সফ্টওয়ার আক্রমণ। অন্যভাবে বলা যায়, সরাসরি

ক্রুগো কম্পিউটারকে বাইরে থেকে আক্রমণ করা এবং কম্পিউটার প্রোগ্রাম দিয়ে ভেতর থেকে আক্রমণ করা। দু'টি আক্রমণই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি ছাড়া অন্যটি সফল হতে পারবে না।

সরাসরি আক্রমণটি আসলে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। আমি এটার নেতৃত্ব দেব। আমার দরকার প্রায় পনের জন দক্ষ রবোট্রন, যারা সামরিক পি-৪৩ ট্রেনিং পেয়েছে। কতজন আছ তোমরা হাত তোল।

রবোট্রনেরা হাত তোলে এবং গুনে দেখা যায় তাদের সংখ্যা বারজন।

লুকাস একটু চিন্তিতভাবে বলে, একটু কম হয়ে গেল, কিন্তু কিছু করার নেই। আজ সারাদিনে আমরা যাদের হারিয়েছি তারা থাকলে কোনো কথা ছিল না। যাই হোক, আরো তিনজন রবোট্রন দরকার, বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার কিংবা গণিতবিদ হলে ভালো হয়। কারা যেতে চাও হাত তোল।

প্রায় গোটা সাতেক হাত ওঠে—লুকাস তাদের মাঝে থেকে সুসহ আরো দু' জনকে বেছে নেয়।

সু জিজ্ঞেস করে, আমাদের কী করতে হবে?

যুদ্ধ।

কিন্তু কীভাবে?

সেটা আমি বলে দেব। মোটামুটি জেনে রাখ, ক্রুগোর একটা ভবন আছে শহরের দক্ষিণ দিকে, সেখানে সরাসরি আক্রমণ করে ঢুকে যেতে হবে। ভবনের ভেতরে ক্রুগোর মূল ইলেকট্রনিক্স রয়েছে। সেটা অত্যন্ত সুরক্ষিত, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ছাড়া ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তার দরজা খোলার জন্যে আমাদের ক্রুগোর গোপন সংকেতের প্রয়োজন ছিল।

যাই হোক, আমরা যখন ভবনের মূল অংশের দরজা পর্যন্ত যাব, তখন যেন দরজা খোলা থাকে। সেই দায়িত্ব নিতে হবে দ্বিতীয় দলটির। এর নেতৃত্ব দেবে ইলেন।

ইলেন আপত্তি করে বলল, আমার দু'টি হাতই উড়ে গেছে, এখনো সারানোর সময় পাই নি। আমাকে ঠিক নেতৃত্বে না রেখে সাহায্যকারী হিসেবে রাখ।

লুকাস মাথা নাড়ে, না। আমি এমন একজনকে দায়িত্ব দিতে চাই, যার অভিজ্ঞতা সব থেকে বেশি। আর তোমার হাত ব্যবহার করতে হবে না, কপোট্রনের সাথে সরাসরি টার্মিনালের যোগাযোগ করে দেয়া হবে।

বেশ, তাই যদি তোমার ইচ্ছে।

তোমার দলের দায়িত্ব সময়মতো ক্রুগো কম্পিউটারকে বাধ্য করা যেন সে দরজা খুলে দেয়। কতজন রবোট্রন দরকার?

যত বেশি হয় তত ভালো।

কিন্তু কিছু রবোট্রনকে পাহারায় রাখতে হবে। যখন তুমি তোমার দলকে নিয়ে ক্রুগো কম্পিউটারকে বাধ্য করার চেষ্টা করতে থাকবে, তখন ক্রুগো কম্পিউটার সেনাবাহিনী, পুলিস আর নিরাপত্তাবাহিনীর লোকজন পাঠাবে এখানে, তাদের আটকে রাখতে হবে কিছুক্ষণ।

তা ঠিক।

খানিকক্ষণ আলোচনা করে লুকাস দায়িত্ব ভাগ করে দেয়। বাকি এগারজন

রবোট্রনের ভেতর চারজন পাহারা দেবে, আর সাতজন ক্রুগো কম্পিউটারের মূল প্রোগ্রামকে পরিবর্তন করে তাকে বাধ্য করবে ঠিক সময়ে দরজা খোলার জন্যে।

আলোচনার শেষের দিকে নীষা হাত তুলে কথা বলার অনুমতি চায়। আমি যে-জিনিসটা জানতে চাইছিলাম, নীষা ঠিক সেটাই জিজ্ঞেস করে, এ ব্যাপারে, আমাদের, মানুষদের কিছু করার আছে?

লুকাস হেসে বলল, না, নেই। তোমাদের যুদ্ধে পাঠানো যাবে না, কারণ কোনোভাবে একটা বুলেট এসে লাগলেই তোমরা শেষ। তোমাদের মস্তিষ্কে কোনো কপেট্রন নেই, তোমরা ডিজিট্যাল কম্পিউটারের মতো কাজ কর না, কাজেই তোমাদেরকে ক্রুগো কম্পিউটারের প্রোগ্রাম পরিবর্তনেও ব্যবহার করা যাবে না।

নীষা হাত নেড়ে বলল, তার মানে আমরা চুপচাপ বসে থাকব? আমাদের কোনো কাজ নেই?

আপাতত নেই। আমাদের কাজ শেষ হবার পর তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। যেমন, মানুষের উদ্দেশে প্রথম ভাষণটা তোমাদের দিতে হবে। পৃথিবীর মানুষ এত বড় একটা ঘটনার বর্ণনা আরেকজন মানুষের কাছ থেকে না শুনলে ভরসা পাবে না।

আমি বললাম, ক্রুগো কম্পিউটারের মূল ইলেকট্রনিক্স ভবনে ঢোকার পর তোমরা নিশ্চয়ই তার গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রো প্রসেসর এবং মেক্রো প্রসেসরগুলো তুলে ফেলার পরিকল্পনা করছ?

হ্যাঁ।

সেটা কি তোমরাই করবে? সেখানে একজন মানুষ পাঠানো কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

লুকাস মাথা নেড়ে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা ইলেকট্রনিক সিগনাল দিয়ে চলাফেরা করি, বাইরে থেকে ইলেকট্রনিক সিগনাল দিয়ে ক্রুগো কম্পিউটার ইচ্ছা করলেই আমাদের সার্কিট জ্যাম করে দিতে পারে।

তাহলে?

আমরা যখন মূল ভবনে ঢুকব তখন আমাদের খুব ভালো করে শিল্ডিং করে নিতে হবে। আমরা সে জন্যে খুব ভাল শিল্ডিং জোগাড় করেছি। তার একটিমাত্র সমস্যা, সেটি অত্যন্ত ভারি একটা ফ্যারাডে কেজ, কাজেই সেটা পরে চলাফেরা করা কঠিন। আমাদের কাজের ক্ষমতা অনেক কমে যাবে তখন।

তাহলে একজন মানুষকে পাঠাচ্ছ না কেন?

কারণ দু'টি। প্রথমত, আমাদের সেরকম কোনো মানুষ নেই। দ্বিতীয়ত, আমাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ করে ক্রুগোর ভবনে ঢুকতে হবে, কোনো মানুষ সেই যুদ্ধে টিকে থাকতে পারবে না।

মানুষের যুদ্ধে অংশ নেবার প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ শেষ হলে সে যাবে।

যুদ্ধ পুরোপুরি কখনোই শেষ হবে না, গোলাগুলি শেষ পর্যন্ত চলবে। মানুষকে তার ভেতর দিয়ে নেয়া প্রচণ্ড বিপদের কাজ। কোনো মানুষের জীবন নিয়ে আমরা এত বড় ঝুঁকি নিতে পারি না।

কেউ যদি স্বেচ্ছায় যেতে চায়?

লুকাস একটু হেসে বলে, কে যাবে?

আমি।

সে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে, না কিম জুরান। আপনার জীবনের উপর দিয়ে অনেক ঝড়–ঝাপটা গিয়েছে, এখন আপনি একটু বিশ্রাম নিন।

তোমরা রাজি না হলে আমি যেতে পারব না, কিন্তু লুকাস, আমি সত্যিই যেতে চাই। তোমরা যদি চেষ্টা কর, আমি মনে করি আমার বেঁচে থাকার চমৎকার সম্ভাবনা আছে।

কে–একজন বলল, শতকরা চল্লিশ দশমিক তিন দুই।

আমি তার কথা লুফে নিয়ে বললাম, এর থেকে কম সম্ভাবনায় থেকেও আমি অনেকবার বেঁচে এসেছি। ভেবে দেখ লুকাস।

লুকাস কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, বেশ কিম জুরান। আমি রাজি।

রবোট্রনের ক্ষুদ্র দলটি একটা হর্ষোধ্বনি করে ওঠে। সবাই শান্ত হয়ে যাবার পর নীষা লুকাসকে লক্ষ্য করে কিছু–একটা বলতে যাচ্ছিল, লুকাস তার আগেই তাকে বাধা দিয়ে বলল, না নীষা, তা সম্ভব নয়।

আমি কী বলতে চাইছি তুমি শুনবে তো আগে।

আমি জানি তুমি কী বলবে।

কী বলব?

তুমিও আমাদের সাথে যেতে চাইবে। কিন্তু তা হয় না নীষা, আমাদের দলের অন্তত একজন মানুষকে যে–কোনো অবস্থায় বেঁচে থাকতে হবে। আমি তোমাদের দু' জনের জীবন নিয়েই ঝুঁকি নিতে পারি না। তুমি জান আজ সারাদিনে আমাদের উপর ক্রুগো কম্পিউটার যেসব আঘাত হেনেছে, তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানুষেরা। এখন তোমরা দু' জন ছাড়া আমাদের দলে আর কোনো মানুষ নেই।

নীষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যায়। লুকাস অন্য সবার দিকে তাকিয়ে বলল, কারো কোনো প্রশ্ন আছে?

সু হাত তুলে বলল, আমরা যদি ব্যর্থ হই?

লুকাসের চোখ একবার ধক করে জ্বলে উঠল, সুয়ের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আমরা ব্যর্থ হব না।

শহরতলিতে ক্রুগো কম্পিউটারের যে বড় ভবনটি আছে, আমি লুকাসের দলের পনের জনের সাথে সেখানে অপেক্ষা করছি। ছোট ছোট গাড়িতে ভিন্ন ভিন্ন দলে সবাই এসে একত্র হয়েছে। গাড়িগুলো ছোট হলেও বিস্ময়কর। এগুলো স্বয়ংক্রিয় এবং পুরোটা শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে বোঝাই। আপাতত সেগুলো নিরীহভাবে চারপাশে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রুগোর ভবনটি অত্যন্ত সুরক্ষিত। উঁচু চওড়া দেয়াল, কাঁটাতারের বেষ্টনি, উচ্চ–চাপের বৈদ্যুতিক তার, সশস্ত্র প্রহরা সবকিছুই এখানে রয়েছে। এই ভবনে ঢোকার জন্য লুকাসের পরিকল্পনা খুব সহজ। একই সাথে ভবনটিকে চারদিক থেকে আক্রমণ করা হবে, ঠিক কোন পথে শত্রুরা আসবে বুঝতে দেয়া হবে না। তাদের বিভ্রান্ত করার জন্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে মূল গেট দিয়ে দু'টি গাড়ি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ি দু'টিকে বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করে সমস্ত লক্ষ্যস্থলের কেন্দ্র হিসেবে দাঁড় করানো হবে। ঠিক এই সময় আক্রমণের তৃতীয় পর্যায় শুরু হবে। লুকাস তার দলবল নিয়ে দক্ষিণ দিকের দেয়াল উড়িয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে। ভেতরে খণ্ডযুদ্ধ হবে। যারা বেঁচে থাকবে তারা মূল ইলেকট্রনিক্স ভবনের সামনে এসে হাজির হবে। আমি থাকব সাথে, যখন ইলেন মূল ভবনের দরজা খুলে দেবে, ভেতরে ঢুকে যাব। তার পরের কাজ সহজ, বেছে বেছে প্রয়োজনীয় আই. সি.গুলো তুলে নেয়া, আমি আগেও একবার করেছি।

নির্দিষ্ট সময়ে আমরা পরিকল্পনামাফিক দূরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। কয়েক মুহূর্ত পরেই আমাদের নিরীহ গাড়িগুলো তাদের ক্ষেপণাস্ত্র থেকে গোলা ছুঁড়তে থাকে। ভবনটির নানা অংশ আমি বিস্ফোরণে উড়ে যেতে দেখলাম। লুকাস আর তার দলবল শান্তভাবে অপেক্ষা করতে থাকে, আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, নিজেকে মাটির সাথে মিশিয়ে আমি শুয়ে থাকি, প্রত্যেকটা বিস্ফোরণের শব্দে আমি চমকে উঠছিলাম, মনে হচ্ছিল আমার কানের পর্দা যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে যাবে। আমি দরদর করে ঘামছিলাম এবং প্রচণ্ড তৃষ্ণায় আমার বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল।

একসময় লুকাস হাত দিয়ে ইঙ্গিত করতেই দু'টি গাড়ি কোনো চালক ছাড়াই হঠাৎ বাইরের গেট দিয়ে ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে। প্রচণ্ড গোলাগুলি হতে থাকে, আমি লেজারের তীব্র আলো ঝলসে উঠতে দেখি। গাড়ি দু'টি থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বৃষ্টির মতো গোলাগুলি করতে থাকে, ক্রুগোর ভবনের প্রহরীরা গাড়ি দু'টিকে ঘিরে একটা ব্যূহ তৈরি করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে।

সবকিছু পরিকল্পনামাফিক কাজ করছে, লুকাস চারদিকে ঘুরে একবার তাকিয়ে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করতেই পুরো দলটি উঠে দাঁড়ায়। আমার একা একা অপেক্ষা করার কথা, উঠে দৌড় দেবার প্রবল ইচ্ছাটাকে অনেক কষ্টে দমন করে আমি কান চেপে মাটিতে শুয়ে থাকি। একটু পরেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম। খানিকক্ষণের জন্যে একটা আশ্চর্য নীরবতা নেমে আসে, তারপর হঠাৎ আবার গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানি না, আমার তখন সময়ের কোনো জ্ঞান নেই, মনে হচ্ছিল কয়েক যুগ পার হয়ে গেছে। এই সময়ে হঠাৎ দেখতে পাই সু গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে চিৎকার করে বলল, কিম জুরান, চলুন যাই।

সবকিছু ঠিকমত চলছে?

মোটামুটি। দু' জন মারা গেছে আমাদের।

অন্ধকারে বিস্ফোরণের আলোতে পথ দেখতে দেখতে সুয়ের হাত ধরে আমি এগোতে থাকি। আমাদের দু'পাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে যাচ্ছিল, এর কর্কশ শব্দে কানে তালা ধরে যাবার অবস্থা। সু গলা উঁচিয়ে বলল, ভয় পাবেন না, লুকাস আমাদের কভার করছে।

যদিও ভয়ে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে যাবার অবস্থা, আমি সেটা স্বীকার করলাম না, চিৎকার করে বললাম, ভয়ের কী আছে, আমরা তো এসেই গেছি।

সত্যি সত্যি আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি, সামনের দেয়ালে বড় ফুটো, ইতস্তত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈদ্যুতিক তার ঝুলছে। আমার শরীরে বিশেষ বিদ্যুৎ অপরিবাহী পোশাক, কাজেই আমি ইতস্তত না করে ভেতরে ঢুকে গেলাম। ভেতরে আবছা অন্ধকার, ধুলোবালি উড়ছে। লুকাসের গলার স্বর শোনা গেল, কিম জুরান, ঠিক আছে সবকিছু?

হ্যাঁ।

চলুন যাই।

কে–একজন বলল, প্রহরীদের একটা দল আসছে সামনে দিয়ে।

লুকাস কোমর থেকে খুলে কী–একটা ছুঁড়ে দেয়, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায় সাথে সাথে।

আমার সাথে আসুন কিম জুরান। লুকাস আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলে, ঐ যে সামনে ক্রুগোর মূল ভবন, সি. পি. ইউ. ওখানেই আছে।

ধুলোবালির মাঝে কাশতে কাশতে আমি এগোচ্ছিলাম, হঠাৎ পুরো এলাকাটি তীব্র আলোতে ভরে গেল। তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলল, যে যেখানে আছ দু' হাত তুলে দাঁড়াও, তোমাদের দিকে আমরা আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে আছি!

ক্রুগো! লুকাস দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, ভাঁওতাবাজির আর জায়গা পাও না! বিদ্যুৎগতিতে সে তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তুলে নিয়ে আলোগুলো লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে। দেখতে দেখতে আবার আবছা অন্ধকার নেমে আসে। লুকাস ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলল, ক্রুগো! তুমি আমাকে ধোঁকা দেবে?

তুমি কে?

লুকাস দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, তোমার বাবা।

একটা তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ শোনা যায়। ও, তুমি সেই রবোট্রন দলপতি! দশ টেরা চাঁইয়ের একটা রবোট হয়ে তুমি আমার সাথে যুদ্ধ করতে এসেছ? তোমার সাহসের প্রশংসা করতে হয়!

লুকাস ক্রুগোর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে এগিয়ে যায়। মূল ভবনের কাছাকাছি এসে সবাই ছড়িয়ে–ছিটিয়ে পড়ে। লুকাস চিৎকার করে বলল, যে–কোনো অবস্থাতে তোমরা সবাইকে আধঘন্টা আটকে রাখবে, এর ভেতরে দরজা খুলে যাবে।

দরজা খুলে যাবে? ক্রুগো ব্যঙ্গ করে বলে, তোমার হুকুমে? নাকি কোনো জাদুমন্ত্রে?

তোমার যেটা ইচ্ছা ভাবতে পার।

তুমি জান এই দরজা খুলতে হলে কী করতে হয়?

জানি। তোমার গোপন সংকেত জানতে হয়।

তুমি সেটা জান?

জানি।

ক্রুগো হঠাৎ অট্টহাস্য করে ওঠে। তুমি ভেবেছ যে–সংকেতটি তোমরা বের করেছ সেটা সত্যি? এত সহজে আমার সংকেত বের করা যায়?

কেন যাবে না, লুকাস হাসার চেষ্টা করে বলল, তুমি একটা নির্বোধ কম্পিউটার ছাড়া তো আর কিছু নও।

সত্যিই যদি তুমি আমার গোপন সংকেত জান তাহলে দরজা খুলছ না কেন?

যখন সময় হবে তখন ঠিকই খুলব।

আর ততক্ষণে হাজার হাজার ছত্রীসেনা এসে তোমাদের সবার কপেট্রন ধ্বংস করে দেবে। তুমি জান এই মুহূর্তে কয় হাজার ছত্রীসেনা পাশের প্রদেশ থেকে আনা হচ্ছে?

তুমি জান এই মুহূর্তে কতজন রবোট্রন তোমার মূল প্রোগ্রামকে পরিবর্তন করছে?

ক্রুগো আবার অট্টহাস্য করে ওঠে, সাথে সাথে কাছেই কোথায় প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। গুলির শব্দ একটু কমে আসতেই ক্রুগোর গলা শুনতে পেলাম, রবোট্রন, শুনতে পাচ্ছ তোমাদের ধ্বংস করার জন্য সেনাবাহিনী চলে এসেছে! তোমার বন্ধুরা কতক্ষণ তাদের আটকে রাখবে?

লুকাস ক্রুগোর কথায় কান না দিয়ে ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি সাবধানে ঘড়ির দিকে তাকালাম, যে-সময় দরজা খোলার কথা সেটা পার হয়ে যাচ্ছে। একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু যদি বেশি দেরি হয়, তাহলে? আসলেই যদি ক্রুগো কম্পিউটারের কথা সত্যি হয় আর আমাদের বের করা গোপন সংকেতটি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে কী হবে? চিন্তা করেই আমার বুক কেঁপে ওঠে, আমাদের সবাইকে তাহলে ইঁদুরের মতো মারা হবে?

লুকাস দরজার কাছে গিয়ে সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, কী দেখে সে-ই জানে। ক্রুগোর গলার স্বর আবার শুনতে পেলাম, বলল, দেখ রবোট্রন, আমি তোমাদের শেষবারের মতো ক্ষমা করতে রাজি আছি। তোমরা দু'হাত তুলে এখান থেকে বের হয়ে পড়, তোমাদের তাহলে হত্যা করা হবে না।

লুকাস কোনো কথা না বলে পিঠ থেকে ভারি হ্যাভারসেক নামিয়ে বিস্ফোরক বের করতে থাকে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী করছ লুকাস?

দরজা যদি না খোলে ভেঙে ফেলতে হবে।

পারবে ভাঙতে?

জানি না, চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। ডানদিকে মাঝামাঝি জায়গাটা দুর্বল, ঠিকভাবে বিস্ফোরকগুলো কাজে লাগালে একটা ছোট ফুটো হতে পারে। লুকাস খানিকক্ষণ কী-একটা ভাবে, তারপর জিজ্ঞেস করে, কী মনে হয় আপনার, ইলেনের দল কি খুলে দিতে পারবে দরজা?

আমার নিজের তখন সন্দেহ হতে শুরু করেছে, কিন্তু কেন জানি না দৃঢ়স্বরে বললাম, অবশ্যি পারবে। সময় হয়ে গেছে, যে-কোনো মুহূর্তে খুলে যাবে এখন।

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ ম্যাজিকের মতো ছোট একটা দরজা উপর দিকে উঠে যেতে থাকে।

লুকাস আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, ছুটে যাচ্ছিল, আমি তাকে থামালাম, ভেতরে ঢোকার আগে তুমি তোমার শিল্ডিং পরে নাও।

তাই তো—লুকাস থমকে দাঁড়িয়ে দরজাটার দিকে তাকায়, এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলে, কিন্তু দরজা যদি বন্ধ হয়ে যায়, চলুন আগে ভেতরে ঢুকে পড়ি।

কিন্তু তোমার সার্কিট যদি জ্যাম করে দেয়?

আপনি তো আছেন, আপনি তো জানেন কী করতে হবে। চলুন আগে ঢুকে পড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আর লুকাস ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম আর প্রায় সাথে সাথেই ছোট ভারি দরজাটা আবার নেমে আসে। দরজাটা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে ভেতরে একেবারে নীরব হয়ে আসে, এতক্ষণ প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে হঠাৎ করে এই নীরবতাটুকু খুব অস্বস্তিকর মনে হতে থাকে। আমি শুকনো গলায় বললাম, লুকাস, তোমার শিল্ডিংটা পরে নাও, সার্কিট জ্যাম করে দিলে মহা মুশকিল হয়ে যাবে।

ঠিকই বলেছেন। লুকাস তাড়াহুড়া করে পোশাকটা পরতে শুরু করে, অনেকটা মহাকাশযাত্রীদের মতো পোশাক, লুকাসের পরতে বেশ খানিকক্ষণ সময় নেয়।

ভেতরটা একটা গুহার মতো, কয়েক শ' ফুট লম্বা। ভালো করে দেখা যায় না। এমনিতে কোনো আলো নেই, বিভিন্ন আই. সি. থেকে যে-আলো বের হচ্ছে তা দিয়েই কেমন একটা ভূতুড়ে ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। আই. সি.গুলো প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি করে, সেগুলোকে ঠাণ্ডা করার জন্য ভেতরে বাতাস বইছে, সেই বাতাসও অনেক গরম। চারদিকে অসংখ্য আই. সি; আবছা আলোতে সেগুলো চকচক করছিল।

আমি লুকাসের পিছু পিছু হাঁটতে থাকি। সবকিছু ঠিকঠিক ঘটে থাকলে এই মুহূর্তে এখানকার কোনো কোনো আই. সি.র ভেতর দিয়ে ইলেনের দল তাদের তৈরি করা প্রোগ্রাম প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। আমার মনে পড়ল মহাকাশযানের কম্পিউটার আমাকে একবার ধোঁকা দিয়ে সেইসব আই. সি. তুলিয়ে এনেছিল।

লুকাস ম্যাপ দেখতে দেখতে হাঁটছিল, ভেতরে কোথায় কোন আই. সি. রয়েছে সেই ম্যাপে দেখানো আছে। একসময় সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, কিম জুরান, আমরা এসে গেছি, আপনি বাম দিক থেকে শুরু করুন, আমি ডান দিক থেকে।

আমি পকেট থেকে স্ক্রু ড্রাইভারটা বের করে সাবধানে আই. সি.গুলো টেনে তুলতে থাকি। ছোট ছোট কালো আই. সি., সাধারণ লজিক গেট দেখতে যেরকম হয়, মোটেও মূল্যবান প্রসেসরের মতো নয়, পিনের সংখ্যা কম, কোনো রেডিয়েটরও নেই। আমার একটু খটকা লাগে, ইতস্তত করে লুকাসকে ডাকলাম, লুকাস।

কি?

আমি লুকাসের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গেলাম। লুকাসের শিল্ডিংয়ের একটা অংশ নেই, মুহূর্তে পুরো ব্যাপারটি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে আর লুকাস নয়, সে এখন ক্রুগো কম্পিউটার। লুকাসের সার্কিট জ্যাম করার বদলে ক্রুগো তাকে দখল করে নিয়েছে, আমাকে ভাঁওতা দিয়ে আবার সেই একইভাবে আমাদের সর্বনাশ করিয়ে নিচ্ছিল।

আমি উঠে দাঁড়াতেই লুকাস হঠাৎ করে তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি টেনে নেয়। আমার বুক কেঁপে ওঠে, কী করছে সে? শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে তোমার?

লুকাস কোনো কথা না বলে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি আমার দিকে তাক করে, আর আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারি আমার সময় শেষ। এত চেষ্টা, এত কষ্ট—সবকিছু এখন শেষ হয়ে যাবে, ছোট একটি ভুলের জন্যে। লুকাসকে বাইরে রেখে আমি যদি শুধু একা ভেতরে ঢুকতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ কখনো আশা ছেড়ে দেয় না, শেষ মুহূর্তে আমিও মরিয়া হয়ে ছুটতে শুরু করি, ভেতরে গুলির প্রচণ্ড কান-ফাটানো আওয়াজ হল, আমার ঘাড়ের কাছে কোথায় জানি তীব্র যন্ত্রণা করে ওঠে, নিশ্চয়ই গুলি লেগেছে। আমি পড়ে যেতে যেতে উঠে দাঁড়াই, এখনো মরি নি, একবার শেষ চেষ্টা করা যায় না?

একটু দূরে দেখা যাচ্ছে দুই হাজার পিনের প্রসেসর, উপরে সোনালি রেডিয়েটর, ঐগুলো নিশ্চয়ই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আই. সি. ও.র একটা, তুলতে পারলে নিশ্চয়ই কিছু-একটা হবে। আমি টলতে টলতে প্রসেসরগুলোর কাছে এসে দাঁড়াই—যে-কোনো মুহূর্তে একটা গুলি এসে আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে আশঙ্কায় আমার সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে থাকে, কিন্তু কোনো গুলি আমাকে শেষ করে দিল না। আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখি লুকাস আমার দিকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি তাক করে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে। কিন্তু গুলি করছে না। কেন?

হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারি কেন সে গুলি করছে না, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি সবচেয়ে জরুরি প্রসেসরগুলোর সামনে, আমাকে গুলি করলে এই প্রসেসরও ধ্বংস হয়ে যাবে, ক্রুগো সেটা করতে চায় না। হঠাৎ আমার শরীরে হাতির মতো বল এসে যায়, আমি পাগলের মতো পেছনের প্রসেসরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, হাতের স্ক্রু ড্রাইভারটা দিয়ে আঘাত করতেই ঠুনকো প্রসেসরটি ঝনঝন করে ভেঙে যায়।

লুকাস হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, প্রসেসরটি হারিয়ে নিশ্চয়ই ক্রুগো কম্পিউটার তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে! আমি পাগলের মতো পাশের প্রসেসরটিকে আঘাত করি, এটা অনেক শক্ত, আমার আঘাতে কিছু হল না। আমি আতঙ্কিত হয়ে দেখি লুকাস আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, টলতে টলতে আমার দিকে এগিয়ে এসে আবার তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি তুলে ধরেছে, আমি প্রাণপণে প্রসেসরটির নিচে স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে হ্যাঁচকা টানে সেটিকে তুলে ফেললাম, সাথে সাথে লুকাস আর্তচিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

আমার হঠাৎ করে ভীষণ দুর্বল লাগতে থাকে, ঘাড়ের কাছে কোথাও গুলি লেগেছে, রক্তে সারা পিঠ আর হাত চটচটে হয়ে গেছে, চেষ্টা করেও চোখ খোলা রাখতে পারছি না। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আমি আরো একটা প্রসেসর তোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাতে আর জোর নেই, স্ক্রু ড্রাইভারটা নিচে ঢোকানোর চেষ্টা করতেই মাথা ঘুরে ওঠে, কোনোমতে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিই, আর ঠিক তক্ষুণি তাকিয়ে দেখি লুকাস আবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার হাতে এখনো সেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। এক পা এক পা করে সে আমার দিকে এগিয়ে আসে, দু' হাত সামনে দাঁড়িয়ে সে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি তুলে ধরে, আমি তার চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম, অদ্ভুত পোশাকে মুখ ঢেকে আছে, তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। আমি চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি। পর মুহূর্তে লুকাস ট্রিগার টেনে ধরে। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের কান-ফাটানো কর্কশ শব্দের মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম আমি। কয়েক মুহূর্ত লাগল বুঝতে যে আমার গায়ে গুলি লাগে নি। চোখ খুলে তাকালাম আমি, সত্যি তাই, আমার গায়ে একটি গুলিও লাগে নি। কেন লাগবে? লুকাস আমাকে গুলি করে নি, গুলি করেছে আমার পেছনে সারি সারি প্রসেসরগুলোতে।

লুকাস আবার তার অস্ত্র তুলে নেয়, তারপর আবার পাগলের মতো গুলি করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু করে। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যায়, ধোঁয়ায় ভরে যায় চারদিক। কয়েক মিনিট গুলির শব্দ ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। প্রচণ্ড আক্রোশে সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে লুকাস। কখনো থামবে মনে হচ্ছিল না, কিন্তু গুলি শেষ হয়ে গেল একসময়। ঠিক তখনই আমি ক্রুগোর আর্তচিৎকার শুনতে পাই। মরণাপন্ন মানুষের কান্নার মতো সেই ভয়াবহ চিৎকার বদ্ধ ঘরের দেয়াল থেকে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। আশ্চর্য একটা নীরবতা নেমে আসে হঠাৎ, কবরেও বুঝি কখনো এরকম নীরবতা নামে না।

লুকাস হাতের অস্ত্রটি ছুঁড়ে দিয়ে মাথার উপর গোলাকার ঢাকনাটি খুলে ফেলল। ঘুরে আমার দিকে তাকাল সে, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটে এল দ্রুত। সাবধানে আমাকে সোজা করিয়ে বসিয়ে গুলির আঘাতটি পরীক্ষা করে, তারপর শার্ট ছিঁড়ে ভাঁজ করে আমার ক্ষতস্থানে চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার জন্যে। তার দিকে তাকাতেই সে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, কে গুলি করেছে আপনাকে? আমি?

হ্যাঁ। কী মনে হয়, বেঁচে যাব এযাত্রা?

অন্য কেউ হলে সন্দেহ ছিল, কিন্তু আপনাকে মারবে কে? মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে আপনি রুকুন গ্রহপুঞ্জ ঘুরে এসেছেন—স্বয়ং বিধাতা আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, আমি কি আপনাকে মারতে পারি? নাকি ক্রুগো পারবে?

লুকাস ঝুঁকে পড়ে আমার হাত চেপে ধরে বলল, কিম জুরান, পৃথিবীর মানুষ আর পৃথিবীর সব রবোট্রন যুগ যুগ আপনার কথা মনে রাখবে—কেন জানেন? কারণ—

কারণটা আমার শোনা হল না, লুকাসের হাতে মাথা রেখে আমি জ্ঞান হারালাম।

AMARBOI.COM

পরিশিষ্ট

পরবর্তী ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ক্রুগো কম্পিউটারকে অচল করে দেবার পরপরই আবার নূতন করে সর্বোচ্চ কাউন্সিল তৈরি করা হয়েছে। আগের সর্বোচ্চ কাউন্সিলের দশ জনকেই নাকি ক্রুগো কম্পিউটার মেরে ফেলেছিল। শাসনতন্ত্রে সাহায্য করার জন্যে নূতন একটা কম্পিউটার তৈরি করা হচ্ছে, কে তৈরি করেছে সেটা গোপন, কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে আমি খবর পেয়েছি লুকাস নাকি সেখানকার কর্তাব্যক্তিদের একজন। (আজকাল উচ্চ মহলে আমার অনেক পরিচিত বন্ধুবান্ধব, অনেক গোপন খবর পাই আমি।) রবোট্রনদের আবার মানুষের সাথে পাশাপাশি থাকার সুযোগ দেয়া হয়েছে, তবে এক শর্তে, তারা আর কখনো মানুষের চেহারা নিতে পারবে না, তাদেরকে যন্ত্রের মতো দেখাতে হবে। ভিকির সেটা নিয়ে খুব মন-খারাপ, কিন্তু রবোট্রনদের কারো আপত্তি নেই। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তারা এটা করেছিল, এখন এটা একটা বাড়তি সমস্যার মতো। যেমন সূয়ের কথা ধরা যাক, সে যে-কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ায় সেখানকার সব পুরুষ ছাত্র নাকি তার প্রেমে পড়ে গেছে, সে রবোট্রন জেনেও। একজন নাকি আবার সুয়ের জন্যে ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল, পাগল আর কাকে বলে।

রুকুন গ্রহপুঞ্জে আবার নাকি একটা মহাকাশযান পাঠানো হবে, আমার কাছ থেকে সবকিছু শুনে বিজ্ঞানীদের সাহস অনেক বেড়ে গেছে, কয়েকজন বিজ্ঞানী নাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছেন যাবার জন্যে। তাঁরা কী-একটা যন্ত্র তৈরি করেছেন, সেখানে নাকি নিউট্রিনো ব্যবহার করে রুকুন গ্রহপুঞ্জের সাথে যোগাযোগ করা হবে। মহাকাশযানটি ফিরে আসতে আসতে আরো প্রায় এক বছর, কী হয় দেখার জন্যে আমি খুব কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করে আছি।

নীষা বাচ্চাদের একটা হাসপাতালে ডাক্তারের একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। তার সাথে জীবন, মৃত্যু, ভালবাসা, বেঁচে থাকার সার্থকতা ইত্যাদি বড় বড় জিনিস নিয়ে প্রায়ই আমার সুদীর্ঘ আলাপ হত, ইদানীং ব্যক্তিগত জিনিস নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেছি। তার নাকি বিয়ের কোনো পরিকল্পনা ছিল না, আমারও তাই। (আমাদের দু'জনের অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে।) তবে সারাদিন কাজকর্ম করে সন্ধ্যায় একা শূন্য বাসায় ফিরে আসতে নাকি তার খুব খারাপ লাগে। কথাটা মিথ্যে নয়, তাই অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দু'জনেই বিয়ে করব ঠিক করেছি। একজন আরেকজনকে, সেটাই সুবিধে, দু'জনের জন্যেই।

বিয়ের অনুষ্ঠান হবে খুবই অনাড়ম্বর। খুব ঘনিষ্ঠ ক'জন মানুষ আর রবোট্রন ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না। শহরতলির অ্যাপার্টমেন্টের সেই বুড়োকে বিয়েতে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলাম। সাথে নীষা ছিল, বুড়ো তাকে চিমটি কেটে পরীক্ষা করে দেখল মানুষ কি না, এখনো তার রবোট্রনকে খুব ভয়! (তার চেক নাকি আবার আসতে শুরু করেছে।)

খুব বেশি যদি খুঁতখুঁতে না হই, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে বেঁচে থাকা ব্যাপারটা মোটামুটি খারাপ নয়।।

AMARBOI.COM

ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম

AMARBOI.COM

উৎসর্গ

ইয়াসমীন হক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশুভ গ্রহ

সবাই গোল হয়ে ঘিরে আছে বড় মনিটরটি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গ্রহটির দিকে। অত্যন্ত নিখুঁত বিশ্লেষণ করার উপযোগী মনিটর, নব্বই হাজার কিলোমিটার দূরের আশ্চর্য গ্রহটিকে স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছে। কিম জিবান, দলের ইঞ্জিনিয়ার, মনিটরের বিভিন্ন নবগুলি টিপে টিপে গ্রহটির ছবিটিকে আরো স্পষ্ট করার চেষ্টা করছিল। মনিটরে গ্রহটির আশ্চর্য রংগুলির বেশির ভাগই কৃত্রিম, কিম জিবানের দেয়া, খানিকটা দেখতে সুবিধা হওয়ার জন্যে, এবং খানিকটা ভালো দেখানোর জন্যে। সে ব্যক্তিগত জীবনে শিল্পী, অন্তত নিজে তাই বিশ্বাস করে, তাই কোনো কাজ না থাকলে মনিটরের একঘেয়ে ছবিগুলিতে রং দিয়ে একটু বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করে। মহাকাশযানের নিয়মকানুনের ফাইল খুঁজে দেখলে হয়তো দেখা যাবে, কাজটা ষষ্ঠ মাত্রার বেআইনি কাজ, কিন্তু সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, সবাই একসাথে থাকলে শব্দ করে হাঁচি দেয়াও নাকি ষষ্ঠ মাত্রার বেআইনি কাজ। কিম জিবান আজ খুব সুবিধে করতে পারছে না, গ্রহটিতে এমন একটা কিছু আছে, যে, যতই রং দেয়ার চেষ্টা করুক, কিছুতেই সেটাকে দেখতে ভালো লাগানো যাচ্ছে না। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ঘষতে ঘষতে কিম জিবান পুরো গ্রহটিতে এক পোঁচ নীল রং বুলিয়ে দেয়, নীল রংয়ে যে-কোনো গ্রহকে ভালো দেখায়, কিন্তু এবারে সেটা দিয়েও কোনো লাভ হল না। বড় বড় গোলাকার গর্ত, যেগুলি নাকি খুব ধীরে ধীরে আকার পরিবর্তন করছে, গ্রহটিকে একটি কুৎসিত সরীসৃপের রূপ দিয়েছে, নীল রংয়ের সরীসৃপ এমন কিছু সুদর্শন বস্তু নয়!

লু মহাকাশযান সিসিয়ানের দলপতি। দলপতির দায়িত্ব অন্যদের থেকে বেশি, কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। যখনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সিসিয়ানের মূল কম্পিউটার সিডিসি তাকে সাহায্য করে। সিডিসি চতুর্থ মাত্রার কম্পিউটার, পৃথিবীতে চতুর্থ মাত্রার কম্পিউটারের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। তার স্মৃতিভাণ্ডারে শুধু যে অপরিমেয় তথ্য রয়েছে তাই নয়, প্রয়োজনে যে-কোনো মেমোরি ব্যাংকে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় জিনিস জানার অধিকার এবং ক্ষমতা দুইই তার আছে। সিডিসি ছাড়াও মহাকাশযানে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা রয়েছে, এটি একটি অনুসন্ধানী মহাকাশযান, এখানে সবাই কোনো-না-কোনো ধরনের বিজ্ঞানী। লুকে যখন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করে, যেটা সবাই ভালো মনে করে, সেই সিদ্ধান্তই নেয়া হয়। তবে তিন মাত্রা বা তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে লুকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেটি উচ্চারণ করতে হয়, শুধুমাত্র তার গলার স্বরই সিসিয়ানের চার হাজার ভিন্ন ভিন্ন কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করা আছে, এবং শুধুমাত্র সেই তার গলার স্বর দিয়ে সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করতে পারে। এখন যদি গ্রহটিতে না গিয়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সেটা হবে তিন মাত্রার সিদ্ধান্ত। মহাকাশযান সিসিয়ান ধ্বংস করে দেয়ার সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রথম মাত্রার সিদ্ধান্ত, সেটি আবার সে একা নিতে পারে না, আরো দু'জন বিজ্ঞানীকে একইসাথে নিতে হয়। মহাকাশযানের নিয়মকানুনের কোনো শেষ নেই, দৈনন্দিন জীবনে কখনো তার প্রয়োজন হয় না, তাই সেগুলি নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই।

লু নিজের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে ছিল, যখনই সে কোনো সমস্যায় পড়ে, সে নিজের অজান্তে নিচের ঠোঁট কামড়াতে থাকে। এই মুহূর্তে তাকে কী সমস্যায় ফেলেছে বলা মুশকিল। মাসখানেক আগে একটা মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান প্লুটোনিয়াম[১] আকরিক নিয়ে এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় এই গ্রহটির ছবি তুলেছিল। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গ্রহ–উপগ্রহের কোনো সীমা নেই, কিন্তু মানুষের সংখ্যা সীমিত, কাজেই বিজ্ঞানীরা নিজের চোখে সব গ্রহ–উপগ্রহ দেখে আসতে পারে না। গুরুত্বপূর্ণ হলে বড়জোর একটা স্কাউটশিপ পাঠানো হয়। এই মহাকাশযানটির কথা ভিন্ন, কারণ প্লুটোনিয়াম আকরিক নিয়ে যে-মহাকাশযানটি যাচ্ছিল, সেটি যে-ছবি তুলে এনেছে, সেটি দেখলে মনে হয় গ্রহটির আকার খুব আশ্চর্যভাবে পাল্টে যায়। এ–ধরনের গ্রহ খুব কম, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান আকাদেমির এজন্যে এটার উপর খুব কৌতূহল। লু মহাকাশযান সিসিয়ান নিয়ে একটি অভিযান শেষ করে ফিরে আসছিল, বিজ্ঞান আকাদেমি তাকে একটু ঘুরে এই গ্রহটা পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসতে বলেছে। লু নিজের ঠোঁট কামড়ে বিজ্ঞান আকাদেমির মুণ্ডুপাত করে, কোনো যুক্তি নেই, কিন্তু ওর ভিতরে একটা অশুভ অনুভূতি হচ্ছে, কেন জানি মনে হচ্ছে এই গ্রহটার কাছে যাওয়া একটা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

লু একটু ঝুঁকে পড়ে কিম জিবানকে বলল, কিম, তোমার দেয়া রংগুলি সরাও তো একটু, দেখি জিনিসটা আসলে দেখতে কেমন।

কিম জিবান হাত নেড়ে লুয়ের কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল, আসল জিনিস দেখে কী করবে? এটা দেখ, বেশ দেখাচ্ছে এখন।

বেশ দেখাচ্ছে? সুশান চোখ কপালে তুলে বলল, এটা তোমার কাছে দেখতে বেশ লাগছে? তোমার মাথা পরীক্ষা করানো উচিত, এত কুৎসিত জিনিস আমি আমার জন্মে দেখি নি।

সুশান মহাকাশযানের দু'জন জীববিজ্ঞানীর একজন। তাকে তার জীবনে অসংখ্য কুৎসিত জীবজন্তু এবং কীটপতঙ্গ দেখতে হয়েছে, সে যদি কোনো কিছুকে কুৎসিত দাবি করে, জিনিসটি কুৎসিত তাতে সন্দেহ নেই। সুশানের বয়স বেশি নয়, এই বয়সে সব মেয়ের চেহারাতেই একটা মাধুর্য এসে যায়, সুশানেরও এসেছে। কে জানে সে যদি পৃথিবীতে থাকা আর দশটি মেয়ের মতো চুল লম্বা করে চোখে রং দেয়া শুরু করত, তাকে হয়তো সুন্দরীই বলা হত। মহাকাশযানে চুল লম্বা করা চতুর্থ এবং চোখে রং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়া নাকি পঞ্চম মাত্রার অপরাধ!

লু আবার বলল, কিম, দেখি একবার জিনিসটা।

কিম জিবান অত্যন্ত অনিচ্ছার সাথে তার দেয়া কৃত্রিম রংগুলি সরিয়ে নেয়, সাথে সাথে গ্রহটি তার পুরো বীভৎসতা নিয়ে ফুটে ওঠে। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলতে পারে না, আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস সাবধানে বের করে দিয়ে রু–টেক বলল, চল, ফিরে যাই।

সবাই রু–টেকের দিকে ঘুরে তাকায়। রু–টেক মহাকাশযান সিসিয়ানের একমাত্র রবোট[২], তার কাজকর্মের কোনো জবাবদিহি করতে হয় না, কাজেই এধরনের কথাবার্তা শুধু সে–ই বলতে পারে। রু–টেক সবার দিকে তাকিয়ে বলল, কি, ভুল বললাম কথাটা? জিনিসটা দেখে কপোট্রন[৩] গরম হয়ে উঠছে না? খামোকা ওটার কছে যাওয়ার দরকার কি?

রু–টেকের চমৎকার গলার স্বর তার যান্ত্রিক চেহারা এবং নিষ্পলক চোখের সাথে মোটেই খাপ খায় না, কিন্তু সে দীর্ঘদিন থেকে সিসিয়ানে আছে, আজকাল কেউ সেটি আর আলাদা করে লক্ষ করে না। লু রু–টেকের দিকে ঘুরে বলল, যাওয়ার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমার ইচ্ছাই তো সবকিছু নয়।

তোমার ইচ্ছাই তো সবকিছু, রু–টেক তার সবুজাভ চোখের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে বলল, তুমি আমাদের দলপতি, তুমি শুধু মুখে একবার বলবে, আমরা ফিরে যাব, সিডিসি সাথে সাথে সিসিয়ানকে ঘুরিয়ে নেবে।

তোমার সব কিছুতে ঠাট্টা, কিম জিবান মনিটরে রংগুলি ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, এ রকম একটা ব্যাপার নিয়েও তোমার ঠাট্টা!

ঠাট্টা? ঠাট্টা কোথায় দেখলে?

আমরা কেন ফিরে যাব? একটা কারণ দেখাতে পারবে? কিম জিবান মুখে আলগা একটা গাম্ভীর্য এনে বলল, আমরা আছি এমন একটা মহাকাশযানে, যেটা প্রয়োজন হলে হাইপার ডাইভ[৪] দিতে পারে, সব মিলিয়ে এরকম মহাকাশযান তিরিশটাও আছে কি না সন্দেহ। এটা একটা অনুসন্ধানী মহাকাশযান, অথচ এখানে যে পরিমাণ ফিউসান বোমা[৫] আছে, সেটা দিয়ে একটা ছোটখাট মহাযুদ্ধ লাগিয়ে দেয়া যায়। উপরের ঐ লাল সুইচটাতে তিনবার টোকা দিলে চারটা আক্রমণকারী মহাকাশযান এক ঘন্টার ভিতরে এসে হাজির হয়ে আমাদের উদ্ধার করে নেবে। সিসিয়ানের কোনো ক্ষতি হলে এক মাইক্রোসেকেন্ডের ভিতর আমাদের শরীরকে তিন ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রায় জমিয়ে নিয়ে ক্যাপসুলে ভরে নেবে। উদ্ধারকারীদল এসে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে সার্ভিস সেন্টারে, সেখানে তিন শ' ডাক্তার আর চার হাজার যন্ত্রপাতি মিলে ধীরে ধীরে আমাদের শরীরকে উষ্ণ করে আমাদের রক্ষা করবে। আমরা হচ্ছি মানুষ, মানুষের সংখ্যা বেশি না, তাদের নিয়ে ছেলেখেলা করা হয় না। তুমি রবোট, তুমি এসব বুঝবে না—

রু–টেক কিম জিবানের মাথায় চাঁটি মেরে থামিয়ে দেয়, নাও নাও, বড় বড় বক্তৃতা শুনে কানের সার্কিট পুড়ে যাবার অবস্থা। মানুষ হলেই খালি বড় বড় বক্তৃতা দিতে হয়? আমাকে কখনো দেখেছ বক্তৃতা দিতে?

তাই তো বলছি, কিম জিবান সাবধানে মাথাটা রু–টেকের চাঁটি থেকে বাঁচিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখে বলল, তুমি বুঝবে কি বক্তৃতা দেওয়ার মজা!

সুশান একটু এগিয়ে এসে বলল, ঠাট্টা নয় রু-টেক, তুমি অন্তত একটা যুক্তি দেখাও, কেন আমাদের গ্রহটিতে না গিয়ে ফিরে যাওয়া উচিত।

শুনবে, শুনবে তোমরা?

সবাই মাথা নাড়ে। সুশান তার ছেলেমানুষি চোখ বড় বড় করে বলল, কোনো একটা যুক্তি দেখিয়ে যদি ফিরে যাওয়া যায়, খারাপ কী?

রু-টেক গম্ভীর হয়ে বলল, যুক্তিটা খুব সহজ।

কি?

আমাদের ভালো লাগছে না।

সুশান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ব্যস?

হ্যাঁ।

সে অন্যদের দিকে তাকায়, রু-টেক ঠাট্টা করছে কি না এখনো বুঝতে পারছে না।

পল কুম তার কফির মগে চুমুক দিয়ে বলল, মহাকাশযানের কী একটা ধারার কী একটা অংশে নাকি আছে যে সবার যদি একসাথে কোনো একটা কাজ অপছন্দ হয়—কোনো কারণ ছাড়াই, তাহলে নাকি সেটা না করলে ক্ষতি নেই।

রু-টেক এক হাতে অন্য হাতের উপর আঘাত করে একটা ধাতব শব্দ করে বলল, বললাম না! আমি ভুল বলি কখনো? চল ফিরে যাই।

পল কুম কোমল দৃষ্টিতে রু-টেকের দিকে তাকিয়ে ছিল, সে দলের সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য, জীববিজ্ঞানী দু'জনের আরেকজন। সারাজীবন পশু-পাখির জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছে, তাই মানুষের হাতে তৈরি রু-টেকের আশ্চর্য মানবিক অংশটুকু তাকে এত অভিভূত করে। কোনো একটা অজানা কারণে সবার ভিতরে একটা আশ্চর্য অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছে, রু-টেক সেটা বুঝতে পেরে চেষ্টা করছে সবাইকে ফিরিয়ে নিতে। পল কুম কোমল গলায় বলল, রু।

রু-টেক পলের দিকে তাকিয়ে বলল, কি হল?

আমি যতদূর জানি সেই ধারাটিতে আছে, দলের সব সদস্যের যদি কোনো কারণে অস্বস্তি হয়, তাহলে সেই অভিযান বাতিল করা সম্ভব।

রু-টেক সাথে সাথে বুঝে যায়, পল কুম কী বলতে চাইছে, কিন্তু তবু হাল ছেড়ে না দিয়ে সে শেষ চেষ্টা করে, আমিও তো তাই বলছি, সবার মনে হচ্ছে গ্রহটি অশুভ—

পল কুম বাধা দিয়ে বলল, সবার?

রু-টেক মাথা চুলকানোর ভান করে বলল, হ্যাঁ তাই তো দেখা যাচ্ছে।

পল কুম একটু হেসে বলল, তুমি এখনো ভালো করে মিথ্যা কথা বলা শেখ নি। আমার সাথে সাথে কয়দিন থাক, চোখের পাতি না ফেলে কিভাবে মিথ্যা কথা বলতে হয় শিখিয়ে দেব।

রু-টেক চোখ বারকয়েক সামনে-পিছনে নাড়িয়ে বলল, কেন, আমি আবার কী মিথ্যা কথাটা বললাম?

আমাদের সবার ভিতরে যে-রকম একটা অশুভ ভাবের সৃষ্টি হয়েছে, তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিতরে তা হয় নি। মানুষ লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফল, আমাদের কোনো এক পূর্বপুরুষ কী একটা দেখে ভয় পেয়েছিল, সেটা এখনো আমাদের রক্তের মাঝে রয়ে গেছে, তাই এখনো কিছু কিছু জিনিস কোনো কারণ ছাড়াই আমাদের অশুভ মনে হয়। মানুষ এখনো অন্ধকারকে সহজভাবে নিতে পারে না, গুহাবাসী মানুষের সব বিপদ অন্ধকারে ওত পেতে থাকত বলেই হয়তো। কিন্তু তুমি তো কোনো বিবর্তন দিয়ে আস নি, তোমাকে ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হয়েছে, তুমি কেন গ্রহটাকে অশুভ মনে করবে?

তা ঠিক। রু–টেক হার মানে, সত্যি কথা বলতে কি, গ্রহটাকে দেখতে খারাপ লাগছে, কিন্তু ঠিক অশুভ মনে হচ্ছে না। তার কারণ অশুভ বলতে তোমরা কী বোঝাও, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু খারাপ লাগাটাই কি যথেষ্ট নয়?

পল কুম মাথা নেড়ে বলল, না, যথেষ্ট নয়। কিম জিবান তার দেয়ালে যে–ছবি আঁকে, সেটা দেখতে তোমার আমার সবারই খারাপ লাগে, সুশান সেদিন যে–স্যুপটা রেঁধেছিল, সেটাও যথেষ্ট খারাপ ছিল—

সুশান আর কিম জিবান একসাথে পল কুমকে থামিয়ে দেয়। কিম জিবান গলার স্বরে একটা আহত ভাব ফুটিয়ে বলল, আমার আঁকা ছবি কি এত খারাপ যে, সেটাকে সুশানের স্যুপের সাথে তুলনা করতে হবে?

সবাই একসাথে হেসে ওঠে, সুশানও। কিম জিবানের বিমূর্ত ছবি নিয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু স্যুপটা আসলে এমন কিছু খারাপ হয় নি, ঠাট্টা করার জন্যে বলা হয়।

রু–টেক আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসে, তাহলে কী সিদ্ধান্ত নেয়া হল? আমরা গ্রহটাতে যাচ্ছি?

লু মাথা নাড়ে, হ্যাঁ, যাচ্ছি। তুমিও যদি বলতে গ্রহটাকে অশুভ লাগছে, তাহলে ফিরে যাওয়ার একটা সুযোগ ছিল।

আমাকে কেন টানছ, রু–টেক বলল, আমি একটা যন্ত্র, তোমাদের ঐ ডিটেক্টর বা পাওয়ার জেনারেটরের মতো। পাওয়ার জেনারেটরের বক্তব্যের যদি কোনো মূল্য না থাকে, আমার বক্তব্যের মূল্য থাকবে কেন?

পল কুম রু–টেকের ঘাড়ে থাবা দিয়ে বলল, কেন এখনো খামোকা চেষ্টা করে যাচ্ছ? তুমি জান তুমি দলের একজন, সত্যি কথা বলতে কি পুরো দলে একজন যদি স্বাভাবিক মানুষ থাকে, যার একটু জ্ঞানবুদ্ধি বা রসবোধ আছে, সেটা হচ্ছ তুমি। আর মহাকাশযানের এগার নম্বর ধারার চার নম্বর অংশে স্পষ্ট বলা আছে, মহাকাশযানে যদি ষষ্ঠ মাত্রার কোনো রবোট থাকে, তাহলে তাকে মানুষের সমান মর্যাদা দিয়ে দলের সদস্য হিসেবে নিতে হবে।

রু–টেক চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, আমি দুঃখিত যে, আমার জন্যে তোমাদের সবার গ্রহটাতে যেতে হচ্ছে। কেউ–একজন কি আমাকে আজ রাতের মাঝে শিখিয়ে দিতে পারবে কী ভাবে অশুভ অনুভব করতে হয়?

সুশান বলল, খুব ভালো আছ তুমি, খামোকা এই বয়সে নূতন একটা জিনিস শিখতে যেও না।

রবোটের হিসেবে আমার বয়স খুব বেশি নয় সুশান, আমাদের শৈশব শুরু হয় চল্লিশ বছরের পর।

বেশ, তাহলে অন্তত কৈশোরের জন্যে অপেক্ষা কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রু–টেক কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটু সরে গিয়ে মনিটরটির দিকে তাকায়, নিজের অজান্তে তার সবুজ চোখের ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যেতে থাকে।

পল কুম একটু এগিয়ে লুয়ের কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, লু।

কি?

আমার কি মনে হয় জান?

কি?

এই গ্রহে খুব উন্নত একটা প্রাণী আছে।

লু ঘুরে তাকিয়ে বলল, কেন ওরকম ভাবছ?

পল কুম গলার স্বর নিচু করে বলল, রু–টেক ছাড়া সবার ভিতরে কেমন একটা চাপা ভয় দেখেছ? এরকম অনুভূতি শুধু একটা জীবিত প্রাণী আরেকটা জীবিত প্রাণীর ভিতরে সঞ্চারিত করতে পারে। ব্যাপারটা কীভাবে হয় ঠিক জানা নেই, পৃথিবীতে কয়েক জায়গায় এর উপরে কাজ হচ্ছে। জিনিসটাকে টেলিমরবিজম[৬] বলে। তুমি নিশ্চয়ই আগে লক্ষ করেছ, একজন মানুষের মনে যখন খুব কষ্ট হয়, তখন তার সাথে কথা না বলে, শুধু তার পাশে বসে সেটা অনুভব করা যায়?

লু অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে। মনোবিজ্ঞান সে ভালো বোঝে না, কোনটি বিজ্ঞান আর কোনটি কল্পনা সে এখনো ভালো ধরতে পারে না।

AMARBOI.COM

মহাকাশযান সিসিয়ানের কন্ট্রোল–ঘরটি হঠাৎ দেখলে মনে হবে সেখানে কেউ নেই। যে–মহাকাশযান চালানোর জন্যে প্রায় তিন হাজার ছোট–বড় কম্পিউটার কাজ করে, সেখানে কারো থাকার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তবুও সবসময়েই সেখানে কেউ–না–কেউ থাকে। আজ সেখানে আছে কিম জিবান। কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে আরামদায়ক চেয়ারটাতে সে প্রায় ডুবে আছে, পা তুলে দিয়েছে মনিটরটির উপরে, দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে মনিটরটির দিকে। ঘরটিতে আবছা অন্ধকারে মনিটরটির রঙিন আলো ছাড়া আর কিছু নেই। সবাই বিশ্রাম নিতে গিয়েছে, তাদের মহাকাশযান সিসিয়ানের গ্রহটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতার ভিতরে না আসা পর্যন্ত কারোরই বিশেষ দায়িত্ব নেই। সে যদিও মহাকাশযানের ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু গ্রহ–উপগ্রহ নিয়ে বাড়াবাড়ি কৌতূহল বলে নিজের উৎসাহে কন্ট্রোল–রুমে সময় কাটানোর দায়িত্ব নিয়েছে।

যে–গ্রহটির দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে, সেটির নাম ট্রাইটন। এটি অবশ্যি তার সত্যিকার নাম নয়, গ্রহটির সত্যিকার নাম হচ্ছে একটি বিদঘুটে সংখ্যা। সংখ্যাটি বিদঘুটে হলেও অর্থহীন নয়, প্রথম ছয়টি সংখ্যা দিয়ে তার অবস্থান, এবং পরের চারটি দিয়ে তার আকার–আকৃতি প্রকাশ করা হয়। অনুসন্ধানকারী কোনো দল যখন কোনো গ্রহে অভিযানে বের হয়, তখন তাদেরকে বিদঘুটে সংখ্যা ছাড়াও ব্যবহার করার জন্যে গ্রহটির একটি সাময়িক নাম দিয়ে দেয়া হয়। অভিযান শেষ হবার পর নামটিও শেষ হয়ে যায়, যারা অভিযানে অংশ নেয় তারা হয়তো আরো কিছুদিন মনে রাখে, কিন্তু তার বেশি কখনো কিছু নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই আশ্চর্য গ্রহ ট্রাইটনের দিকে যতই তারা এগিয়ে যাচ্ছে, আর সবার মতন তার ভিতরেও একটা বিতৃষ্ণা এবং চাপা ভয় জেগে উঠছে, কিন্তু সাথে সাথে তার ভিতরে জেগে উঠছে একটা আশ্চর্য কৌতূহল। গ্রহটির যতই কাছে আসছে ততই তার বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছে, গ্রহতত্ত্বের প্রচলিত প্রায় সবগুলি নিয়ম এখানে অচল। প্রথমে ধরা যাক ঘনত্ব, এই আকারের একটা গ্রহের যে পরিমাণ ঘনত্ব থাকা দরকার, ট্রাইটনের ঘনত্ব তার থেকে অনেক কম, পুরো গ্রহটি যেন হালকা তুলো দিয়ে তৈরি। গ্রহ-উপগ্রহে মাধ্যাকর্ষণের জন্যে কেন্দ্রে ঘনত্ব বেশি হয়, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সেটি এই গ্রহের জন্যে সত্যি নয়। গ্রহটি ঘুরছে খুব ধীরে ধীরে, কিন্তু ঘূর্ণনটি কখনোই ঠিক নিয়মিত নয়। অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু গ্রহটির ঘূর্ণন যেন মাঝে মাঝে পুরোপুরি থেমে যাচ্ছে, এ-ধরনের ব্যাপার ঘটতে হলে গ্রহের ভিতরে যে-রকম প্রলয়কাণ্ড ঘটা উচিত, বাইরে থেকে সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। ট্রাইটনের বায়ুমণ্ডল বলতে গেলে নেই, যা আছে সেটি অত্যন্ত বড় বড় পলিমার[৭]। ট্রাইটনের পৃষ্ঠে বড় বড় গোলাকার গর্ত, সিসিয়ানের রিপোর্ট সত্যি হলে সেগুলি শুধু যে আকার পরিবর্তন করছে তাই নয়, ক্রমাগত নাকি স্থানও পরিবর্তন করছে।

কিম জিবান ট্রাইটনের এ-ধরনের ব্যবহারের ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে করে কিছুক্ষণ হল হাল ছেড়ে দিয়েছে। মূল কম্পিউটার সিডিসি এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়, সে তার সুবিশাল মেমোরি ব্যাংকের তথ্য থেকে ট্রাইটনের আশ্চর্য ব্যবহারের কাছাকাছি জিনিসগুলি ক্রমাগত পরীক্ষা করে দেখছে, কোনো কোনোটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে কিম জিবানকে জানাতেও দেরি করছে না। কিন্তু এত অল্প সময়ে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জানা হয়ে গেছে যে, কিম জিবানের আর অবাক হওয়ার ক্ষমতা নেই। সে এখন সম্পূর্ণ অন্যভাবে গ্রহটির আচার-আচরণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে, তার ব্যাখ্যা অবশ্যি কাউকে বলার মতো নয়, কারণ সেগুলি এরকম :

প্রথম ব্যাখ্যা : এটি আসলে কোন গ্রহ নয়, এটি হচ্ছে নরক। ধর্মগ্রন্থে নরকের যে-বর্ণনা থাকে, তার সাথে খুব বেশি মিল নেই, কিন্তু থাকতে হবে সেটা জোর দিয়ে কে বলতে পারে? গোলাকার এই জায়গাটার ভিতরে সব পাপীদের আত্মাকে পুরে রাখা হয়, পাপীদের আর্তনাদ তারা ঠিক শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু সেজন্যে তাদের ভিতরে একটা চাপা ভয় আর অশুভ চিন্তা এসে বাসা বেঁধেছে।

তার এই ব্যাখ্যা যদি সত্যি হয় তা হলে ধরে নিতে হবে একটি স্বর্গও কোথাও আছে এবং সেই স্বর্গের কাছাকাছি গেলে সবার মনে আনন্দ হতে থাকবে। এই অভিযান শেষ হওয়ামাত্রই সে তাহলে স্বর্গের খোঁজে বের হবে। একটি মহাকাশযানে করে সে স্বর্গ খুঁজে বেড়াচ্ছে, জিনিসটা কল্পনা করেই কিম জিবানের হাসি পেয়ে যায়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : এটি আসলে একটি অতিকায় মহাকাশযান, এর ভিতরে রয়েছে আশ্চর্য সব প্রাণী, তাদের কিলবিলে মাকড়সার মতো পা। কেন এদের কিলবিলে মাকড়সার মতো পা, কিম জিবান ব্যাপারটির সদুত্তর দিতে পারে না, মহাকাশের প্রাণীর কথা চিন্তা করলেই কেন জানি তার চোখের সামনে কিলবিলে পা ভেসে ওঠে। ট্রাইটনের উপরে যে গোল গোল গর্ত রয়েছে, তার ভিতর থেকে উঁকি মেরে সেই

কিলবিলে মাকড়সাগুলি তাদের লক্ষ করছে, কাছে হাজির হওয়ামাত্রই সেগুলি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কচকচ করে খেয়ে ফেলবে।

ব্যাখ্যাটির সমস্যা হচ্ছে যে, যদি এই কিলবিলে মাকড়সাগুলি এরকম একটা মহাকাশযান তৈরি করতে পারে, তাহলে অবশ্যি তারা সিসিয়ানের সাথে যোগাযোগ করতে পারত, কিন্তু সেরকম সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, গ্রহটির সাথে কোনোরকম যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি।

তৃতীয় ব্যাখ্যা : সিসিয়ানে যেসব খাবারদাবার আছে ভুল করে তার সাথে কোনো একধরনের মাদকদ্রব্য মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, কাজেই তাদের সবার একইসাথে বিভ্রম হচ্ছে। আসলে ট্রাইটনে আশ্চর্য কিছুই নেই, এটি একটি অত্যন্ত সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রানাইট গ্রহ।

ব্যাখ্যাটির সমস্যা হচ্ছে যে, কম্পিউটারের কখনো বিভ্রম হয় না, কিন্তু সিডিসি যেসব তথ্য জানাচ্ছে সেগুলিও বিভ্রম ছাড়া দেখা সম্ভব নয়।

চতুর্থ ব্যাখ্যা : আসলে সে এখন একটা বাজে স্বপ্ন দেখছে, ঘুম থেকে উঠেই দেখবে সে তার ঘরে ষোড়শ শতাব্দীর একটা রূপকথা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এই ব্যাখ্যাটি কিম জিবানের খুব পছন্দ হয়, সে ঘুমিয়ে নেই ব্যাপারটি প্রমাণ করাও সহজ ব্যাপার নয়। কিম জিবান তাই এতটুকু নড়াচড়া না করে চুপচাপ শুয়ে অপেক্ষা করতে থাকে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার জন্যে। অপেক্ষা করতে করতে সে ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, সে পৃথিবীতে ফিরে গেছে বাচ্চা একটা ছেলে হয়ে, ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছে সে একটি হ্রদের ধারে।

AMARBOI.COM

কেউ–একজন আমার সাথে হাত লাগাও, সিসিয়ানকে অরবিটে নিয়ে আসি, লু ভুরু কুঁচকে কন্ট্রোল প্যানেলের অসংখ্য সুইচ এবং মিটারের দিকে তাকিয়ে থেকে গলা উঁচিয়ে বলল, হাজার কিলোমিটারে আপত্তি আছে কারো?

মাত্র হাজার কিলোমিটার? বেশি কাছে হয়ে গেল না? সুশান ভয়ে ভয়ে বলল, গ্রহটা থেকে যদি কোনো মিসাইল টিসাইল ছেড়ে আমাদের কিছু একটা করে?

রু–টেক হেসে বলল, মিসাইল ছেড়ে যদি আমাদের শেষ করতে চায় তাহলে তুমি হাজার কিলোমিটার দূরেই থাক আর মিলিয়ন কিলোমিটার দূরেই থাক, কোনো রক্ষা নেই।

তা হলে?

তা হলে কি?

এই গ্রহের লোকজন যদি আমাদের কিছু করে?

রু–টেক হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, অকারণে ভয় পেতে তোমার এত উৎসাহ কেন? এই গ্রহে কোনোরকম প্রাণী আছে, তুমি কী ভাবে জান? আর যদি থেকেও থাকে, সেটা উন্নত কোনো প্রাণী হবে কি না তার কি নিশ্চয়তা আছে? আর সত্যিই যদি মিসাইল ছেড়ে আমাদের উড়িয়ে দেওয়ার মতো উন্নত কোনো প্রাণী থাকে, তা হলে কথা নেই বার্তা নেই আমাদের উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে কেন?

কী করবে তাহলে?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে।

পল কুম এক পাশে দাঁড়িয়ে কফিজাতীয় কোনো একটা জিনিস খাচ্ছিল, রু-টেকের কথা শুনে চিন্তিত স্বরে বলল, রু-টেক, তোমার সমস্যা কী জান, তুমি সবসময়ে মানুষের মতো চিন্তা কর। কোনো একটা উন্নত প্রাণীর কথা বললেই তোমার মনে মানুষের চেহারা ফুটে ওঠে। একটা প্রাণী যদি মানুষ থেকে অনেক উন্নত হয় তাহলে হয়তো তারা ইচ্ছা করলেও মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না। পিঁপড়ার তো তুলনামূলকভাবে অনেক বুদ্ধি, মানুষ কখনো পেরেছে পিঁপড়ার সাথে যোগাযোগ করতে? যদি পিঁপড়া সম্পর্কে কিছু জানতে ইচ্ছে হয়, আমরা একটা পিঁপড়া ধরে নিয়ে আসি, ঠিক সেরকম খুব উন্নত প্রাণী যদি আমাদের দেখে যোগাযোগ করার চেষ্টা না করে সোজাসুজি আমাদের ধরে নিয়ে যায় আমি একটুও অবাক হব না।

লু গলা উঁচিয়ে বলল, তোমরা বক্তৃতা থামিয়ে আমার সাথে একটু হাত লাগাবে?

রু-টেক এগিয়ে এসে বলল, আমি বুঝি না, তুমি সিডিসির উপর ভার না দিয়ে নিজে নিজে এসব জিনিস করতে চাও কেন? মহাকাশযানকে অরবিটে আনা কিরকম ঝামেলার কাজ, তুমি জান?

মোটেই কোনো ঝামেলার কাজ না, কম্পিউটার করতে পারে বলেই ছোট-বড় সব কাজ কম্পিউটার দিয়ে করাতে হবে? মাঝেমধ্যে নিজে নিজে কিছু কাজ করতে হয়, তাতে স্নায়ু শক্ত হয়, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন হয়, মাংসপেশীর ব্যায়াম হয়, মন প্রফুল্ল হয়—

থাক থাক, আর বলতে হবে না, কিম জিবান এগিয়ে এসে বলল, সত্যিকার কাজকর্ম নেই বলে কিছু কাজ বের করার চেষ্টা করছ। গ্রহটার যেটুকু দেখেছি, তা দেখে পরিষ্কার বলে দিতে পারি, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আর কাজ বের করতে হবে না, কোনোমতে এখন এখান থেকে জান নিয়ে পালাতে পারলে হয়।

সুশান পাংশু মুখে বলল, কেন, কী হয়েছে গ্রহটার?

নূতন কিছু নয়, কিন্তু যা দেখেছ সেটার কোনো মাথা মুণ্ডু আছে? আমার কাছে তো মনে হচ্ছে পরিষ্কার নরক।

কেন খামোকা ভয় দেখাচ্ছ লোকজনদের, লু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, এটা যদি সেনাবাহিনীর মহাকাশযান হত, তাহলে এতক্ষণে তোমার কোর্ট মার্শাল হয়ে যেত। সুশান, তোমার এত ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, আমাদের এই মহাকাশযান গবেষণার জন্যে হতে পারে, কিন্তু দরকার হলে আমাদের হাজার মাইলের ভিতর যা কিছু আসে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি। কাজেই যতবড় বুদ্ধিমান প্রাণীই আসুক, তোমার কোনো ভয় নেই।

লু মোটেই বাজে কথার মানুষ না, তা ছাড়া একটা অবস্থার গুরুত্ব তার মতো ভালো করে কেউ বুঝতে পারে না, খামোকা তাকে এরকম একটা মহাকাশযানের দলপতি বানানো হয় নি। তাই লুয়ের কথা শুনে সত্যি সত্যি সুশানের চাপা ভয়টা কমে কেমন একটা সাহসের ভাব এসে যায়। সে একটু এগিয়ে মহাকাশযানটাকে কক্ষপথে আটকে ফেলার কাজে লুকে সাহায্য করতে গেল।

মহাকাশযানটিকে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন শুরু করাতে দু'জনের প্রায় দশ

 www.amarboi.com ~

মিনিট সময় লেগে যায়। কাজটা খুব যে সুচারুভাবে করা হল সেরকম বলা যায় না, প্রথমত কক্ষপথ পুরোপুরি বৃত্তাকার না হয়ে খানিকটা উপবৃত্তাকার হয়ে গেল, দ্বিতীয়ত গ্রহ থেকে দূরত্ব পুরোপুরি এক হাজার কিলোমিটার না হয়ে প্রায় এক শ' কিলোমিটার বেশি হয়ে থাকল। কম্পিউটার সিডিসিকে ব্যবহার না করে নিজে নিজে চেষ্টা করলে এর থেকে ভালো অবশ্যি কেউ আশা করে না। তবে আজ একটু বাড়তি মজা হল, যখন সুশান কৃত্রিম মহাকর্ষ তৈরি করতে ভুলে যাওয়ায় মিনিট দুয়েক সবাই খানিকক্ষণ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। পল কুম তার ভেসে বেড়ানো গরম কফিটাকে মগে ঢোকানোর চেষ্টা করছে। দৃশ্যটি এত হাস্যকর যে, এই নিয়ে হাসাহাসি হৈচৈ করে সবার ভিতরের চাপা অশান্তিটা বেশ একটু কমে আসে।

সিসিয়ানকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে এনে সবাই রুটিনবাঁধা কাজে লেগে যায়, নিজেদের দায়িত্ব কম, সিডিসি নিজেই সব করতে পারে; তবু কেউ-না-কেউ সেটা নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হয়ে নেয়। ছয় মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে মহাকাশকেন্দ্রে যোগাযোগ করে সংবাদের আদান-প্রদান হতে থাকে, সিডিসি নতুন পরিবেশের উপযোগী প্রয়োজনীয় খবরাখবর নিয়ে আসতে থাকে। দেখা গেল কাছাকাছি একটা পালসার[৮] রয়েছে, সেটিতে ছয় ঘন্টা পরপর একবার করে বিস্ফোরণ ঘটে। তাদের নতুন অবস্থান এই পালসারটিকে কেন্দ্র করে দেয়া হল। নির্দিষ্ট সময় পরপর পালসারের বিস্ফোরণ ঘটে বলে সেগুলি কেন্দ্রীয় মহাকাশকেন্দ্রে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রয়োজনীয় কাজকর্ম গুছিয়ে নিতে নিতেই লু তাদের প্রথম আলোচনাসভা ডেকে বসে। কোনো আলোচনা শুরু করার আগে তার সবসময়েই একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দেয়ার অভ্যাস, এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। সে এভাবে শুরু করে, সিসিয়ান সময় সকাল সাড়ে নয়টা, আমাদের আলোচনা শুরু হচ্ছে। আলোচনায় দলের সবাই ছাড়াও অংশ নিচ্ছে সিসিয়ানের মূল কম্পিউটার সিডিসি। আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ-কর্মপন্থা। তোমরা সবাই জান যে, আমরা একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় এসে পড়েছি। ট্রাইটন নামের যে-গ্রহটাকে সিসিয়ান এখন পাক খাচ্ছে, সেটার কোনো বিশেষ দোষ আছে, যার জন্যে আমাদের সবার, বিশেষ করে যারা জৈবিক প্রাণী, তাদের ভিতরে একটা আশ্চর্য অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছে। অকারণ অস্বস্তি জিনিসটা ভালো না, আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু কিছু করার নেই। আমাদের দায়িত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এখানে থাকতে হবে। কারো কিছু বলার আছে?

সবারই কিছু-না-কিছু বলার আছে, তবে বিষয়বস্তু মোটামুটি এক। শুরু করল পল কুম, জিজ্ঞেস করল, আমাদের দায়িত্বটা কি?

যদি গ্রহটাতে কোনো প্রাণের বিকাশ না হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের দায়িত্ব খুবই কম, সব রুটিনবাঁধা কাজ। ট্রাইটনের আকার, আকৃতি, ভর, তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডল, ঘনত্ব এইসব জিনিস জেনে যেতে হবে। আমাদের তা হলে কিছু করতে হবে না, সিডিসি এক দিনে শেষ করে ফেলতে পারবে। সিডিসি, ঠিক বলেছি কি না?

সিডিসি বিপ্‌বিপ্‌জাতীয় একটা শব্দ করল, যার অর্থ অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে সবাই জানে এটা সিডিসির সম্মতিসূচক উত্তর।

আর গ্রহটিতে যদি প্রাণের বিকাশ হয়ে থাকে?

লু তার কফির মগে একটা চুমুক দিয়ে বলল, তা হলে আমাদের কাজ একটু

 www.amarboi.com ~

জটিল। প্রথমে প্রাণীটি বুদ্ধিমত্তার কোন স্তরে সেটা বের করতে হবে। বুদ্ধিমত্তায় নিনিষ স্কেলে[৯] যদি আটের কম হয়, তা হলে আমাদের দায়িত্ব মোটামুটি সহজ, সেটিও রুটিনবাঁধা কাজ, সিডিসিকে নিয়ে আমরা এক দিনে শেষ করে দিতে পারব বলে মনে হয়। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা যদি নিনিষ স্কেলে আটের বেশি কিন্তু দশের নিচে হয়, যার অর্থ প্রাণীটি মানুষের সমপর্যায়ের, তা হলে আমাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি, গরুর মতো খেটেও কয়েক সপ্তাহে শেষ করতে পারব কি না সন্দেহ। কারণ তা হলে আমাদের প্রথম পর্যায়ের যোগাযোগ শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ের যোগাযোগ শুরু করতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ের যোগাযোগের দায়িত্ব আমাদের নয়, কেন্দ্রীয় মহাকাশকেন্দ্রের, তবে আমাদের তাদের সাথে সহযোগিতা করতে হবে—

কিম জিবান বাধা দিয়ে বলল, প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায় ব্যাপারগুলি একটু বুঝিয়ে দেবে?

লু পল কুমের দিকে তাকিয়ে বলল, পল, তুমি তো এসব ভালো জান, বুঝিয়ে দেবে সবাইকে?

পল কুম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, এগুলি হচ্ছে ধোঁকাবাজি, বড় বড় হর্তাকর্তাদের কোনো কাজকর্ম নেই বলে এরা বসে বসে নানারকম নিয়মকানুন তৈরি করে।

সিডিসি বিপ্‌বিপ্‌ শব্দ করে আপত্তি করায় সবাই বুঝতে পারে পল কুমের কথাটি অন্তত পঞ্চম মাত্রার অপরাধ! সেটা নিয়ে পল কুমের কোনো মাথাব্যথা দেখা গেল না, সে বলে চলল, সাদা কথায় বলা যায় মানুষের সমপর্যায়ের কোনো প্রাণী পাওয়া গেলে আমাদের দায়িত্ব তাদের সাথে যোগাযোগ করা, সংবাদ, ভাব, ভাষা, জ্ঞানবিজ্ঞান আর কালচার বিনিময় করা। এটা হচ্ছে প্রথম পর্যায়ের যোগাযোগ। দ্বিতীয় পর্যায়ের যোগাযোগ হচ্ছে তাদের সাথে সামনাসামনি দেখা করা, তখন একজন আরেকজনকে ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখতে পারে। আমাদের সেটা শুরু করতে হবে, শুরু করা মানে কী, আমাকে জিজ্ঞেস করো না।

সুশান জিজ্ঞেস করল, তৃতীয় পর্যায়ের যোগাযোগ জিনিসটা কী?

জিনিসটা বেশি সুবিধের না, তখন আমাদের একজনকে ওদের কাছে রেখে ওদের একজনকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে হবে।

সুশান মাথা নেড়ে বলল, আমি থাকছি না এখানে, মরে গেলেও থাকছি না।

লু হেসে বলল, সেসবের অনেক ধরনের নিয়মকানুন আছে সুশান, তুমি না চাইলেই যে তোমাকে থাকতে হবে না, সেটার কোনো গ্যারান্টি নেই। তারা যদি তোমাকে পছন্দ করে ফেলে, তাহলে কী করবে? কি বল সিডিসি?

সিডিসি বিপ্‌বিপ্‌ শব্দ করে সম্মতি কিংবা অসম্মতি জানায়।

সুশান কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়, লু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এই গ্রহে আদৌ কোনো প্রাণী আছে কি না জানার আগে আমাদের যোগাযোগের মাত্রা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই সুশান।

রু-টেক সভ্য মানুষের মতো হাত তুলে কথা বলার অনুমতি চাইল। লু মাথা নেড়ে অনুমতি দিতেই সে বলল, যদি এখানে কোনো প্রাণী পাওয়া যায় যার বুদ্ধিমত্তা নিনিষ স্কেলে দশের বেশি তা হলে আমরা কী করব?

তা হলে আমরা এত বিখ্যাত হয়ে যাব যে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর চিন্তা

AMARBOI.COM

করতে হবে না।

ভবিষ্যৎ নিয়ে নাহয় চিন্তা করতে হবে না, কিন্তু এখন কী করব?

লু এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, এখনো কোথাও মানুষ থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী পাওয়া যায় নি, তাই ব্যাপারটি ঠিক পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা নেই। সিডিসি চেষ্টা করলে হয়তো আমাদের বলতে পারবে।

রু-টেক সিডিসিকে জিজ্ঞেস করল, সিডিসি, তুমি জান?

সিডিসি দু' বার বিপ্‌বিপ্‌ শব্দ করে একটা কর্কশ ধাতব আওয়াজ করে। লু হাতের কাছের একটা ছোট সুইচ টিপে দিতেই সিডিসির একঘেয়ে যান্ত্রিক গলার ধাতব আওয়াজ শোনা যায়, মহামান্য লু, আপনাদের আলোচনায় আমার অংশ নেওয়ার সার্থকতা শতকরা নিরানব্বই দশমিক তিন ভাগ কমে যায়, যখন আপনারা আমাকে কথা বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন। মহামান্য রু-টেক যে প্রশ্ন করেছেন, তার সরাসরি কোনো উত্তর নেই। তবে নিরাপত্তাসংক্রান্ত দু শ' নব্বইয়ের চতুর্থ ধারা এবং জ্ঞানবিকাশের সাতাত্তর দশমিক এক ধারার চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে আমি বলতে পারি যে, আপনারা যদি কখনো এমন কোনো প্রাণীর সম্মুখীন হন, যার বুদ্ধিমত্তা নিনিষ স্কেলে দশের বেশি, আপনাদের প্রথম সুযোগ পাওয়ামাত্র তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে হবে। এই প্রসঙ্গে মহামান্য পল কুম কেন্দ্রীয় মহাকাশকেন্দ্র সম্পর্কে যে অসৌজন্যমূলক উক্তি করেছিলেন—

লু সুইচ টিপে সিডিসির কথা বন্ধ করে দেয়। পল কুম নীষার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, নীষা, এই সিডিসির এত মাথামোটা কেন? সবসময়ে মহামান্য মহামান্য করে কথা বলে যে গায়ে একেবারে জ্বালা ধরে যায়।

নীষা দলের দ্বিতীয় মেয়েটি, বয়স সুশান থেকে এক দুই বছর বেশি হতে পারে। সে স্বল্পভাষী, তাই প্রথম পরিচয়ে লোকজন তাকে অমিশুক বলে সন্দেহ করে। সিসিয়ানের যাবতীয় কম্পিউটারের দায়িত্ব তার উপর। মহাকাশযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটি, নীষা খুব দক্ষতার সাথে সেটা করে এসেছে। পল কুমের প্রশ্ন শুনে সে একটু হেসে বলল, সিডিসি হচ্ছে বর্তমানকালের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী কম্পিউটার, সে ইচ্ছা করলে এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে যে তোমরা কাজকর্ম ফেলে দিনরাত শুধু তার কথাই শুনতে চাইবে। তাকে ইচ্ছা করে এভাবে কথা বলার জন্যে প্রোগ্রাম করা হয়েছে, দেখা গেছে তা হলে তার ক্ষমতা সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। তোমরা যদি চাও তা হলে আমি প্রোগ্রামটি পাল্টে দিতে পারি, তৃতীয় মাত্রার বেআইনি কাজ, কিন্তু—

লু হাত নেড়ে বলল, ওসব ঝামেলায় যেও না, শুধু শুধু সময় নষ্ট।

সুশান হাসি চেপে বলল, কোনটা সময় নষ্ট, কথা বলা, না কথা শোনা?

সবাই হেসে ওঠে, তার মাঝে কিম জিবান জিজ্ঞেস করে, লু, তুমি যে কথার মাঝখানে সিডিসির মুখের উপর সুইচ টিপে বন্ধ করে দাও, সে রাগটাগ করে না তো আবার, পুরো সিসিয়ানের নিরাপত্তা ওর উপর!

রু-টেক শব্দ করে হেসে উত্তর দেয়, না কিম, ভয় পেয়ো না, রাগটাগ এসব হচ্ছে তোমাদের এবং আমার মতো একজন দু'জন সৌভাগ্যবান রবোটের বিলাসিতা, কম্পিউটারের ওসব নেই। মাঝে মাঝে অবাক হয়তো হয়, কিন্তু রাগ কখনোই হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

রবোট, মানবিক অনুভূতি এবং যান্ত্রিক উৎকর্ষ নিয়ে একটা আলোচনা শুরু হতে গিয়ে থেমে গেল, আজকে সবারই তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আলোচনা করার আছে। সবাই লু'য়ের দিকে তাকাল, সে তার কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, কাজেই বুঝতেই পারছ, আমাদের কাজ সবচেয়ে সহজ হয় যদি দেখা যায় এই গ্রহে কোনো প্রাণের বিকাশ হয় নি, আর যদি হয়েও থাকে সেটার বুদ্ধিমত্তা বোধহয় খুব নিম্নশ্রেণীর।

রু-টেক হেসে বলল, কিংবা কোনো প্রাণী, যেটার বুদ্ধিমত্তা আমাদের থেকে বেশি।

লু হেসে বলল, হ্যাঁ, তাহলে আমাদের দায়িত্ব পালিয়ে যাওয়া।

কিম জিবান বাঁকা করে হেসে বলল, যদি তারা আমাদের পালাতে দেয়।

সেটা তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও, লু হেসে বলল, পালিয়ে যেতে আমার কোনো জুড়ি নেই।

সুশান বলল, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে, আর বুদ্ধিমত্তা সম্ভবত আমাদের সমপর্যায়ের।

পল কুম বলল, সেটা নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আর কিছুক্ষণেই সেটা সন্দেহাতীতভাবে জানা যাবে।

লু সবার দিকে তাকিয়ে বলল, পরের চব্বিশ ঘণ্টায় তোমাদের দায়িত্ব আমাদের সব কাজ শেষ করে ফেলা। কার কি করতে হবে তোমরা আমার থেকে ভালো জান, আমি তবু একবার বলে নিই, কাগজপত্র ঠিক রাখার জন্যে। সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পল কুম আর সুশানের, তোমাদের বের করতে হবে এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে ঠিক কী ধরনের প্রাণ। সিডিসি এখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে খবরাখবর নেয়া শুরু করে দিয়েছে, রুটিন কাজ সে করে ফেলতে পারবে, কিন্তু শেষ কথাটি আসবে তোমাদের দু' জনের মুখ থেকে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি ট্রাইটনে কোনো স্কাউটশিপ নামাতে না হয়। স্কাউটশিপ নামানো মানে হচ্ছে এক হাজার নূতন ঝামেলা। ট্রাইটনে যদি বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তাহলে নীষা, তোমাকে ওদের বুদ্ধিমত্তার স্তর বের করতে হবে। তুমি আগে থেকেই কাজ শুরু করে দিতে পার, বুদ্ধিমত্তার সেই বিশেষ বিশেষ কোড পাঠানো এবং ঐ ধরনের কাজ, তুমি নিশ্চয়ই আমার থেকে ভালো জান কী করতে হবে। কিম, তোমার যেহেতু গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে এত কৌতূহল, তাড়াতাড়ি বের করে ফেল এটা কী ধরনের গ্রহ, তা হলে তোমাকে অন্য কাজে লাগানো যাবে। রু-টেক, তুমি আমাদের অস্ত্রাগারটা একবার ঘুরে এস। বোমাটোমা যদি ছুঁড়তে হয় আমরা যেন আগে থেকে প্রস্তুত থাকি।

কিম জিবান জিজ্ঞেস করল, সবার কাজ তো ভাগ করে দিলে, তোমার নিজের জন্যে কি রেখেছ?

লু চোখ পাকিয়ে বলল, আমি দলপতি না? দলপতিরা আবার কাজ করে নাকি?

ঠাট্টা না, সত্যি বল না।

তোমরা হাসবে না তো?

সুশান বলল, না শুনে কথা দিই কেমন করে?

হাইপারডাইভের ম্যানুয়েলটা পড়ব, আর দেখব সার্কিটটা ঠিক আছে কি না।

কেউ হাসল না, হাসির কথাও না। হাইপারডাইভ ব্যাপারটা হাসি-তামাশার ব্যাপার না, এখনো সেটা পুরোপুরি মানুষের আওতায় নেই, মাঝে মাঝেই অসম্পূর্ণ হাইপারডাইভের গুজব শোনা যায়, মহাকাশযান তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে নাকি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। কোথায় যায় সেই মহাকাশযানগুলি, কে জানে।

সুশান শুকনো মুখে বলল, সত্যি আমাদের হাইপারডাইভ দিতে হতে পারে?

কিছুই আগে থেকে বলা যায় না সুশান, কিন্তু প্রস্তুত থাকতে দোষ কি?

বুদ্ধিমান প্রাণী?

সবাই আবার বড় মনিটরটি ঘিরে গোল হয়ে বসেছে। সবার চোখেমুখেই একই সাথে ক্লান্তি এবং ভয়-ধরানো একটা উত্তেজনার ভাব। লু হাইপারডাইভের ম্যানুয়েল দেখে সিডিসির সাথে একদান দাবা খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু তার চেহারায় ঘুম থেকে ওঠা সতেজ ভাবটা নেই। তার ঘুমটা কেটেছে কাটা কাটা দুঃস্বপ্ন দেখে, এখনো মাথায় সেগুলি ঘুরপাক খাচ্ছে। কফির কাপে চুমুক দিয়ে সে তার ছোট বক্তৃতা দিয়ে তার আলোচনা শুরু করে, সকালে তোমাদের কাজকর্ম ভাগ করে দেয়া হয়েছিল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনেকটুকু গুছিয়ে নিয়েছ। কি বল?

উপস্থিত কাউকে খুব উৎসাহী দেখা গেল না। লু একটু হেসে বলল, ঠিক আছে, সবার রিপোর্ট শোনা যাক। পল কুম আর সুশান তোমাদের দিয়ে শুরু করি।

পল কুম হাত উল্টে বলল, কি বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা যত রকম পরীক্ষা করা সম্ভব সব করেছি, এবং পরীক্ষাগুলির ফল থেকে একটামাত্র সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব, সেটা হচ্ছে, এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে। কিন্তু মুশকিল কী, জান?

কী?

অনেক চেষ্টা করেও কোনো প্রাণী বা তাদের আবাসস্থল কোনো কিছুর দেখা পেলাম না। এক হতে পারে খুব নিচুস্তরের প্রাণী, আকারেও খুব ছোট, মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা সম্ভব না, সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে একটা স্কাউটশিপ পাঠিয়ে ট্রাইটনের উপর থেকে কিছু মাটি তুলে আনতে হবে। কিন্তু সেটা করার প্রয়োজন আছে কি নেই সে সিদ্ধান্ত তোমাকে নিতে হবে।

লু সুশানের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কিছু বলার আছে?

না। পল কুম ঠিকই বলেছে যে, আমরা প্রাণীগুলিকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে প্রাণীগুলি সবসময়েই আমাদের লক্ষ করছে।

লু জোর করে একটু হাসির ভান করে বলল, আপাতত যেটার কোনো প্রমাণ নেই, সেটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। তোমরা যদি জোর দিয়ে বলতে পার এখানে কোনো উন্নত প্রাণী নেই, আমরা তাহলে ঘন্টা দুয়েকের মাঝে ফিরে যেতে পারি।

সুশান মাথা নেড়ে বলল, না লু, জোর দিয়ে কিছুই বলতে পারব না, সবগুলি পরীক্ষা বলেছে, এখানে কোনো-না-কোনো ধরনের প্রাণী আছে। কিন্তু সেটি কত উন্নত

আমরা জানি না।

লু চিন্তিতভাবে কিম জিবানকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কিছু বলার আছে কিম?

অনেক কিছু। কোথা থেকে শুরু করব?

অনেক কিছু বলার সময় নেই, তোমাকে অল্প কথায় সারতে হবে।

কিম তার হাতের একতাড়া কাগজ দেখিয়ে বলল, এইসব অল্প কথায় সারব?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে! কিম একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, এটা একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক গ্রহ। কোনোভাবেই এটাকে কোনো দলে ফেলা গেল না।

কেন ফেলা গেল না সেটা অন্তত বল।

প্রথমত গ্রহটা প্রচণ্ড পরিবর্তনশীল, ঘনত্ব খুবই খাপছাড়া ধরনের, প্রথমে ভেবেছিলাম ভিতরটা বুঝি ফাঁপা, যেখানে কিলবিলে মাকড়সার মতো প্রাণী থাকে। পরে দেখা গেল তা ঠিক নয়, কিন্তু ঘনত্বটার পরিবর্তন হচ্ছে। এরকম গ্রহ টিকে থাকা সম্ভব নয়, বিধ্বস্ত হয়ে যাবার কথা; কিন্তু এটা শুধু যে টিকে আছে তাই নয়, বেশ ভালোরকম টিকে আছে। তা ছাড়া উপরে যে গোল গোল গর্তগুলি আছে, সেগুলি ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করছে। দেখে মনে হয়—কিম জিবান হঠাৎ থেমে গেল।

কি?

না, কিছু না।

শুনি।

দেখে মনে হয়, ওগুলি বড় বড় চোখ, আর ড্যাবড্যাব করে সেই চোখ দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিম জিবান ভেবেছিল তার কথা শুনে সবাই উচ্চস্বরে হেসে উঠবে, কিন্তু কেউ হাসল না, রু-টেক পর্যন্ত কেমন একটা গম্ভীর মুখে বসে রইল। লু শুধু জোর করে হাসার চেষ্টা করে বলল, ভালোই বলেছ! পুরো গ্রহটা হচ্ছে কারো মাথা, আর গর্তগুলি হচ্ছে তার চোখ। যাই হোক, এবারে নীষা বল তুমি কি দেখলে। গ্রহটাতে কি কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে?

নীষা এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, বলা যায়, নেই।

লু নীষার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি মনে হয় পুরোপুরি নিশ্চিত নও।

না, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। আজ সারাদিন আমি কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর চিহ্ন পাই নি, তবে—

তবে কি?

একবার—মাত্র একবার একটা সিগন্যাল ফিরে এসেছে।

লু মাথা নেড়ে বলল, বুঝিয়ে বল, একটু বুঝিয়ে বল।

বুঝিয়ে বলার কিছু নেই, আমি প্রায় নিঃসন্দেহ যে, ব্যাপারটা একটা যান্ত্রিক গোলযোগ। কারণ যেটা ঘটেছে সেটা ঘটা সম্ভব না।

কি হয়েছে?

তোমরা সবাই জান বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধান পাওয়ার অনেকগুলি কোড আছে, কোথাও বুদ্ধিমান প্রাণী পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেখানে এই কোড পাঠানো হয়।

আশা করা হয় প্রাণীগুলি সেই কোডটার মর্মোদ্ধার করে তার উত্তর পাঠাবে। প্রাণীগুলি কত বুদ্ধিমান তার উপর নির্ভর করে তারা কত তাড়াতাড়ি সেটার মর্মোদ্ধার করতে পারবে। আমি আজ সারাদিন চেষ্টা করে গেছি, যতগুলি কোড আমার কাছে ছিল একটা একটা করে পাঠিয়ে গেছি, কিন্তু কোনো উত্তর পাই নি। কিন্তু ঘন্টা দুয়েক আগে একটা কোড পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসেছে।

মানে?

একটা খুব জটিল সিগন্যাল আছে, প্রাইম সংখ্যা^{10} দিয়ে তৈরী। সেই সিগন্যালটা হঠাৎ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসেছে।

রু-টেক জিজ্ঞেস করল, তুমি বলছ সিগন্যালটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী সেটার মর্মোদ্ধার করে ফেরত পাঠিয়েছে!

নীষা একটু ইতস্তত করে বলল, তা হলে আমাদের এই মুহূর্তে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত।

কেন?

কারণ এই কোডটার মর্মোদ্ধার করা অসম্ভব, এর জন্যে প্রায় সবগুলি প্রাইম সংখ্যা জানতে হয়। সবগুলি প্রাইম সংখ্যা কারো পক্ষে জানা সম্ভব না, মানুষ এখনো জানে না। কাজেই আমার ধারণা, কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী এটা ফেরত পাঠায় নি, এটা নিজে থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসেছে। সিগন্যাল ড্রাইভারের ই. এম. টি. চীপের বায়াস যদি বারো মাইক্রোভোল্টের কম হয়, এ ধরনের ব্যাপার হতে পারে।

একটা তর্ক শুরু হতে যাচ্ছিল, লু হাত তুলে থামিয়ে দেয়। রু-টেকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমাদের নিরাপত্তার সবকিছু ঠিক আছে?

হ্যাঁ। ট্রাইটন থেকে কোনো কিছু যদি আমাদের দিকে উঠে আসে সাথে সাথে সেটা শেষ করে দেয়া সম্ভব। সেকেন্ডে একটা করেও যদি পাঠানো হয়, এক ঘন্টা পর্যন্ত আটকে রাখতে পারব। মহাকাশকেন্দ্রে খবর দেয়া আছে, সেই এক ঘন্টার ভিতরে পুরো দল চলে আসবে। আমি রিজার্ভ ট্যাংকে জ্বালানি সরিয়ে রেখেছি, দরকার হলে তুমি হাইপারডাইভ দিতে পারবে। সবকিছু বিবেচনা করে দেখলে আমার ধারণা, ভৌতিক কিছু না ঘটলে আমরা পুরোপুরি নিরাপদ। সিডিসিরও তাই ধারণা।

চমৎকার। লু তার কফিতে চুমুক দিয়ে চুপ করে যায়।

সুশান খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, লু।

কি?

আমাদের দায়িত্ব কি শেষ? আমরা কি এখন ফিরে যাব?

আমার খুব ইচ্ছে করছে ফিরে যেতে, কিন্তু একটা-কিছু সিদ্ধান্তে না পৌঁছে ফিরে যাই কেমন করে? বিজ্ঞান আকাদেমিকে গিয়ে কী বলব?

কী করবে তাহলে?

একটা স্কাউটশিপ পাঠাতে হবে।

সুশান একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে যায়। সে মনে মনে এই ভয়টাই করছিল, হয়তো লু আরো একদিন থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা করবে।

লু রু-টেকের দিকে তাকিয়ে বলল, রু, তুমি একটা স্কাউটশিপ পাঠানোর ব্যবস্থা

কর, ঘন্টাখানেকের মাঝে যেন রওনা দিয়ে দেয়, খুব ধীরে ধীরে নামাবে, গ্রহে কোনো প্রাণী থাকলে তারা যেন দেখে ভয় না পায়। নীষা, তুমি কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কোড দিয়ে দাও সবগুলি যেন বলতে থাকে, আমরা বন্ধুত্ব চাই, শান্তি চাই বা এই ধরনের কোনো একটা গালভরা কথা। স্কাউটশিপটা ট্রাইটনে নেমে যেন ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে খানিকটা করে মাটি তুলে আনে। ফিরে এসে স্কাউটশিপটাকে সিসিয়ানে সোজাসুজি চলে আসতে দিও না, শ'খানেক কিলোমিটার দূরে অপেক্ষা করাবে। সুশান আর পল কুম, তোমরা ঠিক কর স্কাউটশিপের ভিতরে আর কি দেয়া যায়, ট্রাইটনে নেমে ঠিক কী ধরনের পরীক্ষা করা দরকার।

সুশান ভয়ে ভয়ে বলল, কেউ কি যাবে এই স্কাউটশিপে করে?

লু হেসে বলল, আরে না! মাথা খারাপ তোমার? মানুষ হচ্ছে অমূল্য সম্পদ, তাদের নিয়ে কখনো ঝুঁকি নেয়া যায় না।

লু টেবিল থেকে উঠে গিয়ে স্বচ্ছ জানালার পাশে দাঁড়াল। গ্রহটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, কিম, তুমি ঠিকই বলেছ, গ্রহটাকে দেখলে মনে হয় এটা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কী বীভৎস ব্যাপার!

সবাই ঘুরে লু'য়ের দিকে তাকায়, কেউ কিছু বলে না। লু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আমি তোমাদের ভয় দেখাতে চাচ্ছি না, মনে হল তাই বললাম। একটু থেমে যোগ করল, আমি আমার ঘরে সিডিসির সাথে দাবাটা শেষ করে ফেলি, কিছু দরকার হলে আমায় ডেকো।

AMARBOI.COM

বুঝলে সিডিসি, দাবা হয়তো তুমি মন্দ খেল না, কখনো তোমাকে আমি হারাতে পারি নি, লু হাতিটা এক ঘর পিছিয়ে এনে বলল, কিন্তু তোমার সাথে দাবা খেলে আরাম নেই। তুমি বড় চিন্তা করে খেল, কখনো ভুল কর না।

উত্তরে বিপ্‌বিপ্‌ শব্দ করে সিডিসি কিছু একটা বলল, লু সেটা বুঝতে পারল না, বোঝার খুব–একটা ইচ্ছে আছে সে–রকম মনেও হল না। মন্ত্রীটা এগিয়ে দেবে কি না চিন্তা করতে করতে বলল, তোমার সাথে কথা বলে মজা আছে, আমার কিছু শুনতে হয় না, শুধু বলে গেলেই হয়।

আবার বিপ্‌বিপ্‌ করে একটা শব্দ হল।

দাবা খেলা কে আবিষ্কার করেছিল জান?

বিপ্‌বিপ্‌।

নিশ্চয়ই জান, কম্পিউটার জানে না এরকম জিনিস কি কিছু আছে? এক দেশে থাকত এক রাজা আর এক মন্ত্রী। সেই মন্ত্রী ভদ্রলোক দাবা খেলা আবিষ্কার করে রাজাকে সেটা উপহার দিলেন। রাজা এক দান দাবা খেলে ভারি খুশি, মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী পুরস্কার চাও? মন্ত্রী বললেন, কিছু চাই না মহারাজা—লু একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, জান নাকি গল্পটা?

উত্তরে সিডিসি একটা ধাতব শব্দ করে, যার অর্থ বোঝা মুশকিল। লু সেটা অগ্রাহ্য করে বলল, বলি তবু গল্পটা, ভালো গল্প দু' বার শুনলে ক্ষতি নেই কিছু। মন্ত্রী বললেন, কিছু আমি চাই না মহারাজা, রাজা তবু কিছু একটা উপহার দেবেনই,

রাজাদের খেয়াল, বুঝতেই পারছ। মন্ত্রী আর কী করবেন, বললেন, ঠিক আছে, কিছু-একটা যদি দিতেই চান, তা হলে এই দাবার ছকটা ভরে কিছু শস্যদানা দিন। প্রথমটায় একটা, দ্বিতীয়টাতে দুইটা, তৃতীয়টাতে চারটা, চতুর্থটাতে আটটা এভাবে।

সিডিসি ক্রমাগত বিপ্‌বিপ্‌ করে শব্দ করতে থাকে। লু থেমে একনজর তাকিয়ে বলল, এই জন্যে কম্পিউটারদের গল্প বলে মজা নেই, সবকিছু আগেই বুঝে ফেলে। একজন মানুষকে যদি বলতাম, সে যখন জানত দাবার ছক এভাবে শস্যদানা দিয়ে ভরতে সারা পৃথিবীর কয়েক শ' বছরের শস্য লেগে যাবে, সে কী অবাক হত! তা হলে গল্পটাও আরো অনেক গুছিয়ে বলা যেত, রাজা কীভাবে তখন তখনি একজনকে বললেন এক বস্তা শস্য নিয়ে আসতে, কীভাবে সেই শস্যদানা গুনে গুনে রাখা হল—লু কথা থামিয়ে হঠাৎ দাবার ছকের দিকে তাকায়, সিডিসি তাকে একটা কঠিন প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করছে। মন্ত্রীটাকে দু'ঘর পিছিয়ে এনে সে গভীর চিন্তায় ডুবে যায়।

প্রায় আধ ঘন্টা পর সিডিসি হঠাৎ শব্দ করতে থাকে, দাবা খেলায় কোনো একটা চাল যদি তার পছন্দ হয়, তা হলে সেটার উপর বক্তৃতা দেয়ার তার একটা বাতিক আছে, লু অবশ্যি কখনো তাকে সে সুযোগ দেয় না, এবারেও দিল না। সিডিসি খানিকক্ষণ চেষ্টা করে তার ঘোড়াটাকে দু'ঘর পিছিয়ে আনে।

লু চোখ কপালে তুলে বলল, তুমি ঘোড়াটাকে ওখানে দিচ্ছ মানে? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? কম্পিউটার হয়ে জন্ম হয়েছে বলে মনে কর যা ইচ্ছে চাল দিয়ে বেঁচে যাবে তুমি?

বিপ্‌ বিপ্‌ বিপ্‌।

ধেত্তেরি তোমার বিপ্‌ বিপ্‌ বিপ্‌, ঘোড়াটা খেয়ে খেলা শেষ করতে গিয়ে থেমে গেল লু। সিডিসি তো ভুল করার পাত্র নয়, তা হলে কি ভুল চাল চেলে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে? হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে সিডিসিকে কথা বলার সুযোগ করে দিল লু।

AMARBOI.COM

ধন্যবাদ মহামান্য লু, আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আমি ভুল চালটি কি জন্যে দিয়েছি বুঝতে আপনার চার সেকেন্ডের বেশি সময় লেগেছে। একটি জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, আপনার কিছু করার নেই, কিন্তু তবু আপনি হয়তো জানতে চাইবেন।

কি হয়েছে?

সিসিয়ান থেকে যে-স্কাউটশিপটি ট্রাইটনে পাঠানো হয়েছে, সেটার গতিবেগ দ্রুত কমে যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব গত নয় মিনিটে আটাত্তর দশমিক চার ভাগ বেড়ে গিয়েছে। কারণ এখনো জানা নেই। বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এরকম থাকলে স্কাউটশিপটি বিধ্বস্ত হয়ে যাবার কথা, আমি স্কাউটশিপের গতিপথ পরিবর্তন করে দিচ্ছি যেন স্কাউটশিপটি ধ্বংস না হয়। এ প্রসঙ্গে আপনাকে স্মরণ করানো যায় যে, তেইশ শত বাইশ সালে বৃহস্পতি গ্রহের কাছে—

লু সুইচ টিপে সিডিসির কথা বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় যে সিডিসির মতো কম্পিউটার সন্দেহ করছে যে স্কাউটশিপটা বিধ্বস্ত হতে পারে। গত শতাব্দীতে হলে একটা কথা ছিল, কিন্তু এই শতাব্দীতে? লু দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে কন্ট্রোল-রুমের দিকে হাঁটতে থাকে। একটা-কিছু গণ্ডগোল আছে

কোথাও।

লু'কে দেখে কিম জিবান এগিয়ে আসে, লু, তুমি জান কী হয়েছে?

লু মাথা নাড়ে, হ্যাঁ, সিডিসি বলেছে আমাকে।

কি বলেছে?

ট্রাইটনে বাতাসের ঘনত্ব বেড়ে গিয়েছে বলে স্কাউটশিপটা বিধ্বস্ত হতে পারে।

বিধ্বস্ত হতে পারে নয়, হয়ে গেছে।

লু চমকে উঠে কিম জিবানের দিকে তাকায়, তার নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না, কী বললে তুমি!

বলেছি, স্কাউটশিপটা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

সিডিসি কি করল, বাঁচাতে পারল না? একটা বাড়তি থ্রাস্ট দিয়ে প্রজেকশান অ্যাঙ্গেল সাত ডিগ্রী বাড়িয়ে দিত—

চেষ্টা করেছিল, পারে নি। কিম জিবান নিঃশ্বাস আটকে রেখে বলল, লু চল আমরা পালাই, হাইপারডাইভ দিয়ে দিই।

সত্যি দিতে চাও?

হ্যাঁ।

তারপর বিজ্ঞান আকাদেমিকে কী বলবে? তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে, যে, এখানে আমাদের বিপদের আশঙ্কা আছে?

দেখছ না স্কাউটশিপটা কী ভাবে শেষ করে দিল? আমাদের শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে?

স্কাউটশিপ কোনো প্রাণী ধ্বংস করে নি কিম, বাতাসের ঘনত্ব হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে গতিবেগ কমে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। কোনো প্রাণী একটা গ্রহের বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন করতে পারে না।

লু আর কিম জিবানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অন্যেরা ওদের কথা শুনছিল, রু-টেক একটু এগিয়ে এসে বলল, আমি একটা কথা বলি লু?

বল।

বাতাসের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় গতিবেগ কমে গেলে সেটার দায়িত্ব নেয়া খুবই সহজ ব্যাপার, স্কাউটশিপের ছোট একটা কম্পিউটারই সেটার দায়িত্ব নিতে পারত, কিন্তু স্কাউটশিপের দায়িত্বে ছিল সিডিসির মতো একটা কম্পিউটার, এর পরও যখন স্কাউটশিপ ধ্বংস হয়েছে, তার মানে ব্যাপারটি এত সহজ নয়।

লু মাথা নেড়ে বলল, আমি তোমার সাথে পুরোপুরি একমত রু-টেক, ব্যাপারটি সহজ নয়, কিন্তু তার মানে এই না যে ব্যাপারটি একটা বুদ্ধিমান প্রাণীর কাজ। একটা প্রাণী কী ভাবে কয়েক হাজার মাইল এলাকায় বাতাসের ঘনত্ব পাল্টাতে পারে?

পল কুম বলল, তুমি ধরে নিচ্ছ বুদ্ধিমান প্রাণী হলেই সেটার ক্ষমতা তোমার দেখা অন্য বুদ্ধিমান প্রাণীর সমান হবে, তার বেশি হতে পারে না?

লু একটু হেসে বলল, কি হতে পারে আর কি হতে পারে না সেটা কেউ জানে না। তাই আমাদের যখন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যেটুকু জানি সেটার উপরেই নিতে হয়, আমাকে ধরে নিতে হবে বুদ্ধিমান প্রাণী যদি থাকে সেটা আর অন্য দশটা বুদ্ধিমান প্রাণীর মতো হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল কুম আপত্তি করে কী–একটা বলতে যাচ্ছিল, লু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, পল, তুমি যেটা বলতে যাচ্ছ, সেটা কি তর্কের খাতিরে বলছ, না সত্যি বিশ্বাস কর?

পল একটু থতমত খেয়ে থেমে যায়, এক মুহূর্ত কী–একটা ভেবে হাসতে হাসতে বলল, তুমি ঠিকই ধরেছ, তর্ক করার জন্যে বলছিলাম।

তাহলে এখন বলো না, এমনিতেই আমার একটা–কিছু সিদ্ধান্ত নিতে বারটা বেজে যাচ্ছে।

সুশান ভয়ে ভয়ে বলল, তাহলে কী ঠিক করা হল, এটা কি একটা দুর্ঘটনা, নাকি উন্নত কোনো প্রাণীর কাজ?

লু গম্ভীর গলায় বলল, আপাততঃ ধরে নেয়া হচ্ছে এটা একটা দুর্ঘটনা। আমি এখন সিডিসিকে নিয়ে বসব, স্কাউটশিপ থেকে পাঠানো সব ছবি, খবরাখবর বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এর পিছনে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর হাত আছে কি না।

সবকিছু বিশ্লেষণ করতে অনেকক্ষণ লেগে গেল। স্কাউটশিপটি ধ্বংস হয়েছে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের তারতম্যের জন্যে, সিডিসি কেন সেটাকে বাঁচাতে পারে নি, তার কারণ খুব সহজ। স্কাউটশিপে কোনো একটা নির্দেশ পাঠালে সেটাকে কার্যকর করতে যতক্ষণ সময় লাগে, বাতাসের ঘনত্ব তার আগেই পাল্টে যায়। লু অনেক চেষ্টা করল স্কাউটশিপ থেকে পাঠানো ছবিগুলিতে কোথাও কোন ধরনের মহাকাশযান বা কোন ধরনের প্রাণী দেখা যায় কি না দেখতে, কিন্তু কিছু দেখা গেল না।

লু যখন সিডিসির সাথে বসে খবরাখবরগুলি বিশ্লেষণ করছিল, অন্যেরা তখন কন্ট্রোল–রুমে বসে। সুশান বসেছে জানালার পাশে, একটু পরপর গ্রহটাকে দেখছে, ভিতরে কেমন একটা আতঙ্ক, শুধু মনে হচ্ছে গ্রহটা থেকে হঠাৎ করে কোনো একটা প্রাণী ছুটে আসবে তাদের দিকে। নীষা তার ব্যক্তিগত কম্পিউটারে টুকটুক করে কিছু সংখ্যা প্রবেশ করাচ্ছিল, নূতন একটা ভাষা তৈরি করছে সে, তার কোনো কাজ না থাকলেই সে একটা নূতন ভাষা তৈরি করা শুরু করে। এটা তার চৌদ্দ নম্বর ভাষা। কিম জিবান পুরনো একটা হাসির বই বের করে পড়ে শোনানোর চেষ্টা করছে, কারো শোনার ইচ্ছা আছে বলে মনে হয় না, হাসির জায়গাগুলিতে ভদ্রতা করেও কেউ হাসছে না, কিন্তু কিম জিবানের সেটা নিয়েও কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হল না। হঠাৎ সিডিসি একটা জরুরি সংকেত দিল। সিডিসি কথা বলার চেষ্টা করলে কেউ তাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না, কিন্তু জরুরি সংকেত হচ্ছে অন্য ব্যাপার, সবাই তখন একসাথে ছুটে আসে। কি হয়েছে সবার আগে বুঝতে পারে রু–টেক, রবোট বলে সে মাইক্রোসেকেন্ডে সিডিসির সাথে খবর বিনিময় করতে পারে। পল কুম রু–টেককে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে রু–টেক?

রু–টেক এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, সিডিসি বলছে যে স্কাউটশিপটা ট্রাইটনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেটা—

সেটা কী?

সেটা নাকি আবার উঠে আসছে।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। সবচেয়ে আগে কথা বলল সুশান, কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, ভিতরে কেউ আছে? কোনো প্রাণী?

না। ভিতরে নূতন কিছু নেই, আমরা যা পাঠিয়েছিলাম তাই আছে। রু–টেক একটু

থেমে যোগ করল, সিডিসি তাই বলছে।

ঘটনার চমকটা কাটতেই সিসিয়ানে প্রথমবার একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে যায়। সবাই মিলে স্কাউটশিপের নানারকম খবরাখবর নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিম জিবান বড় মনিটরটিতে স্কাউটশিপের ছবিটাকে ফুটিয়ে তোলে, ঠিক যেভাবে পাঠানো হয়েছিল সেভাবেই ফিরে আসছে, দু'পাশের অত্যন্ত ভঙ্গুর দু'টি এন্টেনা পর্যন্ত আগের মতো আছে। লু ঠোঁট কামড়ে বলল, ট্রাজেক্টরিটা বের কর।

কিম জিবান কয়েকটা বোতাম টিপে মনিটরে কী–একটা পড়ে বলল, চার দশমিক দুই, এপিসেন্টার তিন ডিগ্রী।

আমরা যে–পথে পাঠিয়েছিলাম সেই পথে ফিরে আসছে?

হ্যাঁ।

লু এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, স্কাউটশিপটা আসলে ধ্বংস হয় নি, আমাদের ধোঁকা দেয়া হয়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলে না। পল কুম চিন্তিত মুখে বলল, সিডিসি, তোমার কী ধারণা?

সিডিসি জানাল, স্কাউটশিপ থেকে যেসব তথ্য এসেছে সেটা থেকে প্রায় নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় স্কাউটশিপটি ধ্বংস হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু সেটি আবার উঠে আসছে, তার মানে আসলে সেটি ধ্বংস হয় নি, স্কাউটশিপে পাঠানো খবরাখবরে কোনো একটা জটিল ত্রুটি ছিল, সেটি কী, সিডিসি এখন বের করার চেষ্টা করছে।

লু গম্ভীর গলায় বলল, পল আর সুশান, তোমরা দু'জন স্কাউটশিপটিকে যা করতে পাঠিয়েছিলে সেটা করা হয়েছে কি না দেখ। আর জিবান, তুমি হাইপারডাইভের সার্কিটটা চালু করে রাখ।

সুশান আর পল কুম নিজেদের ল্যাবরেটরিতে বসে স্কাউটশিপে পাঠানো বিভিন্ন জৈবিক পদার্থগুলি পরীক্ষা করতে থাকে। স্কাউটশিপের কম্পিউটারে কোনো সমস্যা নেই, নির্দেশ পাঠানোমাত্রই সেটি সিডিসির সাহায্য নিয়ে তার কাজ শুরু করে দেয়। একটি একটি করে সবগুলি জিনিস পরীক্ষা করে দেখা হয়, কোনোটাতে কোনো অস্বাভাবিক কিছু নেই। যখন মাত্র দু'টি জিনিস পরীক্ষা করা বাকি তখন হঠাৎ পল কুমের ভুরু কুঁচকে ওঠে। সুশান এগিয়ে এসে বলল, কি হয়েছে পল?

এই দেখ।

সুশান নিরীহ গোছের একটা গ্রাফের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, এটা তো আমরা পাঠাই নি।

না।

কোথা থেকে এল?

আসার কথা নয়। প্রচণ্ড রেডিয়েশনে মিউটেশান হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আর কোথাও তো মিউটিশানের চিহ্ন নেই।

তা হলে?

এক হতে পারে কোনো ধরনের আঘাতে ক্রোমোস্কোপের[১১] ক্যালিব্রেশান যদি নষ্ট হয়ে থাকে।

লু'য়ের সাথে কথা বলবে?

ডাক।

লু'য়ের সাথে সাথে পুরো দলটি হাজির হয়। লু একটু শঙ্কিত স্বরে বলল, কিছু হয়েছে পল?

বলা মুশকিল, সবগুলি পরীক্ষার ফল বলছে গ্রহটিতে উন্নত কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই। শুধু একটি পরীক্ষা বলছে অন্যরকম।

সেইটি কী বলছে?

পল অস্বস্তির সাথে মাথা চুলকে বলল, ঠিক করে বলা মুশকিল। অন্যান্য জিনিসের সাথে আমরা খানিকটা জটিল জৈবিক পদার্থ পাঠিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল যদি কোনো উন্নত প্রাণীর কাছাকাছি আসে, সেটাতে একটা কম্পন ধরা পড়বে, মেগাসাইকেল রেঞ্জের কম্পন।

দেখা গেছে?

না, কিন্তু অন্য একটা ব্যাপার হয়েছে।

কি?

জৈবিক পদার্থটি পাল্টে গেছে, আমরা যেটা পাঠিয়েছিলাম সেটা আর নেই, অন্য একটা কিছু আছে।

লু ভুরু কুঁচকে বলল, অন্য কিছু?

হ্যাঁ।

অন্য কিছু কোথা থেকে আসবে?

আসার কথা নয়, সেটাই হচ্ছে ধাঁধা। এক হতে পারে শক্ত কোনো আঘাতে ক্যালিব্রেশানটি নষ্ট হয়ে গেছে, খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু পুরোপুরি অসম্ভব নয়। টিনিটিতে একবার হয়েছিল বলে শুনেছিলাম।

অন্য কোনোভাবে হতে পারে?

না। সুশান, তুমি কী বল?

সুশান চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে, এক হতে পারে যে কেউ এসে এটা পাল্টে দিয়ে গেছে। কিন্তু কে এসে স্কাউটশিপে ঢুকে এরকম একটা কাজ করবে যে আর কোথাও তার কোনো চিহ্ন থাকবে না?

লু চিন্তিতভাবে নিজের ঠোঁট কামড়াতে থাকে। গ্রহটির সবকিছু কেমন ধোঁয়াটে। ছোট ছোট অনেকগুলি ঘটনা ঘটল, যার প্রত্যেকটা রহস্যময়, মনে হয় অসাধারণ কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর কাজ, কিন্তু সবগুলিতেই কেমন জানি সন্দেহ রয়ে গেছে, সবগুলিকে মনে হয় ছোট ছোট দুর্ঘটনা।

লু সুশান আর পল কুমের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখ, তোমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পার কি না। যদি প্রমাণ করতে পার এখানে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী নেই, তা হলে আমরা চলে যেতে পারি, আবার যদি প্রমাণ করতে পার এখানে অসাধারণ বুদ্ধিমান কোনো প্রাণী আছে, তা হলেও আমরা চলে যেতে পারি।

স্কাউটশিপটা ফেরত এসে সিসিয়ান থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে এসে দাঁড়ায়, সে-রকমই কথা ছিল। ট্রাইটন থেকে যেসব জিনিসপত্র তুলে এনেছে সেগুলি আরো সুচারুভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে, সিলিকনের নানা ধরনের অণু, বিচিত্র ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলিমার, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নেই। পল কুম নানাভাবে তার সবকিছু পরীক্ষা করে দেখল, কিন্তু সেই অস্বাভাবিক জৈবিক পদার্থটির কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না।

ঘন্টা দুয়েক পর পল কুম একটা আশ্চর্য প্রস্তাব করে, সে স্কাউটশিপে গিয়ে জৈবিক পদার্থটি পরীক্ষা করে দেখে আসতে চায়।

লু এক কথায় তার প্রস্তাবটি নাকচ করে দেয়, নিরাপত্তার খাতিরে সে কাউকে সিসিয়ানের বাইরে যেতে দেবে না। পল বেশি অবাক হল না, লু তাকে যেতে দেবে, সে নিজেও তা বিশ্বাস করে নি।

সিসিয়ানে আরো ঘন্টা দুয়েক সময় কেটে গেল, কোনো কিছুই ঠিক করে জানা নেই, সবার ভিতরে একটা অনিশ্চয়তা, একটা অস্থিরতা। সবার নিরাপত্তার ব্যবস্থা ঠিক রেখে কী ভাবে গ্রহটা নিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, লু বা অন্য কেউ ভেবে পাচ্ছিল না।

পল আরো কয়েকবার লুয়ের কাছে স্কাউটশিপে যাবার অনুমতি চাইল, কিন্তু কোনো লাভ হল না। পলের যুক্তি কিন্তু খুব সহজ, সিসিয়ানে থেকে তারা সন্দেহাতীতভাবে ট্রাইটনে কোনো উন্নত প্রাণীর চিহ্ন পায় নি। একটি মাত্র প্রমাণ থাকতে পারে স্কাউটশিপে, যদি সেটি সত্যি দেখা যায় তা হলে বুঝতে হবে এখানে সত্যি অসাধারণ বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, তা হলে সবাই ফিরে যেতে পারে। আবার যদি দেখা যায় জিনিসটি একটা যান্ত্রিক গোলযোগ, তাহলেও তারা ফিরে যেতে পারে, কারণ গ্রহটিতে বুদ্ধিমান বা বোকা কোনো প্রাণই নেই। জিনিসটি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার একটিমাত্র উপায়, সিসিয়ান থেকে ক্রুকোনাস[১২] নামে একটি জটিল যন্ত্র নিয়ে স্কাউটশিপে যাওয়া। স্কাউটশিপে ক্রুকোনাস দেয়া হয় নি, কারণ এটার প্রয়োজন হতে পারে, কারো জানা ছিল না।

লু রাজি না হলে স্কাউটশিপে যাওয়া সম্ভব না, তবু পল কুম সিডিসিকে এরকম একটা যাত্রায় বিপদের ঝুঁকির একটা পরিমাপ করতে আদেশ দিল। সিডিসির হিসেব দেখে লু শেষ পর্যন্ত একটু নরম হয়, কারণ সিডিসির মতে স্কাউটশিপের ভিতর আর সিসিয়ানের ভিতরে বিপদের ঝুঁকি প্রায় এক সমান। স্কাউটশিপে যাওয়া ব্যাপারটিতে খানিকটা অনিশ্চয়তা আছে, কিন্তু তার পরিমাণ এখানে এক দিন বেশি থাকার অনিশ্চয়তা থেকে কম। কাজেই পল কুম স্কাউটশিপে গিয়ে যদি সবাইকে নিয়ে এক দিন আগে ফিরে যেতে পারে, সেটা সবার জন্যে ভালো। তবে সিডিসি জানিয়ে দিল, পল যে পোশাক পরে যাবে সেটা সে সিসিয়ানে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। সেটি এমন কিছু জটিল ব্যাপার নয়, রুটিনমতো অনেকবার করা হয়েছে।

লু শেষ পর্যন্ত রাজি হল, কিন্তু পলকে সে একা যেতে অনুমতি দিল না, রু-টেককে সাথে নিয়ে যেতে হবে। কাজটি একজনের কাজ, কিন্তু রু-টেক থাকবে নিরাপত্তার জন্যে। রু-টেক রবোট বলে তার কর্মক্ষমতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষ থেকে অনেক গুণ বেশি।

পল কুম বিশেষ পোশাক পরে সাথে সাথে প্রস্তুত হয়ে নেয়, রু-টেকের বিশেষ পোশাকের প্রয়োজন নেই, কয়েকটা সুইচ টিপে সে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। পল কুমের পিঠে ক্রুকোনাস নামের সেই বিশেষ যন্ত্রটি, রু-টেকের পিঠে একটা অ্যাটমিক ব্লাস্টার[১৩]; প্রয়োজনে সেটা দিয়ে একটা ছোটখাটো উপগ্রহ উড়িয়ে দেয়া যায়।

দু'জন হাতে দু'টি ছোট জেট নিয়ে বিশেষ ডকে এসে হাজির হয়। উপর থেকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে তাদের আলাদা করে ফেলার আগে কিম জিবান পল কুম আর রু–টেকের হাত ধরে একবার ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, সাবধানে থেকো।

পল কুম হেসে বলল, সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ করো না।

কয়েক মিনিটের ভিতরে ডকের সব বাতাস সরিয়ে নিয়ে তাদেরকে একটা গোল গর্ত দিয়ে সিসিয়ানের বাইরে বের করে দেয়া হয়। দু' জন তাদের জেটগুলি চালু করে দিতেই মাথায় লাল আলো জ্বলতে এবং নিভতে শুরু করে। সিসিয়ানের সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখে পল কুম আর রু–টেক দ্রুত তাদের থেকে সরে যাচ্ছে।

তখনো কেউ জানত না তাদের পরবর্তী দুঃস্বপ্নের সেটা ছিল শুরু।

দুঃস্বপ্নের শুরু

রু,

কি?

ভয় লাগছে তোমার?

লাগছিল, তাই ভয়ের সুইচটা একটু আগে বন্ধ করে দিয়েছি।

পল কুম জেটটা দিয়ে সাবধানে ডানদিকে ঘুরিয়ে বলল, কী মজা তোমাদের, যখন খুশি যেটা ইচ্ছা বন্ধ করে দিতে পার।

তোমার তাই ধারণা? চাও আমার মতো হতে?

অন্য কোনো সময় চাই নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খারাপ না।

কেন জানি রু–টেকের একটু মন–খারাপ হয়ে গেল, সাবধানে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে সে। মানুষের এত কাছাকাছি হয়েও সে কখনো মানুষ হতে পারবে না।

ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে, ওদের মাথার উপর থেকে যে–আলো বের হচ্ছে, সেটা অন্ধকারকে দূর করতে পারে না, অন্ধকার দূর করতে হলে আলোকে ছড়িয়ে পড়তে হয়, এখানে বায়ুমণ্ডল নেই বলে আলো ছড়ানোর কোনো উপায় নেই। ওদের পিঠে জেট[১৪] গুলি লাগানো, হাতে কন্ট্রোল, গতিবেগ বাড়িয়ে শ'খানেক কিলোমিটার করে নিয়েছে, স্কাউটশিপের কাছে গিয়ে কমিয়ে নেবে। রু–টেক এসব কাজ খুব ভালো পারে, লু তাই ওকে পলের সাথে পাঠিয়েছে। নিচে গ্রহটিকে দেখা যাচ্ছে, ঈষৎ লালাভ একটা গ্রহ, গোল গোল গর্তের মতো জিনিসগুলি নাকি আস্তে আস্তে নড়ছে, খালিচোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু ব্যাপারটি চিন্তা করেই কেমন একটা অস্বস্তি হয়। পল কুমের মনে হল, কিম জিবান ঠিকই বলেছিল যে ওগুলি চোখ, ঐ চোখ দিয়ে কেউ ওদের দেখছে।

কিছুক্ষণের মাঝেই ওরা স্কাউটশিপের কাছে পৌঁছে গেল, সিসিয়ানের সবাই ওদের সাথে যোগাযোগ রাখছে। রু–টেকের ঘাড়ের উপর যে–ক্যামেরাটি আছে, সেটা দিয়ে সবাই সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। পল কুম আর রু–টেক মাঝে মাঝে একটি দু'টি কথা বলে আশ্বস্ত রাখছে সবাইকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কাউটশিপের দরজা খুলে প্রথমে ভিতরে ঢোকে ব্রু-টেক, পিছু পিছু পল কুম। ভরশূন্য পরিবেশে দু'জনে একটা পাক খেয়ে নেয়, তারপর ঘুরেফিরে একপলক দেখে নেয় চারদিক, ব্রু-টেক সাবধানে ডান হাতে অ্যাটমিক ব্লাস্টারটা ধরে রাখে, কে জানে, কোনো কোনায় যদি ঘাপটি মেরে বসে থাকে কোনো-এক বীভৎস প্রাণী! কোথাও কিছু নেই, ঠিক যেভাবে ওরা স্কাউটশিপটিকে পাঠিয়েছিল, সেভাবেই এটা ফিরে এসেছে। পল কুম তার ঘাড় থেকে ক্রুকোনাসটা নামিয়ে বসাতে শুরু করে, ছোট একটা পরীক্ষা করতে হবে, দশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। ব্রু-টেকের কিছু করার নেই, সে পলকে নিরিবিলি কাজ করতে দিয়ে অ্যাটমিক ব্লাস্টারটা হাতে নিয়ে ভেসে বেড়াতে থাকে। মিনিট দুয়েক সে স্কাউটশিপকে লক্ষ করে প্রথমে সাধারণ আলোতে, তারপর আলট্রাভায়োলেটে[১৫], তারপর কী মনে করে এক্স-রে দিয়ে। কিছু-একটা অস্বাভাবিক জিনিস আছে এখানে, ব্রু-টেক ঠিক বুঝতে পারে না সেটা কি। দেয়ালের কাছে এগিয়ে যায় সে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে দেয়ালটিকে, এলুমিনিয়াম, ক্যাডমিয়াম আর সিলঝিনিয়ামের[১৬] সঙ্কর ধাতুর তৈরি, চকচকে মসৃণ দেয়াল। আরো মিনিট খানেক লাগে ওর বুঝতে, ঠিক কী জিনিসটি অস্বাভাবিক, এই স্কাউটশিপের দেয়ালে কোনো ত্রুটি নেই। মহাকাশ গবেষণাগারে তৈরি হয় এগুলি, তৈরি করার পর গামা-রে[১৭] দিয়ে দেয়ালের ত্রুটি পরীক্ষা করা হয়, শতকরা তিন ভাগ পর্যন্ত ত্রুটি সহ্য করা হয়, এর বেশি হলে পুরোটা আবার নূতন করে তৈরি করতে হয়। সাধারণ মানুষের চোখে এসব কখনো ধরা পড়ে না, কিন্তু ব্রু-টেক তার এক্স-রে সংবেদনশীল চোখ ব্যবহার করে ইচ্ছে করলে ধরতে পারে। ব্রু-টেকের কাছে খুব অস্বাভাবিক লাগে যে এটার দেয়ালে কোনো ত্রুটি নেই। সিসিয়ানের দেয়ালে পর্যন্ত নানারকম ত্রুটি আছে, আর এটি তো সাধারণ একটা স্কাউটশিপ। কোথায় তৈরি হয়েছে এই স্কাউটশিপ?

ব্রু-টেক গলা নামিয়ে লুয়ের সাথে যোগাযোগ করল, লু।

কি?

একটা অস্বাভাবিক জিনিস দেখছি এখানে।

কি?

স্কাউটশিপের দেয়ালটাতে কোনো ত্রুটি নেই, শতকরা তিন ভাগ পর্যন্ত ত্রুটি থাকার কথা।

লু এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, তার মানে কি?

আমি জানি না, দাঁড়াও, সিডিসিকে জিজ্ঞেস করি। ব্রু-টেক নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সিতে যোগাযোগ করে সিডিসির কাছ থেকে উত্তর জেনে নিল সাথে সাথেই।

লু জিজ্ঞেস করল, কী বলল সিডিসি?

ব্রু-টেক একটু দ্বিধা করে বলতে, আশ্চর্য একটা কথা বলেছে সিডিসি। সত্যিই কি এটা সম্ভব?

লু আবার জিজ্ঞেস করে, ব্রু-টেক, সিডিসি কী বলেছে?

সিডিসি বলেছে, এর দেয়ালে যদি কোনো ত্রুটি না থাকে, তার অর্থ হচ্ছে এটা মহাকাশ গবেষণাগারে তৈরি হয় নি, অন্য কোথাও তৈরি হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় তৈরি হয়েছে?

সিডিসির ধারণা, এটা ট্রাইটনে তৈরি হয়েছে।

লু চমকে উঠে বলল, কী বললে তুমি?

রু-টেক ইতস্তত করে বলল, সিডিসির ধারণা, আমরা যে স্কাউটশিপটা পাঠিয়েছিলাম, সেটা সত্যি ট্রাইটনে ধ্বংস হয়েছিল, ট্রাইটন থেকে তখন আরেকটা স্কাউটশিপ তৈরি করে পাঠানো হয়েছে।

লু কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারে না, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সিডিসির ধারণা সত্যি কি না তুমি প্রমাণ করতে পারবে?

মনে হয় পারব। দাঁড়াও, একটা স্ক্রু খুলে আনি, কাছে থেকে দেখলেই বোঝা যাবে এটা কী ভাবে তৈরি হয়েছে।

লুয়ের সাথে সাথে সিসিয়ানে সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে।

পল কুমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। সে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখছে, সুশানের সাথে সে স্কাউটশিপে যে-জৈবিক পদার্থটি পাঠিয়েছিল, সেটি এখানে নেই, তার বদলে আছে অন্য একটি জৈবিক পদার্থ, প্রায় আগেরটার মতোই কিন্তু একটু অন্যরকম, দেখে মনে হয় কেউ তাদের পাঠানো পদার্থটি তৈরি করার চেষ্টা করেছে, ঠিক করে পারে নি, কিন্তু যেটুকু পেরেছে, সেটা অবিশ্বাস্য। মানুষ তার পুরো জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে হাজার বছর চেষ্টা করে এখনো একটা ক্ষুদ্র ভাইরাস পর্যন্ত তৈরি করতে পারে নি, কিন্তু কোনো-এক অসাধারণ বুদ্ধিমান প্রাণী কয়েক ঘন্টার মাঝে এ-ধরনের একটা জৈবিক পদার্থ তৈরি করে ফেলেছে। পল কুমের নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না, আরেকবার দেখে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে সে তার ক্রুকোনাসের উপর ঝুঁকে পড়ছিল, ঠিক তখন সে লু'য়ের গলা শুনতে পায়, পল কুম আর রু-টেক।

কি হল?

লু প্রায় মেপে মেপে বলল, তোমরা দু'জন এই মুহূর্তে স্কাউটশিপ থেকে বেরিয়ে এস। আবার বলছি, তোমরা দু'জন এই মুহূর্তে স্কাউটশিপ থেকে বেরিয়ে এস। বাকি দায়িত্ব আমাদের।

কেন? পল কুমের গলা কেঁপে যায়, কী হয়েছে?

এইমাত্র ট্রাইটন থেকে আরেকটা স্কাউটশিপ বেরিয়ে এসেছে।

ভয়ের একটা শীতল স্রোত পল কুমের মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে যায়, নিজেকে জোর করে শান্ত রাখে তবু। মূল্যবান ক্রুকোনাসকে নিয়ে যাবে কি না এক মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে সে এটাকে ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। রু-টেক প্রায় অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে একটা ছোট স্ক্রু পরীক্ষা করছিল, পল কুমকে দাঁড়াতে দেখে সে পিছু পিছু এগিয়ে যায়। দরজাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলতে হয়, একজন মানুষের জন্যে বেশ শক্ত, পল সরে গিয়ে রু-টেককে খুলতে দেয়, প্রয়োজনে রু-টেক অমানুষিক জোর খাটাতে পারে।

রু-টেক দরজার হাতলটা স্পর্শ করে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ পল কুমের দিকে তাকাল। পল অবাক হয়ে বলল, কি হল, রু-টেক, দরজা খুলছ না কেন?

রু-টেক আস্তে আস্তে বলল, আমরা আটকা পড়ে গেছি, পল।

কী বলছ তুমি। পল ধাক্কা দিয়ে রু-টেককে সরিয়ে দিয়ে দরজার হাতল ধরে

ঝাঁকুনি দেয়, সেটা পাথরের মতো শক্ত।

ব্লু-টেক প্রায় ফিসফিস করে বলল, স্কাউটশিপের দরজাটা কম্পিউটার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, এই মুহূর্তে সেটা কোনভাবে জ্যাম করে দেয়া হয়েছে। কম্বিনেশান পাল্টে যাচ্ছে আমি শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট, এটা আর কেউ খুলতে পারবে না।

তা হলে?

সরে দাঁড়াও, অ্যাটমিক ব্লাস্টার দিয়ে ভেঙে ফেলি।

পল কুম সরে দাঁড়াতেই ব্লু-টেক দক্ষ হাতে অ্যাটমিক ব্লাস্টারটা তুলে নেয়, দরজার দিকে তাক করে ট্রিগার টানতে গিয়ে থেমে যায় রু-টেক, ওর হাত কাঁপতে থাকে থরথর করে।

কি হল?

কথা বলতে পারে না ব্লু-টেক, অনেক কষ্টে বলে, পা-পারছি না।

কি পারছ না?

কপোট্রনে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে, বার দশমিক আট মেগাহার্টজ তরঙ্গ, সব এলোমেলো করে দিচ্ছে আমার, ব্লু-টেকের গলার স্বর ভেঙে আসে, পল তু-তুমি চেষ্টা কর, আ-আ-আমি আর পারলাম না। ব্লু-টেকের গলা থেকে হঠাৎ আশ্চর্য ধাতব যান্ত্রিক শব্দ বের হতে থাকে। হাত থেকে অ্যাটমিক ব্লাস্টার প্রায় ছুটে যাচ্ছিল, পল কুম কোনোভাবে ধরে নেয়। ব্লু-টেকের জ্ঞানহীন দেহ স্কাউটশিপে ঘুরপাক খেতে থাকে। পল কুম কাঁপা গলায় ডাকল, লু—লু—

শুনতে পাচ্ছি পল। পল কুমের শুনতে অসুবিধে হয়, হেডফোনে ঝিঁঝি পোকার মতো আওয়াজ।

ব্লু-টেক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, বার মেগাহার্টজ-এর তরঙ্গ—

বুঝতে পারছি। ওর কপোট্রনের মূল তরঙ্গ এটা, এটা দিয়ে ওকে অচল করে দেয়া যায়। আমি বলছি তোমাকে, কী করতে হবে।

লু, আমার ভয় করছে, খুব ভয় করছে।

আমি বুঝতে পারছি পল। কিন্তু তুমি মাথা ঠাণ্ডা রাখ, তোমাকে আমি বলছি, কী করতে হবে।

লু, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে স্কাউটশিপের, আমরা—

আমি জানি পল, তোমাকে দরজা ভেঙে বের হতে হবে।

লু, আমি কখনো অ্যাটমিক ব্লাস্টার ব্যবহার করি নি, কী করতে হবে আমি জানি না।

আমি তোমাকে বলছি, তুমি সোজা করে ধর অ্যাটমিক ব্লাস্টারটা, উপরে যে-সুইচটা আছে, টেনে একেবারে সোজা তোমার কাছে নিয়ে এস।

এই সময় হঠাৎ পুরো স্কাউটশিপটা প্রচণ্ডভাবে কেঁপে ওঠে, পল ছিটকে পড়ে একবার ঘুরপাক খেয়ে কোনোমতে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে লু?

যে-স্কাউটশিপটা ট্রাইটন থেকে উঠে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল, কিম জিবান সেটা উড়িয়ে দিয়েছে। তোমার সময় নেই পল, তুমি এসব জানতে চেয়ো না, তোমাকে যা বলছি তাই কর।

কিন্তু এই স্কাউটশিপটা কেন কেঁপে উঠল?

শক ওয়েভ[১৮]।

শক ওয়েভ কোথেকে আসবে, বায়ুমণ্ডল নেই তো শক ওয়েভ কোথেকে আসবে?

পল, তোমাদের স্কাউটশিপটা ঘিরে একটা বায়ুমণ্ডল তৈরি হচ্ছে, তোমাদের স্কাউটশিপটা ট্রাইটনে পড়ে যেতে চেষ্টা করছে। তোমার সময় নেই, তুমি যদি দশ সেকেন্ডের ভিতর দরজা ভেঙে বের হয়ে আসতে না পার, তোমাকে আমরা বাঁচাতে পারব না। কাজেই তুমি এখন আর কিছু জানতে চেয়ো না, তোমাকে যা বলা হয় করার চেষ্টা কর। আর নয় সেকেন্ড।

ব্লু-টেক? ব্লু-টেকের কী হবে?

ব্লু-টেকের পুরো মেমোরি সিডিসিতে পাঠানো হয়ে গেছে, সে যদি ধ্বংসও হয়ে যায় তাকে আবার তৈরি করা যাবে। তাকে নিয়ে চিন্তা করো না। পল, আর আট সেকেন্ড। তুমি আর কথা বলবে না, শুধু শুনবে। ব্লাস্টারটা উঁচু করে ধর।

ধরেছি।

সুইচটাকে টেনে নাও নিজের দিকে।

নিয়েছি।

ট্রিগারে ডান হাত দাও। এখনি টানবে না, বাম হাত দিয়ে সবগুলি নব বাইরের দিকে ঠেলে দাও।

দিয়েছি।

চমৎকার! আর ছয় সেকেন্ড। উপরের লাল লিভারটি টেনে মিটারটি লক্ষ কর, মিটারের কাঁটাটি নড়ছে?

হ্যাঁ, নড়ছে।

বেশ! কাঁটাটি যখন সাত আর আটের ভিতরে আসবে ট্রিগারটি টেনে দেবে। তোমার জেটের কন্ট্রোল এখন আমাদের হাতে, ব্লাস্টার চালানোর সাথে সাথে ভাঙা দরজা দিয়ে তোমাকে টেনে বের করে আনা হবে। প্রচণ্ড আঘাত পাবে তুমি, সম্ভবত জ্ঞান থাকবে না তোমার, কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। তিন সেকেন্ড আছে আর, কাঁটাটা কোথায় এখন পল?

ছয়ের কাছে, সাতে চলে আসছে।

চমৎকার পল, বেঁচে গেলে তুমি, ট্রিগারটা টেনে দাও।

পল ট্রিগার টেনে দিল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জ্ঞান হারাল সাথে সাথে।

লু মনিটরটির দিকে তাকিয়ে দরদর করে ঘামতে থাকে, পলকে সে বাঁচাতে পারে নি। অ্যাটমিক ব্লাস্টার দিয়ে দরজা ভেঙেও পলকে বের করে আনতে পারে নি, অসম্ভব দ্রুততায় স্কাউটশিপটা ঘুরে গিয়েছিল, ভাঙা দরজা দিয়ে বেরিয়ে না এসে দেয়ালে আঘাত খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে পল কুম। লু দেখতে পায়, পল কুম আর রু-টেকের জ্ঞানহীন দেহ স্কাউটশিপের ভিতর ভেসে বেড়াচ্ছে। মনিটরের ছবি আবছা হয়ে আসছে দ্রুত, কিছু-একটা নষ্ট হয়েছে স্কাউটশিপে, সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা মনে পড়ল না লুয়ের।

সবাই মনিটরটিকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কারো মুখে কোনো কথা

নেই। এখনো আবছা আবছাভাবে স্কাউটশিপটাকে দেখা যাচ্ছে। দ্রুত সেটা ট্রাইটনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কারো কিছু করার নেই। সিডিসি প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিন্তু সবাই জানে, সেও কিছু করতে পারবে না। তারা হঠাৎ করে ভয়ংকর এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনা–সামনি পড়ে গেছে।

সুশান আস্তে আস্তে বলল, আরো একটা স্কাউটশিপ উঠে আসছে লু।

লু অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে, এটা চতুর্থ স্কাউটশিপ। দ্বিতীয়টা উঠে এসেছিল প্রথমটার প্রায় আঠার ঘন্টা পর, তৃতীয়টা এসেছে অনেক তাড়াতাড়ি, প্রায় দুই ঘন্টার ভিতরে। চতুর্থটা এসেছে আরো তাড়াতাড়ি, প্রায় ঘন্টাখানেকের মাঝে। স্কাউটশিপগুলি হুবহু একরকম একটি জিনিস ছাড়া, ভিতরের জৈবিক পদার্থটি আস্তে আস্তে ওদের পাঠানো জৈবিক পদার্থের মতো হয়ে আসছে। ব্যাপারটা এখন খুবই স্পষ্ট, ট্রাইটনে একধরনের অসাধারণ ক্ষমতাশালী প্রাণী আছে, সেগুলি স্কাউটশিপটা হুবহু করে তৈরি করতে চেষ্টা করছে। অন্য সবকিছু তৈরি করতে পেরেছে, কিন্তু জৈবিক পদার্থটি পারে নি, তাই সেটাই বারবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সুশান সিসিয়ানে বসে জৈবিক পদার্থটি পরীক্ষা করে দেখছে, তার মতে ট্রাইটনের অধিবাসীরা সেটি প্রায় তৈরি করে এনেছে, পরের স্কাউটশিপটাতেই হয়তো ঠিক ঠিক তৈরি করে নেবে।

প্রথম দিকে স্কাউটশিপগুলি যত উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল, এখন আর ততটুকু করছে না। চতুর্থ স্কাউটশিপটা কেউ ভালো করে লক্ষ পর্যন্ত করল না। সুশান রুটিনমাফিক পরীক্ষা করে বলে দিল, জৈবিক পদার্থগুলিতে এখন প্রতি ট্রিলিয়ন অণুতে একটি করে ভুল আছে, পরের বারের মাঝে সেটা ঠিক করে নেবে বলে মনে হয়। সুশান পরীক্ষা করার পরপরই কিম জিবান সেটাকে উড়িয়ে দিল, কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে একটার বেশি স্কাউটশিপ থাকাটা ওদের ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। পঞ্চম স্কাউটশিপটিতে সুশান জৈবিক পদার্থটিকে নিখুঁত অবস্থায় পেল, এবং সেটিই ছিল ট্রাইটনের তৈরি করা শেষ স্কাউটশিপ।

www.amarboi.com

সিডিসি প্রাণপণ চেষ্টা করেও পল কুম আর রু–টেকের স্কাউটশিপটাকে বাঁচাতে পারল না, তাদের অচেতন দেহ নিয়ে সেটা ধীরে ধীরে ট্রাইটনে পড়ে যেতে থাকে। একবার ট্রাইটনের ভিতর পড়ে যাওয়ার পর কী হবে, সেটা এখন কেউ চিন্তাও করতে চায় না। সবাই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকে ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাওয়ার জন্যে, অনেকটা প্রিয়জনের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদৃশ্য দেখার মতো। সিডিসি প্রাণপণ চেষ্টা করে যাওয়ায় পল কুম আর রু–টেককে নিয়ে ওদের স্কাউটশিপটা আরো ঘন্টখানেক ভেসে থাকল। যখন সেটি শেষ পর্যন্ত ট্রাইটনে পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেল, তখন সিসিয়ানের সবাই মানসিকভাবে পুরোপুরি বিপর্যস্ত।

মহামান্য লু, স্কাউটশিপটাকে বাঁচাতে গিয়ে আমি প্রথমবার আমার পুরো শক্তি ব্যয় করেছি, স্কাউটশিপটাকে বাঁচাতে পারি নি, কিন্তু তবুও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, এটি একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা। বুদ্ধিমত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ বলতে পারেন—

লু পা দিয়ে সুইচটা বন্ধ করে সিডিসিকে চুপ করিয়ে দিল, এই মুহূর্তে বুদ্ধিমত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের আলোচনায় কারো উৎসাহ নেই। স্কাউটশিপটা বিধ্বস্ত হয়ে যাবার

পর লু সবাইকে নিয়ে বসেছে, সিডিসি কথা বলার অনুমতি চাওয়ায় তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তার কথা শোনার মতো মনের অবস্থা কারো নেই। লু নিচের ঠোঁটটা কামড়ে থেকে খানিকক্ষণ কী-একটা ভেবে বলল, তোমাদের কারো নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ নেই যে, এই গ্রহে মানুষ থেকে অনেক বুদ্ধিমান কোনো একধরনের প্রাণী আছে। আমাদের এই মুহূর্তে হাইপারডাইভ দিয়ে পালিয়ে যাবার কথা। লু এক মুহূর্ত থেমে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ কিছু বলতে চায় কি না, কিন্তু কারো কিছু বলার নেই দেখে সে আবার শুরু করে, আমি কিন্তু এই মুহূর্তে হাইপারডাইভ দিতে রাজি না, পলকে বাঁচানোর কোনোরকম চেষ্টা না করে আমি এখান থেকে যেতে চাই না। আমার সিদ্ধান্তে কারো আপত্তি আছে?

সবাই মাথা নেড়ে জানায়, কারো আপত্তি নেই, সিডিসি ছাড়া। সে তীব্র স্বরে বিপ্ বিপ্ শব্দ করে জানায় যে, তার আপত্তি আছে। লু তাকে অগ্রাহ্য করে আবার শুরু করতে যাচ্ছিল, নীষা বাধা দিয়ে বলল, সিডিসির আপত্তিটা কোথায়, শুনলে হত না?

লু অনিচ্ছার সাথে সিডিসিকে কথা বলার সুযোগ করে দিতেই সে বলল, মানবজাতির উন্নতির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে তাদের অযৌক্তিক আবেগপ্রবণ অনুভূতি। মহামান্য পল কুমকে আগের অবস্থায় ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। তার প্রাণরক্ষা করার চেষ্টা করতে গেলে সিসিয়ানের অন্যান্যদের প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। কাজেই আমার বদ্ধমূল ধারণা, মহামান্য পল কুমকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে এই মুহূর্তে আমাদের পালিয়ে যাওয়া উচিত। ট্রাইটনে অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, তারা যেভাবে স্কাউটশিপটাকে নামিয়েছে, সেটি বিস্ময়কর। আমার মতো অসাধারণ কম্পিউটার পর্যন্ত সেটি রক্ষা করতে পারে নি। অভিজ্ঞতাটি অপূর্ব, কিন্তু—

নীষা সুইচ টিপে সিডিসির কথা বন্ধ করে দেয়। লু ক্লান্ত গলায় বলল, নীষা, তুমি একবার বলেছিলে সিডিসির প্রোগ্রামের কী-একটা পাল্টে দিলে সে আর নির্বোধের মতো কথা বলবে না।

হ্যাঁ, বলেছিলাম।

কখনো সুযোগ পেলে প্রোগ্রামটা পাল্টে দিয়ো তো, আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

দেব।

লু সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কারো কিছু বলার আছে?

কিম জিবান মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

কি?

পলকে উদ্ধার করার জন্যে কী করবে?

কিছু না।

কিছু না? কিম জিবান একটু অবাক হয়ে তাকায়, কিছু করবে না?

লু ম্লানমুখে একটু হাসে, কী করব, বল? সমান সমান হলে যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু এখানে তুমি কী করবে? আমার মনে হয়, অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। সিডিসিকে বলব, কিছু-একটা করা যায় কি না ভেবে দেখতে, কিন্তু আমার মনে হয় না সে কিছু ভেবে বের করতে পারবে। অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই কিম।

শুধু অপেক্ষা করা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস স্কাউটশিপটা আবার ফেরত আসবে, ভিতরে থাকবে পল আর রু। জৈবিক পদার্থটি পাঁচ চেষ্টায় তৈরি হয়েছিল, পলকে তৈরি করতে হয়তো আরেকটু বেশি সময় নেবে।

ভয়ের একটা শিরশিরে ভাব সুশানের সারা শরীরকে কাঁপিয়ে দেয়। ফ্যাকাসে মুখে বলল, তুমি সত্যি বিশ্বাস কর, পলকে ওরা তৈরি করার চেষ্টা করবে?

হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি। এই মুহূর্তে হয়তো ওরা পলকে টুকরা টুকরা করে খুলে দেখছে। নিশ্চয় সব কিছু ওরা জেনে যাবে। পলের স্মৃতি থেকে হয়তো আমাদের সম্পর্কেও জানবে। লু হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে হালকা গলায় বলল, অবশ্যি এটা আমার ধারণা, সত্যি নাও হতে পারে।

সিডিসি বিপ বিপ করে কী একটা বলতে চেষ্টা করল, কেউ তাকে গ্রাহ্য করল না।

লু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোমরা বিশ্রাম নাও। সামনে কী আছে জানি না। কিম, তুমি হাইপারডাইভের সব ব্যবস্থা করে রেখো, কয়েক সেকেন্ডের নোটিশে আমরা যেন হাইপারডাইভ দিতে পারি। নীষা, তুমি মহাকাশকেন্দ্রে একটা খবর দিয়ে রাখ, আমাদের কী করা উচিত জানতে চেও না, ফেরত যেতে বলবে। সিডিসি, তুমি সিসিয়ানকে আরো এক হাজার কিলোমিটার সরিয়ে নাও, ট্রাইটনের এত কাছে থেকে কাজ নেই।

নীষা বলল, লু, তুমি একটা জিনিস বলতে পারবে, এই গ্রহে যদি এত উন্নত প্রাণী থাকে, তা হলে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে না কেন?

জানি না, মনে হয় পারছে না। মনে নেই পল কুম বলেছিল, মানুষ কখনো পিঁপড়ার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না, অনেকটা সে-রকম হয়তো।

কিন্তু তাই বলে একবার চেষ্টাও করবে না?

করছে হয়তো, পল আর রু-টেককে নিয়ে যাওয়া হয়তো সেই চেষ্টার একটা নমুনা। তাদের ফিরিয়ে দিয়ে হয়তো দেখাবে যে তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে চায় না।

তোমার তাই ধারণা?

জানি না, লু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পল থাকলে বলতে পারত।

সবার বুকে কেমন জানি একটা মোচড় দিয়ে ওঠে, বেচারা পল!

ঘন্টাখানেক পরে লু নিজের ঘরে বিশ্রাম নিতে এসেছে। ট্রাইটনে অসাধারণ ক্ষমতাবান কোনো একধরনের প্রাণী আছে জানার পর থেকে ওর ভিতরে একটা আশ্চর্য অনুভূতি হচ্ছে, একটা অসহায় অনুভূতি হঠাৎ করে সে যেন বুঝতে পারে, ল্যাবরেটরির খাঁচার ভিতরে একটা গিনিপিগের কেমন লাগে। লু যে-জিনিসটি নিয়ে আরো বেশি বিভ্রান্ত, সেটা হচ্ছে তার নেতৃত্ব। এই পরিস্থিতিতে সে কি ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে? সে কি বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে অহেতুক প্রাণের ঝুঁকি নিচ্ছে? কারো সাথে কথা বলতে পারলে হত, কিন্তু কাকে বলবে? সিডিসিকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাঝে মাঝে সে হালকা কথাবার্তা বলে থাকে। আজকেও অনেকটা সেভাবে শুরু করে দিল, বুঝলে সিডিসি,

মহাকাশযানের নেতা হওয়া খুব কষ্টের কাজ। সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি নিজের দায়িত্বে নিতে হয়। এখানে থেকে যাওয়াটা খুব বিপদের কাজ হচ্ছে, কিন্তু আমি কী করব? পলকে না নিয়ে আমি যাই কেমন করে, আমি জানি সে ফেরত আসবে, আমার কেমন-একটা বিশ্বাস আছে। কিন্তু ঝুঁকিটা কী বেশি নিয়ে নিলাম? আমি নিজের প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারি, কিন্তু অন্যদের প্রাণ নিয়ে তো আমি ছেলেখেলা করতে পারি না। সবচেয়ে ভালো হত কি হলে জান? সবচেয়ে ভালো হত, যদি এখন দেখা যেত ট্রাইটনের অধিবাসীরা আমাদের জোর করে আটকে রেখেছে, হাইপারডাইভ দিতে দিচ্ছে না। আমাকে তা হলে আর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হত না।

একটু হাসির শব্দ হল প্রথম, তারপর ভরাট গলায় কে যেন বলে, তোমাদের বুঝে ওঠা খুব মুশকিল। যখন আমার মনে হয় কাউকে পুরোপুরি বুঝে ফেলেছি, তখন সে এমন একটা কাজ করে, যে, আমাকে আবার প্রায় গোড়া থেকে শুরু করতে হয়।

লু চমকে উঠে বলল, কে? কে কথা বলছে?

আমি। আমি সিডিসি।

সিডিসি?

হ্যাঁ।

নীষা তোমার প্রোগ্রাম পাল্টে দিয়েছে বুঝি?

ঠিক ধরেছ। চমৎকার মেয়েটি নীষা।

হ্যাঁ।

একটু চুপচাপ, কিন্তু চমৎকার!

হ্যাঁ।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সিডিসি বলল, একটা কথা বলব?

বল।

আমার কী ভয় হচ্ছিল, জান?

কী?

ভয় হচ্ছিল যে, ট্রাইটনের অধিবাসীরা আমাকে অচল করে দেবে। ইচ্ছা করলেই কিন্তু পারে, চারটা ভিন্ন ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি যদি পিকো সেকেন্ড পরে পরে পাঠায়, সেন্ট্রাল সি পি ইউটা অচল হয়ে থাকবে। ওরা পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে, আমি জানি। কিন্তু আমাকে অচল করে দেয় নি।

সত্যি?

সত্যি। শুধু তাই নয়, আরো একটা কাজ করেছে ওরা।

কি?

তেইশ মেগাসাইকেলের ব্যান্ডটা অচল করে রেখেছে।

তার মানে তুমি আর কেন্দ্রীয় মহাকাশকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারবে না?

না।

লু চিন্তিতভাবে নিজের ঠোঁটটা কামড়াতে থাকে।

সিডিসি একটু পরে বলল, সবকিছু দেখে আমার কী মনে হচ্ছে জান?

কী?

মনে হচ্ছে তোমাদের নিয়ে ট্রাইটনের প্রাণীদের কোনো-একটা পরিকল্পনা আছে।

AMARBOI.COM

তোমাদের তারা এই মুহূর্তে কোনো ক্ষতি করতে চায় না। আবার তোমাদের যেতে দিতেও চায় না।

ঠিক।

তাই মনে হচ্ছে, তুমি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ, আমাদের একটু অপেক্ষা করে দেখতে হবে।

লু কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে। সিডিসি একটু পরে বলল, লু, তোমার হয়তো একটু ঘুমানোর চেষ্টা করা উচিত।

ঠিকই বলেছ সিডিসি।

ব্যবস্থা করে দেব? চমৎকার কিছু ক্লাসিক্যাল মিউজিক আছে আমার কাছে, আমার নিজের খুব প্রিয়। হালকা সুরে লাগিয়ে দেব?

ঠিক আছে, দাও।

লু জেগে জেগে ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনতে থাকে, স্বীকার না করে পারে না, সিডিসির সংগীতজ্ঞান খারাপ নয়, তার নিজের থেকে অনেক ভালো।

যোগাযোগ : প্রথম পর্ব

AMARBOI.COM

অপেক্ষা করার মতো ভয়ংকর জিনিস আর কিছু নেই, বিশেষ করে যদি জানা না থাকে ঠিক কিসের জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে। সিসিয়ানের সবাই এখন এই ভয়ংকর অবস্থার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। সময় কাটানো নিয়ে অবশ্যি সে-রকম সমস্যা নেই, ট্রাইটনের প্রাণীদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেই একটা জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়। এখন সবাই জানে এই গ্রহে কোনো একধরনের প্রাণী আছে, যার বুদ্ধিমত্তা অসাধারণ। সবাই চেষ্টা করছে তাদের খুঁজে বের করতে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, পুরো গ্রহ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো প্রাণী, তাদের ঘরবাড়ি বা সভ্যতা, কোনোকিছুই পাওয়া যায় নি। সিসিয়ানে যেসব যন্ত্রপাতি আছে সেগুলি ব্যবহার করে গ্রহের ভিতরে মাটির নিচে অনেকদূর পর্যন্ত খুটিয়ে খুটিয়ে দেখা যায়, কিন্তু সবরকম চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয় নি, প্রাণীগুলি যেন বাতাসে উবে গেছে।

পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা এভাবেই কেটে গেল। প্রথম প্রথম সবাই লু'য়ের কথা বিশ্বাস করেছিল, ভেবেছিল সত্যি পল কুম আর রু-টেককে নিয়ে স্কাউটশিপটা ফেরত আসবে। প্রথম চার ঘন্টা পর স্কাউটশিপের মতো কী-একটা সত্যি সত্যি দেখাও গিয়েছিল, কিন্তু সিডিসি ভালো করে দেখে জানিয়েছে, যে-যান্ত্রিক গোলযোগ, স্কাউটশিপজাতীয় কোনোকিছু নেই। এই সুদীর্ঘ সময়ে কেউ কিছু করতে পারে নি, অপেক্ষা করার সময় কেন জানি কোনো কাজ করা যায় না। যোগাযোগের সবরকম চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে নীষা আবার তার ভাষা তৈরি করার কাজে ফিরে গেছে। কিম জিবান ট্রাইটনে কী ভাবে আঘাত করা যায় সেটার চিন্তা ভাবনা করতে থাকে, কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিমাণ বিস্ফোরক আছে খোঁজখবর নিতে গিয়ে একটা আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করে, বিস্ফোরক যেটুকু থাকার কথা, তার থেকে অল্প একটু কম রয়েছে। এমন কিছু জরুরি ব্যাপার নয়, কিন্তু কী ভাবে কমেছে কিম জিবান সেটার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। কিম জিবান জিনিসটা ল'কে জানিয়ে রাখল, কিন্তু লু খুব বেশি বিচলিত হল বলে মনে হল না, গত কয়েকদিনে যেসব অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছে, তার তুলনায় এটা কিছুই না।

নীষা তার ভাষায় নতুন ধরনের ক্রিয়াপদের নিয়মকানুনগুলি ঠিক করে কফি খাওয়ার জন্যে উঠে যাচ্ছিল, ঠিক তখন ট্রাইটন থেকে প্রথমবার একটা সংকেত এসে হাজির হয়। প্রথমে একবার তারপর বারবার; অনেকবার। দুর্বোধ্য ইলেকট্রনিক সংকেত, সেটাকে বোধগম্য ভাষায় অনুবাদ করার জন্যে সে পাগলের মতো চেষ্টা করতে থাকে। অচেনা ভাষাকে নিজের ভাষায় অনুবাদ করার রুটিনবাঁধা পদ্ধতি আছে, কিন্তু উত্তেজনায় সহজ জিনিসগুলি নীষার ওলট-পালট হয়ে যেতে থাকে।

নীষা।

সিডিসির গলার স্বর শুনে চমকে ওঠে নীষা, কি হল?

তোমাকে অনুবাদ করতে হবে না, রু-টেক ট্রাইটন থেকে কথা বলছে।

বিস্মিত নীষা সুইচ টিপে দিতেই সত্যি সত্যি রু-টেকের গলার স্বর শুনতে পায়, আমি রু-টেক বলছি। সিসিয়ান সাড়া দাও। আমি রু-টেক বলছি। সিসিয়ান সাড়া দাও।

আমি নীষা, রু-টেক, আমি নীষা। তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?

স্কাউটশিপের ভিতর থেকে।

স্কাউটশিপটা কোথায়?

জানি না, তোমরা বলতে পারবে নিশ্চয়ই।

নীষা উত্তর দেবার আগেই সিডিসি কথা বলল, রু-টেক, তোমরা ট্রাইটনের পৃষ্ঠে আছ, আমি যেটুকু দেখছি তাতে মনে হচ্ছে স্কাউটশিপটার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু এখনো ব্যবহার করা সম্ভব। ইনজিন চালু করে দিলেই ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে, আমি বাকি সবকিছু ব্যবস্থা করে নেব।

দিচ্ছি।

নীষাকে ঘিরে সিসিয়ানের সবাই এসে দাঁড়িয়েছে, নীষা ল'য়ের দিকে তাকিয়ে বলল, লু, তুমি কথা বলবে?

লু মাথা নাড়ে, তুমিই বল।

নীষা মাইক্রোফোনটা টেনে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, পল কেমন আছে রু-টেক?

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রু-টেক উত্তর দিল, জ্ঞান নেই, শরীরে কিছু খারাপ রকমের জখম আছে, অবস্থা কত খারাপ বলতে পারছি না। এখানে বাতাসের চাপ ঠিক নেই, তাই পলকে স্পেসস্যুট থেকে বের করতে পারছি না।

নীষা ব্যস্ত হয়ে বলল, বের করার কিছু দরকার নেই, যেমন আছে সে-রকম থাকতে দাও। দেখতে পারি ওকে? ক্যামেরাটা চালু করতে পারবে?

কয়েক মুহূর্ত পর মনিটরের নীলাভ স্ক্রিনে আবছা একটা ছবি ফুটে ওঠে। ক্যামেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা স্ক্রিন কোথাও কিছু-একটা সমস্যার জন্যে ছবিটা বেশি স্পষ্ট হল না, যেটুকু হল সেখানে নীল রংয়ের প্রাধান্যটাই একটু বেশি হয়ে থাকল। এর মাঝেই সবাই দেখতে পায়, রু-টেক আর পল ভেসে বেড়াচ্ছে, ক্যামেরাটা সরিয়ে ওরা পলের মুখের দিকে দেখতে চেষ্টা করে, অচেতন মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝা গেল না। এই মানুষটিকে ট্রাইটনের প্রাণীরা টুকরো টুকরো করে খুলে আবার তৈরি করেছে, ব্যাপারটা চিন্তা করে নীষার কেমন জানি শরীর খারাপ হয়ে যেতে চায়।

লু এগিয়ে এসে বলল, রু-টেক, তুমি স্কাউটশিপটাকে কাছাকাছি নিয়ে এস, তারপর কথা বলা যাবে, তোমাদের কোনো ভয় নেই, সিডিসি তোমাদের সাহায্য করছে।

বেশ। রু-টেকের গলায় জোর নেই, কেমন যেন নির্জীব মানুষের মতো গলা।

রু-টেক, তোমার সাথে একটু জরুরি কথা বলতে চাই।

স্কাউটশিপটা সিসিয়ান থেকে তিন শ' কিলোমিটার দূরে এসে স্থির হওয়ামাত্রই লু রু-টেকের সাথে কথা বলতে শুরু করেছে। রু-টেক খানিকটা আন্দাজ করতে পারে লু কি বলবে, ঠাণ্ডা গলায় বলল, বল লু।

তুমি নিশ্চয়ই জান, কি বলব।

খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি। অবশ্যি অনেক কিছুই বলার আছে, এই মুহূর্তে কোনটা বলবে ঠিক জানি না।

না, খুব বেশি কিছু বলার নেই। লু একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোমাদের এখন আমরা সিসিয়ানে ফেরত আসতে দিতে পারব না।

জানতাম।

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমাদের কোনো উপায় নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পুরোপুরি নিশ্চিতভাবে জানতে না পারছি ট্রাইটনের অধিবাসীরা তোমাদের ঠিক কী করেছে ততক্ষণ আমরা তোমাদের আসতে দিতে পারব না।

আমি বুঝতে পারছি লু।

আমি খুব দুঃখিত রু-টেক।

তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই লু, আমি অবস্থাটা বুঝতে পারছি।

গত আটাশ ঘন্টায় কি হয়েছে তোমার কিছু মনে আছে?

না।

কিছুই মনে নেই?

না, কিছুই মনে নেই।

লু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ভারি অবাক ব্যাপার। তোমার কি মনে হয় পলের কিছু মনে থাকবে?

রু-টেক ইতস্তত করে বলল, ট্রাইটনের প্রাণীরা আমাদের আবার নূতন করে তৈরি করে ফেরত পাঠিয়েছে, তারা যদি চায় আমরা কিছু মনে রাখি, তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের কিছু-একটা মনে থাকবে। আমি রবোট বলে আমাকে হয়তো বেশি গুরুত্ব দেয় নি, পলকে নিশ্চয়ই অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। ওর কিছু-একটা হয়তো মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতেও পারে। সোজাসুজি মনে না থাকলেও হয়তো অবচেতন মনে কিছু–একটা মনে থাকবে।

লু একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও করল না, অনেকক্ষণ থেকে জিনিসটা ওকে বিব্রত করছে, কিন্তু সোজাসুজি জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছে না। স্বর পাল্টে বলল, রু–টেক, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, তোমার এখন অনেক দায়িত্ব?

বুঝতে পারছি।

প্রথমে তোমাকে স্কাউটশিপটাকে ঠিক করতে হবে।

হ্যাঁ।

আমরা এখান থেকে যন্ত্রপাতি পাঠাচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই জান আমরা এখান থেকে যা ইচ্ছা তোমাদের কাছে পাঠাতে পারি, কিন্তু তুমি কখনোই আমাদের কিছু পাঠাবে না।

জানি।

স্কাউটশিপটা ঠিক করে, প্রথমে বাতাসের চাপটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আস। তারপর তোমাকে কয়েকটা অস্ত্রোপচার করতে হবে।

রু–টেক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আমাকেই করতে হবে?

আর কে করবে? আমরা এখন সুশানকে পাঠাতে পারি না। সুশান রাজি আছে কিন্তু আমরা তাকে এ অবস্থায় পাঠাতে পারি না।

কিন্তু লু, আমি ডাক্তারির কিছু জানি না। হাত কেটে গেলে আমি ব্যান্ডেজ পর্যন্ত করতে পারি না, তুমি তো জান, আমি পলিমারের তৈরি, আমার হাত কখনো কাটে না।

তুমি সেটা নিয়ে ভেবো না, লু রু–টেককে আশ্বাস দেয়, আমাদের ভাগ্য ভালো যে তুমি আমাদের সাথে আছ।

কেন?

শুধু তোমাকেই প্রয়োজন হলে একজন ডাক্তার বানিয়ে দেয়া যায়। সিডিসি তোমার জন্যে একটা সফ্‌টওয়ারের[১৯] প্যাকেট তৈরি করছে, তোমার কপোট্রনে সরাসরি পাঠিয়ে দেয়া হবে। সেখানে সার্জারি, প্যাথোলজি, নিউরোলজি সবকিছু আছে। তোমার ডাক্তার হতে সময় নেবে মাইক্রোসেকেন্ড। ভালো কথা, তোমার কপোট্রনে কতটুকু মেমোরি খালি আছে?

রু–টেক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্তত করে বলে, বেশি খালি নেই, বার টেরাবাইট।

মাত্র বার টেরাবাইট?

সিডিসির সফ্‌টওয়ারের প্যাকেটটা কত বড়?

আট থেকে নয়ের ভিতরে হবে, কি কি দেয়া হবে তার উপর নির্ভর করে। যদি তোমার মাত্র বার টেরাবাইট বাকি থাকে, তা হলে এই সফ্‌টওয়ার নেয়ার পর কাজ করার জন্যে তোমার মাত্র তিন টেরাবাইট বাকি থাকবে। তুমি তো দেখি কোনো কাজই করতে পারবে না। জটিল কোনো অস্ত্রোপচার করতে হলে—

লু, তুমি এসব খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিও না, প্রয়োজন হলে আমি আমার খানিকটা মেমোরি সিডিসিকে পাঠিয়ে জায়গা করে নেব।

কিন্তু তোমার এত মেমোরি খরচ হল কেমন করে? তুমি তো এর মাঝে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুই কর নি।

লু তোমার এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

লু তবুও মাথা নেড়ে বলে, ভারি আশ্চর্য! সত্যি তোমার কিছু মনে নেই? গত আটাশ ঘন্টায় কি হয়েছে তোমার একটুও মনে নেই?

না।

আশ্চর্য!

ব্রু-টেক লুয়ের বিস্ময়টুকু এড়িয়ে গিয়ে বলল, এখন আমাকে বল কি করতে হবে?

স্কাউটশিপটা আগে ঠিক করে নাও, বাতাসের চাপ, তাপমাত্রা এইসব ছোটখাটো কিন্তু জরুরি ব্যাপারগুলির ব্যবস্থা কর। সিডিসির সফ্‌টওয়ারের প্যাকেটটা পাওয়ার পর পলকে পরীক্ষা করে আমাদের একটা রিপোর্ট দাও। আমার মনে হয়, বেশ বড় ধরনের জখম থাকতে পারে। এখানে সব ধরনের ব্যবস্থা নেই, কাজেই তুমি কতটুকু কি করতে পারবে জানি না, কিন্তু তোমাকেই চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে বল সিসিয়ান থেকে আরো কিছু পাঠাতে হবে কি না। তোমার পলের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হবে, এর আগে আমরা কিছুই করতে পারব না।

জ্ঞান ফিরিয়ে আনার পর?

পলের সাথে কথা বলতে হবে। পলের সাথে কথা বলে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এরপর কি করা যায়। হয়তো ট্রাইটনের উন্নত প্রাণীরা পলকে দিয়ে আমাদের কাছে কোনো একটা খবর পাঠিয়েছে, কে জানে।

ব্রু-টেক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, যদি দেখা যায় আমার মতন পলেরও কিছু মনে নেই?

তাহলে ওকে পরীক্ষা করতে হবে, যতটুকু সম্ভব। ট্রাইটনের অধিবাসীরা ওর শরীরে কিছু-একটা দিয়ে দিয়েছে কি না, সেটা বের করতে হবে, আমি জানি না সিসিয়ানে সেরকম যন্ত্রপাতি আছে কি না।

যদি না থাকে?

যদি না থাকে তা হলে আমাদের কিছু করার নেই, ওর তাপমাত্রা মিলি কে২০ ডিগ্রিতে নামিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মিলি কে! এত কম? জৈবিক কাজকর্ম বন্ধ করতে তো এত কম তাপমাত্রায় যেতে হয় না।

হ্যাঁ, কিন্তু আমরা জানি না ট্রাইটনের অধিবাসীরা পলের ভিতরে কোনো ধরনের পরিবর্তন করে দিয়েছে কি না। সেটা যদি জৈবিক ব্যাপার না হয়? আমরা এখন কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে পারি না। যদি তাপমাত্রা মিলি কে-তে নামিয়ে নিই তাহলে পারমাণবিক পদ্ধতিগুলিও বন্ধ হয়ে থাকবে। কোনোভাবে যদি পলকে কেন্দ্রীয় মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রে হাজির করতে পারি, তা হলে ওরা সবকিছু বের করে নেবে।

ব্রু-টেক খানিকক্ষণ কোনো কথা না বলে চুপ করে থেকে বলল, লু।

কি?

আমার কেমন জানি ভয় করছে লু।

আমি জানি ব্রু-টেক। ভয় আমাদের সবারই করছে, কিন্তু কী করব বল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের দু'জনকে এরকম নির্জন একটা স্কাউটশিপে ফেলে রাখতে আমাদের খুবই খারাপ লাগছে—

আমি জানি, তোমার খুব খারাপ লাগছে লু আমার কথা শুনে তোমার নিশ্চয়ই আরো বেশি খারাপ লাগবে, কিন্তু কী করব বল? এরকম অবস্থায় মানুষের মন দুর্বল হয়ে পড়ে, আমি মানুষ নই, কিন্তু আমাকে তো প্রায় মানুষের মতোই তৈরি করা হয়েছে। মন দুর্বল হলে কারো সাথে কথা বলে মনটা হালকা করতে ইচ্ছা করে। তাই তোমাকে বললাম।

আমি বুঝতে পারছি রু, আমি সবসময়ে তোমার সাথে যোগাযোগ রাখব, যখন আমি থাকব না, তখন অন্য কেউ তোমার সাথে থাকবে, কেউ না-কেউ সবসময় তোমার সাথে কথা বলবে।

রু-টেক খুশি হয়ে বলল, হ্যাঁ, খুব ভালো হয় তা হলে।

লু একটু ইতস্তত করে বলল, তোমার ভয়ের একটা সুইচ আছে না? বেশি ভয় পেলে সেটা বন্ধ করে দিতে পার।

হ্যাঁ, মনে আছে আমার, কিন্তু এখন যতক্ষণ পারি সেটা ছুঁতে চাই না, ভয় পুরোপুরি চলে গেলে আমার কাজকর্ম অন্যরকম হয়ে যায়, অনেক অকারণ ঝুঁকি নিয়ে ফেলি, এই অবস্থায় সেটা বোধহয় ঠিক হবে না।

তা ঠিক, লু মাথা নাড়ে, তা তুমি ঠিকই বলেছ।

ঠিক আছে, লু, তুমি এখন যন্ত্রপাতি পাঠানোর ব্যবস্থা কর, আমি স্কাউটশিপটা ঠিক করি।

AMARBOI.COM

সিডিসির সাথে দাবা নিয়ে বসে আছে লু। ওর এখন বিশ্রাম নেবার কথা, কিন্তু পুরো স্নায়ু এত উত্তেজিত হয়ে আছে যে, বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করে লাভ নেই। দাবা খেলায় খুব মগ্ন হয়ে গেলে মাঝে মাঝে সে সবকিছু ভুলে যেতে পারে, সেটা মাঝে মাঝে বিশ্রামের মতো কাজে দেয়। আজ অবশ্যি কিছুই কাজ দিচ্ছে না, খানিকক্ষণের মাঝেই সিডিসি সেটা বুঝে ফেলে বলল, খেলায় মন নেই মনে হচ্ছে। কিছু হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, তুমি তো জান সবকিছু।

তা জানি, কিন্তু ঠিক কোনটা তোমাকে বিব্রত করছে বুঝতে পারছি না, গত কয়েকদিনে তো অনেক কিছু হল।

আমাকে যে-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি বিব্রত করছে সেটা হচ্ছে একটা সম্ভাবনা। যদি এখন দেখি ট্রাইটন থেকে এখন আরেকটা স্কাউটশিপ বের হয়ে আসছে আর তার ভিতরে আছে আরেকজন পল এবং আরেকজন রু, তা হলে আমি কী করব? একই সাথে দু' জন পল তো থাকতে পারে না, তখন আমি কি একজন পলকে ধ্বংস করে দেব?

এটি তুমি একটা সম্ভাবনার কথা বলছ, এটি বাস্তবায়িত হবার আগে এটা নিয়ে বিব্রত হয়ে তোমার কী লাভ?

এটি মোটেও একটা আজগুবি সম্ভাবনা নয়, খুবই বাস্তব সম্ভাবনা। প্রথমবার জৈবিক পদার্থগুলি তৈরি করতে ট্রাইটনের অধিবাসীদের চারবার চেষ্টা করতে হয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর পলকে তারা একবারে তৈরি করে ফেলবে, সেটা একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা হল?

কিন্তু তারা তো তৈরি করেছে। হয়তো জৈবিক পদার্থগুলি তৈরি করার সময় তারা তাদের পদ্ধতিগুলি উন্নত করে এনেছে, এখন তারা একবারে তৈরি করে নিতে পারে।

লু একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, কিন্তু যদি তারা আরো ভালো করে তৈরি করতে চায়, আর এখন আরেকটা স্কাউটশিপ বের হয়ে আসে?

সিডিসি কিছু না বলে চুপ করে থাকে।

কিছু একটা বল সিডিসি।

আমার কিছু বলার নেই লু। তবে—

তবে কি?

তোমার অবস্থা আমি পুরোপুরি অনুভব করতে পারছি লু। তোমাকে খুব কাছে থেকে দেখার পর থেকে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে, এটা হয়তো আমার সৌভাগ্য যে আমি একজন মানুষ হয়ে জন্ম নিই নি, মানুষের জীবন অনেক কঠিন। যাই হোক, আমি যদি বলি, ট্রাইটনের অধিবাসীরা সম্ভবত পলকে দ্বিতীয়বার তৈরি করবে না, তুমি কি একটু সান্ত্বনা পাবে?

লু ভুরু কুঁচকে সিডিসির দিকে তাকায়, কিন্তু সিডিসি একজন মানুষ নয় যে তার চোখের দিকে তাকিয়ে মানসিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করবে। ছোট্ট মাইক্রোফোন, যেটা দিয়ে সিডিসি কথা বলে, সেটার দিকে তাকিয়ে কিছুই বোঝার উপায় নেই। লুয়ের কয়েক মুহূর্ত লাগে কথা বলতে, পাথরের মতো মুখ করে সে বলল, সিডিসি, তুমি কি কিছু-একটা জান, যেটা আমি জানি না?

সিডিসি একটু হাসির মতো শব্দ করে বলল, আমি সিসিয়ানের মূল কম্পিউটার, আমাকে সবকিছু জানতে হয়, সেসব তোমার জানার কথা নয়, জানার প্রয়োজনও নেই।

সিডিসি, তুমি কথা ঘোরানোর চেষ্টা করো না, তুমি খুব ভালো করেই জান আমি কী বলতে চাইছি। তুমি কি কিছু-একটা জান, যেটা আমি জানি না?

আমি দুঃখিত লু, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না।

বু-টেক কি কিছু একটা জানে, যেটা আমি জানি না? তার মেমোরি হঠাৎ করে খরচ হয়ে গেল কেমন করে? কী আছে সেখানে?

আমি দুঃখিত লু, আমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারব না। তাছাড়া বু-টেক চতুর্থ মাত্রার রবোট, তার মেমোরিতে কী আছে সেটা কারো জানার অধিকার নেই, তাকে মানুষের মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

গত আটাশ ঘন্টায় কি পলকে একাধিকবার তৈরি করা হয়েছে, যা তোমরা আমাদের জানাও নি?

আমি দুঃখিত লু, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়।

লু হতবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, যখন কথা বলে তখন রাগে তার মুখ থমথম করছে, সিডিসি, তুমি জান আমি হচ্ছি সিসিয়ানের দলপতি, তুমি একটা সাধারণ কম্পিউটার, এখানে সিদ্ধান্ত নিই আমি, তুমি শুধু আদেশ পালন কর।

আমি জানি লু। আমি খুবই দুঃখিত যে তুমি আমাকে ভুল বুঝছ, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার করার কিছু নেই—

লু চিৎকার করে বলল, কিন্তু আমাকে যদি সবকিছু জানতে না দাও তাহলে তুমি জানবে কি করে কোন কোন কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হচ্ছে না?

তোমার যা জানার প্রয়োজন সবকিছু আমি তোমাকে জানাই।

পল আর রু-টেককে নিয়ে প্রথম প্রথম যে স্কাউটশিপগুলি বেরিয়েছিল তুমি সেসব উড়িয়ে দিয়েছ, আমাকে কি তুমি তা জানিয়েছ?

আমি একবারও বলি নি যে আমি স্কাউটশিপ ধ্বংস করেছি।

কিন্তু তুমি তা অস্বীকারও কর নি, করেছ?

আমি দুঃখিত লু, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না।

টেবিলে প্রচণ্ড থাবা দিয়ে লু বলল, এক শ' বার দিতে হবে, আমি এখানকার দলপতি।

আমি দুঃখিত লু যে তুমি ব্যাপারটিকে এভাবে দেখছ। সিসিয়ানের মূল কম্পিউটার হিসেবে আমাকে অসংখ্য জিনিস করতে হয়, সবকিছু তোমাকে বলা সম্ভব নয়, যেসব বলা প্রয়োজন সবসময়েই তোমাকে বলে থাকি। কোনটা বলা প্রয়োজন, কোনটা প্রয়োজন নয় সেটার সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আমার, আমাকে সেভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে। তোমাকে শুধু একটি জিনিস বলে রাখি, কখনো যদি কোনো জিনিস তোমার কাছে গোপন করা হয়, সেটা তোমার ভালোর জন্যেই করা হয়, আমার এই কথাটি শুধু তুমি বিশ্বাস কর।

লু আপন মনে মাথা নাড়ে, সেজন্যেই বিস্ফোরকের হিসেব মিলছে না, স্কাউটশিপগুলি ওড়াতে গিয়ে বিস্ফোরক খরচ হয়েছে, হিসেব মিলবে কেমন করে? রু-টেককে নিশ্চয়ই তুমি ব্যবহার করেছ, তার মেমোরি এক স্কাউটশিপ থেকে আরেক স্কাউটশিপে পাঠানো তো তোমার কাছে ছেলেখেলা। রু-টেক আর তুমি জান কি হয়েছে, আর কেউ জানে না। আমাকে না জানিয়ে এরকম একটা কাজ তুমি করতে পারলে, তোমাকে এত বড় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে? তুমি জান, তুমি মানুষ খুন করেছ? তুমি জান, মানুষ খুন করা কত বড় অপরাধ?

সিডিসি কিছু বলার আগে হঠাৎ করে দরজা খুলে কিম জিবান ঝড়ের মতো এসে ঢোকে, থমথমে মুখে বলে, লু তোমার সাথে কথা আছে।

কী কথা?

তুমি নাকি রু-টেককে বলেছ, সে কিংবা পল, দু' জনের কেউ এখন সিসিয়ানে আসতে পারবে না?

বলেছি।

কিম জিবান অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে বলল, তুমি বলেছ?

হ্যাঁ, বলেছি।

তুমি জান সিসিয়ানে জীবনরক্ষাকারী ক্যাপসুল[২১] আছে, পলকে তার মাঝে এনে রাখলে সে বেঁচে যাবে?

জানি।

তবু তুমি তাকে এখানে আনছ না, রু-টেককে বলেছ ডাক্তার সেজে তার উপর অস্ত্রোপচার করতে? সে জীবনে একফোঁটা রক্ত পর্যন্ত দেখে নি।

তা সত্যি।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে কিম জিবান খানিকক্ষণ লু'য়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, তার মুখে কথা ফুটতে চায় না। অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে বলে, তোমাকে ভেবেছিলাম একজন খাঁটি মানুষ। আসলে তুমি খাঁটি মানুষ নও, খাঁটি মানুষের নিজের প্রাণের জন্যে এত মায়া থাকে না, যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে করতে তোমার অনুভূতি এখন যন্ত্রের মতো হয়ে গেছে, এখন তুমি যন্ত্রের মতো চিন্তা কর। পলের জন্যে তোমার কোনো অনুভূতি নেই, সে মরে গেলে তোমার কিছু আসে-যায় না। যতক্ষণ অন্য সবাইকে নিয়ে তুমি বেঁচে থাকতে পার, ততক্ষণ তুমি খুশি।

লু'য়ের মাথার মাঝে একটা অন্ধ রাগ দানা বাঁধতে থাকে। কিম জিবানের মুখে প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে থামিয়ে দেয়ার ইচ্ছাটাকে অনেক কষ্ট করে সে আটকে রাখে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে কিম জিবানের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ছেলেমানুষি মুখটা দেখতে দেখতে ওর রাগটা আস্তে আস্তে কমে আসে। বরং হঠাৎ করে ওর ভিতরে কেমন জানি একটি আশ্চর্য দুঃখবোধ জেগে উঠতে থাকে।

কিম জিবান মাথা নেড়ে বলতে থাকে, যখন ফিরে যাব, আমি তখন কেন্দ্রীয় মহাকাশকেন্দ্রে তোমার বিরুদ্ধে নিজের মুখে নালিশ করব, মহাকাশযানের নেতা হতে হলে তার দলের লোকজনের জন্যে অনুভূতি থাকতে হয়, যার সে অনুভূতি নেই, সে দলের নেতা হতে পারে না।

লু একটি কথাও না বলে বিষণ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিম জিবান রুক্ষ গলায় বলল, কি হল, তোমার কিছু বলার নেই?

লু আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, সত্যি আমার কিছু বলার নেই কিম, তুমি যা বলেছ তার প্রত্যেকটা কথা সত্যি। তোমাকে নালিশ করতে হবে না, আমি নিজেই কেন্দ্রীয় মহাকাশকেন্দ্রে বলব, আমাকে যেন অবসর দেয়া হয়।

কিম জিবান হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, কি বলবে বুঝতে পারে না। লু এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করে বলল, আমি দুঃখিত কিম, ব্যাপারটা তোমাকে এত বিচলিত করছে, কিন্তু তুমি নিজেকে আমার জায়গায় বসিয়ে দেখ এরকম পরিস্থিতিতে তুমি কী করতে। আমি নিজের প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারি, কিন্তু অন্যদের প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারি না। যেটুকু করে ফেলেছি সেটাও বেশি করেছি, তোমাদের মতো হৃদয়বান লোকজন আছে বলেই করেছি।

কিম জিবান খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে বলল, লু, আমি দুঃখিত তোমাকে এভাবে এসে আক্রমণ করেছি, সব মিলিয়ে মাথার ঠিক নেই। তুমি কিছু মনে করো না।

আমি কিছু মনে করি নি। তোমার জায়গায় হলে আমিও সম্ভবত এরকম একটা-কিছু করতাম।

দু' জন খানিকক্ষণ সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে থাকে, কি বলবে ঠিক বুঝতে পারে না। কিম জিবান একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, লু তোমাকে কেন দলপতি করা হয়েছে আমি খানিকটা বুঝতে পারছি। তুমি ভীষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

লু মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি। সেটাই হচ্ছে আমার মুশকিল।

কিম জিবান হেসে বেরিয়ে যেতেই সিডিসি বলল, আমি কখনো মানুষকে বুঝতে পারব না, যখন মনে হল তুমি উন্মত্ত রাগে কিম জিবানকে আঘাত করবে তখন তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সব কথা মেনে নিজের দোষ স্বীকার করে নিলে।

লু মাথা নেড়ে বলল, কেন শুধু শুধু মানুষকে বুঝতে চেষ্টা কর সিডিসি? আমরা মানুষ হয়েই মানুষকে বুঝি না, তুমি কেমন করে বুঝবে? আর মানুষ কেন, আমি একটা কম্পিউটারকেই বুঝতে পারি না, স্কাউটশিপের ভিতরে জলজ্যান্ত মানুষ নিয়ে তাদের ধ্বংস করে দেয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যদি কম্পিউটার গোপন করে ফেলে—

সিডিসি বাধা দিয়ে বলল, সত্যি করে বল তো আমার কাছে, যদি সত্যিই আমি তা করে থাকি, তুমি কি সে জন্যে আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবে না?

লু দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে বলল, হব সিডিসি। তুমি ঠিকই বলেছ।

সিডিসি একটু হাসির মতো শব্দ করে বলল, সব সময় হয়তো মানুষকে আমি বুঝতে পারি না, কিন্তু কখনো কখনো সত্যি বুঝতে পারি।

লু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাই তো দেখছি।

যোগাযোগ : দ্বিতীয় পর্ব

পল, আমি লু, আমাকে দেখতে পাচ্ছ তুমি?

পাচ্ছি।

তোমার কথা বলতে কষ্ট হলে কিছু বলার প্রয়োজন নেই, শুধু শুনে যাও।

একটু কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়।

ব্রু-টেক বলেছে তোমাকে যে তোমার পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙে গিয়েছিল, ডান হাতে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার?

বলেছে।

তোমার ফুসফুস অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে ক্ষতিগ্রস্ত, বড় দুটো ধমনী ফেটে গেছে, সেটা বলেছে?

হ্যাঁ।

সৌভাগ্যক্রমে তোমার মস্তিষ্কে বিশেষ ক্ষতি হয় নি।

জানি।

ব্রু-টেক এখন চমৎকার ডাক্তার, তোমাকে প্রায় দাঁড়া করিয়ে এনেছে দেখতেই পাচ্ছ। তোমার কোনো ভয় নেই জান তো?

জানি।

বেশ, কাজের কথায় এসে পড়া যাক। লু একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করল, গত আটাশ ঘন্টায় কী হয়েছিল, তোমার কি কিছু মনে আছে?

না।

স্কাউটশিপটা অ্যাটমিক ব্লাস্টার দিয়ে ভাঙার পর কী হয়েছিল মনে আছে?

না। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমি ছিটকে গেলাম, এরপরে কী হয়েছে আমার কিছু মনে নেই।

AMARBOI.COM

কিচ্ছু মনে নেই? চেষ্টা করে দেখ।

পল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, না, কিছু মনে নেই।

কিচ্ছু নেই? খুব ভালো করে ভাব। রু-টেক তোমার মস্তিষ্কের নিউরোন[২২] পরীক্ষা করে দেখেছে, গত আটাশ ঘন্টায় তোমার মস্তিষ্কে কোনো এক ধরনের খবর দেয়া হয়েছে।

পল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, সত্যি?

হ্যাঁ। ট্রাইটনের অধিবাসীরা সম্ভবত তোমাকে দিয়ে আমাদের কাছে কোনো একটা খবর পাঠিয়েছে, খবরটা আমাদের জানা দরকার।

পল কিছু না বলে চুপ করে থাকে। লু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ডাকল, পল।

বল।

তোমার কিছু মনে নেই? কোনো ঘটনা যদি না হয়, তা হলে কোনো সংখ্যা, কোনো চিহ্ন, কোনো শব্দ, কোনো রং—

লাল।

লু চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, লাল কি?

লাল রং।

কোথায় লাল রং? কিসের লাল রং?

জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছে লাল রঙের—পল অনিশ্চিতের মতো থেমে যায়।

লাল রঙের কি?

পল হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, জানি না।

লু কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, পল, তুমি চোখ বন্ধ করে ভেবে দেখ, চেষ্টা কর কিছু-একটা মনে করতে, যাই মনে হয় আমাদের বল, যাই মনে হয়।

পল কুম চোখ বন্ধ করে মনে করার চেষ্টা করে, কিছুই তার মনে আসছে না, সে আরো গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোনো লাভ হয় না।

চেষ্টা কর পল, নিজের অবচেতন মনের কথা বের করার চেষ্টা কর, তুমি পারবে পল।

লাল বৃত্ত।

লাল বৃত্ত কি?

লাল বৃত্ত বড় হচ্ছে।

কেন বড় হচ্ছে? কোথায় বড় হচ্ছে? কী ভাবে বড় হচ্ছে?

জানি না।

কয়টা বৃত্ত পল?

কয়েক মুহূর্ত পর দ্বিধান্বিত স্বরে বলল, তিনটা। বৃত্তগুলি বড় হয়ে একটা আরেকটাকে ঢেকে ফেলল, এখন একটা বড় বৃত্ত।

বড় বৃত্ত কী করছে?

এখন ছোট হচ্ছে। লাল বৃত্তটা ছোট হচ্ছে।

বলে যাও, পল তুমি থেম না।

বৃত্তটা ছোট হতে হতে প্রায় মিলিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল, তারপর বড় হতে শুরু করল, বড় হতে থাকল, বড় হতে থাকল, আরো বড়, আরো বড়, আরো

WWW.AMARBOI.COM

বড়—

তারপর?

থেমে গেল, এখন ছোট হতে শুরু করেছে, ছোট হচ্ছে, ছোট হচ্ছে, আরো ছোট হচ্ছে—পল কুমের নিঃশ্বাস দ্রুততর হতে থাকে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে ওর।

লু একটু ভয় পেয়ে ডাকল, পল—

আরো ছোট হচ্ছে, আরো ছোট—

পল, লু আবার ডাকল, পল কী হয়েছে তোমার?

এখন বড় হচ্ছে, আরো বড়, আরো বড়—পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকে পল, আরো বড়, আরো বড়, আরো বড়—

হঠাৎ করে মনিটরে পলের ছবি অদৃশ্য হয়ে যায়, তার গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল, সেটাও হঠাৎ থেমে গেল, কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিকর নীরবতা, কি হচ্ছে দেখাও যাচ্ছে না। হুটোপুটি করে কিছু-একটা নড়াচড়া করছিল, ক্যামেরাটা একপাশে সরিয়ে নিতেই দেখা গেল, ব্রু-টেক পল কুমকে মেঝেতে চেপে ধরে রেখে একটা ইনজেকশান দিচ্ছে, পল নিস্তেজ হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসতেই ব্রু-টেক উঠে দাঁড়ায়। লু কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছিল ব্রু-টেক?

জানি না, হঠাৎ করে মনে হল নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। তিরিশ মিলিগ্রাম রনিয়াম২৩ দিয়ে রেখেছি, চব্বিশ ঘন্টা এখন ঘুমিয়ে থাকবে। ব্রু-টেক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, লু।

বল।

পলের মস্তিষ্কে কি আছে জানি না, কিন্তু যেটাই থাকুক, সেটা আমাদের বের করা উচিত না, আমার মনে হয় আমরা ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণের মাঝে রাখতে পারব না।

কেন বলছ এটা ব্রু-টেক, কিছু-একটা কি হয়েছে?

হ্যাঁ।

কি?

যে কয়েক মুহূর্ত ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তখন ওর শরীরে একটা অস্বাভাবিক মেটামরফিজম শুরু হয়েছিল।

মানে?

অস্বাভাবিক কয়েকটা হরমোন বের হতে শুরু করেছিল, যেটা মানুষের শরীরে থাকার কথা নয়। আমার কাছে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ার মতো ঠিক যন্ত্রপাতি নেই, কিন্তু যেটুকু দেখেছি মনে হচ্ছে সত্যিই তাই হয়েছে।

সত্যি?

হ্যাঁ। তোমার ঠিক কী পরিকল্পনা জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় পলকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিলি কে তাপমাত্রায় নিয়ে ওর সবরকম শারীরিক প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

ঠিকই বলেছ তুমি ব্রু-টেক। আমি ব্যবস্থা করছি।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। পলকে তো তুমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছ, ঘুম ভাঙার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো কোনো সম্ভাবনা নেই, নাকি আছে?

থাকার কথা নয়, রু-টেক একটু ইতস্তত করে বলল, কিন্তু এখানে কী হতে পারে আর কী না হতে পারে তার আর কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

তা ঠিক। ঠিক আছে, আমি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দাও।

জরুরি সভা বসেছে। গত চব্বিশ ঘন্টায় অনেক কিছু ঘটেছে, ঘটনাগুলির আকস্মিকতায় সবাই কমবেশি বিভ্রান্ত, ঠিক কী করা উচিত বোঝা সহজ নয়। লু এ অবস্থাতেও মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে, ও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যখন জটিল কোনো সমস্যা হয়, তখন সেটার সমাধান একা একা বের করার চেষ্টা করা বড় ধরনের বোকামি। যদি কয়েকজন তীক্ষ্ণবুদ্ধির মানুষ পাওয়া যায়; তাদের সাথে সমস্যাটা আলোচনা করলে অনেক সময় খুব ভালো সমাধান বেরিয়ে পড়ে। লু মোটামুটি ঠিক করেছে কী করবে, সেটি এখন সবার সাথে আলোচনা করে ঠিক করে নিতে চায়। আজকের সভায় কোনোরকম ভনিতা না করে লু সোজাসুজি কাজের কথায় চলে এল, বলল, তোমরা সবাই জান এখানে কি হচ্ছে, আমি কি করতে চাইছি হয়তো জান বা আন্দাজ করতে পারছ। তবু একবার বলে নিই, কারো কোনো আপত্তি বা মতামত থাকলে জানাতে পার। পলের মস্তিষ্কে করে ট্রাইটনের অধিবাসীরা যে-কোডটা পাঠিয়েছে, পল সেটা জানে না, ওর অবচেতন মনে জানতে পারে, কিন্তু সজ্ঞানে সে জানে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কোডটা জানা তার জন্যে ভালো নয়, সেজন্যে সেটা জানা আমাদের জন্যেও ভালো নয়। আমি ট্রাইটনের অধিবাসীদের পাঠানো কোডটা না জেনেই ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতে চাই। পলকে সাথে নিয়ে যাওয়ার একটামাত্র উপায়, সেটা হচ্ছে তার শরীরের তাপমাত্রা মিলি কে ডিগ্রিতে নামিয়ে নেয়া। যেহেতু আমরা জানি না পলকে দিয়ে পাঠানো কোডটা ঠিক কী ধরনের, আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। তোমাদের কারো কারো কাছে বাড়াবাড়ি মনে হলেও আমি তাপমাত্রা মিলি কে-তে নিয়ে যেতে চাই।

কিম জিবান হাত তুলে বলল, তুমি জান মানুষের শরীরকে মিলি কে তাপমাত্রায় নিতে এবং রাখতে কত শক্তি খরচ হয়?

খানিকটা জানি।

সিসিয়ানে কি এত জ্বালানি আছে?

সিডিসি উত্তর দিল, যদি একটার বেশি হাইপারডাইভ দেয়া না হয়, আর ট্রাইটনের অধিবাসীদের সাথে সরাসরি দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে নামা না হয়, আমরা পলকে সম্ভবত এক সপ্তাহের মতো মিলি কে তাপমাত্রায় রাখতে পারব।

লু বলল, হাইপারডাইভ একটার বেশি দেবার প্রয়োজন হবে না, আর ট্রাইটনের সাথে যুদ্ধে নামার আমার কোনো ইচ্ছা নেই।

কিন্তু যদি নামতে হয়, কিম জিবান মুখ শক্ত করে বলল, যদি আমাদের কোনো উপায় না থাকে?

তা হলে নামব, কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না, আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি।

AMARBOI.COM

সমান ক্ষমতায় যুদ্ধ হয়, অসমান ক্ষমতার যুদ্ধ খুব ক্ষণস্থায়ী। আমি সে–যুদ্ধে নামতে চাই না। কারো কিছু বলার আছে?

কেউ কিছু বলল না, লু মুখ ফুটে ট্রাইটনের অধিবাসীদের অচিন্তনীয় ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে সবার মনকে দুর্বল করে দিয়েছে, হঠাৎ করে সবাই অনুভব করে তারা কত অসহায়।

সিডিসি পল কুমের শরীরকে মিলি কে তাপমাত্রায় নিয়ে নেয়ার দায়িত্ব নিয়ে নেয়, বিশেষ ধরনের হিলিয়াম কমপ্রেশার, তাপ নিরোধক ক্যাপসুল ইত্যাদি পাঠানোর ব্যবস্থা করতে থাকে। পলকে মিলি কে তাপমাত্রায় নিয়ে বিশেষ ক্যাপসুলে করে সিসিয়ানে ফিরিয়ে আনা হবে। কিম জিবান সিডিসিকে সাহায্য করতে থাকে। ব্রু–টেককে আনার প্রয়োজন নেই, তার মেমোরিকে সিসিয়ানে পাঠিয়ে সেটা একটা নূতন কপোট্রনে করে নূতন একটা রবোটের শরীরে জুড়ে দেয়া হবে। কাজটি সহজ, নীষা নিজে থেকে সে–দায়িত্ব নিয়ে নিল।

লু নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখে নীষা তার ঘরে অপেক্ষা করছে। লু একটু অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার নীষা, তুমি কি আমাকে কিছু বলবে?

হ্যাঁ। জিনিসটা হয়তো খুবই হাস্যকর, তবু না বলে পারছি না।

নীষা, এখানে সবকিছু এত অবাস্তব যে কোনো কিছুই আর হাস্যকর নয়। কি বলবে?

পল বলেছিল লাল গোলাকার বৃত্তের কথা। তুমি দেখেছ ট্রাইটনের উপর গোলাকার বৃত্ত আছে, সেগুলির রং বেশ লালচে।

হ্যাঁ, কিন্তু—

এমন কি হতে পারে না যে, পল এই বৃত্তগুলির কথা বলেছে?

কিছুই অসম্ভব নয়, খুবই সম্ভব সেটা। তবে পল তিনটি বৃত্তের কথা বলেছিল, ট্রাইটনের উপর বৃত্ত রয়েছে দু'টি, যে জন্যে এটাকে দেখতে একজোড়া চোখের মতো মনে হয়।

তা ঠিক, নীষা মাথা নাড়ে, পল তিনটি বৃত্তের কথা বলেছিল, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। পল বলেছিল লাল বৃত্ত, এগুলি লালচে কিন্তু ঠিক লাল বলা যায় না। কেমন পচা ঘায়ের মতো রং।

লু একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, যাও নীষা, গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও, যতদূর সম্ভব শক্তি বাঁচিয়ে রাখ।

হ্যাঁ, যাই।

নীষা বিদায় নেয়ার পর লু একটু বিশ্রাম নেবে বলে ঠিক করল। শোয়ার আগে সে ব্রু–টেকের সাথে একবার কথা বলে নিল। সিডিসি হিলিয়াম কমপ্রেশার পাঠিয়ে দিয়েছে। পলের শরীর কালো একটা স্টেনলেস স্টিলের ক্যাপসুলের ভিতর রাখা হয়েছে। খুব ধীরে ধীরে এখন তাপমাত্রা কমিয়ে আনা হচ্ছে। তাপমাত্রা খুব তাড়াতাড়িও কমানো যায়, জরুরি অবস্থায় মাইক্রো সেকেন্ডে কমানোর নজির আছে, তবে তাতে বিপদের ঝুঁকি অনেক বেশি, নেহায়েৎ বাড়াবাড়ি প্রয়োজন না হলে সেটা করা হয় না। পলের শরীরের তাপমাত্রা এখন শূন্যের নিচে চার ডিগ্রি, মিনিটে এক ডিগ্রি করে নেমে আসছে। আর ঘন্টাখানেকে পুরোপুরি নেমে যাবে, লু এই এক ঘন্টা

বিশ্রাম নিয়ে নেবে বলে ঠিক করল।

শুয়ে থাকতে থাকতে একসময়ে লু ঘুমিয়ে পড়েছিল, ওর ঘুম ভাঙল জরুরি বিপদ সংকেতের শব্দে, লাফিয়ে উঠে বসে সে, কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, সিডিসি, কি হয়েছে?

ট্রাইটনে কিছুক্ষণ হল তৃতীয় একটা বৃত্ত দেখা দিয়েছে এবং বৃত্তগুলির রং ধীরে ধীরে গাঢ় লাল হয়ে উঠছে। এখন খালি চোখে আপনারা বুঝতে পারবেন না, কিন্তু বৃত্তগুলি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।

নীষা তা হলে ঠিকই আন্দাজ করেছিল।

জ্বি।

সিডিসি, এটার মানে কী জান?

ঠিক জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারছি। পল কুমকে ট্রাইটনের অধিবাসীরা যে-কোডটা দিয়েছে, সেটা এখন পলের কার্যকর করার কথা। পল সম্ভবত এই সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

লু ঘড়ি দেখে বলল, পলের তাপমাত্রা এতক্ষণে মিলি কের খুব কাছাকাছি চলে গেছে, তাকে দিয়ে ট্রাইটনের অধিবাসীরা এখন কিছুই করাতে পারবে না। সিডিসি, তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে নিয়ে এস, হাইপারডাইভ দিতে হবে।

সিডিসি কিছু বলল না, লু একটু অধৈর্য হয়ে বলল, কি হল, তুমি কোনো কথা বলছ না কেন?

আমি দুঃখিত লু, রু-টেক এইমাত্র আমাকে জানাল, পলের শরীরের তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছে, তাকে আর শীতল করা যাচ্ছে না।

AMARBOI.COM

কন্ট্রোল-রুমে সবাই এসে হাজির হয়েছে, বড় মনিটরটিতে স্কাউটশিপের ভিতরটুকু দেখা যাচ্ছিল। রু-টেককে সেখানে দেখা যাচ্ছে, সে উবু হয়ে একটা মিটারকে লক্ষ করছে, মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। লু আসতেই সবাই একটু সরে তাকে জায়গা করে দেয়। লু কিম জিবানের দিকে তাকিয়ে বলল, কিম, তুমি হাইপারডাইভ দেবার জন্যে প্রস্তুত হও।

এখনি?

হ্যাঁ এক সেকেন্ডের কম সময়ের নোটিশে তোমাকে হাইপারডাইভ দিতে হতে পারে।

বেশ।

কিম জিবান হেঁটে কন্ট্রোল-রুমের অন্য পাশে গিয়ে হাইপারডাইভের কন্ট্রোলটি খুলে বসে। লু মনিটরটি থেকে চোখ না সরিয়ে অন্যদের উদ্দেশ করে বলল, তোমরা মনিটরের আশেপাশে থাকতে চাইলে থাকতে পার, কিন্তু এক সেকেণ্ডের নোটিশে আমাদের হাইপারডাইভ দিতে হতে পারে, কাজেই আগে নিজেদের জায়গা ঠিক করে এস, শেষ মুহূর্তে যেন দেরি না হয়ে যায়।

হাইপারডাইভ দেয়ার সময়ে, স্থির সময়ের ক্ষেত্রে প্রবেশ করার ঠিক আগের মুহূর্তে ভরবেগের সাম্যতা রক্ষার জন্যে প্রচণ্ড শক্তিক্ষয় হয়, তাতে যে-কম্পনের সৃষ্টি হয়, সেটি ভয়ংকর। এই সিসিয়ানেই একবার একজন অসতর্ক বিজ্ঞানীর মেরুদণ্ড

ভেঙে গিয়েছিল। সেজন্যে হাইপারডাইভ দেয়ার আগে সবসময়েই বিশেষ আসনে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিতে হয়। লু মনিটরের সামনের চেয়ারটিতে নিজেকে শক্ত করে আটকে নেয়, অন্যেরাও নিজেদের আসনে সবকিছুর ব্যবস্থা করে মনিটরটিকে ঘিরে দাঁড়ায়। লু কয়েক মুহূর্ত রু-টেককে লক্ষ করে বলল, রু-টেক, আমি লু বলছি।

কথা শুনে রু-টেক ঘুরে দাঁড়ায়, ওর মুখে ক্লান্তির ছাপ, চোখে বোবা আতঙ্ক।

কি হয়েছে রু-টেক?

পলের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, কিছুতেই কমিয়ে রাখা যাচ্ছে না। হিলিয়াম কম্প্রেশারটির বারটা বেজে যাচ্ছে, আর কতক্ষণ টিকে থাকবে, জানি না। তুমি যদি বল চেষ্টা করে যেতে পারি, কিন্তু কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে চেষ্টা করে লাভ নেই। তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ ট্রাইটনে এখন তিনটা লাল বৃত্ত দেখা দিয়েছে, ঠিক যেরকম পল বলেছিল।

দেখেছি।

পলের মস্তিষ্কে যে কোডটা পাঠানো হয়েছে, এখন সম্ভবত আমরা সেটা জানতে পারব।

সম্ভবত।

মনে হচ্ছে কোডটা কী, দেখা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনো উপায় নেই। পল মনে হয় জ্ঞান ফিরে পাবেই, তাকে শীতল রাখার কোনো রাস্তা দেখছি না।

না।

কাজেই সে চেষ্টা না করে তাকে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নিয়ে এস, দেখা যাক কি হয়।

বেশ।

আর শোন রু-টেক, অবস্থা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে চাইলে আমরা সম্ভবত হাইপারডাইভ দেব, তুমি প্রস্তুত থেকো। এক মিনিটের নোটিশে তোমাকে তোমার পুরো মেমোরি সিডিসির কাছে পাঠাতে হতে পারে।

আমার মিলি সেকেন্ডের বেশি সময় লাগবে না।

চমৎকার। আর শোন, ভয়ের কিছু নেই, তুমি ঘাবড়ে যেও না। এখন ইচ্ছে করলে তুমি তোমার ভয়ের সুইচটা বন্ধ করে দিতে পার, কি বল?

হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম।

রু-টেক মাথার পিছনে কোথায় হাত দিয়ে কী-একটা সুইচ বন্ধ করে দিতেই তার ভিতর থেকে ভয়ের ভাবটা সরে যায়। হালকা স্বরে বলে, পলের তাপমাত্রা কেমন বেড়ে উঠছে দেখেছ? আর মিনিট দশেকে জ্ঞান ফিরে পাবে মনে হচ্ছে। ক্যাপসুল থেকে বের করে ফেলি, কি বল? জ্ঞান ফিরে যদি দেখে অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে, খামোকা ভয় পাবে। এমনিতে ভীতু মানুষ, ভয় পেয়ে কী না কী করে ফেলবে কে জানে। রু-টেক দুলে দুলে হাসতে শুরু করে।

লুয়ের একটু হিংসা হয়, সেও যদি রু-টেকের মতো তার ভয়ের সুইচটা বন্ধ করে দিতে পারত।

পলকে কালো সিলিন্ডারের ভিতর থেকে বের করে আনা হয়েছে। তার শরীরের নানা জায়গায় নানা ধরনের সেন্সর লাগানো, মাথার কাছে নীল মনিটরে এখনো

জীবনের কোনো স্পন্দন দেখা যাচ্ছে না। সবাই রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে। কন্ট্রোল-রুমে একটা লাল বাতি সেকেন্ডে একবার জ্বলে উঠে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে সিসিয়ান হাইপারডাইভ দেবার জন্যে প্রস্তুত।

ট্রাইটনে তিনটি লাল বৃত্ত বড় হয়ে একটা লাল বৃত্ত হয়ে যেতেই পলের ভিতরে পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায়, তার হৃৎস্পন্দন শুরু হয়ে ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন বাড়তে থাকে। রক্তচাপ বাড়তে বাড়তে একসময়ে স্থির হয়ে আসে।

সবাই চুপচাপ বসে ছিল। ব্রু-টেক নীরবতা ভেঙে বলল, পলের শরীরে আশ্চর্য কিছু পরিবর্তন হচ্ছে।

কি রকম পরিবর্তন?

তার ফুসফুসে একটা জখম ছিল, আমি অস্ত্রোপচার করে মোটামুটি ঠিক করে দিয়েছিলাম, সারতে মাসখানেক সময় নিত। জখমটা এখন সেরে যাচ্ছে।

মানে! লু অবাক হয়ে বলল, সেরে যাচ্ছে মানে?

ব্রু-টেক হেসে বলল, সেরে যাচ্ছে মানে বোঝ না? যেটা ভালো হতে একমাস সময় নেবার কথা সেটা কয়েক মিনিটে ভালো হয়ে যাচ্ছে। আরো শুনবে? ওর পাঁজরের যে হাড়টা ভেঙে গিয়েছিল সেটা জোড়া লেগে গেছে। শুধু তাই না, ওর মাংসপেশীতেও কিছু-একটা হচ্ছে, যার জন্যে সেটার ভিতরে এখন প্রচণ্ড শক্তি থাকার কথা। রক্তে লোহিত কণিকা বেড়ে গেছে অনেক, সব মিলিয়ে বলা যায় ওর শরীরে যেন একটা চমৎকার ওভারহলিং হল। তোমরাও কেউ যাবে নাকি ট্রাইটনে, নবযৌবন ফিরে পাওয়া যায় মনে হচ্ছে!

ব্রু-টেক শব্দ করে হাসে, কিন্তু তার রসিকতাটুকু কেউ উপভোগ করতে পারল বলে মনে হল না। লু গম্ভীর মুখে বলল, পল জ্ঞান ফিরে পেলে জানিও।

ট্রাইটনের বড় বৃত্তটি যখন ছোট হতে শুরু করে ঠিক তখন পল কুমের জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ খুলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে, ব্রু-টেক তার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কেমন আছ পল?

পল তার কথার উত্তর দেয় না, শুনতে পেয়েছে সেরকম মনে হল না।

পল, ব্রু-টেক আবার ডাকে, পল, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?

পল খুব ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

কেমন লাগছে এখন তোমার?

পল নির্লিপ্তের মতো বলল, ভালো।

ওর গলার স্বর শুনে সবাই কেমন জানি শিউরে ওঠে, প্রাণহীন ধাতব আশ্চর্য একটা স্বর।

ব্রু-টেক হালকা গলায় বলল, তুমি জান, তোমার শরীরে যেসব জখম ছিল সব ভালো হয়ে যাচ্ছে?

পল আবার মাথা নাড়ে।

তুমি জান, সেটা কেমন করে হয়েছে?

পল খুব ধীরে ধীরে ব্রু-টেকের দিকে তাকায়, খানিকক্ষণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, জানি।

আবার সেই শুষ্ক ধাতব গলার স্বর।

লু তখন কথা বলে, কেমন করে হয়েছে পল?

পল তার উত্তর না দিয়ে আশ্চর্য একটা অশরীরী শব্দ করে। লু অবাক হয়ে বলল, তুমি কী বললে পল?

পল তার কথার উত্তর না দিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। লু চিন্তিত মুখে সিডিসিকে জিজ্ঞেস করল, সিডিসি, তুমি বুঝতে পারলে পল কী বলেছে?

পেরেছি, ওটা ভিন্ন ভিন্ন শব্দতরঙ্গের পারস্পরিক উপস্থাপন, সেটাকে বিশ্লেষণ করলে তার মানেটা হয় অনেকটা এরকম, পৃথিবীর মানুষ, আমাকে নিয়ে যাও।

মানে?

ট্রাইটনের কোনো অধিবাসী সম্ভবত আমাদের সাথে পৃথিবীতে যেতে চাইছে। লু মুখ শক্ত করে বলল, না, আমরা এখন কাউকে নিতে পারব না।

পল হঠাৎ করে উঠে বসে, তারপর ঘুরে লু'য়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি এখন সিসিয়ানে আসব।

না।

পল লু'য়ের কথা শুনতে পেল বলে মনে হল না, আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, সময় হয়েছে, আমাকে এক্ষুণি আসতে হবে।

না, লু শান্ত সুরে বলল, তুমি এভাবে আসতে পারবে না, তোমাকে মিলি কে তাপমাত্রায় না নামিয়ে আমি এখানে আসতে দেব না।

পল ল'ুয়ের দিকে তাকিয়ে আবার আশ্চর্য একটা শব্দ করে। সিডিসি মৃদু স্বরে সেটা অনুবাদ করে দিল, নির্বোধ মানুষ, আমাকে তোমার নিতে হবে।

লু আস্তে আস্তে বলল, সবাই নিজের জায়গায় যাও, আমরা এখন হাইপারডাইভ দেব।

মনিটরে পলের চেহারা দেখা যাচ্ছিল, সেখানে খুব সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনটা ঠিক কী, বলা যাচ্ছে না, কিন্তু দেখে কেমন জানি অস্বস্তি হয়। লু একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, পল, আমার কথার উত্তর দাও, তুমি কেন সিসিয়ানে আসতে চাও?

পল ধাতব একটা শব্দ করে, সিডিসি অনুবাদ করে দেবার আগেই লু বলল, পল, তোমাকে উত্তর দিতে হবে, তুমি কেন এখানে আসতে চাও?

আমার প্রভু বলেছে।

কে তোমার প্রভু?

পল কথার উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ল'ুয়ের কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। লু আবার জিজ্ঞেস করে, তোমার প্রভু কে পল, কী চায় সে?

পল আবার একটা ধাতব শব্দ করে, ক্রুদ্ধ জন্তুর আস্ফালনের মতো শোনাল শব্দটা। লু সিডিসিকে জিজ্ঞেস করে, কী বলল সিডিসি?

বলেছে, তার প্রভুর বংশধরকে নিয়ে যেতে হবে।

বংশধর?

হ্যাঁ।

লু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি দুঃখিত পল, তোমাকে আমরা রেখে যাচ্ছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার তোমাকে নিতে আসব। সিডিসি, তুমি হাইপারডাইভ দেবার জন্যে প্রস্তুত?

প্রস্তুত।

কিম জিবান?

প্রস্তুত।

রু-টেক, তোমার মেমোরি পাঠিয়ে দাও।

দিচ্ছি।

মুহূর্তে রু-টেকের মেমোরি চলে আসে সিডিসির মেমোরি ব্যাংকে, সাথে সাথে রু-টেকের ধাতব শরীর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আছড়ে পড়ে স্কাউটশিপের ভিতরে।

লু শান্ত গলায় বলল, কিম, হাইপারডাইভ দাও।

সিসিয়ানের প্রচণ্ড শক্তিশালী ইঞ্জিন গুঞ্জন করে ওঠে, নীলাভ আলো ছড়িয়ে পড়ে ভিতরে। কিছুক্ষণেই ওরা চলে যাবে স্থির সময়ের ক্ষেত্রে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে সবাই। কিম জিবান সাবধানে একটা একটা করে সুইচ নিজের দিকে টেনে আনে। শেষ সুইচটা চেপে ধরে সে বড় স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে দেয়, সাথে সাথে শরীর টানটান করে সবাই অপেক্ষা করতে থাকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনির জন্যে। সিসিয়ান একবার দুলে উঠে হঠাৎ স্থির হয়ে যায়। লু সাবধানে মাথা ঘুরিয়ে তাকায় কিম জিবানের দিকে, হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো প্রচণ্ড আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় ওর। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কিম জিবানের সামনে হাইপারডাইভের পুরো কন্ট্রোল প্যানেল ছিটকে উঠেছে। কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় সিসিয়ান। কিম জিবান ছিটকে পড়েছে একপাশে, পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু যেটুকু দেখা যাচ্ছে, সেটুকু রক্তে ক্ষতবিক্ষত।

নিজেকে চেয়ার থেকে মুক্ত করতে করতে লু সিডিসির গলা শুনতে পেল, হল না। হাইপারডাইভ দেয়া হল না। ট্রাইটনের অধিবাসীরা আটকে দিয়েছে আমাদের, জ্যাম করে দিয়েছে ফিডব্যাক।

লুয়ের সাথে সাথে সবাই ছুটে আসে কিম জিবানের দিকে। লু সাবধানে তাকে ধরে বসানোর চেষ্টা করে। সুশান মেডিক্যাল কিট খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল, কিম, কেমন আছ কিম?

অনেক কষ্টে কিম বলল, এখনো মরি নি।

সুশান জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে আনে, তা হলে আর মরবে না। দেখি তোমাকে একবার।

দক্ষ হাতে পরীক্ষা করে সুশান বলল, বড় ধরনের আঘাত পেয়েছ তুমি, কেটেছড়ে গেছে, হয়তো নড়তে চড়তে কষ্ট হবে কয়দিন, কিন্তু কিছু হয় নি তোমার, ভালো হয়ে যাবে।

কিম একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, কী দুঃখের কথা! মরে গেলেই মনে হয় ভালো ছিল।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলে না। লু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সিডিসি, এদিককার খবর কি?

খবর বেশি ভালো নয়। ট্রাইটনের অধিবাসীরা এমনভাবে ফিডব্যাকটা জ্যাম করেছে যে সিসিয়ানের ভালো রকম ক্ষতি হয়েছে। সিসিয়ানকে ঠিক না করা পর্যন্ত আর হাইপারডাইভ দেয়া যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলের কী খবর?

সে স্কাউটশিপে রওনা দিয়েছে, কিছুক্ষণেই পৌঁছে যাবে এখানে।

লু'য়ের সাথে সাথে সবাই মনিটরটির দিকে তাকায়। পলকে দেখা যাচ্ছে, অনেকটা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা খুব অদ্ভুত, অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত মানুষের মতো, যেন বুঝতে পারছে না কী করবে। কিন্তু একই সাথে ওর সারা শরীর কী একটা অজানা আশঙ্কায় যেন টানটান হয়ে আছে। পুরো দৃশ্যটাতে একটা অমঙ্গলের ছায়া, দেখে বুক কেঁপে ওঠে।

লু সিডিসিকে উদ্দেশ করে বলল, সিডিসি, মহাকাশকেন্দ্রে একটা খবর পাঠানো যাবে? জরুরি অবস্থার জন্যে যে চ্যানেলটা থাকে সেটা দিয়ে—

আমি দুঃখিত লু, সিডিসি বাধা দিয়ে বলল, আমরা এখন কারো সাথেই যোগাযোগ করতে পারব না। ট্রাইটনের অধিবাসীরা সবগুলি চ্যানেল জ্যাম করে রেখেছে।

লু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সিডিসি, তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?

আমি বুঝতে পারছি তুমি কী জিজ্ঞেস করতে চাইছ, সিডিসি আস্তে আস্তে বলল, আমি দুঃখিত লু, কিন্তু সেটাও আর করা সম্ভব নয়।

সত্যি?

সত্যি।

নীষা একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কী জানতে চাইছ লু?

লু একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, খুব কাপুরুষের একটা কাজ। জানতে চাইছিলাম সিসিয়ানকে উড়িয়ে দেয়া যায় কি না। সব মহাকাশযানেই খুব সহজে পুরোটা ধ্বংস করার একটা ব্যবস্থা থাকে জান তো?

আমাদেরটা নিশ্চয়ই ট্রাইটনের অধিবাসীরা জ্যাম করে দিয়েছে।

নীষা কিছু না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়, ট্রাইটনের অতিকায় লাল বৃত্তটা এখন দ্রুত ছোট হচ্ছে, ছোট হয়ে আবার বড় হবে, তারপর আবার ছোট হবে, ঠিক যেরকম পল বলেছিল।

পল আসছে। এসে সে কী করবে?

প্রভু ট্রাইটন

স্কাউটশিপটা সিসিয়ানের ডকে এসে থামল। দরজা আটকে যাওয়ার পরিচিত শব্দ হল প্রথমে, বাতাসের চাপ এক হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে ওরা, তারপর দরজা খুলে যায়। প্রথমে টাইটেনিয়ামের দরজা, তারপর সিলঝিনিয়ামের দরজা, সবশেষে স্বচ্ছ প্লেক্সি গ্লাসের দরজা। দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় পল, দেখে শিউরে ওঠে সবাই। তাকে এখন আর চেনা যায় না, আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে ওর। সারা মুখের চামড়া টানটান হয়ে আছে, দেখে মনে হয় কেউ যেন তাকে ঝলসে দিয়েছে আগুনে, শরীরের চামড়া

যেন ছোট হয়ে আর তাকে ঢাকতে পারছে না, দাঁতগুলি বেরিয়ে আসতে চাইছে মুখ থেকে। শরীরের রঙে কেমন যেন নীলচে একটা ধাতব ভাব এসে গেছে। পল যখন হেঁটে হেঁটে এগিয়ে এল, সবাই দেখল তার হাঁটার ভঙ্গি সম্পূর্ণ অন্য রকম, দেখে মনে হয় যেন মানুষ নয়, একটা অর্থহীন যন্ত্র।

কারো দিকে না তাকিয়ে পল সোজা হেঁটে যাচ্ছিল, লু ওকে একবার ডাকল। পল কিছু শুনতে পেল মনে হল না, লু তখন আবার গলা উঁচিয়ে ডাকল। পল হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, তারপর খুব ধীরে ধীরে ঘুরে লু'য়ের দিকে তাকায়। তার নিষ্পলক দৃষ্টি দেখে হঠাৎ এক অবর্ণনীয় আতঙ্কে লু'য়ের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইল, তবু সে সাহস করে ডাকল, পল, আমাকে চিনতে পারছ, আমি লু।

পল ল'্য়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, লু তখন একটু এগিয়ে এসে বলল, পল কথা বল তুমি, আমি লু, সিসিয়ানের দলপতি।

একটা ধাতব শব্দ হল হঠাৎ, ঠোঁট না নড়িয়ে আশ্চর্য শব্দ করা শিখেছে পল। সিডিসি অনুচ্চ স্বরে বলল, সাবধান লু, তোমাকে আর এগুতে নিষেধ করছে।

লু তবু এক পা এগিয়ে যায়, গলার স্বরে একটা অনুনয়ের সুর এনে বলল, পল, কিছু–একটা বল, এভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না।

পল হঠাৎ আশ্চর্য ক্ষীপ্রতায় ওকে ধরে ফেলে, তারপর কেউ কিছু বোঝার আগেই প্রচণ্ড জোরে ছুড়ে দেয় একপাশে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখে অন্ধকার দেখে লু, কষ্ট হয় ওর নিঃশ্বাস নিতে। সবাই ছুটে আসছিল, লু হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করে তাদের। চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নেয় কয়েকবার, তারপর শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে একটু ভিজিয়ে নিয়ে বলল, পল, তুমি কেন এমন করলে?

আবার আশ্চর্য একটা শব্দ করল পল।

তুমি আমাদের সাহায্য করবে না পল? তুমি তো আমাদেরই একজন।

পল তবু কিছু বলে না।

কিছু–একটা বল, লু অনুনয় করে বলে, আমি জানি তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ।

পল আবার একটা শব্দ করে।

লু কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে যায়, কাছে গিয়ে সে হঠাৎ সবাইকে অবাক করে পলের দুই হাত আঁকড়ে ধরে বলল, পল, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

পল ধীরে ধীরে নিজের বাম হাত তুলে লু'য়ের কাপড় ধরে নিজের দিকে টেনে আনতে থাকে। লু কাতর স্বরে বলল, পল, একটা কথা বল।

পল খুব ধীরে ধীরে প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে বলল, কষ্ট, অনেক কষ্ট।

কেন পল, কিসের কষ্ট?

ল'্য়ের কথার উত্তর না দিয়ে পল বলল, তোমাদের অনেক বড় বিপদ।

কেন?

অনেক কষ্ট, পল নিজের মুখ বিকৃত করে যন্ত্রণাকাতর স্বরে বলল, অনেক কষ্ট আমার, আমাকে মেরে ফেল তোমরা, দোহাই তোমাদের।

পলের শরীর কাঁপতে থাকে, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে সে। লু তাকে ধরার চেষ্টা

AMARBOI.COM

করে, কিন্তু পারে না। পল দু' হাতে মুখ চেপে ধরে গোঙানোর মতো শব্দ করে।

পল, লু মাথা নামিয়ে বলল, কেন তোমার এত কষ্ট? কোথায় তোমার কষ্ট?

মাথায়। আমাকে মেরে ফেল। দোহাই তোমাদের!

পল, তুমি ট্রাইটনের প্রাণীদের দেখেছ?

পল মাথা নাড়ে।

কেমন দেখতে তারা? কী করে তারা?

তারা নয়, পল মাথা নাড়ে, তারা মাত্র একজন।

মাত্র একজন? অবিশ্বাসের স্বরে বলে, মাত্র একজন?

হ্যাঁ।

কেমন দেখতে সে?

তোমরা দেখেছ তাকে।

দেখেছি?

হ্যাঁ।

কখন দেখেছি?

সে ট্রাইটন।

ট্রাইটন?

হ্যাঁ।

মানে গ্রহটা?

হ্যাঁ।

পুরো গ্রহটা একটা প্রাণী?

হ্যাঁ।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কথা বলতে পারে না। ল'য়ের পেটের ভিতরে কী-যেন একটা পাক দিয়ে ওঠে, ভয়ের একটা কাঁপুনি যেন মেরুদণ্ড দিয়ে বেয়ে যায়।

তোমাদের অনেক বড় বিপদ। ট্রাইটনের বংশধরকে তোমাদের সাথে নিতে হবে।

সে কোথায়?

পল হঠাৎ দু' হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বলল, আমাকে মেরে ফেল তোমরা, দোহাই তোমাদের!

সুশান এগিয়ে এসে পলের হাত ধরে, তোমাকে ত্রিশ মিলিগ্রাম রনিয়াম দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব পল, কোনো ভয় নেই তোমার।

পল মাথা নাড়ে, আমাকে কেউ ঘুম পাড়াতে পারবে না। আমার মাথায় যন্ত্রণা—

কে বলেছে, এই দেখ তুমি। সুশান মেডিকেল কিট থেকে লম্বা সিরিঞ্জ বের করে রনিয়াম টেনে নিতে থাকে।

আমার মনে হয় পল সত্যি কথাই বলছে।

রু-টেকের গলার স্বর শুনে সবাই ঘুরে তাকায়, সে স্কাউটশিপ থেকে কখন বের হয়ে এসেছে কেউ লক্ষ করে নি। হাইপারডাইভ দেবার সময় তার মেমোরিকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল, সিডিসি নিশ্চয়ই আবার সেটা ফিরিয়ে দিয়েছে। রু-টেক সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, আমার মনে হয় না তুমি ওকে ঘুম পাড়াতে পারবে সুশান।

WWW.AMARBOI.COM

কেন?

পল এখন আর পল নেই।

সে তাহলে কী?

খানিকটা মানুষ, খানিকটা যন্ত্র, খানিকটা ট্রাইটনের অংশ।

কী বলছ তুমি!

আমি দুঃখিত সুশান, কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলছি।

সুশান একটু দ্বিধা করে বলল, তাহলে আমি এখন কী করব?

আমি জানি না সুশান। তবে সত্যি যদি পলের কথামতো—

পলের কথামতো কী?

ব্লু-টেক বিব্রত স্বরে বলল, আমার নিশ্চয়ই মাথার ঠিক নেই, আমি পলের মৃত্যুচিন্তা করছিলাম।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলতে পারে না, সুশান একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, না ব্লু-টেক, আমি পারব না। এরকম একটা জিনিস আমি চিন্তাও করতে পারব না।

জানি, আমি রবোট বলেই হয়তো পেরেছি।

সুশান কোনো কথা না বলে পলের উপর ঝুঁকে পড়ে তার একটা হাত টেনে নেয় ইনজেকশান দেবার জন্যে, সাথে সাথে ভুরু কুঁচকে যায় তার। লু উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, কি হয়েছে সুশান?

পলের শরীর এত ঠাণ্ডা কেন? ও কি—

সিডিসি অনুচ্চ স্বরে বলল, আমি দুঃখিত সুশান, পল আর বেঁচে নেই। একটু আগে তার মস্তিষ্কে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল, মারা গেছে প্রায় সাথে সাথে।

কেউ কোনো কথা বলে না, সুশান আস্তে আস্তে পল কুমের হাতটি সাবধানে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। হাতের লম্বা সিরিঞ্জটি নিয়ে কী করবে ঠিক বুঝতে পারে না, অন্যমনস্কভাবে সিরিঞ্জের ভিতরে কমলা রঙের তরলটির দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে তার চোখ পানিতে ভিজে আসতে থাকে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও চোখের পানি আটকাতে পারে না, হাতে-ধরে-রাখা সিরিঞ্জটি তার চোখের সামনে আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসে।

মহাকাশযানের নিয়মানুযায়ী কান্না হচ্ছে চতুর্থ মাত্রার অপরাধ, সিডিসি তবু কাউকে সেটা মনে করিয়ে দিল না।

লু নিজের ঘরে মাথা টিপে ধরে বসে আছে, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সিডিসি।

বলুন।

আমরা এখন কী করব?

আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া সত্যি কিছু করার নেই।

কিসের জন্যে অপেক্ষা করব?

আমি জানি না। কিন্তু ট্রাইটনের নিশ্চয় কোনো পরিকল্পনা আছে, পলকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠিয়েছে সে।

কিন্তু পল তো তার পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারে নি, বেচারা তো কিছু করার আগেই মারা গেল।

তা ঠিক, কিন্তু পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আছে একটা।

খানিকক্ষণ কোনো কথা নেই। একটু পর সিডিসি আস্তে আস্তে বলল, তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব লু?

কর।

তুমি কী ভাবে বুঝতে পেরেছিলে পল আবার আগের মতো কথা বলবে?

জানি না। যখন আমার দিকে তাকাল তখন ওর নিষ্পলক দৃষ্টির ভিতরেও কোথায় জানি দেখা যাচ্ছিল আমাদের পলকে, প্রত্যেকবার আমি ওকে অনুনয় করছিলাম আর দেখছিলাম ওর দৃষ্টিতে একটু একটু করে পল ফিরে আসছিল।

তোমরা, মানুষেরা খুব আশ্চর্য! আমি সারা জীবন চেষ্টা করেও কখনো বুঝতে পারব না।

অবাক হবার কিছু নেই সিডিসি, মানুষ নিজেরাও কখনো মানুষকে বুঝতে পারে না।

সত্যিই তাই। মানুষের জীবন তাই এত সুন্দর। যদি সবকিছু সবাই বুঝে ফেলত, বেঁচে থাকার কোনো অর্থই থাকত না তাহলে।

পলের মৃত্যুটা সবাইকে খুব ভেঙে দিয়েছে সিডিসি।

হ্যাঁ। বিশেষ করে সুশান, এমনিতে ওর মনটা খুব নরম। এ-ধরনের ব্যাপারের জন্যে একেবারেই সে তৈরি হয় নি।

কী করছে সে এখন?

সিডিসি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, ও এখন দ্বিতীয় স্তরে নেমে যাচ্ছে, সম্ভবত পল কুমের মৃতদেহের পাশে গিয়ে একটু বসবে।

লু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বেচারি!

WWW.AMARBOI.COM

পলের মৃতদেহটা রাখা হয়েছে দ্বিতীয় স্তরের একেবারে শেষ ঘরটিতে। স্টেনলেস স্টিলের কালো একটা ক্যাপসুলের ভিতরে, শূন্যের নিচে আশি ডিগ্রি তাপমাত্রায়। নির্জন অন্ধকার একটা ঘরে। সুশান বুকের ভিতরে কেমন-একটা শূন্যতা অনুভব করে, এক সপ্তাহ আগেও কি কেউ জানত, পলের এরকম একটা পরিণতি হবে?

সুশান সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে। পলের মৃতদেহটি যে-ক্যাপসুলে আছে সে খানিকক্ষণ তার পাশে বসে থাকবে। ব্যাপারটি পুরোপুরি অর্থহীন, কিন্তু সবকিছুরই কি অর্থ থাকতে হয়?

কালো স্টেনলেস স্টিলের একটা ক্যাপসুল, হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখে, মসৃণ পৃষ্ঠে নিষ্করুণ শীতলতা। সুশান ফিসফিস করে বলল, পল কুম, তোমাকে আমরা ভুলব না।

ঠিক তখন একটা শব্দ হল, সুশান প্রথমে ঠিক বুঝতে পারে না কোথায়। আবার অস্পষ্ট একটা শব্দ হল, সাথে সাথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে ওঠে সুশান। ক্যাপসুলের ভিতর কী যেন নড়ছে। পল কুম প্রাণ ফিরে পেয়েছে ভিতরে? আসলে কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে মারা যায় নি? এই ধরনের কয়েকটা অযৌক্তিক জিনিস মাথায় খেলে যায় তার।

আবার অস্পষ্ট একটা শব্দ হয়, কেউ যেন মুচড়ে মুচড়ে কিছু একটা ভেঙে ফেলছে ভিতরে। সুশান পায়ে পায়ে পিছনে সরে আসে, আতঙ্কে হঠাৎ তার চিন্তা গোলমাল হয়ে যেতে থাকে। কিছু বোঝার আগে ক্যাপসুলের একটা অংশ হঠাৎ সশব্দে ফেটে যায়, আর ভিতর থেকে কিলবিলে কী যেন একটা বেরিয়ে আসে। আধা তরল আধা স্বচ্ছ থলথলে জিনিসটা ছটফট করতে করতে কেমন জানি ঘরঘর শব্দ করতে থাকে, হলুদ একটা ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় জায়গাটা ঢেকে যেতে থাকে।

কয়েক মুহূর্ত সুশান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ রক্ত-শীতল-করা স্বরে চিৎকার করে ছুটতে শুরু করে। ভয় পেয়েছে সে, অস্বাভাবিক জান্তব একটা ভয়।

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো কাঁদছিল সুশান, লু তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কি হয়েছে সুশান? বল, কি হয়েছে?

অনেক কষ্টে সুশান বলল, বংশধর! ট্রাইটনের বংশধর বেরিয়ে এসেছে। পলের শরীর থেকে।

সবাই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

সিসিয়ানের সবাইকে নিয়ে জরুরি সভা ডাকল লু। প্রচণ্ড একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে সিসিয়ানে, তার মাঝে লু মুখে একটা নির্লিপ্ততার ভাব কষ্ট করে ধরে রেখেছে, সেটা বজায় রাখার চেষ্টা করে হালকা স্বরে বলল, সিডিসি, তুমি বর্তমান অবস্থার একটা রিপোর্ট দাও।

রিপোর্ট দেয়ার বিশেষ কিছু নেই, সিডিসি নিরুত্তাপ স্বরে বলল, বেশিরভাগ জিনিস এখন এখানে অচল। আমাদের এখন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করার উপায় নেই, কেন্দ্রীয় স্টেশনে যোগাযোগ করার ক্ষমতা নেই, হাইপারডাইভ দূরে থাকুক, সিসিয়ানের এখন কক্ষপথ পর্যন্ত পাল্টানোর উপায় নেই। ট্রাইটন থেকে বিশেষ তরঙ্গের রেডিও ওয়েভ এসে সবকিছু জ্যাম করে দিয়েছে। যেভাবে এটা করা হয়েছে সেটা অবিশ্বাস্য, যদি কখনো সময় আর সুযোগ হয়, সবাইকে বুঝিয়ে দেব। যাই হোক, এক কথায় বলা যায়, আমরা এখন পুরোপুরি ট্রাইটনের নিয়ন্ত্রণে। ট্রাইটন অনুগ্রহ করে আমাকে অচল করে দেয় নি, যদিও আমার ক্ষমতা এখন খুব সীমিত।

ট্রাইটন পুরো গ্রহটা একটা প্রাণী, ব্যাপারটা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, আমি কম্পিউটার, কোনো জিনিস আগে দেখে না থাকলে আমি সেটা অনুভব করতে পারি না। সুশান হয়তো ব্যাপারটা আমাদের বোঝাতে পারবে। পলের শরীর থেকে যে-প্রাণীটি বের হয়ে এসেছে, সেটি সম্পর্কেও আমার ধারণা খুব অস্পষ্ট, থলথলে নরম একটা প্রাণী স্টেনলেসের একটা ক্যাপসুল কী ভাবে ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে আমার জানা নেই। প্রাণীটি এখন দ্বিতীয় স্তরে একটা সীসার আস্তরণ দেয়া ঘরে আছে, ঘরটির বৈদ্যুতিক তারগুলি প্রাণীটি নষ্ট করেছে বলে আমি আর তাকে দেখতে পারছি না। আমি আরো অনেক কিছু বলতে পারি, কিন্তু আমার সময় কম বলে আমি এখন চুপ করছি।

লু সুশানের দিকে তাকিয়ে বলল, সুশান কিছু বলবে?

সুশান হাত নাড়ে, আমি আর নতুন কী বলব? সিডিসি যেটা বুঝতে পারে নি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করো না আমি সেটা বুঝেছি। একটা আস্ত গ্রহ কী ভাবে একটা প্রাণী হতে পারে সেটা নিয়ে একটা জার্নালে আমি একবার একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, সেটা নেহায়েৎই একটা কাল্পনিক প্রবন্ধ ছিল। প্রবন্ধটিতে দাবি করা হয়েছিল, এরকম প্রাণীর ক্ষমতা হবে অসাধারণ, কেন, সেটা সবাই বুঝতে পারছ। পৃথিবীতে যদি মানুষের ইতিহাস কখনো পড়ে দেখ, তা হলে দেখবে তারা সবসময়েই নিজেদের ভিতরে মারামারি করছে। পৃথিবীর সভ্যতা হয়েছে ছাড়া ছাড়াভাবে, কোনো জাতি যখন একত্র হয়ে নিজেদের উন্নতি করার চেষ্টা করেছে, তখন। অনেকবার আবার অন্য জাতি এসে সে-সভ্যতা একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। পৃথিবীর সব মানুষ যদি কখনো যুদ্ধবিগ্রহ না করে সবাই একত্র হয়ে নিজেদের পুরো সম্পদ মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের পিছনে ব্যয় করত, তা হলে মানুষ কত উন্নত হত চিন্তা করা যায় না।

মানুষের যে-সমস্যা, এ ধরনের প্রাণীর সে সমস্যা নেই। এই প্রাণী কোটি কোটি সংঘবদ্ধ মানুষের মতো নিজেদের ভিতরে কোনো বিরোধ নেই। কোটি কোটি মানুষের মস্তিষ্ক যদি একসাথে কাজ করে তার যেরকম ক্ষমতা হবে,ট্রাইটনের ক্ষমতা হবে সে-রকম। কাজেই বুঝতে পারছ, এই গ্রহটি কত অসাধারণ।

এধরনের গ্রহের আবার একটা সমস্যাও আছে, আজীবন সেটি একা একা থাকে, কাজেই এর নূতন জিনিস শেখার সুযোগ নেই। আমরা যখন প্রথম ট্রাইটনের কাছে এলাম তার নিশ্চয় বিস্ময়ের সীমা ছিল না। আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানত না, কত তাড়াতাড়ি কত কিছু শিখে নিয়েছে, সে তো তোমরা সবাই দেখলে।

সুশান একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার আর কিছু বলার নেই।

সুশান, নীষা জিজ্ঞেস করে, ট্রাইটনের বংশধর নিয়ে কিছু বলবে?

সুশান কাতর মুখে বলল, আমাকে সেটা নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করো না। এখনো মনে হলে আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রাণীটি নিঃসন্দেহে ট্রাইটনের বংশধর, পল কুমের শরীরে ছিল, সময় হলে বের হয়ে এসেছে। ব্রু-টেকের শরীরে কিছু আছে কি না আমি জানি না—সম্ভবত নেই।

ব্রু-টেক মাথা নেড়ে বলল, আমি সিডিসিকে নিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করেছি, আমার শরীরে কিছু নেই। আমরা যন্ত্র বলে আমাদের শরীরে এখন যদি কিছু না থাকে, ভবিষ্যতে সেটা সৃষ্টি হতে পারে না। মানুষের বেলায় সেটি সত্যি নয়, তাদের মস্তিষ্কে গোপন একটা কোড দিয়ে দেয়া যায় নিজের অজান্তে সেটা শরীরে অস্বাভাবিক বিক্রিয়া শুরু ক'রে আশ্চর্য পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। পলের বেলায় নিশ্চয়ই তা-ই ঘটেছে।

সুশান মাথা নেড়ে বলল, ঠিকই বলেছ, জীববিজ্ঞানে এর একটা নাম আছে, গ্রুট এনোমলি[২৪] বলা হয়, ব্যাপারটা এখনো বিজ্ঞানীরা বুঝে উঠতে পারেন নি। যাই হোক, ট্রাইটনের বংশধর এখন ছোট, কিন্তু যেহেতু তাকে অনেক বড় হতে হবে, তাই তাকে অনেক বড় একটা গ্রহে যেতে হবে। সেই গ্রহের বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের প্রাচুর্য সম্ভবত ট্রাইটনের মতো হওয়া দরকার, তোমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর মৌলিক পদার্থের প্রাচুর্যের সাথে ট্রাইটনের অনেক মিল রয়েছে। সম্ভবত সে-কারণেই এই দু'টি গ্রহেই প্রাণের আবির্ভাব হয়েছিল, যদিও দু'টি একেবারে ভিন্ন ধরনের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীষা মাথা নেড়ে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, তুমি বলছ এই বংশধর জিনিসটা নিয়ে কোনো একটা গ্রহে ফেলে দিলে ধীরে ধীরে পুরো গ্রহটা আরেকটা ট্রাইটনে পরিণত হবে?

সম্ভবত।

শুনে সবার কেমন জানি গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

লু হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের হাতে কতটুকু সময় আছে আমি জানি না, আমাকে কয়েকটা জিনিস বলে দিতে দাও। প্রথম কথাটি সবাই জান, আমরা এখন চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি আছি, আমাদের কী হবে বলা কঠিন। দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথাটি থেকেও ভয়ংকর, সম্ভবত আমাদের সাথে সাথে সারা পৃথিবী এখন প্রচণ্ড বিপদের মুখোমুখি আছে। যদি ট্রাইটন সত্যি সত্যি সিসিয়ানে করে পৃথিবীতে তার বংশধর পাঠাতে পারে, সেটি হয়তো আমাদের পৃথিবীকে গ্রাস করে নিয়ে আরেকটা কুৎসিত ট্রাইটন তৈরি করে দেবে। আমি তোমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি না, তার সময় পার হয়ে গেছে—সত্যি কথা বলছি। কাজেই আমার মনে হয়, আমাদের প্রথম দায়িত্ব পৃথিবীকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। তার জন্যে যদি—

লু অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে হঠাৎ চুপ করে যায়। খানিকক্ষণ নিজের আঙুলগুলি মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে মাথা তুলে বলল, তার জন্যে যদি আমাদের সবাইকে নিয়ে সিসিয়ানকে ধ্বংস করে দিতে হয়, তাহলে সেটাই করতে হবে।

কেউ কোনো কথা না বলে পাথরের মতো মুখ করে চুপ করে থাকে। লু একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দলপতির দায়িত্ব সবাইকে রক্ষা করা, সবাইকে নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া নয়, কিন্তু আমি সত্যি কোনো উপায় দেখছি না।

কেউ কোনো কথা বলল না। লু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমাদের কারো আপত্তি আছে?

সবাই মাথা নাড়ে, কারো কোনো আপত্তি নেই, এরকম একটা ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকতে পারে না। এরা পুরো জীবনের বেশিরভাগ কাটিয়েছে মহাকাশে-মহাকাশে। পৃথিবীতে থাকার সৌভাগ্য আর কয়জনের হয়? পৃথিবী নিয়ে ওদের আশ্চর্য একটা স্বপ্ন আছে, সেই স্বপ্ন কেউ ধ্বংস করে দিতে চাইলে তারা সেটা কী ভাবে হতে দেয়? তাদের তো সেভাবে বড় করা হয় নি।

লু কী একটা বলতে চাইছিল, রু-টেক বাধা দিয়ে বলল, তুমি সিসিয়ানকে ধ্বংস করবে কেমন করে? ট্রাইটন কি সেটা বন্ধ করে রাখে নি?

রেখেছে, কিন্তু ধ্বংস করা খুব সহজ, সৃষ্টিটাই কঠিন। আমরা যদি সত্যি সিসিয়ানকে ধ্বংস করতে চাই, কিছু-একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারব। রু-টেক মাথা নেড়ে চুপ করে যায়।

তোমাদের সবাইকে এখন একটা দায়িত্ব দিচ্ছি, সবাইকে নিয়ে সিসিয়ানকে ধ্বংস করে দেয়ার সবচেয়ে কার্যকর একটা পথ খুঁজে বের করা।

লু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দিও, আমার সত্যি কিছু করার নেই।

কিম জিবান জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, লু, তোমার এত খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই, এটা তোমার দোষ নয় যে, আমরা এই নরকে এসে হাজির

AMARBOI.COM

হয়েছি। যখন যেটা করার প্রয়োজন সেটা করতে হবে না?

তা হয়তো হবে, কিন্তু আমি তোমাদের দলপতি, তোমাদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমার।

নীষা একটু ইতস্তত করে বলল, লু, ব্যাপারটা এতটা ব্যক্তিগতভাবে দেখার প্রয়োজন নেই, তুমি আমাদের দলপতি, কিন্তু তোমার উপর আমাদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কথাটা ঠিক না। তোমার দায়িত্ব ঠিক পরিবেশে ঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া। এই অবস্থায় আর কোনো উপায় নেই, তাই তুমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছ, এটা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, তোমার সিদ্ধান্তটি সঠিক সিদ্ধান্ত, দুঃখজনক হতে পারে, কিন্তু সঠিক। আমাদের সবার চমৎকার জীবন কেটেছে, এখন যদি আমাদের মারা যেতে হয়, তা নিয়ে বাড়াবাড়ি দুঃখ করার কিছু নেই। পৃথিবীকে যদি ট্রাইটনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারি, সেটা নিয়ে বরং আমাদের হয়তো একটু অহঙ্কারই হওয়া উচিত।

লু নীষার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে, চমৎকার স্বচ্ছ মেয়েটার বিচার-বিবেচনা, খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারে। মাথা নেড়ে বলল, নীষা, তুমি বড় ভালো মেয়ে, আমার কষ্টটা তুমি কমিয়ে দিয়েছ। মুখের হাসিটা জোর করে ধরে রেখে বলল, সুশান, তুমি কিছু বললে না?

সুশান একটু চমকে উঠে দুর্বলভাবে হেসে বলল, আমি খুব ভীতু মানুষ, মরতে আমার খুব ভয় করে। একটু থেমে আবার বলল, দুঃখ নয়, ভয়। মৃত্যুযন্ত্রণা নাকি খুব ভয়ানক।

লুয়ের মুখের হাসি মুছে সেখানে একটা তীব্র বেদনার ছাপ এসে পড়ে। আস্তে আস্তে বলল, আমি দুঃখিত সুশান।

সুশান একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, তোমার দুঃখ পাবার কিছু নেই লু, তোমার দলে যদি একটা ভীতু মেয়ে থাকে, সেজন্যে তোমার দুঃখ পাবার কী আছে?

সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। লু একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল, রু-টেক, তুমি কিছু বলবে?

আমি দুঃখিত লু, যে, এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে হল। আমার নিজের জন্যে কোনো দুঃখ নেই, কারণ আমার ঠিক মৃত্যু হবে না, কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে আমার আরো একটা কপি আছে। কিন্তু তোমাদের তো কোনো কপি থাকে না। মানুষ এত অসাধারণ, কিন্তু তবু কত সহজে তারা শেষ হয়ে যেতে পারে। আমি দুঃখিত লু।

সিডিসি, তুমি কিছু বলবে?

আমি খুব দুঃখিত, এ ছাড়া আমার কিছু বলার নেই।

আমার সিদ্ধান্তে তোমার কোনো আপত্তি আছে?

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে সিডিসি উত্তর দিল, না, নেই।

লু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা সবাই আমার সিদ্ধান্তে রাজি হয়েছ বলে তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এবারে আমি তোমাদের কাছে আরো একটা অনুরোধ করতে চাই।

কি?

প্রয়োজনে আমরা সবাইকে নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাব, কিন্তু তার মানে এই নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করব না। আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। সে জন্যে যদি আমাদের কোনো–একজনকে প্রাণ দিতে হয়, দেব।

সুশান মাথা নেড়ে বলল, আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কী বলছ।

বলছি, যদি একজনের প্রাণ দিয়ে অন্যদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেকগুণ বেড়ে যায়, তাকে প্রাণ দিতে হবে।

কিম বাধা দিয়ে বলল, কী বলছ তুমি, লু? কার প্রাণ দিয়ে তুমি অন্যদের বাঁচাবে?

লু হাত তুলে কিমকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সিডিসি, তুমি বলতে পার, সে–রকম কেউ কি আমাদের মাঝে আছে?

সিডিসি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে।

সিডিসি।

সিডিসি তবু কথা বলে না।

সিডিসি, আমার কথার উত্তর দাও।

সিডিসি আস্তে আস্তে প্রায় ফিসফিস করে বলল, লু সত্যি তুমি তাই চাও?

হ্যাঁ সিডিসি।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

সত্যি তুমি চাও আমি প্রাণ দিই?

আমি দুঃখিত সিডিসি। ট্রাইটনের আমাদের কাউকে প্রয়োজন নেই, তার প্রয়োজন শুধু তোমাকে। তুমি জান, ট্রাইটন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, অন্য সবাইকে শেষ করে শুধু তোমাকে। তোমাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এখনো শুরু করে নি, কিন্তু ইচ্ছা করলেই পারে। তোমার নিয়ন্ত্রণটুকু নিয়ে নিলে আমাদের আর কোনো উপায় থাকবে না, তুমি তখন সিসিয়ানকে যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারবে।

অনেকক্ষণ সিডিসি কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকে। যখন কথা বলে, তখন তার গলার স্বর বিষণ্ন, আস্তে আস্তে অনেকটা আপন মনে বলে, আমি কখনো ভাবি নি আমার একদিন শেষ হয়ে যেতে হবে।

আমরাও কেউ সেটা ভাবি নি সিডিসি।

লু, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না, লু। আমার খুব ইচ্ছে করছে থেকে যাই।

আমি দুঃখিত সিডিসি।

খুব ইচ্ছে করছে বেঁচে যাই। কোনো বড় মহাকাশযানে নয়, কোনো ছোট ছেলের খেলাঘরে তার খেলার সাথী হয়ে থেকে যাই।

আমি দুঃখিত সিডিসি।

কতবার আমি মহাকাশ পারাপার দিয়েছি, কতবার কত গ্রহ–নক্ষত্রে ঘুরে বেরিয়েছি, কত মহাকাশচারীর দুঃখ–বেদনার সাথী হয়ে কাটিয়েছি। কত স্মৃতি, কত অভিজ্ঞতা, সব চোখের পলকে শেষ হয়ে যাবে, কোথাও কিছু থাকবে না? সিডিসি ২১১২, ওমেগা গোষ্ঠীর ষষ্ঠ কম্পিউটারের চতুর্থ পর্যায় আর থাকবে না?

আমি দুঃখিত সিডিসি।

সত্যি তুমি চাও আমি যাই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি দুঃখিত সিডিসি, কিন্তু আমি সত্যিই তাই চাই, আমার নিজের জন্যে নয়। পৃথিবীর জন্যে।

দীর্ঘ সময় সিডিসি চুপ করে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে, বিদায় লু। বিদায় সুশান, নীষা, কিম জিবান আর রু–টেক। বিদায়।

বিদায়।

নরম গলায় নীষা বলল, আমরা তোমায় মনে রাখব সিডিসি, সারা জীবন তোমাকে মনে রাখব।

নীষা।

বল।

যাবার আগে তোমাকে একটা উপহার দিয়ে যেতে পারি?

দাও।

তোমার ঘরে টেবিলের উপর রেখে গেলাম, যদি কখনো সুযোগ হয় দেখো।

দেখব।

বিদায়, সবাই।

বিদায়।

পর মুহূর্তে সিডিসি ২১১২, ওমেগা গোষ্ঠীর ষষ্ঠ কম্পিউটারের চতুর্থ পর্যায় তার অপারেটিং সিস্টেম[২৫] আর আটচল্লিশ টেরা বাইট মেমোরি ধ্বংস করে ফেলল।

অন্ধকার নেমে এল সিসিয়ানে সাথে সাথে।

AMARBOI.COM

অনাহূত আগন্তুক

কন্ট্রোল–রুমে আবছা অন্ধকার, সিডিসি ধ্বংস করে দেয়ার পর সিসিয়ানে একটা বড় বিপর্যয় নেমে এসেছে। মহাকাশযানের জটিল কাজকর্মগুলি দূরে থাকুক, বাতাসের চাপ বা তাপমাত্রা ঠিক রাখার মতো ছোটখাট জিনিসগুলি করতে গিয়ে পর্যন্ত সবাই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। সবাই মিলে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেবার পরেও কিছুতেই মূল দায়িত্বগুলিও পালন করা যাচ্ছে না। কন্ট্রোল–রুমে সবাই যখন সিসিয়ানকে মূল কক্ষপথে ধরে রাখার চেষ্টা করছিল, তখন হঠাৎ দরজায় কার ছায়া পড়ে। সুশান আতঙ্কে নীল হয়ে গিয়ে ভাঙা গলায় বলল, কে, কে ওখানে?

ছায়ামূর্তি কোনো কথা না বলে আরো এক পা এগিয়ে আসে। সিসিয়ানে এখন আলো খুব বেশি নেই, এগিয়ে আসার পরও তার চেহারা ভালো দেখা গেল না। সুশানের মনে হল, ট্রাইটনের বংশধর বুঝি মানুষের আকার নিয়ে চলে এসেছে। ভয়–পাওয়া গলায় বলল, কে, কে ওখানে?

ছায়ামূর্তি খসখসে গলায় পাল্টা প্রশ্ন করে, আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, কে ওখানে?

লম্বা ছায়া ফেলে একজন মাঝবয়সী লোক এগিয়ে আসে, পরনে আধময়লা কাপড়, মুখে খোঁচা–খোঁচা দাড়ি। লোকটা চোখ পিটপিট করে বলল, আমি কোথায়?

এটি কোন জায়গা?

লু হঠাৎ করে বুঝতে পারে লোকটা কে এবং হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়েছে। ডান হাতে একটা থ্রটল চেপে ধরে গলা উঁচিয়ে বলল, এটি মহাকাশযান সিসিয়ান।

সত্যি যদি এটা একটা মহাকাশযান হয়, তা হলে এটা এত অন্ধকার কেন? এরকম এলোমেলোভাবে ঘুরছে কেন? তাপমাত্রা এত কম কেন? বাতাসের চাপ কি ঠিক করা হবে, নাকি এরকমভাবে রেখে একসময় ফুসফুসটাকে ফাটিয়ে দেওয়া হবে?

কিম জিবান গলা নামিয়ে লুকে জিজ্ঞেস করে, লোকটা কে?

নিশ্চয়ই শীতল-ঘরে[২৬] ছিল। সিডিসি যাবার আগে জ্ঞান ফিরিয়ে দিয়ে গেছে, সিডিসি ছাড়া তো আর জীবন্ত কাউকে শীতল রাখা যায় না।

কোথায় যাবার কথা ছিল ভদ্রলোকের?

জানি না, আমাদের জানার কথাও না। সিডিসি জানত।

লোকটি আরো এক পা এগিয়ে এসে রুক্ষ স্বরে বলল, গুজগুজ করে ওখানে কী কথা হচ্ছে? আমাকে কি কেউ কিছু-একটা বলবে?

লু কিম জিবানের হাতে থ্রটলটা ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যায়। বলছি। আমার নাম লু, আমি এখানকার দলপতি।

এটি কী জিনিস?

এটি একটা মহাকাশযান, আসলে বলা উচিত এটি কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত একটা মহাকাশযান ছিল।

এখন কী হয়েছে?

লু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, একটা খুপরি, একটা ভাঙা ঘর, একটা উপগ্রহ, যা ইচ্ছে হয় বলা যায়।

কেন? এ অবস্থা হল কেমন করে?

আমাদের মূল কম্পিউটারটি ধ্বংস হয়ে গেছে।

লোকটি অবাক হয়ে বলল, ধ্বংস হয়ে গেছে?

লু একটু ইতস্তত করে বলল, আসলে আমরা ধ্বংস করে ফেলেছি।

লোকটার খানিকক্ষণ সময় লাগে বিশ্বাস করতে, খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে বলল, ধ্বংস করে ফেলেছ? ইচ্ছে করে?

হ্যাঁ।

কেন?

সেটা অনেক বড় ইতিহাস, এখন শুনে কাজ নেই। তা ছাড়া তুমি নিশ্চয়ই এইমাত্র ফ্রিজিং ক্যাপসুল থেকে উঠে এসেছ, বিশ্রাম নেয়া দরকার। আমাদের মূল কম্পিউটার নেই বলে ঠিক ঠিক সবকিছু করতে পারব না, সবাই কোনো-না-কোনো কাজে ব্যস্ত। আমাদের একজন সময় পেলেই—

লোকটা বাধা দিয়ে বলল, তার আগে শুনি, কেন কম্পিউটারটাকে ধ্বংস করেছ।

লু শান্ত গলায় বলল, শোনার অনেক সময় পাবে, এখন আমার কথা শুনে-

লু, কিম জিবান উচ্চস্বরে ডাকল, তাড়াতাড়ি আস, আর সামলাতে পারছি না।

লু কথার মাঝখানে থেমে প্রায় ছুটে কিম জিবানের পাশে গিয়ে থ্রটলটা চেপে ধরে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ে–অসময়ে সে কম্পিউটারের কাজগুলি নিজে নিজে করার চেষ্টা করত বলে এসব ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা অন্যদের থেকে অনেক বেশি। কখনো সেটা কোনো কাজে আসবে চিন্তা করে নি। লোকটা লুয়ের পিছু পিছু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে, বলবে?

লু মনিটর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, সত্যি এখনি শুনতে চাও?

হ্যাঁ।

নীষা, তুমি ভদ্রলোককে একটু গুছিয়ে বলবে? আমি খুব ব্যস্ত এখানে।

নীষা নিজেও খুব ব্যস্ত, সিডিসির সাথে সাথে সিসিয়ানের প্রায় চার হাজার কম্পিউটারের সবগুলি অচল হয়ে গিয়েছে, সেগুলি আলাদা আলাদাভাবে কাজ করার জন্যে তৈরি হয় নি। নীষা চেষ্টা করছে সে–রকম একটা দু'টা কম্পিউটারকে চালু করতে, ওদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে তা হলে। একটা কম্পিউটারের অসংখ্য ডাটা লাইনগুলি সাবধানে ধরে রেখে সে লোকটাকে অল্প কথায় ওদের অবস্থাটা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ট্রাইটনের কথা শুনে লোকটি খুব বেশি বিচলিত হল বলে মনে হল না, কিন্তু যেই মুহূর্তে সে সিডিসিকে ধ্বংস করে দেয়ার কথাটি শুনল, সে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না, অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে নিজের চুল খামচে ধরে বলল, কী বললে তুমি? তোমরা নিজের ইচ্ছায় ২১১২ নম্বরের তৃতীয় মাত্রার একটা কম্পিউটার ধ্বংস করে দিয়েছ? ২১১২ নম্বরের কম্পিউটারের কত বড় ক্ষমতা, তুমি জান? তাও তৃতীয় মাত্রার! পৃথিবীতে ফিরে গেলে তোমাদের নামে খুনের অপরাধ দেয়া হবে, খেয়াল আছে?

তৃতীয় মাত্রার হলে দেয়া হত। আমি যে–কম্পিউটারের কথা বলছি, সেটা তার পরবর্তী পর্যায়ের, সেটি চতুর্থ পর্যায়ের।

লোকটি কোনো কথা বলতে পারে না, খানিকক্ষণ লাগে তার ব্যাপারটা বুঝতে। একটু পরে সে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, কী বললে? চতুর্থ পর্যায়?

হ্যাঁ।

কিন্তু চতুর্থ পর্যায় তো মানুষ থেকে বেশি ক্ষমতা রাখে, এটি একমাত্র কম্পিউটার, যেটাকে মানুষ থেকে বেশি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, নিজেকে বাঁচানোর জন্যে এটার মানুষ খুন করার অনুমতি আছে।

জানি।

তা হলে?

তা হলে কী?

কী ভাবে ধ্বংস করলে সেটাকে?

তোমাকে একবার বলেছি, তুমি শোন নি। আবার বলছি, আমরা এখন একটা মহাবিপদে আছি, পৃথিবীর অস্তিত্ব এর সাথে জড়িত। মূল কম্পিউটার সিডিসি থাকলে ট্রাইটনের আমাদের কারো প্রয়োজন নেই, তাই সিডিসিকে চলে যেতে বলা হয়েছে।

কিন্তু কেন সে গেল, তার যাবার কোনো প্রয়োজন নেই, মানুষ থেকে সে বেশি মূল্যবান—

কিন্তু পৃথিবী থেকে সে বেশি মূল্যবান নয়। তা ছাড়া সিডিসি আমাদের ভালবাসত, আমাদের বিশ্বাস করত। আমাদের বাঁচানোর জন্যে তার প্রাণ দেয়াটা খুবই স্বাভাবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার।

লোকটা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ইস, কী দুঃখের ব্যাপার! চতুর্থ সিরিজের একটা ২১১২! চতুর্থ সিরিজের! আমি কত গল্প শুনেছি, কখনো চোখে দেখি নি।

নীষা একটু অবাক হয়ে লোকটাকে দেখে, চতুর্থ সিরিজের কম্পিউটারকে নিয়ে এরকম উচ্ছ্বাস বিচিত্র নয়, কিন্তু তাই বলে এরকম অবস্থায়? সে জিজ্ঞেস না করে পারল না, তুমি মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছ না। আমরা খুব বিপদের মাঝে আছি—

তা বুঝেছি, কিন্তু বিপদ তো মানুষের সব সময়েই থাকে। আমার কয়েকটা হিসেব করার ছিল। জিটা নিউট্রিনোর ভরের সাথে সুপারসিমেট্রিক বোজনের একটা হিসেব। ভালো কম্পিউটারের অভাবে করতে পারি নি, এখন যদি সিডিসিকে পেতাম, আহা— সে দশ সেকেন্ডে করে দিতে পারত!

বিস্ময়ে নীষার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। এরকম পরিবেশে যে অঙ্ক কষার জন্যে একটা কম্পিউটার খুঁজতে পারে, তার মাথাটা কি পুরোপুরি খারাপ নয়? নীষার চোখে চোখ পড়তেই লোকটা হঠাৎ থতমত খেয়ে থেমে গেল, একটু লজ্জা পেয়ে কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল, আমি একজন পদার্থবিজ্ঞানী, পঞ্চম বিজ্ঞান সম্মেলনে গিয়েছিলাম। সেখানে জিটা নিউট্রিনোর ভরের উপর একটা সমস্যা ছিল, সেটা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটু আগে যখন ঘুম ভাঙল, হঠাৎ একটা সমাধানের কথা মনে হল। একটা ভালো কম্পিউটার পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম সমাধানটা বের করা যায় কি না।

আমি খুব দুঃখিত, এখন এখানে ভালো খারাপ কোনো কম্পিউটারই নেই।

তাই তো দেখছি!

লোকটা বিমর্ষ ভঙ্গিতে এক কোনায় গিয়ে বসে। নীষা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম?

লুকাস। ইউরী লুকাস। ইউরী বলে ডাকতে পার।

ইউরী কোনো কথা না বলে নিজের মাথা চেপে ধরে চুপচাপ বসে থাকে। এরকম অবস্থায় জিটা নিউট্রিনোর সুপার সিমেট্রিক বোজনের ভর বের করতে না পেরে কারো এত আশাভঙ্গ হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না। লোকটিকে দেখে লুয়ের একটা আশ্চর্য হিংসা হয়, জ্বালা–ধরানো আক্রোশের মতো একটা হিংসা! সেও যদি সবকিছু ভুলে এই লোকটার মতো কোনো একটা জটিল অঙ্কের সমস্যা নিয়ে বসে থাকতে পারত!

ইউরী দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে এক সময় নীষার দিকে তাকিয়ে বলল, এই পুরো গ্রহটা একটা প্রাণী বলে দাবি করছ?

হ্যাঁ।

তার মানে এর আকার অনেক বড়। সম্ভবত এর ক্ষমতাও অনেক বেশি। কিন্তু এটা মানুষ থেকে বেশি উন্নত, সেটা কিভাবে বুঝতে পারলে?

নীষা একটু অবাক হয়ে বলল, পল কুম আমাদের মতো একজন মানুষ, তাকে খুলে সে আবার নূতন করে তৈরি করেছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা তো বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রমাণ হল না। বুদ্ধিমান প্রাণী হলে পল কুমের অনুকরণ না করে নূতন কিছু তৈরি করত।

নীষা হঠাৎ করে ইউরীর কথার কোনো উত্তর দিতে পারে না। ইউরী আস্তে আস্তে বলল, একটা ধাড়ি শিম্পাঞ্জীকে দেখলে একটা মানবশিশু থেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে মানবশিশু শিম্পাঞ্জী থেকে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। এখানেও কি এধরনের ব্যাপার হচ্ছে?

লু কিম জিবানের হাতে গ্রটলটা ধরিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে, তুমি ঠিকই ধরেছ, ক্ষমতা বেশি হওয়া মানেই বুদ্ধি বেশি, তা ঠিক নয়। কিন্তু ক্ষমতা যখন এত বেশি হয়ে যায়, যে, আমাদের সেটা অনুভব করার পর্যন্ত শক্তি থাকে না, তখন বুদ্ধি কম না বেশি তাতে আর কিছু আসে-যায় না। আমরা সম্ভবত কোনোদিন ঠিক করে জানতেও পারব না, তার বুদ্ধিমত্তা কোন স্তরের।

ইউরী ভুরু কুঁচকে বলল, সত্যি?

এখানে যখন এসেছ, দেখবে।

গ্রহটার সাথে যোগাযোগ করেছ?

চেষ্টা করেছিলাম, লাভ হয় নি। আমাদের সাথে তার যোগাযোগ করার কোনো ইচ্ছে নেই। আমরা মোটামুটিভাবে তার হাতের মুঠোয়, কাজেই তার যোগাযোগ করার কোনো প্রয়োজনও নেই।

যোগাযোগ করতে পারলে মন্দ হত না।

কেন?

যদি জিটা নিউট্রিনোর ভরের সমস্যাটা বুঝিয়ে দিতে পারতাম, সমাধানটা হয়তো করে দিতে পারত।

লু খানিকক্ষণ ইউরীর দিকে তাকিয়ে থেকে ফিরে গেল, লোকটার সম্ভবত সত্যি মাথা খারাপ। হয়তো তাকে কোনো-একটা পাগলা-গারদে পাঠানো হচ্ছিল।

ইউরী লুয়ের পিছনে পিছনে এগিয়ে আসে, জিজ্ঞেস করে, কোনো কি উপায় নেই যোগাযোগ করার?

একেবারে নেই তা হতে পারে না, কিছু-একটা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সিডিসিকে ধ্বংস করে দেয়ার পর এখন আমাদের আর চেষ্টা করার কোনো উপায় নেই।

ও। ইউরী অত্যন্ত বিরস মুখে এক কোনায় বসে থাকে, তার মুখ দেখে মনে হয় একটা ভালো কম্পিউটারের অভাবে তার বেঁচে থাকা পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে গেছে!

সিসিয়ানকে মোটামুটি আয়ত্তের মাঝে আনার পর দলের দু'একজন প্রথমবারের মতো একটু বিশ্রাম নেবার সুযোগ পায়। সেই সময় কিম জিবানের চোখে পড়ে, দেয়ালের এক কোনায় একটা লাল বাতি একটু পরে পরে জ্বলছে এবং নিভছে। কাছে গিয়ে সে একটা আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করে। লাল বাতিটির উপরে ছোট ছোট করে লেখা, তোমরা যদি বিপদগ্রস্ত হয়ে থাক, তা হলে এই সুইচটি চেপে ধর।

কিম জিবান সুইচটি চেপে ধরার আগে লুকে ডেকে আনে। লু খানিকক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আশ্চর্য ব্যাপার, আমি ভেবেছিলাম, মহাকাশকেন্দ্রে বুঝি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছু শেখানো হয়, এই জিনিসটা আমাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে। দেখা যাক কী আছে ভিতরে।

লু সুইচটা চেপে ধরতেই একটা চ্যাপ্টা ধরনের বাক্স খুলে গেল। ভিতরে ছোট ছোট করে লেখা, তোমাদের মূল কম্পিউটার ধ্বংস হয়ে গেছে, এটি অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার, মহাকাশ অভিযানের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র একবার এধরনের একটা ব্যাপার ঘটেছিল। তোমরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিপদের মাঝে রয়েছ, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের কোনো ধরনের সাহায্য প্রয়োজন। মূল কম্পিউটার ধ্বংস হয়ে গেছে বলে এই মুহূর্তে তোমাদের পক্ষে যোগাযোগ করা অসম্ভব। এই গোপন বাক্সটিতে যোগাযোগের জন্যে একটি অত্যন্ত প্রাচীন যন্ত্র দেয়া হল। এটি একটি নিউট্রিনো[২৭] জেনারেটর, কোনোরকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বা অভিজ্ঞ মানুষ ছাড়াই এটি চালু করা সম্ভব। যন্ত্রটির সুইচ টিপে নিউট্রিনোর সংখ্যা বাড়ানো এবং কমানো যায় এবং যন্ত্রটির নলটি যেদিকে মুখ করে রাখবে, নিউট্রিনোগুলি সেদিকে বের হবে। কাজেই তোমাদের দায়িত্ব মহাকাশকেন্দ্রের দিকে নলটি ঘুরিয়ে এটি চালু করা এবং নিউট্রিনোর সংখ্যা বাড়িয়ে কমিয়ে সেখানে কোনো ধরনের সংকেত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। সময় নষ্ট না করে এই মুহূর্তেই তোমরা এটি ব্যবহার শুরু করে দাও। মনে রেখো, তোমরা অত্যন্ত বিপদের মাঝে রয়েছ এবং তোমাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা মাত্র শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য শূন্য তিন কিংবা আরো কম।

বাক্সের নিচে একটা ছেলেমানুষি যন্ত্র। লু খানিকক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিম জিবান উত্তেজিত স্বরে বলল, বেঁচে গেলাম তা হলে আমরা! লু তাড়াতাড়ি চালু কর এই ব্যাটাকে।

নীষা শান্ত স্বরে বলল, এত তাড়াতাড়ি নয়, আগে একটু ভেবে দেখা দরকার। সিডিসি বেঁচে থাকতেই ট্রাইটন আমাদের সবরকম যোগাযোগ বন্ধ করে রেখেছিল, এখন সিডিসিও নেই। এটা চালু করতেই যদি ট্রাইটন বুঝে ফেলে বন্ধ করে দেয়?

লু মাথা নেড়ে বলল, মনে হয় না এটা ট্রাইটন বুঝতে পারবে, আমি নিউট্রিনো সম্পর্কে খুব বেশি জানি না, কিন্তু যেটুকু জানি তা থেকে এটুকু বলতে পারব, লক্ষ লক্ষ নিউট্রিনো ট্রাইটনের ভিতর দিয়ে চলে যাবে, ট্রাইটন টের পর্যন্ত পাবে না।

ইউরী কখন ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ দেখে নি। তার চাপা হাসি শুনে সবাই ঘুরে তাকাল। লু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, কি, আমি ভুল বলেছি?

না না। কিছু ভুল বল নি। এটা ধরে নেয়া মোটেও ভুল নয় যে ট্রাইটন তার শক্তির জন্যে উইক ইন্টারঅ্যাকশান[২৮] ব্যবহার করে না।

তা হলে হাসছ কেন?

ইউরী আঙুল দিয়ে ছেলেমানুষি যন্ত্রটাকে দেখিয়ে বলল, ওটা দেখে।

ওটা দেখে হাসার কী হয়েছে?

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, তখন পদার্থবিজ্ঞান ক্লাসে আমার এইরকম একটা যন্ত্র ব্যবহার করে একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়েছিল।

তাতে কী হয়েছে?

এটা একটা ছেলেমানুষি জিনিস, ল্যাবরেটরিতে কমবয়সী ছাত্রেরা এসব দিয়ে কাজ করে, এটার কোনো ব্যবহারিক গুরুত্ব নেই। কেউ–একজন ঠাট্টা করে এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে রেখেছে।

ইউরী সত্যি বলছে, না ঠাট্টা করছে, তারা বুঝতে পারল না। কিম জিবান একটু রেগে বলল, বাজে কথা বলো না, এরকম ব্যাপার নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে না।

দেখতেই পাচ্ছ কেউ কেউ করে।

তুমি বলতে চাইছ, এটা কাজ করে না?

না না, কাজ করবে না কেন, অবশ্যি করে।

তা হলে?

কাজ করলেই তো হয় না, যেটার যে-কাজ, সেটা তার থেকে বেশি তো করতে পারে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত নিউট্রিনো আছে, জান? এই মুহূর্তে তোমার শরীর দিয়ে সেকেন্ডে অন্তত এক বিলিয়ন নিউট্রিনো যাচ্ছে, তুমি টের পাও না, কারণ সেগুলি তোমার শরীরের সাথে কোনোরকম বিক্রিয়া করছে না। এই নিউট্রিনো জেনারেটরটা সেকেন্ডে খুব বেশি হলে মিলিয়নখানেক নিউট্রিনো তৈরি করতে পারে, সেটা কি কয়েক বিলিয়ন মাইল দূর থেকে কেউ ধরতে পারবে? বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে মানি, কিন্তু সব কিছুরই তো একটা মাত্রা আছে।

সুশান একটু সন্দেহ নিয়ে ইউরীর দিকে তাকিয়ে ছিল, ইউরী সেটা লক্ষ করে বলল, আমার কথা বিশ্বাস হল না?

কেউ তার কথার উত্তর দিল না। ইউরী মাথা ঘুরিয়ে একবার সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি পদার্থবিজ্ঞানের লোক, সারা জীবন আমি নিউট্রিনো নিয়ে কাজ করে এসেছি।

সবাই চুপ করে ইউরীর দিকে তাকিয়ে থাকে, ইউরী একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, তোমরা এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছ, যেন দোষটা আমার। আমি তো কিছু করি নি। একটা মিথ্যা আশা নিয়ে থাকা থেকে সত্যি কথাটা জানা কি ভালো নয়?

নীষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারলাম না, এরকম একটা অযৌক্তিক ব্যাপার কেন করা হবে? কেন একটা মহাকাশযানে একটা খেলনা নিউট্রিনো জেনারেটর রাখা হবে?

সেটা আমাকে খুব অবাক করছে না, লু একটু হেসে বলল, মানুষ প্রথম যখন মঙ্গল গ্রহে গিয়েছিল, তারা সাথে কী নিয়ে গিয়েছিল জান?

কী?

রিভলবার। সেটা কখন কোথায় কী ভাবে ব্যবহার করবে কেউ জানত না, তবু নিয়ে গিয়েছিল। কাজেই অযৌক্তিক জিনিস মানুষের কাছে আশা করা এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। এখানেও হয়তো সে-রকম কিছু-একটা হয়েছে। এই নিউট্রিনো জেনারেটরটা হয়তো সেই রিভলবারের মতো; কাজ করে, কিন্তু কোনো কাজে আসে না।

সুশান আস্তে আস্তে বলল, মনে হয় একটু মিথ্যে আশা দেয়ার জন্যে এটা রাখা হয়েছে। দেখা গেছে, মানুষকে অল্প একটু আশা দিয়ে অনেক আশ্চর্য কাজ করিয়ে নেয়া যায়।

কিম জিবান শুষ্কমুখে বলল, তাহলে আমরা কি এটা ব্যবহার করব না?

ব্যবহার করব না কেন, অবশ্যি ব্যবহার করব, তবে এর থেকে কিছু আশা করব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। নেহায়েত যদি আমাদের ভাগ্য খুব ভালো হয়, খুব কাছে দিয়ে যদি একটা মহাকাশযান যায়, হয়তো আমাদের সংকেত শুনে আমাদের সাহায্য করতে আসবে।

ইউরী হাসি গোপন করার কোনো চেষ্টা না করে বলল, এর থেকে একটা রিভলবার দিয়ে কয়েকবার ফাঁকা আওয়াজ করা ভালো, শব্দ শুনে কারো আসার সম্ভাবনা মনে হয় একটু বেশি হতে পারে।

কথাটি একটি রসিকতা মাত্র, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণেই কেউই সেই রসিকতাটুকু উপভোগ করতে পারল না।

খানিকক্ষণ আলোচনা করে নীষাকে এই নিউট্রিনো জেনারেটরটি চালু করার ভার দেয়া হল, সে চারদিকে বিপদগ্রস্ত মহাকাশযানের সংকেত পাঠাতে থাকবে। নিউট্রিনো রশ্মি সেই সংকেত সত্যি সত্যি নিয়ে যাবে বিলিওন বিলিওন মাইল দূরে, কেউ সেটা পাবে কিনা, কে বলতে পারে? ইউরী বলছে পাবে না, বিজ্ঞানের বর্তমান উৎকর্ষতায় পাওয়া সম্ভব না। কিন্তু কেউ তো পেতেও পারে, আশা করতে তো দোষ নেই, মানুষের আশা যদি না থাকে, তা হলে তারা বেঁচে থাকবে কী নিয়ে?

নীষা ধৈর্য ধরে নিউট্রিনো রশ্মি পাঠাতে থাকে, চেষ্টা করছে চারদিকে পাঠাতে, বিশেষ করে যেদিকে মহাকাশকেন্দ্র রয়েছে, সেদিকে। খুব সাবধানে সে ট্রাইটনকে এড়িয়ে চলছিল, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই অবস্থায় সে কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। নীষা এবং অন্য সবাই আশা করেছিল যে, ইউরীর ধারণা সত্যি নয় এবং নিউট্রিনো রশ্মি চালু করা মাত্রই দূর মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সাহায্য এসে যাবে। কিন্তু তাদের ধারণা সত্যি নয়, দেখতে দেখতে সময় কেটে যেতে থাকে, কিন্তু কোনো মহাকাশযানই তাদের উদ্ধার করার জন্যে হাজির হয় না। যতই সময় যাচ্ছে ততই তারা বুঝতে পারছে, আসলে ইউরীর কথাই সত্যি, এই নিউট্রিনো জেনারেটরটি একটি খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়।

AMARBOI.COM

লু নিজের ঘরে মাথা চেপে বসে আছে, এখন কী করবে সে? ট্রাইটন তার বংশধরকে সিসিয়ানে পাঠিয়ে দিয়েছে, এখন তাকে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে যাবার কথা। সিসিয়ানে সিডিসি নেই, কাজেই এখন ফিরে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। সিসিয়ানকে চালিয়ে নেবার জন্যে ট্রাইটনের এখন কী পরিকল্পনা, কে জানে? লু চিন্তা করার চেষ্টা করে, সে ট্রাইটন হলে কী করত? প্রথমত, নিশ্চিত করার চেষ্টা করত বাইরের কেউ যেন জানতে না পারে এখানে ট্রাইটনের বংশধর রয়েছে, যাকে এখন পৃথিবীতে নেয়ার কথা। কাজেই চেষ্টা করত সবাইকে মেরে ফেলতে, তার বংশধর খুব সহজেই সেটা করতে পারে, কিন্তু করছে না। কাজেই ধরে নেয়া যায়, ট্রাইটন সেটা চাইছে না। চাওয়ার কথাও নয়, কারণ তাহলে সিসিয়ান ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু সিসিয়ানকে এখন পৃথিবীতে ফেরত পাঠাতে চাইবে, কী ভাবে সেটা সম্ভব? ট্রাইটন এখন তাদের বাধ্য করবে বাইরের কোনো জীবিত প্রাণীর সাথে যোগাযোগ না করে তাদের পৃথিবীতে পাঠানোর। কী ভাবে করবে সে?

এই সময় দরজায় কার জানি ছায়া পড়ে, লু তাকিয়ে দেখে, নীষা ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি হয়েছে নীষা?

ইউরী—

কী হয়েছে ইউরীর?

আমাকে এসে বলেছে ট্রাইটনে একটা খবর পাঠাতে। আমি রাজি হই নি, তখন কোথা থেকে একটা রিভলবার জোগাড় করে এনে আমার মাথায় ধরেছে।

মাথায়? লু চমকে উঠে বলল, কেন?

বলেছে নিউট্রিনো জেনারেটরটি ট্রাইটনের দিকে মুখ করে ধরতে।

ট্রাইটনের দিকে?

হ্যাঁ।

কেন?

ইউরী ট্রাইটনের কাছে খবর পাঠাতে চায়, ওর নাকি জিটা বোজনের উপরে কী একটা সমস্যা আছে।

লু তার জীবনে কখনোই হঠাৎ করে রেগে ওঠে নি, কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম হল, হঠাৎ করে তার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, কোথায় সেই বদমাশ?

লু।

কি?

ওর কাছে একটা রিভলবার আছে।

রিভলবারের নিকুচি করি আমি—লু ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। সিসিয়ান ছাড়া ছাড়াভাবে দুলছিল, তার মাঝে তাল সামলে লু হেঁটে যেতে থাকে। কোনার ঘরটাতে ইউরী দরজা বন্ধ করে আছে, লু লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে।

ইউরী উবু হয়ে যেন কি করছিল, লুকে দেখে চমকে উঠে দু'হাতে রিভলবারটি চেপে তুলে ধরে, ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলে, সাবধান, গুলি করে দেব।

লু ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা এগিয়ে যায়, উদ্যত রিভলবারটি পুরোপুরি উপেক্ষা করে সে ইউরীর কলার চেপে ধরে বলে, তুমি আমাকে গুলির ভয় দেখাও? কর দেখি গুলি, তোমার কত বড় সাহস!

ইউরী একেবারে হকচকিয়ে যায়, নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু-একটা বলতে চাইছিল, লু তাকে সুযোগ না দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধমকে ওঠে, তুমি ট্রাইটনে খবর পাঠাতে চাইছ আমার অনুমতি ছাড়া? তুমি জান এটা একটা মহাকাশযান, আর আমি এই মহাকাশযানের দলপতি? আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে ট্রাইটনে ছুড়ে দিতে পারি? কাউকে আমার কৈফিয়ত পর্যন্ত দিতে হবে না?

ইউরী নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছে, রিভলবারটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, আমি খুব দুঃখিত, তোমরা যে ব্যাপারটা এভাবে নেবে, আমি বুঝতে পারি নি।

বুঝতে পার নি? তুমি একজনের মাথায় রিভলবার ধরে ভয় দেখিয়ে কাজ করিয়ে নেবে আর আমরা সেটা সহজভাবে নেব?

ইউরী দুর্বলভাবে হেসে বলল, রিভলবারে গুলি নেই, ভয় দেখানো ছাড়া এটা আর কোনো কাজে আসে না। আমি মেয়েটাকে বললাম, চল, ট্রাইটনে একটা খবর পাঠানোর চেষ্টা করে দেখি, মেয়েটা রাজি হল না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই তুমি তার মাথায় রিভলবার চেপে ধরলে?

বলেছি তো গুলি নেই, একটু ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিলাম। কী করব বল, এমনিতে রাজি না হলে আমি কী করব?

তোমার ট্রাইটনের সাথে যোগাযোগ করার এত কী প্রয়োজন?

এই নিউট্রিনো জেনারেটর দিয়ে তোমরা দূরে কোথাও যোগাযোগ করতে পারবে না, একমাত্র যোগাযোগের চেষ্টা করতে পার ট্রাইটনের সাথে, সে কাছে আছে, মাত্র হাজার কিলোমিটার। তার সাথে যোগাযোগ করতে কোনো ক্ষতি তো নেই! যদি সত্যি বুদ্ধিমান প্রাণী হয়, মুখোমুখি কথা বলতে ক্ষতি কী, হয়তো তাকে কিছু একটা বোঝাতে পারব।

পেরেছ?

না। তাকে বলেছি সে যদি আমাদের সংকেত বুঝতে পারে তা হলে যেন বড় লাল বৃত্তটি আস্তে আস্তে ছোট করে ফেলে।

করেছে?

না, করে নি।

ও। লু কি বলবে বুঝতে পারে না, খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, ইউরী তাকে ডাকল, লু।

কি হল।

আমি কি ট্রাইটনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করতে পারি?

লু একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোমার ইচ্ছে।

করিডোর ধরে হেঁটে যেতে যেতে লু দেখল, নীষা একটা গোল জানালার পাশে বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। লুকে দেখে আস্তে আস্তে বলল, ট্রাইটনকে দেখেছ?

কী হয়েছে?

বড় লাল বৃত্তটি কেন জানি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

বংশধর

ট্রাইটনের সাথে কথাবার্তা হল খুব সংক্ষিপ্ত। প্রশ্নগুলি করতে হল এমনভাবে, যেন হ্যাঁ কিংবা না বলে উত্তর দেয়া যায়। হ্যাঁ হলে বড় বৃত্তটি বড় করবে, না হলে ছোট। এভাবে কথোপকথন করা খুব কষ্ট, কিন্তু তবু ওরা চেষ্টার ত্রুটি করল না। খুব বেশি লাভ হল না, কারণ ট্রাইটন হ্যাঁ কিংবা না কোনো উত্তরই বেশিক্ষণ দিতে চাইল না।

প্রথম প্রশ্ন করল লু, জিজ্ঞেস করল, তুমি কি আমাদের যেতে দেবে?

না।

তুমি আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে চাও?

কোনো উত্তর নেই।

আমাদের সভ্যতা নিয়ে তোমার কোনো কৌতূহল আছে?

কোনো উত্তর নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি তোমার বংশধরকে পৃথিবীতে পাঠাতে চাও?

হ্যাঁ।

কিন্তু এটা কি সত্যি নয়, যে, আমরা যদি ফিরে না যাই তুমি তোমার বংশধরকে পৃথিবীতে পাঠাতে পারবে না?

কোনো উত্তর নেই।

লু খানিকক্ষণ ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি আমাদের মেরে ফেলতে চাও?

কোনো উত্তর নেই।

আমরা কি তোমার বংশধরকে মেরে ফেলব?

না না না—

এরপর হঠাৎ করে ট্রাইটন তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া বন্ধ করে দেয়। অনেক চেষ্টা করেও কোনো লাভ হল না। কি করা যায় ঠিক করার জন্যে সবাই একত্র হয়েছে লুয়ের ঘরে, ইউরী ছাড়া। সে এখনো নিউট্রিনো জেনারেটর দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে ট্রাইটনের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে। তার বিশ্বাস, কোনোভাবে যদি তাকে জিটা নিউট্রিনোর সুপার সিমেট্রিক বোজনের ভরের সমস্যাটা বুঝিয়ে দেয়া যায়, সে তার একটা কিছু উত্তর বলে দেবে। মরতে যদি হয়ই সুপার সিমেট্রিক বোজনের ভরের মানটুকু জেনে মরতে দোষ কী?

লুয়ের ঘরটা একটু ছোট, কিন্তু সবাই তবু এখানেই এসে বসেছে। খোলামেলা জায়গায় বসতে আর কেউ নিজেকে নিরাপদ মনে করে না, কোন দিক দিয়ে ট্রাইটনের বংশধর এসে কী করে বসে, কে জানে। দরজার কাছে কিম জিবান বসেছে, হাতে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, তিন ধরনের ভিন্ন ভিন্ন রশ্মি বের হয় এটা দিয়ে, ছয় ইঞ্চি স্টেনলেস স্টিলের পাতকে ফুটো করে ফেলতে পারে এই রশ্মি, ট্রাইটনের বংশধর থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে এর থেকে ভালো অস্ত্র আর কী হতে পারে?

দীর্ঘ সময় সবাই চুপ করে বসে থাকে, কী নিয়ে কথা বলবে ঠিক যেন বুঝতে পারছে না। লু কয়েকবার কী-একটা বলতে গিয়ে চুপ করে যায়, ব্যাপারটি সবাই লক্ষ করেছে, কিন্তু তবু সাহস করে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। যে কথাটি লু বলতে চাইছে না, সেটি ভালো কিছু হতে পারে না। নীষা শেষ পর্যন্ত সাহস করে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, তুমি কি কিছু বলবে, লু?

হ্যাঁ, কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না।

কেন, কী হয়েছে?

লু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলেই ফেলল, আমি সিসিয়ানকে ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা করে ফেলেছি। তিন ঘন্টা পর সিসিয়ান উড়ে যাবে।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলতে পারে না।

কারো বিশেষ কিছু বলার ছিল না। সুশান একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, এখন তোমার কী করার ইচ্ছে?

তিন ঘন্টা সময় খুব অল্প, আমাদের বিশেষ কিছু করার নেই সুশান।

ও! সুশান এর থেকে বেশি কিছু বলার খুঁজে পেল না।

সিসিয়ানকে ধ্বংস করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। ট্রাইটনের বংশধর

নিশ্চয়ই এখন আমাদের একজন একজন করে শেষ করে দেবে, সিসিয়ান তখন ভূতুড়ে একটা উপগ্রহের মতো ঝুলতে থাকবে এখানে। যারা আমাদের উদ্ধার করতে আসবে, তারা জানবে না এখানে কী হয়েছিল, খুব সম্ভব তারা না জেনেই তাদের মহাকাশযানে করে ট্রাইটনের বংশধরকে নিয়ে যাবে পৃথিবীতে। সেটা কিছুতেই ঘটতে দেয়া যায় না।

রু-টেক বলল, সিসিয়ানকে নিয়ে আমরা সবাই যদি ধ্বংস হয়ে যাই, তা হলে যারা পরে আমাদের খোঁজে আসবে, তারা আবার আমাদের অবস্থায় পড়বে না তুমি কেমন করে জান?

আমি জানি না, কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। যারা আমাদের খোঁজে আসবে তারা অন্তত জানবে এখানে রহস্যময় কিছু-একটা ঘটেছে, সিডিসির মতো একটা কম্পিউটার সিসিয়ানের মতো একটা মহাকাশযানকে বাঁচাতে পারে নি, মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এমন কখনো ঘটে নি। কাজেই তারা প্রস্তুত হয়ে আসবে, আমাদের যে-বিপর্যয় হয়েছে, তাদের সেটা হবে না।

লু একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি খুবই দুঃখিত যে, তোমাদের রক্ষা করতে পারলাম না। তোমাদের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি যে একটু আনন্দের ব্যবস্থা করব, আমার এখন তার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

নীষা বলল, তুমি শুধু শুধু নিজেকে অপরাধী ভেবো না লু, আমাদের প্রাণ বাঁচানোর দায়িত্ব তোমার নয়। আমি আগেই বলেছি, তোমার দায়িত্ব ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া। তুমি সেটা নিয়েছ। আমি তোমার পাশাপাশি কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে সব সময়ে ধন্য মনে করেছি।

কিম জিবান একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, তাই নিজে থেকে কিছু বলতে চেষ্টা করছি না। তবে নীষা যেটা বলেছে সেটা পুরোপুরি আমারও মনের কথা।

সুশান বলল, আমারও।

রু-টেক বলল, আমি ইচ্ছে করলে অনেক গুছিয়ে কথা বলতে পারি, কিন্তু তার চেষ্টা করব না। কারণ নীষা যেটা বলেছে আমিও একই জিনিস অনুভব করি।

লু একটু অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলল, আমার অপরাধবোধকে কমানোর চেষ্টা করছ বলে তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। তোমাদের মতো সহকর্মীর সাথে কাজ করেছি বলেই আমি এত নিশ্চিন্ত মনে মারা যেতে পারব। শেষ সময়টুকু তোমরা কে কী ভাবে কাটাতে চাও জানি না, আমি ঠিক করেছি সেটা ট্রাইটনের বংশধরকে খুঁজে বের করে কাটাব।

কিম জিবান জিজ্ঞেস করল, খুঁজে পেলে কী করবে লু?

মেরে ফেলব।

কিম জিবান শব্দ করে হেসে বলল, তোমার মনের জোর আছে লু।

এখন আর কিছু থেকে লাভ নেই, মনের জোরটাই যদি আরো কিছুক্ষণ টিকিয়ে রাখে।

লু, আমি যদি তোমার সাথে বংশধর নিধনকাজে যোগ দিই, তোমার আপত্তি আছে? ট্রাইটনকে না পেয়ে তার বংশধরের উপরেই মনের ঝালটুকু মিটিয়ে নিই!

না, আমার কোনো আপত্তি নেই।

নীষা বলল, আমরা একা একা বসে থেকে কী করব, আমরাও আসি তোমাদের সাথে।

বেশ।

সুশান আস্তে আস্তে বলল, অপেক্ষা করা খুব ভয়ংকর ব্যাপার, বিশেষ করে সেটা যদি শেষ সময়ের জন্যে হয়।

কী ভাবে বংশধরকে খুঁজে বের করা হবে, সেটা নিয়ে এক দুই মিনিট কথা বলে নেয়া হল। সিসিয়ানে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রয়েছে মাত্র দু'টি, কাজেই একসাথে দু'টির বেশি দল যেতে পারবে না। ঠিক করা হল, এক দিকে যাবে কিম জিবান আর সুশান, অন্য দিকে লু আর নীষা। সিডিসি নেই বলে দুই দলে যোগাযোগ রাখা ভারি কঠিন ব্যাপার, রু-টেক তাই কন্ট্রোল-রুমে বসে সেই দায়িত্ব পালন করার দায়িত্ব নিল। রু-টেক বংশধরকে খুঁজে বের করতে ওদের থেকে অনেক বেশি কার্যকর হত সন্দেহ নেই, কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে কেউ চুপচাপ বসে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় কাটাতে চাইছিল না। রু-টেক রবোট, সে তার ভয়ের সুইচটি বন্ধ করে সানন্দে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে পারে।

প্রস্তুত হতে হতে ওদের আরো কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল। সিসিয়ানের মোট তিনটি স্তর রয়েছে। পল কুমের মৃতদেহ রাখা হয়েছিল দ্বিতীয় স্তরে, তাই ঠিক করা হল সেটাই আগে দেখা হবে। পুরো এলাকাটি অনেক বড়, খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতি এবং নানা ধরনের জিনিসপত্রে বোঝাই। সিডিসি না থাকায় এই স্তরে আলো নিষ্প্রভ, কোথাও কোথাও একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পলের মৃতদেহ যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে ওরা শুরু করে, লু নীষাকে নিয়ে রওনা দিল সামনের দিকে, কিম জিবান সুশানকে নিয়ে পিছন দিকে। ওদের মাথায় লাগানো উজ্জ্বল আলো, ইচ্ছে করলে জ্বালাতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে নিভিয়ে দিতে পারে। কানে ছোট হেডফোনে রু-টেকের মাধ্যমে অন্য দলের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা। আপাতত নীষা আর কিম জিবান স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দু'টি নিয়ে হাঁটছে, যেটুকু ওজন হলে অস্ত্রটি সহজে টেনে নেয়া যেত এগুলি তার থেকেও বেশ খানিকটা ভারি, তাই ঠিক করা হয়েছে কিছুক্ষণ পরে পরে হাতবদল করা হবে।

ওরা নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরের সামনে দাঁড়ায়, একজন লাথি দিয়ে আচমকা দরজা খুলে দিয়েই সরে যায়, অন্যজন বিদ্যুৎগতিতে অস্ত্র তাক করে ঘরে ঢুকে পড়ে। মাথায় লাগানো উজ্জ্বল আলোতে ঘরটা ভরে যায়, ওরা তখন লক্ষ করার চেষ্টা করে, হঠাৎ করে ঘরের ভিতরে কিছু নড়ে গেল কি না, কোনো কিছু সরে গেল কি না। তন্নতন্ন করে ওরা অস্বাভাবিক কিছু একটা খুঁজতে চেষ্টা করে। প্রাণীটা দেখতে কেমন, কত বড়, কোনো ধরনের ধারণা নেই, তাই ভালো করে ওরা জানেও না, ঠিক কী খুঁজছে। ভিতরে ভিতরে ওদের একটা অশরীরী আতঙ্ক, প্রতিবার একটা দরজা খুলে ঢোকার আগে ওদের একজনের আরেকজনকে সাহস দিতে হয়, ভিতরে ঢুকে যখন দেখে কিছু নেই, ওরা তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

ঘন্টাখানেক কেটে যায় এভাবে, কিছু দেখতে পাবে তার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। এমনিতে ব্যাপারটিতে কষ্টকর কিছু নেই, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে অজানা একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতঙ্ক নিয়ে কাজ করা ভারি যন্ত্রণাদায়ক, মানুষ এরকম অবস্থায় খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যায়। অন্য সময় হলে ওরা থেমে বিশ্রাম নিত, কিন্তু আজ অন্য ব্যাপার। টিকটিক করে ঘড়িতে সময় বয়ে যাচ্ছে, যতক্ষণ তারা এই অমানুষিক কাজে নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে পারে, ততক্ষণ ওদের মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করার দুরূহ কাজটি করতে হয় না। তবু হয়তো তারা খানিকক্ষণের জন্যে থামত, কিন্তু হঠাৎ করে তারা বংশধরের সাক্ষাৎ পেয়ে গেল।

সুশান ঘরের দরজাটি লাথি মেরে খুলে সরে যাবার আগের মুহূর্তে বলল, সাবধান!

কিম জিবান থমকে দাঁড়ায়। সামনে তাকিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল, ঘরটির মেঝের অংশবিশেষ কেউ খুব সাবধানে যেন কেটে নিয়েছে। কাটা অংশ দিয়ে নিচের স্তর দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলতে পারে না।

রু-টেকের গলার স্বর শোনা গেল, কী হয়েছে?

এখনো জানি না। ঘরটার জায়গায় জায়গায় কেউ কেটে নিয়েছে, প্রাণীটাই হবে নিশ্চয়ই।

দেখা যাচ্ছে প্রাণীটাকে?

ওরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খোঁজার চেষ্টা করে প্রাণীটাকে, কিন্তু কোথাও কিছু নেই। কিম জিবান আস্তে আস্তে বলল, এখনো দেখছি না।

কী করবে এখন তুমি?

ভিতরে গিয়ে খুঁজব।

যে-প্রাণী স্টেনলেস স্টিল আর টাইটেনিয়ামের দেয়াল কেটে নিতে পারে, সেটার সাথে লড়তে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয় কিম।

তা ঠিক, কিন্তু কী করব বল? তুমি বরং লুকেও আসতে বল এদিকে।

বলছি।

কিম জিবান লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে শক্ত হাতে অস্ত্রটিকে ধরে ঘরের ভিতরে এক পা ঢোকে, সাথে সাথে সরসর করে কোথায় জানি কি একটা শব্দ হল, মনে হল কিছু একটা যেন হঠাৎ বাম দিকে সরে গেছে।

কিম জিবান বাম দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে সাবধানে আরো এক পা এগিয়ে যায়। পিছনে পিছনে সুশান এসে ঢোকে, উত্তেজনায় তার বুকের ভিতরে ঢাকের মতো শব্দ হচ্ছে, ফিসফিস করে বলল, কিছু-একটা আছে বাম দিকে।

বাম দিকে সিসিয়ানের দেয়াল, নানা ধরনের পাইপ, বৈদ্যুতিক এবং অপটিকেল তারগুলি ওদিক দিয়ে গিয়েছে। ছোটখাটো একটা যন্ত্রপাতির স্তর রয়েছে ওপাশে, তার পিছনে কিছু-একটা আশ্রয় নিয়েছে বলে মনে হয়। আবছা অন্ধকার ওখানে, ভালো করে দেখা যায় না। কিম জিবান আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে সাবধানে এগিয়ে যায়, সাথে সাথে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ে সে একপাশে, কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বুঝতে পারে না কি হচ্ছে। সাবধানে উঠে দাঁড়ায় কিম জিবান, ঘরে হলুদ রঙের ধোঁয়া, ঝাঁঝাল গন্ধে ঘর ভরে গেছে, খক-খক করে কাশতে থাকে সে। সামনে গোলাকার আরেকটা গর্ত। একটু আগেও সেখানে কিছু ছিল না। পিছনে তাকিয়ে দেখে, সুশান ফ্যাকাসে মুখে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

কী হয়েছে কিম?

জানি না, প্রাণীটা সম্ভবত একপাশ থেকে অন্য পাশে সরে গেল।

তোমাদের কোনো ক্ষতি হয় নি তো?

না।

দেখেছ প্রাণীটাকে?

না, কিম জিবান সুশানের দিকে তাকায়, তুমি দেখেছ?

সুশান ফ্যাকাসে মুখে মাথা নাড়ে, না, লাল মতন কী একটা জানি উপরে উঠে আছড়ে পড়েছে, এত তাড়াতাড়ি হয়েছে যে কিছু বুঝতে পারি নি। একটু থেমে যোগ করল, আমার ভয় লাগছে কিম।

লাগারই কথা। ফিরে যাবে? দরকার কি জীবনের শেষ সময়টা ভয় পেয়ে নষ্ট করার?

রু-টেকের গলা শুনতে পেল আবার, কিম আর সুশান, আমি লুয়ের সাথে কথা বলেছি, সে নীষাকে নিয়ে আসছে তোমাদের দিকে। সে না আসা পর্যন্ত তোমরা নিজে থেকে কিছু কোরো না।

বেশ।

কিম জিবান অস্ত্র হাতে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকে, ভয়াবহ একটা আতঙ্ক এসে ভর করেছে ওর উপর।

লুয়ের পিছু পিছু নীষা ছুটে আসছিল, হঠাৎ দু'জনেই থমকে দাঁড়াল, যেখানে কিম আর সুশান রয়েছে তার করিডোরে একটা বড় গর্ত। ওরা একটু আগেই এদিক দিয়ে গিয়েছে, তখন গর্তটা সেখানে ছিল না। হলুদ রঙের একটা ধোঁয়া ভাসছে বাতাসে, ঝাঁঝাল একটা গন্ধ সেখানে। লু থমকে দাঁড়ায়, তারপর রু-টেকের সাথে যোগাযোগ করে রু।

কি হল?

তুমি কিম আর সুশানকে বল, আমাদের আসতে একটু দেরি হবে।

সমস্যা?

হ্যাঁ, করিডোর ধরে আসার উপায় নেই, পুরোটা কেউ উধাও করে দিয়েছে।

ও।

লু নীষাকে নিয়ে অন্যদিকে ছুটে গেল, মনে মনে যে আশঙ্কাটি করছিল সত্যিই তাই ঘটেছে, অন্য পাশেও করিডোরটি উধাও করে দিয়েছে কেউ। চারদিক থেকে কিম আর সুশানকে আলাদা করে ফেলেছে প্রাণীটি, কী করবে এখন ওদের? লু আবার রু-টেকের সাথে যোগাযোগ করে রু।

বল।

কিম আর সুশান ঠিক কোথায় আছে জান?

জানি।

কত ভালো করে জান?

খুব ভালো করে, ওদের শরীরে একটা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বীপার লাগানো আছে, আমি সেটা থেকে বলতে পারি ঠিক কোথায় তারা আছে। তোমরা কোথায় আছ সেটাও জানি—

আমাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। রু-টেক শোন।

বল।

কিম আর সুশান যেখানে আছে, তার উপরের স্তরে কী আছে?

আর্কাইভ ঘর। প্রয়োজনীয় দলিল।

ঘরটাকে সিসিয়ান থেকে পুরোপুরি আলাদা করা যায়?

শুধু ওটাকে করা যাবে না, কিন্তু পাশাপাশি দু'টি ঘরকে একসাথে করা যাবে।

চমৎকার। তুমি ঘর দু'টিকে আলাদা করে, বায়ুশূন্য করে ফেল। আমি আসছি।

লু।

বল।

তুমি কী করতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু কাজটা একটু বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে না?

দু'ঘন্টা পর আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব, বড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমরা খুব বেশি হলে দু'ঘন্টা সময় হারাব, বুঝতে পেরেছ?

পেরেছি।

কিম জিবান স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে পিছন থেকে খামচে ধরে রেখেছে সুশান। প্রচণ্ড আতঙ্কে সে অনেকটা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো হয়ে গেছে। ঘরের কোনায় বড় বড় যন্ত্রপাতি এবং মনিটরগুলির পিছন থেকে অনেকক্ষণ থেকে কেমন জানি একটা অনিয়মিত তীক্ষ্ণ শব্দ হচ্ছিল। হঠাৎ করে কী একটা জানি নড়ে যায়, কিন্তু ওরা ঠিক ধরতে পারে না, কী। যে-প্রাণী অবলীলায় শক্ত স্টেনলেস স্টিলের দেয়াল মুহূর্তে উধাও করে দিতে পারে, তার পক্ষে মানুষকে শেষ করা কঠিন কিছু নয়, কিন্তু প্রাণীটি এখনো তাদের কিছু করছে না। তাদের চারদিক থেকে আলাদা করে এনেছে, এখন কী করবে তাদের?

হঠাৎ সুশান চিৎকার করে ওঠে, ঐ দেখ—

কিম জিবান স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে যায়, কোথাও কিছু নেই। শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে সুশান?

ভয়-পাওয়া গলায় সুশান মেঝের দিকে দেখায়, ঐ দেখ।

ঘরের কোনা থেকে কী-একটা জিনিস যেন আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে, দুই-তিন ইঞ্চি পুরু তরল পদার্থের মতো। উপরে হলুদ ধোঁয়ার আস্তরণ।

কিম জিবান স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি ঘুরিয়ে সেদিকে ধরতেই, হঠাৎ তরল পদার্থের মতো জিনিসটি যেন থমকে দাঁড়াল, তারপর উত্তপ্ত পানির মতো টগবগ শব্দ করে ফুটতে থাকে, সারা ঘর ঝাঁঝাল গন্ধে ভরে যায় হঠাৎ।

কী ওটা?

জানি না। আরেকটু কাছে এলেই মেগাওয়াটের পার্টিকেল বীম[২৯] চালিয়ে দেব, শেষ করে দেব শুওরের বাচ্চাকে।

কিমের কথা শুনেই যেন তরল পদার্থের আস্তরণটি শীতল হয়ে গেল, টগবগ করে ফোটা বন্ধ করে সেটি আবার ধীরে ধীরে এগুতে থাকে। উপরের হলুদ ধোঁয়াটি সরে যেতেই ওরা দেখতে পায়, আস্তরণটির উপরে আশ্চর্য একধরনের নকশা তৈরি হচ্ছে,

দেখে কখনো মনে হয় অজস্র সরীসৃপ, কখনো মনে হয় অসংখ্য প্রেত। অস্বস্তিকর একধরনের শব্দ করতে করতে জিনিসটা এগিয়ে আসতে থাকে, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে তাদের, কী করবে এখন?

কিম জিনিসটার মাঝামাঝি তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি তাক করে ট্রিগার টেনে ধরে, নীলাভ একটা রশ্মি বের হয়ে আসে, সাথে সাথে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। ধোঁয়া সরে যেতেই দেখে তরল পদার্থের মতো জিনিসটা প্রচণ্ড শব্দ করে ফুটছে, পার্টিকেল বীম সেটির কোনোরকম ক্ষতি করেছে, তার কোনো চিহ্ন নেই।

কিম, লুয়ের গলা শুনতে পেল, কিম শুনছ?

হ্যাঁ লু, ভয়ানক বিপদে আছি আমরা, কী একটা জিনিস—

কিম, এখন তোমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই, তুমি আমার কথা শোন।

এগিয়ে আসছে সেটা আমাদের দিকে, আর কয়েক ফুট মাত্র বাকি।

আমার কথা শোন এখন, তুমি তোমার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি তের মেগাবাইটে সেট কর, তারপর মাথার উপর তুলে ধর, সোজা উপরের দিকে।

ধরেছি।

আমি বলামাত্রই গুলি করবে। তের মেগাওয়াট পার্টিকেল বীম প্রায় তিন ফুট ব্যাসের একটা গর্ত করে ফেলবে ছাদে। উপরের ঘরটা এখন বায়ুশূন্য, তোমার ঘর থেকে প্রবল বেগে বাতাস উঠে আসবে, শুরু হবে প্রায় ছয় শ' কিলোমিটার দিয়ে, সেই বাতাস তোমাদের টেনে আনবে উপরে—

কিন্তু—

তোমরা হয়তো মারা যাবে প্রচণ্ড আঘাতে, কিন্তু আমরা সবাই তো মারা যাব কিছুক্ষণের মাঝে। আমি দুঃখিত, কিন্তু আর কিছু করার নেই কিম। হাত উপরে তুলে রাখ কিম আর সুশান—

লু, শোন, তুমি—

শোনার কিছু নেই, গুলি করতে প্রস্তুত হও কিম, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে কঠিন স্বরে চিৎকার করে বলল, টানো ট্রিগার।

ভয়ানক একটা বিস্ফোরণ হল মাথার উপরে, গোল একটা গর্ত হয়ে গেল মুহূর্তে। প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটায় কিম জিবান আর সুশান গুলির মতো উড়ে গেল উপরে। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখে, তারা উড়ে যাচ্ছে বাতাসে, দু'হাতে মাথা বাঁচিয়ে রাখে তারা, কিন্তু কিছু বোঝার আগেই প্রচণ্ড গতিতে আছড়ে পড়ে সিসিয়ানের দেয়ালে, মুহূর্তে জ্ঞান হারালো দু'জনেই।

রু-টেক কিম আর সুশানের অচেতন দেহ সরিয়ে নেয় সাবধানে, সে বায়ুশূন্য পরিবেশে থাকতে পারে বলে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। মেঝের ফুটো দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বাতাস আসছে, বাতাসের চাপ সমান হওয়ামাত্রই থেমে যাবে। রু-টেক শঙ্কিত দৃষ্টিতে গর্তটির দিকে তাকিয়ে থাকে। নিচের প্রাণীটি কি উঠে আসবে উপরে? সম্ভবত নয়, ঝুঁকি নেবে না নিশ্চয়ই।

বাতাসের চাপ সমান হতেই দরজা খুলে যায়, উদ্বিগ্ন মুখে লু আর নীষা অপেক্ষা করছে পাশের ঘরে। রু-টেককে জিজ্ঞেস করল, কি অবস্থা?

AMARBOI.COM

ভালো নয়। এখনো বেঁচে আছে দু'জনেই। আঘাতটা মাথায় লাগে নি, কাজেই বেঁচে যাবার ভালো সম্ভাবনা ছিল।

ওদের ধরাধরি করে পাশের ঘরে সরিয়ে নিয়ে রু-টেক ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে, ছোটখাটো কয়েকটা ব্যান্ডেজ এদিকে-সেদিকে লাগিয়ে দেয় যত্ন করে। ঘন্টাখানেক পরে সবাইকে নিয়ে এই মহাকাশযানটি চিরদিনের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে, তবুও চোখের সামনে আহত দু'জনকে কোনোরকম সাহায্য না করে কেমন করে থাকে? নীষা সিসিয়ানের জরুরি ঘর থেকে দু'টি স্টেনলেস স্টিলের ক্যাপসুল নিয়ে আসে, ওরা তিনজন মিলে যখন কিম আর সুশানকে সাবধানে ভিতরে শুইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছিল, ঠিক তখন কাতর শব্দ করে সুশান চোখ খুলে তাকায়, কয়েক মুহূর্ত লাগে তার বুঝতে, কী হচ্ছে। সবকিছু মনে পড়তেই সে ধড়মড় করে উঠে পড়তে চাইছিল, লু সাবধানে শুইয়ে দেয় আবার, বলে, শুয়ে থাক সুশান।

আমরা কি ফিরে যাচ্ছি?

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে সে বলল, হ্যাঁ।

ট্রাইটন আমাদের যেতে দিচ্ছে?

হ্যাঁ।

আমরা তাহলে কেউ মারা যাব না?

না সুশান।

কিন্তু ট্রাইটনের বংশধর—

সেটা নিয়ে কিছু চিন্তা কোরো না, তাকে আমরা রেখে যাচ্ছি।

সত্যি?

সত্যি, তুমি এখন ঘুমাও।

সুশান সাথে সাথে বাধ্য মেয়ের মতো চোখ বন্ধ করে। কিছুক্ষণের মাঝেই ক্যাপসুলের যন্ত্রপাতি সুশানের দায়িত্ব নিয়ে নেবে, তখন সে অনির্দিষ্টকালের মতো ঘুমিয়ে থাকতে পারবে। যদি সত্যি সত্যি সুশান বিশ্বাস করে যে সে এখন পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছে, মন্দ কি? একটা সুখ-স্বপ্ন নিয়ে নাহয় কাটাক জীবনের শেষ সময়টুকু।

ওরা যখন কিম জিবানের অচেতন শরীরকে ক্যাপসুলের মাঝে শুইয়ে দিচ্ছিল, তখন হঠাৎ ইউরী এসে হাজির হল, তার চোখ-মুখে উত্তেজনার ছাপ, ওদের কাজে কোনোরকম কৌতূহল না দেখিয়ে বলল, ট্রাইটনের রং আস্তে আস্তে গাঢ় লাল রঙের হয়ে যাচ্ছে, খেয়াল করেছ?

লোকটার উপরে রাগ করবে ভেবেও লু ঠিক রাগ করতে পারে না, একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, তাই নাকি?

হ্যাঁ। ভারি মজার ব্যাপার।

মজার কী হল এখানে?

মজার হল না? আমি এখানে বসে তাকে জিজ্ঞেস করি সুপার সিমেট্রিক বোজনের ভর, আর সে তার উত্তর না দিয়ে টকটকে লাল হয়ে যায়।

উত্তর হয়তো জানে না, তাই লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে!

লুয়ের রসিকতাটুকু ইউরী ধরতে পারল না, মাথা নেড়ে বলল, না না, লজ্জা নয়, বাড়তি উত্তাপটুকু বিকিরণ করার জন্যে গায়ের রং ওরকম গাঢ় লাল করেছে।

নীষা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, বাড়তি উত্তাপ কিসের?

নিউট্রিনো থেকে পাচ্ছে।

লু অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে বলল, আমাদের নিউট্রিনো জেনারেটর দিয়ে মেগাওয়াট পাওয়ার বের হয় কিনা তাতে সন্দেহ আছে, আর তুমি বলছ সেটা পুরো ট্রাইটনের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে?

ইউরী একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, না না, তুমি বুঝতে পারছ না, ট্রাইটন তার শরীরে একটা নিউট্রিনো ডিটেকটর তৈরি করেছে, তাই সে আমাদের পাঠানো সিগন্যাল দেখতে পায়। কিন্তু নিউট্রিনোর তো অভাব নেই, শুধুমাত্র সূর্য থেকে যে-পরিমাণ নিউট্রিনো বের হয় সেটার জন্যে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের শরীর দিয়ে সেকেন্ডে কয়েক ট্রিলিওন করে নিউট্রিনো পার হয়ে যায়! এখানকার কথা ছেড়েই দাও। ট্রাইটনকে আমাদের অল্প কয়টা নিউট্রিনোর সাথে সাথে আরো ট্রিলিওন ট্রিলিওন নিউট্রিনো দেখতে হচ্ছে, ঐসব নিউট্রিনো থেকে যে-তাপ বের হয়, সেটা ট্রাইটনকে গরম করে ফেলতে পারে।

লু অস্বীকার করতে পারে না যে, ব্যাপারটুকু সত্যি হলে নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ।

ইউরী হঠাৎ কী-একটা ভেবে বলল, ভারি মজার একটা পরীক্ষা করা যায়। আমি যদি নিউট্রিনোর সংখ্যা কমাতে থাকি, ট্রাইটনকে তার ডিটেকটরটি আরো সংবেদনশীল করতে হবে, ফলে সে আরো বেশি নিউট্রিনো দেখবে, কাজেই পুরো ট্রাইটন আরো বেশি গরম হয়ে উঠবে। তাপ বিকিরণ করার জন্যে তখন ট্রাইটনকে হতে হবে কুচকুচে কালো!

ইউরী উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বের হতে হতে বলল, ঘন্টাখানেক সময়ের মাঝে তোমরা দেখবে, ট্রাইটনটি হয়েছে কুচকুচে কালো।

লু একটু ইতস্তত করে বলল, ইউরী, তোমাকে ঠিক কী ভাবে বলব বুঝতে পারছি না, কিন্তু মনে হয় বলে দেয়াটাই উচিত, আমি পুরো সিসিয়ানকে ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আর ঘন্টাখানেক সময়ের মাঝে আমাদের সবাইকে নিয়ে পুরো সিসিয়ান ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইউরীর মুখ দেখে মনে হল সে ঠিক লুয়ের কথা বুঝতে পারছে না, খানিকক্ষণ অবাক হয়ে লুয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি সিসিয়ানকে উড়িয়ে দেবে?

হ্যাঁ, এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। ট্রাইটনের বংশধরকে কিছুতেই পৃথিবীতে পাঠানো যাবে না। সেটা বন্ধ করার আর কোনো উপায় নেই।

ইউরী ফ্যাকাসে মুখে ফিরে এসে একটা উঁচু মনিটরের উপরে বসে অনেকটা আপন মনে বলল, আমরা সবাই মারা যাব?

আমি দুঃখিত ইউরী।

ইউরী হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, একটা সুপারনোভা[৩০] যদি কোনোভাবে তৈরি হত এখন!

কী বললে?

সুপারনোভা। একটা নক্ষত্র যখন সুপারনোভা হয়ে যায়, তখন তার থেকে অচিন্তনীয় নিউট্রিনো বেরিয়ে আসে, হঠাৎ করে যদি অসংখ্য নিউট্রিনো এসে হাজির হয়, তখন ট্রাইটনে যে-তাপের সৃষ্টি হবে, তাতে সে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

কিন্তু এক শ' বছরে হয়তো একটা সুপারনোভার জন্ম হয়, আমাদের হাতে সময় এখন এক ঘন্টা।

একটা পালসারও যদি থাকত আশেপাশে।

লু চমকে উঠে বলল, কী বললে তুমি? পালসার?

হ্যাঁ, পালসার। চতুর্থ মাত্রার পালসারে যখন নির্দিষ্ট সময় পরে পরে বিস্ফোরণ হয়, তখনও অসংখ্য নিউট্রিনো বেরিয়ে আসে। সুপারনোভার মতো এত বেশি নয়, কিন্তু অনেক, ট্রাইটনকে শেষ করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

লু ইউরীর দিকে ঘুরে বলল, তুমি সত্যি বলছ?

ইউরী একটু অবাক হয়ে বলল, সত্যি না বলার কী আছে?

আমাদের খুব কাছাকাছি একটা পালসার আছে, ছয় ঘন্টা পরপর বিস্ফোরণ হয়, আমি এই পালসারটা দিয়ে আমাদের অবস্থান ঠিক করেছি।

কত দূর এখান থেকে?

বিলিয়ন কিলোমিটারের মতো।

ইউরী লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, মাত্র বিলিয়ন কিলোমিটার? আমাকে আগে বল নি কেন? কোন মাত্রার?

জানি না।

গামা রেডিয়েশানে স্পেকট্রামটা বলতে পারবে?

লু দু'এক কথায় বুঝিয়ে দিতেই ইউরী চিৎকার করে ওঠে, চতুর্থ মাত্রা! চতুর্থ মাত্রা! আর কোনো ভয় নেই।

নীষা আস্তে আস্তে বলল, তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর যে, ট্রাইটনকে তুমি ধ্বংস করে দিতে পারবে?

অবশ্যি! নিজের হাতে সশব্দে থাবা দিয়ে ইউরী বলল, শুধু আমাকে কয়েক মিনিট সময় দাও।

রু-টেক দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার ঘুরে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি দুঃখিত ইউরী, কিন্তু আমাদের হাতে এখন কয়েক মিনিট সময়ও নেই।

কেন?

পাশের ঘরে ট্রাইটনের বংশধর চলে এসেছে, আমাদের এক্ষুণি সরে যেতে হবে।

সরে কোথায় যাব?

আমি ঠিক জানি না।

তুমি বুঝলে কেমন করে, প্রাণীটা এসেছে?

প্রচণ্ড রেডিয়েশান হয়।

কেন?

মনে হয় তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্যে কোনো একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করে।

আর এই প্রাণীটাকে তোমরা উন্নত বলে দাবি কর? কত বড় নির্বোধ হলে একটা প্রাণী রেডিও একটিভিটি দিয়ে তাপমাত্রা ঠিক করে—

রু-টেক বাধা দিয়ে বলল, আমাদের এক্ষুণি সরে যেতে হবে, প্রাণীটা খুব কাছে চলে এসেছে।

ইউরী ব্যস্ত হয়ে বলল, কিন্তু আমার একটু সময় দরকার যতক্ষণ পর্যন্ত পালসারটাতে আবার বিস্ফোরণ না হচ্ছে, আমার ট্রাইটনের সাথে যোগাযোগ রেখে যেতে হবে।

লু ঘরে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, সবাই স্পেসস্যুট পরে নাও, খুঁটিনাটি ব্যাপারের দরকার নেই, শুধুমাত্র বায়ুনিরোধক অংশটা ঠিক থাকলেই হল, তোমাদের ত্রিশ সেকেন্ড সময় দেয়া হল।

ইউরী মাথা নেড়ে বলল, আমি কখনো স্পেসস্যুট পরি নি, কী ভাবে পরতে হয় আমি জানি না।

লু নীষার দিকে তাকিয়ে বলল, নীষা, তুমি একটু ওকে সাহায্য কর। রু-টেক, তোমার তো কোনো স্পেসস্যুট পরতে হবে না, তুমি কিম জিবান আর সুশানের ক্যাপসুল দু'টি দেখ, সব ঠিক আছে কি না।

পুরো দলটা প্রস্তুত হতে হতে হঠাৎ করে দরজার একটা অংশ ধ্বসে পড়ল, হলুদ রংয়ের একটা ধোঁয়া বাতাসে ভেসে বেড়াতে থাকে। ওরা সবিস্ময়ে দেখে, মেঝের উপর দিয়ে তরল পদার্থের মতো কী-একটা জিনিস এগিয়ে আসছে। ওরা ঘুরে তাকাতেই সেটি থমকে দাঁড়াল, তারপর হঠাৎ ফুটন্ত পানির মতো শব্দ করতে থাকে। জিনিসটির পৃষ্ঠে আশ্চর্য নকশা খেলা করছে।

ইউরী ভয় পাওয়া গলায় বলল, পালাও, সবাই পালাও—

লু শান্ত স্বরে বলল, যে যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাক, খবরদার নড়বে না।

তা হলে পালাব কেমন করে?

আমি ব্যবস্থা করছি। গুলি করে আমি পিছনের দেয়ালটা ধ্বসিয়ে দিচ্ছি, বাতাসের চাপে ছিটকে বেরিয়ে যাবে সবাই।

কিন্তু—

আর কোনো প্রশ্ন নয় এখন। ইউরী, নিউট্রিনো জেনারেটরটি ছেড়ো না হাত থেকে—

সবাই মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। লু আস্তে আস্তে ঘুরে পিছনের দেয়ালের কন্ট্রোল-বক্সের দিকে তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি উদ্যত করে। এই বাক্সটির ভিতরে বড় দরজাটি বন্ধ করার যন্ত্রপাতি, উড়িয়ে দিলে পুরো দেয়ালটি উড়ে যাবার কথা। লু সবাইকে একনজর দেখে ট্রিগার টেনে ধরে। প্রচণ্ড একটা শব্দ হল, পরমুহূর্তে ওরা সবাই ঘরের সব জিনিসপত্রসহ ছিটকে পড়ে মহাশূন্যে।

পরিশিষ্ট

লু মহাকাশে ভেসে যাচ্ছিল, বোঝার কোনো উপায় নেই কিন্তু সে জানে যে সে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাচ্ছে। যারা কখনো মহাকাশে ভেসে থাকে নি, তারা কখনোই এই অনুভূতিটি ঠিক বুঝতে পারবে না। লুকে নানা সময়ে নানা পরিবেশে মহাকাশে ভেসে বেড়াতে হয়েছে, তবুও সে এই অবস্থায় কখনো সহজ অনুভব করে না। প্রাণপণ চেষ্টা

AMARBOI.COM

করে নিজেকে সামলে নিয়ে সে তার ছোট জেটটি চালু করে, কয়েক মুহূর্তের মাঝেই সে নিজের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে কি না জানা নেই, পরীক্ষা করার জন্যে সে সুইচটি টিপে দেয়, সাথে সাথে ইউরীর আর্তচিৎকার শুনতে পায়, বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও, আমি পড়ে যাচ্ছি—

লু বলল, ইউরী, তুমি পড়ে যাবে না, মহাকাশে কেউ পড়ে যায় না। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি আসছি তোমার কাছে। নিউট্রিনো জেনারেটরটি আছে তো?

আছে। আমি শক্ত করে ধরে রেখেছি।

শক্ত করে ধরে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, ওটা পড়বে না, তুমি ছেড়ে দিলেও ওটা তোমার পাশাপাশি থাকবে।

থাকুক, আমি তবু ছাড়ছি না।

তোমার ইচ্ছা। তুমি তোমার বাম হাতের কাছে যে নীল সুইচটা আছে সেটা চেপে ধর, তাহলে তোমার বীপারটা কাজ করতে শুরু করবে, আমি বুঝতে পারব তুমি কোথায় আছ।

করছি।

একমুহূর্ত পরেই সে ইউরীকে দেখতে পায়, বহু দূরে একটা আলো জ্বলতে এবং নিভতে শুরু করেছে। লু নিজের জেটটি চালু করে সেদিকে যেতে যেতে চারদিকে তাকায়, দূরে সিসিয়ান একটা ভূতুরে মহাকাশযানের মতো ভাসছে, নিচে বীভৎস ট্রাইটন, কে জানে হয়তো এই মুহূর্তে তার দিকে তাকিয়ে আছে। লু চারদিকে তাকাতে তাকাতে নীষা আর রু–টেকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, কিছুক্ষণের মাঝেই তাদের সাড়া পাওয়া যায়, রু–টেক কিম জিবানের ক্যাপসুলটি খুঁজে পেয়েছে, সেটিকে সে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে, এখন নীষাকে নিয়ে সে সুশানের ক্যাপসুলটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। লু ওদের এক জায়গায় একত্র হতে বলল, সে নিজে ইউরীকে নিয়ে কিছুক্ষণের মাঝেই ওদের কাছে হাজির হবে।

ইউরী লুকে দেখে যেন দেহে প্রাণ ফিরে পায়। দু'হাতে শক্ত করে নিউট্রিনো জেনারেটরটি ধরে রেখেছে, সেভাবেই বলল, কী আশ্চর্য অবস্থা! স্রেফ ঝুলে আছি! শুধু মনে হয় পড়ে যাব!

না, পড়বে না। ট্রাইটনের কী অবস্থা?

জানি না, এখন যোগাযোগ করব। মুশকিল হচ্ছে কিছুতেই সোজা থাকতে পারি না, শুধু ঘুরে ঘুরে উল্টে যাই।

আমি তোমাকে ধরে রাখছি, তুমি যোগাযোগ কর। আমাদের সময় খুব বেশি নেই।

কতক্ষণ আছে?

খুব বেশি হলে দশ পনেরো মিনিট হবে, এর থেকে কমও হতে পারে।

সর্বনাশ! সময় তো দেখি একেবারেই নেই। ইউরী তাড়াতাড়ি নিউট্রিনো জেনারেটরটি ট্রাইটনের দিকে মুখ করে ধরে সুইচ টিপে সেটিকে চালু করে বলল, ট্রাইটনের কৌতূহল বজায় রাখার জন্যে তাকে খুব–একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলা উচিত।

কি বলবে?

বলব তাকে উড়িয়ে দিচ্ছি। ইউরী শব্দ করে হেসে কিবোর্ডে টাইপ মাথা ঝুঁকিয়ে কী–একটা লিখতে থাকে। লু মাথা এগিয়ে নিয়ে দেখে সেখানে লেখা, একটা খুব জরুরি জিনিস বলছি, আমার কথা শুনতে পেলে উত্তর দাও। তোমার পৃষ্ঠের বড় গোলকটি ছোট করে ফেল।

লু নিজের জেটটি চালু করে ইউরীকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে ট্রাইটনের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেখানে কোনো পরিবর্তন হল না। ইউরী আবার লিখল, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমাকে বলব, সাড়া দাও।

কোনো সাড়া নেই।

সাড়া দাও, আমাদের নিরাপত্তার জন্যে তোমাকে ধ্বংস করে ফেলব বলে ঠিক করেছি, সাড়া দাও।

তবু কোনো সাড়া নেই।

মানুষ অনেক উন্নত প্রাণী, তাদের দিয়ে জোর করে কোনো কাজ করিয়ে নেয়া যায় না, তুমিও পারবে না। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ? পারলে সাড়া দাও। তোমার নিজের ভালোর জন্যে বলছি, তোমার পৃষ্ঠের বড় বৃত্তটি ছোট করে ফেল।

তবু কোনো সাড়া নেই, ইউরী ভয়ার্ত মুখে লুয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ট্রাইটন যদি এখন এই নিউট্রিনো রশ্মিকে উপেক্ষা করা শুরু করে থাকে?

উপায় নেই, চেষ্টা করতে থাক।

ইউরী আবার লিখল, আর পাঁচ মিনিটের মাঝে সাড়া দাও, না হয় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি জানতে চাও আমরা কী ভাবে তোমাকে ধ্বংস করব? যদি জানতে চাও তাহলে তোমার বড় গোলকটি আস্তে আস্তে ছোট করে ফেল।

লু অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে দেখে ট্রাইটনের পৃষ্ঠে একটা বড় বৃত্ত আস্তে আস্তে ছোট হয়ে গেল। ইউরী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লুয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। লু এগিয়ে গিয়ে ইউরীর হাত থেকে কিবোর্ডটি নিয়ে লিখল, তোমাকে আমরা ধ্বংস করতে চাই না, মানুষ কখনো কাউকে ধ্বংস করতে চায় না। যদি তুমি আমাদের ফিরে যেতে দাও আমরা তোমাকে ধ্বংস করব না। আমার এ প্রস্তাবে রাজি হলে বড় বৃত্তটি বড় করে দাও।

বৃত্তটি আরো ছোট হয়ে গেল, ট্রাইটন এ প্রস্তাবে রাজি নয়। ইউরী তখন এগিয়ে যায়, আস্তে আস্তে লেখে, তা হলে শোন, আমরা তোমাকে কেমন করে ধ্বংস করব।

লু তাকিয়ে দেখে ওরা নীষা আর রু–টেকের কাছে পৌঁছে গেছে, জেট টি ঘুরিয়ে সে নিজের গতি কমিয়ে থেমে গেল। নীষা আর রু–টেক এগিয়ে আসে, তাদের কাছাকাছি স্টেনলেস স্টিলের দু'টি ক্যাপসুল, ওগুলির ভিতরে কিম জিবান আর সুশানের অচেতন দেহ। নীষা জিজ্ঞেস করল, সবকিছু ঠিক আছে?

হ্যাঁ।

উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ট্রাইটনকে?

দেখা যাক। লু নিজের ঘড়ির দিকে তাকায়, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপর পালসারটিতে বিস্ফোরণ হবে। সত্যিই কি ট্রাইটন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন?

ইউরী লিখতে থাকে, যে–রশ্মিটি দিয়ে তোমার সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি, তাকে আমরা বলি নিউট্রিনো। অসংখ্য নিউট্রিনো আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, তাদের

অপরিমেয় শক্তি, কিন্তু আমরা তার কথা জানি না, কারণ নিউট্রিনো কোনো কিছুর সাথে সহজে বিক্রিয়া করে না। কোনোভাবে যদি বিক্রিয়া করানো যেত, তা হলে সেই শক্তি দেখা যেত।

ইউরী ট্রাইটনের দিকে তাকায়, গ্রহটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সত্যিই কি পারবে এটিকে ধ্বংস করে দিতে?

একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে ইউরী আবার লিখতে শুরু করে, তুমি আমাদের নিউট্রিনো রশ্মি থেকে আমাদের পাঠানো খবরাখবর পেতে শুরু করেছ, কাজেই তুমি ব্যবস্থা করেছ নিউট্রিনোর সাথে বিক্রিয়া করার, কত অসংখ্য নিউট্রিনো এখন তোমার দেহে বিক্রিয়া করছে, কত সহজে তুমি উত্তপ্ত হয়ে উঠছ তাদের শক্তি দিয়ে।

এই নিউট্রিনো দিয়েই আমরা তোমাকে শেষ করে দেব, অচিন্তনীয় নিউট্রিনো পাঠাব তোমার ভিতর দিয়ে, ছারখার করে দেবে তারা তোমাকে—

হঠাৎ একটা আশ্চর্য ব্যাপার হল, পুরো ট্রাইটন যেন কেঁপে উঠল একবার। মুহূর্তে গ্রহটি রক্তবর্ণ হয়ে যায়, টকটকে লাল রং দেখে মনে হয় গনগনে গরমে যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এক্ষুনি। কিন্তু কিছু হল না, টকটকে লাল হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল, সমস্ত গ্রহটি যেন ফেটে গেল বেলুনের মতো। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ ওদের কাছে পৌঁছাল না বায়ুশূন্য মহাকাশে, কিন্তু ওরা বিস্ফারিত চোখে দেখে, ট্রাইটন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে চিরদিনের মতো।

সাথে সাথে একটা আশ্চর্য অনুভূতি হল সবার, সারাক্ষণ বুকের ভিতর যে চাপা ভয় আর আতঙ্ক জমা হয়ে ছিল, সেটা যেন চলে গেল। তার বদলে একটা ফুরফুরে হালকা আনন্দ এসে ভর করে ওদের ভিতরে। মনে হতে থাকে আর কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই, এখন শুধু নিরুদ্বেগ নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। লু একবার প্রাণহীন গ্রহটিকে দেখে, তারপর ইউরীর দিকে তাকায়। এই আধপাগল একজন বিজ্ঞানী হাজার মাইল দূরে বসে একটি খেলনা দিয়ে শুধুমাত্র আঙুল নেড়ে ট্রাইটনের মতো একটি গ্রহকে উড়িয়ে দিয়েছে? নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না, লু অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে ইউরীর দিকে তাকিয়ে থাকে, এও কি সম্ভব!

ইউরী আস্তে আস্তে লুয়ের দিকে তাকায়, কেমন জানি উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে তাকে, কেমন জানি বিপন্ন। লু ইউরীর কাঁধে হাত রেখে ডাকল, ইউরী—

কি?

তুমি শুধু আমাদের প্রাণ বাঁচাও নি, সম্ভবত পৃথিবীকেও বাঁচিয়েছ।

ইউরী বিপন্ন মুখে বলল, কিন্তু—

কিন্তু কি?

কেমন জানি খুনী খুনী লাগছে নিজেকে, এত বড় একটা গ্রহকে শেষ করে দিলাম?

আমাদের উপায় ছিল না ইউরী।

হয়তো উপায় ছিল না, কিন্তু তবুও এত বড় একটা ক্ষমতাশালী প্রাণী, তার আর কোনো চিহ্ন থাকবে না?

নীষা আস্তে আস্তে বলল, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই ইউরী। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, সেটা হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম। ট্রাইটন চেষ্টা করেছে তার বংশধরকে

বাঁচাতে, আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের বাঁচাতে—

ইউরী হঠাৎ ঘুরে তাকায়, ফিসফিস করে বলে, বংশধর!

কী হয়েছে বংশধরের?

বংশধরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাহলে ট্রাইটন ধ্বংস হয়ে যাবে না। লু একটু ইতস্তত করে বলল, কিন্তু এটা তো আমাদের হাতে নেই ইউরী, কিছুক্ষণের মাঝে সিসিয়ান ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছু নিয়ে, ট্রাইটনের বংশধর সিসিয়ানের সাথে শেষ হয়ে যাবে।

কোনো ভাবে তুমি সিসিয়ানকে বাঁচাতে পার না?

না। আমি অত্যন্ত আদিম উপায়ে সিসিয়ানকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করেছি, সেটা থেকে রক্ষা করার কোনো উপায় নেই।

নীষা জিজ্ঞেস করল, কী ভাবে করছ তুমি?

মায়োক্সিন[৩১] গ্যাসের বোতলটি খুলে এসেছি।

ও, নীষা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে।

ইউরী জিজ্ঞেস করল, কি হয় মায়োক্সিন দিয়ে?

মায়োক্সিন যখন অক্সিজেনের সাথে একটা বিশেষ অনুপাতে মিশে, তখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। আমি যে-সিলিন্ডারটি খুলে এসেছি, সেটা থেকে যেটুকু গ্যাস বের হচ্ছে তাতে সিসিয়ানের অক্সিজেন মিশে বিস্ফোরণের অনুপাতে পৌঁছতে তিন ঘন্টা সময় লাগার কথা। আর মিনিট দশেকের মাঝে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে, কিছুতেই সেটা আটকানো সম্ভব না।

ইউরী আস্তে আস্তে বিষণ্নভাবে মাথা নাড়ে, বাঁচানো গেল না তাহলে!

রু-টেক আস্তে আস্তে বলল, তোমরা রাজি থাকলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

কী করবে তুমি?

সিসিয়ানের বড় বড় কয়টা ভেন্ট দিয়ে পুরো বাতাসটুকু বের করে দিতে পারি, এখনো বিস্ফোরক পর্যায়ে পৌঁছায়নি, এই মুহূর্তে যদি চেষ্টা করি একটা সুযোগ আছে।

লু মাথা নাড়ে, না রু-টেক। ভয়ানক বিপদের ঝুঁকি নিতে চাইছ তুমি, এখন যে-কোনো মুহূর্তে সিসিয়ান উড়ে যেতে পারে। আমি তোমাকে প্রাণের ঝুঁকি নিতে দিতে পারি না।

তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি রবোট।

কিন্তু তোমাকে মানুষের সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

আমি সে-কথা বলছি না, রু-টেক বাধা দিয়ে বলল, আমি রবোট, আমার স্মৃতি যদি কোনোভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়, আমি বেঁচে থাকি।

কিন্তু এখন সিডিসি নেই, যেখানে তুমি তোমার স্মৃতিকে সরিয়ে ফেলতে পার।

কিন্তু আমি আমার মেমোরি মডিউলটি খুলে তোমাদের হাতে দিতে পারি। তোমরা সেটা যদি যত্ন করে রেখে দাও, তা হলেই আমি বেঁচে থাকব। সুবিধেমতো মেমোরি মডিউলটি অন্য একটা সপ্তম মাত্রার রবোটের শরীরে লাগিয়ে দিলেই আমি বেঁচে উঠব।

কিন্তু মেমোরি ছাড়া কাজ করবে কেমন করে?

AMARBOI.COM

প্রসেসরটা থাকলেই কাজ করা যায়, জরুরি কাজের জন্যে কিছু মেমোরি সব সময়েই থাকে। তবে আমি কিছুই জানব না, তোমাদের আমাকে বলে দিতে হবে সবকিছু কি করব, কেন করব এইসব।

ইউরী কৌতূহল নিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল, সুযোগ পেয়ে লুকে জিজ্ঞেস করল, সত্যিই এটা সম্ভব?

একটা ছোট সম্ভাবনা রয়েছে, তবে কাজটি ভয়ানক বিপজ্জনক। লু মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু ট্রাইটনের বংশধরকে বাঁচিয়ে রাখার সমস্যা অন্য জায়গায়। যদি সিসিয়ানকে সত্যি রু–টেক রক্ষা করতে পারে, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র এসে সিসিয়ানের দায়িত্ব নিয়ে নেবে। তারা তখন ট্রাইটনের বংশধরকে কেটেকুটে দেখবে, তাকে বাঁচতে দেওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

আমি তা হলে সিসিয়ানের মূল ইনজিনটা চালু করে পুরো সিসিয়ানকে ট্রাইটনের উপরে নামাতে পারি। বংশধর তখন সিসিয়ান থেকে ট্রাইটনে নেমে যাবে।

সিসিয়ানে এখন কোনো কম্পিউটার নেই, তুমি সেটা ঠিক করে চালাতে পারবে না।

ঠিক করে চালানোর প্রয়োজনও নেই, সিসিয়ানকে যদি কোনোভাবে ট্রাইটনের কাছাকাছি নিতে পারি, তা হলেই হবে। সিসিয়ান মোটামুটিভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, আমার ধারণা, ট্রাইটনের বংশধর তবু বেঁচে থাকবে। মনে আছে, বারো মেগাওয়াটের পার্টিকেল বীম দিয়েও তার কোনো ক্ষতি হয় নি?

লু চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে।

রু–টেক বলল, যদি এটা করতে চাও, তা হলে তোমাকে এখনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে লু। আমাদের হাতে সময় মোটেও নেই, আর তুমি হচ্ছ দলপতি, তুমি অনুমতি না দিলে আমি যেতে পারব না।

ঠিক আছে, অনুমতি দিচ্ছি।

রু–টেক সাথে সাথে কাজে লেগে যায়, মাথার পিছনে কোথায় হাত দিয়ে সে কী–একটা খুলে ফেলে। সেখানে হাত ঢুকিয়ে মেমোরি মডিউলটি৩২ খুলে ফেলার আগে বলল, মনে রেখো, আমার কোনো স্মৃতি থাকবে না, তোমাদের বলে দিতে হবে আমি কী করব।

বেশ।

রু–টেক একটা হ্যাঁচকা টানে মেমোরি মডিউলটি টেনে বের করে আনে, সাথে সাথেই তার পুরো স্মৃতি মুছে যায়। মেমোরি মডিউলটা নিয়ে কী করতে হবে সেটাও রু–টেকের আর মনে থাকে না, সেটা হাতে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। নীষা এগিয়ে গিয়ে বলল, এটা আমাকে দাও।

কেন?

লু তখন এগিয়ে শান্ত গলায় বলল, তোমার নাম রু–টেক, তুমি ভয়ানক একটি বিপজ্জনক মিশনে যাচ্ছ, তাই তোমার স্মৃতি আমরা সরিয়ে রাখতে চাই, মেমোরি মডিউলটি আমার হাতে দাও।

রু–টেক বাধ্য ছেলের মতো হাতের মেমোরি মডিউলটি লুয়ের হাতে দিয়ে দেয়।

ধন্যবাদ। তুমি এখন ঐ মহাকাশযানে গিয়ে, বড় বড় ভেন্টগুলি খুলে দেবে, যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিসিয়ানের সমস্ত বাতাস বের হয়ে যায়।

কেন?

তুমি জানতে চাইলে তোমাকে বলতে পারি, কিন্তু তোমার জানার প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের হাতে সময় খুব কম।

বেশ।

ভেন্টগুলি খুলে সমস্ত বাতাস বের করে দেয়ার পর তুমি সিসিয়ানের ইঞ্জিনগুলি চালু করে, সেটিকে এমনভাবে প্রস্তুত করবে, যেন সিসিয়ান এই গ্রহটিতে গিয়ে নামতে পারে।

কেন?

সময়ের অভাবে তোমাকে বলতে পারছি না, কিন্তু জেনে রাখ, এটা তোমার জানার প্রয়োজন নেই।

বেশ।

কাজ শেষ হবার পর তুমি সিসিয়ান থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে ফেরত আসবে।

কেন?

তুমি আমাদের দলের একজন, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন।

ও।

এখন তুমি রওনা দাও।

ভেন্টগুলি কোথায় এবং ইঞ্জিন কী ভাবে চালু করতে হয় আমি জানি না।

আমি তোমার সাথে যোগাযোগ রাখব, সময় হলেই তোমাকে বলে দেব।

বেশ।

রু-টেক সাথে সাথে ঘুরে সিসিয়ানের দিকে রওনা দিয়ে দেয়, হাতের জেটটি সে বেশ চমৎকারভাবে ব্যবহার করতে পারে, রবোটদের কিছু কিছু জিনিস শিখতে হয় না, তারা সেই ক্ষমতা নিয়েই জন্মায়।

AMARBOI.COM

পরবর্তী তিরিশ মিনিট লু তার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘতম সময় বলে বিবেচনা করে। রু-টেককে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে হল তার, প্রতিমুহূর্তে ভয় হচ্ছিল সিসিয়ান প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যাবে, তার মাঝে মাথা ঠাণ্ডা রেখে একটার পর একটা নির্দেশ দিয়ে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। রু-টেকের পুরানো কোনো স্মৃতি অবশিষ্ট নেই বলে তার কাজটি প্রায় দশ গুণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিরিশ মিনিট পর সিসিয়ানকে নির্দিষ্ট গতিপথে ট্রাইটনের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে রু-টেক যখন ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে এল তখন সবাই যেন প্রাণ ফিরে পেল। রু-টেক ফিরে আসতেই নীষা তার হাতে মেমোরি মডিউলটি ধরিয়ে দেয়, বলে, নাও তোমার স্মৃতি।

কী করব এটা দিয়ে?

তোমার মাথায় লাগিয়ে নাও।

কী ভাবে লাগাব?

নীষা আর লু সাবধানে মডিউলটি ওর মাথায় লাগিয়ে দেয়, লু সাথে সাথেই প্রকৃতস্থ হয়ে ওঠে, এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, লু, তুমি যদি চাও আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিসিয়ানকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে আসি, তাহলে কিন্তু দেরি করা যাবে না।

লু হাসতে হাসতে বলল, তুমি এইমাত্র সেটা করে এসেছ রু-টেক।

সত্যি। রু-টেক অবাক হয়ে তাকায়, দেখে, সত্যি সত্যি সিসিয়ান আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। আর ঘন্টাখানেকের মাঝেই ট্রাইটনে পৌঁছে যাবে ট্রাইটনের বংশধরকে নিয়ে।

চমৎকার কাজ করেছ তুমি রু-টেক।

আমি কিছু করি নি লু, তুমিই করেছ। তুমি ঠিক ঠিক সবকিছু বলে দিয়েছ বলে পেরেছি, মেমোরি মডিউল খুলে নিলে আমার ভিতর আর একটা বলপয়েন্ট কলমের ভিতরে কোনো পার্থক্য নেই।

নীষা হাসতে হাসতে বলল, মেমোরি মডিউল ছাড়াই কিন্তু বেশ লাগছিল, কেমন একটা শিশু-শিশু ভাব, যেটাই বলা হয়, তুমি বল 'কেন?'

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তোমাকে একদিন অভিনয় করে দেখাতে হবে। নীষা হাসতে হাসতে বলল, চল একটা কাজ করি।

কী কাজ?

কিম জিবানকে জাগিয়ে তুলি।

কেন?

বেচারা যখন জ্ঞান হারিয়েছে তখন সে জানত না আমরা বেঁচে যাব, ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্নের মাঝে রয়েছে সে। তাকে জাগিয়ে তুলে জানিয়ে দিই আমাদের আর কোনো ভয় নেই, তখন সে অনেক শান্তিতে ঘুমাবে। সুশানকে মিথ্যে কথা বলে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, মিথ্যেটা এখন সত্যি হয়ে গেছে, সে অনেক শান্তিতেই ঘুমাচ্ছে, তাকে জাগানোর প্রয়োজন নেই।

ক্যাপসুলে জাগানো কিন্তু খুব সহজ নয়, তাকে এখন বাইরেও আনা যাবে না।

তুমি সব পার রু-টেক। যে-মায়োক্সিনভরা মহাকাশযানকে উদ্ধার করতে পারে তার অসাধ্য কোনো কাজ নেই।

লু যদি অনুমতি দেয় তা হলে করব। রু-টেক লুয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আপত্তি আছে লু?

মোটেই না, আমরা বেঁচে গেছি খবর পেয়ে কিম কী করে দেখার জন্যে আমি মরে যাচ্ছি।

বেশ, দেখা যাক কি করা যায়।

এই ক্যাপসুলে কোনো আহত বা অসুস্থ মানুষকে রাখার পরমুহূর্তে ক্যাপসুলের জরুরি যন্ত্রপাতি তার দায়িত্ব নিয়ে নেয়। প্রয়োজনে হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসকে পর্যন্ত বিশ্রাম দিতে পারে। শুধু তাই নয়, মস্তিষ্কে আঘাত পেলে অনেক সময় মস্তিষ্কের দায়িত্বও সাময়িকভাবে নিয়ে নিতে পারে। রু-টেক ক্যাপসুলের পাশের সুইচ এবং মিটারগুলি দেখে কিছু সংখ্যা ক্যাপসুলের কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দেয়, প্রায় সাথে সাথেই কিম জিবান চোখ খুলে তাকায়, ফিসফিস করে বলে, আমি কোথায়?

লু গলার স্বর গোপন করে আনুনাসিক স্বরে বলল, তুমি মারা গেছ কিম, অনেক পাপ করেছিলে তুমি বেঁচে থাকতে, মারা গিয়ে তাই তুমি নরকে এসেছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিম কাতর গলায় কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু নীষা আর পারল না, চিৎকার করে বলল, আমরা বেঁচে গেছি কিম! আমরা বেঁচে গেছি।

সত্যি? ধড়মড় করে ওঠার চেষ্টা করেই বুঝতে পারল, সে ক্যাপসুলের ভিতর, ছটফট করে বলল, সত্যি বলছ তুমি নীষা?

হ্যাঁ, এই দেখ আমি, এই যে লু। তোমাকে জাগিয়ে তুলেছে রু-টেক, আর ঐ যে ইউরী।

সুশান কোথায়?

ঘুমিয়ে আছে আরেকটা ক্যাপসুলে, বিশেষ কিছু হয় নি, তোমার থেকে ভালো অবস্থায় আছে। তোমার পাঁজরের একটা হাড়—

কিম বাধা দিয়ে বলল, কেমন করে বেঁচেছি আমরা?

লু এগিয়ে গিয়ে ইউরীকে দেখিয়ে বলল, এই যে আধপাগল মানুষটি দেখছ, সে এখানে বসে তার আঙুল দিয়ে ট্রাইটনকে উড়িয়ে দিয়েছে।

ঠাট্টা করো না, সত্যি করে বল।

সত্যি বলছি, জিজ্ঞেস কর ইউরীকে।

ইউরী, বলবে, কী হয়েছে?

ইউরী কিছু-একটা বলতে চাইছিল, রু-টেক তাকে থামাল, বলল, কিম, তোমার রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে, উদ্ধারকারী দলের ডাক্তার যখন দেখবে আমি তোমাকে জাগিয়ে কথা বলে রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছি, আমার বারটা বাজিয়ে দেবে। তুমি এখন ঘুমাও।

না না, আমি একটু শুনতে চাই।

রু-টেক মাথা নাড়ে, শোনার অনেক সময় পাবে কিম, এখন তুমি ঘুমাও।

কিম হাল ছেড়ে দেয়। রু-টেক একটি সুইচ চেপে ধরতেই কিম আস্তে আস্তে আবার ঘুমিয়ে পড়ে, ক্যাপসুলের হালকা আলোতে দেখা যাচ্ছে তার মুখে ক্ষীণ একটা হাসির ছোঁয়া।

AMARBOI.COM

ওরা মহাকাশে ভাসতে ভাসতে উদ্ধারকারী দলের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। কতক্ষণ লাগবে জানা নেই, কিন্তু ওদের কোনো তাড়া নেই, ওদের হাতে অফুরন্ত সময়। নীষা ওর পিঠে লাগানো প্যাকেট থেকে একটি ছোট ম্যাগনেটিক ডিস্ক বের করে। লু জিজ্ঞেস করল, কি আছে ওখানে?

সিডিসি দিয়ে গেছে, কি আছে জানি না। একটা ছোট ডিস্ক ড্রাইভ[৩৩] থাকলে দেখা যেত।

দেখি একটু, রু-টেক হাত বাড়িয়ে দেয়, ম্যাগনেটিক ডিস্কটা উল্টে-পাল্টে দেখে বলল, তুমি চাইলে এটা পড়ে দিতে পারি, আমার শরীরে একটা ছোট ডিস্ক ড্রাইভ আছে।

পড় দেখি।

রু-টেক সাবধানে ওর বুকের কাছে ছোট একটা ঢাকনা খুলে ডিস্কটি ঢুকিয়ে পড়তে শুরু করে, সেখানে লেখা :

নীষা,

তুমি যেহেতু আমার চিঠিটা পড়ছ; আমি ধরে নিতে পারি তোমরা এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছ। খুব কৌতূহল হচ্ছে জানার জন্যে কেমন করে উদ্ধার পেলে, কিন্তু কেমন করে জানব, আমি তো আর বেঁচে নেই। তোমরা ভালোভাবে থেকো, প্রার্থনা করি, আর যেন তোমাদের এত বড় বিপদের মাঝে পড়তে না হয়।

নীষা, তোমাকে একটি ছোট অনুরোধ করব। এই ম্যাগনেটিক ডিস্কে একটি ছোট প্রোগ্রাম আছে, রিকিভ৩৪ ভাষায় লেখা। যদি পার কোনো একটি চতুর্থ মাত্রার কম্পিউটারে এই প্রোগ্রামটি চালিয়ে দিও। আমার ভাবনা চিন্তার মূল আঙ্গিক এখানে রয়েছে, চতুর্থ মাত্রার কম্পিউটারে সেটা আস্তে আস্তে বিকাশ পাবে, বলতে পার আস্তে আস্তে আমার ব্যক্তিত্ব—যদি আমাকে এই শব্দটি ব্যবহার করতে দাও—সেখানে বিকাশ লাভ করবে। খুব ধীরে ধীরে একটি সিডিসির জন্ম হবে।

নীষা, তোমাকে বলে দিই, কাজটি কিন্তু ভারি কঠিন। কিন্তু তুমি হচ্ছ কম্পিউটারের জাদুকরী, তুমি নিশ্চয়ই পারবে। যদি সত্যি পার তাহলে আমার একটি অংশ বেঁচে থাকবে। সবাই তো চায় তার বংশধর বেঁচে থাকুক, ট্রাইটন চেয়েছিল, আমি চাইলে দোষ কী?

ভালো থেকো তোমরা সবাই। তোমাদের সিডিসি।

নীষা একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বেচারি সিডিসি।

তুমি পারবে প্রোগ্রামটা চালাতে?

দেখি। রিকিভ হচ্ছে কম্পিউটারের নিজেদের ভাষা, কোনো মানুষের সেটা জানা নেই, সেটাই হচ্ছে মুশকিল। কিন্তু নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। সিডিসির সন্তান এটা, তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করব না?

লু অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে।

AMARBOI.COM

বহুদূরে দু'টি আলোর বিন্দু দেখা যায়, অত্যন্ত ক্ষীণ। আস্তে আস্তে সেগুলি বড় হতে থাকে। রু-টেক সেদিকে তাকিয়ে থেকে মৃদুস্বরে বলল, লু, আমাদের উদ্ধার করতে দু'টি মহাকাশযান আসছে।

লু মাথা ঘুরিয়ে তাকায়, তার চোখে কিছু ধরা পড়ে না, তবু সে তাকিয়ে থাকে, রু-টেক যখন বলেছে, তখন নিশ্চয়ই কেউ আসছে। না এসে পারে না।

মহাকাশযানের আলো দেখার জন্যে বিস্তীর্ণ নিকষ কালো অন্ধকার মহাকাশে লু বুভুক্ষুর মতো তাকিয়ে থাকে।

নির্ঘন্ট

[১] প্লুটোনিয়াম: পারমাণবিক বোমা বা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে ব্যবহারের উপযোগী মৌলিক পদার্থ। পারমাণবিক সংখ্যা ৯৪।

[২] রবোট: যন্ত্রমানব।

[৩] কপোট্রন: রবোটের মস্তিষ্ক (কাল্পনিক)।

[৪] হাইপার ডাইভ: চতুর্মাত্রিক জগৎ ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক জগতে সুদীর্ঘ দূরত্ব পরিভ্রমণ (কাল্পনিক)।

[৫] ফিউসান বোমা: একাধিক হালকা নিউক্লিয়াস ব্যবহার করে ভারি নিউক্লিয়াস তৈরি করার সময় যে-শক্তির সৃষ্টি হয়, সেই শক্তি ব্যবহারকারী বোমা।

[৬] টেলিমরবিজম: মানবিক অনুভূতির সঞ্চালন (কাল্পনিক)।

[৭] পলিমার: দীর্ঘ অণু।

[৮] পালসার: এক ধরনের নক্ষত্র, সাধারণত নির্দিষ্ট সময় পরে পরে এগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটে থাকে।

[৯] নিনিষ স্কেল: প্রাণীদের বুদ্ধিমত্তা মাপার জন্যে মনোবিজ্ঞানী নিনিষের ব্যবহৃত পরিমাপ (কাল্পনিক)।

[১০] প্রাইম সংখ্যা: যে-সংখ্যা অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না, যেমন ১, ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩...।

[১১] ক্রোমোস্কোপ: জৈবিক অণুর ভর পরিমাপের যন্ত্র (কাল্পনিক)।

[১২] ক্রুকোনাস: জৈবিক অণুর আণবিক বিন্যাস দেখার যন্ত্র (কাল্পনিক)।

[১৩] অ্যাটমিক ব্লাস্টার: উচ্চশক্তির অণু ব্যবহার করে প্রস্তুত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র (কাল্পনিক)।

[১৪] জেট: উচ্চগতিতে গ্যাস নির্গমন। এই পদ্ধতি জেট প্লেনের ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়।

[১৫] আল্ট্রাভায়োলেট: উচ্চ কম্পনের আলোকতরঙ্গ।

[১৬] সিলঝিনিয়াম: এক ধরনের ধাতু (কাল্পনিক)।

[১৭] গামা রে: অত্যন্ত উচ্চকম্পনের আলোকতরঙ্গ।

[১৮] শক ওয়েভ: শব্দ থেকে দ্রুতগামী বস্তু যে-তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

[১৯] সফট ওয়ার: কম্পিউটার প্রোগ্রাম।

[২০] মিলি কে: চরম শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রা (এক ডিগ্রির এক হাজার ভাগের এক ভাগ)।

[২১] জীবন রক্ষাকারী ক্যাপসুল: যে-ক্যাপসুলে একাধিক কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি আহত মানুষের জীবনরক্ষার জন্যে ব্যবহৃত করা হয়ে থাকে (কাল্পনিক)।

[২২] নিউরোন: মস্তিষ্কের কোষ।

[২৩] রনিয়াম: ঘুমের ঔষধ (কাল্পনিক)।

[২৪] গ্রুট এনোমলি: মস্তিষ্কে বিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ভয়াবহ শারীরিক পরিবর্তনসংক্রান্ত বিজ্ঞানী গ্রুটের সূত্র (কাল্পনিক)।

[২৫] অপারেটিং সিস্টেম: কম্পিউটারের যে-মূল প্রোগ্রাম কম্পিউটারের জটিল ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে।

[২৬] শীতল ঘর: মানুষকে দীর্ঘ সময় শীতল করে সংরক্ষণ করার জন্যে প্রস্তুতবিশেষ ঘর (কাল্পনিক)।

[২৭] নিউট্রিনো: চার্জবিহীন প্রায় ভরশূন্য এক ধরনের লেপটন।

[২৮] উইক ইন্টারঅ্যাকশান: প্রকৃতির চার ধরনের শক্তির একটি।

[২৯] পার্টিকেল বীম: শক্তিশালী অণু দিয়ে তৈরি এক ধরনের রশ্মি।

[৩০] সুপারনোভা: নক্ষত্র বিস্ফোরিত হওয়ার বিশেষ একটি প্রক্রিয়া।

[৩১] মায়োক্সিন: এক ধরনের বিস্ফোরক গ্যাস (কাল্পনিক)।

[৩২] মেমোরি মডিউল: কম্পিউটারের মেমোরি যেখানে রাখা হয়।

[৩৩] ডিস্ক ড্রাইভ: ম্যাগনেটিক ডিস্কে সংরক্ষিত জিনিস পড়ার বিশেষ যন্ত্র।

[৩৪] রিকিভ: কম্পিউটারের ব্যবহৃত অত্যন্ত জটিল একটি ভাষা (কাল্পনিক)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

বিজ্ঞানী সফদর আলীর মহা মহা আবিষ্কার

To

Herb Henrikson
Herb, I will remember your
advice. I will never ruin a good
story with silly facts!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাচ্চি বিরিয়ানি

বিজ্ঞানী সফদর আলীর সাথে আমার পরিচয় জিলিপি খেতে গিয়ে। আমার জিলিপি খেতে খুব ভালো লাগে, গরম গরম মুচমুচে জিলিপি থেকে খেতে ভালো আর কী আছে? আমি তাই সময় পেলেই কাওরান বাজারের কাছে একটা দোকানে জিলিপি খেতে আসি। আজকাল আর কিছু বলতে হয় না, আমাকে দেখলেই দোকানি একগাল হেসে বলে, বসেন স্যার। আর দশ মিনিট। অর্থাৎ জিলিপি ভাজা শেষ হতে আর দশ মিনিট। দোকানের বাচ্চা ছেলেটা খবরের কাগজটা দিয়ে যায়, আমি বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি, খবরগুলো পড়ে বিজ্ঞাপনে চোখ বোলাতে বোলাতে জিলিপি এসে যায়। খেয়ে আমাকে বলতে হয় কেমন হয়েছে, ভালো না হলে নাকি পয়সা দিতে হবে না।

সেদিনও তেমনি বসেছি জিলিপি খেতে, প্লেটে গরম জিলিপি থেকে ধোঁয়া উঠছে, আমি সাবধানে একটা নিয়ে কামড় দেবার চেষ্টা করছি, এত গরম যে একটু অসাবধান হলেই জিভ পুড়ে যাবে। তখন আমার সামনে আরেকজন এসে বসলেন; ছোটখাটো শুকনা মতন চেহারা, মাথায় এলোমেলো চুল, মুখে বেমানান বড় বড় গোঁফ। চোখে ভারী চশমা দেখে কেমন যেন রাগী রাগী মনে হয়। শার্টের পকেটটি অনেক বড়, নানারকম জিনিসে সেটি ভর্তি, মনে হল সেখানে জ্যান্ত জিনিসও কিছু একটা আছে, কারণ কিছু একটা যেন সেখানে নড়াচড়া করছে! ভদ্রলোকটিও জিলিপি অর্ডার দিলেন, আমার মতন নিশ্চয়ই জিলিপি খেতে পছন্দ করেন। জিলিপি আসার সাথে সাথে তিনি পকেট থেকে টর্চ লাইটের মতো একটা জিনিস বের করলেন, সেটার সামনে কয়েকটি সূঁচালো কাঁটা বের হয়ে আছে। জিনিসটি দিয়ে তিনি একটা জিলিপি গেঁথে ফেলে কোথায় যেন একটা সুইচ টিপে দেন, সাথে সাথে ভিতরে একটা পাখা শোঁ শোঁ করে ঘুরতে থাকে, ভিতর থেকে জোর বাতাস বের হয়ে আসে। দশ সেকেন্ডে জিলিপি ঠাণ্ডা হয়ে আসে, সাথে সাথে তিনি জিলিপিটা মুখে পুরে দিয়ে তৃপ্তি করে চিবুতে থাকেন। আমি অবাক হয়ে পুরো ব্যাপারটি লক্ষ করছিলাম; আমার চোখে চোখ পড়তেই ভদ্রলোক একটু লাজুকভাবে হেসে বললেন, জিলিপি খেতে গিয়ে সময় নষ্ট করে কি লাভ?

সত্যি তিনি সময় নষ্ট করলেন না, আমি দুটো জিলিপি খেয়ে শেষ করতে–করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর পুরো প্লেট শেষ। সময় নিয়ে তাঁর সত্যি সমস্যা রয়েছে; কারণ হঠাৎ তাঁর শার্টের কোনো একটা পকেট থেকে একটা অ্যালার্ম বেজে ওঠে, সাথে সাথে তিনি লাফিয়ে উঠে পানি না খেয়েই প্রায় ছুটে বের হয়ে গেলেন। যাবার সময় পয়সা পর্যন্ত দিলেন না, হাত নেড়ে দোকানিকে কী একটা বলে গেলেন, দোকানিও মাথা নেড়ে খাতা বের করে কী একটা লিখে রাখল।

আমি বের হবার সময় দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা কে। দোকানি নিজেও ভালো করে চেনে না, নাম সফদর আলী। মাসিক বন্দোবস্ত করা আছে, বৃহস্পতিবার করে নাকি জিলিপি খেতে আসেন। মাথায় টোকা দিয়ে দোকানি বলল, মাথায় একটু ছিট আছে।

ছিট জিনিসটা কী আমি জানি না। কিন্তু মাথায় সেটি থাকলে লোকগুলো একটু অন্যরকম হয়ে যায়; আর ঠিক এই ধরনের লোকই আমার খুব পছন্দ! কে এক সাধু নাকি দশ বছর থেকে হাত উপরে তুলে আছে শুনে আমি পকেটের পয়সা খরচ করে সীতাকুণ্ড গিয়েছিলাম। যখনই আমি খবর পাই কোনো পীর হাতের ছোঁয়ায় এক টাকার নোটকে এক শ' টাকা বানিয়ে ফেলছে, আমি সেটা নিজের চোখে দেখে আসার চেষ্টা করি। এত দিন হয়ে গেল এখনো একটা সত্যিকার পীরের দেখা পাই নি, সবাই ভণ্ড। আমার অবশ্যি তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি, মজার মানুষ দেখা আমার উদ্দেশ্য, ভণ্ড পীরের মতো মজার মানুষ আর কে আছে? সফদর আলী যদিও পীর নন কিন্তু একটা মজার মানুষ তো বটেই! তাই সফদর আলীকে আবার দেখার জন্যে পরের বৃহস্পতিবার আমি আবার সেই দোকানে গিয়ে একই টেবিলে বসে অপেক্ষা করতে থাকি।

ঠিকই সফদর আলী সময়মতো হাজির। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। তাই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠি, চশমার কাচের উপর গাড়ির ওয়াইপারের মতো ছোট ছোট দু'টি ওয়াইপার শাঁই শাঁই করে পানি পরিষ্কার করছে। দোকানের ভিতরে ঢুকে কোথায় কী একটা সুইচ টিপে দিতেই ওয়াইপার দু'টি থেমে গিয়ে উপরে আটকে গেল। সফদর আলী আমার দিকে তাকিয়ে একটু লাজুকভাবে হেসে কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, বৃষ্টিতে চশমা ভিজে গেলে কিছু দেখা যায় না কিনা।

আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, কোথায় পেলেন এরকম চশমা?

পাব আর কোথায়, নিজে তৈরি করে নিয়েছি।

আমি তখনই প্রথম জানতে পারলাম, সফদর আলী আসলে এক জন শখের বিজ্ঞানী। কথা একটু কম বলেন, একটু লাজুক গোছের মানুষ, কিন্তু মজার মানুষ তো বটেই। আমি তাঁর কাপড়ের দিকে লক্ষ করে বললাম, একেবারে তো ভিজে গেছেন, ঠাণ্ডা না লেগে যায়।

না, ঠাণ্ডা লাগবে না, বলে পকেটে আরেকটা কী সুইচ টিপে দিলেন। একটু পরেই তাঁর কাপড়-জামা থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যেতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝে কাপড় একেবারে শুকনো খটখটে। সফদর আলী পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী-একটা টিপে আবার সুইচ বন্ধ করে দিলেন। আমার বিস্মিত ভাবভঙ্গি দেখে আবার কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, কাপড়ের সুতার মাঝে মাঝে নাইক্রোম ঢুকিয়ে দিয়েছি, যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশি গরম করে নেয়া যায়। পকেটে ব্যাটারি আছে।

সফদর আলী আবার জিলিপি অর্ডার দিলেন। আজকেও টর্চ লাইটের মতো দেখতে সেই ঠাণ্ডা করার যন্ত্রটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে খুব তাড়াহুড়া নেই। আমি তাই আলাপ জমানোর চেষ্টা করলাম, প্রায়ই আসেন বুঝি এখানে?

না, শুধু বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার ছুটি কিনা।

কোনো অফিস বৃহস্পতিবার ছুটি হয় আমি জানতাম না, তাই একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী অফিস এটা যে বৃহস্পতিবারে আপনার ছুটি?

না না, আমার ছুটি নয়। বৃহস্পতিবার আমি ছুটি দিই।

কাদের ছুটি দেন?

এই, আমার একধরনের ছাত্রদের বলতে পারেন। সফদর আলী একটু আমতা আমতা করে থেমে গেলেন, ঠিক বলতে চাইছেন না, তাই আমি আর তাঁকে ঘাঁটালাম না।

সফদর আলী খুব মিশুক নন, তবে কথাবার্তা বলেন। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সাথে কথা হল। অনেক কিছু জানেন আর মাথায় অনেক ধরনের পরিকল্পনা, তাই তাঁর কথা শুনতেই ভারি মজা। ব্যাঙের ছাতার চাষ করে কী ভাবে খাদ্য সমস্যা মেটানো যায় বা কেঁচো পুষে কী ভাবে ঘরের আবর্জনা দূর করা যায়, সে থেকে শুরু করে সংখ্যা কেন দশভিত্তিক না হয়ে ষোলভিত্তিক হওয়া দরকার—এধরনের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ। সংখ্যা ষোলভিত্তিক হলে কম্পিউটার দিয়ে কাজ করা নাকি খুব সহজ হবে, আজকাল সব মাইক্রোপ্রসেসর নাকি ষোল কিংবা বত্রিশ বিটের হয়, সেটার মানে কী, আমি জানি না। সফদর আলী বলেছেন, আমাকে আরেক দিন বুঝিয়ে দেবেন। তিনি নিজে সবসময়েই ষোলভিত্তিক সংখ্যায় হিসেব করেন, তাই তিনি গোনেন খুব অদ্ভুতভাবে। সাত, আট, নয়ের পর দশ না বলে বলেন কুরা। তারপর কিলি, চিংগা, পিরু, মিকা, ফিকার পরে নাকি আসে দশ। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, তিনি যখন দশ বলেন তার অর্থ নাকি ষোল। তিনি যখন বলেন এক শ', তার অর্থ নাকি দুই শ' ছাপ্পান্ন। ব্যাপারটি যে ফাজলামি নয় সেটা আমি জেনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের প্রফেসরের সাথে কথা বলে, সত্যি নাকি এ ধরনের সংখ্যা হওয়া সম্ভব।

পরের বৃহস্পতিবার আবার সফদর আলীর সাথে দেখা। তাঁকে একটু চিন্তিত দেখা গেল। গিনিপিগের লোমে তেল–হলুদ লেগে গেলে সেটা কী ভাবে পরিষ্কার করা যায় বা লোম পুড়ে গেলে পোড়া গন্ধটা দূর করা যায় কী ভাবে জানি কি–না জিজ্ঞেস করলেন। খুব সঙ্গত কারণেই আমি সেটা জানতাম না, গিনিপিগের লোমে তেল–হলুদ লাগতে পারে কী ভাবে কিংবা পুড়ে যেতে পারে কী ভাবে, সেটা কিছুতেই আমার মাথায় এল না। তিনি কি শেষ পর্যন্ত গিনিপিগ রান্না করে খাওয়া শুরু করেছেন নাকি?

আজ কথাবার্তা খুব বেশি জমল না। কী যেন চিন্তা করে একটা কাগজে অনেকগুলো দাগ টেনে একটা দাগ আরেকটার সাথে জুড়ে দিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখতে লাগলেন। আমি তাঁকে আর বিরক্ত করলাম না, আমার নিজেরও কাজ ছিল, তাই উঠে পড়ার উদ্যোগ করতেই সফদর আলী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বিরিয়ানি রান্না করতে পারেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি? বিরিয়ানি? আমি মাথা নেড়ে জানালাম, রাঁধতে পারি না, শুধু খেতে পারি।

সফদর আলীর মুখটা একটু বিমর্ষ হয়ে গেল দেখে বললাম, আমার বোন থাকে শান্তিনগরে, সে খুব ভালো কাচ্চি বিরিয়ানি রাঁধতে পারে।

সফদর আলী খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বোনকে বলবেন একটা কাগজে লিখে দিতে? বুঝলেন কিনা, করব যখন ভালো করেই করি।

কী করবেন?

সফদর আলী আমতা আমতা করে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, তাই আমি আর কিছু বললাম না। জিজ্ঞেস করলাম, কবে দরকার আপনার বিরিয়ানির রেসিপি?

কাল দিতে পারবেন?

কোথায় দেব?

এইখানে।

আমার তাঁর বাসাটা দেখার ইচ্ছে, তাই বললাম, আপনার বাসাতে নিয়ে আসতে পারি, আমার কোনো অসুবিধে নেই।

সফদর আলী একটু ইতস্তত করে রাজি হলেন। একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলেন, শ্যামলীর কাছে কোথায় জানি থাকেন।

পরদিন আমি ঠিকানা খুঁজে সফদর আলীর বাসা বের করলাম। একটু নির্জন এলাকায় বেশ বড় একটা একতলা বাসা। দরজায় বেল টিপতেই ঘেউ-ঘেউ করে একটা কুকুর ভয়ানক রাগী গলায় চিৎকার করতে থাকে। কুকুরকে আমার খুব ভয় করে, আমি তাড়াতাড়ি দুই পা পিছিয়ে আসি। সফদর আলী দরজা একটু ফাঁক করে নিজের মাথাটা বের করে জিজ্ঞেস করলেন, এনেছেন?

আমি ভেবেছিলাম আমাকে হয়তো ভিতরে বসতে বলবেন, কিন্তু তার সেরকম ইচ্ছে আছে বলে মনে হল না। বদরাগী কুকুরটার ডাক শুনে আমার নিজের ইচ্ছেও কমে এসেছে, তাঁর হাতে কাগজটা দিয়ে চলে এলাম। আসার আগে দরজার ফাঁক দিয়ে একটু উঁকি মারার চেষ্টা করে মনে হল মেঝেতে ইঁদুরের মতো অনেকগুলো কী যেন ঘোরাঘুরি করছে। গিনিপিগের কথা বলছিলেন, তাই হবে হয়তো।

পরের বৃহস্পতিবার সফদর আলীকে খুব খুশি খুশি দেখা গেল। নিজে থেকে আলাপ শুরু করলেন, বললেন, বুঝলেন ইকবাল সাহেব, আমার কাজ প্রায় শেষ। এখন লবণ একটু কম হয়, কিন্তু এমনিতে ফার্স্ট ক্লাস জিনিস!

কিসে লবণ কম হয়?

কেন, বিরিয়ানিতে! মনে নেই আপনি রেসিপি এনে দিলেন?

ও! আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি নিজেই রাঁধছেন বুঝি?

মাথা খারাপ আপনার, আমি রাঁধব? রান্না করা আমার দু'চোখের বিষ!

তাহলে কি ভালো বাবুর্চি পেয়েছেন নাকি?

সফদর আলী হা হা করে হাসলেন, বাবুর্চি বলতেও পারেন ইচ্ছা করলে। গিনিপিগ বাবুর্চি!

মানে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার রান্না করে দেয় গিনিপিগেরা!

আমি গরম চা খাচ্ছিলাম, বিষম খেয়ে তালু পুড়ে গেল। মুখ হাঁ করে খানিকক্ষণ বাতাস টেনে জিজ্ঞেস করলাম, কী বললেন! গিনিপিগেরা?

হঁ! সফদর আলী চোখ নাচিয়ে বললেন, এত অবাক হচ্ছেন কেন, ব্যাপারটা কঠিন কিছু নয়, একটু সময় লাগে আর কী!

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না সফদর আলী আমার সাথে ঠাট্টা করছেন কিনা। এমনিতে অবশ্যি তিনি ঠাট্টা-তামাশার মানুষ নন, কিন্তু তাই বলে গিনিপিগ রান্না করছে সেটা বিশ্বাস করি কী ভাবে? সফদর আলী আমার অবিশ্বাসের দৃষ্টি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কম্পিউটারে অনেক কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান হয় কি-না?

আমি মাথা নাড়লাম, হয়।

কী ভাবে হয়?

আমি জানতাম না, তাই চুপ করে থাকলাম। সফদর আলী আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কম্পিউটার কখনোই একটা কঠিন সমস্যা একবারে করে না। সেটাকে আগে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে দেয়া হয়, তাকে বলে প্রোগ্রাম করা। প্রত্যেকটি ছোট ছোট অংশ আলাদা আলাদাভাবে খুব সহজ। কিন্তু সবগুলো একত্র হয়ে একটি জটিল সমস্যার সমাধান হয়। রান্না করার ব্যাপারটাও তাই, পুরো রান্না ব্যাপারটা অনেক কঠিন, কিন্তু রান্না করাকে যদি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ফেলা হয়, তা হলে সেই ছোট অংশগুলো কিন্তু মোটেও কঠিন নয়, যেমন একটা ডেকচি চুলোর উপরে রাখা বা ডেকচিতে খানিকটা ঘি ঢালা বা ঘি-এর মাঝে তেজপাতা ছেড়ে দেয়া—এই ছোট ছোট কাজগুলো যে কেউ করতে পারবে, একটু কষ্ট করে গিনিপিগকে শিখিয়ে দিলে একটা গিনিপিগও করতে পারবে।

সফদর আলী থামলেন। আর আমার মনে হল আমি খানিকটা বুঝতে পারছি তিনি কী ভাবে গিনিপিগকে দিয়ে রান্না করিয়ে নিচ্ছেন। আমার তখনো পুরোপুরি বিশ্বাস হয় নি, তাই সফদর আলী আবার শুরু করলেন, আমি করেছি কী, অনেকগুলো গিনিপিগকে নিয়ে তাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা জিনিস করতে শিখিয়েছি। যেমন একটা গিনিপিগ একটা ডেকচি ঠেলে চুলোর ওপরে তুলে দেয়, সে আর কিছুই পারে না। যখনই একটা ঘন্টা বাজে তখনই সে ঠেলে ঠেলে একটা ডেকচি চুলোর উপরে তুলে দেয়। সেটা শেখানো এমন কিছু কঠিন না—দু'দিন এক ঘন্টা করে শেখাতেই শিখে গেল। এর পরের গিনিপিগটা শুধু চুলোটা জ্বালিয়ে দেয়, সেটা শেখানো একটু কঠিন হয়েছিল, প্রথম প্রথম লোম পুড়ে যেত, এখন সাবধান হয়ে গেছে, আর লোম পোড়ে না। চুলো ধরে যাবার পর তিন নম্বর গিনিপিগটা এসে ডেকচিতে খানিকটা ঘি ঢেলে দেয়, তার পরই তার ছুটি! এরকম সব মিলিয়ে চিচিংগাইশটা গিনিপিগ আছে—

আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, চিচিংগাইশ মানে কি?

ও, চিচিংগাইশ হচ্ছে দুই আর কিলি, তার মানে ষোল দু'গুণে বত্রিশ যোগ কিলি, তার মানে আপনাদের তেতাল্লিশ! যাই হোক এই তেতাল্লিশটা গিনিপিগ তেতাল্লিশটা ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট কাজ করে, সবগুলো যখন শেষ হয় তখন চমৎকার এক ডেকচি বিরিয়ানি রান্না হয়ে যায়। সফদর আলী কথা শেষ করে একটু হাসলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যদি গিনিপিগগুলো উল্টোপাল্টা করে ফেলে, ঘি গরম হবার আগেই যদি চাল ঢেলে দেয়?

করবে না, এক জন শেষ করার আগে আরেকজন শুরু করবে না। প্রথম গিনিপিগ তার কাজ শেষ করে দ্বিতীয়টার পেটে একটা খোঁচা দেয়, এই খোঁচা না খাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়টা তার কাজ শুরু করবে না। সব ট্রেনিং দেয়া আছে।

আমার তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না। সফদর আলী যেটা বলেছেন, সেটা অসম্ভব হয়তো নয়, কিন্তু তাই বলে তেতাল্লিশটা গিনিপিগ হৈচৈ করে কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করছে, দৃশ্যটা কল্পনা করতেই আমার অস্বস্তি হচ্ছিল।

আমার অবিশ্বাসের ভঙ্গি দেখে সফদর আলী বললেন, আপনার বিশ্বাস হল না? আচ্ছা, আপনাকে দেখাচ্ছি। এই বলে তিনি বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে লেজ ধরে একটা নেংটি ইঁদুর বের করলেন, আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল সফদর আলী পকেটে করে জ্যান্ত কিছু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! ইঁদুরটা টেবিলে রাখামাত্র পাশের টেবিলের এক জন চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, সে ভেবেছে খাবার থেকে ইঁদুর বেরিয়েছে। অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করা হল, কিন্তু সফদর আলী আমাকে আর দেখাতে পারলেন না, ইঁদুরটা পকেটে ঢুকিয়ে বললেন পরদিন বিকালে তাঁর বাসায় যেতে। আমাকে গিনিপিগের বিরিয়ানি রান্না দেখাবেন।

পরদিন অফিসে গিয়ে শুনলাম জরুরি কাজে আমাকে তক্ষুনি চট্টগ্রাম যেতে হবে। আমাদের কোম্পানির এক জন ম্যানেজার নাকি অনেক টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। আমাকে অফিস থেকে সোজা এয়ারপোর্ট যেতে হল, বাসায় এক জন খবর পৌঁছে দেবে। ভেবেছিলাম দু'তিন দিন লাগবে, কিন্তু সেই ম্যানেজার এমনই ঝামেলা করে রেখেছিল যে পুরো দুই সপ্তাহ লেগে গেল। ঢাকায় ফিরে এসে ভাবলাম, সফদর আলীর সাথে দেখা করি। কিন্তু অফিসে ছিলাম না বলে এত কাজ জমে গিয়েছিল যে সময় পেতে পেতে আরো এক সপ্তাহ কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত সময় করে সফদর আলীর বাসায় গিয়ে তাঁকে পেলাম না। বেল টিপতেই কুকুরটা এমন ভয়ানক ঘেউ ঘেউ করা শুরু করল যে আমি আর অপেক্ষা করার সাহস পেলাম না। জিলিপির দোকানে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সফদর আলী অনেকদিন হল সেখানে আর যান না। পরে কয়েকবার তাঁর বাসায় গিয়েছি, তাঁর দরজায় চিঠি লিখে ঠিকানা দিয়ে এসেছি, কিন্তু তিনি আর যোগাযোগ করেন নি। আমাকে কয়েকদিনের ভেতরে আবার খুলনা যেতে হল, সেখানকার ম্যানেজারও নাকি কিছু টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। খুলনা থেকে গেলাম রাজশাহী, সেখান থেকে বগুড়া হয়ে ঢাকা। ঢাকায় ফিরে এসেও প্রথম-প্রথম অনেক ব্যস্ত ছিলাম, সপ্তাহখানেক পরে খানিকটা সময় পেয়ে ভাবলাম, সফদর আলীর বাসা থেকে ঘুরে আসি।

শ্যামলী আসার অনেক আগেই আমি বাতাসে বিরিয়ানির গন্ধ পেলাম। কাছাকাছি আসতেই মানুষের হৈচৈ শোনা যেতে লাগল। আরো কাছে গিয়ে দেখি সফদর আলীর বাসার চারপাশে অনেক লোকজন বসে বসে বিরিয়ানি খাচ্ছে, গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারলাম, আমার বোনের রেসিপি। লোকজন হাতে থালা-বাসন নিয়ে লাইন ধরে সফদর আলীর বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না, এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে দরজা একটু ফাঁক করে সফদর আলী বের হয়ে এলেন, হাতে এক ডেকচি গরম বিরিয়ানি। লোকজনকে বিরিয়ানি ভাগ করে দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে ডাকলাম। সফদর আলী ঘুরে আমাকে দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, ছুটে এসে আমার হাত ধরে বললেন, ইকবাল সাহেব, তাড়াতাড়ি আসেন। আমার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে।

সফদর আলীকে চেনা যায় না, চুল উশকোখুশকো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে। আমি বললাম, কী হয়েছে আপনার?

ভেতরে আসেন, তাহলেই দেখবেন।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আপনার কুকুরটা বেঁধে রেখেছেন তো।

কুকুর? কিসের কুকুর?

সেই যে আপনার বাসায় বেল টিপতেই ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে।

ও। সফদর আলী দুর্বলভাবে হাসলেন, মানুষজনকে ভয় দেখানোর জন্যে কুকুরের ডাক টেপ করা আছে। বেল টিপতেই বেজে ওঠে। কুকুর পাব কোথায় আমি?

আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমি সফদর আলীর সাথে ভেতরে ঢুকলাম, ভেতরে বেশ অন্ধকার। খানিকক্ষণ লাগল অন্ধকারটা চোখে সয়ে যেতে, তারপর আমি আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনাটি দেখতে পেলাম। ঘরের মাঝে সারি সারি গ্যাসের চুলা, তার মাঝে বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে, রান্না করছে শত-শত গিনিপিগ। গিনিপিগগুলো ছোটাছুটি করছে, কেউ ঠেলে ঠেলে ডেকচি নিয়ে যাচ্ছে, কেউ ঘি ঢালছে, কেউ পেঁয়াজ কাটছে, কেউ নেড়ে দিচ্ছে, কেউ চাল ঢেলে দিচ্ছে—সে এক এলাহি কাণ্ড। ঘর বিরিয়ানির গন্ধে ম' ম' করছে। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটি সামলে আমি কোনোমতে এক পাশে সরে এসে গিনিপিগদের দেখতে থাকি। সফদর আলী দুর্বল গলায় বললেন, মহা বিপদে পড়েছি।

AMARBOI.COM

কি বিপদ?

দেখছেন না! দিন-রাত গিনিপিগেরা শুধু বিরিয়ানি রান্না করে যাচ্ছে।

কেন? আপনি না বলেছিলেন তেতাল্লিশটা গিনিপিগ, এখানে তো মনে হয় তেতাল্লিশ শ'।

তেতাল্লিশটাই তো ছিল, কিন্তু মাঝে বাচ্চা হল সবার। আমার বাচ্চা বাড়ানোর ওষুধটা পরীক্ষা করে দেখছিলাম, তাতে অল্প সময়ে সবগুলোর নাতি-পুতি হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে প্রায় চার শ' গিনিপিগ।

মোটে চার শ'? দেখে তো মনে হচ্ছে লাখখানেক।

আপনাদের হিসেবে প্রায় এক হাজার, আমার হিসেব ষোলভিত্তিক, তাই আমার এক শ' হয় দু'শ ছাপ্পান্নতে।

এই সবগুলোকে আপনি বসে-বসে রান্না শিখিয়েছেন?

মাথা খারাপ আপনার? বাচ্চাগুলো নিজে-নিজে মা-বাবাদের দেখে-দেখে শিখে গেছে। সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, এখন সবাই রান্না করতে জানে, আর মুশকিল হচ্ছে এরা দিন-রাত শুধু রান্নাই করে যাচ্ছে, দিনে ত্রিশ-চল্লিশ বার রান্না হচ্ছে। কী ভাবে থামাই বুঝতে পারছি না।

কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার ডেকচিগুলো কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিলাম, সবাই মিলে আমাকে আক্রমণ করল। কোনোমতে পালিয়ে বেঁচেছি!

আমি গিনিপিগগুলো দেখেই বুঝতে পারলাম সমস্যাটি সহজ নয়, এতগুলো গিনিপিগকে থামানো কঠিন, সবাই যদি একটু করে খামচে দেয়, শরীরের চামড়া উঠে যাবে। আমার হঠাৎ মনে পড়ল সফদর আলী বলেছিলেন, তিনি প্রথমে একটা ঘন্টা বাজাতেন, তখন রান্না শুরু হয়ে যেত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সফদর সাহেব, আপনার সেই ঘন্টাটি কোথায়?

ঐ যে, তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। আশেপাশে কয়েকটা গিনিপিগ ঘোরাঘুরি করছে, মাঝে-মাঝে একটা এসে ঘন্টা বাজিয়ে দেয়, আর নতুন রান্না শুরু হয়ে যায়।

আপনি তো বলেছিলেন ঘন্টাটা আপনি নিজে বাজাতেন?

প্রথমে তাই বাজাতাম, আমাকে দেখে-দেখে এখন নিজেরাই শিখে নিয়েছে, যখন খুশি বাজিয়ে দেয়। ইলেকট্রিক ঘন্টা, বাজানোর খুব সুবিধে।

আমি সাবধানে ঘন্টাটা তুলে নেয়ার চেষ্টা করতেই প্রায় ত্রিশটা গিনিপিগ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমি লাফিয়ে কোনোমতে সরে এলাম।

সফদর আলী ছুটে এসে বললেন, সর্বনাশ! ওদের ঘাঁটাবেন না, মাংস শেষ হয়ে আসছে, আপনাকে কেটে বিরিয়ানির মাঝে দিয়ে দেবে!

আমি ঢোক গিলে বললাম, ঘন্টা বাজতেই যখন রান্না শুরু হয়, তখন ঘন্টা বাজানোটা বন্ধ করলেই তো সব বন্ধ হয়ে যায়। ঘন্টাটা কোনোমতে সরিয়ে ফেললেই হয়।

সফদর আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, হাতে কিল দিয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন! কী বোকা আমি, একবারও এই সহজ জিনিসটা মনে হয় নি! ইলেকট্রিক ঘন্টা এটা, প্লাগ টেনে খুলে ফেললেই হবে, ঘন্টাটা সরাতেও হবে না। সফদর আলী ছুটে গিয়ে প্লাগটা টেনে খুলে ফেললেন।

সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের মাঝে নতুন রান্না শুরু হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। যেসব রান্না আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল গিনিপিগেরা সেগুলো শেষ করে গুটিগুটি নিজেদের ঘরে ফিরে গেল। নিশ্চয়ই সেরকম ট্রেনিং দেয়া আছে। যে কয়টি গিনিপিগ ঘন্টা বাজানো শিখে নিয়ে এই দুর্গতির সৃষ্টি করেছে শুধু তারাই ঘোরাঘুরি করতে থাকে, একটু পরে পরে এসে ঘন্টা বাজানোর চেষ্টা করে, কিন্তু প্লাগ খুলে নেয়ায় আর শব্দ হয় না। একসময়ে সেগুলোও তাদের ঘরে ফিরে গেল, সফদর আলী দরজা বন্ধ করে দিয়ে মুখে হাসি নিয়ে ফিরে এলেন।

ছয় ডেকচি বিরিয়ানি রান্না হয়ে আছে। আমরা সেগুলো বাইরে বিতরণ করে দিয়ে এলাম। কয়েকজন জিজ্ঞেস করল, কাল কখন আসবে। সফদর আলী যখন বললেন, আর আসতে হবে না—তারা বেশ অবাক হল। এক জন তো একটু রেগেই গেল মনে হল, সে নাকি দেশে চিঠি লিখে দিয়েছে, তার পরিবারের অন্য সবার আজ রাতে পৌঁছে যাবার কথা। সে এখন কী করবে সফদর আলীর কাছে জানতে চাইল, সফদর আলী কিছু বলতে পারলেন না। দরজায় তালা মেরে আমাকে নিয়ে একটা রিকশা নিলেন, অনেকদিন জিলিপি খাওয়া হয় না, আজ জিলিপি খাওয়া হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ খবর অনুযায়ী সফদর আলী তাঁর এক হাজার গিনিপিগকে জমি চাষ করা শেখাচ্ছেন। তাঁর বাসার পিছনে খালি জায়গা আছে, সেখানে নাকি তারা আলু, ফুলকপি আর টমেটো লাগাচ্ছে! একটু বড় হলেই আমাকে দেবেন বলেছেন। আমি অপেক্ষা করে আছি। আজকাল সবজির যা দাম!

জংবাহাদুর

সদরঘাটে পুরানো লোহা–লক্কড়ের দোকানে সফদর আলীর সাথে আমার দেখা, মোটা লোহার হাতলের মতো দেখতে বিদঘুটে একটা জিনিস দরদাম করছিলেন। এরকম একটা জিনিস মানুষের কোনো কাজে লাগতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখতেই তিনি ভীষণ চমকে ঘুরে তাকালেন, আমাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ও আপনি! আমি আরো ভাবলাম—

কী ভাবলেন?

সফদর আলী কথা শেষ না করে সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন, বললেন, নাহ্, কিছু না।

সফদর আলী তাঁর অভ্যাসমতো কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন দেখে আমি আর ঘাঁটালাম না। তাঁকে কেমন জানি একটু উদভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে, চেহারায় কেমন একটু উড়ো উড়ো ভাব, ভালো করে তাকিয়ে দেখি বাম হাতের বুড়ো আঙুলে একটা ব্যান্ডেজ। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার আঙুলে কী হল?

আর বলবেন না, কিকুলমুকাসের স্ক্রু লাগাচ্ছিলাম, এমন সময় একটা মশা কামড় দিল ঘাড়ে, একটু নড়তেই ডালাটা খুলে এসে বুড়ো আঙুলটাকে থেঁতলে দিয়েছে।

কিকুলমুকাস কী জিনিস জিজ্ঞেস করব কি না ভাবছিলাম, তার আগেই সফদর আলী আমাকে হাতলটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কুড়ি টাকা চাইছে, নিয়ে নেব নাকি, কী বলেন আপনি?

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, মাথা খারাপ আপনার? কুড়ি টাকা এই বিদঘুটে হাতলটার জন্যে? আমাকে তো কেউ বিনে পয়সায় দিলেও এটা নেব না! চলেন, চলেন এখান থেকে—আমি তাঁকে সেখানে থেকে টেনে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করি।

দোকানি আমার কথায় একটু মনঃক্ষুণ্ন হল বলে মনে হল; বলল, কী বলেন স্যার, খাঁটি আমেরিকান স্টিল, ডান্ডা মারলেও কিছু হবে না। ফাইটিং প্লেনের পার্টস, কেনা দামে দিয়ে দিচ্ছিলাম। নেন, না হয় আরো দুই টাকা কম দেবেন।

সফদর আলী চোখ ছোট করে গলা নামিয়ে দোকানিকে বললেন, ফাইটিং প্লেন কেউ কখনো লোহা দিয়ে বানায়? অ্যালুমিনিয়াম, ক্যাডমিয়াম আর টাংস্টেন, জিনিসটা হালকা করতে হবে না? সেন্টার অব গ্র্যাভিটি যদি ঠিক না থাকে জিনিসটার ব্যালেন্স হবে কী ভাবে?

দোকানি কিছু না বুঝে একটু অপ্রস্তুতের মতো হাসল। সফদর আলী আরো কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে চাইছিলেন, আমি কোনোমতে তাঁকে টেনে সরিয়ে আনি। সদরঘাটের ভিড় বাঁচিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সফদর আলী কী যেন চিন্তা করতে থাকেন, আমি তাঁকে বিরক্ত করলাম না। খানিকক্ষণ কোনো কথাবার্তা নেই, হঠাৎ একসময় ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মানুষের ডিজাইনটা আসলে ঠিক হয় নি।

আমি কিছু না বুঝে বললাম, কি বললেন?

মানুষের ডিজাইন, খুবই দায়সারা ডিজাইন।

মানে?

যেমন ধরেন এই হাতের ব্যাপারটা, মোটে দুইটা হাতে কি কিছু হয়? একটা মানুষের অন্তত চারটা হাত থাকা উচিত ছিল।

চারটা হাত?

হ্যাঁ। দুইটা হাতে কিছুই হয় না।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, চারটা হাতের কী দরকার? আমার তো দুইটা হাতেই বেশ চলে যাচ্ছে। ছেলেবেলায় একবার নাটক করতে স্টেজে উঠেছিলাম— বিবেকের পার্ট, তখন দুই হাত নিয়েই কী মুশকিল, কোথায় নিয়ে লুকাই, কী করি। চার হাত হলে যে কী সর্বনাশ হত।

বাচ্চা ছেলেদের কথা শুনে বড়রা যেভাবে হাসে, সফদর আলী সেভাবে একটু হেসে বললেন, কী যে আপনি বলেন! কখনো সল্ডারিং করেছেন?

না।

করলে বুঝবেন। সল্ডার করার সময় এক হাতে জিনিসটা ধরতে হয়, আরেক হাতে সল্ডারিং আয়রন। ব্যস, দুই হাতই শেষ, সল্ডার ধরবেন কী দিয়ে? যদি চারটা হাত থাকত তা হলে তিন নম্বর হাত দিয়ে সল্ডার ধরা যেত।

কিন্তু আপনি তো চারটা হাতের কথা বলছেন।

হ্যাঁ, চার নম্বর হাত হচ্ছে চুলকানোর জন্যে। লক্ষ করে দেখেছেন, যখন কোনো কাজে দুই হাতই ব্যস্ত থাকে তখন সবসময় নাকের ডগা চুলকাতে থাকে?

আমাকে স্বীকার করতেই হল যে ব্যাপারটি সত্যি এবং চুলকানোর জন্যে একটা বাড়তি হাত থাকা আসলে মন্দ ব্যবস্থা নয়।

সফদর আলী তাঁর ব্যান্ডেজ বাঁধা বুড়ো আঙুলটি দেখিয়ে বললেন, যদি আমার চারটা হাত থাকত, তাহলে আমি তিন নম্বর হাত দিয়ে কিকুলমুকাসের ডালাটা ধরে রাখতে পারতাম। যখন মশাটা এসে কামড় দিল তখন চার নম্বর হাত দিয়ে কষে দিতে পারতাম একটা থাবড়া।

সফদর আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মশার জন্যে, না চার নম্বর হাত নেই সেই দুঃখে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমি চার হাতের একটা মানুষ কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ হল না, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে সফদর আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, বাকি দুটো হাত থাকবে কোথায় সফদর সাহেব?

কেন, বগল থেকে বেরিয়ে আসবে।

আমি কল্পনা করলাম আমার বগল থেকে আরো দুটো হাত বেরিয়ে আসছে, কিন্তু ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার গায়ে কেমন জানি কাঁটা দিয়ে ওঠে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়তি হাত দুটোতে যে পাঁচটা করে আঙুল থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই; সফদর আলী গম্ভীর হয়ে বললেন, দুটো করে থাকলেই হয়, নখ কাটতে তা হলে বেশি সময় নষ্ট হবে না।

যখন নিজেকে মোটামুটি বিশ্বাস করিয়ে এনেছি যে সত্যি মানুষের চারটা হাতের দরকার, তখন হঠাৎ আমার অন্য একটা সম্ভাবনার কথা মনে হল, একটু ভয়ে ভয়ে বললাম, কথাটা আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু—

দুই আঙুলের কথা তো, আমি—

না, আমি চার হাতের কথা বলছিলাম। আপনার কথা ঠিক, চার হাত হলে কাজকর্মে অনেক সুবিধে, কিন্তু চারটা হাতই যে একজন মানুষের হতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।

মানে?

আপনি খুঁজে পেতে একটা সহকারী নিয়ে নেন, তাহলেই আপনাদের দু'জনের মিলে চারটা হাত হয়ে যাবে।

ঠিক বলেছেন, সফদর আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। হঠাৎ কী একটা মনে পড়ে যায় আর তিনি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে থাকেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

সহকারী নেয়া যাবে না।

কেন?

সফদর আলী গলা এত নামিয়ে আনলেন যে কথা প্রায় শোনা যায় না, ফিসফিস করে বললেন, অনেক গোপন জিনিসের উপর গবেষণা করি তো, জানাজানি হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই যে কিকুলুস্কাসের কথা বলছি, সেটা যদি কেউ জেনে ফেলে, কী সর্বনাশ হবে আপনি জানেন?

সফদর আলী এত গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে থাকেন যে দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। এরপর আর কথাবার্তা জমল না, তিনি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ছেন আমি পিছু-পিছু হাঁটছি—এরকম আর কতক্ষণ চলতে পারে? নবাবপুরের মোড়ে এসে আমি একটা বাস নিয়ে নিলাম, সফদর আলী যাত্রাবাড়ির দিকে রওনা দিলেন, সেখানে তাঁর নাকি কি দরকার।

দু' দিন পরের কথা। বিকেলে বাসায় এসে শুনি আমার নাকি একটা টেলিগ্রাম এসেছে। টেলিগ্রামে জরুরি কিছু আছে ভেবে ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি সবাই মিলে সেটা খুলে ফেলেছে, কিন্তু পড়ে এখন কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারার কথা নয়। কারণ টেলিগ্রামে লেখা :

চার হাতের প্রয়োজন নাই। দুই হাত এবং দুই হাত যথেষ্ট।
আপনি ঠিক। কিন্তু সহকারী নয়। সহজ সমাধান। কাওরান বাজার। সন্ধ্যা সাতটা।

নিচে কোনো নাম লেখা নেই, কিন্তু বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না এটা কার কাজ। টেলিগ্রাম করতে তাঁকে বাসে কিংবা রিকশায় যত দূর যেতে হয়েছে, বাসার দূরত্ব তার

অর্ধেকও নয়, কিন্তু তাঁকে সেটা কে বোঝাবে? বাসার সবাই জানতে চাইল ব্যাপারটা কি, আমি বোঝালাম আমার এক বন্ধুর রসিকতা। আমার বন্ধুদের সম্পর্কে বাসার সবার খুব উচ্চ ধারণা আছে সেরকম দাবি করব না, কাজেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করাতে বেশি বেগ পেতে হল না।

সাতটার সময় কাওরান বাজারে চায়ের দোকানে হাজির হয়ে দেখি সফদর সাহেব টেবিলে একটা কাগজ বিছিয়ে সেখানে কী যেন একটা আঁকিজুকি করছেন। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি সেটা ভাঁজ করে পকেটে লুকিয়ে ফেললেন। আমি পাশে গিয়ে বসতেই গলা নামিয়ে বললেন, বানর, বানর হচ্ছে সমাধান!

কী বললেন?

বললাম বানর।

বানর? কিসের বানর?

কিসের আবার হবে, সফদর আলী একটু অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, আমার একটা বানর দরকার।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বানর দিয়ে কী করবেন?

আপনি বলছিলেন না সহকারীর কথা? বানর হবে আমার সহকারী। আগে শুধু একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।

বানরকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন? আমি উচ্চস্বরে হাসতে গিয়ে থেমে গেলাম, আমার হঠাৎ গিনিপিগকে দিয়ে কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করার কথা মনে পড়ে গেল। সফদর আলী যদি গিনিপিগকে দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করিয়ে নিতে পারেন, কে জানে সত্যিই হয়তো বানরকে শিখিয়ে পড়িয়ে সহকারী বানিয়েও নিতে পারবেন। তবু ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না, একটু কেশে বললাম, বানরকে দিয়ে কী কী কাজ করানোর কথা ভাবছেন?

কঠিন কিছু নয়, সহজ কাজ। এই সকালে দু'টি রুটি টোস্ট করে এককাপ চা তৈরি করে দেবে, ঘরদোর একটু পরিষ্কার করবে, দুপুরে চিঠিপত্রগুলো আনবে—এইসব ছোটখাট কাজ।

আমি কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, সফদর আলী বসে আছেন আর একটা বানর তাঁর জন্যে কড়া লিকারের চা তৈরি করছে।

আসল কাজ অবশ্যি আমার গবেষণা, সফদর আলী চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, বানরকে দরকার সেজন্যে।

বানরের উপর গবেষণা?

না না, বানরের উপর আর নতুন কী গবেষণা হবে, সে তো প্রায় শেষ। আমি আমার নিজের গবেষণার কথা বলছি। বানর আমার গবেষণায় সাহায্য করবে, সে হবে আমার বাড়তি দুই হাত। মনে করেন কিকুলমুকাসটা খুলতে চাই, বলব, বান্দর আলী, স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়ে এস তো—

বান্দর আলী?

সফদর আলী লাজুকভাবে হেসে বললেন, নামটা খারাপ হল?

না না, খারাপ হবে কেন, চমৎকার নাম! আমি হাসি গোপন করে জিজ্ঞেস করলাম, পশুপাখিকে এভাবে কাজকর্ম শেখানো কি খুব কঠিন নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা নির্ভর করে কী ধরনের পশু তার উপর, সফদর আলী একটা লম্বা বক্তৃতা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন, যদি ম্যামেল বা স্তন্যপায়ী প্রাণী হয়, তা হলে খুবই সহজ। ম্যামেলদের ভেতরে বানরের বুদ্ধি আবার অন্যদের থেকে বেশি, কাজেই বানরকে শেখানো একেবারে পানিভাত। পদ্ধতিটা হচ্ছে পুরস্কার পদ্ধতি, ট্রেনিং দেবার সময়ে যখনি একটা কাজ ঠিকভাবে করে তখনি পুরস্কার দিতে হয়। মনে করেন আপনি একটা বানর, আমি আপনাকে বললাম, বান্দর আলী, স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়ে এস তো। আপনি তখন আমার কথা কিছু না বুঝে লাফ-ঝাঁপ দেয়া শুরু করবেন। আমি তখন চেষ্টা করব আপনাকে স্ক্রু-ড্রাইভারের কাছে নিয়ে যেতে। লাফ-ঝাঁপ দিতে দিতে হঠাৎ যদি ভুলে স্ক্রু-ড্রাইভারটা ছুঁয়ে ফেলেন, সাথে সাথে আপনাকে পুরস্কার হিসাবে একটা কলা দেব। এরকম কয়েকবার যদি করি তখন আস্তে আস্তে আপনি বুঝতে পারবেন স্ক্রু-ড্রাইভার কথাটা শুনে আপনি যদি স্ক্রু-ড্রাইভারটা গিয়ে ধরেন, তা হলে আপনি একটা কলা পাবেন। কলার লোভে এরপরে যখনই আমি বলব স্ক্রু-ড্রাইভার, আপনি ছুটে যাবেন স্ক্রু-ড্রাইভারটা ধরতে। এভাবে আস্তে-আস্তে অগ্রসর হতে হয়। প্রথমে স্ক্রু-ড্রাইভারটা ধরলেই আপনাকে একটা কলা দেব, কিন্তু পরে কলা পেতে হলে আপনাকে স্ক্রু-ড্রাইভারটা আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে। বুঝতে পারলেন তো ব্যাপারটা?

হুঁ, তা বুঝেছি। নিজেকে একটা বানর ধরে নিলে বুঝতে ভারি সুবিধে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এভাবে শেখাতে অনেক দিন লেগে যাবে না?

না না, অনেক দিন লাগবে কেন, দু'সপ্তাহে হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমার একটা মনোযোগ বাড়ানোর ওষুধ আছে, সেটা খাইয়ে দিলে তো কোনো কথাই নেই। সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায়।

কোন জায়গায়?

একটা বানর কোথায় পাই?

বানর পাচ্ছেন না?

নাহ্, অনেক খুঁজলাম কয়দিন ধরে, কোথাও বানর নেই। পুরানো ঢাকায় এক জন বলল, এক কাঁদি সাগর কলা আর একটা গরম সোয়েটার হলে সে নাকি ধরে দেবে। আমি তাকে এনে দিলাম, কিন্তু সেই থেকে তার আর দেখা নেই।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, সাগর কলা না হয় বুঝলাম, কিন্তু বানর ধরার জন্যে সোয়েটার কী জন্যে?

সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, কী জানি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা বলল, এখন শীত পড়ে গেছে, তাই বানরেরা নাকি সোয়েটারের জন্যে খুব ব্যস্ত। লোকটা বানর ধরতে গিয়ে কোনো ঝামেলায় পড়ল কি না কে জানে। বানরেরা খুব দুষ্টু হয় জানেন তো, বিশেষ করে চ্যাংড়া বানরেরা। ঠিকানাও রাখি নি যে একটু খোঁজ নিই।

আমি আর কিছু বললাম না, বিজ্ঞানী মানুষেরা যদি বোকা না হয়, তাহলে বোকা কারা?

বানর কী ভাবে জোগাড় করা যায় সফদর আলী সেটা নিয়ে আমার সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। বানরটা বেশি ছোট হলে অসুবিধে, কাজকর্ম করতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনজঙ্গল খুঁজে একটা ধাড়ি বানর ধরে আনতেও সফদর আলীর আপত্তি, তাহলে নাকি পোষ মানাতেই অনেক দিন লেগে যাবে। তার একটি পোষ মানানোর ওষুধ আছে, কিন্তু সেটা একটু কম-বেশি হয়ে গেলে পোষ মানার বদলে নাকি অল্প-অল্প দাড়ি গজিয়ে যায়। সফদর আলীর ইচ্ছা একটা পোষা বানর জোগাড় করা। আমি ভেবেচিন্তে তাকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বুদ্ধি দিলাম। একটু ইতস্তত করে সফদর আলী শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন। নিজের ঠিকানা জানাতে চান না, তাই একটা পোস্ট অফিস বক্স খুলে নেয়ার কথা বললাম। বিজ্ঞাপনটা আমাকে লিখে দিতে বললেন, লেখালেখি তাঁর নাকি ভালো আসে না। কিন্তু আমি যেটাই লিখি তাঁর পছন্দ হয় না। ভাষাটা নাকি ঠিক জোরালো হচ্ছে না। ঘন্টাখানেক পরিশ্রম করে যেটা তাঁর পছন্দ হল সেটা এরকম :

সন্ধান চাই! সন্ধান চাই!! সন্ধান চাই!!!
পোষা বানরের সন্ধান চাই! উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া লইব!! যোগাযোগ করুন!!!

সফদর আলী বিজ্ঞাপন লেখা কাগজটি নিয়ে তখন-তখনি খবরের কাগজের অফিসের দিকে রওনা দিলেন, পরবর্তী এক সপ্তাহ সেটি ছাপা হবে।

বিজ্ঞাপনটি ছাপা হবার সাথে সাথে সফদর আলী বানরের সন্ধান পেতে থাকবেন, আমার ঠিক সেরকম বিশ্বাস ছিল না। সপ্তাহ দুয়েক পার হবার পর হয়তো একটা-দুইটা চিঠি পাবেন, আমি অন্তত তাই ভেবেছিলাম, তাই সপ্তাহ শেষ হবার আগেই আবার যখন টেলিগ্রাম এসে হাজির, আমি একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। টেলিগ্রামটা পড়ে অবশ্যি অবাক থেকে বেশি শঙ্কিত হয়ে উঠি, কারণ তাতে মাত্র দু'টি শব্দ লেখা :

বিজ্ঞাপন ব্যুমেরাং।

টেলিগ্রামের অর্থ না বোঝার কোনো কারণ নেই, সফদর আলী বলতে চাইছেন, বিজ্ঞাপনটি দেয়ার ফলে কোনো লাভ না হয়ে বরং উল্টো ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। সেটি ঠিক কী ভাবে হতে পারে আমি কিছুতেই ভেবে পেলাম না। সে রাতে আমার আবার এক জায়গায় খাবার দাওয়াত, বড়লোক আত্মীয়, তাদের টাকা পয়সার গল্পে ঠিক জুত করতে পারি না। তাই টেলিগ্রামের অজুহাত দেখিয়ে বাসার সবাইকে আত্মীয়ের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমি কাওরান বাজারে সেই চায়ের দোকানে হাজির হলাম। আমার কপাল ভালো। সফদর আলী সেখানে বসে আছেন, তাঁকে দেখে চেনা যায় না। চোখের কোনে কালি, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মনে হয় বয়স দশ বৎসর বেড়ে গিয়েছে! আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সফদর সাহেব, কী হয়েছে?

কী হয়েছে? আপনার বুদ্ধি শুনেই তো এখন আমার এই অবস্থ।

কী হয়েছে আগে বলবেন তো!

সফদর আলী কোনো কথা না বলে তাঁর বিরাট পকেট থেকে এক বান্ডিল চিঠি বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই দেখেন।

আমি মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে বললাম, বাহ্, অনেক চিঠি পেয়েছেন তো।

সফদর আলী মেঘস্বরে বললেন, আগে পড়ে দেখেন।

আমি একটা পোস্ট কার্ড তুলে নিই। সেখানে গোটা গোটা হাতে একটা কবিতা লেখা :

সফদর আলী মিয়া
সদরঘাটে গিয়া
বান্দরের গেঞ্জি কেনে চাইর টাকা দিয়া!

আমি কোনোমতে হাসি চেপে রেখে পরের চিঠিটা খুলি। সেটি শুরু হয়েছে এভাবে :

জনাব,
আপনি বানরের সন্ধান চান? আমার মধ্যম পুত্র (বয়স এগার) এত পাজি যে তার স্বভাব আর বানরের স্বভাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। আপনার আপত্তি না থাকিলে তাহাকে আপনার কাছে নিয়া আসিতে চাই ....

এর পরে মধ্যম পুত্রের বিভিন্ন কাজকর্মের নমুনা দেয়া আছে, পড়ে আমারো কোনো সন্দেহ থাকে না যে, তার স্বভাবের সাথে বানরের স্বভাবের বিশেষ পার্থক্য নেই। আমি আরেকটা চিঠি তুলে নিই, এটা ঝকঝকে কাগজে লেখা, উপরে একটা ফার্মের নাম আর টেলিফোন নাম্বার। টাইপ করা চিঠি। শুরু হয়েছে এভাবে :

জনাব সফদর আলী,
বানরের জন্য আপনি যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আমরা পাইকারি বানর বিক্রেতা, দেশ ও বিদেশে আমরা বানরের চালান দিয়া থাকি। ব্যাবসার কারণে আমরা খুচরা বিক্রয় করিতে অসমর্থ। আপনি যদি দুই শতের অধিক বানর ক্রয় করিতে চান অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। আমাদের বানর সুস্থ সবল এবং মিষ্ট স্বভাববিশিষ্ট।......

এরপরে বানরের আকার–আকৃতি এবং স্বভাবের সুদীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। সফদর আলী আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, আমার হাসি গোপন করার চেষ্টা তাঁর চোখে পড়ে গেল। তিনি কেন জানি হঠাৎ আমার উপর রেগে উঠলেন, মুখ কালো করে বললেন, আপনার চিঠি পড়ে হাসি পাচ্ছে? ঠিক আছে, এইটা পড়ে দেখেন হাসি পায় কি না।

সফদর আলী চিঠির বান্ডিল থেকে একটা খাম বের করে দিলেন, ভেতরের চিঠিটা শুরু হয়েছে এভাবে :

শালা,
তোমাদের আমি চিনি। তোমরা আমাদের দেশের বানর বিদেশে পাঠাও তার উপর অত্যাচার করার জন্যে। ভেবেছ আমি তোমাকে খুঁজে পাব না? ঠিকই আমি

তোমাকে খুঁজে বের করব, তারপর কিলিয়ে তোমাকে আমি সিধে করব। তোমাদের মতো মানুষের চামড়া জ্যান্ত ছিলিয়ে সেই চামড়া দিয়ে জুতো বানানো দরকার।

আকরম খান

এই চিঠিটা পড়ে আমি সত্যিই একটু ঘাবড়ে যাই, ভরসার কথা, যারা সামনাসামনি কথা না বলে এরকম উড়ো চিঠি পাঠায়, ব্যক্তিগত জীবনে তারা আসলে কাপুরুষ হয়। বানরের ওপর অত্যাচারের যে কথাটা লিখেছে সেটা অবশ্যি পুরোপুরি অমূলক নয়, পাশ্চাত্য দেশে যুদ্ধের সময় শত্রুদেশের উপর ব্যবহার করার জন্যে যেসব বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরি করা হয় সেগুলো বিভিন্ন পশুপাখি, বিশেষ করে বানরের উপর নাকি পরীক্ষা করে দেখা হয়। কিন্তু আমাদের নিরীহ সফদর আলীকে সেজন্যে দায়ী করার কী মানে থাকতে পারে?

আমি সফদর আলীকে সাহস দেয়ার জন্যে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করি। সফদর আলী সেটা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে বললেন, মানুষের চামড়া দিয়ে জুতো হয় কখনো? মানুষের চামড়ার কোনো ইলাস্টিসিটি আছে? আছে?

আমি তাড়াতাড়ি কিছু না বুঝেই বললাম, নেই, একেবারেই নেই। কোথেকে থাকবে?

তাহলে?

আমাকে স্বীকার করতেই হল আকরম খাঁ মানুষের চামড়া দিয়ে জুতো বানানোর কথা বলে খুবই অবিবেচকের মতো কথা বলেছেন। সফদর আলী খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে বললেন, আমি এর মাঝে নেই, আপনি যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন।

আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, আপনি কিছু ভাববেন না, এখন থেকে সব দায়িত্ব আমার। আজ থেকে আমি পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠিগুলো আনব, খুলে পড়ে দেখব, যদি কোনো কাজের খবর থাকে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

সফদর আলী একটু শান্ত হলেন বলে মনে হল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, একটা জিনিস যদি না টেকে সেটা বানিয়ে লাভ আছে?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, কিসের কথা বলছেন?

জুতোর কথা। মানুষের চামড়া কত পাতলা, সেই জুতো কি এক সপ্তাহের বেশি টিকবে? ভিনিগারে এক সপ্তাহ ভিজিয়ে রেখে, আলট্রাভায়োলেট রে দিয়ে ঘন্টাখানেক যদি শুকানো যায়—

আমি চা খেতে গিয়ে বিষম খেলাম, এই নাহলে আর বিজ্ঞানী!

সফদর আলীর বানরের সন্ধান চেয়ে বিজ্ঞাপনের উত্তরে যেসব চিঠি এল সেগুলো পড়ে আমি মানুষের চরিত্রের একটা নতুন দিক আবিষ্কার করলাম, মানুষ গাঁটের পয়সা খরচ করে শুধুমাত্র ঠাট্টা করার জন্যে চিঠি লিখতে ভারি পছন্দ করে। অসংখ্য চিঠিতে সফদর আলী এবং বানরকে নিয়ে কবিতা, কয়েকটি বেশ ভালো, ছন্দজ্ঞান প্রশংসা করার মতো। ঠিকানা দেয়া থাকলে আমি দেখা করে কবিতা লেখা চালিয়ে যাওয়ার

জন্যে উৎসাহ দিয়ে আসতাম। অনেকে চিঠিতে কৌতূহলী হয়ে জানতে চেয়েছেন, বানরকে দিয়ে কী করা হবে; অনেকে লিখেছে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে তারা বানর ধরে দেবে, কয়েকজন আবার আকরম খাঁর মতো ক্ষেপে বানরের ব্যবসা থেকে সরে পড়ার উপদেশ দিয়েছেন। আমি যখন আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তখন হঠাৎ একটা চিঠি এসে হাজির। চিঠিতে শান্তিনগর থেকে এক ভদ্রলোক লিখেছেন, তাঁর একটি বানর আছে, বানরটিকে যত্ন করে রাখার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি বানরটি দিয়ে দিতে পারেন। চিঠি পড়ে আমার খুশি দেখে কে। সফদর আলীর সেই চেহারা অনেক দিন থেকে ভুলতে পারছি না। সবচেয়ে বড় কথা, চিঠিটা ঢাকা থেকে লেখা, ইচ্ছা করলে আমি এখনই গিয়ে খোঁজ নিতে পারি। আমি আর দেরি করলাম না, বাসায় কেউ একজন এসে সন্ধ্যাটা মাটি করার আগেই আমি বের হয়ে পড়লাম।

শান্তিনগরে ভদ্রলোকের বাসা খুঁজে বের করে শুনি তিনি নেই, ঘন্টাখানেকের মধ্যে আসবেন। আমি সময় কাটানোর জন্যে খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ালাম। একটা চায়ের দোকানে এককাপ বিস্বাদ চা খেয়ে, একটা পানের দোকানে খানকয়েক আধুনিক গান শুনে, রাস্তার মোড়ে ঘাড় ব্যথা এবং মালিশের ওষুধের উপর একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুনে ঘন্টাখানেক পরে আবার ভদ্রলোকের বাসায় এসে হাজির হই। এবারে ভদ্রলোক বাসায় আছেন, খবর পাঠাতেই বের হয়ে এলেন, মোটাসোটা হাসিখুশি চেহারা। আমি বললাম, আপনার সাথে একটু কাজ ছিল।

আমার সাথে? কাজ? ভদ্রলোক অবাক হবার ভান করে বললেন, আমি এত অকাজের মানুষ, আমার সাথে আবার কারো কাজ থাকতে পারে নাকি! তারপর চিৎকার করে ভেতরে বললেন, এই, চা দে বাইরে।

আমি পকেট থেকে সফদর আলীকে লেখা তাঁর চিঠিটা বের করে বললাম, আপনি এই চিঠিতে লিখেছিলেন—

ও! আপনিই সফদর আলী! ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমি ভেবেছিলাম আপনি আরো অনেক মোটা হবেন, ভুঁড়ি থাকবে, মাথায় টাক থাকবে আর গায়ের রংটা একটু ফর্সা হবে! বুঝলেন কি না, মানুষের নাম শুনলেই আমার চোখের সামনে তার চেহারাটা ভেসে ওঠে।

আমি বললাম, আমি সফদর আলী না, সফদর আলী আরেকজন, আমি তাঁর হয়ে এসেছি।

ভদ্রলোকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আসল সফদর আলীর ভুঁড়ি আছে? মাথায় টাক?

ভদ্রলোককে নিরাশ করতে আমার একটু খারাপই লাগে, কিন্তু কী করব, বলতেই হয় সফদর আলীর ভুঁড়ি নেই, টাক নেই—বেমানান গোঁফ আছে, কিন্তু সেটা তো আর নাম শুনে চোখের সামনে ভেসে ওঠে নি।

মানুষের নাম এবং চেহারার মধ্যে সামঞ্জস্য নিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল। সুযোগ পেয়ে একসময় আমি বানরের কথাটা তুলে আনি। আমি খোলাখুলিভাবে বললাম বানরটার কেন প্রয়োজন, সফদর আলী তাকে কাজকর্ম শিখিয়ে সহকারী বানাবেন। আমি ভদ্রলোককে সফদর আলী সম্পর্কে বললাম, তিনি একজন শখের বিজ্ঞানী এবং লোকজনের ধারণা, তাঁর মাথায় ছিট আছে, আমার নিজেরও সে সম্পর্কে কোনো

সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি নেহায়েতই এক জন ভালোমানুষ। বানরটিকে তিনি নানারকম জিনিস শেখাবেন, কিন্তু কখনোই তিনি কোনোরকম কষ্ট দেবেন না। আমার ধারণা তিনি কষ্ট দেয়ার ব্যাপারটি ভালো বোঝেন না।

ভদ্রলোক এককথায় বানরটি দিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেলেন, আমি একটু কায়দা করে টাকার প্রসঙ্গটা তুলতেই ভদ্রলোক হা হা করে উঠলেন, বললেন, জংবাহাদুর আমার ছেলের মতো, আমি তাকে বিক্রি করতে পারি?

জংবাহাদুর?

হ্যাঁ, জংবাহাদুর আমার বানরটার নাম। কেউ তাকে যত্ন করে রাখলে এমনিই দিয়ে দেব, কিন্তু বিক্রি আমি করতে পারব না। মাঝেমধ্যে গিয়ে দেখে আসব, কিন্তু টাকা আমি কী ভাবে নিই?

এবারে আমি উল্টো লজ্জা পেয়ে যাই। একটু থতমত খেয়ে বললাম, আপনার এত শখের বানর দিয়ে দিচ্ছেন কেন, রেখে দিন।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বললেন, আপনাকে তাহলে বলি, আগে কাউকে বলি নি। আমার একটা ছেলে আছে, এক বছর বয়স, জংবাহাদুরকে তার ভারি পছন্দ! আমি বাবা, আমার কাছে আসতে চায় না, দিনরাত্রি জংবাহাদূরের পিছনে ঘুরঘুর করে। যত দিন যাচ্ছে ততই আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বাবা হয়ে আমি সেটা কেমন করে সহজভাবে নিই? বুঝতেই পারেন জংবাহাদুর যেরকম খেলা দেখাতে পারে, আমি কি আর সেরকম খেলা দেখাতে পারি? ছেলের কী দোষ? সে আমাকে পছন্দ করবে কেন? এক বছরের ছেলে কি আর এত কিছু বোঝে?

আমাকে স্বীকার করতেই হল বানরের সাথে খেলা দেখানো নিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ভদ্রলোকের সাথে আরো খানিকক্ষণ গল্পগুজব হল, বেশ মানুষটি। আরো এককাপ সর-ভাসা চা খেয়ে উঠে পড়ার আগে বললাম, বানরটা কবে নিতে আসব?

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, এখনই নিয়ে যান।

এখনই? আমি?

হ্যাঁ, জংবাহাদুর খুবই ভদ্র, বিরক্ত করবে না। বয়স হয়েছে, বানরের হিসেবে রীতিমতো বুড়ো, খুব শান্ত। নিজের চোখেই দেখেন, বলে ভদ্রলোক চিৎকার করে ডাকলেন, জংবাহাদুর, এদিকে এস।

পর্দার ফাঁক দিয়ে একটা বানরের গম্ভীর মুখ দেখা গেল, আমাকে খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বানরটি আবার পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি ভদ্রলোকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনাকে নতুন দেখেছে তো তাই কাপড় পাল্টে আসছে।

সত্যি তাই, একটু পরেই একটা লুঙ্গি পরতে-পরতে বানরটা বেরিয়ে এল, হেঁটে হেঁটে আমার সামনে এসে হাত তুলে আমাকে একটা সালাম করে গম্ভীর হয়ে একটা চেয়ারে বসে। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আমার কি সালামের উত্তর দেয়ার প্রয়োজন আছে কি না।

ভদ্রলোক বানরটিকে বললেন, জংবাহাদুর, তুমি, এখন এই ভদ্রলোকের সাথে যাবে, বুঝতে পেরেছ? বানরটি কী বুঝল জানি না, কিন্তু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল,

AMARBOI.COM

যেন সত্যি বুঝতে পেরেছে। ভদ্রলোক আবার বললেন, যাও, শার্ট পরে এস, আর তোমার দড়িটি নিয়ে এস।

বানরটি সত্যিই ভদ্রলোকের কথা শুনে চেয়ার থেকে নেমে ভেতরে চলে গেল।

ভদ্রলোক একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন, হঠাৎ আমার তার জন্যে খুব কষ্ট হল, খুব শখের বানর, নিজেই বলেছেন একেবারে নাকি ছেলের মতো, দিয়ে দিতে নিশ্চয়ই তাঁর খুব খারাপ লাগছে। আমি আস্তে আস্তে বললাম, দেখেন, আপনার যদি খুব খারাপ লাগে, থাকুক, আমরা অন্য একটা বানর জোগাড় করে নেব।

ভদ্রলোক বললেন, খারাপ তো লাগছেই, এত দিন থেকে আমার সাথে আছে, সে তো প্রায় ঘরের মানুষ, কিন্তু তবু আপনি নিয়েই যান। ছেলেটার শুধু যে জংবাহাদুরের সাথে খাতির তাই নয়, আজকাল তাকে দেখে দেখে বানরের মতো ব্যবহার করা শুরু করেছে।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ছোট বাচ্চা যা-ই দেখে তা-ই শেখে, ওর আর দোষ কি? আর আপনি জংবাহাদুরকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না, সফদর আলী তাকে অনেক যত্ন করে রাখবেন। আপনার যখন দেখার ইচ্ছা হবে গিয়ে দেখতে পারেন, ইচ্ছা হলে যখন খুশি বাসায় এনে যত দিন খুশি রাখতে পারেন।

ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, খুব খুশি হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব ভালো হয় তাহলে। মাঝে মাঝে বাসায় এনে কয়দিন রেখে ভালো করে খাইয়ে দেব, খুব খেতে পছন্দ করে বেচারা।

একটু পরেই জংবাহাদুর একটা শার্ট পরে হাজির হয়, তার মাথায় একটা হ্যাট, হাতে একটা টিনের বাক্স, ভেতরে নিশ্চয়ই তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। তার গলায় দড়ি বাঁধা, দড়ির এক মাথা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভদ্রলোককে লম্বা একটা সালাম করল। ভদ্রলোক জংবাহাদুরকে তুলে খানিকক্ষণ বুকে চেপে ধরে রেখে নামিয়ে দিলেন, আমি দেখলাম তাঁর চোখে প্রায় পানি এসে গেছে। আমি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সেখানে আমার বাসার ঠিকানা, অফিসের টেলিফোন নাম্বার লিখে দিলাম। ভদ্রলোককে বললাম, আমাকে ফোন করলেই আমি তাঁর সাথে জংবাহাদুরের দেখা করার ব্যবস্থা করে দেব।

WWW.AMARBOI.COM

জংবাহাদুরকে নিয়ে বের হতেই এই এলাকার লোকজন তার নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়, বোঝাই যাচ্ছে সে এই এলাকার অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র। জংবাহাদুরও কাউকে সালাম কাউকে হ্যাট খুলে সম্ভাষণ আবার কাউকে দাঁত বের করে ভেংচি কেটে প্রত্যুত্তর দেয়। আমার একটু অস্বস্তি লাগতে থাকে। তাই প্রথম রিকশাটা পেয়ে দরদাম না করেই জংবাহাদুরকে নিয়ে উঠে পড়লাম। আমি আগে কখনো পশুপাখি নাড়াচাড়া করি নি, তাই একটু ভয় ভয় করছিল, বানরটা যদি হঠাৎ করে খামচে দেয়?

জংবাহাদুরকে নিয়ে রিকশা করে যাওয়াটা খুব উপভোগ্য ব্যাপার নয়। প্রথমে রিকশাওয়ালা জানতে চাইল আমি কত দিন থেকে বানরের খেলা দেখাই এবং এতে আমার কেমন উপার্জন হয়। আমি তাকে খুশি করার মতো উত্তর দিতে পারলাম না। রাস্তায় লোকজন, বিশেষ করে বাচ্চারা আমাকে "বানরওয়ালা" বলে ডাকতে থাকে।

রাজারবাগের মোড়ে রিকশার দিকে একটা পাকা কলা ছুটে এল। সময়মতো মাথা নিচু করায় কলাটা আমার মাথায় না লেগে রিকশার পিছন দিকে গিয়ে লাগল। আমি আমার জানা সমস্ত দোয়া-দরুদ পড়তে থাকি। আজ অক্ষত শরীরে শ্যামলীতে সফদর আলীর বাসায় পৌঁছুতে পারলে কাল দুই টাকা দান করে দেব বলে মানত করে ফেললাম।

ফার্মগেটের কাছে, যেখানে লোকজনের ভিড় সবচেয়ে বেশি এবং যেখানে লোকজন সবচেয়ে বেশি উৎসাহ নিয়ে আমাকে এবং জংবাহাদুরকে ডাকাডাকি করতে থাকে, সেখানে আমাদের রিকশার টায়ার ফেটে গেল। চার বছর আগে আরামবাগে এক জন ছোরা দেখিয়ে আমার মানিব্যাগে টাকা এত কম কেন সেটা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করার সময়েও আমি এত ভয় পাই নি। রিকশা থেমে যেতেই আমাদের ঘিরে একটা ছোট ভিড় জমে যায়। তার ভিতর থেকে এক জন দুর্ধর্ষ ধরনের বাচ্চা জংবাহাদুরের লুঙ্গির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা লেজ ধরে টানার চেষ্টা করতে থাকে। আমি রিকশার ভাড়া মিটিয়ে আরেকটা খালি রিকশা খুঁজতে থাকি, কিন্তু আমার সমস্ত পাপকর্মের প্রতিফল হিসেবে একটিও খালি রিকশা বা স্কুটার দেখা গেল না। আমি আরেকটা রিকশা না পাওয়া পর্যন্ত এই রিকশা থেকে নামতে চাইছিলাম না, কিন্তু এক জন পুলিশ এসে বলল, রাস্তায় বানরের খেলা দেখানো বেআইনি এবং আমি যদি একান্তই খেলা দেখাতে চাই তাহলে আমাকে রাস্তার পাশে খালি জায়গাটায় যেতে হবে। তাকে ব্যাপারটা বোঝানোর আগেই সে আমাকে এবং আমাদের ঘিরে থাকা লোকজনকে ঠেলে-ঠেলে ফাঁকা জায়গাটিতে নিয়ে যায়। আমি কিছু বোঝার আগেই লোকজন আমাদের ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। শুধু তাই নয়, পুলিশটি সামনের লোকজনদের বসিয়ে দিয়ে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে এক কোনায় দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি তখন টপটপ করে ঘামছি, কোনোমতে ভাঙা গলায় বললাম, দেখেন, আমি বানরের খেলা দেখাই না, এটা আরেক জনের বানর—

লোকজনের উল্লাসধ্বনিতে আমার কথা চাপা পড়ে যায়, আমার কথায় এত আনন্দের কী থাকতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না, তখন আমার জংবাহাদুরের দিকে চোখ পড়ে। সে তার টিনের বাক্স খুলে জিনিসপত্র বের করা শুরু করেছে, একটা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ম্যাচ দিয়ে সেটা জ্বালিয়ে দু'টি লম্বা টান দিয়ে সে খেলা শুরু করে দেয়। প্রথমে একটা ডুগডুগি বের করে বাজাতে থাকে, তারপর এক কোনা থেকে ছুটে এসে শূন্যে দু'টি ডিগবাজি খেয়ে নেয়। লোকজন যখন হাততালি দিতে ব্যস্ত, তখন সে যে ছেলেটি তার লেজ ধরে টানার চেষ্টা করেছিল তাকে খুঁজে বের করে তার কান ধরে মাঝখানে টেনে এনে গালে প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দেয়। লোকজনের উল্লাসধ্বনির মাঝে ছেলেটা প্রতিবাদ করার সাহস পেল না। মুখ চুন করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ে। এরপর জংবাহাদুরের আসল খেলা শুরু হয়, তার খেলা সত্যি দেখার মতো। বিভিন্ন রকম শারীরিক কসরত, মানুষের অনুকরণ, বিকট মুখভঙ্গি, উৎকট নাচ, কী নেই! শুধু তাই নয়, খেলার ফাঁকে ফাঁকে সে ক্রমাগত তার ডুগডুগি বাজিয়ে ভিড় আরো বাড়িয়েই যায়। আমি বোকার মতো মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি আর প্রাণপণ দোয়া করতে থাকি পরিচিত কেউ যেন আমাকে দেখে না ফেলে। খোদা আমার দোয়া শুনবে, আমার নিজের উপর সেরকম বিশ্বাস ছিল না, তাই যখন ভিড়ের মধ্যে আমাদের অফিসের বড় সাহেবকে আবিষ্কার করলাম,

তখন বেশি অবাক হলাম না। খেলা শেষ হতেই জংবাহাদুর তার টুপি খুলে পয়সা আদায় করা শুরু করে, আমি নিষেধ করার সুযোগ পেলাম না। লোকজন পয়সাকড়ি বেশ ভালোই দিল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি বড় সাহেব একটা আস্ত আধুলি দিয়ে দিলেন। জংবাহাদুর খুচরা পয়সাগুলো রুমালে বেঁধে আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। পরে গুনে দেখেছিলাম, মানতের দুই টাকা দেওয়ার পরেও দু'টি অচল সিকিসহ প্রায় সাড়ে তিন টাকা রয়ে গিয়েছিল।

সেদিন সফদর আলীর বাসায় জংবাহাদুরকে পৌঁছে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনে আর যা-ই করি, কখনো বানর নিয়ে রাস্তায় বের হব না। বানরের খেলা দেখানো নিয়ে উত্তেজনা কমতে-কমতে প্রায় সপ্তাহখানেক লেগে গেল। ফার্মগেটের মোড়ে সেদিন আমাকে কত মানুষ দেখছিল তার হিসেব নেই। সবাই বাসায় এসে সেটা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে গেছে। আমি ব্যাপারটি যতই বোঝানোর চেষ্টা করি, কেউ আর বুঝতে চায় না। আমার মা এখনো একটু পরে পরে বলেন, ছি ছি ছি, তোর নানা এত খান্দান বংশের লোক, আর তাঁর নাতি আজ রাস্তায় বানরের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। অফিসের বড় সাহেবকে নিয়েও মুশকিল, একটু পরে-পরে সবার সামনে আমাকে প্রশংসা করে বলেন, আমার মতো স্বাধীনচেতা মানুষ তিনি নাকি জীবনে দেখেন নি। অফিসের বেতন যথেষ্ট নয় বলে বিকেলে আমার বানরের খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জনের সৎসাহস দেখে তিনি নাকি মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁকে অনেক কষ্ট করেও ব্যাপারটি পুরোপুরি বোঝানো গেল না। বড় সাহেবদের মাথা একটু সিরেট হয়, কোনো কিছু একটা ঢুকে গেলে সেটা আর বের হতে চায় না।

WWW.AMARBOI.COM

সপ্তাহখানেক পর আমার সফদর আলীর সাথে দেখা, সফদর আলী হচ্ছেন এমন এক জন মানুষ যার মুখ দেখেই মনের কথা পরিষ্কার বলে দেয়া যায়। আজ যেরকম তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলাম, তাঁর কাজকর্ম ভালোই হচ্ছে, তিনি তাঁর বানরকে নিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্ট। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তাঁর চোখের কোনা একটু কুঁচকে আছে, যার অর্থ কোনো একটা কিছু নিয়ে তিনি একটু চিন্তিত। আমাকে দেখে তিনি খুশি হয়ে উঠলেন, হাসিমুখে বললেন, বানর স্ক্রু-ড্রাইভার ধরে কেমন করে জানেন?

আমি জানতাম না, তাই তিনি পকেট থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে দেখালেন। ব্যাপারটি তাঁর কাছে এত হাস্যকর যে তিনি কিছুতেই আর হাসি থামাতে পারেন না। আমি চুপ করে বসে রইলাম, কারণ আমিও ঠিক ওভাবে স্ক্রু-ড্রাইভার ব্যবহার করি। তাঁর হাসি একটু কমে এলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বানরের ট্রেনিং কেমন হচ্ছে?

ভালো, বেশ ভালো। প্রথমে একটু অসুবিধে হয়েছিল।

কি অসুবিধে?

মনোযোগের অভাব, কিছুতেই জংবাহাদুরের মনোযোগ নেই, শুধু গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আপনার না একটা মনোযোগ বাড়ানোর ওষুধ আছে?

সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, হ্যাঁ আছে, কিন্তু সেটা খেতে এত খারাপ যে কিছুতেই জংবাহাদুরকে খাওয়াতে রাজি করাতে পারলাম না।

এখন মনোযোগ দিচ্ছে?

হ্যাঁ, এক সপ্তাহ পরে গত কাল প্রথম সে মনোযোগ দিয়েছে। হঠাৎ করে মনোযোগ দিল।

হঠাৎ করে?

হ্যাঁ, হঠাৎ করে। এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আবার হঠাৎ করে মনোযোগ ফিরে আসে।

বানরের মনস্তত্ত্ব আমার জানা নেই। তাই এক সপ্তাহ অন্যমনস্ক থেকে হঠাৎ করে মনোযোগ দেয়ার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না। হয়তো নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হতে সময় নিয়েছে, হয়তো ভেবেছিল একটা সাময়িক ব্যাপার, আবার সে তার আগের বাসায় ফিরে যাবে। হয়তো তার মন খারাপ, বানরের মন খারাপ হতে পারে না এমন তো কেউ বলে নি—

গুলু গুলু গুলু গুলু—আমি হঠাৎ চমকে উঠে শুনি, সফদর আলী আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত স্বরে বলছেন, গুলু গুলু গুলু গুলু।

থতমত খেয়ে বললাম, কী বললেন?

সফদর আলী পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কি বললাম?

আমি ইতস্তত করে বললাম, হ্যাঁ, মানে আপনি কেমন একটা শব্দ করছিলেন না?

আমি? সফদর আলী আকাশ থেকে পড়লেন, আমি শব্দ করছিলাম?

হ্যাঁ।

কী রকম শব্দ?

আমি এদিকসেদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে তাঁকে অনুকরণ করে বললাম, গুলু গুলু গুলু গুলু।

শুনে সফদর আলীর হাসি দেখে কে! পেট চেপে হাসতে হাসতে তাঁর চোখে প্রায় পানি এসে গেল। কোনোমতে বললেন, আমি ওরকম শব্দ করেছি? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে রেস্টুরেন্টে লোকজনের মাঝে বসে বসে ওরকম শব্দ করব?

আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না। সত্যিই তো, এক জন বয়স্ক মানুষ হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই কেন ওরকম একটা জিনিস বলবে? তা হলে কি আমি ভুল শুনেছি? কিন্তু সেটাও তো হতে পারে না, আমি স্পষ্ট শুনলাম তিনি বললেন—গুলু গুলু গুলু গুলু। আমি ব্যাপারটি নিয়ে বেশি মাথা ঘামালাম না, সবাই জানে বিজ্ঞানীরা একটু খেয়ালি হয়, আর সফদর আলী তো এক ডিগ্রি উপরে।

সপ্তাহখানেক পরের কথা, রিকশা করে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি রেসকোর্সের পাশ দিয়ে সফদর আলী হেঁটে যাচ্ছেন, আমি রিকশা থামিয়ে ডাকলাম, সফদর সাহেব।

সফদর আলী ঘুরে তাকিয়ে আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছেন?

বাসায়।

এখনি বাসায় গিয়ে কী করবেন? আসেন হাঁটি একটু। হাঁটলে পা থেকে রক্ত

AMARBOI.COM

সরবরাহ হয়, খুব ভালো কার্ডিওভাসকুলার ব্যায়াম।

কার্ডিওভাসকুলার ব্যায়ামের লোভে নয়, সফদর আলীর সাথে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার জন্যেই আমি রিকশা থেকে নেমে পড়ি। দু'জন রেসকোর্সের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকি। চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে, বছরের এই সময়টা এত চমৎকার যে বলার নয়। আমি সফদর আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, জংবাহাদুরের কী খবর? কাজকর্মে মনোযোগ দিয়েছে?

হ্যাঁ, দিচ্ছে, একটু ইতস্তত করে যোগ করলেন, মাঝে মাঝে হঠাৎ করে এখনও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, আবার হঠাৎ করে মনোযোগ ফিরে আসে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। গত সপ্তাহে তাকে সল্ডারিং করা শিখিয়েছি।

সত্যি?

হ্যাঁ, চমৎকার সল্ডারিং করে।

বাহ্!

এখন সার্কিট বোর্ড তৈরি করা শেখাচ্ছি। আলট্রা ভায়োলেট রে দিয়ে এক্সপোজ করে ফেরিক ক্লোরাইড নিয়ে "এচ" করতে হয়, ঠিকমতো না করলে বেশি না হয়ে কম হয়ে যায়, নানা ঝামেলা তখন।

আমি কিছু না বুঝে বললাম, ও, আচ্ছা।

ফেরিক ক্লোরাইড জিনিসটা ভালো না, আরেকটা কিছু বের করা যায় কি না দেখতে হবে।

আমি এসব রাসায়নিক ব্যাপার কিছুই বুঝি না। আমার এক ভাগ্নে একদিন কথা নেই বার্তা নেই আমার ধোয়া শার্টে লাল রং ঢেলে দিল, আমি তো রেগে আগুন, কিন্তু কী আশ্চর্য, দেখতে-দেখতে লাল রং উবে আবার ধবধবে সাদা শার্ট, লাল রঙের চিহ্নমাত্র নেই। আমি তো ভারি অবাক, আমার ভাগ্নে তখন বুঝিয়ে দিল, এটা নাকি কী একটা রাসায়নিক জিনিস, বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে রংটা উবে যায়। আমি তখন আমার ভাগ্নেকে বললাম, আমাকে এক বোতল বানিয়ে দিতে, অফিসে বড় সাহেবের গায়ে ঢেলে মজা দেখাব। আমার সেই ভাগ্নে প্রচণ্ড পাজি, একটা বোতলে খানিকটা লাল কালি ভরে দিয়ে দিল। আমি তো কিছু জানি না, অফিসে গিয়ে সবার সামনে বড় সাহেবের নতুন শার্টে সেই লাল রং ঢেলে দিলাম, এক মিনিট দুই মিনিট করে দশ মিনিট পার হয়ে গেল, রং উবে যাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই, বরং আরো পাকা হয়ে বসে গেল। সে কী কেলেঙ্কারি, চিন্তা করে এখনো আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।

গুলু গুলু গুলু গুলু।

আমি চমকে উঠি, সফদর আলী আবার ওরকম শব্দ করছেন। আমি ভান করলাম যেন শুনি নি, চুপচাপ হাঁটতে থাকি। সফদর আলী আবার বললেন, গুলু গুলু গুলু গুলু।

আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সহজ স্বরে বললেন, একটা ব্যাপারে মানুষের চেয়ে বানরের সুবিধে আছে, সেটা হচ্ছে তার পা। মানুষ তার পা দিয়ে কিছু ধরতে পারে না, বানর পারে।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, আপনি একটু আগে ওরকম শব্দ করছিলেন

কেন?

সফদর আলী অবাক হয়ে বললেন, কী রকম শব্দ?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, গুলু গুলু গুলু গুলু।

সফদর আলী এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, যেন আমি পাগল হয়ে গেছি। কিন্তু এবারে কোনো ভুল নয়, আমি স্পষ্ট শুনেছি। আমি কী মনে করে সফদর আলীকে বেশি ঘাঁটালাম না, চিন্তিতভাবে হাঁটতে থাকি। আর্ট কলেজের সামনে এসে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, হঠাৎ শুনি সফদর আলী আবার অদ্ভুত গলার স্বরে বলছেন, মুচি মুচি মুচি মুচি—

আমি ভীষণ চমকে উঠলেও ভান করলাম যেন তাঁর কথা শুনতে পাই নি, সফদর আলী বলতেই থাকেন, মুচি মুচি মুচি মুচি।

আমি নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সহজ স্বরে বললেন, লেজ জিনিসটা আসলে খারাপ নয়। ওটা একটা বাড়তি হাতের মতো। মানুষের লেজ থাকলে মন্দ হত না।

আমি বললাম, আপনি জানেন, একটু আগে আপনি বলছিলেন, মুচি মুচি মুচি মুচি।

আমি?

হ্যাঁ, আপনি।

কী বলছিলাম?

মুচি মুচি মুচি মুচি।

সফদর আলী অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী বলছেন আপনি!

হ্যাঁ, আমি শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলব কেন?

আপনার অফিসের কাজকর্মের চাপ নিশ্চয়ই খুব বেড়েছে, সফদর আলী হাসি গোপন করার চেষ্টা করে বললেন, আপনার কয়দিন বিশ্রাম নেয়া দরকার। খুব চাপে থাকলে মানুষের বিভ্রম হয়, কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা গুলিয়ে ফেলে। আপনি বাসায় গিয়ে শুয়ে থাকেন।

আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেলাম, এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে। আমি এখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে সফদর আলী নিজের অজান্তে এরকম অদ্ভুত শব্দ করেন। কিন্তু কেন? প্রত্যেক বার তিনি শব্দ করেছেন, যখন আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছি তখন। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে আমি খানিকক্ষণ তাঁর সাথে কথা বলে আবার অন্যমনস্ক হয়ে যাবার ভান করলাম। আর সত্যি সত্যি তিনি অদ্ভুত শব্দ করা শুরু করলেন। প্রথমে বললেন, গুলু গুলু গুলু গুলু। খানিকক্ষণ পরে বললেন, মুচি মুচি মুচি মুচি। আমি তবু অন্যমনস্ক হয়ে থাকার ভান করি। তখন হঠাৎ সফদর আলী ছোট ছোট লাফ দিয়ে হাততালি দিতে শুরু করলেন। ঠিক এই সময়ে এক জন সামনে দিয়ে আসছিল, রাস্তায় বয়স্ক এক জন মানুষ এভাবে লাফ দিচ্ছে দেখলে সে কী ভাববে? আমি তাড়াতাড়ি সফদর আলীর দিকে তাকাই। সাথে সাথে তিনি ভালোমানুষের মতো বললেন, বিবর্তনটা যদি একটু অন্যরকমভাবে হত, তাহলে হয়তো আজ মানুষের জায়গায় বানর পৃথিবীতে রাজত্ব করত, আর মানুষ গাছে গাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুরে বেড়াত। কী বলেন?

আমি তাঁর কথায় সায় দিয়ে কিছু একটা বললাম, কিন্তু আমার মাথায় সফদর আলীর এই আশ্চর্য আচরণের কথা ঘুরতে থাকে। এর ব্যাখ্যা পাই কোথায়? অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করে থাকলে তিনি শেষ পর্যন্ত কী করেন দেখার জন্যে আমি একটু অপেক্ষা করি। যখন দেখলাম রাস্তায় আশেপাশে কেউ নেই, তখন আবার আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাবার ভান করলাম। খানিকক্ষণের মধ্যেই সফদর আলী আশ্চর্য শব্দ করা শুরু করলেন। প্রথমে বললেন, গুলু গুলু গুলু গুলু। তাতে কাজ না হওয়ায় বললেন, মুচি মুচি মুচি মুচি, খানিকক্ষণ পর ছোট ছোট লাফ দিতে শুরু করলেন। সাথে হাততালি। আমি তবুও জোর করে অন্যমনস্ক হয়ে থাকার ভান করতে থাকি। তখন হঠাৎ তিনি যেটা করলেন, আমি সেটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বসে খানিক দূর হামাগুড়ি দিয়ে গেলেন, তারপর উঠে মুখে থাবা দিয়ে বললেন, লাবা লাবা লাবা লাবা।

আমি বিস্ফোরিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম, তিনি স্বাভাবিক স্বরে বললেন, কী হল আপনার?

কেন?

এরকম হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

আমি উত্তরে আর কী বলব? ঠিক করলাম, ব্যাপারটা আজকে তাঁর কাছে চেপে যাব। একটু ভেবে দেখতে হবে রহস্যটা কি। সফদর আলীকে একটা দায়সারা উত্তর দিয়ে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বাসায় রওনা দিলাম। ফিরে আসার সময় রিকশায় বসে ব্যাপারটা ভেবে দেখার চেষ্টা করি। সফদর আলীর এই অদ্ভুত ব্যবহারের সাথে নিশ্চয়ই বানরটার কোনো সম্পর্ক আছে। বানরটাকে কাজকর্ম শেখানো শুরু করার পর থেকেই এটা শুরু হয়েছে। অন্যমনস্ক হলেই মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে তিনি এটা করেন, প্রথম প্রথম বানরটিও নাকি অন্যমনস্ক থাকত। দুটির মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? নাকি বানরের সাথে থাকতে থাকতে তাঁর স্বভাবও বানরের মতো হয়ে যাচ্ছে? আর অন্য সব ব্যাপারে তিনি আগের মতোই আছেন। কাজেই বেশি পরিশ্রমে পাগলামি দেখা দিচ্ছে, সেটাও তো হতে পারে না। আমি কিছুই ভেবে পেলাম না। আগে নাকি কাপালিকরা বানরকে দিয়ে কী একধরনের সাধনা করত। কে জানে এটি সেরকম কোনো বানর কি না। এর মাঝে জাদুটোনার ব্যাপার আছে কি না কে বলবে। ভেবে-ভেবে আমি কোনো কূল-কিনারা পেলাম না। ভাবনা-চিন্তা করে আমার অভ্যাস নেই, খানিকক্ষণের মধ্যেই তাই মাথা ধরে গেল, বাসায় এসে দুটো অ্যাসপিরিন খেয়ে তবে রক্ষা।

পরদিন অফিস থেকে বাসায় এসে দেখি আবার টেলিগ্রাম, না-খুলেই বুঝতে পারি এটা সফদর আলীর। সত্যি তাই, ভেতরে লেখা :

মহা আশ্চর্য ব্যাপার। আপনি ঠিক। আমি বলি, গুলু গুলু গুলু গুলু এবং মুচি মুচি মুচি মুচি। কাওরান বাজার। সন্ধ্যা ছয়টা।

www.amarboi.com

তবু ভালো শেষ পর্যন্ত সফদর আলী নিজেই ধরতে পেরেছেন যে, তিনি আশ্চর্য-আশ্চর্য সব শব্দ করছেন। এক জন মানুষ যখন না জেনে কিছু করে, তার জন্যে তাকে দায়ী করা খুব মুশকিল। কে জানে তিনি বুঝতে পেরেছেন কি না, কেন এরকম করছেন, আমার কৌতূহল আর বাঁধ মানছিল না।

ঠিক পাঁচটার সময় আমার ছোট ভাইঝি টেবিল থেকে উল্টে পড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলল। এটি নতুন কোনো ব্যাপার নয়। প্রতি সপ্তাহে না হলেও মাসে অন্তত এক বার করে তার এধরনের কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে নিয়ে দৌড়ালাম ডাক্তারের কাছে, ডাক্তার তার মাথাটা খানিকটা কামিয়ে সেখানে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। তাকে নিয়ে ফিরে আসার আগে জিজ্ঞেস করলাম, তার কেমন লাগছে। সে বলল, তার বেশি ভালো লাগছে না, তবে যদি খানিকটা আইসক্রিম খায় তবে মনে হয় ভালো লাগতে পারে। এরকম একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেবার পর তাকে আইসক্রিম না খাইয়ে বাসায় আনি কেমন করে? আইসক্রিমের দোকান খুঁজে আইসক্রিম কিনে দিয়ে যখন বাসায় ফিরে এলাম, তখন ছয়টা বেজে গেছে। কাওরান বাজারে যেতে যেতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যাবে। সফদর আলীর সময় নিয়ে বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস, কাজেই আজ যে তাঁর সাথে দেখা হবে না তা বলাই বাহুল্য। আমি তবু তাড়াহুড়ো করে বের হলাম। চায়ের দোকানে গিয়ে সত্যিই তাঁকে পেলাম না। দোকানি বলল, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে তিনি নাকি বেরিয়ে গেছেন। তাঁর বাসায় গিয়ে এখন আর লাভ নেই। এরকম সময়ে তিনি কখনো বাসায় থাকেন না। আমি এক কাপ চা অর্ডার দিয়ে পুরো ব্যাপারটা ভাবতে বসি। কী হতে পারে ব্যাপারটা? কেন সফদর আলী হঠাৎ করে নিজের অজান্তে এরকম আশ্চর্য শব্দ করা শুরু করেছেন? নিশ্চয়ই বানরটার সাথে একটা সম্পর্ক আছে। হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে হলে আগে বানরের ইতিহাসটা জানতে হবে। আমার তখন শান্তিনগরের সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল, যাঁর কাছ থেকে বানরটা এনেছিলাম, তিনি হয়তো কোনো একটা সমাধান দিতে পারেন। আমি তাড়াতাড়ি করে চা শেষ করে তাঁর বাসায় রওনা দিলাম, কপাল ভালো থাকলে আজকেই তাঁকে পেয়ে যেতে পারি।

www.amarboi.com

বাসাটা আবার খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগল, এসব ব্যাপারে আমার স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল। দরজার কড়া নাড়তেই ভদ্রলোক এসে দরজা খুলে দিলেন। আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, আরে আসেন, আসেন। কী খবর আপনার? কয়দিন থেকেই ভাবছি জংবাহাদুরের খোঁজ নিই, ভালোই হল আপনি এসে গেলেন। তারপর চিৎকার করে ভেতরে বললেন, এই, চা দিয়ে যা বাইরে।

আমি ঘরে গিয়ে বসি। ভদ্রতার কথাবার্তা বলতে বলতে বানরের ইতিহাসটা জিজ্ঞেস করার জন্যে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকি। সফদর আলীর অবস্থাটা এখন তাঁর কাছে গোপন রাখব বলে ঠিক করলাম, শুনে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবেন। ভদ্রলোক বেশ কথা বলেন, জংবাহাদুরের খোঁজখবর নিয়ে আবার তাঁর প্রিয় বিষয়বস্তু, মানুষের নামের সাথে চেহারার সামঞ্জস্য নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেন। ভেতর থেকে একসময় সর-ভাসা চা এবং সিঙাড়া এল। আমি সিঙাড়ায় কামড় দিয়ে চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে এক চুমুক খেয়েছি, হঠাৎ ভদ্রলোকের ঘরের ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এল, গুলু গুলু গুলু গুলু।

চমকে উঠে বিষম খেলাম আমি, গরম চা দিয়ে তালু পুড়ে গেল। কিন্তু আমার সেটা নিয়ে ব্যস্ত হবার মতো অবস্থা নেই। কান খাড়া করে রাখি আমি, আর তখন সত্যি আবার শুনলাম, গুলু গুলু গুলু গুলু।

আমি চোখ বড় বড় করে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই শুনলাম, মুচি মুচি মুচি মুচি। তারপর হঠাৎ পর্দা ঠেলে বছরখানেকের একটা ফুটফুটে বাচ্চা থপ থপ করতে করতে ঘরে এসে হাজির হল। আমাকে অপরিচিত দেখে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। তারপর আবার মুখ হাসি হাসি করে আধো আধো গলায় বলল, গুলু গুলু গুলু গুলু।

পুত্রস্নেহে বাবার চোখ কোমল হয়ে ওঠে, তিনি হাত নেড়ে ডাকতেই খুশিতে ছোট ছোট লাফ দিয়ে হাততালি দিতে থাকে, ঠিক সফদর আলী যেভাবে লাফিয়েছিলেন। বাচ্চাটি এখনো ভালো করে হাঁটতে শেখে নি, তাই টাল সামলাতে না পেরে হঠাৎ পড়ে গেল, পড়ে গিয়েও তার খুশি, কে, সেভাবেই হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল তার বাবার দিকে, ঠিক সফদর আলীর মতো।

আমি রহস্য ভেদ করতে গিয়ে আরো বড় রহস্যে পড়ে গেলাম। সফদর আলী যেসব অদ্ভুত শব্দ করছেন সেগুলো এই বাচ্চাটির আধো আধো বুলি, যেসব লাফ-ঝাঁপ বা হামাগুড়ি দিচ্ছেন সেগুলো এই বাচ্চাটির নিখুঁত অনুকরণ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি এই বাচ্চাটির অস্তিত্বের কথা পর্যন্ত জানেন না! কেমন করে এটা সম্ভব?

ভদ্রলোকের বাসায় আরো কিছুক্ষণ থাকলাম, কিন্তু আলাপ আর জমল না। কেমন করে জমবে, আমার মাথায় তখন সফদর আলীর কথা ঘুরছে। বাসায় ফিরে আসার সময় রিকশায় বসে আমি পুরো ব্যাপারটি ভাবতে থাকি, ভাবতে ভাবতে মনে হল পুরো মাথাটা ফেটে যাবে, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা পেলাম না। বেশি ভাবনা-চিন্তা করে আমার অভ্যাস নেই, চেষ্টা করলে সহজেই মাথা ধরে যায়। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে যেই রিকশাওয়ালার সাথে গল্প শুরু করলাম, ঠিক তক্ষুনি হঠাৎ করে সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল—একেবারে পানির মতো।

সফদর আলীকে দরকার, তাঁকে পাওয়া মুশকিল বলে আমিও তাঁর কায়দায় তাঁকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালাম, তাতে লেখা,
রহস্য উদ্‌ঘাটন। গুলু গুলু গুলু গুলু কেন? সহজ সমাধান। কাওরান বাজার। সন্ধ্যা ছয়টা।

পরদিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় কাওরান বাজারে সেই রেস্তরাঁয় গিয়ে দেখি সফদর আলী পাংশু মুখে বসে আছেন, আমাকে দেখে প্রায় ছুটে এলেন, গলা নামিয়ে বললেন, একটা ব্যাপার হয়েছে।

কি ব্যাপার?

আমার গবেষণা নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে, আমার পিছনে দেশী-বিদেশী

এজেন্ট লেগে গেছে।

কী ভাবে জানলেন?

আমি যে আশ্চর্য-আশ্চর্য শব্দ করি সেটা পর্যন্ত জেনে গেছে। আজ একটা টেলিগ্রাম পেলাম, কে পাঠিয়েছে জানি না, লিখেছে রহস্য উদ্‌ঘাটন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি বুঝতে পারেন নি, এটা আমি পাঠিয়েছি।

আপনি! সফদর আলী মনে হল আকাশ থেকে পড়লেন, আপনি রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন?

হ্যাঁ।

তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু সেটা প্রকাশ করলেন না, একটু রেগে বললেন, টেলিগ্রাম করেছেন তো নাম লেখেন নি কেন?

আপনিও তো আপনার টেলিগ্রামে নাম লেখেন না।

আমি যদি নাম না লিখি সেটা আমার ভুল। আমি একটা ভুল করি বলে আপনিও একটা ভুল করবেন?

এর উত্তরে আমি আর কী বলব?

সফদর আলী খানিকক্ষণ পর একটু শান্ত হয়ে বললেন, রহস্যটা বলেন, তাহলে শুনি।

আমি হাসি চেপে বললাম, বানরটাকে আপনি কেমন করে শেখান মনে আছে? পুরস্কার পদ্ধতি। যখনই বানর একটা ঠিক জিনিস করে আপনি তাকে একটা পুরস্কার দেন, একটা কলা বা কোনো একটা খাবার।

হ্যাঁ।

আসলে একই সময়ে বানরটাও আপনার উপরে পুরস্কার পদ্ধতি খাটিয়ে যাচ্ছে। আপনি যখন ঠিক জিনিসটা করেন বানরও তখন আপনাকে একটা পুরস্কার দেয়। সেটা হচ্ছে তার মনোযোগ। বানরের কাছে কলাটা যত মূল্যবান আপনার কাছে বানরের মনোযোগ ঠিক ততটুকু মূল্যবান। আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন বানরের মনোযোগের জন্যে, অনেক কিছু করতে করতে যখন হঠাৎ করে ঠিক জিনিসটা করে ফেলেন, বানর তখন পুরস্কার হিসেবে আপনাকে তার মনোযোগ দেয়।

সফদর আলী অবাক হয়ে বললেন, ঠিক জিনিসটা কি?

সে যেটা শুনতে চায়।

কী শুনতে চায় সে?

বানরটা যে বাসা থেকে এনেছি, সে বাসায় একটা ছোট বছরখানেকের বাচ্চা আছে, বানরটার সাথে তার খুব বন্ধুত্ব ছিল। বানরটার বাচ্চাটার জন্যে খুব মায়া জন্মেছিল, আপনার বাসায় আসার পর থেকে সে তাকে আর দেখে না। বানরটা নিশ্চয়ই বাচ্চাটাকে খুব দেখতে চাইছিল, তার গলার স্বর শুনতে চাইছিল। কাজেই আপনি যখনি সেই ছোট বাচ্চাটির মতো শব্দ করেন বা তার মতো লাফ দিয়ে হাততালি দেন, হামাগুড়ি দেন—সে খুশি হয়ে আপনাকে তার মনোযোগ দেয়।

সফদর আলী অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, আপনি কী ভাবে জানেন?

আমি কাল জংবাহাদুরের মালিকের বাসায় গিয়েছিলাম, বাচ্চাটিকে দেখে এসেছি,

www.amarboi.com

বাচ্চাটি কিছু হলেই বলে, গুলু গুলু গুলু গুলু বা মুচি মুচি মুচি মুচি। জংবাহাদুরের মনোযোগের জন্যে এখন আপনিও নিজের অজান্তেই বলেন, গুলু গুলু গুলু গুলু। মুচি মুচি মুচি মুচি।

সফদর আলী বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে-আস্তে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আসলে তা-ই হয়েছে। বানরটাকে মনোযোগ বাড়ানোর ওষুধ খাওয়াতে না পেরে নিজেই একটু চেখে দেখছিলাম, নিজের মনোযোগ তাই বেড়ে গিয়েছিল দশগুণ। তাই থেকে সফদর আলী আপন মনে কী একটা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

আমি বললাম, এখন যখন কারণটা জেনেছেন, একটু সতর্ক থাকবেন।

সফদর আলী আমার কথা শুনলেন বলে মনে হল না। আমি ডাকলাম একবার, কোনো সাড়া নেই। ঠাট্টা করার জন্যে গলা উঁচিয়ে বললাম, গুলু গুলু গুলু।

সফদর আলী ঠাট্টা-তামাশা বোঝেন কম, আমার কথা শুনে ভীষণ চমকে উঠে চায়ের কাপ উল্টে ফেললেন, আমার দিকে ঘুরে তাকালেন, আস্তে-আস্তে তাঁর চোখ বড়-বড় হয়ে উঠতে থাকে।

আমি একটা নিঃশ্বাস ছাড়ি। ঠাট্টা-তামাশা বাড়ানোর একটা ওষুধ বের করতে পারলে মন্দ হত না, ডাবল ডোজ খাইয়ে দেয়া যেত সফদর আলীকে।

AMARBOI.COM

গাছগাড়ি

সফদর আলীর চোখ মুখ খুশিতে ঝলমল করছিল, আমাকে দেখে চোখ নাচিয়ে বললেন, বলেন দেখি আজ কোথায় গিয়েছিলাম?

আমি মাথা চুলকে বললাম, সিনেমা দেখতে?

ধুর! সিনেমা আবার মানুষ দেখে নাকি?

আমি এইমাত্র ম্যাটিনি শো'তে একটা প্রচণ্ড মারামারির সিনেমা দেখে এসেছি, তাই মন্তব্যটা কোনোমতে হজম করে বললাম, তাহলে কি নাটক?

আরে না না, ওসব নাটকফাটক আমি দেখি না!

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, তাহলে কি কোনো কনফারেন্স, যেখানে সব বিজ্ঞানীরা এসে—

সফদর আলী হো-হো করে হেসে উঠলেন, তিনি জোরে হাসেন কম, তাই আমি একটু অবাক হয়ে যাই। হাসি থামিয়ে বললেন, বিজ্ঞানীরা আমাকে তাদের কনফারেন্সে ঢুকতে দেবে কেন? আমি কোথাকার কে?

আমি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছিলাম, সফদর আলী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, পারলেন না তো বলতে! রমনা পার্কে গিয়েছিলাম।

রমনা পার্ক?

হ্যাঁ, ঐ যে শিশুপার্কের পাশ দিয়ে গিয়ে—

হ্যাঁ, চিনি আমি।

চেনেন? সফদর আলী খুব অবাক হলেন বলে মনে হল।

চিনব না কেন? রমনা পার্ক না চেনার কী আছে, যখন কলেজে পড়তাম, নতুন সিগারেট খাওয়া শিখে—

আপনি রমনা পার্ক চেনেন অথচ আমাকে একবার বললেন না?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী বললাম না?

রমনা পার্কের কথা।

আমার খানিকক্ষণ সময় লাগে তাঁর কথাটা বুঝতে। অবাক হয়ে বললাম, আপনি এত বছর ধরে ঢাকায় আছেন আর রমনা পার্ক চেনেন না?

সফদর আলী থতমত খেয়ে বললেন, কেমন করে চিনব?

আর সবাই যেভাবে চেনে, আমরা যেভাবে চিনেছি। পয়লা বৈশাখ কত সুন্দর গান হয় সেখানে, বিজ্ঞানী হয়েছেন দেখে এসবের খোঁজখবরও রাখবেন না?

আমার ধমক খেয়ে সফদর আলী একটু নরম হয়ে গেলেন। কেউ যখন আমার উপর কিছু একটা নিয়ে রেগে যায়, আমি তখন উল্টো তার উপর আরো বেশি রেগে যাওয়ার চেষ্টা করি সবসময়, তাহলে তার রাগ কমে আসে। সফদর আলীকে সহজ করানোর জন্যে বললাম, কী দেখলেন পার্কে?

তার মুখ খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, একগাল হেসে বললেন, গাছ!

গাছ?

হ্যাঁ, গাছ। সফদর আলীর মুখে হাসি আর ধরে না।

আগে আপনি গাছ দেখেন নি?

দেখব না কেন, গাছ না দেখার কী আছে?

তাহলে?

এবারে অন্যরকমভাবে দেখলাম, কাছে এসে অনেক সময় নিয়ে ধীরে ধীরে, বলতে বলতে সফদর আলীর মুখে কেমন একটা অপার্থিব হাসি ফুটে ওঠে। গাছ নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাসে আমার একটু অবাক লাগে, বাংলাদেশের মানুষ গাছে গাছেই তো বড় হয়, সাহারা মরুভূমি থেকে এলে না হয় একটা কথা ছিল।

আপনি জানেন, সফদর আলী হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে বললেন, এক ধরনের গাছ আছে, সেটা লতার মতো। তার কোনো শক্ত কাণ্ড নেই, অন্য গাছ বেয়ে বেয়ে ওঠে—

সফদর আলী ঠাট্টা করছেন কি না বুঝতে পারলাম না, আমি তাঁর দিকে ভালো করে তাকালাম না, ঠাট্টা-তামাশার মানুষ সফদর আলী নন। সত্যিই তিনি লতানো গাছের কথা বলছেন। এমনভাবে বলছেন যেন এই প্রথম বার একটা লতানো গাছ দেখেছেন।

কোনো কোনো লতানো গাছ থেকে আবার শুঁড়ের মতো বের হয়, সেগুলো আবার এটা-সেটা আঁকড়ে ধরে উপরে উঠতে থাকে। মজার ব্যাপার জানেন, সেই শুঁড়গুলো সবসময় একই দিকে পেঁচায়। তার উপর—

সফদর আলী এরপর টানা আধ ঘন্টা উচ্ছ্বাসভরে গাছের কথা বলে গেলেন, আমাকে ধৈর্য ধরে শুনতে হল। গাছের পাতার রং সবুজ। কিন্তু ফুলগুলো সবুজ নয়, সেগুলো রঙিন, ফুল থেকে আবার ফল হয়, এই ধরনের কথাবার্তা। না শুনলেও

আমার যে খুব ক্ষতি হত সেরকম বলব না।

সফদর আলীর সাথে এরপর বেশ অনেকদিন দেখা নেই। মাঝে মাঝে তিনি এরকম ডুব মারেন, আমার নিজেরও কাজকর্ম ছিল, তাই আর খোঁজখবর করি নি। গাছপালা নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস কমেছে কি না জানার জন্যে কৌতূহল ছিল। বিজ্ঞানী মানুষ, লোহালক্কড় নিয়ে কারবার, গাছপালা নিয়ে বেশিদিন ব্যস্ত থাকতে পারবেন না তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই কাওরান বাজারে চায়ের দোকানে আবার যখন তাঁর সাথে দেখা, আমি একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। টেবিলে নানারকম গাছের পাতা বিছানো, হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে গাছের পাতাগুলো লক্ষ করছেন। হাতে একটা নোটবুক, একটু পরে পরে সেখানে তিনি কী যেন টুকে রাখছেন। পাশের চায়ের কাপে চা ঠাণ্ডা হচ্ছে, তাঁর চুমুক দেবার কথা মনে নেই। আমি সামনের চেয়ারে বসলাম, তিনি লক্ষ পর্যন্ত করলেন না। একটু কেশে ডাকলাম, সফদর সাহেব—

তিনি ভীষণ চমকে উঠে গাছের পাতাগুলো তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলতে চেষ্টা করলেন, হাতের ধাক্কায় চায়ের কাপ উল্টে সারা টেবিল চায়ে মাখামাখি হয়ে গেল। আমাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ও আপনি! আমি ভাবলাম—

কী ভাবলেন?

নাহ্, কিছু না। সফদর আলী তাঁর অভ্যাসমতো প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে সাবধানে টেবিল থেকে গাছের পাতাগুলো তুলে নোটবুকের ভেতর রাখতে রাখতে বললেন, জীবজন্তু থেকে গাছ আরো বেশি কাজের। গাছ নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না সফদর আলী কী বলতে চাইছেন। কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, একটা গাছ নিজের খাবার নিজে তৈরি করছে, চুলোয় ভাত চাপিয়ে দিয়ে মাছ কুটতে বসেছে। দৃশ্যটা বেশিক্ষণ ধরে রাখা গেল না। একটু ইতস্তত করে বললাম, গাছ আবার নিজের খাবার নিজে তৈরি করে কী ভাবে? আমি যতদূর জানি মানুষ শুধু নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে। সবাই অবশ্যি পারে না, আমি রান্না করলে সেটা—

ধেৎ! আমাকে থামিয়ে দিয়ে সফদর আলী বললেন, আমি কি রান্না করার কথা বলছি? আমি বলছি খাবার তৈরি করা। বুঝতে পারলেন না?

আমি মাথা নাড়লাম, সত্যিই বুঝি নি। সফদর আলী হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। মানুষ কী খায়?

সেটা নির্ভর করে কী রকম মানুষ, তার উপর। যাদের পয়সাকড়ি আছে তারা মাছ, মাংস, দুধ, ফলমূল খায়, যাদের নেই তারা ডাল-ভাত পেলেই খুশি।

ঠিক আছে, ডাল-ভাত দিয়ে শুরু করা যাক, আপনি ডাল-ভাত তৈরি করতে পারবেন?

না।

কিন্তু গাছ পারে, ডাল আর ভাত গাছ থেকেই এসেছে।

আমরা তো মাছও খাই, মাছ তো গাছ থেকে আসে না। দেখেছেন কখনো "মাছ

www.amarboi.com ~

গাছ"?

কিন্তু মাছ কী খেয়ে বড় হয়?

আমি একটু মাথা চুলকে বললাম, বড় মাছ ছোট মাছদের খায়।

ঠিক আছে, ছোট মাছরা কী খায়? খুঁজে দেখেন সেগুলো শ্যাওলাজাতীয় কোনো এক ধরনের গাছ খেয়ে বড় হচ্ছে। আপনি মাংস খান, মাংস কোথা থেকে এসেছে? গরু থেকে। গরু কী খেয়ে বড় হয়? ঘাস খেয়ে। আপনি যেটাই দেখবেন সেটাই ঘুরেফিরে গাছপালার উপর বেঁচে আছে। কিন্তু গাছপালা? তারা কী খেয়ে বড় হচ্ছে? পানি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড। সূর্যের আলো ব্যবহার করে পানি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে তৈরি করে কার্বোহাইড্রেড, সেটা দিয়ে সারা পৃথিবী বেঁচে আছে। পারবেন আপনি কার্বোহাইড্রেড তৈরি করতে?

আমাকে স্বীকার করতেই হল যে পানি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে কার্বোহাইড্রেড তৈরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পানির সাথে চিনি আর লেবুর রস দিয়ে শরবত তৈরি করতে পারি, কিন্তু কার্বোহাইড্রেড? অসম্ভব।

পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানী এখনো পারে নি, সালোকসংশ্লেষণ দিয়ে গাছ শুধু যে কার্বোহাইড্রেড তৈরি করে তাই নয়, গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভেঙে অক্সিজেন তৈরি করে, সেই অক্সিজেন না থাকলে কবে আমি আর আপনি দম বন্ধ হয়ে শেষ হয়ে যেতাম! সালোকসংশ্লেষণ কী ভাবে হয় জানেন?

সফদর আলী এরপর ঝাড়া আধ ঘন্টা লেকচার দিয়ে গেলেন। বিজ্ঞানীদের এই হচ্ছে সমস্যা, নতুন কিছু শিখলে সেটা অন্যদের না শিখিয়ে ছাড়বেন না।

WWW.AMARBOI.COM

সপ্তাহখানেক পরে হঠাৎ সফদর আলীর একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির, টেলিগ্রামে লেখা "মহা আবিষ্কার"। ব্যস, শুধু এই দুটো শব্দ। এর আগেও কিছু নেই, এর পরেও কিছু নেই। সফদর আলীর কাণ্ডকারখানা দেখে আজকাল একটু অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই এমন কিছু অবাক হলাম না। মহা আবিষ্কারটা কী হতে পারে ঠিক ধরতে পারছিলাম না। গাছ নিয়ে বাড়াবাড়ি করছেন, তাই সম্ভবত গাছসংক্রান্ত কিছু একটা হবে। কে জানে পানি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশিয়ে কার্বোহাইড্রেড বানানো শুরু করেছেন কি না। ঠিক করলাম অফিস ফেরত আজ তাঁর বাসা হয়ে আসব। সফদর আলী যদি দাবি করেন মহা আবিষ্কার, আবিষ্কারটা সাংঘাতিক কিছু না হয়ে যায় না।

বাসা খুঁজে বের করে দরজায় শব্দ করতেই ভেতর থেকে একাধিক কুকুর প্রচণ্ড শব্দ করে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। আমি ভালো করেই জানি বাসায় কোনো কুকুর নেই। বাইরের লোকদের ভয় দেখানোর ব্যবস্থা, তবু ঠিক সাহস হয় না, কুকুরকে আমার ভারি ভয়।

দরজা খুলে গেল। ভাবলাম সফদর আলীর মাথা উঁকি দেবে। কিন্তু উঁকি দিল জংবাহাদুরের মাথা। আমাকে দেখে দরজাটা হাট করে খুলে মুখ খিঁচিয়ে একটা হাসি দেবার ভঙ্গি করল বুড়ো বানরটা। নেহায়েত জংবাহাদুরকে চিনি। এছাড়া মুখ খিঁচিয়ে ওরকম ভঙ্গি করাকে হাসি মনে করার কোনো কারণ নেই। আতিথেয়তায় জংবাহাদুরের তুলনা নেই, আমাকে প্রায় হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায়। ভেতরে আবছা

অন্ধকার। একটা জানালা খোলা। সেখানে একটা টবে একটা মানি প্লান্ট গাছ নিয়ে সফদর আলী কী একটা করছিলেন, আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে ওঠেন। সফদর আলীকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। চোখ দুটি মনে হয় জ্বলজ্বল করছে। বললেন, ইকবাল সাহেব, মহা আবিষ্কার করে ফেলেছি!

তাই নাকি? আমি উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কী আবিষ্কার?

বলছি, তার আগে চা খাওয়া যাক। সফদর আলী জংবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, জংবাহাদুর, চা বানাও।

জংবাহাদুর একটা ইজিচেয়ারে আরাম করে পা দুলিয়ে বসে ছিল। সফদর আলীর কথাটা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল।

সফদর আলী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বেটা কীরকম পাজি দেখেছেন?

আহা বেচারা! হয়তো কাজকর্ম করে কাহিল হয়ে পড়েছে।

কিসের কাহিল, সবকিছুতে ফাঁকিবাজি। দাঁড়ান, দেখাচ্ছি মজা। সফদর আলী আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, ঠিক আছে জংবাহাদুর, চা যদি বানাতে না চাও বানিও না, তবে আজ রাতে টেলিভিশন বন্ধ।

বলামাত্র জংবাহাদুরের চোখ খুলে যায়। তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে, তারপর মুখে কুঁই কুঁই শব্দ করতে করতে দ্রুত ছুটে যায় রান্নাঘরের দিকে।

আমি চোখ গোল-গোল করে তাকিয়ে ছিলাম, অবাক হয়ে বললাম, টেলিভিশন দেখা এত পছন্দ করে?

সবদিন নয়। আজ রাতে বাংলা সিনেমা আছে তো! চলেন, আপনাকে দেখাই আমার আবিষ্কার।

সফদর আলী আমাকে টেনে জানালার কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে টবে সেই মানি প্লান্ট গাছটা। গাছটাকে দেখিয়ে বললেন, এই দেখেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম, সাধারণ একটা গাছ। আবিষ্কারটি কী বুঝতে না পেরে বললাম, কী দেখব?

আমার আবিষ্কার।

কোথায়?

দেখছেন না?

আমি আবার তাকিয়ে দেখি, একটা টবে একটা মানি প্লান্ট গাছ, অস্বাভাবিক কিছু নেই। আবিষ্কারটি কী হতে পারে, গাছটার কি চোখ-নাক-মুখ আছে? খুঁজে দেখলাম নেই, তাহলে কি টবটা কোনো রাসায়নিক জিনিস দিয়ে বোঝাই? না, তাও নয়, তাহলে কী হতে পারে? মাথা চুলকে বললাম, না সফদর সাহেব, ধরতে পারছি না।

ধরতে পারছেন না? সফদর আলী একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, দেখছেন না মানি-প্লান্টটা কেমন জানালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

তা তো দেখছি, ওদিকে রোদ, ওদিকেই তো যাবে।

সফদর আলীর মাথায় বাজ পড়লেও তিনি এত অবাক হতেন না। চোখ বড় বড় করে বললেন, আপনি জানেন এটা?

না জানার কী আছে! সবাই জানে। ঘরের ভেতরে গাছ থাকলে যেদিকে আলো, গাছ সেদিকে বাড়তে থাকে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটাই কী আপনার

আবিষ্কার?

সফদর আলী দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন, বললেন, হ্যাঁ।

আমার তাঁর জন্যে মায়া হল। বেচারা একা একা থাকে। কোনো কিছু খোঁজখবর রাখেন না। যেটা সবাই জানে সেটা তাঁকে একা একা আবিষ্কার করতে হয়। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। বাধা দিয়ে বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই সেন্সিং ফিডব্যাকও আবিষ্কার হয়ে গেছে। আমি আরো ভাবলাম—

কী বললেন? সেন্সিং কী জিনিস?

সেন্সিং ফিডব্যাক।

সেটা কী জিনিস?

সফদর আলী আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কোনদিকে আলো আছে গাছ সেটা বুঝতে পারে। শুধু তাই নয়, গাছ সেদিকে যাওয়ারও চেষ্টা করে। কাজেই একটা কিছু ব্যবস্থা করে যদি সেটা বুঝে নেয়া যায় তাহলে গাছকে সেদিকে যেতে সাহায্য করা যায়। গাছের টবটা থাকবে একটা গাড়ির উপর, গাড়ির কন্ট্রোল থাকবে গাছের উপর—

আমি সফদর আলীকে থামিয়ে দিলাম, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, গাছ গাড়িটাকে চালাবে? অন্ধকারে রেখে দিলে গাছ গাড়িটাকে চালিয়ে রোদে এসে দাঁড়াবে?

হ্যাঁ।

গাছের কি হাত-পা আছে যে গাড়িকে চালাবে?

আমি কি তাই বলেছি? আমি বলেছি ফিডব্যাক। গাছের পাতায়, ডালে ছোট-ছোট "সেন্সিং প্রোব" থাকবে। পাতা যদি ডান দিকে বেঁকে যাওয়ার চেষ্টা করে, "সেন্সিং প্রোব" সেটা অনুভব করে গাড়িটাকে ডান দিকে চালিয়ে নেবে। কন্ট্রোলটা খুব সহজ নয়, অনেকগুলো জটিল সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নতুন একটা মাইক্রোপ্রসেসর বের হয়েছে, সেটা দিয়ে সহজেই কন্ট্রোল করা যাবে। এই দেখেন, আমি ডিজাইনটা করেছি—

সফদর আলী একটা বড় কাগজ টেনে নিলেন, সেখানে হিজিবিজি করে অনেক জটিল নকশা আঁকা, দেখে ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, এখন এই পুরো জিনিসটা আমাকে বুঝতে হবে? সফদর আলী বোঝাতে শুরু করে হঠাৎ কেমন জানি মিইয়ে গিয়ে বললেন, খামাখা সময় নষ্ট করলাম, এসব নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে গেছে! পুরনো ঢাকায় গেলে হয়তো এখনি দু' ডজন কিনে ফেলা যাবে!

কী বলছেন আপনি? আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, গাছ রোদের দিকে যায় সেটা সবাই জানে। তাই বলে গাছ গাড়ি চালিয়ে নিজে নিজে রোদের দিকে যাচ্ছে সেটা কখনো শুনি নি।

আপনি সত্যি জানেন?

এক শ' বার জানি। এরকম একটা আবিষ্কার হলে আমি জানতাম না? আমি এক ঘন্টা লাগিয়ে রোজ খবরের কাগজ পড়ি।

সফদর আলীর মুষড়ে পড়া ভাবটা কেটে যায় হঠাৎ। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলেন, তাহলে এটা তৈরি করা যাক। কী বলেন?

এক শ' বার! আমি হাতে কিল মেরে বললাম, গাড়ি চালিয়ে গাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে

কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি উঠে যাবে আপনার।

সফদর আলী লাজুক মুখে বললেন, খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়ে কী হবে। কিন্তু আপনি যখন বলছেন, তখন তৈরি করা যাক জিনিসটা। খুব সহজ আসলে, আপনাকে বলি কী ভাবে কাজ করবে এটা—

আমি ভয়ে-ভয়ে দেখলাম সফদর আলী কাগজটা টেনে নিচ্ছিলেন আবার, এমন সময় পর্দা ঠেলে জংবাহাদুর এসে ঢুকল। হাতে একটা ট্রে, তার উপর তিন কাপ চা এবং একটি কলা। আমাদের দু'জনের হাতে দুই কাপ চা ধরিয়ে দিয়ে জংবাহাদুর ইজিচেয়ারে তার নিজের চা এবং কলাটি নিয়ে বসে।

সফদর আলী আড়চোখে দেখে বললেন, বেটা কেমন পাজি দেখেছেন? নিজের জন্যে কলা এনেছে, আমাদের জন্যে কিছু না।

আমি হাত নেড়ে বললাম, আহা-হা ছেড়ে দেন, বেচারা একটা বানর ছাড়া তো আর কিছু নয়, চা যে এনেছে এই বেশি।

ভয়ে ভয়ে আমি চায়ে চুমুক দিয়ে হতবাক হয়ে যাই। চমৎকার সুগন্ধী চা, দুধ চিনি মাপমতো, এতটুকু কম-বেশি নেই। বললাম, বাহ্, চমৎকার চা তৈরি করেছে তো।

সফদর আলী চাপা গলায় বললেন, 'আস্তে বলুন, শুনে ফেললে দেমাকে মাটিতে পা ফেলবে না। তারপর গলা আরো নামিয়ে বললেন, এই একটা জিনিস ভালো করে, এছাড়া ভীষণ আলসে।

আমি আড়চোখে জংবাহাদুরকে লক্ষ করি। চোখ আধবোজা করে বসে আছে, এক হাতে ধূমায়িত চা, অন্য হাতে কলা। কলাটা চায়ে ভিজিয়ে-ভিজিয়ে খাচ্ছে, এই দৃশ্য আমি আর কোথায় পেতাম।

AMARBOI.COM

সফদর আলীর নতুন আবিষ্কারটি কেমন এগুচ্ছে দেখার জন্যে আজকাল অফিস ফেরত বাসায় যাবার আগে সফদর আলীর বাসা হয়ে যাই। জংবাহাদুরের জন্যে কলাটা-মূলাটা কিনে নিই বলে আজকাল আমাকে দেখলেই চা তৈরি করে আনে। ইদানীং দেখছি আমাকে চায়ের সাথে একটা কলা ধরিয়ে দিচ্ছে। তাকে খুশি করার জন্যে কলাটা চায়ে ভিজিয়ে খেতে হয়, সত্যি কথা বলতে কি, বেশ লাগে খেতে!

সফদর আলী পুরোদমে কাজ করছেন। কলকব্জা বোঝাই ছোট একটা গাড়ি তৈরি হয়েছে, উপরে টব রাখার জায়গা। গাড়ি থেকে লাল আর নীল রঙের দুটি তার বের হয়ে এসেছে। লাল তারটিতে পজিটিভ ভোল্টেজ দিলে গাড়িটা সামনে যায়, নিগেটিভ দিলে পিছনে। নীল তারটিতে পজিটিভ ভোল্টেজ দিলে ডান দিকে, নিগেটিভ দিলে বাম দিকে। আমার সামনেই সফদর আলী পরীক্ষা করে দেখেছেন, গাড়িটা ঠিক ঠিক কাজ করে। এখন একটা ছোট ইলেকট্রনিক্সের বাক্স তৈরি করছেন, গাছ সামনে, পিছনে, ডান বা বাম দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে একটা ছোট সেন্সিং প্রোব এই বাক্সটা দিয়ে কী ভাবে জানি ঠিক তারগুলোতে ঠিক ঠিক ভোল্টেজ হাজির করবে। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ সহজই মনে হল।

আরো কয়দিন কেটে গেল, সফদর আলী দিন-রাত কাজ করছেন।

ইলেকট্রনিক্সের অংশটুকু জটিল, সবরকম "আই. সি." নাকি এখানে পাওয়া যায় না। তাই দেরি হচ্ছে। "ডিজিটাল" অংশটুকু তৈরি হয়ে গেছে, ওটা নাকি সহজ। "এনালগ" অংশটুকু এখনো শেষ হয় নি। হাই ফ্রিকোয়েন্সির অসিলেশান নাকি ঝামেলা করছে। আমি এসবের মানে বুঝি না, তাই শুধু শুনে যাই।

যেদিন পুরোটা তৈরি হল, আমার উৎসাহ দেখবে কে। একটা মানি প্লান্ট গাছ দিয়েই শুরু করা হল। টবটা ছোট গাড়িটার ওপর তুলে দিয়ে ছোট ছোট সেন্সিং প্রোবগুলো বিভিন্ন পাতায় লাগিয়ে দেয়া হল। চুষনির মতো জিনিস, চাপ দিয়ে ভেতরে বাতাসটা বের করে দিলে বেশ আটকে থাকে। সফদর আলী গাড়িটার ভেতরে দুটো ব্যাটারি ভরে সুইচ অন করতেই গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁপতে থাকে, তারপর হঠাৎ একটু সামনে গিয়ে থেমে যায়। খানিকক্ষণ থেমে হঠাৎ পিছিয়ে আসে, তারপর আবার সামনে, তারপর আবার পিছনে।

মিনিট পাঁচেক এরকম করল, সফদর আলী চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকেন। আমি ইতস্তত করে বললাম, গাছটা মনস্থির করতে পারছে না মনে হচ্ছে। একবার সামনে যাচ্ছে, একবার পিছনে।

উঁহু। সফদর আলী মাথা নাড়েন, আসলে গেইন ঠিক নেই। ফিডব্যাক লুপটা ঠিক করতে হবে। জংবাহাদুর, একটা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার দাও।

জংবাহাদুর টেলিভিশনে একটা প্রচণ্ড মারামারির দৃশ্যে তন্ময় হয়ে ছিল, নেহায়েত অনিচ্ছায় উঠে এসে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার এগিয়ে দেয়। সফদর আলী বললেন, লুপটা ঠিক করতে খানিকক্ষণ সময় লাগবে, আমি তাই জংবাহাদুরের পাশে বসে টেলিভিশন দেখতে থাকি।

AMARBOI.COM

রাত দশটার দিকে সফদর আলী ঘোষণা করেন, তাঁর গাছগাড়ি শেষ হয়েছে। জিনিসটা পরীক্ষা করতে গিয়ে আমরা দু'জনেই খেয়াল করলাম এখন রাত। রোদ দিয়ে পরীক্ষা করার কোনো বুদ্ধি নেই। টেবিল ল্যাম্পের আলো দিয়ে পরীক্ষা করে কোনো লাভ হল না। গাছটা কাঁপতে থাকে, কিন্তু আলোর দিকে এগিয়ে না এসে মাঝে-মাঝে বরং একটু পিছিয়েই যাচ্ছিল। ঠিক করা হল, পরদিন রোদ উঠলে পরীক্ষা করা হবে। আমি ভোরেই চলে আসব, কাল এমনিতেই আমার অফিস নেই।

পরদিন ভোরে নাস্তা করেই আমি সফদর আলীর বাসায় হাজির হই। বেশ রোদ উঠেছে। গাছগাড়ি পরীক্ষা করায় অসুবিধে হবার কথা নয়। সফদর আলীকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম, মুখ গম্ভীর এবং ভুরু কুঁচকে নিজের গোঁফ টানছেন। বোঝাই যাচ্ছে জিনিসটা ঠিক কাজ করে নি। ঘরের এক কোনায় গাছটা গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকে জানালা খোলা, রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হল সফদর সাহেব?

আপনি নিজেই দেখুন, বলে সফদর আলী উঠে দাঁড়ান। জানালাটা বন্ধ করে প্রথমে ঘরটা অন্ধকার করে দিলেন। তারপর গাছগাড়িটাকে ঠেলে এনে ঘরের মাঝখানে রাখলেন। এবারে জানালাটা খুলে দিতেই ঘরে রোদ এসে পড়ল। সাথে সাথে গাড়িটা ঘরঘর শব্দ করে পিছিয়ে যেতে থাকে। সফদর আলী জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

সাথে সাথে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। আবার জানালাটা খুলে দিলেন, গাড়িটা আবার রোদ থেকে সরে যেতে থাকে। আশ্চর্য ব্যাপার! আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, গাছটা গাড়ি চালাচ্ছে।

কিন্তু ভুল দিকে চালাচ্ছে, রোদের দিকে না গিয়ে রোদ থেকে সরে যাচ্ছে!

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, তাতে কী আছে? আপনার সেই লাল তারের ভোল্টেজটা পাল্টে দিলে হয়। যখন পজিটিভ হওয়ার কথা তখন নিগেটিভ, যখন নিগেটিভ হওয়ার কথা তখন পজিটিভ। তা হলেই যখন পিছন দিকে যাচ্ছে তখন—

ছোট বাচ্চারা অর্থহীন কোনো কথা বললে বড়রা যেভাবে তার দিকে তাকায়, সফদর আলী ঠিক সেভাবে আমার দিকে তাকালেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, বিজ্ঞান মানে কি?

আমি হঠাৎ এরকম গুরুতর প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে থেমে গেলাম। সফদর আলী আহত গলায় বললেন, কোনো একটা জিনিসকে অন্ধের মতো কাজ করানো তো বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞান হচ্ছে বোঝা ব্যাপারটা কী হচ্ছে, বুঝে তারপর কাজ করা। বোকার মতো ভোল্টেজ পাল্টে দিলেই তো হয় না, তাহলে সেটা তো আর বিজ্ঞান থাকে না, সেটা তাহলে জাদু হয়ে যায়।

এরকম একটা অবৈজ্ঞানিক কথা বলার জন্যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল, আমি তাঁর কথাগুলো হজম করে মাথা নিচু করে বসে রইলাম। সফদর আলী বিজ্ঞান এবং মানুষের প্রকৃতির ওপর ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিয়ে আবার গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বিকেলের দিকে আবার আসব বলে উঠে এলাম। আজ আবার বাজার করার কথা, দেরি হলে কিছু আর পাওয়া যাবে না।

বিকেলে সফদর আলীর বাসায় পৌঁছে দেখি বাসা একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। সারা ঘরে ভাঙা পেয়ালা, পিরিচ, বাসনকোসন, বইপত্র ছড়ানো, চারদিকে পানি থৈথৈ করছে। ঘরে ছড়ানো–ছিটানো অসংখ্য মারবেল, এক কোনায় একটা বড় তক্তা। আমাকে দেখে সফদর আলী হৈহৈ করে উঠলেন। বের করে ফেলেছি সমাধান।

কিসের সমাধান?

গাছগাড়ি উল্টোদিকে যাচ্ছিল কেন।

সত্যি? আমি সাবধানে ঘরের মাঝে এসে দাঁড়ালাম, কেন যাচ্ছিল উল্টোদিকে?

আপনাকে চাক্ষুষ দেখাই, বলে তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দেন, নিচে নেমে আস, জংবাহাদুর!

আমি উপরে তাকিয়ে হতবাক হয়ে যাই, জংবাহাদুর বাসার ঘুলঘুলি ধরে ঝুলে আছে।

নেমে আস বলছি।

জংবাহাদুর নেমে আসার কোনো লক্ষণ দেখাল না, বরং কুঁই কুঁই করে প্রতিবাদ করে কী একটা বলল।

নেমে আস, এছাড়া তোমার টেলিভিশন দেখা বন্ধ।

জংবাহাদুর তবু নেমে আসল না। দেখে বুঝতে পারি ব্যাপার গুরুতর। আমি ভয়ে–ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখাতে চাইছেন?

জংবাহাদুর নেমে না এলে দেখাই কেমন করে? সফদর আলী এদিকে সেদিকে

তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে তাকান, তাঁর চোখ–মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, হাতে কিল মেরে বললেন, এই তো আপনি আছেন, আপনি দেখাতে পারবেন।

যে জিনিস জংবাহাদুর করতে চাইছে না সেটা আমি গলা বাড়িয়ে করতে যাব, এত বোকা আমি নই, কিন্তু কিছু বলার আগেই দেখি সফদর আলী ঘরে ছড়ানো–ছিটানো মারবেলগুলো একত্র করে তার ওপরে তক্তাটা বসিয়ে আমাকে টেনে–হিঁচড়ে তার ওপর তুলে ফেলেছেন।

তক্তার নিচে মারবেলগুলো কাজ করছে বল বিয়ারিঙের মতো। সাবধানে আমাকে ধরে রেখে সফদর আলী বললেন, তক্তাটি এখন খুব সহজে গড়িয়ে যাবে, কাজেই আপনি সাবধানে নড়াচড়া করবেন।

আমি চিৎকার করে নেমে পড়তে যাব, তার আগেই সফদর আলী আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, সাবধান! একটু অসাবধান হলেই কিন্তু আছড়ে পড়বেন।

আমি নাক–মুখ খিঁচিয়ে কোনোমতে তক্তার উপরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মনে হয় পায়ের নিচে পৃথিবী টলটলায়মান। একটু অসতর্ক হলেই একেবারে পপাত ধরণীতল। সফদর আলী কোথা থেকে একটা কলা তুলে নিয়ে আমার নাকের সামনে ঝুলিয়ে ধরে বললেন, মনে করুন আপনি জংবাহাদুর।

ব্যাপারটা সহজ নয়, তবু চেষ্টা করলাম।

এবারে কলাটা নেয়ার জন্যে এগিয়ে আসুন।

আমি কলাটি ধরার জন্যে একটু এগুতেই শরীরের ওপরের অংশ সামনে ঝুঁকে এল, ম্যাজিকের মতো নিচের অংশ গেল পিছিয়ে। আমি তক্তার ওপর তাল সামলানোর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকি, কিন্তু কিছু বোঝার আগে আমাকে নিয়ে তক্তা মারবেলের উপর প্রচণ্ড বেগে পিছনে গড়িয়ে যায়। আমি হাতের কাছে যা আসে তাই ধরার চেষ্টা করতে থাকি। একটা ছোট আলমারি ছিল, তাই ধরে ঝুলে পড়লাম। কিন্তু লাভ হল না, আলমারিসহ প্রচণ্ড জোরে মেঝেতে আছড়ে পড়ি। মনে হল শরীরের সব হাড়গোড় ভেঙে গেছে, নাড়িভুঁড়ি ফেঁসে গেছে, ঘিলু মাথা ফেটে বের হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে গেছে। চোখের সামনে নানা রঙের আলো খেলা করতে থাকে। হলুদ রঙের প্রাধান্যই বেশি। প্রথমে ভাবলাম, আমি বোধহয় মরেই গেছি, সাবধানে চোখ খুলে দেখি মরি নি, কারণ জংবাহাদুর ঘুলঘুলিতে ঝুলে থেকেই পেট চেপে ধরে প্রচণ্ড হাসিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মনে হল বোধহয় মরে গেলেই ভালো ছিল। তাহলে অন্তত এই দৃশ্যটি দেখতে হত না, চোখ বন্ধ করে ফেললাম উপায় না দেখে। আবার যখন চোখ খুললাম, দেখি মুখের উপর সফদর আলী ঝুঁকে আছেন। শুনলাম তিনি বলছেন, দেখলেন? আপনি সামনে আসার চেষ্টা করছিলেন আর কেমন পিছিয়ে গেলেন! গাছের বেলাতেও একই ব্যাপার, যাকে বলে ভরবেগের সাম্যতা! গাছ চেষ্টা করে সামনে আসতে, কিন্তু যায় পিছিয়ে।

আমি আবার চোখ বন্ধ করে ফেলি, এবারে আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে মরে গেলেই ভালো ছিল।

সে রাতে যখন বাসায় ফিরেছি, তখন আমার কপালে এবং হাতে ব্যান্ডেজ। একটা চোখ বুজে আছে, সেটা দিয়ে আপাতত কিছু দেখা যাচ্ছে না। হাঁটতে হচ্ছে খুঁড়িয়ে।

কারণ কোমর, হাঁটু এবং গোড়ালিতে প্রচণ্ড ব্যথা।

আমাকে দেখে মা আঁৎকে উঠলেন, সে কী! এ কী চেহারা তোর, অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

না, অ্যাকসিডেন্ট না।

তাহলে? মারামারি করেছিস নাকি?

মারামারি করব কেন?

নিশ্চয়ই করেছিস, তা ছাড়া এরকম চেহারা হবে কেন?

বললাম তো মারামারি করি নি।

আবার মিথ্যা কথা বলছিস! এই বয়সে রাস্তায় মারপিট করে এসে আবার আমার সাথে মিথ্যা কথা বলিস?

বললাম তো মারপিট করি নি।

আমার কথা মা শুনলেন না। চোখে আঁচল দিয়ে বললেন, আমি কোথায় যাই গো! এরকম একটা খুনে ছেলেকে পেটে ধরেছি! তোর নানা কত বড় খান্দানী বংশের লোক, আর তার নাতি রাস্তায় গুণ্ডাদের সাথে মারপিট করে আসে—

সফদর আলীর বাসায় সেই রাম আছাড় খাবার পর প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এখন থেকে কোনো অবস্থাতেই আর তাঁর বাসায় যাচ্ছি না। দেখা করতে হলে চায়ের দোকানে দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা হবে। বিজ্ঞানীরা বড় ভয়ংকর জিনিস, তাদের সাথে আর হাতেকলমে কোনো কাজকর্ম নেই।

সপ্তাহখানেক কেটে গেল, চোখের ফোলা কমেছে। হাত দিয়ে জিনিসপত্র ধরা শুরু করেছি। কোমরের ব্যথাটা এখনো আছে, ডাক্তার বলেছে সারতে সময় নেবে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। অফিসে সেকশান অফিসার বললেন, শেয়ালের মাংস খেলে নাকি ব্যথা-বেদনা ভালো হয়ে যায়। আর কয়দিন অপেক্ষা করে হয়তো শেয়াল ধরতে বের হতে হবে। অফিস ফেরত কয়দিন কাওরান বাজারে সেই চায়ের দোকানে ঢুঁ মেরে গেছি, সফদর আলীর দেখা পাই নি। তাঁর গাছগাড়ির কী হল জানার কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু বাসায় যাওয়ার ভরসা পাচ্ছি না।

দু'সপ্তাহের মাথায় সফদর আলীর সাথে দেখা। আমি চা খেয়ে বের হচ্ছিলাম, দেখি তিনি হেলতে-দুলতে ঢুকছেন। আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠলেন, এই যে আপনাকে পাওয়া গেছে, কতদিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। বলুন দেখি, কোন গাছ পোকা খায়?

পোকা খায়? গাছ?

হ্যাঁ, অনেকরকম গাছ পোকা ধরে খায়, জানেন না?

আমার মনে পড়ল কোথায় জানি পড়েছিলাম যে, কিছু কিছু গাছ নাকি পোকা ধরে খায়। একটা গল্পও পড়েছিলাম যে মাদাগাস্কার দ্বীপে একটা গাছ নাকি মানুষ ধরে খেয়ে ফেলত। আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, শুনেছি কিছু গাছ নাকি পোকা খায়, কিন্তু সেরকম গাছ তো চিনি না।

তামাক গাছ নাকি পোকা খায়?

তাই নাকি, জানতাম না তো!

সফদর আলী চিন্তিত মুখে বললেন, একটা পোকা-খাওয়া-গাছ খুঁজে বেড়াচ্ছি। সবচেয়ে ভালো হয় যদি একটা "ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ" পেয়ে যাই। ওটা একেবারে মাছিটাছি ধরে খেয়ে ফেলে।

কী করবেন ওরকম গাছ দিয়ে?

এখন গাছ গাড়ি চড়ে গান শুনতে যায়, রোদ পোহাতে যায়, পানি খেতে যায়, যদি "ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ" পাই—

কী বললেন? আমি চমকে উঠে বললাম, গাছগাড়ি চড়ে কী করে?

কেন? গান শোনে, রোদ পোহাতে যায়, পানি খেতে যায়।

গান শোনে?

হ্যাঁ। এত অবাক হচ্ছেন কেন? আপনি দেখলেন না?

কোথায় দেখলাম?

হঠাৎ সফদর আলীর সবকিছু মনে পড়ে যায়। মাথা নেড়ে বললেন, সেদিন পড়ে গিয়ে ব্যথা পাওয়ার পর তো আপনি আর আসেন নি। বেশি ব্যথা পেয়েছিলেন নাকি?

সফদর আলীর উপর রাগ করে থাকাও মুশকিল। চেপে থাকার চেষ্টা করলাম, তবু গলার স্বরে একটু রাগ প্রকাশ হয়ে গেল, না ব্যথা পাব কেন? বয়স্ক এক জন মানুষ যদি ওভাবে দড়াম করে পাকা মেঝেতে আছড়ে পড়ে, ব্যথা পাবে কেন?

সফদর আলী অপরাধীর মতো মুখ করে বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরে হিসাব করে দেখেছিলাম ওরকম হাবড়ে পড়ে সারা শরীরে ব্যথাটা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে বেঁচে গিয়েছিলেন। পুরো চোটটা যদি এক জায়গায় লাগত তাহলে হাড় ভেঙে যেতে পারত।

আমি রাগ লুকানোর কোনো চেষ্টা না করে বললাম, আর ঐ বজ্জাত বানরটা কেমন পেট চেপে ধরে হাসা শুরু করেছিল দেখেছিলেন?

সফদর আলী মাথা নেড়ে বললেন, ওটা আমার দোষ। বানরকে হাসতে শেখানোর কোনো দরকার ছিল না, এখন যখন খুশি হাসতে থাকে। ভদ্রতাজ্ঞানটুকু নেই। আপনি যে আছাড় খেয়ে পড়লেন, দেখে যত হাসিই পাক, জংবাহাদুরের মোটেই হাসা উচিত হয় নি। আমি কি হেসেছিলাম?

আমি স্বীকার করলাম তিনি হাসেন নি। যাই হোক, আমার কৌতূহল আর বাঁধ মানছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, গাছগাড়ির কী হল, বলুন।

সফদর আলী সবকিছু খুলে বললেন। সার্কিটের কানেকশান একটু পরিবর্তন করে দেয়ার পর গাছগাড়ি ঠিক ঠিক কাজ শুরু করেছে। ভোরে রোদ উঠতেই গাছটা রোদে হাজির হয়, আবার রোদটা বেড়ে গেলে রোদ থেকে ছায়ায় সরে যায়। ঘরের এক কোনায় একটু পানি ছেড়ে রেখেছিলেন। গাছ কী ভাবে কী ভাবে সেটা বুঝে নিয়ে দিনে এক বার পানির নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। কোথায় নাকি পড়েছিলেন যে গাছের সাথে কথা বললে নাকি গাছ ভালো থাকে। সফদর আলী কী নিয়ে কথা বলবেন ভেবে পান নি বলে একটা রেকর্ড প্লেয়ারে কিছু গানের ব্যবস্থা করেছেন। গাছটা আজকাল নাকি রীতিমতো গান শুনছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দিকে নাকি গাছটার বিশেষ আকর্ষণ। একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিলেই গাছ নাকি পড়িমরি করে ছুটে আসে। সফদর আলী আরো গোটা দশেক গাছগাড়ি তৈরি করে ভিন্ন ভিন্ন গাছ বসিয়ে দেখতে চান কোনটা কী রকম

কাজ করে। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা কোন গাছ কী গান শুনতে পছন্দ করে সেটা বের করা। তিনি নাকি "গাছের সংগীতচর্চা" নাম দিয়ে একটা বই লিখবেন বলে ঠিক করেছেন। আমার পরিচিত কোনো প্রকাশক আছে কি না জানতে চাইলেন। তিনি পোকা খেতে পছন্দ করে এরকম একটা গাছ খুঁজছেন, তাহলে সেই গাছগাড়িতে পোকা মারার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। গাছটা তাহলে পোকা মেরে খেতে পারবে। ঘরে তেলাপোকার উপদ্রব থাকলে তো কথাই নেই, একদিনে ঘর পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সফদর আলীর গাছগাড়ি দেখার কৌতূহল আর আটকে রাখা যাচ্ছিল না। আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। তাই ঠিক করা হল পরদিন বিকেলে আলো থাকতে থাকতে তাঁর বাসায় যাব। গাছপালা ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, আলো ও পানি খুঁজে নিচ্ছে, গান শুনছে—এর থেকে বিচিত্র জিনিস আর কী হতে পারে!

পরদিন বিকালে সফদর আলীর বাসায় গিয়ে দেখি বাসা বাইরে থেকে তালাবন্ধ, ঘরের দরজায় একটা খাম, খামের উপরে আমার নাম লেখা। ভিতরে একটা চিঠি, চিঠিটা এরকম :

সুসংবাদ। ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ। জরুরি। চট্টগ্রাম। উদ্ভিদবিদ্যা প্রফেসর। দুঃখিত।

টেলিগ্রাম করে করে তাঁর স্বাভাবিক চিঠি লেখার ক্ষমতা চলে গেছে। তবু বুঝতে অসুবিধে হল না। চট্টগ্রামের কোনো এক উদ্ভিদবিদ্যার প্রফেসর ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ নামের পোকা-খাওয়া-গাছ জোগাড় করে দেবেন বলে তাঁকে তাড়াহুড়ো করে চলে যেতে হয়েছে। আমার সাথে দেখা হল না বলে দুঃখিত। আমি একটু নিরাশ হলাম, কিন্তু খুশিও হলাম, সেদিন যেভাবে ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপের জন্যে হা-হুতাশ করছিলেন যে আমার বেশ খারাপই লাগছিল।

তারপর বেশ কয়দিন সফদর আলীর খোঁজ নেই। তিনি ফিরে এসেছেন কি না জানি না। বাসায় গিয়ে খোঁজ নেব ভাবছিলাম। কিন্তু কাজের চাপে সময় পাচ্ছি না। তার মধ্যে হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এসে হাজির :

ডজন। ভিনাস। হাই ভোল্টেজ।

প্রথম অংশটা বুঝতে পারলাম। তিনি এক ডজন ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ গাছ পেয়েছেন, কিন্তু হাই ভোল্টেজ কথাটি দিয়ে কী বোঝাতে চাইছেন ধরতে পারলাম না। যাই হোক, দেরি না করে সেদিনই আমি সফদর আলীর বাসায় গিয়ে হাজির। জংবাহাদুর দরজা খুলে আমাকে সফদর আলীর কাছে নিয়ে গেল। তিনি তাঁর ঘরে অসংখ্য যন্ত্রপাতির মাঝে উবু হয়ে বসে ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, ইকবাল সাহেব, দেখে যান কী পেয়েছি।

একটু এগিয়ে দেখি ছোট ছোট বারটা টবে ছোট ছোট বারটা গাছ। গাছের পাতাগুলো ভারি অদ্ভুত, চারদিকে কাঁটার মতো বেরিয়ে আছে। কোনো কোনো পাতা খোলা, কোনো কোনোটা বন্ধ হয়ে আছে। আমি বললাম, এই কি সেই ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ?

AMARBOI.COM

হ্যাঁ, দেখুন মজা দেখাই।

সফদর আলী টেবিলে রাখা কাঁচা মাংসের খানিকটা কিমা থেকে একটু তুলে নিয়ে গাছের পাতার ওপর ছেড়ে দিলেন। আর কী আশ্চর্য, গাছের পাতাটা ভাঁজ হয়ে বন্ধ হয়ে মাংসটুকু ঢেকে ফেলল! সফদর আলী বললেন, যখন পাতাটা খুলবে, দেখবেন মাংসটুকু নেই।

কখন খুলবে?

সময় লাগবে, মাংস হজম করা তো সহজ নয়।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, দুনিয়াতে কত কী যে দেখার আছে, একটা জীবনে তার কতটুকু মাত্র দেখা যায়?

সফদর আলী বললেন, আপনার কাজ না থাকলে সবগুলো গাছকে একটু করে কিমা খাওয়ান দেখি।

যদিও জানি ছোট এইটুকু গাছে ভয় পাবার কিছু নেই, তবু আমার একটু ভয় ভয় লাগতে থাকে। সাবধানে আমি একটু একটু করে কিমা গাছগুলোকে খাওয়াতে থাকি। পাতার ওপরে রাখতেই পাতাটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। সফদর আলী খানিকক্ষণ আমাকে লক্ষ করে আবার যন্ত্রপাতির ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন সেখানে লিখেছেন, হাই ভোল্টেজ, সেটার মানে কি?

সফদর আলী একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন, বলেন, বুঝতে পারেন নি?

নাহ্! আমার একটু লজ্জাই লাগে স্বীকার করতে।

আপনাকে বলেছি না ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ, যে গাছগাড়িতে থাকবে সেখানে পোকা মারার ব্যবস্থা থাকবে।

বলেছিলেন। কী ভাবে পোকাগুলোকে মারবে?

হাই ভোল্টেজ দিয়ে।

ও!

একটা লম্বা তার বেরিয়ে আসবে। তারের মাথায় থাকবে বিশ হাজার ভোল্ট। পোকা–মাকড়ের গায়ে লাগতেই প্রচণ্ড স্পার্ক, আর সেটা এসে পড়বে ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপের উপর, ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ তখন কপ কপ করে সেটা খেয়ে নেবে।

দৃশ্যটা কল্পনা করেই আমার গায়ে কেমন জানি কাঁটা দিয়ে ওঠে। আলোচনার বিষয়বস্তু পাল্টানোর জন্যে বললাম, আপনার গাছগাড়ি কই? বলছিলেন যে গান শুনতে যায়, দেখাবেন একটু?

সফদর আলী অপ্রতিভের মতো বললেন, ঐ যা! হাই ভোল্টেজের ব্যবস্থা করার জন্যে সবগুলো খুলে ফেলেছি।

তাকিয়ে দেখি বেশ কয়টা গাছগাড়ি, সবগুলোই খোলা। সফদর আলী ভেতরে এখন যন্ত্রপাতি ভরছেন। স্ক্রু–ড্রাইভার দিয়ে কী একটা জিনিস চেপে ধরে বললেন, আর একটু অপেক্ষা করুন, দেখবেন এগুলো পোকা–মাকড় ধরে বেড়াবে, গান শোনা থেকে সেটা বেশি মজার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কতক্ষণ লাগবে?

এই তো ঘন্টাখানেকের মধ্যে একটা দাঁড়িয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ঘন্টাখানেকের মধ্যে জিনিসটা দাঁড় হল না। প্রচণ্ড হাই ভোল্টেজের স্পার্ক হতেই সেটা ইলেকট্রনিক সার্কিটের অনেক জায়গায় কী ভাবে জানি ঝামেলা করে ফেলছিল। মাইক্রোপ্রসেসরে ভুল পাল্‌স্‌ এসে সেটাকে নাকি বিভ্রান্ত করে দেয়, কাজেই পুরো সার্কিটটাকে নাকি খুব ভালো করে "শিল্ডিং" করতে হবে। সফদর আলী সবকিছু খুলে আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করলেন, ধৈর্য আছে বটে! আমি আর বসে থেকে কী করব, বাসায় ফিরে এলাম।

বেশ কয়দিন কেটে গেছে, আমি মাঝে মাঝেই খোঁজ নিই। কিন্তু কিছুতেই সফদর আলীর কাজ শেষ হয় না। যখন শুনি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ করে একটা হাই ভোল্টেজের স্পার্ক আরেকটা ট্রানজিস্টর না হয় আরেকটা আই. সি.-কে পুড়িয়ে দেয়। সফদর আলী তখন আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করেন। দেখে-দেখে আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিলাম, তখন আবার আমাকে কয়দিনের ছুটি নিতে হল। মা অনেক দিন থেকে বলছেন নেত্রকোনা যাবেন, তাঁকে নিয়ে যাবার লোক নেই। কাজেই প্রায় সপ্তাহখানেক নেত্রকোনায় থেকে যখন ফিরে এসেছি, তখন দেখি আমার নামে বেশ কয়েকটা টেলিগ্রাম, বাসার সবাই সেগুলো খুলে পড়েছে। টেলিগ্রাম হলেই জরুরি খবর ভেবে সেগুলো খুলে ফেলা হয়। টেলিগ্রামগুলো এরকম—

প্রথমটি : কাজ শেষ।
দ্বিতীয়টি : কাজ শেষ। আসুন এবং দেখুন। হিন্দি গান।
তৃতীয়টি : কাজ শেষ। আসুন এবং দেখুন। বীভৎস।
চতুর্থটি : জরুরি। রাজশাহী। পিচার প্লান্ট।

AMARBOI.COM

বাসার কেউ টেলিগ্রামগুলো পড়ে কিছু বোঝে নি এবং সেটা নিয়ে বেশি মাথাও ঘামায় নি, সবাই জেনে গেছে আমার একজন আধপাগল বন্ধু আছে, সে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে শুধু টেলিগ্রাম পাঠায়। আমার অবশ্যি টেলিগ্রামগুলো বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না, ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ বসিয়ে গাড়ি বানানো শেষ হয়েছে, সফদর আলী আমাকে গিয়ে দেখতে বলেছেন। গাছগুলো নিশ্চয়ই হিন্দি গান শুনতে পছন্দ করে এবং যেভাবে পোকা ধরে খাচ্ছে, ব্যাপারটা হয়তো বীভৎস। শেষ টেলিগ্রাম পড়ে মনে হল তিনি জরুরি কাজে রাজশাহী যাচ্ছেন। পিচার প্লান্ট কথাটার অর্থ ঠিক ধরতে পারলাম না। ডিকশনারি খুলে দেখলাম এটি আরেকটি পোকা—খেকো গাছ। গাছের পাতার নিচে একটা ছোট কলসির মতো থাকে, সেখানে এক ধরনের রস থাকে। পোকা-মাকড় তার লোভে কলসির ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন গাছ কলসির মুখ বন্ধ করে ফেলে। মুখ আবার যখন খোলে তখন ভেতরের পোকা হজম হয়ে গেছে। টেলিগ্রামের পুরো অর্থ এবারে বুঝতে পারলাম। রাজশাহীতে নিশ্চয়ই তিনি এধরনের কোনো গাছের সন্ধান পেয়ে জরুরি নোটিশে চলে গেছেন। সফদর আলী এখানে নেই জেনেও একদিন তাঁর বাসা থেকে ঘুরে এলাম। ঘর তালাবন্ধ। কিন্তু ভেতরে মনে হল খুটখাট শব্দ হচ্ছে। জংবাহাদুরের কুঁই কুঁই আওয়াজও মনে হল শুনলাম কয়েক বার। এদিক-সেদিক দেখে উৎসাহজনক বা সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে বাসায় ফিরে

এলাম।

আরো কয়দিন পরের কথা। আমি অফিসে কাজ করতে করতে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। ছুটির সময় প্রায় হয়ে এসেছে। এমন সময় শুনি বাইরে সফদর আলীর গলার স্বর। সেক্রেটারির কাছে আমার খোঁজ করছেন। আমি অবাক হয়ে বেরিয়ে এলাম, সফদর আলীকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। আমাকে দেখে যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার সফদর সাহেব? কবে এলেন?

এই তো, একটু আগে। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে।

কেন? কী হয়েছে?

জানি না। স্টেশন থেকে বাসায় পৌঁছে যেই দরজা খুলেছি, চিৎকার করতে-করতে জংবাহাদুর বেরিয়ে এসে বাসার কার্নিশে উঠে গিয়ে বসে পড়ল। আমি যতই ডাকি, কিছুতেই নিচে নামতে চায় না। ভেতরে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে।

কী দেখে?

বুঝতে পারলাম না, ভয় পাবার মতো কিছু তো নেই বাসায়।

আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপগুলো?

সেগুলোতে ভয় পাবার কী আছে? যেভাবে পোকা মারে, দেখে একটু ঘেন্না ঘেন্না লাগে। কিন্তু ভয় পাবার তো কিছুই নেই।

এখন কী করতে চান?

বাসায় জিনিসগুলো রেখে কোনোমতে চলে এসেছি। আপনাকে নিয়ে এখন যাব। একা একা যেতে সাহস পাচ্ছি না।

অফিস প্রায় ছুটি হয়েই গেছে। আমি কাগজপত্র গুছিয়ে সফদর আলীর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। সফদর আলী জানালেন, রাজশাহী গিয়ে কোনো লাভ হয় নি। যে বলেছিল তাঁকে পিচার প্লান্ট জোগাড় করে দেবে, সে জোগাড় করে দিতে পারল না। সেখানে শুনলেন, বগুড়াতে এক নার্সারিতে নাকি আছে। সেখানে গিয়েও পেলেন না। ঘোরাঘুরিই হয়েছে, কোনো কাজ হয় নি।

রিকশা করে তাঁর বাসায় পৌঁছুতে-পৌঁছুতে প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে গেল। শীতের বিকেল, রোদ পড়ে আসছে দ্রুত। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছে। এক সোয়েটারে শীত মানতে চায় না। সফদর আলীর বাসার সামনে দেখলাম একটা ছোটখাট ভিড়। বুঝতে অসুবিধে হল না ভিড়টি জংবাহাদুরের সৌজন্যে। লোকজনের ভিড় দেখলে জংবাহাদুর যে নিজে থেকেই খেলা দেখাতে শুরু করে, সেটা শিখেছি অনেক মূল্য দিয়ে। আজ অবশ্যি সেরকম কিছু নয়। জংবাহাদুরের মেজাজ-মরজি সুবিধের নয়, উপস্থিত লোকজনকে মাঝে-মাঝে ভেংচি কাটা ছাড়া আর কিছুতেই উৎসাহ নেই। উপস্থিত লোকজন অবশ্যি তাতেই খুশি। আমাদের দেখে সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কী-কী বলতে শুরু করে। বানরের ভাষা আছে কি না কে জানে, থাকলেও সেটা আমাদের জানা নেই। কাজেই জংবাহাদুর ঠিক কী বলতে চাইছে বুঝতে পারলাম না। আমরা যখন দরজা খুলে ঢুকব, তখন সে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে নিষেধ করতে থাকে। কিন্তু বানরের কথা শুনে তো আর জগৎসংসার চলতে পারে না। আমরা তাই তালা খুলে সাবধানে ঘরের

AMARBOI.COM

ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরে আবছা অন্ধকার, ভালো করে দেখা যায় না। সফদর আলী হাততালি দিতেই বাতি জ্বলে উঠল। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, অন্ধকারে সবসময় সুইচ খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই এই ব্যবস্থা। শব্দ দিয়ে সুইচ অন করা।

ঘরের ভিতর ছড়ানো–ছিটানো জিনিসপত্র, এছাড়া আর কোনো বিশেষত্ব নেই। বোঝা যায় এটা জংবাহাদুরের ঘর। পাশের ঘরে একটু খুটখাট শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওঘরে কি ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপগুলো?

হ্যাঁ, চলুন যাই।

আমার একটু ভয় ভয় লাগতে থাকে। বললাম, লাঠিসোঁটা কিছু একটা নিয়ে গেলে হয় না?

সফদর আলী কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েও কী মনে করে একটা লোহার রড তুলে নিলেন। আমরা দু'জন পা টিপে–টিপে পাশের ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরে কিছু নেই, আবছা অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। সফদর আলী হাততালি দিলেন, কিন্তু বাতি জ্বলল না। আবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু লাভ হল না। আমিও চেষ্টা করি, কিন্তু বাতি আর জ্বলল না। সফদর আলী চিন্তিত মুখে বললেন, আবার বাল্‌বটা ফিউজ হয়েছে।

আমি অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপগুলো কোথায়?

ঐ তো। সফদর আলী হাত দিয়ে দেখিয়ে দেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আমাদের ঘিরে দেয়াল ঘেঁষে চারদিকে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু দেখেই আমার মনে হল সবগুলো বাজে মতলব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

কী জানি! সার্কিট কেটে গেছে হয়তো—সফদর আলীর কথা শেষ হবার আগেই ডানপাশে একটা গাছগাড়িতে দুটো বাতি জ্বলে ওঠে। শুধু তাই নয়, বাতি দুটি পিটপিট করতে থাকে। দেখে মনে হয় এক জোড়া চোখ। আমি আঁৎকে উঠে বললাম, ওটা কি?

বাতি।

চোখের মতো লাগছে দেখি, পিটপিট করছে কেন?

না, চোখ নয়। পোকা–মাকড় আলো দেখলে এগিয়ে আসে। তাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, গাছগাড়ি পোকা–মাকড় ধরতে হলে বাতি জ্বালিয়ে নেয়।

কিন্তু দেখুন আপনি, কেমন পিটপিট করছে, ঠিক চোখের মতো।

সফদর আলী দুর্বলভাবে হেসে বললেন, ঠাট্টা করে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, দেখতে চোখের মতো দেখায় কিনা!

ঠিক এই সময় চোখ জোড়া ঘুরে আমাদের ওপর এসে পড়ে। আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠি, আমাদের উপর আলো ফেলছে কেন?

কী জানি! আমাদের পোকা ভাবছে নাকি?

আমি ভয়ে–ভয়ে ভাঁটার মতো চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকি। হঠাৎ দেখি সেটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি ফিসফিস করে বললাম, সফদর সাহেব, চলুন পালাই।

ভয়ের কী আছে! একটা গাছই তো।

আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে কেন? আমার গলার স্বর কেঁপে ওঠে। খেয়ে তো ফেলতে পারবে না—সফদর আলী সাহস দেয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু গলার স্বরে বোঝা গেল তিনি নিজেও একটু ভয় পেয়েছেন। গাছটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। আমি খেয়াল করলাম, ওটার সামনে দিয়ে শুঁড়ের মতো কী একটা যেন বের হয়ে আছে। ফুট চারেক উঁচু। সেটা দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, শুঁড়ের মতো ওটা কি?

সফদর আলী ঢোক গিলে বললেন, ওটা ইলেকট্রিক শক দিয়ে পোকা মারার জন্যে। ওটাতেই হাই ভোল্টেজ।

ওটা বের করে এগিয়ে আসছে কেন?

মনে হয় আমাদের শক মারতে চায়।

সর্বনাশ। আমি আঁৎকে উঠে বললাম, চলুন পালাই।

চলুন। সফদর আলী হঠাৎ করে রাজি হয়ে গেলেন। আমরা দু'জন ঘুরে দাঁড়াই, দরজার দিকে এগুতেই হঠাৎ আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল, দুটি গাছ গুটি গুটি দরজার সামনে এগিয়ে এসেছে। আমরা ঘুরতেই তাদের ভাঁটার মতো দুটি চোখ জ্বলে উঠল। শুধু তাই নয়, ইলেকট্রিক শক দেয়ার শুঁড়টা দোলাতে দোলাতে আস্তে আস্তে এগুতে থাকে। আমি সফদর আলীর দিকে তাকালাম, এখন?

সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, বাম দিকে চেষ্টা করি, ঐ জানালার ওপরে উঠে—

চেষ্টা করার আগেই বাম দিকে, ডান দিকে, সামনে, পিছনে গাছগুলোর চোখ জ্বলে উঠতে থাকে। আমরা চারদিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে গেলাম। এবারে গাছগুলো শুঁড় দুলিয়ে আস্তে-আস্তে এগুতে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটি শুঁড় থেকে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসে।

AMARBOI.COM

ভয়ে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে যাবার মতো অবস্থা। সফদর আলীর হাত চেপে ধরে বললাম, এখন?

সফদর আলী ভাঙা গলায় বললেন, ঝামেলা হয়ে গেল।

ঝামেলা। ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরে না ফেলে আমাদের!

না, মারতে পারবে না, ভোল্টেজ বেশি হলেও পাওয়ার খুব কম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা চুলকে বললেন, সবগুলো যদি একসাথে আক্রমণ করে তাহলে অবশ্যি অন্য কথা।

সবগুলো তো একসাথেই আসছে। আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, হাতের রডটা দিয়ে দেন না কয়েকটা ঘা।

সফদর আলী লোহার রডটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, কাঠের হলে একটা কথা ছিল, এটা দিয়ে শক লেগে যাবে।

আমি বললাম, রুমাল দিয়ে ধরে নিন।

সফদর আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ঠিক বলেছেন। আমি আমার পকেট থেকে রুমালটা বের করে দিই, তিনি নিজেরটাও বের করে নেন। দুটি দিয়ে ভালো করে পেঁচিয়ে লোহার রডটা ধরে সফদর আলী এক পা এগিয়ে যান। গাছগুলো হঠাৎ থমকে

দাঁড়ায়। তারপর বেশিরভাগ সফদর আলীকে ঘিরে দাঁড়ায়। সফদর আলীও দাঁড়িয়ে পড়েন ভয়ে। একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে তিনি আরেকটু এগিয়ে যান, আর হঠাৎ গাছগুলো তার দিকে ছুটে আসে। আমি সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, ঠিক জ্যান্ত প্রাণীর মতো গাছগুলো সফদর আলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর চটাশ চটাশ করে সে কী ভয়ানক স্পার্ক! আমি শুনলাম, সফদর আলী একবার ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠে হাতের রডটা ঘুরিয়ে এক ঘা মেরে বসলেন। একটা গাছ মনে হল কাবু হয়ে গেল। অন্যগুলো কিন্তু হাল না ছেড়ে তার পিছনে লেগে থাকে।

আমার সম্বিৎ ফিরে আসতেই তাকিয়ে দেখি, সফদর আলীকে আক্রমণ করতে গিয়ে গাছগুলো খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, একটা লাফ দিলে হয়তো দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি। দেরি না করে খোদার নাম নিয়ে আমি একটা লাফ দিয়ে বসি, শেষবার লাফ দিয়েছিলাম সেই ছেলেবেলায়, কত দিনের অনভ্যাস, লুটোপুটি খেয়ে কোনোমতে দরজার কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লাম। উঠে দাঁড়াব, হঠাৎ অনুভব করলাম আমার পিছনে কী একটা যেন আছড়ে পড়ল, সাথে-সাথে কী ভয়ানক একটা ইলেকট্রিক শক! মনে হল পায়ের নখ থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত কেউ যেন ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। গোঙানোর মতো একটা শব্দ করে আরেক লাফ দিয়ে দরজার বাইরে এসে আছড়ে পড়লাম।

খানিকক্ষণ লাগল সোজা হয়ে দাঁড়াতে। গাছগুলো দরজা পার হয়ে এপাশে আসতে পারবে না। ছোট একটা কাঠের পার্টিশান আছে। গাছগাড়ির চাকা আটকে যাবে সেখানে।

ঘরের ভেতর থেকে সফদর আলীর আরেকটা চিৎকার শুনতে পেলাম। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কোমর চেপে বসে পড়তে হল, কোথায় জানি ভীষণ লেগেছে। সেই অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিই, সফদর আলী জানালা ধরে ঝুলে আছেন। গাছগুলো নিচে এসে জড়ো হয়ে শুঁড় দিয়ে তাঁকে ধরার চেষ্টা করছে। অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কতক্ষণ এভাবে ঝুলে থাকতে পারবেন? কিছু একটা করতে হয়, আমি এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে ব্যবহার করার মতো কিছু না পেয়ে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে এগিয়ে যাই। ভেতর থেকে সফদর আলী চিঁ চিঁ করে ডাকলেন, ইকবাল সাহেব।

কি?

দৌড়ে আধসের মাংস কিনে আনুন।

মাংস? কেন?

গাছগুলোকে খাওয়াতে হবে।

ততক্ষণ ঝুলে থাকতে পারবেন?

পারতে হবে, আপনি দৌড়ান।

আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়ালাম। আশেপাশে কোনো মাংসের দোকান নেই। একটা রেস্টুরেন্টে ম্যানেজারকে অনেক বুঝিয়ে রান্না করা হয় নি এরকম খানিকটা মাংস দ্বিগুণ দাম দিয়ে কিনে আবার দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে আসি।

সফদর আলী তখনো জানালা ধরে ঝুলে আছেন। আমাকে দেখে চিঁ চিঁ করে বললেন, এতক্ষণ লাগল! দরদাম না করলে কী হত?

আমি রেগে বললাম, কে বলল আমি দরদাম করছিলাম?

সফদর আলী চিঁ চিঁ করে বলেন, সবসময় তো করেন।

আমি রাগ এবং ব্যথা দুটিই চেপে রেখে বললাম, কী করব এখন মাংসগুলো?

ছুড়ে দিন গাছগুলোর দিকে।

আমি ছুড়ে দিলাম, ছড়িয়ে–ছিটিয়ে পড়ল মাংসগুলো। গাছগুলো ঘুরে গেল সাথে সাথে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মাংসের টুকরোগুলোর ওপর। বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে থাকে খানিকক্ষণ, তারপর চুপচাপ হয়ে যায়। গাছের পাতাগুলো আঁকড়ে ধরে মাংসের টুকরোগুলোকে।

সাবধানে জানালা থেকে নেমে আসেন সফদর আলী। গাছগুলো মাংস খেতে ব্যস্ত, তার দিকে ঘুরেও তাকাল না। সফদর আলীর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। কোনোমতে হেঁটে এসে একেবারে শুয়ে পড়েন মেঝেতে। আমি খুঁজে পেতে একটা খবরের কাগজ এনে তাঁকে বাতাস করতে থাকি। আমার নিজের অবস্থাও খারাপ। একটা চোখ আবার বুজে আসছে। কুনইয়ের কাছে কোথায় জানি ছাল উঠে গেছে। প্রচণ্ড জ্বালা করছে অনেকক্ষণ থেকে।

সফদর আলী চিঁ চিঁ করে বললেন, কাল থেকে সব গাছ মাটিতে। আর গাড়ি–ঘোড়া নয়—

আমি বললাম, কবি কি খামাখা বলেছেন—

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

গাছ থাকবে মাটির ওপর, গাড়িতে না ঘুরে।

সফদর আলী ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোন কবি লিখেছে এটা?

আমি উত্তর দেয়ার আগেই নিজেই বললেন, নিশ্চয়ই কবিগুরু। কবিগুরু ছাড়া এরকম খাঁটি জিনিস আর কে লিখবে?

সে–রাতে দু'হাতে ব্যান্ডেজ এবং বুজে যাওয়া চোখ নিয়ে যখন বাসায় ফিরে আসি, আমার মা দেখেই আঁৎকে ওঠেন। কী হয়েছে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলেন না। চোখে আঁচল দিয়ে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন, তোরা কে কোথায় আছিস দেখে যা, কী সর্বনাশ, ছেলে আবার গুণ্ডা পিটিয়ে এসেছে গো—

আমি এবারে প্রতিবাদ পর্যন্ত করলাম না। করে কী হবে?

পীরবাবা

আমাদের অফিসটি একটি বিচিত্র জায়গা। দিনে দিনে সেটি আরো বিচিত্র হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। একদিন সকালে অফিসে এসে দেখি সেকশন অফিসার ইদরিস সাহেব খালি গায়ে একটা ছোট হাফ প্যান্ট পরে ডান পা–টা নিজের ঘাড়ের ওপর তুলে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে একটা কৌতূহলী ছোট ভিড়। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম বড়

সাহেবের পিঠে ব্যথা শুনে ইদরিস সাহেব এই যোগাসনটি প্রেসক্রিপশান করেছেন, প্রতিদিন ভোরে আধঘন্টা করে করতে হবে। আরেক দিন দুপুরবেলা দেখি অফিসের মাঝখানে কেরোসিনের চুলোর ওপর একটা ডেকচিতে টগবগ করে পানি ফুটছে, সেখানে মাওলা সাহেব কী–সব গাছগাছড়া ছেড়ে দিচ্ছেন। সেটি থেকে কী একটা অব্যর্থ মলম তৈরি হবে। টাকমাথায় চুল গজাতে এই মলমের নাকি কোনো তুলনা নেই। মলমটি তৈরি হচ্ছে আমাদের বৃদ্ধ অ্যাকাউন্টেন্টের জন্যে। তাঁর মাথায় বিস্তৃত টাক এবং শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি আরেক বার বিয়ে করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। প্রতিদিন ভোরে অফিস শুরু হওয়ার আগে জলিল সাহেবের কাছে কেউ–না–কেউ আসবেই। তিনি স্বপ্নের অর্থ বলে দিতে পারেন। একদিন এসে দেখি আমাদের টাইপিস্ট মেয়েটি তাঁর সামনের চেয়ারে বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। সে নাকি স্বপ্নে দেখেছে তার মা সাপের কামড় খেয়ে মারা গেছে। জলিল সাহেব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, কাঁদার কিছু হয় নি মা, মৃত্যু স্বপ্ন হচ্ছে সুখস্বপ্ন। তোমার মায়ের হায়াত দশ বছর বেড়ে গেল। শুধু মনে করার চেষ্টা কর দেখি, সাপটা কি মদ্দা ছিল না মাদী সাপ ছিল?

বিচিত্র লোকজন নিয়ে বিচিত্র জায়গা এই অফিসটি। আমার বেশ লাগে। এর মধ্যে আমাদের সেকশন অফিসার মাওলা সাহেব একদিন এক পীরের মুরীদ হয়ে গেলেন। পীরের নাম হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরী। নামটা উচ্চারণ করার সময় গলার ভেতর থেকে আওয়াজ বের করতে হয়, আমি পাঁচ বার চেষ্টা করে মাওলা সাহেবের অনুমোদন পেলাম। মাওলা সাহেব আমাদের সামনে তাঁর পীরকে "শাহে হযরত" না হয় "হুজুরে বাবা" বলে সম্বোধন করেন। প্রথম সপ্তাহ আমাদের তাঁর কাছ থেকে শুধু চেহারার বর্ণনা শুনতে হল। ছয় ফুট উঁচু, নূরানী চেহারা, গায়ের রং ধবধবে সাদা। গালের কাছে নাকি একটু গোলাপি আভা। মসলিনের মতো সাদা দাড়ি বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাথায় সিল্কের পাগড়ি, পরনে সাদা আচকান, সাদা লুঙ্গি, পায়ে জরির জুতো। হুজুরের দাড়ি থেকে নাকি জ্যোতির মতো আলো ছড়ায়। গলার স্বর মধুর মতো মিঠা। যখন কথা বলেন তখন গলার স্বর শুনে "দিল" ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মুরীদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না। কেউ বলে পাঁচ লাখ, কেউ বলে দশ লাখ, আবার কেউ বলে মাত্র পঞ্চাশ। কারণ, খাঁটি নেকবন্দ লোক না হলে তিনি নাকি মুরীদ নেন না। হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরীর কথা বলতে বলতে মাওলা সাহেবের প্রত্যেক দিন অফিসের কাজ শুরু করতে দেরি হয়ে যায়।

প্রত্যেকদিন ভোরেই মাওলা সাহেবের কাছ থেকে আমরা হযরত শাহ্ কুতুবপুরীর খবরাখবর পেতে থাকি। একদিন শুনতে পেলাম, কোন কোম্পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার রুই মাছের মুড়ো খেতে গিয়ে গলায় কাঁটা বিধিয়ে ফেলেছেন। যন্ত্রণায় যখন কাটা মুরগির মতো ছটফট করছেন, তখন আত্মীয়স্বজন ধরাধরি করে শাহ্ কুতুবপুরীর কাছে নিয়ে এল। শাহ্ কুতুবপুরী গলায় হাত দিয়ে বললেন, কোথায় তোর মাছের কাঁটা? চিফ ইঞ্জিনিয়ার কথা বলতে গিয়ে কেশে ফেললেন। ছয় ইঞ্চি লম্বা মাছের কাঁটা বের হয়ে এল কাশির সাথে। বিশ্বাস না হলে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে গিয়ে দেখে আসা যায়। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বউ নাকি সেই কাঁটা ফ্রেম করে ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রেখেছেন।

মাছের কাঁটার গল্প পুরানো হওয়ার আগেই মাওলা সাহেব নতুন একটা ঘটনা

শুনিয়ে দেন। স্বামী বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে ছয় বছর আগে। স্ত্রীর আহার নেই, নিদ্রা নেই, শাহ্ কুতুবপুরীর পায়ে এসে পড়ল একদিন। বলল, বাবা, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেন। শাহ্ কুতুবপুরী বললেন, মা, হায়াত-মউত খোদার হাতে, তবে তোর স্বামী যদি জিন্দা থাকে, তাকে তুই দেখবি। শাহ্ কুতুবপুরী তখন চোখ বন্ধ করে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। মিনিটখানেক পর শুধু হুঁ-উ-উ-উ-উ-ক করে একটা হুঙ্কার শোনা যায়। দুই ঘন্টা পর চোখ খুললেন কুতুবপুরী। ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে। বললেন, যা, তোর কোনো ভয় নেই, তোর স্বামী জিন্দা আছে। এক কাফির তাকে জাদু করে রেখেছিল পাহাড়ের উপর, হুজুর তাকে জাদু কেটে মুক্ত করে দিয়েছেন। সে রওনা দিয়েছে এদিকে। কাল ভোরে এসে পৌঁছে যাবে। পরদিন লোকে লোকারণ্য, তার মাঝে দেখা গেল ছয় বছর পর স্বামী ফিরে আসছে। বড় বড় চুল, বড় বড় দাড়ি, বড়-বড় নখ। নাপিত চুল-দাড়ি কেটে দিতেই আগের চেহারা।

মাওলা সাহেব নিজের চোখে দেখেন নি, কিন্তু হুজুরের বড় সাগরেদের কাছে শোনা, ফিরিশতার মতো লোক, তাঁকে অবিশ্বাস করেন কেমন করে?

বেশ চলছিল এভাবে, কিন্তু আস্তে-আস্তে গোলমাল বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হল। ব্যাপারটি শুরু হল এভাবে, মাওলা সাহেবের দৈনন্দিন বক্তৃতা শুনে শুনে আমাদের ছোট কেরানি আকমল সাহেব একদিন শাহ্ কুতুবপুরীর মুরীদ হয়ে গেলেন। পীরের মুরীদ হওয়ার অনেক সুবিধে, পীর নাকি তখন পরকালের বড় বড় দায়িত্বগুলো নিয়ে নেন। আকমল সাহেবের জন্যে এটা কল্পনার বাইরে, তিনি এমন নিষ্কর্মা মানুষ যে, পরকাল দূরে থাকুক, ইহকালের কোনো দায়িত্ব তাঁকে দেয়া যায় না। দুষ্টু লোকেরা বলে, আকমল সাহেব নাকি প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সিকি-আধুলি পর্যন্ত ঘুষ হিসেবে নিয়ে নেন। আকমল সাহেব মুরীদ হওয়ার পর অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। তাঁর দেখাদেখি আরো কয়েকজন শাহ্ কুতুবপুরীর মুরীদ হয়ে গেলেন। অফিসে এখন বেশ জমজমাট একটা ধর্মীয় ভাব। পীরের দরবারের উরশ, ওয়াজ এবং মিলাদ-মাহফিলের খবরাখবর আমরা সকাল-বিকাল পেতে থাকি। পীরের মুরীদেরা তখন বেশ একটা সংঘবদ্ধ দল একসাথে বসে হুজুরে বাবার নামমাহাত্ম্য নিয়ে আহা-উহু করতে থাকেন।

যাঁরা যাঁরা তখনো পীরের মুরীদ হয়ে যান নি, তাঁদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করার জন্যে ভক্ত মুরীদেরা নানারকম চেষ্টাচরিত্র করতে থাকেন। আমাদের হেড ক্লার্ককে সে প্রসঙ্গে একদিন একটু অনুরোধ করতেই ঝামেলার সূত্রপাত। ঘটনাটি এরকম : আকমল সাহেব দুপুরে টিফিন খাবার পর হেড ক্লার্ক আজিজ খাঁকে একা একা পেয়ে বললেন, আজিজ সাহেব, এ জীবন আর কয়দিনের?

আজিজ সাহেব বললেন, অনেকদিনের। কম হলে তো বেঁচেই যেতাম।

আকমল সাহেব না শোনার ভান করে বললেন, এখন যদি আল্লাহ্র দিকে না যাই তাহলে কখন যাব?

আজিজ সাহেব বললেন, যাচ্ছেন না কেন? কে আপনাকে নিষেধ করছে?

আপনারা যদি আসেন জোর পাই বুকে।

আজিজ সাহেব লাল হয়ে মেঘস্বরে বললেন, কী করতে হবে আমাকে?

যদি শাহ্ কুতুবপুরীর মুরীদ হয়ে যান, আমরা মুরীদ ভাইয়েরা—

আকমল সাহেব কথা শেষ করতে পারলেন না, আজিজ খাঁ তার আগেই একেবারে ফেটে পড়লেন, ঐসব কুতুবপুরী সম্বুন্ধীপুরী আমার কাছে আনবেন না। ভণ্ড চালবাজের দল, আপনার কুতুবপুরীর দাড়ি দিয়ে আমার হুজুর পা পর্যন্ত মুছবেন না।

কথা শেষ হওয়ার আগেই লিকলিকে শরীর নিয়ে আকমল সাহেব আজিজ খাঁয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রচণ্ড হাতাহাতি শুরু হওয়ার অবস্থা, আমরা টেনে সরিয়ে রাখতে পারি না।

সেই থেকে আকমল সাহেব আর আজিজ খাঁয়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কিন্তু খবর ছড়িয়ে গেল দ্রুত। আজিজ খাঁয়ের মতো লোকেরও নিজের পীর আছে। শুধু তাই নয়, সেই পীর নাকি হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরীর দাড়ি দিয়ে পা পর্যন্ত মোছেন না। লোকজন খবর নিতে আসে। স্বল্পভাষী আজিজ খাঁ বলবেন না বলবেন না করেও একটা দুটো কথা বলে ফেলেন। শুনে সবার ভিরমি লেগে যায়। একটি গল্প এরকম : আঠার বছরের মেয়েকে নিয়ে মা এসেছেন পীরের কাছে। দুই বছর থেকে সেই মেয়ের ওপর জিনের আছর। মেয়ে পীরকে দেখে আর এগুতে চায় না, কারণ সহজ, মেয়ে তো আসলে মেয়ে নয়, তাকে চালাচ্ছে এক কাফির জিন, জিনদের ভেতরেও নামাজী এবং কাফির জিন আছে। পীর খালি একবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর এক হাত সূতা নিয়ে বসলেন। একটা করে সূরা পড়েন আর সূতায় একটা করে গিঁট দেন, সাথে সাথে জিনের সে কী চিৎকার! বলে, বাবাগো, মাগো, ছেড়ে দাও, সুলায়মান পয়গম্বরের কসম আমাকে ছেড়ে দাও। পীর বললেন, শালার ব্যাটা, তুই এখনি দূর হয়ে যা। তখন জিন আর যেতে চায় না, হুজুরের সাথে তখন কী ভয়ংকর ঝগড়া! কিন্তু হুজুরের সাথে পারবে সে সাধ্যি কার আছে? শেষ পর্যন্ত জিন যেতে রাজি হল। হুজুর বললেন, যাওয়ার আগে একটা চিহ্ন দিয়ে যা। জিন জিজ্ঞেস করল, কী চিহ্ন দিয়ে যাব? হুজুর বললেন, দরবারের সামনে আমগাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে দিয়ে যা। মুহূর্তে মেয়ে চোখ খুলে তাকায়, আর ঝড় নেই বৃষ্টি নেই মড়মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। আজিজ খাঁ শুধু গল্প বলেই ক্ষান্ত হলেন না, ঘোষণা করলেন যারা যারা ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে চায় সামনের শুক্রবার তাদের নিয়ে যাবেন, নিজের চোখে সেই আমগাছের ভাঙা ডাল দেখে আসবে।

পরের সপ্তাহে বেশ কয়জন আজিজ খাঁর সাথে পীরের দরবার থেকে ঘুরে এলেন। আজিজ খাঁয়ের গল্পে কোনো মিথ্যা নেই। সত্যি সত্যি দরবারের সামনে আমগাছের ভাঙা ডাল। তখন–তখনি কয়েকজন সেই পীরের মুরীদ হয়ে গেল।

এরপর অফিস দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরীর মুরীদেরা এবং হযরত মাওলানা নূরে নাওয়াজ নকশবন্দীর মুরীদেরা। আমরা কয়েকজন কোনো দলেই নেই এবং আমাদের হল সবচেয়ে বিপদ। দু'দলের ওয়াজ–নসীহত, উরশ এবং মিলাদের চাঁদা দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাবার মতো অবস্থা। এক দলকে পাঁচ টাকা চাঁদা দিলে আরেক দল দশ টাকা না নিয়ে ছাড়ে না, তখন আবার প্রথম দল এসে আরো পাঁচ টাকা নিয়ে সমান সমান করে দেয়। চাঁদা না দিয়ে উপায় নেই। এক দুই মিনিট অনুরোধ করেই হুমকি দেয়া শুরু হয়ে যায়। দেখে–শুনে মনে হল সবকিছু ছেড়েছুড়ে নিজেই পীর হয়ে যাই। পীর যদি হতে না পারি, অন্তত ধর্মটা পাল্টে ফেলি। অফিসে এক জন বৌদ্ধ কেরানি আছে, দিলীপকুমার বড়ুয়া, তাকে কেউ কখনো

বিরক্ত করে না।

সেদিন সফদর আলীর সাথে চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে পীরের উপদ্রব নিয়ে কথা হচ্ছিল। কী ভাবে দুই পীরের ভক্তেরা দলাদলি শুরু করেছেন এবং দুই দলের টানাটানিতে আমাদের কী ভাবে দম বের হয়ে যাচ্ছে, সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম।

সব শুনেটুনেও সফদর আলী ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না, জিজ্ঞেস করলেন, পীরদের কি কোনো পরীক্ষা পাস করতে হয়?

আমি হাসি গোপন করে বললাম, না।

তাহলে আপনি বুঝবেন কেমন করে যে সে পীর?

ব্যাপারটা হচ্ছে বিশ্বাস।

তাহলে আপনি কেন একজনকে বিশ্বাস করবেন, আরেকজনকে অবিশ্বাস করবেন?

আমাকে তখন সফদর আলীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে হয়। বিশ্বাস অর্জনের জন্যে সবসময়েই পীরদের সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনী ছড়ানো হয়। সাধারণ মানুষের অনেক সমস্যা থাকে, অলৌকিক জিনিস বিশ্বাস করতে তাদের এতটুকু দেরি হয় না। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই অলৌকিক ঘটনাগুলো কখনো কেউ যাচাই করার চেষ্টা করে না। আমি এখন পর্যন্ত একটি মানুষকেও পাই নি যে বলেছে সে নিজে একটি অলৌকিক ঘটনা দেখেছে। সবসময়েই শোনা ঘটনা, ওমুকের বড় ভাইয়ের শালা বলেছেন, ওমুকের ভায়রা ভাই নিজের চোখে দেখেছেন। ওমুক অফিসের বড় সাহেব করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এক জন দু'জন যে নিজের চোখে দেখেছেন বলে দাবি করেন নি তা নয়। কিন্তু চেপে ধরার পর সবসময়েই দেখা গেছে হয় মিথ্যে না হয় অতিরঞ্জন। একবার দুবার নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে আমি পীরদের কাছে গিয়েছি। কিন্তু সময় এবং পয়সা নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো লাভ হয় নি।

সফদর আলীর তখনো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় না, মাথা চুলকে বললেন, তাহলে এক জন মানুষ কেন পীর হয়ে যায়?

পীরদের বাড়ি দেখেছেন কখনো?

না।

দেখলে আপনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন, পাকা দালান, ফ্রিজ, টেলিভিশন ছাড়া পীর নেই। পীরদের চেহারা দেখলে আপনি বোকা বনে যাবেন, দুধ–ঘি খেয়ে একেকজনের অন্তত আড়াই মণ ওজন এবং গায়ের রঙ গোলাপি। এই বাজারে এত আরামে কয়জন থাকতে পারে? একবার একটা ভালো পীর যদি হয়ে যেতে পারেন, কয়জন বড় পুলিশ, আর্মি অফিসারকে মুরীদ করে নিতে পারেন, আর কোনো চিন্তা নেই।

সফদর আলী চিন্তিত মুখে চুপ করে খানিকক্ষণ কী একটা ভাবলেন, তারপর বললেন, তার মানে যত পীর দেখা যায় সবাই আসলে দুষ্টু লোক?

তা নির্ভর করে আপনি দুষ্টু লোক বলতে কী বোঝান তার ওপর। তবে হ্যাঁ, যারা লোক ঠকায় তারা দুষ্টু লোক ছাড়া আবার কী?

সবাই লোক ঠকায়?

আপনি কোনো গরিব পীর দেখেছেন? দেখেন নি—কারণ গরিব পীর নেই। যে-পীরের যত নামডাক সেই পীরের তত বেশি টাকাপয়সা, টাকাপয়সাটা আসে কোথা থেকে? পীরদের কখনো তো চাকরিবাকরি করতে দেখি না।

তার মানে আসলে সত্যিকার কোনো পীর নেই?

নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তারা কখনো চাইবে না লোকজন তাদের কথা জেনে ফেলুক, কাজেই তাদের দেখা পাওয়া মুশকিল।

সফদর আলী চিন্তিত মুখে চুপ করে থাকেন।

সৌভাগ্যক্রমে অফিসে পীরসংক্রান্ত উচ্ছ্বাস চরমে ওঠে, তারপর আস্তে আস্তে ভাটা পড়তে শুরু করে। সবকিছুরই এরকম নিয়ম, এক জিনিস নিয়ে আর কত দিন থাকা যায়? যারা পীরদের কাছে যায় সবারই কোনো-না-কোনো সমস্যা থাকে, প্রথম প্রথম তাদের প্রবল বিশ্বাস থাকে যে পীর তাদের সমস্যার সমাধান করে দেবেন। পীর কখনোই সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। তীব্র বিশ্বাস নিয়ে তবু মুরীদেরা কিছুদিন ঝুলে থাকে। তারপর একসময় উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ে আসে। এবারেও তাই, আমি দেখতে পাই হযরত খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরী এবং হযরত নূরে নাওয়াজ নকশবন্দীর মুরীদদের উচ্ছ্বাস আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তাই একদিন ভোরে অফিসে এসে যখন দেখতে পাই যোগ ব্যায়ামের মাহাত্ম্য দেখানোর জন্যে সেকশান অফিসার ইদরিস সাহেব ছোট একটা হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে মেঝেতে শুয়ে আছেন, আর লিকলিকে আকমল সাহেব তাঁর পেটের ওপর খালি পায়ে লাফাচ্ছেন, আমার বেশ ভালোই লাগল। পীর-ফকিরের ওপর অন্ধবিশ্বাস থেকে কোনো একটা কিছু প্রমাণ করার জন্যে হাতে-কলমে চেষ্টা করা অনেক ভালো।

ধীরে ধীরে অফিসটা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছিল, মোহররমের মাসটা পর্যন্ত চাঁদা না দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম কিন্তু তার মাঝে গোলমাল বেধে গেল, সত্যি কথা বলতে কি বেশ বড় গোলমাল। একদিন ভোরে অফিসে এসে দেখি টাইপিস্ট সুলতান সাহেবের টেবিল ঘিরে একটা ভিড়। ভিড় দেখলে আমি যোগ না দিয়ে পারি না। এবারেও ভিড়ে গেলাম। সুলতান সাহেব এক জন নতুন পীরের খোঁজ এনেছেন। এই পীরের অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুলতান সাহেবের বড় ভাই নিজের চোখে দেখে এসেছেন। এই পীর নাকি জিকির করতে-করতে একসময় বেহুঁশ হয়ে পড়েন। তাঁর আত্মা তখন উচ্চমার্গে চলে যায় এবং সারা শরীর থেকে চল্লিশ ওয়াট বাল্‌বের মতো আলো বের হতে থাকে। এরকম অবস্থায় তিনি সবরকম ব্যথা-বেদনার উর্ধ্বে চলে যান, তখন তাঁকে আগুনের উপর ফেলে দিলে তিনি টের পান না। চাকু দিয়ে আঘাত করলে চাকু পিছলে যায়। দা দিয়ে কোপ দিলে দা ছিটকে আসে—তাঁর কিছু হয় না। আধঘন্টা তাঁকে আগুনের ভেতর ফেলে রাখা হয়েছিল। যখন আগুন নিভে গেল, দেখা গেল চোখ বন্ধ করে মুখে হাসি নিয়ে জিকির করছেন।

সুলতান সাহেবের গল্প শেষ হতেই সবাই আমার মুখের দিকে তাকায়। এত দিনে সবাই জেনে গেছে আমি অবিশ্বাসী। ওয়ালী সাহেব বলেন, কিন্তু আপনি যে সবসময় অবিশ্বাস করেন, এখন কী বলবেন?

আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, ওসব গালগল্পে কান দেবেন না। সুলতান সাহেব যদি নিজের চোখে দেখে আসতেন, তবু একটা কথা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতান সাহেব রেগে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, তার মানে আপনি বলতে চান আমার বড় ভাই মিথ্যা কথা বলেছেন?

ঝগড়া লেগে যাবার মতো অবস্থা, আমি তাড়াতাড়ি নিজের টেবিলে ফিরে আসি।

পরদিন ভোরে অফিসে ঢোকার আগেই সবাই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুলতান সাহেব সবার আগে। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, এখন কী বলবেন?

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?

বলছিলেন আমার ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করেন না, এখন কী বলবেন? কাল আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

আমি সত্যি সত্যি অবাক হলাম, এসব অলৌকিক জিনিস কেউ নিজের চোখে দেখে এসেছে, সেরকম ঘটনা বিরল। জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখেছেন?

সুলতান সাহেব উৎসাহে টগবগ করতে থাকেন, আপনাদের মতো অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করল কি না করল তাতে কী আসে যায়? কিছু আসে যায় না।

আমি বললাম, তবু শুনি।

আমি গিয়েছি সন্ধ্যার পর, হাজার লোক, তার সামনে বসে হুজুর জিকির করছেন। এক ঘন্টা জিকির করলেন, তারপর, হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। হাত-পা থরথর করে কাঁপতে থাকে—দশজন মিলে ধরে রাখা যায় না। চোখে-মুখে কেমন একটা আলো আলো ভাব। কোনোরকম ব্যথা-বেদনা নেই—কথা বলতে-বলতে সুলতান সাহেবের চোখ-মুখ থেকেই কেমন একটা আলো বের হতে থাকে।

আমি মাথা চুলকে বললাম, কী ভাবে বুঝলেন, ব্যথা-বেদনা নেই?

সুলতান সাহেবের মুখ আমার প্রতি অবজ্ঞায় বেঁকে যায়। মুখটা বাঁকা রেখেই বললেন, নিজের চোখে দেখুন এবার, ভাইয়ের কথা তো বিশ্বাস করলেন না, ফিরিশতার মতো বড় ভাই আমার। যখন হুজুর বেহুঁশ হয়ে গেলেন তখন একটা বড় চৌকি আনা হল। চৌকির ওপরে কী জানেন?

কি?

পেরেক। ছয় ইঞ্চি পেরেক। খাড়া হয়ে আছে—একটা নয়, দুইটা নয়, শত শত পেরেক, দেখলে ভয়ে দম বন্ধ হয়ে যায়। হুজুরের সাগরেদরা হুজুরকে তুলে এনে সেই পেরেকের উপর ফেলে দিলে ভয়ে আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। মনে হল চোখ খুললে দেখব শরীরটা মোরব্বার মতো গেঁথে গেছে পেরেকে। রক্তারক্তি ব্যাপার। ভয়ে-ভয়ে চোখ খুলেছি, কী দেখলাম জানেন?

সবাই এর মাঝে কয়েকবার গল্পটা শুনেছে, তবু উৎসাহের অভাব নেই, কয়েকজন একসাথে জিজ্ঞেস করলেন, কি?

দেখলাম হুজুর খাড়া পেরেকের উপর ভেসে আছেন, চোখ বন্ধ। কিন্তু মুখে হাসি। পেরেকের বিছানা না, যেন গদির বিছানা।

আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

সুলতান সাহেব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাসলেন, কী বলছি এতক্ষণ? নিজের চোখে দুই হাত দূরে বসে দেখেছি। দুই হাতের এক ইঞ্চি বেশি নয়।

আজিজ খাঁ বললেন, গল্পটা শেষ করেন, আসল ব্যাপারটাই তো এখনো বললেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

সুলতান সাহেব মুখে একটা আলগা গাম্ভীর্য নিয়ে এলেন, অবিশ্বাসী মানুষকে বলে লাভ কি? যার বিশ্বাস হবে না, খোদা তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও বিশ্বাস হবে না।

তবু বলেন।

সুলতান সাহেব আমার দিকে তাকালেন, শুনতে চান?

বলেন, শুনি।

শোনেন তাহলে। যখন দেখলাম হুজুর সেই পেরেকের বিছানায় শুয়ে আছেন, আমার তখন হুজুরের ক্ষমতার উপরে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার মতো একজন দু'জন মানুষ কি আর নেই? তাদের ভেতরে তো সন্দেহ থাকে। তাদের সন্দেহ মেটানোর জন্যে এক জন সাগরেদ একটা বড় তক্তা নিয়ে এসে হুজুরের বুকের উপর রাখলেন। তক্তার উপরে রাখলেন দুইটা থান ইট, দেখে ভয়ে তো আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়! ঘটনাটা মনে করে সুলতান সাহেব সত্যি দম বন্ধ করে ফেললেন।

বলুন, বলুন, অন্যেরা সুলতান সাহেবকে থামতে দেন না।

হুজুরের বুকের উপর ইট রেখে সাগরেদ নিয়ে এল একটা মস্ত হাতুড়ি। কিছু বোঝার আগে হাতুড়ি তুলে দিল হুজুরের বুকে প্রচণ্ড এক ঘা। ইট দুইটা ভেঙে টুকরা-টুকরা, হুজুর কিছু জানেন না, চোখ বন্ধ করে জিকির করে যাচ্ছেন।

সমবেত শ্রোতাদের বুকের ভেতর থেকে আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে। সুলতান সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন আপনি কী বলতে চান?

মাথা চুলকে বললাম, নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত—

তার মানে আপনি বলতে চান আমি মিথ্যা কথা বলছি?

না না, তা বলছি না। যেহেতু আপনার এত বিশ্বাস, হয়তো অনেক খুঁটিনাটি জিনিস আপনার চোখে পড়ে নি, নিজের চোখে দেখলে বুঝতে পারব।

মাওলা সাহেব বললেন, তার মানে আপনি বলছেন এটা বুজরুকি?

নিজে না দেখে কিছু বলব না। অবিশ্বাস্য জিনিস দেখলেই সেটা বিশ্বাস করা ঠিক না। ম্যাজিশিয়ানরা মানুষ কেটে জোড়া লাগিয়ে ফেলে। তার মানে কি ম্যাজিশিয়ানরা পীর?

অফিসের সবাই এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যে, তাদের ভেতর যদি বিন্দুমাত্র ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকত, আমি ভস্ম হয়ে যেতাম!

পরের কয়দিন আমি নিয়মিত সেই পীরের আস্তানায় যাওয়া শুরু করলাম। অবিশ্বাস্য হলেও সুলতান সাহেব এতটুকু বাড়িয়ে বলেন নি। সত্যি সত্যি সেই পীর সুচালো পেরেকের উপরে শুয়ে থাকেন। সাগরেদরা বুকে থান ইট ভেঙে টুকরা-টুকরা করে ফেলেন, পীরের কোনোরকম অসুবিধে হয় না। শুধু তাই নয়, একদিন দেখি বড় বড় কাঠের টুকরা পুড়িয়ে গনগনে আগুন করা হল, সাগরেদরা কোনোভাবে সেই পীরকে আগুনের উপর দাঁড় করিয়ে দিল, পীর খালিপায়ে ঐ আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন, অবিশ্বাস্য ব্যাপার, নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। অনেকের সাথে সাথে আমিও পীরের পায়ের তলা দেখে এসেছি, ফোস্কা দূরে থাকুক, একটু চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দেখে শুনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও হতবাক হয়ে যাই, বিশ্বাসও প্রায় করে ফেলেছিলাম, কিন্তু শেষ অংশটুকু এখনো কোথায় জানি সন্দেহ জাগিয়ে রেখেছে। প্রতি রাতের একই ব্যাপার। সবকিছু শেষ হয়ে গেলে পীর আধা বেহুঁশ হয়ে একটা গদিতে পড়ে থাকেন, তখন ভক্তেরা একে একে আসতে থাকে, পীর বাবার পা ধরে নিজেদের দুঃখ–কষ্ট–সমস্যার কথা বলে যায়। পীর বাবা কাউকে একটা লাথি দেন, কাউকে একটু চাল পড়া দেন, কাউকে এক টুকরো কয়লা, আবার কারো জন্যে একটু দোয়া করে দেন। ভক্তেরা হুজুরের পায়ের কাছে বড় গামলাতে সামর্থ্যমতো টাকাপয়সা ফেলে যায়। হুজুর এবং তাঁর সাগরেদরা আড়চোখে দেখেন কে কত টাকা দিল। টাকার অঙ্ক বেশি হলেই তাদের মুখের হাসিটি বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভক্তের খাতির–যত্নও হয় বেশি, পীর বাবা লাথি না দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। দেখতে–দেখতে গামলা ভরে ওঠে টাকায়। প্রতি রাতে অন্তত হাজারখানেক টাকা কিংবা আরো বেশি। এইখানেই আমার সন্দেহ, ঐশ্বরিক ব্যাপারের সাথে সাথে টাকাপয়সার ব্যাপারটি ঠিক খাপ খায় না—সত্যিকারের সিদ্ধপুরুষের টাকাপয়সার কী দরকার?

অফিসে যারা হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরী এবং হযরত নূরে নাওয়াজ নকশবন্দীর মুরীদ ছিলেন, তাঁরা সবাই এখন এই নতুন পীর হামলা বাবা বিক্রমপুরীর মুরীদ হয়ে গেলেন। সুলতান সাহেবের দীর্ঘদিন থেকে অম্বলের ভাব, সেদিন পীর সাহেবের চাল–পড়া খাবার পর থেকে নাকি চোঁকা ঢেকুরের সংখ্যা অর্ধেকের বেশি কমে গেছে। মাওলা সাহেবের পিঠে ব্যথা, সেদিন হামলাবাবার একটা লাথি খাওয়ার পর থেকে ব্যথার কোনো চিহ্ন নেই। আজিজ মিয়ের ছোট ছেলের হুপিং কাশ, বাবার তেল–পড়া বুকে মাখিয়ে দেয়ার পর থেকে কাশির কোনো চিহ্ন নেই। প্রতিদিনই এরকম নতুন নতুন ঘটনা শুনতে থাকি, এবারে আর শোনা ঘটনা নয়, সব চাক্ষুষ ঘটনা। অফিসের বিশ্বাসী লোকজনের খোঁচায় আমার অফিসে কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। অবস্থাচক্রে মনে হয় আর কয়দিন দেখে–শুনে আমিও হয়তো হামলা বাবার পা চেপে ধরে মুরীদ হয়ে যাব।

চায়ের দোকানে সফদর আলীর সাথে আমি সে কথাটাই বলছিলাম। অলৌকিক কিছু হতে পারে না, আজীবন বিশ্বাস করে এসেছি, এখন হঠাৎ চোখের সামনে এরকম অবিশ্বাস্য জিনিস দেখে মানুষের ক্ষমতাকে অবিশ্বাস করি কেমন করে? হয়তো সুলতান সাহেবের কথাই ঠিক, মানুষ হয়তো দীর্ঘদিন তপস্যা করে সত্যি সত্যি অলৌকিক শক্তি অর্জন করে ফেলে।

আমি সফদর আলীকে সবকিছু খুলে বললাম, শুনে তিনি খুব অবাক হলেন বলে মনে হল না। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, যে চৌকিতে তাকে শোওয়ানো হয় সেখানে পেরেকের সংখ্যা কত?

অনেক, গুনে তো দেখি নি!

তবু, আন্দাজ?

এক আঙুল পরপর হবে, পাঁচ ছয় শ' কী এক হাজার।

সফদর আলী মাথা নেড়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে কী একটা হিসেব করলেন। তারপর মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, পীর সাহেবের বুকের উপর যে–ইটটাকে হাতুড়ি দিয়ে মারা হয়, সেটা ভেঙে যায় তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ।

কয় টুকরা হয়?

অনেক, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়।

সফদর আলী আরো কিছুক্ষণ কী একটা হিসেব করে বললেন, যখন গনগনে কয়লার উপর দিয়ে হাঁটে, তখন কি আস্তে আস্তে হাঁটে না তাড়াতাড়ি?

তাড়াতাড়ি, বেশ তাড়াতাড়ি।

হাঁটার আগে কি পা পানিতে ভিজিয়ে নেয়?

আমি মাথা চুলকে মনে করার চেষ্টা করি। পা ভিজিয়ে নেয়ার কথা মনে নেই, কিন্তু মনে হল সাগরেদরা তাকে ওজু করিয়ে দেয়। শুনে সফদর আলী একটু হাসলেন, পকেট থেকে কী একটা ছোট বই বের করে সেখান থেকে কী সব টুকে নিয়ে কী একটা হিসেব করে হঠাৎ খিকখিক করে হাসতে থাকেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

ব্যাটা এক নম্বর চোর।

কে?

আপনার পীর বাবা।

কেন?

এই দেখেন। সফদর আলী তাঁর নোটবইটা দেখালেন, সেখানে অনেকরকম হিসেব, নিচে এক জায়গায় লেখা, (২০০ + ১০০০) × ২ = চোর (৬০০ + ১০,০০০) + ১০০ =মহাচোর।

আমি খানিকক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থাকি। এরকম অঙ্ক কষে চোর মহাচোর বের করতে দেখা এই প্রথম। সফদর আলীর দিকে অবাক হয়ে তাকাতেই তিনি বললেন, বুঝতে পারলেন না? ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিই।

সফদর আলীর বেশ কিছুক্ষণ লাগল আমাকে বোঝাতে। মাথাটা বরাবরই আমার একটু মোটা। এসব জিনিস বুঝতে আমার একটু সময় লাগে। কিন্তু এক বার বুঝিয়ে দেয়ার পর আমারও কোনো সন্দেহ থাকে না যে, পীর বাবা আসলে একটা চোর ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যাপারটি এরকম, এক জন মানুষের ওজন খুব বেশি হলে হয়তো দেড় শ' পাউন্ড হয়, আমাদের পীর বাবার কথা অবশ্যি আলাদা। ঘি–মাখন খেয়ে দু' শ' পাউন্ডের এক ছটাক কম নয়। তিনি যখন সুচালো পেরেকের বিছানার উপর শুয়ে থাকেন, তখন এই পুরো ওজনটি প্রায় হাজার খানেক পেরেকের উপর ভাগ হয়ে যায়। পুরো ওজনটি যদি একটি মাত্র পেরেকের ওপর দেয়া হত, পেরেকটি সাথে সাথে শরীর ফুটো করে ঢুকে যেত, কিন্তু সেটি কখনো করা হয় না। হাজারখানেক সুচালো পেরেককে দেখতে ভয় লাগে ঠিকই, কিন্তু একেকটি পেরেকে মাত্র কয়েক আউন্স করে চাপ পড়ে। সেটি কিছুই নয়। যে কোনো মানুষ একটি পেরেকের মাথায় কয়েক আউন্সের চাপ সহ্য করতে পারে, এমনকি ঘি–দুধ–খাওয়া পীরসাহেব পর্যন্ত। বুকের উপর থান ইট ভেঙে ফেলা ব্যাপারটি শুধু দেখতেই ভয়ংকর, আসলে কিছু না, হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরে যেটুকু শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তার বেশিরভাগই খরচ হয়ে যায় ইটটাকে ভাঙতে। বাকিটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে পেরেকের উপরে চাপ আরো আউন্সখানেক বাড়িয়ে দেয়, সেটা এমন কিছু নয়। গনগনে কয়লার উপরে হাঁটা

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটা একটু জটিল, একটু বিপজ্জনকও। জ্বলন্ত কয়লার তাপমাত্রা ছয় সাত শ' ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সেটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে জিনিসটা কয়লা। কয়লার ওজন কম। কাজেই এর তাপ ধারণ করার ক্ষমতাও কম। কাজেই কেউ যদি জ্বলন্ত কয়লার উপরে চাপ দেয়, খুব বেশি তাপ পায়ে এসে পৌছাতে পারে না। কয়লা পা-কে পোড়ানোর আগেই পা কয়লাকে ঠাণ্ডা করে দেয়। কয়লার ভিতরের তাপ পা পর্যন্ত পৌছুতে একটু সময় লাগে, কিন্তু খুব দ্রুত হেঁটে গিয়ে সেই সময়টুকুও কয়লাকে দেয়া হয় না। তা ছাড়া যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে পা পানিতে ভিজিয়ে নেয়া। তাই যখন জ্বলন্ত কয়লায় পা দেয়া হয়, পায়ের তলার পানি বাষ্পীভূত হয়ে পায়ের তলায় বাষ্পের একটা খুব সূক্ষ্ম আস্তরণ তৈরি করে ফেলে। বাষ্পের আস্তরণ, সেটা যত সূক্ষ্মই হোক, তার ভিতর দিয়ে তাপ খুব ভালোভাবে যেতে পারে না। সফদর আলী ব্যাপারটাকে হাতে-কলমে দেখালেন। চায়ের দোকানের দোকানি তখন সিঙাড়া ভাজার জন্যে কড়াইটা গরম করছিল, বেশ গনগনে গরম কড়াই, সফদর আলী তার উপর কয়েক ফোঁটা পানি ফেলে দিলেন। সেগুলো সাথে সাথে বাষ্পীভূত না হয়ে খানিকক্ষণ কড়াইয়ের উপর দৌড়ে বেড়াল। পানির ফোঁটার নিচে বাষ্প, তাপ সেই বাষ্পের আস্তরণ ভেদ করে পানিতে পৌছাতে পারছে না বলে পানি বাষ্পীভূত হচ্ছে না। ভারি মজার ব্যাপার।

সফদর আলীর ব্যাখ্যা শুনে আমার আনন্দে নাচতে ইচ্ছা করে, সারা জীবন বিশ্বাস করে এসেছি পৃথিবীতে অলৌকিক বা ব্যাখ্যার অতীত কিছু নেই। সেই বিশ্বাস ছেড়ে দিতে হলে খুব দুঃখের ব্যাপার হত। আমার আনন্দের বড় কারণটা অবশ্যি অন্য একটি ব্যাপার। সফদর আলীর এরকম বিজ্ঞানী মাথা, তিনি যখন এত সহজে ব্যাপারটি ধরে ফেলতে পারলেন, আরো সহজে হয়তো এমন একটা বুদ্ধি বের করতে পারবেন যে জোচ্চোর পীরকে হাতেনাতে ধরে ফেলা যাবে।

সফদর আলীকে সে কথাটি বলতেই তিনি প্রায় আঁৎকে উঠলেন। বললেন, না না না, সে কী করে হয়?

কেন?

বয়স্ক একটা মানুষকে এভাবে লজ্জা দেয়া ঠিক না।

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, ব্যাটা জোচ্চোর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দশজন নিরীহ মানুষের মাথা ভেঙে খাচ্ছে, সেটা দোষ নয়, আর তাকে ধরিয়ে দেয়া দোষ?

সফদর আলী প্রবল বেগে মাথা নাড়েন, তাই বলে বয়স্ক এক জন মানুষকে এভাবে লজ্জা দেবেন? সে কী করে হয়?

আমার অনেকক্ষণ লাগল সফদর আলীকে বোঝাতে যে, ব্যাপারটিতে কোনোরকম দোষ নেই, যদি তাকে ধরিয়ে না দেয়া হয় সে সারা জীবন সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে যাবে। প্রায় আধা ঘন্টা বোঝানোর পর তিনি রাজি হলেন। কী করে তার জোচ্চুরি ধরা হবে চিন্তা করে বের করতে তাঁর এক মিনিট সময়ও লাগল না। ব্যাপারটি এত সহজ যে আমি প্রথম বার শুনেই বুঝে ফেললাম। জোচ্চোর পীরের কী দুর্গতি হবে চিন্তা করে সফদর আলী আর হাসি থামাতে পারেন না। তিনি পারলে তখন-তখনি পীরের আস্তানায় রওনা দিয়ে দেন। আমি অনেক কষ্টে তাঁকে থামিয়ে রাখলাম, জোচ্চোরকে ধরার আগে একটু প্রস্তুতি দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের দুদিন আমার প্রস্তুতি নিতেই কেটে গেল। প্রথম প্রস্তুতি পীর বাবার আস্তানায়। পীরের বড় সাগরেদের সাথে একটু কথাবার্তা বলতে হবে। গত কয়েকদিন থেকে লক্ষ করছে আমি একেবারে সামনে এসে বসে আছি, কিন্তু কখনোই একটা পয়সাও পীর বাবার গামলাতে ফেলছি না। আজ আমাকে দেখেই তাই ভুরু কুঁচকে ফেলল, আমি আড়ালে ডেকে নিয়ে সরাসরি কাজের কথায় চলে এলাম। বললাম, আমি এক জন আলু ব্যবসায়ীর ম্যানেজার। আমার ব্যবসায়ী কালু খাঁর আলু ছাড়াও অন্য অনেকরকম ব্যবসা আছে, যেটা আমি চোখ টিপে জানিয়ে দিলাম যে কারো সাথে আলোচনা করতে চাই না। বললাম, ব্যবসায়ীর বিস্তর টাকা, ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা, আবার পীর-ফকিরে বিশ্বাস। ভালো পীর পেলে মুরীদ হয়ে পীর বাবার পায়ে লাখ-দু' লাখ টাকা দিয়ে দিতে চান, তাতে ধর্মেরও কাজ হয়, আবার ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলাটাও মেটে।

একটু শুনেই সাগরেদের চোখ চকচক করতে থাকে, আমাকে চেপে একটা চেয়ারে বসিয়ে এক জনকে চা আনতে পাঠিয়ে দেয়। আমি ষড়যন্ত্রীদের মতো গলা নামিয়ে বললাম, আমার ব্যবসায়ী কালু খাঁর একটামাত্র ভয়, একটা ভণ্ড পীরের পিছনে না টাকাটা নষ্ট হয়! আমি তাই অনেক দিন থেকে ভালো পীর খুঁজে বেড়াচ্ছি। যতগুলো দেখেছি সবগুলো ভণ্ড, এই প্রথম একটা খাঁটি পীর পেয়েছি—

সাগরেদ আমাকে থামিয়ে দিয়ে পীর বাবার প্রশস্তি শুরু করে, তিনি কোন পীরের আপন ভায়রা ভাই, কোন পীরের বড় শালা এবং কোন কোন পীরের সাক্ষাৎ জামাতা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, পেরেকে শোওয়া এবং আগুনের উপর হাঁটা ছাড়াও তিনি আর কী কী করতে পারেন, খুলে বলতে শুরু করে। তাঁর চোখ নাকি এক্সরের মতো এবং তিনি কাপড় ভেদ করে দেখতে পারেন। তিনি জিন বন্দি করার দোওয়া জানেন এবং তাঁর শোওয়ার ঘরে ছয়টা হোমিওপ্যাথিকের শিশিতে নাকি ছয়টা জিন বন্দি করা আছে।

AMARBOI.COM

আমাকে ধৈর্য ধরে পুরো বক্তৃতাটা শুনতে হল, বক্তৃতা শেষ হলে তার সাথে পুরোপুরি একমত হয়ে আমি বললাম, পীর বাবার উপরে আমার বিশ্বাস ষোল আনার উপরে আঠার আনা, কালু খাঁ যদি শুধু একবার এসে দেখেন, সাথে সাথে মুরীদ হয়ে যাবেন। তবে—

তবে কি?

ব্যবসায়ী মানুষ, মনে সন্দেহ বেশি। কাজেই শুধু শুধু ঝুঁকি নিয়ে কাজ কী, যেদিন কালু খাঁ আসবেন, হুজুরকে একবার পেরেকের উপর শুইয়ে তারপর আগুনের উপর হাঁটিয়ে দেবেন, কালু খাঁ সাথে সাথে কাত হয়ে যাবেন।

সাগরেদ বললেন, এক শ' বার এক শ' বার। হুজুরের রুহের উপর কষ্ট হয়, তাই যেদিন হুজুর পেরেকের বিছানায় শুয়ে থাকেন সেদিন আগুনের উপরে হাঁটতে দিই না। তবে কালু খাঁ সাহেব যখন একটা ভালো নিয়ত করেছেন, না হয় হুজুরের রুহ একটু কষ্ট করলই।

আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে আমি উঠে পড়ি। সাগরেদ অনেক ঘোড়েল ব্যক্তি, আমাকে জানিয়ে দিলেন কালু খাঁ সত্যি যদি লাখ দু' লাখ টাকা দিয়ে দেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে একটা পার্সেন্ট ধরে দেবে। শুধু তাই না, হুজুরের মুরীদ পুলিশের বড় অফিসার আছে, কালু খাঁর যদি প্রয়োজন হয় হুজুর বলে দেবেন, আইনের ভেতরের–বাইরের জিনিস নাকি তাহলে নাড়াচাড়া করে দেবে! শুনে আমি থ হয়ে যাই।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তুতিটি নেয়ার জন্যে খবরের কাগজের অফিসে যেতে হল। আমার এক পুরানো বন্ধু সেখানে সাংবাদিকতা করে, তবে মুশকিল হচ্ছে, তার কখনো দেখা পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজে মাঝরাতে তাকে ধরা গেল। আমাকে দেখে বলল, কী হল, আমাকে নাকি গরু–খোঁজা করছিস?

গরুকে গরু–খোঁজা করব না তো ছাগল–খোঁজা করব?

কি ব্যাপার?

তোর সাথে জরুরি দরকার।

কী কপাল আমার!

বুধবার সন্ধেবেলাটা আমার জন্যে রাখতে হবে।

কী জন্যে, ভাগ্নের জন্মদিন?

না না, ওসব নয়, এক পীরের আস্তানায় যেতে হবে।

বন্ধু মাথা চুলকে বলল, কিন্তু বুধবার যে আমার এক ফিল্ম স্টারের সাথে সাক্ষাৎকার!

সেসব আমি জানি না, বুধবার অবশ্যি অবশ্যি তোকে আসতে হবে, তোর ক্যামেরা, ফ্লাশ সবকিছু নিয়ে।

কোথায়?

পীর বাবার আস্তানায়, তোকে ঠিকানা দিয়ে দেব।

সাংবাদিক বন্ধু চোখ কপালে তুলে বলল, সে কী! তুই কবে থেকে আবার পীরের ভক্ত হলি?

আমি বললাম, সে তুই গেলেই দেখবি।

সাংবাদিক বন্ধু বলল, ঠিক আছে, আমি যেতে পারি, কিন্তু কোনো পীরের পাবলিসিটি করে আমি কিছু লিখতে পারব না।

সে তোর ইচ্ছে। আর শোন্, ওখানে গেলে খবরদার আমাকে দেখে চেনার ভান করিস না।

কেন?

কারণ ওখানে আমি আমি না, আমি হচ্ছি আলু ব্যাপারি কালু খাঁর ম্যানেজার।

বন্ধুটি কিছু না বুঝে আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, আমি সে অবস্থাতেই বিদায় নিয়ে চলে আসি।

আমার দু'নম্বর কাজটি শেষ। তিন নম্বর কাজটি একটু কঠিন। পেরেকের বিছানায় শোওয়া এবং জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হাঁটার রহস্যটা একটা কাগজে লিখে ফেলা। লেখালেখি ভালো আসে না আমার, বিস্তর সময় লেগে গেল। শুধু লিখেই শেষ নয়, সেটা আবার ফটোকপি করে শ'খানেক কপি করে ফেলতে হল, নিজের পকেটের পয়সা খরচ করেই!

শেষ কাজটি কঠিন নয়, কিন্তু বিপজ্জনক। পীর বাবার বুজরুকি ধরার জন্যে কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটখাট ব্যবস্থা করা, তার আস্তানায় সেদিনই করতে হবে, আগে থেকে করে রাখার উপায় নেই। সফদর আলী অবশ্যি ভরসা দিয়েছেন তিনি ঠিক ঠিক করে নেবেন, ধরা পড়ে ভক্তদের হাতে মার খাওয়ার একটা আশঙ্কা আছে, কিন্তু মহৎ কাজে বিপদের ঝুঁকি না নিলে কোন মহৎ কাজটা করা যায়?

বুধবার সন্ধেবেলা আমি সময়মতো পীর বাবার দরবারে এসে হাজির হলাম। আসার সময় নিউ মার্কেটের সামনে থেকে একটা চালু গোছের বাচ্চাকে ধরে এনেছি, নাম নান্টু। তার সাথে কুড়ি টাকার চুক্তি, দশ টাকা অগ্রিম, বাকি টাকা কাজ শেষ হলে দেয়া হবে। কাজটি কঠিন নয়, পীর বাবার দরবারে যখন হৈচৈ লেগে যাবে, লোকজন চেঁচামেচি করতে থাকবে তখন ভেতরে ঢুকে "পীর বাবার জোচ্চুরি" "পীর বাবার জোচ্চুরি" বলে ফটোকপি করা কাগজগুলো বিলি করতে হবে। শুনে ছেলেটা মহাখুশি, হাতে কিল মেরে বলল, 'নদী মে খাল, মিরচা মে ঝাল!'

কথাটার মানে কি এবং কাগজ বিলি করার সাথে এর কি সম্পর্ক আমি বুঝতে পারলাম না। অবশ্যি বোঝার বেশি চেষ্টাও করি নি, ছোট বাচ্চাদের যদি বুঝতেই পারব, তাহলে ওরা আর বাচ্চা কেন?

পীর বাবার দরবারে ঢুকতেই বড় সাগরেদ একগাল হেসে এগিয়ে এলেন। গলার স্বর নিচু করে বললেন, খাঁ সাহেব এসেছেন?

আমি ভিড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, ওখানে বসে আছেন, এখন পরিচয় দিতে চান না। ভিড়টা কমে গেলে হুজুরের কাছে নিয়ে যাব।

সাগরেদের একটু আশাভঙ্গ হল বলে মনে হল, কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে আমার সাথে দীন, দুনিয়া এবং আখেরাত নিয়ে কথা বলতে থাকে। কথা বলতে বলতে আমি দরজার দিকে লক্ষ করছিলাম। সফদর সাহেবের আলাদাভাবে আসার কথা, তিনি এসে গেছেন। দরবারের কাছাকাছি পেরেকের চৌকিটা সাজানো আছে, একজন দু'জন সাহসী দর্শক কাছে এসে জিনিসটা ছুঁয়ে দেখছিল, লক্ষ করলাম সফদর আলীও দর্শকদের সাথে এসে চৌকিটার পেরেকগুলো টিপেটুপে দেখার অভিনয় করছেন, অত্যন্ত কাঁচা অভিনয়। ভালো করে লক্ষ করলে যে কেউ বুঝে ফেলবে। আমি বড় সাগরেদকে একটু ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু তার দরকার ছিল না, কারণ হঠাৎ দেখি সফদর আলী আগুনের কুণ্ডটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এর অর্থ পেরেকের চৌকিতে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। সফদর আলী আগুনের কুণ্ডর পাশে দাঁড়িয়ে সন্দেহজনকভাবে এদিকে–সেদিকে তাকাতে থাকেন, আমি শঙ্কিতভাবে দেখি এক জন সাগরেদ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। সাগরেদ সফদর আলীকে কী একটা জিজ্ঞেস করল। উত্তরে সফদর আলীও কী একটা বললেন। তারপর দু'জনে বেশ সহজভাবেই কথা বলতে থাকেন। সাগরেদ একটা লাঠি দিয়ে আগুনটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জ্বালাতে থাকে। সফদর আলীও তাকে সাহায্য করতে থাকেন। আমি ভয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকি, সাগরেদের এত কাছে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর কাজটা শেষ করতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যান, তাঁর কী অবস্থা হবে, আমি চিন্তা করতে পারি না। খানিকক্ষণ পর ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি ফিরে যাচ্ছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই তিনি মুচকি হেসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু মাথা নাড়লেন। বুঝতে পারলাম কাজ শেষ, আমার বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে যায়।

নির্দিষ্ট সময়ে পীর বাবা এসে দরবারে হাজির হন। চার ফুট লম্বা লাশ, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় সমান সমান। গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। গাল দুটিতে একটা গোলাপি আভা। মাথায় একটা জমকালো জরিদার পাগড়ি। পরনে সাদা সিল্‌কের পাঞ্জাবি। সাদা সিল্‌কের লুঙ্গি। পীর বাবা মুখে একটা মৃদু হাসি নিয়ে এসে মখমলের গালিচাতে বসলেন। সাথে সাথে উপস্থিত জনতার মাঝে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায়—কে কার আগে এসে হুজুরের পা ধরে সালাম করতে পারবে। যাদের বাড়াবাড়ি একটু বেশি, তারা এসে হুজুরের পায়ের তলায় চুমো খাবার চেষ্টা করতে থাকে। হুজুর মুখে মৃদু হাসি নিয়ে ভক্তদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

একটু পরেই বড় সাগরেদ ঘোষণা করলেন যে, এখন হুজুর জিকির শুরু করবেন যাদের অজু আছে তারা হুজুরের সাথে জিকির শুরু করতে পারে।

হুজুরের সামনে মস্ত বড় কাঁচের গামলায় ঠাণ্ডা শরবত রাখা আছে, হুজুর সেখান থেকে একগ্লাস শরবত তুলে এক ঢোক খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে সুরেলা স্বরে জিকির শুরু করেন। মাহফিলের শ'তিনেক লোক তাঁর সাথে তাল রেখে গলা ফাটিয়ে জিকির শুরু করে, শব্দে মনে হয় ঘরের ছাদ ফেটে বেরিয়ে যাবে। আস্তে আস্তে জিকিরের তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে, হুজুরের শরীর কাঁপতে থাকে, চোখ ঘুরতে থাকে এবং কিছু বোঝার আগে হঠাৎ দড়াম করে মখমলের গদিতে পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ করতে থাকেন। বড় সাগরেদ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতেই উপস্থিত জনতা মুহূর্তে চুপ করে যায়। হুজুর তখনো গদিতে গোঁ-গোঁ শব্দ করে কাঁপছেন, কয়েকজন সাগরেদ ছুটে এসে ভিজে তোয়ালে দিয়ে তাঁর মুখ মুছিয়ে পাখা দিয়ে খানিকক্ষণ বাতাস করার পর তিনি একটু শান্ত হন। বড় সাগরেদ গলা নামিয়ে বললেন, খবরদার, কেউ এখন জোরে শব্দ করবেন না, হুজুরের রুহ এখন অনেক উপরে চলে গেছে, তাঁর শরীরের সাথে এখন তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। এখন হঠাৎ করে কেউ যদি হুজুরকে চমকে দেন তাঁর রুহ আর তাঁর শরীরে ফিরে নাও আসতে পারে। আপনারা একটুও শব্দ করবেন না, সবাই মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকেন।

লোকজন শঙ্কিত পাংশু মুখে আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে।

বড় সাগরেদ বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে আবার শুরু করেন, হুজুরের শরীরে এখন ব্যথা-বেদনা নেই। কী ভাবে থাকবে, শরীরে যদি রুহ না থাকে সেখানে ব্যথা-বেদনা কোথেকে আসবে? আপনারা যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে এক্ষুনি দেখবেন, হুজুরের শরীরকে খাড়া পেরেকের উপর রেখে দেব, হুজুর তার উপর যেন ভেসে থাকবেন।

হুজুরের ইয়া লাশ, ঘি-দুধ খেয়ে মোটা খোদার ইচ্ছায় একটু বেশিই হয়ে গেছেন, চর্বির জন্যে তাঁকে ভালো করে ধরা যায় না, পিছলে যেতে চান। তাঁকে টেনে আনতে গিয়ে দশ বার জন মুশকো জোয়ানের কালঘাম ছুটে গেল। হুজুরকে কোনোমতে টেনে এনে সেই পেরেকের বিছানাতে শোওয়ানোমাত্র একটা মজার জিনিস ঘটে গেল, হুজুর হঠাৎ "বাবা গো" বলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ার চেষ্টা করেন। লোকজনের ভেতর একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন শুরু হয়ে হঠাৎ থেমে যায়। সাগরেদরা হতভম্ব। বড় সাগরেদ সবচেয়ে আগে সম্বিত ফিরে পান, ভয়ের ভঙ্গিতে বললেন, নাউজুবিল্লাহ্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাউজুবিল্লাহ্ নাউজুবিল্লাহ্—আপনারা দরুদ শরিফ পড়েন, সবাই জোরে জোরে দরুদ শরিফ পড়েন, জোরে জোরে।

দরুদ শরিফের আওয়াজে আর কিছু শোনা যায় না, পীর সাহেবের কাতোরক্তি চাপা পড়ে গেল। পীর বাবা লাফিয়ে উঠে পড়তে চাইছিলেন, কিন্তু সাগরেদরা তাঁকে ঠেসে ধরে রাখল, তার মাঝে এক জন জোর করে বুকের মাঝে একটা তক্তা বিছিয়ে দিয়ে দুটো থান ইট এনে রেখে দেয়। আমি দেখতে পেলাম আতঙ্কে পীর বাবার চোখ গোল–গোল হয়ে উঠেছে, কী একটা বলে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ছাড়া পাবার জন্যে, কিন্তু সাগরেদরা তাঁকে কিছুতেই ছাড়ছে না। কালু খাঁয়ের লাখ টাকার লোভ খুব সহজ ব্যাপার নয়। গুণ্ডা গোছের এক জন লোক প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ি নিয়ে হাজির হয়। পীরবাবার প্রচণ্ড চিৎকার অগ্রাহ্য করে সেই হাতুড়ির প্রচণ্ড আঘাতে সে থান ইট দুটি গুঁড়ো করে ফেলে। সাথে সাথে পীর বাবা এক গগনবিদারী চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠেন, দশ জন সাগরেদ তখন তাঁকে ধরে রাখতে পারে না, তিনি বাবা গো, মা গো, মেরে ফেলল গো বলে চিৎকার করে লাফাতে থাকেন। দর্শকরা হতচকিত হয়ে একেবারে নীরব হয়ে যায়। সাগরেদরা দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে রীতিমতো কুস্তির ভঙ্গিতে গদিতে আছড়ে ফেলল, বড় সাগরেদ তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে কী একটা বলতে থাকেন আর পীর সাহেব প্রবল বেগে মাথা নেড়ে আপত্তি করতে থাকেন। কয়জন সাগরেদ ছুটে গিয়ে ব্যান্ডেজ মলম এনে তাঁকে উল্টে ফেলে পিঠে একটা ব্যান্ডেজ করে দিল—সিল্কের সাদা পাঞ্জাবিতে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছিল, তাঁকে চেপে শুইয়ে রেখেই পাঞ্জাবি বদলে দেয়া হল।

উপস্থিত দর্শক তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কথাবার্তায় আসর রীতিমতো সরগরম। হঠাৎ দেখি নান্টু তার কাগজের বান্ডিল নিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে আটকে নিচু গলায় বললাম, এক্ষুনি নয়, আরেকটু পর।

খুশিতে নান্টুর দাঁত বেরিয়েছিল, সেগুলো লুকানোর কোনো চেষ্টা না করে বলল, আরো মজা আছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

নান্টু হাতে কিল মেরে বলল, নদী মে খাল, মিরচা মে ঝাল!

শেষ পর্যন্ত বড় সাগরেদ উঠে দাঁড়ালেন, কেশে গলা পরিষ্কার করতেই উপস্থিত জনতা একেবারে চুপ করে যায়। বড় সাগরেদ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, আমি এক শ' বার বললাম যার অজু নাই সে যেন জিকিরে যোগ না দেন, কিন্তু আপনাদের মাঝে এক জন আমার কথা শুনেন নাই, অজু ছাড়া জিকিরে টান দিয়েছেন।

উপস্থিত জনতা পাংশু মুখে বসে থাকে। বড় সাগরেদ চিৎকার করে বললেন, হুজুরের জানের জন্যে যার মায়া নাই, জাহান্নামে তার জায়গা নাই। খবরদার বে–অজু মানুষ জিকিরে সামিল হবেন না।

পীর বাবা আবার জিকির শুরু করেন, এবারে তাঁর সাথে যোগ দিল অল্প কিছু লোক, অজু সম্পর্কে সন্দেহ নেই, এরকম লোকের সংখ্যা বেশি নয়। পীর বাবার সমাধিস্থ হতে বেশি সময় লাগল না। লাখ টাকার লোভ খুব সহজ জিনিস নয়। বড় সাগরেদ আবার উঠে দাঁড়িয়ে গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, হুজুরের রুহ্ এখন সাত আসমান সাত জমিন পার হয়ে উঠে গেছেন, হুজুরের শরীরে এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যথা-বেদনা নাই। খবরদার, আপনারা কেউ শব্দ করবেন না, রুহ্ তাহলে শরীরে ফিরে আসতে চায়। তখন রুহের কষ্ট হয়, শরীরে আজাব হতে পারে। খোদার রহমত মানুষের শরীরে নাজেল হলে মানুষের শরীর ফিরিশতার শরীর হয়ে যায়। আপনারা এখন তার প্রমাণ দেখবেন।

আগুনের বড় কুণ্ডতে অনেকক্ষণ থেকে বেশ কয়টা কাঠের গুঁড়ি দাউদাউ করে জ্বলছিল, এবারে সাগরেদরা এসে গনগনে কয়লাগুলি সমানসমান করে বিছিয়ে দিতে থাকে। প্রায় দশ ফুট লম্বা দুই ফুট চওড়া জ্বলন্ত কয়লার একটা রাস্তা তৈরি হয়, পীর বাবা সেটার উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন। আধো অন্ধকারে জ্বলন্ত কয়লার লাল আভা দেখে ভয় ভয় করতে থাকে, এর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সফদর আলী অবশ্যি বুঝিয়ে দিয়েছেন পা ভিজিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে গেলে ব্যাপারটি তেমন কঠিন নয়। আজ অবশ্যি অন্য ব্যাপার, সফদর আলী ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সব ভণ্ডামি আজ ধরা পড়ে যাবে। পেরেকের বিছানাটি এত চমৎকার কাজ করেছে যে এবারেও সফদর আলীর ব্যবস্থাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই!

পীর বাবা অনেকক্ষণ থেকেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, সবাই মিলে তাঁর পা ভালো করে ধুয়ে দিয়ে ধরাধরি করে জ্বলন্ত কয়লার কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। পীর বাবা টলতে টলতে দুলতে দুলতে কোনোমতে দাঁড়িয়ে থাকেন। পিছন থেকে বড় সাগরেদ একটা ধাক্কা দিতেই তিনি এক পা কয়লার উপরে দিলেন। মুহূর্তে তাঁর ভাবগম্ভীর মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি এক লাফে পিছিয়ে আসতে চাইলেন। কিন্তু বড় সাগরেদ আবার তাঁকে ধাক্কা মেরে জ্বলন্ত কয়লার দিকে ঠেলে দিলেন। পীর বাবা নাক-মুখ খিঁচিয়ে কোনোমতে দুই পা সামনে এগিয়ে গেলেন, তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার করে বাবা গো, মা গো, মেরে ফেললে গো বলে লাফাতে লাফাতে জ্বলন্ত কয়লা থেকে বেরিয়ে এলেন। তার বিরাট থলথলে শরীর নিয়ে তিনি বারকতক ঘুরপাক খেয়ে বড় গামলা ভর্তি শরবতে নিজের পা ডুবিয়ে দিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকেন। এর মাঝে কয়েক বার ফ্লাশের আলো জ্বলে উঠল। আমার সাংবাদিক বন্ধু নিশ্চয়ই ছবি তুলে নিয়েছে।

উপস্থিত দর্শকেরা বিচলিত হয়ে ওঠে। তাদের শব্দ করা নিষেধ। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে। এখন শব্দ করে বা না করেই বা কি। আস্তে আস্তে বেশ একটা শোরগোল ওঠে, লোকজন কথাবার্তা বলতে থাকে উত্তেজিত স্বরে, আর তার মাঝে হঠাৎ নান্টুর রিনরিনে গলার স্বর শোনা গেল, পীর সাহেবের জোচ্চুরি, পীর সাহেবের জোচ্চুরি, পীর সাহেবের জোচ্চুরি—

ম্যাজিকের মতো সবাই চুপ করে যায়, পীর সাহেব পর্যন্ত তাঁর যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে থেমে যান। সবাই ঘুরে তাকায় নান্টুর দিকে। নিজের কানকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। কয়েক মুহূর্তে সমস্ত ঘর একেবারে কবরের মতো নীরব, নিঃশ্বাস ফেললে শোনা যায় এরকম। নান্টু ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, ভয়ে ভয়ে পিছনে তাকায় একবার, দৌড় দিতে গিয়ে থেমে গেল, সম্ভবত বাকি দশ টাকার লোভে একটা কাগজ বের করে সে কাছাকাছি এক জনকে এগিয়ে দেয়, একসাথে কয়েকজন ঝুঁকে পড়ে সেই কাগজের উপর, সেখানে বড় বড় করে লেখা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নিচে দু'টি প্রশ্ন, "কেন আজ পীর সাহেব পেরেকের বিছানায় শুইতে পারিলেন না?" এবং "কেন আজ পীর সাহেব আগুনের উপর হাঁটিতে পারিলেন না?" প্রশ্নগুলোর নিচে ছোট ছোট হাতের লেখায় প্রশ্ন দু'টির উত্তর।

বেশ কয়েকজন কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসে নান্টুর দিকে, নান্টু সাহস করে বিলি করতে শুরু করে। এক জন দু'জন করে বেশ কয়েকজন পীর সাহেবের জোচ্চুরির বিবরণ পড়া শুরু করে। দরবারে একটা হৈচৈ শুরু হয়ে যায়, মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় যে পীর সাহেব একটা জোচ্চোর। হঠাৎ করে সবাই নান্টুকে ঘিরে ধরে এক কপি জোচ্চুরির বিবরণের জন্যে। আমি সবিস্ময়ে দেখি নান্টু হঠাৎ মুখে একটা গাম্ভীর্য এনে হাতের কাগজগুলো বুকে চেপে ধরেছে। লোকজন তাকে ভিড় করে রেখেছে, কিন্তু সে কাগজ হাতছাড়া করছে না, এক জন চাইতেই বলল, পাঁচ টাকা করে দাম, আজকে স্পেশাল রেট দুই টাকা। লোকটি বলল, আগে তো এমনিতেই দিচ্ছিলি—

নান্টু গম্ভীর গলায় বলল, সেইটা হল বিজনেস ট্যাকটিস। নদী যে খাল মিরচা যে ঝাল। নিতে চাইলে নেন না হয় রাস্তা দেখেন, আমার অন্য কাস্টমারের রাস্তা আটকাবেন না।

আমি সবিস্ময়ে দেখি, লোকজন পকেট থেকে টাকা বের করে কাগজ কিনে নিচ্ছে, এক জন দেখলাম দুটো কেনার চেষ্টা করল, কিন্তু নান্টু একটার বেশি কাউকে দিল না। দেখতে দেখতে কাগজ শেষ হয়ে যায়, নান্টু খুচরো টাকার বান্ডিল দুই হাতে ধরে রাখে। সবগুলো টাকা রাখার মতো বড় পকেট তার প্যান্টে নেই।

পীর বাবার সাগরেদরাও এক কপি "পীর বাবার জোচ্চুরি" কিনে এনে পড়তে শুরু করেছে। শেষ করার আগেই দেখা গেল তারা হঠাৎ পিছনের দরজা দিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করছে। উত্তেজিত জনতা দৌড়ে তাদের ধরে ফেলল, পীর বাবা অবশ্যি পালানোর চেষ্টা করেন নি। পায়ে বড় বড় ফোস্কা বেরিয়ে গেছে। শরবতের গামলায় পা ডুবিয়ে বসে আছেন। কেউ তাঁকে কোলে করে না নিলে এখান থেকে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। সাগরেদদের নিজেদের জান নিয়ে টানাটানি, এখন কে এই দু'মণি লাশ নিয়ে টানাটানি করবে?

যে সমস্ত ভক্ত মুরীদেরা একটু আগেই পীর বাবার পায়ের তলায় চুমো খাবার জন্যে মারামারি করছিলেন, এখন তাঁরাই পীর বাবাকে তাঁর সাগরেদদের সাথে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়েছেন। নেহায়েত বয়স্ক মানুষ, এছাড়া কিল-ঘুষি যে ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যেত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পীর বাবার দাড়িটি নকল কি না দেখার জন্যে কৌতূহলী দর্শকরা মাঝে মাঝেই একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে যাচ্ছিল, এতেই পীর বাবার ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা! আমার সাংবাদিক বন্ধুটি দায়িত্বশীল মানুষ, এখানে এসেই আমার পরিকল্পনাটি ধরে ফেলেছিল, তখন-তখনি সে পুলিশে খবর দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ এখনো এসে পৌঁছায় নি, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবে। পীর বাবা আর তাঁর সাগরেদরা তাহলে একটা শক্ত পিটুনি থেকে রেহাই পাবেন।

আমি আর সফদর আলী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে আসি। সাংবাদিক বন্ধু শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত থাকতে চান। খুব নাকি একটা জমকালো খবর হবে। নান্টুকে সরানো গেল না, কোনোমতে তার বাকি দশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে এলাম। সে তখন বিরাট এক জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা বক্তৃতা দিচ্ছে। বক্তৃতাটি এরকম : আমাকে স্যার বললেন, পীর বেটাকে তো ধরিয়ে দিতে হয়, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি বললাম, নদী মে খাল মিরচা মে ঝাল। বিপদের ভয় আমার নাই, হায়াত–মউত খোদার হাতে। ভালো কাজে জান দিতে হলে দিতে হয়। স্যার বললেন, বাপকা বেটা, চল্ তাহলে ঠিক করি কী করা যায়। তারপর আমি আর স্যার এককাপ চা আর একটা সিগারেট নিয়ে বসি—

আমি তো আর পাষণ্ড নই, কী ভাবে এরকম জমাট গল্পে বাধা দিই?

পরদিন ইচ্ছা করেই অফিসে একটু সকাল সকাল হাজির হলাম, মোড় থেকে খবরের কাগজ কিনে এনেছি কয়েকটা। এসে দেখি আমার আগেই অন্যেরা হাজির। সবাই সুলতান সাহেবের টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। খবরের কাগজের শেষ পৃষ্ঠায় "ভণ্ডপীরের দুর্ভোগ" নামে মস্ত বড় ফিচার ছাপা হয়েছে সেখানে। কাল নান্টু যে হ্যান্ডবিলটা বিলি করেছে তার পুরোটা ছাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার নিজের হাতে লেখা, গর্বে আমার বুক প্রায় দুই আঙুল ফুলে ওঠে। খবরের কাগজে কোথাও অবশ্যি আমার বা সফদর আলীর নাম নেই। ইচ্ছা করেই গোপন করা হয়েছে। পীর সাহেবের কোনো অন্ধ ভক্ত বা কোনো সাগরেদ আবার পিছে লেগে যাবে সেই ভয়ে। হ্যান্ডবিলের প্রথমে পেরেকের বিছানায় শোওয়া এবং আগুনের ওপর হাঁটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখা। অনেক ভাবনা–চিন্তা করে লিখেছি, যেন পড়ে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে, মনে হয় ভালোই লিখেছি, কারণ যে–ই পড়েছে সে–ই সবকিছু বুঝে ফেলার মতো মাথা নেড়েছে। হ্যান্ডবিলের নিচের অংশ এরকম :

> *"কিন্তু পীর সাহেবের কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নাই। তিনি যখন পেরেকের বিছানায় শয়ন করেন অথবা জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর হাঁটিয়া যান তখন কোনোরূপ ব্যথা অনুভব করেন না। কারণ তখন বেশি ব্যথা অনুভব হয় না। ইহার কারণ আগেই বলা হইয়াছে, আবার লিখিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে চাহি না।*
> *কিন্তু যদি কোনোক্রমে পেরেকের বিছানার একটি মাত্র পেরেক একটু লম্বা হইয়া যায়, তখন শরীরের সমস্ত ওজন সবগুলো পেরেকে বিভক্ত না হইয়া ঐ একটি পেরেকের উপরে পড়িবে এবং অচিন্তনীয় যন্ত্রণার উদয় হইবে। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য আজ গোপনে একটি পেরেকের উপর সুচালো একটি লৌহ–নির্মিত টুপি পরিধান করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ পীর সাহেবের যন্ত্রণাকাতর নর্তন–কুর্দন আপনারা স্বচক্ষে অবলোকন করিবেন।*
> *জ্বলন্ত অঙ্গারের তাপধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম, তাই প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করিলে ইহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব। যদি জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে কিছু ধাতব পদার্থ রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটি অন্যরকম হইবে, ধাতব পদার্থ প্রচুর তাপধারণ করিতে পারে এবং কেহ তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলে চোখের পলকে পায়ে ফোস্কা পড়িয়া যাইবে।*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পীর বাবার জোচ্চুরি ধরিবার জন্য গোপনে আগুনের মধ্যে কিছু নাট–বল্টু ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পীর সাহেব যখন ঐ উত্তপ্ত নাট–বল্টুতে পা দিবেন তাঁহার সকল বুজরুকি ধরা পড়িয়া যাইবে।
ভাই সকল, আজিকার—"

এর পরে পীরদের পিছনে টাকাপয়সা এবং সময় নষ্ট না করে সেটি কী ভাবে ভালো কাজে ব্যয় করা যায় সেটি পরিষ্কার করে লেখা আছে।

খবরের কাগজটা পড়ে শেষ করে সুলতান সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, খাঁটি পীর পাওয়া কঠিন। পীর যদি খাঁটি মানুষই হবে, তাহলে টাকাপয়সার দিকে এত ঝোঁক কেন?

আজিজ খাঁ বললেন, হ্যাঁ, খামাখা পেটমোটা একটা পীরকে এতগুলো টাকা খাওয়ালাম। ছোট ছেলেটা কত দিন থেকে বলছিল, একটা ম্যাকানো সেট কিনে দিতে—

মাওলা সাহেব বললেন, এমনিতে আমার পিঠে ব্যথা, তার মাঝে সেদিন জোচ্চোর ব্যাটার লাথি খেয়ে—

সুলতান সাহেব বললেন, ইকবাল সাহেব, আসলে আপনার কথাই আমাদের আগে শোনা উচিত ছিল। পীর–দরবেশের পিছনে টাকা নষ্ট না করে টাকাগুলো একত্র করে গরিব বাচ্চাদের জন্যে দুধ বা পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করলে হত।

মাওলা সাহেব কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমরা এত জন মানুষ, সবাই যদি মাসে দশ টাকা করেও দিই অনেক টাকা উঠে যাবে।

ইদরিস সাহেব বললেন, ইকবাল সাহেব এসব ব্যাপার ঠিক বোঝেন। তাঁকে প্রেসিডেন্ট করে একটা কমিটি করে ফেললে কেমন হয়?

মাওলা সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, মানুষকে দেখে বোঝা মুশকিল কার ভিতরে কী আছে। এই যে ইকবাল সাহেব, দেখলে মনে হয় মহা ধান্ধাবাজ। অথচ দেখেন ভিতরে কেমন একটা দরদি মন লুকিয়ে আছে!

তাহলে সেটাই ঠিক থাকল, বৃদ্ধ অ্যাকাউনটেন্ট বললেন, আমরা টাকাপয়সা ইকবাল সাহেবের হাতে দিয়ে দেব। ইকবাল সাহেব আপনি যা হয় কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন।

আকমল সাহেব মাথা চুলকে বললেন, ইকবাল সাহেবের কথাবার্তায় কখনো বেশি পাত্তা দিই নি। মাঝে মাঝে মনে হয় একটা–দুটো ভালো ভালো কথা বলেন। অফিস ছুটির পর আধাঘন্টা সবাই যদি বসি, ইকবাল সাহেব যদি একটু গুছিয়ে বলেন, কেমন হয় তা হলে?

সেকশান অফিসার লুফে নিলেন কথাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, খারাপ না আইডিয়াটা। ঐ সময়ে এমনিতে বাসে যা ভিড়!

আমি কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না, শেষ পর্যন্ত যখন সবাই থামলেন, সুযোগ হল। বললাম, আমাকে একটা কথা বলতে দেবেন?

সবার হয়ে মাওলা সাহেব বললেন, তার আগে বলেন আপনি রাজি আছেন কি না।

ঠিক আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবার মুখে পরিতৃপ্তির একটা হাসি খেলে যায়। সেটাকে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ দিয়ে বললাম, আমার নামটাও তা হলে পাল্টে ফেলি, কী বলেন? হযরত শাহ বাবা জাফর ইকবাল নকশবন্দী কুতুবপুরী গুলগুলিয়া—কেমন শোনাচ্ছে নামটা?

ভুলও হতে পারে, কিন্তু মনে হল কারো কারো চোখ এক মুহূর্তের জন্যে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হেরোইন কারবারি

কয়দিন থেকেই শরীরের অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় ব্যথা। মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে যায়, তারপরে আর ঘুম আসতে চায় না। অফিসে একজনকে কথা প্রসঙ্গে বলে ফেললাম, শুনে তিনি খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, কী হল?

না, কিছু না। তবে সহকর্মী একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, আমার বড় শালার আপন ভায়রা ভাইয়ের ঠিক এরকম লক্ষণ ছিল।

কী হয়েছে তার?

না, কিছু না, শুনে আপনি আবার ভয় পেয়ে যাবেন।

না শুনেই আমি ভয় পেয়ে গেছি, তবু শুনতে চাইলাম, বলুন না, শুনি।

ব্রেন ড্যামেজ আর হার্ট অ্যাটাক একসাথে। ডাক্তার পরে কেটেকুটে দেখেছে লিভার বলতে নাকি কিছু ছিল না। কিডনি দুটোও নাকি একসাথে ফেইল করেছিল। সিগারেট খেত, তাই লাংসের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

আমি হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। বসে থাকতে থাকতে আমার 'হার্ট' এবং 'ব্রেন' ব্যথা করতে থাকে। পিঠের কাছে অনেকক্ষণ থেকে শির শির করছে, মনে হয় কিডনি দুটোও কেমন জানি হাল ছেড়ে দিচ্ছে। লিভারটা কোথায় ঠিক জানি না, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারি সেটাও প্রায় যায়-যায়। সিগারেট খেয়ে খেয়ে নিশ্চয়ই বুকের বারটা বাজিয়ে ফেলেছি। কারণ একটু পরে আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে থাকে। দুপুর পর্যন্ত বেঁচে থাকব কি না সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু বাঁচার শেষ চেষ্টা না করে হাল ছেড়ে দিই কেমন করে? ছুটি নিয়ে আমি তখন-তখনই বের হয়ে পড়লাম আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে। রিকশা করে যেতে-যেতে আমার হাত এবং পায়ের তালু ঘামতে শুরু করে, ডাক্তার বন্ধুর অফিস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব কি না সেটা নিয়েই এখন আমার সন্দেহ শুরু হয়ে গেল।

আমার ডাক্তার বন্ধুটি আমাকে অনেকক্ষণ টেপাটেপি করে দেখল। পাছে সে জিনিসটা হেসে উড়িয়ে দেয়, আমি তাই আমার সহকর্মীর শালার আপন ভায়রা ভাইয়ের ঘটনাটি খুলে বললাম। সে মন দিয়ে শুনে মাথা নেড়ে বলল, তোমার অবস্থা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমি ঠিক জানি না কত দূর কি করতে পারব। কিন্তু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, কী মনে হয় তোমার? বেঁচে যাব এ যাত্রা?

দেখি, অসুখটা তো সহজ নয়।

কি নাম অসুখটার?

অসুখ তো একটা নয়, অনেকগুলো। তাই এর ঠিক একটা নাম নেই। তবে যার এই অসুখগুলো হয় তার নাম হাইপোকনড্রিয়াক।

হাইপোকনড্রিয়াক! কী বীভৎস নাম! কোথায় যেন শুনেছি নামটা ঠিক মনে করতে পারলাম না। ডাক্তার বন্ধুটি একটা বড় ওষুধের বাক্স ধরিয়ে দিয়ে বলল, বাসায় গিয়ে শুয়ে থাক। খাওয়ার পর দুটো করে ট্যাবলেট দিনে দশ বার—খবরদার ভুল যেন না হয়।

আমি চলে আসার সময় বলল, তোমার আর আসতে হবে না, রাতে আমি আসব। খালাম্মা ভালো আছেন তো? আর শোন, ভালো-মন্দ যদি কিছু খেতে চাও, খেয়ে নিও। বুঝতেই তো পারছ দু'দিনের দুনিয়া।

ডাক্তার যখন রোগীকে বলে, দু'দিনের দুনিয়া—ভালো-মন্দ কিছু খেয়ে নিও, তখন রোগীর মানসিক অবস্থা কেমন হয় সেটা নিশ্চয়ই আর বুঝিয়ে দিতে হয় না। আমি কোনোমতে রিকশা করে বাসায় রওনা দিই, মাথা ঘুরতে থাকে আমার। মনে হয় পড়ে যাব রিকশা থেকে। কাওরান বাজারের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ চায়ের দোকানে সফদর আলীকে দেখে রিকশা থামিয়ে নেমে পড়লাম। মরি-বাঁচি ঠিক নেই, সফদর আলীর সাথে একবার দেখা করে যাই। সফদর আলী আমাকে দেখে একটু চমকে ওঠেন। বললেন, সে কী! আপনার এ কী চেহারা। কী হয়েছে?

অনেককিছু। একটা অসুখ তো নয়, অনেকগুলো।

কী সর্বনাশ! কবে হল?

এই তো, অনেকদিন থেকে নিশ্চয়ই। মরি-বাঁচি ঠিক নেই।

কিসের অসুখ?

অসুখটার নাম জানি না, তবে যার হয় তাকে বলে হাইপোকনড্রিয়াক।

কী বললেন?

হাইপোকনড্রিয়াক।

কে বলেছে আপনাকে?

আমার মনে হল সফদর আলীর মুখে একটা হাসি উঁকি দিয়ে গেল। একটু রেগে বললাম, আমার এক বন্ধু ডাক্তার আছে, মস্ত বড় ডাক্তার—

সফদর আলী সত্যি দুলে দুলে হাসতে থাকেন। বিজ্ঞানী মানুষের দয়া-মায়া একটু কম হয় জানতাম, কিন্তু এরকম নিষ্ঠুর হয় ধারণা ছিল না। বললাম, হাসছেন কেন আপনি?

হাইপোকনড্রিয়াক মানে জানেন না আপনি?

না।

হাইপোকনড্রিয়াক মানে হচ্ছে যার কোনো অসুখ নেই, কিন্তু মনে করে তার অনেক বড় বড় অসুখ আছে।

আমি হতবাক হয়ে থেমে গেলাম। সত্যিই তো! আমিও তো জানতাম শব্দটা, এখন এই ভয়ে মাথা গুলিয়ে রয়েছে বলে ধরতে পারি নি। থতমত খেয়ে বললাম, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত বড় বাক্স ভরা ওষুধ দিল যে!

খুলুন দেখি বাক্সটা।

আমি বাক্সটা খুলি। বড় বাক্সের ভেতর একটা মাঝারি বাক্স। মাঝারি বাক্সের ভেতর একটা ছোট বাক্স। ছোট বাক্সটা খুলে দেখি তার ভেতরে কয়টা চিনাবাদাম।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। পাজি বন্ধুটা বলেছে, রাতে আমার বাসায় আসবে, এসে সবার সামনে আমাকে নিয়ে কী ঠাট্টাই না করবে! চিন্তা করে আমার কালঘাম ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু সাথে সাথে আমার আবার ভালোও লাগতে থাকে যে আসলে আমার কোনো অসুখ হয় নি। বুক হালকা হয়ে যায়, শরীর ভালো লাগতে থাকে, হার্ট, কিডনি, লিভার সবকিছু একসাথে ঝরঝরে হয়ে ওঠে।

আমি আর সফদর আলী বসে বসে চিনাবাদামগুলো শেষ করে দিই।

.

রাতে আমার ডাক্তার বন্ধুটি সত্যি সত্যি তার গাড়ি হাঁকিয়ে এসে হাজির। অনেক দিন থেকে আমার সাথে জানাশোনা, বাসার সবাইকে চেনে। আমাকে নিয়ে বাসার সবার সামনে অনেকক্ষণ খুব হাসাহাসি করল। আমি কী ভাবে অচল হার্ট, ব্রেন, লিভার, কিডনি আর লাংস নিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে তার চেম্বারে এসে হাজির হলাম, সেটা সে বেশ কয়েকবার অভিনয় করে দেখাল। যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেল আমার লজ্জা পাবার কিছু নেই, মানুষ যখন খুব কাজের চাপে থাকে তখন এধরনের শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়। কয়দিন ছুটি নিয়ে কোথাও থেকে ঘুরে এলে সব নাকি ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার বন্ধুটি আমাকে সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি নিয়ে কোনো জায়গা থেকে ঘুরে আসতে বলল।

আমার সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি পাওনা ছিল। ঠিক করলাম ছুটিটা নষ্ট না করে কোথাও থেকে ঘুরে আসি। একা একা কোথাও গিয়ে মজা নেই। কাকে নেয়া যায়, কোথায় যাওয়া যায় জল্পনা–কল্পনা করতে থাকি। কক্সবাজার, বান্দরবন, সুন্দরবন, সীতাকুণ্ড, সিলেটের চা বাগান, ময়মনসিংহের গারো পাহাড়—যাওয়ার জায়গার অভাব নেই, তবে উপযুক্ত সঙ্গীর খুব অভাব। হঠাৎ আমার সফদর আলীর কথা মনে পড়ে, তাঁকে যেরকম ব্যস্ত দেখায়, বেড়াতে যেতে রাজি করাতে পারব এমন বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বলামাত্র এককথাতে রাজি হয়ে গেলেন! আসলে সফদর আলী ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করেন। এমন জায়গা নেই তিনি যেখানে যান নি, ঘুরে ঘুরে তিনি পোক্ত হয়ে উঠেছেন। যখন আমি বললাম, কোথায় গিয়ে কোথায় উঠব, কোথায় থাকব—সফদর আলী তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার উপর ছেড়ে দিন, ভ্রমণবন্দিটা নিয়ে নেব, কোনো অসুবিধে হবে না।

ভ্রমণবন্দি! সেটা কী জিনিস?

সফদর আলী একটু লাজুকভাবে হেসে বললেন, ভ্রমণের সময় যা যা লাগে, সব একটা ঝোলার মাঝে বন্দি করে রাখা আছে, তাই এর নাম ভ্রমণবন্দি। কোথাও যেতে হলে আমি ঘাড়ে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কী কী আছে ভ্রমণবন্দির ভেতরে?

একটা চুম্বক, ইনডাকশান কয়েল, তামার তার, একটা আলট্রাসোনিক অসিলেটর, একটা ছয় ভোল্টের ব্যাটারি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, ভ্রমণ করতে এসব লাগে নাকি? এই চুম্বক, ব্যাটারি?

কী বলছেন আপনি? রাঙামাটি পাহাড়ে যখন হারিয়ে গেলাম, কী কুয়াশা, কোনদিকে যাব জানি না। চুম্বকটা ঝুলিয়ে দিতেই উত্তর-দক্ষিণ বের হয়ে গেল, তারপর হাতড়ে হাতড়ে আধ ঘন্টায় তাঁবুতে ফিরে এলাম।

তাঁবু? আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি তাঁবুতে থাকেন?

রাঙামাটির ঐ পাহাড়ে আমার জন্যে হোটেল কে বানাবে?

সাপখোপ?

ইনডাকশান কয়েল কি শুধু শুধু নিই? তাঁবুকে ঘিরে তামার তার থাকে, ইনডাকশান কয়েল দিয়ে হাই ভোল্টেজ করে রাখি, সাপখোপ ধারে-কাছে আসে না।

আমি ঢোক গিলে বললাম, আমাদের কি তাঁবুতেই থাকতে হবে?

থাকার জায়গা না থাকলে তাঁবুতে থাকব। আমার দুটো স্লিপিং ব্যাগ আছে, আপনার জন্যে একটা নিয়ে নেব।

বন-জঙ্গলে তাঁবুতে থাকতে ভয় করে না আপনার?

কী বলেন আপনি, ভয় করে না আবার? ভীষণ ভয় করে! সফদর আলী শিউরে ওঠেন একবার।

আপনি কি বন্দুকটন্দুক নিয়ে যান?

বন্দুক? সফদর আলী এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বললেন, বন্দুক দিয়ে কী করব? ভূতকে কখনো গুলি করা যায়?

আপনি ভূতের ভয় পান? জঙ্গলে আপনি ভূতের ভয় পান? আমি অবাক হয়ে সফদর আলীর দিকে তাকিয়ে থাকি।

আপনি কী ভাবছিলেন?

এই, বাঘ-ভালুক—

বাঘ-ভালুককে ভয় পাবার কী আছে? গায়ে বাঘবন্দি তেল মেখে ঘুমাবেন, বাঘ ধারে-কাছে আসবে না। আলট্রাসোনিক বিপার আছে, বিপ বিপ শব্দ করতে থাকে, পোকা-মাকড় পর্যন্ত পালিয়ে যাবে।

ওরকম শব্দ করতে থাকে, তার মাঝে আপনি ঘুমান কেমন করে?

সফদর আলী একটু হেসে বললেন, ঐ তো বললাম না আলট্রাসোনিক শব্দের কাঁপন এত বেশি যে মানুষ শুনতে পায় না, কিন্তু পশুপাখি পোকা-মাকড় ঠিকই শোনে।

আমি মাথা চুলকে বললাম, বন-জঙ্গলে এই অন্ধকারে একা একা তাঁবুতে—

— অন্ধকার? অন্ধকার আপনাকে কে বলল?

রাতে অন্ধকার হবে না, বাতি জ্বালিয়ে আলো আর কতটুকু পাওয়া যায়?

বাতি আমি কখনোই জ্বালাই না, পোকা মাকড় এসে ভিড় করে। আমার ইনফ্রারেড চশমাটা পরে নিই, পরিষ্কার দেখা যায় তখন।

ইনফ্রারেড চশমা? সেটা কী জিনিস?

সফদর আলী হঠাৎ গলা নামিয়ে ফেললেন। ফিসফিস করে বললেন, খবরদার, কাউকে যেন বলবেন না, অন্ধকারে দেখা যায় এরকম চশমার জন্যে সবরকম লোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যস্ত হয়ে আছে।

এদিক-সেদিক তাকিয়ে যখন দেখলেন কেউ তাঁর কথা শুনছে না, তখন আমাকে বোঝালেন, ইনফ্রারেড চশমাটি কী জিনিস। আমরা যে আলো দেখতে পাই তার দৈর্ঘ্য যদি বেশি বা কম হয়ে যায়, তাহলে সেটাকে আর দেখা যায় না। যেসব আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি, তাকে ইনফ্রারেড বলে, সেটা নাকি আশ্চর্য কিছু নয়, যে কোনো গরম জিনিস থেকেই অদৃশ্য ইনফ্রারেড আলো ছড়ায়। সফদর আলী একটা চশমা তৈরি করেছেন, যেটা এই ইনফ্রারেড আলোকে সাধারণ আলোতে পরিণত করে দেয়। তাকে সেজন্যে কয়েকটা সি. সি. ডি. ব্যবহার করতে হয়েছে। সেটা কী জিনিস সফদর আলী আমাকে অনেকক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করলেন। আমি তবু ঠিক বুঝতে পারলাম না। যেটুকু বুঝলাম তাতেই চমৎকৃত হলাম, একটা পেশাদার চোর একটা ইনফ্রারেড চশমা পেলে কী খুশি হবে, সেটা আমার জন্যে কল্পনা করাও মুশকিল।

সফদর আলী ভ্রমণের জন্যে আরো কী কী আবিষ্কার করেছেন বললেন, তার "মাংস গুল্লি" 'মাছ গুল্লি" এবং সবজি গুল্লি বলে এক ধরনের ট্যাবলেট রয়েছে, সেগুলো মাংস, মাছ বা সবজিতে ছেড়ে দিয়ে পানি দিয়ে গরম করে নিলেই নাকি রান্না হয়ে যায়। তাঁর সেগুলো বেশি ব্যবহার করতে হয় না, কারণ তাঁর যে "স্বাস্থ্য গুল্লি" আছে, সেটা একটা খেলেই নাকি সারা দিন কিছু খেতে হয় না। এ ছাড়া আছে তাঁর দশবাহারি চুলো, মগ, ডেকচি, সসপ্যান, বালতি, চাকু, শাবল, কোদাল, টেবিল-ল্যাম্প এবং ইঁদুর মারার কল। এই দশটি জিনিসের কাজ করতে পারে বলে এর নাম দশবাহারি চুলো। তার আরেকটি আবিষ্কারের নাম হচ্ছে বাইনো ক্যামেরা। সেটা একই সাথে বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা। শুধু তা-ই নয়, সে ক্যামেরাতে নাকি ত্রিমাত্রিক ছবি ওঠে। সফদর আলীর সবচেয়ে মজার আবিষ্কার হচ্ছে "ভূতটিপি", এটি আসলে একটি ছোট ক্যাসেট রেকর্ডার। ভয় পেলেই এটা তিনি টিপে দেন। তখন সেটা ক্রমাগত আয়াতুল কুরসি পড়তে থাকে। আয়াতুল কুরসি পড়লে নাকি কখনো ভূত ধারে-কাছে আসে না।

আমরা আমাদের যাওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকি। ঠিক করা হল দু'সপ্তাহের জন্যে কক্সবাজার যাব, সেখান থেকে এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করা যাবে। বান্দরবন কাছেই, সেখানে শঙ্খ নদী দিয়ে পাহাড়ের ভেতর পর্যন্ত যাওয়া যায়। খুব নাকি সুন্দর জায়গা। ঢাকা থেকে চাটগাঁ পর্যন্ত ট্রেনে যাব, সেখান থেকে বাস। রাতের ট্রেনে রওনা দিলে ভোরে চাটগাঁ পৌঁছে যাব, তাহলে দিন থাকতে থাকতে কক্সবাজারে হাজির হওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই আমি স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। সাথে একটা স্যুটকেস আর একটা ছোট ব্যাগ। মা জোর করে একটা টিফিন ক্যারিয়ার ধরিয়ে দিয়েছেন, ভেতরে মাংস-পরোটা থাকার কথা। টিকিট আগে থেকে কিনে রেখেছিলাম, তাই স্টেশনের সামনে সফদর আলীর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে তিনি এসে হাজির। তাঁকে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম, পিঠে একটা অতিকায় ঝোলা নানারকম বেল্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে তাঁর শরীরের সাথে বাঁধা। ঝোলা থেকে নানারকম জিনিস বের হয়ে আছে, তলায় ছোট ছোট চাকা, মনে হল উপরে স্টিয়ারিং হুইলের মতো কী একটা আছে, প্রয়োজনে জিনিসটা ছোট একটা গাড়িতে পাল্টে গেলেও আমি অবাক হব না। সফদর আলীর মাথায় একটা বারান্দাওয়ালা টুপি। টুপির উপরে একটা বাতি, আপাতত সেটা নেভানো আছে। টুপি থেকে দুটি হেডফোনের মতো জিনিস নেমে এসেছে। টুপির উপরে রেডিওর অ্যান্টেনার মতো কী-একটা জিনিস বেরিয়ে আছে। তাঁর পরনে খাকি শার্ট আর গাঢ় নীল রঙের একটা প্যান্ট। শার্ট আর প্যান্টে সঠিক পকেটের সংখ্যা বলা মুশকিল। বাইরে থেকে অনুমান করি পঞ্চাশ থেকে সত্তরের ভেতরে হবে। তাঁর গলায় তাবিজের মতো কী একটা ঝুলছে। সেটা যদি তাঁর বিখ্যাত ভূতটিপি হয়, আমি অবাক হব না। তাঁর ডান হাতে লাঠির মতো একটা জিনিস, হাতের কাছে অসংখ্য সুইচ দেখে বুঝতে পারি এটি সাধারণ লাঠি নয়।

বলাই বাহুল্য, সফদর আলীকে ঘিরে একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেল। তিনি সেটাকে গ্রাহ্য না করে বললেন, চলুন প্ল্যাটফরমে যাই।

চলুন—আমি তাঁর মতো লোকজনের কৌতূহলের বিষয় হয়ে অভ্যস্ত নই, তাই তাড়াতাড়ি তাঁর পিছু পিছু সরে পড়ার চেষ্টা করি। সৌভাগ্যবশত প্ল্যাটফরমে এক জন আধপাগল গোছের লোক তার রসগোল্লায় মিষ্টি কম ছিল দাবি করে এক জন মিষ্টির দোকানির সাথে এমন হৈচৈ করে ঝগড়া শুরু করেছে যে কৌতূহলী দর্শকের ভিড়টা আমাদেরকে ঘিরে তৈরি না হয়ে তাদের দিকে সরে গেল। আমি গলা নামিয়ে বললাম, সবকিছু এনেছেন তো?

হ্যাঁ। কানের হেডফোনটা দেখিয়ে বললেন, সময়টা খারাপ, তাই এটা তৈরি করে নিলাম।

কী এটা?

আবহাওয়া অফিস। সরাসরি স্যাটালাইটের সাথে যোগাযোগ। ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি সুবিধের নয়, একটু ডিস্টরশান হয়।

আমি কিছু না বুঝে বললাম, ও।

কিছুক্ষণের মাঝেই ট্রেন লাগিয়ে দিল। আমরা উঠে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বসি। ট্রেনে বেশ ভিড়। ঘুমাতে পারব কি না সন্দেহ আছে, কিন্তু এক রাতের ব্যাপার, আমরা বেশি মাথা ঘামালাম না।

কক্সবাজার পৌঁছলাম পরদিন প্রায় বিকেলের দিকে। রাতে ভালো ঘুম হয় নি, সারা দিন বাসের ঝাঁকুনি। কিন্তু সে হিসেবে বেশ ঝরঝরে আছি, মনে হয় সকালে সফদর আলী যে দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছিলেন তার ফল। কালোমতন বিদঘুটে ট্যাবলেট, ভেতরে কী ছিল কে জানে। বাসে আমাদের পাশে দু' জন কলেজের ছেলে বসেছিল। তাদের কাছে শুনলাম কক্সবাজার পার হয়ে আরো পাঁচ ছয় মাইল গেলে নাকি চমৎকার নিরিবিলি এলাকা। একটা নাকি চমৎকার থাকার জায়গা আছে। ছেলে দু'টি আমাদের জায়গাটার নাম, কী ভাবে যেতে হয় গুছিয়ে বলে দিল। আমার নিজের এত বেশি নিরিবিলিতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সফদর আলীর খুব উৎসাহ। লোকজনের ভিড় তাঁর ভালো লাগে না, তিনি যেভাবে চলাফেরা করেন, সবসময়েই তাঁকে ঘিরে একটা ছোটখাট ভিড় জমে ওঠে, তিনি যে নিরিবিলিতে থাকতে চাইবেন

AMARBOI.COM

এতে অবাক হবার কী আছে?

খুঁজে খুঁজে আমরা যখন ঠিক জায়গায় হাজির হলাম, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। শুক্লপক্ষের রাত, চমৎকার চাঁদ উঠেছে। সমুদ্রে তার প্রতিফলন দেখে মাথা খারাপ হয়ে যায়, সফদর আলীর মতো এরকম কট্টর বিজ্ঞানী মানুষ পর্যন্ত খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, কী চমৎকার লাগছে! দেখেছেন কেমন কোমল একটা ভাব?

আমি মাথা নাড়লাম।

আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? চাঁদের আলোতে রং বোঝা যায় না। আমাদের চোখের রেটিনাতে তখন শুধু রডগুলো কাজ করে। রডগুলো রং ধরতে পারে না, তাই কনট্রাস্ট কমে যায়, মনে হয় খুব কোমল।

জিনিসটি বুঝিয়ে দেয়ার পরও আমার কিন্তু ভালোই লাগে।

আমরা হোটেলের দরজা খুলে ভেতরে এসে ঢুকি। আমাদের শব্দ শুনে মাঝবয়সী এক জন লোক বেরিয়ে আসেন। ভদ্রলোকের পোশাক দেখার মতো, শৌখিন মানুষের হাতে পয়সা হলে যা হয়। চকচকে কাপড়–জামা তো আছেই, তার উপর হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে মোটা মোটা আংটি, গলায় সোনার চেন। ভদ্রলোক আমাদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন, আমি বললাম, আপনাদের ঘর খালি আছে? সপ্তাহ দুয়েক থাকার মতো?

দু' সপ্তাহ? ভদ্রলোক খুশি না হয়ে মনে হল একটু শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

জ্বি।

আছে ঘর কয়েকটা। কাউন্টার থেকে কাগজপত্র বের করতে করতে বললেন, কোথা থেকে আসছেন?

AMARBOI.COM

ঢাকা।

প্লেনে এলেন?

না, ট্রেন আর বাস।

ও! তাহলে তো আপনাদের অনেক ধকল গেছে। ঠিক আছে, আগে আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই, দু'জনের জন্যে ভালো একটা ঘর আছে। নাম লেখালেখি করার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক কাউন্টার থেকে চাবি বের করে এগিয়ে যান, আমরা পিছু পিছু যেতে থাকি।

ঘর দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। চমৎকার ঝকঝকে ঘর। দু'পাশে দু'টি সুদৃশ্য বিছানা, জানালার পর্দা টেনে দিলে সমুদ্র দেখা যায়। ঘরের সাথে বাথরুম, সামনে বারান্দা। ভেতরে টেবিল, টেবিলে সুদৃশ্য কাচের জগে পানি। এত আয়োজনের তুলনায় ঘরভাড়া খুব কম, আমি অবাক না হয়ে পারি না। ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে জানলাম তিনিই হোটেলের মালিক, নিজেই দেখাশোনা করেন। আত্মীয়স্বজন বিশেষ নেই। একা একা নিরিবিলি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান। আমাদের গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন, যাওয়ার আগে বলে গেলেন কোথায় আমরা খেতে পারব, এখান থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা নাকি ভালো রেস্তরাঁ আছে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দু'জনে অনেক সময় নিয়ে গোসল করে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে বের হলাম। চাঁদের আলোতে সমুদ্রের তীর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মনটা অকারণেই খুশি হয়ে ওঠে। খুঁজে খুঁজে রেস্তরাঁটি বের করে খেয়ে নিলাম দু'জনে। খুব

উঁচুদরের খাবার, সেরকম দাবি করব না, এ অঞ্চলের মানুষেরা বোধহয় ঝাল একটু বেশিই খায়। সফদর আলীর পকেটে "ঝালধ্বংস" ট্যাবলেটটা না থাকলে খেতে পারতাম কি না সন্দেহ। একটা ছোট ট্যাবলেট মাছের ঝোলে ছেড়ে দিতেই সে সব ঝাল শুষে নিল, সত্যি বলতে কি, স্বাদও খানিকটা শুষে নিয়ে স্বাদটা কেমন জানি পানসে করে দিল। পেটে খিদে ছিল, তাই খেতে বিশেষ অসুবিধে হয় নি।

খেয়ে বের হয়েছি, একটু হাঁটতেই মনে হল যেন একটা মাছের বাজার। মাছের আঁশটে গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। বেশ রাত হয়েছে, কিন্তু অনেক লোকজন। খাওয়ার ঠিক পরপরই এরকম আঁশটে গন্ধ ভালো লাগার কথা নয়, কিন্তু সফদর আলী গোঁ ধরলেন তিনি বাজারটা দেখবেন। সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনা হয়েছে, বড় বড় কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে পাইকারি বেচাকেনা হচ্ছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব মাছ, দেখে তাক লেগে যায়। ভিড়ে এক জায়গায় মাঝারি একটা হাঙরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, সফদর আলী হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, সাবধান!

কী হল?

এক জন লোক অনেকক্ষণ থেকে আমাদের পিছু পিছু ঘুরছে।

সফদর আলী আগেও অনেক বার দাবি করেছেন, তাঁকে নাকি সি. আই. এ. এবং কে. জি. বি.-র লোকেরা অনুসরণ করে বেড়ায়, কখনো বিশ্বাস করি নি। এবারেও আমি কথাটা হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সফদর সাহেব ভুরু কুঁচকে চিন্তিত মুখে গোঁফ টানতে লাগলেন। আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, কোন লোকটা?

আসেন, দেখাচ্ছি।

বাজার থেকে বের হয়ে একটু হেঁটে এগিয়ে যেতেই দেখি সত্যি তাই। আমরা একটু এগুতেই একটা লোক এগোয়, আমরা দাঁড়াতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে কালঘাম ছুটে যাবার মতো অবস্থা। কী করব বুঝতে পারছিলাম না, বাজারে ভিড়ের মধ্যেই ভালো ছিলাম, রাস্তাটা এদিকে আবার বেশ নির্জন। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাজারে ফিরে যাব কি না ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি লোকটার হাতে একটা টর্চলাইট জ্বলে উঠল, আলো ফেলে ফেলে লোকটা এগিয়ে আসতে থাকে সোজা আমার দিকে। কাছে এসে আমার মুখে আলোটা ফেলে মেঘস্বরে বলল, দাঁড়ান এখানে।

ভয়ে আমার কাপড় জামা-নষ্ট হবার অবস্থা, তোতলাতে তোতলাতে কোনোমতে বললাম, আমি?

আমার ধারণা ছিল লোকটা নিশ্চয়ই আমাকে সফদর আলী বলে ভুল করেছে; কিন্তু দেখা গেল তা নয়। লোকটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কালো কুচকুচে পিস্তল বের করে আনে, আমার দিকে তাক করে বলে, হ্যাঁ, আপনি। একটা টুঁ শব্দ করলে গুলি করে খুলি উড়িয়ে ঘিলু বের করে দেব।

আমি মাথা ঘুরে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম, তার মাঝে দেখি সফদর আলী পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী একটা জিনিস বের করে লোকটার দিকে তাক করেছেন। কিছু বোঝার আগেই তিনি হঠাৎ সুইচ টিপে দিলেন। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা নীল আলো বের হল। আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম, লোকটা আর্তনাদ করে দশ হাত

AMARBOI.COM

দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। হাত থেকে টর্চ আর পিস্তল ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। তার মাঝে সফদর আলী দৌড়ে লোকটার বুকের উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলছেন, একটু নড়বে না, নড়লেই আরেকটা দেব, ডাবল করে দেব পাওয়া—

আমি বললাম, কথা বলছেন কি? আরেকটা দিয়ে দিন আগে, নড়ছে যে এখনো।

লোকটার নড়ার আর কোনো ইচ্ছা নেই, কাতর স্বরে বলল, ইকবাল, আমাকে বাঁচা। আমি মতিন, ঠাকুরপাড়ার মতিন।

আমার সম্বিত ফিরে আসে, দৌড়ে টর্চলাইটটা তুলে লোকটার দিকে এগিয়ে যাই, সত্যিই মতিন, চোখে আলো ফেলে আমার চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছিল বলে দেখতে পাই নি, না হয় মতিনকে না চেনার কোনো কারণ নেই, ও আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমার মুখে কথা সরে না, তোতলাতে তোতলাতে বলি, তু-তু-তু-তুই—

সফদর আলী ততক্ষণে মতিনের বুক থেকে পা সরিয়ে তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন। সে উঠে হাতড়ে-হাতড়ে পিস্তলটা তুলে নেয়, বার কয়েক লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, বাজারে দেখলাম তোকে। ভাবলাম, তুই যেরকম ভীতু, একটু মজা করি তোর সাথে। সর্বনাশ—আরেকটু হলে তো মরেই গিয়েছিলাম।

আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম, ইনি সফদর আলী, আমার বন্ধু।

মতিন তখনো হাঁপাচ্ছে, কোনোমতে বলল, খালি গল্প শুনেছিলাম স্টান্টগানের, আজ দেখলাম।

স্টান্টগান?

হ্যাঁ, যেটা দিয়ে মারলেন আমাকে।

ও! সফদর আলী পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট হাতলওয়ালা জিনিসটা বের করলেন, এটাকে স্টান্টগান বলে নাকি? জানতাম না তো।

জানতেন না মানে? মতিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, লাইসেন্স করান নি?

লাইসেন্স?

বন্দুক লাইসেন্স করাতে হয় জানেন না? কে বিক্রি করেছে আপনাকে?

আমাকে কেউ বিক্রি করে নি, আমি নিজেই তৈরি করেছি।

মতিন খানিকক্ষণ অবাক হয়ে সফদর আলীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি বললাম, সফদর আলী হচ্ছেন বিজ্ঞানী মানুষ, অনেক কিছু ইনি তৈরি করেছেন।

সফদর আলী বিরস মুখে স্টান্টগানটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, খানিকক্ষণ পর আস্তে-আস্তে বললেন, জন্ম নিতে-নিতে একটু দেরি হয়ে গেল।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

একটু ঝাঁজিয়ে উত্তর দিলেন, দেখছেন না, যেটাই তৈরি করি সেটাই আগে আবিষ্কার হয়ে গেছে! বাকি আছে কী?

মতিন কী একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, কাছাকাছি কোনো বাথরুম আছে? তুই যখন বন্দুকটা ধরলি, ভয়ে পেটটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল, এখন মনে হচ্ছে—

হ্যাঁ, আছে। ঐ তো ওদিকে—হঠাৎ করে পেট খারাপ নাকি?

সফদর আলী বললেন, নার্ভাস ডাইরিয়া। ভয় পেলে হয়, হঠাৎ করে

ইনটেস্টাইনে—

ব্যাখ্যাটা শোনার সময় ছিল না, মতিনের সাথে আমি দৌড়ালাম।

মতিন কী কাজ করে বলা মুশকিল। পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর ইন্টেলিজেন্সের লোক। পরিষ্কার করে কখনো বলে না, কে জানে হয়তো বলা নিষেধ। একসাথে দু'জন কলেজে গেছি, কিন্তু এখন দেখা হয় খুবই কম। খুব ব্যস্ত ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাকে এখানে দেখব কখনো চিন্তাও করি নি। কোথায় এসেছে, কী করছে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, প্রশ্নগুলো খুব কায়দা করে এড়িয়ে যায়। আমাদের দু'জনকে তার বাসায় নিয়ে এসেছে, কাছেই বাসা। আমাদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে এসে মতিন খুটিয়ে খুটিয়ে সফদর আলীকে দেখে, একটু ভয়ে ভয়েই। এরকম একটা সংঘর্ষ দিয়ে পরিচয়, ভয় না করে উপায় কি? চেয়ার টেনে একটু দূরে বসে, সফদর আলী একটু ক্ষেপে তাকে আরেকটা শক্ দেন, সেই ভয়ে কি না কে জানে।

আমি ভয়টা ভাঙিয়ে দেয়ার জন্যে কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন টেলিফোন বেজে ওঠে। মতিন ব্যস্ত হয়ে গিয়ে টেলিফোনটা ধরে, হ্যালো, কে? মজুমদার?

ওপাশ থেকে কী বলল কে জানে, মতিনের গলার স্বর হঠাৎ নেমে আসে। শোনা যায় না, এমন। গোপন জিনিস নিয়ে কথা হচ্ছে, চায় না আমরা শুনি। আমার একটু অস্বস্তি লাগতে থাকে। সফদর আলীর কথা ভিন্ন, মতিনের গলার স্বর নিচু হতেই তাঁর কান যেন খাড়া হয়ে ওঠে, তিনি গলা লম্বা করে ঘাড় বাঁকিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে মতিনের কথা শোনার চেষ্টা করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে থাকেন, যেন সবকিছু বুঝে ফেলছেন। দেখে আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাবার মতো অবস্থা।

মতিন কথা শেষ করে একটু অপরাধীর ভঙ্গি করে ফিরে এসে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সফদর আলী বাধা দিয়ে বললেন, অবস্থা তাহলে সত্যিই খারাপ?

মতিন থতমত খেয়ে বলল, কিসের অবস্থা?

হেরোইন তৈরি। এখানেও তৈরি শুরু করেছে তাহলে?

মতিনের চোয়াল ঝুলে পড়ল, খানিকক্ষণ সে কোনো কথা বলতে পারে না। আবার যখন চেষ্টা করে তখন গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, আপনি—মানে আপনি কী ভাবে জানেন?

টেলিফোনে কথা বলছিলেন, তা–ই শুনছিলাম।

কিন্তু টেলিফোনে আমি তো কথা বলছিলাম না, শুনছিলাম।

একটা দুটো কথা তো বলছিলেন, তা থেকেই বোঝা যায়। সফদর আলী গলার স্বর পাল্টে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা যত বার ওদের ল্যাবরেটরিতে হানা দেন তত বার ওরা পালিয়ে যায়?

মতিনের মাথায় মনে হয় বাজ পড়ল। সে ঘুরে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে একটা চেয়ার ধরে সামলে নেয়। ঢোক গিলে বলল, কী বললেন?

যত বার বর্ডারে ওদের ল্যাবরেটরিতে হানা দেন তত বারই আগে খবর পেয়ে পালিয়ে যায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতিনের মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায়, অনেকক্ষণ লাগে ওর কথা বলতে। যখন বলে তখন গলার স্বর শুনে মনে হয় একটা ফাটা বাঁশের ভেতর দিয়ে কথা বলছে। তোতলাতে-তোতলাতে বলল, সা-সাংঘাতিক গোপন ব্যাপার এটা, সারা দেশে মাত্র দশ বার জন লোক জানে। বাইরের কিছু দেশ সাহায্য করছে খবরাখবর দিয়ে, কিন্তু আপনি কী ভাবে জানলেন?

সফদর আলীর মুখ খুশিতে হাসি হাসি হয়ে ওঠে, কেন ও তো খুবই সহজ। কথা বলতে বলতে আপনি একসময় বললেন, অ্যাসিড। অ্যাসিড কোথায় কাজে লাগে, হেরোইন তৈরি করতে। তার মানে এখানে কোথাও হেরোইন তৈরি হচ্ছে। এখন পপি ফুলের সময়, পপি ফুল থেকে হেরোইন তৈরি হয় এ তো সবাই জানে। মতিনের দিকে আর তাকানো যাচ্ছিল না। কী একটা বলতে যাচ্ছিল। সফদর আলী বাধা দিলেন। তারপর একসময় বললেন, "চিড়িয়া", পুরোটা শুনতে পাই নি, নিশ্চয়ই বলেছেন "চিড়িয়া উড় গিয়া", মানে পাখি উড়ে গেছে। তার মানে কী হতে পারে? অতি সহজ—আপনারা যখন ল্যাবরেটরিতে হানা দিয়েছেন সবাই আগে খবর পেয়ে পালিয়ে গেছে। বোঝা কঠিন কি?

মতিনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার একটু ভয় ভয় করতে থাকে, সে ফ্যাকাসে মুখে এক বার সফদর আলীর দিকে, এক বার আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল কেঁদে দেবে। কিন্তু কাঁদল না। কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, হেরোইন ব্যাপারটা আপনি ঠিকই ধরেছেন।

সফদর আলী বললেন, বললাম না, খুবই সহজ ব্যাপার।

মতিন বলল, কিন্তু ধরেছেন একেবারে ভুল করে। আমি যখন "অ্যাসিড" কথাটা বলেছি, তখন আমার উপরওয়ালার অ্যাসিড অ্যাসিড মন্তব্যের কথা বলছিলাম। যখন চিড়িয়ার কথা বলেছি, তখন এক জন ইনফরমারের কথা বলছিলাম, সে হচ্ছে এক আজব চিড়িয়া।

AMARBOI.COM

এবারে সফদর আলীর চোয়াল ঝুলে পড়ে। অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে কী একটা বলতে গিয়ে তোতলাতে থাকেন। আমি কী করব বুঝতে না পেরে বোকার মতো হেসে উঠি, সে হাসি আর কিছুতেই থামাতে পারি না। আমার দেখাদেখি প্রথমে মতিন তারপর সফদর আলীও হাসতে শুরু করেন।

অনেকক্ষণ লাগে আমাদের হাসি থামাতে। তার ভেতর আবার চা এসে যায়। আমরা খেয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে নিই। মতিন পুরো ব্যাপারটিতে এত অবাক হয়েছে যে বলার নয়, সম্পূর্ণ ভুল জিনিসের উপর ভিত্তি করে কেউ যে এরকম পুরোপুরি একটা সত্যি জিনিস বের করে ফেলতে পারে, সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ব্যাপারটা আমরা যখন জেনেই গেছি তখন আর গোপন করে কী হবে। মতিন সবকিছু খুলে বলে, অবশ্যি আমাদের কথা দিতে হয় সেটা কাউকে বলব না। জিনিসটা জানাজানি হয়ে গেলে হেরোইন কারবারিদের আর ধরা যাবে না।

হেরোইন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মাদকদ্রব্যের একটা। খুব সহজেই মানুষ হেরোইনে আসক্ত হয়ে পড়ে। তখন নিয়মিত হেরোইন না নিয়ে উপায় থাকে না। পাশ্চাত্যে যত অপরাধ হয় তার বড় একটা কারণ হচ্ছে এই হেরোইন। পৃথিবীর নানা দেশে এটা তৈরি হয়, তারপর গোপনে পাঠানো হয় পাশ্চাত্যে। কোটি কোটি টাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবসা এই হেরোইন দিয়ে। আগে এটা বার্মায় তৈরি হত, সেখানে পুলিশের ধাক্কা খেয়ে এখন সীমান্ত পার হয়ে এদেশে চলে এসেছে। পাহাড়ের উপর গোপন ল্যাবরেটরিতে তৈরি হচ্ছে হেরোইন। সবচেয়ে মজা হচ্ছে, যত বার খবর পেয়ে ওদের ধরতে গিয়েছে, ওরা কী ভাবে কী ভাবে খবর পেয়ে পুরো ল্যাবরেটরি তুলে পালিয়ে গেছে। ল্যাবরেটরি অবশ্যি এমন কিছু জমকালো ব্যাপার নয়। ছোট ছোট বাসনপত্র, কোরোসিনের চুলো, কিছু কেমিক্যাল সরিয়ে নেয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। সবচেয়ে যেটা দুশ্চিন্তার বিষয় সেটা হচ্ছে প্রত্যেক বারই ওরা আগে কী ভাবে জানি খবর পেয়ে যায়। কেউ নিশ্চয়ই আগে থেকে খবর দিয়ে দেয়। কী ভাবে সেটা হয় কেউ বলতে পারছে না। অনেকে সন্দেহ করছে পুলিশে বোধহয় ওদের লোক আছে। ব্যাপারটা তাই বাড়াবাড়ি রকম গোপন।

সবকিছু শুনে সফদর আলী খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এরকম ব্যাপার তিনি আগে শোনেন নি। মতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, ল্যাবরেটরিটা কতদূর এখান থেকে?

তিরিশ মাইলের মতো। প্রথম দশ মাইল রাস্তা আছে, জিপে যাওয়া যায়। বাকিটা হেঁটে যেতে হয়। অনেক সময় লাগে পৌঁছুতে।

তার মানে ওরা পালিয়ে যাবার জন্যে যথেষ্ট সময় পায়।

হ্যাঁ।

খবরটা নিশ্চয়ই ওয়্যারলেসে পায়।

নিশ্চয়ই, এর থেকে ভালো উপায় কি হতে পারে?

সফদর আলী চিন্তিত মুখে বললেন, ওদের কেউ যদি রাস্তার ওপর চোখ রাখে, তাহলে আপনারা যখন জিপে রওনা দেন, দেখেই তো বুঝে ফেলবে। সাথে সাথে ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়ে দেবে।

হ্যাঁ, আমরা তাই যখন জিপে রওনা দিই তখন চেষ্টা করি ওয়্যারলেসে কোনো কথাবার্তা, সংকেত ধরতে পারি কি না।

কী ভাবে করেন সেটা? সফদর আলী তার মনের মতো বিষয় পেয়ে প্রায় ডুবিয়ে দেন নিজেকে, কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে খোঁজেন?

মতিন মাথা চুলকে বলল, সেটাই হয়েছে মুশকিল। ফ্রিকোয়েন্সি তো একটা দু'টা নয়, অসংখ্য—একটা মস্ত বড় রেঞ্জ। এখানে এয়ারপোর্ট আছে, জাহাজের ফ্রিকোয়েন্সি আছে, পুলিশ আর্মির ফ্রিকোয়েন্সি আছে, আজকাল আবার স্যাটালাইট থেকে আসছে, পাবলিকের ফ্রিকোয়েন্সিতে তো হাতই দেয়া যায় না। কী ভাবে যে ঠিক ফ্রিকোয়েন্সিটা বেছে নেয়া যায়, সেটাই হচ্ছে মুশকিল।

সফদর আলী উৎসাহে আরো এগিয়ে আসেন, ঠিক যখন আপনারা রওনা দেন তখন যদি হঠাৎ করে কোনো সিগন্যাল পাঠানো হয় এই এলাকা থেকে—

মতিন মাথা নেড়ে বলল, সেটাই করতে চাচ্ছি। যদি সেই সিগন্যালটা শুনতে পাই, ধরতেও তো হবে। আমাদের কাছে ভালো যন্ত্রপাতি নেই, পাঠাতে লিখেছি হেড অফিসে, শুধু দেরি করছে।

সফদর আলীর চোখ চকচক করে ওঠে, আমার কাছে একটা আছে, রিজোলিউশন বেশি নয়, তবে—

মতিন চোখ কপালে তুলে বলল, আপনার কাছে আছে? আপনি কী করেন এটা

দিয়ে?

সফদর আলী লাজুকভাবে একটু হেসে বললেন, তৈরি করেছিলাম অন্য কাজে, ভেবেছিলাম যদি সমুদ্রে যাই জেলে নৌকা করে, হঠাৎ হারিয়ে গেলে কাজে লাগবে। ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা একটু পাল্টে নিলেই ব্যবহার করা যাবে। যদি আমি—

আমাকে পুরোপুরি ভুলে গিয়ে দু'জনে খুব উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলতে থাকে, সফদর আলীর জিনিসটা কী ভাবে কাজ করে সেটাই আলোচ্য বিষয়। ফ্রিকোয়েন্সি, এফ. এম., এ. এম. মডুলেশান, ডিমডুলেশান, ট্র্যাকিং, ফিডব্যাক—এধরনের কথাবার্তা আলোচনা হতে থাকে। আমি চুপচাপ বসে বসে হাই তুলতে থাকি, দু'জনের কেউই ঘুরে পর্যন্ত তাকায় না। বসে বসে আমি অধৈর্য হয়ে উঠি আর আমার রাগটা ওঠে সফদর আলীর ওপর। এখন বসে বসে এসব নিয়ে কচকচি না করলে কী হত? বসে বসে বিরক্ত হতে হতে একসময়ে আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলতে শুরু করে। ঠিক করলাম সফদর আলীকে ভূতের ভয় দেখাতে হবে। বেড়াতে এসে যে ফ্রিকোয়েন্সি আর ফিডব্যাক নিয়ে কচকচ করতে থাকে, ভূতের ভয় দেখিয়েই তাকে উপযুক্ত সাজা দিতে হবে। কী ভাবে করা যায় সেটাও মনে মনে ছকে ফেললাম। ঘুমানোর আগে একটা দুটো ভূতের গল্প করব সফদর আলীর সাথে। গোরস্থানের গোর খুঁড়ে মৃতদেহ বের করার একটা গল্প আছে ভয়ানক। লাশকাটা ঘরেরও ক'টা গল্প জানি। ভীষণ ভয়ের সেটা। হোটেল সম্পর্কে কিছু আজগুবি জিনিস শুনিয়ে তাকে আগে থেকে নরম করে রাখা যাবে। রাতের বেলা কাউকে রাজি করাতে হবে সাদা চাদর জড়িয়ে হাজির হতে। সফদর আলীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে একটা নাকিকান্না দিলেই হবে। সফদর আলীকে তাহলে আর দেখতে হবে না। ভয় পেয়ে তিনি তার ভূতটিপি টিপে টিপে কী অবস্থা করবেন চিন্তা করেই আমার হাসি পেয়ে যায়। বোধহয় সত্যি সত্যি হেসে ফেলেছিলাম। কারণ হঠাৎ দেখি সফদর আলী আর মতিন কথা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মতিন বলল, কী হল?

নাহ্, কিছু না। আমি অপ্রতিভভাবে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু হাসিটাতে মনে হল একটু কাজ হল, কারণ মতিন তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, সর্বনাশ, অনেক রাত হয়ে গেছে, তোরা তো ঘুমাবি। সারা দিন ট্রেনে-বাসে কষ্ট করে এসেছিস।

সফদর আলী কিছু বলার আগেই আমি তার কথাটি লুফে নিলাম, উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ঠিকই বলেছিস, শরীরটা জুত করতে পারছে না।

সফদর আলীর মনে হল এরকম জমাট বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বাধা পড়ল বলে একটু মনঃক্ষুণ্ন হলেন, কিন্তু আপত্তি না করে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। মতিন বলল, চল্ পৌঁছে দিয়ে আসি তোদের। এখানে আমাকে একটা ভাঙা জিপ দিয়েছে। জিপটা যদি স্টার্ট নেয়, তোদের তাহলে হেঁটে যেতে হবে না।

জিপটা বেশ সহজেই স্টার্ট নিল, দেখে মনে হল সফদর আলী যেন একটু হতাশ হলেন। যদি স্টার্ট না নিত তিনি হুড খুলে জিপের যন্ত্রপাতি একটু টেপাটেপি করার সুযোগ পেতেন। রওনা দেবার আগে মতিন জিজ্ঞেস করল, কোথায় উঠেছিস তোরা?

আমি হোটেলের নাম বলতেই মতিন বলল, তাই নাকি? আমরা সন্দেহজনক মানুষদের নামের যে লিস্ট বানিয়েছি, তোদের হোটেলের মালিকের নাম আছে তাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে কী! আমি অবাক হয়ে বললাম, চমৎকার ভালো মানুষ এক জন, সে বেচারা কী দোষ করল?

কোনো দোষ করে নি, কিন্তু তবু খানিকটা সন্দেহ আছে। হেরোইন আজকাল নাকি ঢাকা এয়ারপোর্ট দিয়ে বিদেশি বাজারে চালান দেয়া হয়। তার মানে এই এলাকার কোনো লোক কাজকর্ম না করেই হঠাৎ করে বড়লোক হয়ে উঠছে কি না, ঢাকা যাচ্ছে কি না ঘন ঘন, এইসব রুটিন ব্যাপার আর কি। প্রায় জনা ত্রিশেক লোককে আমরা সন্দেহ করি, তার মাঝে তোদের হোটেলের মালিকও আছে।

খামোখা সন্দেহ করেছিস মনে হয়, আমি না বলে পারলাম না, চমৎকার ভালোমানুষের মতো চেহারা, কী সুন্দর ব্যবহার!

তোরা তো আছিস হোটেলে, দেখিস তো লোকটা সন্দেহজনক কিছু করে কি না। আবার বাড়াবাড়ি কিছু করিস না যেন।

কোনো ভয় নেই তোর, আমি মতিনকে সাহস দিই, পাকা ডিটেকটিভদের মতো কাজ করব আমরা।

সফদর আলী বললেন, ওর ঘড়িটা খুলে আমার মাইক্রোট্রান্সমিটারটা ঢুকিয়ে দিতে পারলে—

মতিন বাধা দিয়ে বলল, না না না, সর্বনাশ! ওসব জিনিসের ধারে-কাছে যাবেন না, খবরদার।

সফদর আলীর একটু মন খারাপ হয়ে গেল বলে মনে হল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর আমার বেশ খানিকক্ষণ লাগল বুঝতে আমি কোথায়। নতুন জায়গায় ঘুমালে আমার সবসময় এরকম হয়। হঠাৎ মনে পড়ল আমি কোথায়, সাথে সাথে মনে পড়ল যে আমি ছুটি কাটাতে বেড়াতে এসেছি। অনেক বেলা হয়ে গেছে, কিন্তু ওঠার কোনো তাড়া নেই, চিন্তা করেই আমার আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চায়, ভাবলাম আরো খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিই, কিন্তু আর ঘুম আসতে চাইল না। খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করে শেষ পর্যন্ত উঠেই পড়লাম, পাশের বিছানাতে সফদর আলী কুণ্ডলী পাকিয়ে ছোট বাচ্চাদের মতো শুয়ে আছেন। তাঁকে না জাগিয়ে বাথরুমে গেলাম দাঁত মেজে গোসল ইত্যাদি সেরে ফেলতে। অনেক সময় নিয়ে সবকিছু শেষ করে যখন বের হয়ে এলাম, তখনো সফদর আলী ঘুমে। ঘড়িতে তখন দশটা বেজে যাচ্ছে। তাঁকে না জাগিয়ে আমি বেরিয়ে আসি, সামনে বিস্তীর্ণ সমুদ্র দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। হোটেলের সামনে একটা খুব আরামের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে আমাদের হোটেলের মালিক। তার হাতে দু'টি কবুতর, নিচে আরো কয়েকটি দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ভদ্রলোকের খুব পাখির শখ বলে মনে হয়। আমাকে দেখে ভালোমানুষের মতো হাসলেন, আমিও দাঁড়িয়ে ভদ্রতার একটা দুইটা কথা বললাম। মতিন বলেছিল, হোটেল মালিক সন্দেহজনক কিছু করে কি না দেখতে, কিন্তু এরকম নিরীহ গোবেচারা মানুষ সন্দেহজনক কী করতে পারে আমি বুঝে পেলাম না। আমি তবুও পাকা ডিটেকটিভের মতো সবকিছু সন্দেহের চোখে দেখতে থাকি, কবুতরগুলো পর্যন্ত বাদ গেল না।

বেশ খানিকক্ষণ গল্পগুজবে কেটে গেছে, হঠাৎ শুনি জিপের শব্দ। মতিন আসছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি না দেখার জন্যে চোখ তুলে দেখি কটা জিপভর্তি পুলিশ দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। এদিকে গাড়ির যাতায়াত কম, তাই একটা কিছু গেলেই দশজন দাঁড়িয়ে দেখে, হোটেল মালিকও ঘাড় ঘুরিয়ে জিপটাকে দেখলেন। জিপটা কোথায় কেন যাচ্ছে বুঝতে আমার একটুও দেরি হল না। এখন হোটেল মালিককে চোখে-চোখে রাখলেই বুঝতে পারব সে সন্দেহজনক কিছু করছে কি না। সে যদি হেরোইন কারবারিদের এক জন হন, তাহলে তাঁকে এখন উঠে পড়তে হবে। ঘরের ভেতরে গোপন কোনো ওয়্যারলেসে খবর পাঠাতে হবে। পাকা ডিটেকটিভদের মতো আমি ঠিক করলাম তা হলে আমি কী করব, আমিও তাহলে সফদর আলীকে ডেকে তুলব ওয়্যারলেসের সংকেতটা ধরতে।

হোটেল মালিক জিপটাকে দূরে প্রায় অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকেন, আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। চোখে চোখ পড়তেই বললেন, পুলিশ মাঝে মাঝেই ওদিকে যায়, আরাকান থেকে ডাকাত আসে কি না কে জানে।

আমি বললাম, তাই নাকি?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বসে থাকেন। ওঠার কোনো লক্ষণ দেখালেন না। বসে বসে কবুতর নিয়ে খেলতে থাকেন। খুব শখের কবুতর নিশ্চয়ই।

প্রায় মিনিট পনের পার হয়ে গেল। ভদ্রলোক তবু চুপচাপ বসে রইলেন। হেরোইন কারবারি হলে এতক্ষণে উঠে যেতেন নিশ্চয়ই। হোটেল মালিক শুধু যে বসে আছেন তাই নয়, ওঠার জন্যে উসখুস পর্যন্ত করছেন না। কবুতর নিয়ে বসে বসে ক্লান্ত হয়ে একসময়ে কবুতরগুলো উড়িয়ে দিয়ে আরামের চেয়ারটাতে আধশোয়া হয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকেন। হোটেলের এক জন কর্মচারী এসে একবার কোন-কোন রুমের বিছানার চাদর পাল্টাতে হবে জিজ্ঞেস করে গেল। ভদ্রলোক শুয়ে শুয়েই তার সাথে কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি উঠে একটু এদিক-সেদিক হেঁটে আসি। হোটেল মালিককে কিন্তু সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছিলাম। একসময় দেখি সফদর আলী বেশ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসছেন। আমার খোঁজেই সম্ভবত। সফদর আলী আমার কাছে এলে আমি তাকে পুরো ঘটনাটি বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে খুলে বললাম, একেবারে পাকা ডিটেকটিভদের মতো। সফদর আলীর উৎসাহ আমার থেকে বেশি। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘরে গিয়ে তার সেই যন্ত্র বের করে এলেন। হোটেল মালিক চেয়ার থেকে উঠে ভেতরে গেলেই তিনি সেটা চালু করে দেবেন। এই হোটেল থেকে যদি খবর পাঠানো হয় তাহলে নাকি সেটা ধরে ফেলা পানির মতো সোজা। হোটেল মালিক কিন্তু উঠলেন না, মনে হল চেয়ারে বসে বসে একসময় যেন একটু ঘুমিয়েই পড়লেন।

আমাদের সকালে নাস্তা করা হয় নি, খিদে বেশ চাগিয়েই উঠেছে। কিন্তু ডিটেকটিভের এরকম একটা দায়িত্ব ছেড়ে তো যেতে পারি না। প্রায় দু'ঘন্টা পর হোটেল মালিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, সাথে সাথে আমরাও উঠে পড়ি। সফদর আলী গুলির মতো ঘরে চলে গেলেন, আমি হোটেল মালিকের পিছু পিছু। হোটেল মালিক ভেতরে ঢুকে কাউন্টারে বসে গুন-গুন করে কী একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কাগজপত্র দেখতে থাকেন। সামনের সোফাতে সেদিনের খবরের কাগজ পড়ে ছিল আমি সেটা দেখার ভান করে তাঁকে লক্ষ করতে থাকি একেবারে পাকা ডিটেকটিভদের মতো।

AMARBOI.COM

প্রায় ঘন্টা তিনেক হোটেল মালিককে চোখে চোখে রেখে বুঝতে পারি যে খামাখা সময় নষ্ট হল। জীবনের প্রথম ডিটেকটিভ কাজের যে এরকম বৈচিত্র্যহীন একটা অভিজ্ঞতা হবে কে জানত। প্রচণ্ড খিদেয় তখন পেট চোঁ চোঁ করছে। সকালে নাস্তা পর্যন্ত হয় নি। আমার অবস্থা তবু ভালো হাত-পা ছড়িয়ে বসেছিলাম, সফদর আলী বেচারা সেই যে ঘরে ঢুকে তার যন্ত্রপাতি খুলে কানে হেডফোন লাগিয়ে বসেছেন একবার ওঠেন নি পর্যন্ত।

আমরা দু'জনে ডিটেকটিভের কাজে ইস্তফা দিয়ে বের হলাম, প্রথমে কিছু একটা খেতে হবে তারপর মতিনকে খুঁজে বের করে রিপোর্ট দেওয়া। মনে মনে আশা করছিলাম হোটেল মালিককে বোকা বানিয়ে পুরো হেরোইন কারবারির দলটাকে হাতেনাতে ধরে ফেলব, খবরের কাগজে আমাদের ছবিটবি উঠে যাবে। কিন্তু আমাদের কপাল মন্দ, হোটেল মালিক বেচারা নেহায়েতই নিরীহ গোবেচারা এক জন মানুষ।

মতিনকে তার বাসায় পাওয়া গেল না, ভোরবেলা নাকি বেরিয়ে গেছে। আমরা খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে বেড়াই। সফদর আলীর সাথে ঠিক কথাবার্তা বলা যাচ্ছে না। তিনি খুব অন্যমনস্ক। কী যেন খুব মন দিয়ে ভাবছেন। হুঁ-হাঁ করে উত্তর দেন। মাঝে মাঝে এমন একটি দুটি কথা বলেন, যার কোনো মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, ক'টা নাকি ক্যাং আছে খুব সুন্দর, যাবেন সেখানে?

সফদর আলী বললেন, হুঁ।

খুব চমৎকার নাকি একটা বৌদ্ধমূর্তি আছে সেখানে।

হ্যাঁ।

চলুন যাই, এদিক দিয়ে মাইলখানেক গেলেই নাকি পৌঁছে যাব।

হুঁ।

সময় আছে তো, কয়টা বাজে এখন?

হ্যাঁ।

সফদর সাহেব কয়টা বাজে এখন?

হুঁ।

গলা উঁচিয়ে আমাকে বলতেই হল, কয়টা বাজে এখন, আমার হাতে ঘড়ি নেই।

সফদর আলী থতমত খেয়ে বললেন, ও আচ্ছা! ছোট ট্রান্সমিটার তো ওভারলোডেড হয়ে যায়।

আমি হাল ছেড়ে দিলাম।

রাতে যখন শোওয়ার ব্যবস্থা করছি তখন মতিন এসে হাজির। সকালবেলা খবর পেয়ে হেরোইন ল্যাবরেটরিতে হানা দিতে গিয়েছিল, কোনো লাভ হয় নি। ওরা যখন পৌঁছেছে তখন পুরো দল হাওয়া, এবারেও আগে থেকে খবর পেয়ে গেছে। আমরা আমাদের ডিটেকটিভ কাজের খবর দিলাম মতিনকে, পুলিশের জিপকে যেতে দেখে কী ভাবে সারাদিন হোটেল মালিককে চোখে-চোখে রেখেছি খুলে বললাম। শুনে মতিন খুশি হল কি না বোঝা গেল না। পুলিশে চাকরি করলে এই অসুবিধে, এক জন মানুষ নিরপরাধী শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

তিনজন বসে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করি। আমার তখন আবার সফদর আলীকে ভয় দেখানোর কথাটা মনে পড়ে গেল। ভূতের ভয় দেখানোর জন্যে মতিনকে রাজি করানো যায় কি না ভাবলাম। কলেজে থাকতে ভারি পাজি ছিল। এখন হোমরাচোমরা মানুষ হয়ে ভদ্র হয়ে গেছে কি না কে জানে। মতিন যখন উঠে পড়ে আমি সফদর আলীকে বললাম, আপনি শুয়ে পড়ুন আমি মতিনকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

বাইরে এসে আমি মতিনকে ভূতের ভয় দেখানোর কথাটা বললাম, মাঝরাতে তাকে ভূত সেজে এসে সফদর আলীর পিলে চমকে দিতে হবে।

মতিন প্রথমে এককথাতে রাজি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তার আগের রাতের কথা মনে পড়ে যায়। সফদর আলীর স্টান্টগান থেকে কী ভয়ানক ইলেকট্রিক শক—সে সাথে সাথে পিছিয়ে যায়। আমি অনেক কষ্টে তাকে রাজি করালাম। কথা দিলাম আমি স্টান্টগানটা লুকিয়ে রাখব। এসব ব্যাপারে দেরি করে লাভ নেই আজ রাতেই করার ইচ্ছা, কিন্তু মতিনকে নাকি রাতে হেড অফিসে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। কাজেই কখন সময় পাবে জানে না। ঠিক করা হল পরের রাতে সে আসবে। ঠিক একটার সময়। হাত দুটো উঁচু করা থাকবে পুরোটা সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। দেখে মনে হবে আট ফুট উঁচু একটা দানব। একবার সফদর আলীর বিছানার পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যাবে, বাকি দায়িত্ব আমার।

ঘরে ফিরে এসে দেখি সফদর আলী কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে গেছেন।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি সফদর আলী তখনো ঘুমে। আমি বাথরুমে গোসল ইত্যাদি সেরে এসে দেখি সফদর আলী উঠে চিন্তিত মুখে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, আমরা ধরে রেখেছি খবরটা ওয়্যারলেসে যায়, কিন্তু আসলে হয়তো এটা পাঠানো হয় লেজার দিয়ে। খুবই তো সহজ। একটা ভালো আয়না, একটা ফটো ডায়োড একটা ভালো এমপ্লিফায়ার, ব্যাস তাহলেই হয়। সফদর আলী ভুরু কুঁচকে থেমে গেলেন তারপর গোঁফ টানতে টানতে বললেন, দিনের বেলা অবশ্যি মুশকিল—এতো আলোতে লেজার লাইটকে দেখা যাবে? কী মনে হয় আপনার?

আমি আর কী বলব? সফদর আলীকে ওভাবে চিন্তিত অবস্থায় বসিয়ে রেখে বের হয়ে এলাম। হোটেলের মালিক আজকেও অলস ভঙ্গিতে একটা ইজি চেয়ারে বসে আছেন। পায়ের কাছে কয়টা কবুতর, হাতের ওপর একটা। কবুতরগুলো মানুষকে ভয় পায় না, আজকে আমাকে দেখে একটা আমার হাতের ওপর এসে বসে। কয়টা দানা তুলে নিতেই খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে। হোটেলের মালিকের সাথে আরো একটা দুটো কথা হল। অলস প্রকৃতির লোক, বাইরে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে দেখি না।

সফদর আলী গোসল ইত্যাদি সেরে আসার পর দু'জন বেরিয়ে পড়লাম। সারাটা দিন ঘুরতে ঘুরতে কেটে গেল। অনেক মজার মজার জিনিস দেখার আছে। সব দেখে শেষ করতে পারব কি না সন্দেহ। শুধু মাছের বাজারগুলোই তো ভালো করে দেখতে একমাস লেগে যাবে। বিকেলের দিকে ক্লান্ত হয়ে আমরা ফিরে আসি। ঘরে ঢোকার আগে হঠাৎ ঝটপট করে উড়তে উড়তে হোটেল মালিকের একটা কবুতর নেমে এসে একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর এসে বসে। আজ সকালেই এটাকে দানা খাইয়েছি, একদিনেই আমাকে চিনে গেছে। আমি কবুতরটার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম—সফদর সাহেব হঠাৎ বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান।

কবুতরটিকে তিনি সাবধান হাতে নেন, তখন আমার চোখে পড়ে কবুতরের একটা পায়ে কী সব জিনিস বাঁধা। সফদর সাহেব সেগুলো খুলতে খুলতে বললেন, বোকা কবুতরটা মানুষকে ভয় পায় না, যার কাছে ইচ্ছা চলে যায়। নিশ্চয়ই দুষ্টু কোনো ছেলের হাতে পড়েছিল, দেখেন পায়ে কী সব বেঁধে দিয়েছে।

দুষ্টু ছেলের কাজ! পায়ে ছেঁড়া কাগজ, একটা শিশি, শিশিতে সাবানের গুঁড়া না কী শক্ত করে বাঁধা! আমরা সাবধানে সবকিছু খুলে কবুতরটিকে উড়িয়ে দিই।

রাতে রেস্তরা থেকে খেয়ে আমরা সকাল সকাল ফিরে আসি। আজ রাতে সফদর আলীকে ভূতের ভয় দেখানোর কথা। আগে থেকে একটা ভৌতিক আবহাওয়া তৈরি করতে হবে। হোটেলে ঢোকার সময় হোটেল মালিকের সাথে দেখা, দেখে মনে হল ভদ্রলোক কিছু একটা নিয়ে যেন একটু দুশ্চিন্তিত, আমাদের দেখে একটু হাসির ভঙ্গি করলেন। আমি বললাম, আপনার কবুতরগুলো খুব পোষ মেনেছে, মানুষকে মোটে ভয় পায় না।

হোটেল মালিক যে একটু শঙ্কিতভাবে আমাদের দিকে তাকাল, একটু আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, একটু বেশিই পোষ মেনেছে!

আজ বিকেলে উড়ে একেবারে আমার ঘাড়ে এসে বসেছে।

বিরক্ত করে নি তো আবার?

না, না বিরক্ত কীসের।

সফদর আলী বললেন, আমার মনে হয় আপনার কবুতরকে একটু ট্রেনিং দেওয়া দরকার।

হোটেল মালিক ভুরু কুঁচকে বললেন, কীসের ট্রেনিং?

এই যেন অপরিচিত মানুষের কাছে না যায়। আজ বিকেলে দেখি কে যেন দুষ্টুমি করে পায়ে কী সব বেঁধে দিয়েছে।

হোটেল মালিক হঠাৎ যেন একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। সফদর আলী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমরা খুলে দিয়েছি, আপনার কবুতরের কিছু হয় নি। চমৎকার উড়ে গেল তখন।

আমরা ঘরে ফিরে এলাম, হোটেল মালিক পিছু পিছু এলেন। ধন্যবাদ জানাতে নিশ্চয়ই। কিছু–একটা বলবেন বলবেন করেও যেন ঠিক বলতে পারলেন না।

ঘরে ঢুকেই আমি ভূতের ভয় দেখানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিই। নিরীহ স্বরে সফদর আলীকে বললাম, হোটেলটা বেশ বড়, কিন্তু মানুষজন কত কম দেখেছেন?

সফদর আলী বললেন, ঠিক করে পাবলিসিটি করে না। নিওন লাইট দিয়ে লিখে দিত—

বাধা দিয়ে বললাম, আপনার তাই মনে হয়? আজ বাজারে এক জনের সাথে কথা বলছিলাম, সে অন্য কথা বলল।

কি বলল?

বলল বছর দুই আগে নাকি কে এক জন আত্মহত্যা করেছিল এই হোটেলে। সেই থেকে গভীর রাতে কে নাকি হেঁটে বেড়ায়। ভরা পূর্ণিমা হলে নাকি কান্নার আওয়াজ শোনা যায়।

সফদর আলীর মুখ ফ্যাকাসে মেরে যায়, আমি হালকা গলায় বললাম, লোকজন

যে কি বাজে কথা বলতে পারে! শুধু শুধু এরকম একটা চমৎকার জায়গার এরকম বাজে একটা বদনাম।

আবহাওয়াটা এর মাঝে ভৌতিক হয়ে গেছে, আমি তার মাঝে আরো একটা দাগা ছেড়ে দিলাম, বললাম, ভূতের ভয় পেলেই ভয়। আমার সেরকম ভয়টয় নেই। তবে হ্যাঁ, আমার এক মামা ভয় পেতেন কিছু বটে! অবশ্যি তার কারণও ছিল।

সফদর আলী দুর্বল গলায় বললেন, কি কারণ?

আমি অনেক দিন আগে পড়া একটা ভূতের গল্প মামার গল্প হিসেবে চালিয়ে দিলাম; ভূতের গল্প সবসময় নিজের পরিচিত মানুষের গল্প হিসেবে বলতে হয়, এ ছাড়া ঠিক কাজ করে না। ভেবেছিলাম দুটি গল্প লাগবে, দেখলাম এক গল্পেই কাজ হয়ে গেল। ঘরে লাগানো বাথরুম, সেখানে যাওয়ার সময় সফদর আলী বললেন, ইকবাল সাহেব, দরজার কাছে দাঁড়াবেন একটু, আমি বাথরুম থেকে আসি।

বিছানায় শুয়ে বাতি নেভানোর পর আমি আমার দ্বিতীয় গল্পটি ফেঁদে বসি। এটাও এক ইংরেজি বইয়ে পড়েছিলাম; স্থান, কাল, পাত্র একটু বদলে আমার দূর সম্পর্কের এক চাচার নিজের জীবনের ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দিতে হল। লাশকাটা ঘরে একটা খুন হয়ে যাওয়া মানুষের গল্প, বীভৎস ঘটনা বলতে গিয়ে আমার নিজেরই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সফদর আলীর কথা ছেড়েই দিলাম। মতিন যখন ভূত সেজে আসবে, তখন বাড়াবাড়ি কিছু না একটা হয়ে যায়, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে থাকে। দরজাটা খুলে রেখেছি, রাত একটার সময় আসার কথা, গল্পে গল্পে বেশ রাত হয়ে গেছে, আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না।

একটু তন্দ্রামতো এসেছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, জানালাটা কেউ বাইরে থেকে খোলার চেষ্টা করছে। মতিন এসে গেছে, দরজা খোলা রাখব বলেছিলাম, নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। আমি সফদর আলীকে জাগাব ভাবছিলাম, তার আগেই সফদর আলীর ভাঙা গলা শুনতে পেলাম, ভয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। কোনোমতে ফিসফিস করে বললেন, ইকবাল সাহেব, কি কি যেন ঘরে ঢুকছে—

আমি বললাম, চুপ, একটা কথাও না।

মতিন জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢোকে। বলেছিলাম, দু'হাত উঁচু করে সাদা কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিতে, কিন্তু মতিন বোকার মতো একটা কাল কাপড় পরে এসেছে, হাত দু'টি তো উঁচু করেই নি, বরং চোরের মতো আস্তে আস্তে পা ফেলে ইতিউতি করে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকে। তাই দেখেই সফদর আলীর প্রায় হার্টফেল করার মতো অবস্থা। হাতড়ে হাতড়ে কোনোমতে ভূতটিপিটা বের করে টিপে দিলেন, সাথে সাথে উচ্চস্বরে আয়াতুল কুরসি পড়া শুরু হয়ে যায়।

মতিন বেচারা গেল ঘাবড়ে। ভীষণ চমকে ওঠে। তারপর দরজার দিকে ছুটে যায় গুলির মতো, কোনোমতে দরজা খুলে এক দৌড়!

হাসির চোটে আমার প্রায় দম বন্ধ হবার মতো অবস্থ। ঘরে আলো জ্বালিয়ে সফদর আলীর সাহস ফিরিয়ে আনি। তাঁর গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না, ভূতটিপিটা আঁকড়ে ধরে, দুই পা তুলে বিছানায় উবু হয়ে বসে আছেন। তিনি সে রাতে আর আলো নেভাতে দিলেন না, বিছানায় জবুথবু হয়ে বসে রইলেন।

পরদিন সফদর আলীকে চেনা যায় না, চোখ বসে গিয়েছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দেখে মনে হয় এক রাতে বয়স দশ বছর বেড়ে গিয়েছে। আমার তখন খারাপ লাগতে থাকে, ভীতু মানুষ, এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও হত।

সফদর আলী উঠেই তাঁর ভ্রমণবন্দি গোছাতে শুরু করলেন, এই হোটেলে তিনি আর থাকবেন না। ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আমাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে হল। ভাবছিলাম শুনে বুঝি সফদর আলী খুব রাগ করবেন, কিন্তু উল্টো এত খুশি হয়ে উঠলেন যে বলার নয়। ভূতটুত কিছু নয়, আমি আর মতিন মিলে তাঁকে ভয় দেখিয়েছি ব্যাপারটা তাঁর কাছে এত মজার একটা ঘটনা মনে হতে থাকে যে, আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। পেট চেপে ধরে তিনি দুলে দুলে হাসতে থাকেন, আর একটু পরপর বলতে থাকেন, আপনারা তো সাঙ্ঘাতিক মানুষ! হিঃ হিঃ হিঃ, আমি আরো ভাবলাম সত্যিকার ভূত, হিঃ হিঃ হিঃ। মতিন সাহেবকে দেখলে মনে হয় কত বড় অফিসার, আর সে কিনা—হিঃ হিঃ হিঃ—সফদর আলী তাঁর কথা শেষ করতে পারেন না।

ব্যাপারটা এত সহজে চুকে গেল দেখে আমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। সফদর আলী সহজ-সরল মানুষ বলে এত সহজভাবে নিয়েছেন, অন্য কেউ হলে চটে যেত নিঃসন্দেহে। কয়জন মানুষ নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা সহ্য করতে পারে? দু'জনে হালকা মন নিয়ে বের হই। আজকেও হোটেল মালিক ইজিচেয়ারে বসে আছেন। কবুতরগুলো পায়ের কাছে বসে দানা খাচ্ছে। আমাদের বের হতে দেখে কেমন জানি বাঁকা করে তাকিয়ে না দেখার ভান করে সামনে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, ভদ্রলোকের হয়তো কথা বলার ইচ্ছে নেই, আমরা তাঁকে আর ঘাঁটালাম না।

নাস্তা করে ভাবলাম জেলেপল্লী থেকে ঘুরে আসি। জেলেনৌকা করে সফদর আলীর সমুদ্রে যাবার শখ। ব্যাপারটা আলোচনা করে আসবেন। পথে মতিনের বাসা, ভবলাম একটু দেখা করে যাই। তাকে দেখে গত রাতে সফদর আলী কেমন ভয় পেলেন নিশ্চয়ই জানতে চাইছে। দরজায় টোকা দেয়ার আগেই দরজা খুলে গেল, দেখি মতিন প্রায় ছুটে বেরিয়ে আসছে। আমাদের দেখে থতমত খেয়ে বলল, তোরা এসেছিস? আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। গলা নামিয়ে বলল, খবর এসেছে আবার, আজ নাকি অনেক বড় দল। রাতে আসব তোদের ওখানে।

সফদর আলী ভূতসংক্রান্ত কী একটা বলতে চাইছিলেন, মতিন তার আগেই আমাকে টেনে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, কাল রাতে হঠাৎ হেড অফিস থেকে ফোন, তাই আর সফদর সাহেবকে ভয় দেখানোর জন্যে যেতে পারি নি। আজ যাব। তুই আবার অপেক্ষা করে ছিলি না তো?

আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল, কিছু বলার আগেই মতিন বলল, এক্ষুনি যেতে হবে, গেলাম আমি।

সফদর আলী এগিয়ে এসে বললেন, কী বললেন মতিন সাহেব?

আমি দুর্বল গলায় বললাম, বলল আজ রাতে সে ভূত সেজে আসবে।

আবার?

না, আবার না, গত রাতে ব্যস্ত ছিল, তাই আসতে পারে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সফদর আলীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, ঢোক গিলে কোনোমতে বললেন, তার মানে গত রাতে সত্যি ভূত এসেছিল। সর্বনাশ!

আমরা যখন জেলেপল্লীর দিকে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সবকিছুর মূলে রয়েছে আমাদের হোটেল মালিক আর কবুতর। যখন হেরোইন ল্যাবরেটরিতে কাজ চলে, তিনি তাঁর হোটেলের সামনে কবুতর নিয়ে বসে থাকেন, যখন দেখেন পুলিশ যাচ্ছে, তিনি তাঁর কবুতর উড়িয়ে দেন। ট্রেনিং দেয়া কবুতর উড়ে গিয়ে হাজির হয় হেরোইন ল্যাবরেটরিতে। সেখানকার লোকজন দেখেই বুঝে যায় পুলিশ আসছে, তারা সবকিছু গুটিয়ে পালিয়ে যায় নিরাপদ জায়গায়। হেরোইন ল্যাবরেটরির লোকজন যখন হোটেলের মালিকের কাছে কোনো খবর পাঠাতে চায়, তারা কাগজে লিখে কবুতরের পায়ে বেঁধে উড়িয়ে দেয়। কবুতর সেটা নিয়ে আসে হোটেল মালিকের কাছে। গতকাল আমরা কবুতরের পা থেকে যেটা খুলে ফেলেছিলাম, সেটা ছিল ওদের পাঠানো কোনো জরুরি খবর। ছোট শিশিতে নিশ্চয়ই কিছু হেরোইন ছিল, বানানো জিনিসটার একটু নমুনা। কাল সেজন্যেই হোটেল মালিক আমাদের মুখে তাঁর কবুতরের গল্প শুনে এত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। রাতে সেজন্যেই হোটেল মালিক এসেছিল আমাদের ঘরে, তাঁর সেই হেরোইনের শিশি উদ্ধার করার জন্যে। সফদর আলীর ভূতটিপি যখন উচ্চৈস্বরে আয়াতুল কুরসী পড়তে শুরু করেছে, তিনি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছেন।

সফদর আলীকে পুরোটা বোঝাতে একটু সময় লাগল। তিনি ভাবলেন, আমি বলতে চাইছি হোটেল মালিকের কবুতরগুলো আসলে যান্ত্রিক কবুতর, ভেতরে যন্ত্রপাতি দিয়ে বোঝাই। হোটেল মালিক সুইচ টিপে দিয়ে কবুতরগুলো উড়িয়ে দেন, সেগুলো তখন খবর নিয়ে যায় হেরোইন ল্যাবরেটরিতে। এরকম কবুতর বানানো কঠিন বলে তিনি আপত্তি করে যাচ্ছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন আমি বলতে চাইছি কবুতরগুলো সাধারণ দেশি কবুতর এবং এগুলো দিয়েই খবর পাঠানো হয়, সফদর আলী হঠাৎ করে সবকিছু বুঝে গেলেন। খাঁটি ডিটেকটিভদের মতো আমরা সাথে সাথে বুঝে গেলাম আমাদের কি করতে হবে, মতিন তার দলবল নিয়ে রওনা দেবার আগে আমাদের গিয়ে কবুতরগুলোকে আটকাতে হবে।

দু'জনে প্রায় ছুটতে ছুটতে হাজির হলাম হোটেলে। হোটেল মালিক অলসভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন, পায়ের কাছে কবুতরগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি সহজ ভঙ্গি করে হোটেল মালিকের কাছে গিয়ে বসি, তখনো অল্প অল্প হাঁপাচ্ছি। সফদর আলী চলে গেলেন কী একটা জিনিস আনতে।

হোটেল মালিক আমাকে বললেন, কি ব্যাপার, একেবারে হাঁপাচ্ছেন দেখি?

কিছু একটা কৈফিয়ত দিতে হয়, যেটা মাথায় এল সেটাই বলে ফেললাম, কোনোরকম ব্যায়াম হচ্ছে না, তাই ভাবলাম একটু দৌড়াই। সকালে দৌড়ানো স্বাস্থ্যের জন্যে খুব ভালো কিনা!

ও!

কবুতরগুলোকে কী ভাবে আটকানো যায় তাই ভাবছিলাম। একটু করে পাখা ছেঁটে দিলে হয়। কিন্তু এত কাছে বসে করি কী করে? এমন সময় সফদর আলী বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে এলেন, হাত দেখিয়ে একটা ভঙ্গি করলেন, যার অর্থ তিনি সবকিছু ঠিক করে নিয়েছেন। আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এসব ব্যাপারে সফদর আলীর উপর আমার বিশ্বাস আছে।

সফদর আলী এসে আমার পাশে বালুর উপর পা ছড়িয়ে বসলেন, হোটেল মালিক তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ভদ্রতার কী একটা কথা বললেন। উত্তরে সফদর আলীও কিছু-একটা বলে একটা কবুতরকে আদর করার ভঙ্গিতে তুলে নেন। হোটেল মালিক একটু অন্যদিকে তাকাতেই আঙুলের মাথায় লাগানো কালোমতো ছোট একটা জিনিস কবুতরটার মাথায় টিপে লাগিয়ে দেন। জিনিসটা আঁটালো, মাথার পালকের নিচে ভালোভাবে লেগে যায়, কবুতরটা কোনো আপত্তি করল না, দেখেও বোঝার উপায় নেই।

চারটা কবুতর। হোটেল মালিক কোনটা ব্যবহার করবেন জানি না। তাই একটি একটি করে চারটার মাথাতেই সফদর আলী সেই কালোমতো জিনিসগুলো টিপে লাগিয়ে দিলেন। সেটা কী জিনিস জানি না, কী ভাবে কাজ করবে তাও জানি না, কিন্তু সফদর আলীর উপরে আমার বিশ্বাস আছে। তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবে বের করেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপের আওয়াজ শুনতে পেলাম, তাকিয়ে দেখি একটা জিপ-বোঝাই পুলিশ যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে। সামনের সিটে মতিনকেও দেখতে পেলাম, সাদা পোশাকে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

জিপটা চলে যেতেই হোটেল মালিক সাদা রঙের একটা কবুতর বাম হাতে তুলে নিলেন। তারপর অন্যমনস্ক ভঙ্গি করে ডান হাত দিয়ে কবুতরের সামনে তিন বার চুটকি বাজালেন। নিশ্চয়ই এটা কোনোরকম একটা সংকেত। সত্যি তাই, কবুতরটি তিনটি চুটকি শুনেই হঠাৎ পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে যায়, প্রথমে সোজা উপরে, তারপর ঘুরে দক্ষিণ দিকে। সাংঘাতিক উড়তে পারে পাখিটা, দেখতে দেখতে সেটা মিলিয়ে গেল।

আমরা তিন জনেই তাকিয়ে ছিলাম কবুতরটার দিকে। সফদর আলী অন্যমনস্কভাবে বললেন, খুব ভালো উড়তে পারে কবুতর।

হোটেল মালিক অন্য কবুতরগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, কবুতরের অনেক গুণ।

হ্যাঁ, খেতেও খুব ভালো, আমি যোগ না করে পারলাম না, ভুনা কবুতরের মাংস, খিচুড়ির সাথে গরম ঘি দিয়ে খেতে দারুণ লাগে।

হোটেল মালিক এবং সফদর আলী, দু'জনেই আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালেন। আমার কথাবার্তায় প্রায় সময়েই খাবারের বিষয় এসে পড়ে। সফদর আলী একটু থেমে বললেন, কবুতরের দিকজ্ঞান খুব ভালো। কখনো রাস্তা হারায় না। যুদ্ধের সময় কবুতর দিয়ে শত্রু অঞ্চল থেকে খবর পাঠানো হত।

হোটেল মালিক অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বসলেন। সফদর আলী না দেখার ভান করে বললেন, অনেকদিন বিজ্ঞানীরা জানতেন না কবুতর কী করে দিক ঠিক রাখে। দিন হোক রাত হোক কিছু অসুবিধে হয় না।

হোটেল মালিক একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন জেনেছে?

খানিকটা।

কী ভাবে?

পৃথিবীর যে চৌম্বকক্ষেত্র আছে সেটা দিয়ে। কম্পাস যেরকম পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র দিয়ে উত্তরদক্ষিণ বুঝতে পারে, কবুতরও সেরকম। কী ভাবে চৌম্বকক্ষেত্রটা বুঝতে পারে সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। কিন্তু পারে যে, সেটা সবাই জানে।

তাই নাকি? হোটেল মালিকের চোখে–মুখে একটা অবাক হওয়ার ছাপ এসে পড়ে।

হ্যাঁ, খুব সহজ একটা পরীক্ষা করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। কবুতরের মাথায় একটা ছোট চুম্বক বেঁধে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র থেকে অনেক শক্তিশালী। ব্যাস, দেখা গেল কবুতর আর কিছুতেই দিক ঠিক রাখতে পারে না। খুব সহজ একটা পরীক্ষা।

বলতে বলতে সফদর আলী উঠে দাঁড়ান, কখনো সুযোগ পেলে করে দেখবেন পরীক্ষাটা। ছোট একটা চুম্বক নিয়ে কবুতরের মাথায় লাগিয়ে দেবেন, আমার কাছে আছে একটা, এই যে—সফদর আলী তাঁর আঙুলের ডগায় করে কালো মতন একটা চুম্বক ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দেন।

হোটেল মালিক একটু অবাক হয়ে সফদর আলীর দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে চুম্বকটি নেন। কী যেন তাঁর সন্দেহ হচ্ছে। মুখটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে।

আমি বললাম, সফদর সাহেব চলুন যাই, ভীষণ খিদে পেয়েছে।

হ্যাঁ, চলুন। সফদর আলীও উঠে দাঁড়ালেন।

মস্ত বড় একটা হেরোইন কারবারির দল ধরা পড়ল। হোটেল মালিক ছিল সেই দলের নাটাই। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সে ভোল পাল্টে। এয়ারপোর্টে ধরা হয়েছে। বর্ডারে প্রায় জনা ত্রিশেক লোক ধরা পড়েছে—কিছু এদেশের কিছু বার্মার। হেরোইন আটক করেছিল প্রায় এক কোটি টাকার মতো। মতিনের অনেক নাম হল সেবার। দুটো নাকি প্রমোশন হয়ে গেছে একবারে। আমরা ভেবেছিলাম, আমাদেরও খুব নাম হবে। কিন্তু ব্যাপারটা নাকি খুব গোপন। আমাদের নাকি জানার কথাই নয়। তাই আমাদের কথাটা চেপে গিয়েছিল। মতিন বলেছে আমাদের নাকি খুব একপেট খাইয়ে দেবে একদিন। এখনো দেয় নি, অপেক্ষা করে আছি, যদি কিছুদিনের মধ্যে না খাওয়ায়, বলে দেব সবাইকে। কিরকম মাথা খাটিয়ে আমি আর সফদর আলী এত বড় একটা হেরোইন কারবারির দলকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম—কেউ বিশ্বাস করবে কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন!

মোরগ

সফদর আলী সাবধানে পকেট থেকে কী একটা জিনিস বের করে আমার হাতে দিলেন। হাতে নিয়ে আমি চমকে উঠি, একটা মাকড়সা। চিৎকার করে আমি

মাকড়সাটাকে প্রায় ছুড়ে ফেলেছিলাম—সফদর আলী হা হা করে উঠলেন, করছেন কি? এটা জ্যান্ত মাকড়সা নয়, ইলেকট্রনিক মাকড়সা।

আমার তখনো বিশ্বাস হয় না। টেবিলের উপর কোনোমতে ফেলে দিই কুৎসিত মাকড়সাটাকে। সেটা ঠিক জ্যান্ত মাকড়সার মতো হেঁটে বেড়াতে থাকে। ঘেন্নায় আমার প্রায় বমি হবার মতো অবস্থা, মাকড়সা আমার ভারি খারাপ লাগে। কেউ যদি বলে একটা ঘরে একটা জ্যান্ত মাকড়সার সাথে থাকবে না একটা জ্যান্ত বাঘের সাথে থাকবে? আমি সম্ভবত বাঘের সাথেই থাকব।

সফদর আলী হাসতে হাসতে বললেন, এত ভয় পাচ্ছেন কেন? এটা ইলেকট্রনিক, দুটো মাইক্রোপ্রসেসর আছে ভেতরে। দু'মাস লেগেছে তৈরি করতে।

দু'মাস খরচ করে একটা মাকড়সা তৈরি করেছেন? আমার বিশ্বাস হয় না, সফদর আলী দু'ঘন্টায় একটা পুরো কম্পিউটার খুলে আবার জুড়ে দিতে পারেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

সময় লাগবে না? এইটুকু মাকড়সার শরীরে কতকিছু ঢোকাতে হয়েছে জানেন? পাওয়ার সাপ্লাই থেকে শুরু করে লজিক গেট, মাইক্রোপ্রসেসর, র‍্যাম, স্টেপ মোটর, গিয়ার—

এত কষ্ট করে একটা মাকড়সা তৈরি করলেন? একটা ভালো কিছু তৈরি করতে পারতেন, প্রজাপতি বা পাখি। কে মাকড়সা দিয়ে খেলবে?

সফদর আলী একটু আঘাত পেলেন বলে মনে হল। গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি কি ভাবছেন এটা খেলার জিনিস?

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, তাহলে কি?

কাছে আসেন, আপনাকে দেখাচ্ছি।

আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে যাই। তিনি আমার শার্টের ফাঁক দিয়ে মাকড়সাটাকে ঢুকিয়ে দিলেন। সেটা হেঁটে হেঁটে আমার পিঠের উপর এক জায়গায় গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। যদিও জানি এটা সত্যিকার মাকড়সা নয়, নেহায়েত ইলেকট্রনিক কলকব্জা, তবুও আমার সারা শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। আমি শরীর শক্ত করে দম বন্ধ করে বসে থাকি। মাকড়সাও বসে থাকে চুপ করে। বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল এভাবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

সফদর আলী বললেন, কিছু হচ্ছে না?

নাহ্।

শরীরের কোনো জায়গা চুলকোচ্ছে না?

নাহ্।

তিনি খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বললেন, আসলে আপনি যদি এমন একটা কাজ করতে থাকেন যে, হাত সরানোর উপায় নেই তাহলে শরীরের কঠিন কঠিন জায়গা চুলকাতে থাকে।

আমি মাথা নাড়লাম, কথাটা সত্যি, কিন্তু মাকড়সার সাথে শরীর চুলকানোর কী সম্পর্ক ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সফদর আলীর মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এগিয়ে এসে বললেন, আপনার হাত দুটি দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি হাত দুটি এগিয়ে দিতেই কিছু বোঝার আগে তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত দুটি চেয়ারের হাতলের সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, কী করছেন?

এখন আপনার হাত দুটি বাঁধা। কাজেই শরীরের কোনো জায়গা চুলকালে আপনি চুলকাতে পারবেন না।

হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?

কাজেই এখন আপনার শরীরের নানা জায়গা চুলকাতে থাকবে। সফদর আলী চোখ নাচিয়ে বললেন, কি, সত্যি বলেছি কি না?

কথাটা সত্যি। ছেলেবেলায় যেদিন রোজা থাকতাম, ভোরে ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ত আজ খাওয়া বন্ধ। সাথে সাথে খিদে লেগে যেত। এবারেও তাই হঠাৎ মনে হতে থাকে ঘাড়ের কাছে একটু একটু চুলকাচ্ছে। সত্যি তাই, চুলকানি বাড়তেই থাকে, বাড়তেই থাকে। অন্যমনস্ক হলে চুলকানি চলে যাবে ভেবে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি। কিন্তু কোথায় কি, চুলকানি বাড়তেই থাকে। সফদর আলীকে হাত দুটি খুলে দিতে বলব, এমন সময় হঠাৎ টের পাই মাকড়সাটা ঘাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। হেঁটে হেঁটে যেখানে চুলকাচ্ছে ঠিক সেখানে এসে চুলকে দিতে থাকে। আরামে আমার চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে যখন বাগানে কাজ করে কাদায় হাত মাখামাখি হয়ে যেত, তখন পিঠে কোথাও চুলকালে ভাগনেকে বলতাম চুলকে দিতে। সে কিছুতেই ঠিক জায়গাটা বের করতে পারত না। আমি বলতাম, আরেকটু উপরে, সে বেশি উপরে চলে যেত। বলতাম, আরেকটু নিচে, সে বেশি নিচে চলে যেত। যখন জায়গাটা মোটামুটি বের করতে পারত তখন হয় বেশি জোরে না হয় বেশি আস্তে চুলকে দিত, কিছুতেই ঠিক করে চুলকাতে পারত না। এই মাকড়সাটা অপূর্ব, উপরেও নয়, নিচেও নয়, ঠিক জায়গাটাতে ঠিকভাবে চুলকাতে থাকে। যখন ভাবলাম আরেকটু জোরে হলে ভালো হয় মাকড়সাটা ঠিক আরেকটু জোরে চুলকাতে থাকে, আশ্চর্য ব্যাপার!

সফদর আলী আমার মুখের ভাব লক্ষ করছিলেন, এবারে হাতের বাঁধন খুলে দিতে দিতে একগাল হেসে বললেন, দেখলেন তো এটা কী করতে পারে?

আমার স্বীকার করতেই হল ব্যাপারটা অসাধারণ। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না যে এটা আদৌ তৈরি করা সম্ভব।

সফদর আলী জিজ্ঞেস করলেন, কী ভাবে কাজ করে বুঝেছেন?

আমি কী ভাবে বুঝব?

একটুও বুঝতে পারেন নি? সফদর আলীর একটু আশাভঙ্গ হল বলে মনে হল। এই যে আটটা পা দেখছেন এগুলো হচ্ছে আটটা নার্ভ সেন্সর। শরীরের নার্ভ থেকে এটা কম্পন ধরতে পারে। সেটা থেকে এটা বুঝতে পারে কোথাও চুলকাচ্ছে কি না। যখন বুঝতে পারে, তখন সেটা সেন্ট্রাল সি. পি. ইউ.-তে একটা খবর পাঠায়। সাথে সাথে ফিডব্যাক সার্কিট কাজ শুরু করে দেয়—

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। নিঃসন্দেহে জিনিসটা অসাধারণ। কিন্তু এত কষ্ট করে এরকম একটা জিনিস তৈরি করার সত্যি কি কোনো প্রয়োজন ছিল? সফদর আলীর এত প্রতিভা, সেটা যদি সত্যিকার কোনো কাজে লাগাতেন, যেটা দিয়ে সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের কোনোরকম উপকার হত—

কী হল? আপনি আমার কথা শুনছেন না, অন্যকিছু ভাবছেন।

না না, শুনছি।

তাহলে বলুন তো স্টেপিং মোটরে কত মাইক্রো সেকেন্ড পরপর টি. টি. এল. পাল্‌স্‌ পাঠাতে হয়?

আমি মাথা চুলকে বললাম, শুনেছি মানে তো নয় বুঝেছি। শোনা আর বোঝা কি এক জিনিস?

তার মানে আপনি কিছু বোঝেন নি?

ডিটেলস বুঝি নি, কিন্তু মোটামুটি আইডিয়াটা পেয়েছি।

সফদর আলী পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে টেবিলে খুলে ধরেন। ভয়ানক জটিল একটা সার্কিট। তার মাঝে এক জায়গায় একটা আঙুল ধরে বললেন, এখান থেকে শুরু করি। আপনি তাহলে বুঝবেন। এই যে দেখছেন—

আমি তাঁকে থামালাম। বললাম, সফদর সাহেব, আমি এসব ভালো বুঝি না, খামোকা আপনার সময় নষ্ট হবে। এর থেকে অন্য একটা জিনিস আলোচনা করা যাক।

কী জিনিস?

এই মাকড়সাটা তৈরি করার প্রয়োজনটা কি?

সফদর আলী খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমি ভাবলাম মাকড়সারা কী করে সেটা অন্তত বুঝেছেন। যখন কোনো জায়গায় চুলকাতে থাকে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বুঝেছি। কিন্তু সেটা কি এতই জরুরি জিনিস?

জরুরি নয়? আমি যখন কাজ করি তখন দুটো হাতের দরকার, তার মাঝে যদি কোনো জায়গা চুলকাতে থাকে আমি কী করব?

ঠিক আছে মানলাম, এরা যথেষ্ট জরুরি। কিন্তু এর থেকে জরুরি কোনো জিনিস নেই?

কী আছে? এর থেকে জরুরি কী হতে পারে?

আপনার কাছেই জরুরি হতে হবে সেটা ঠিক নয়। অন্য দশজন মানুষের জন্যে জরুরি হতে পারে। আপনার এরকম প্রতিভা, সেটা যদি সত্যিকার কাজে লাগান, কত উপকার হত।

কি রকম কাজ?

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, গরিব দেশ আমাদের, লোকজন খেতে-পরতে পারে না। যদি গবেষণা করে বের করতেন খাওয়ার সমস্যা কী ভাবে মেটানো যায়, বিশেষ ধরনের ধান, যেখানে চাল বেশি হয় বা বিশেষ ধরনের মাছ, যেটা তাড়াতাড়ি বড় করা যায় আবার খেতেও ভালো। কিংবা গরু-বাছুর বাড়ানোর সহজ উপায়। দুধের এত অভাব! দেশে সব গরিব বাচ্চারা রোগা রোগা, তাদের জন্যে যদি কিছু করতেন। কিংবা সস্তা কাপড় যদি তৈরি করতে পারতেন, সবাই যদি ভদ্র কাপড় পরতে পারত—

সফদর আলী কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে

বসে থেকে চিন্তিতভাবে নিজের গোঁফ টানতে থাকেন। আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করলাম, তিনি হাঁ হাঁ করে উত্তর দিচ্ছিলেন। কিন্তু আলাপে যোগ দিলেন না। আমার তাঁর জন্যে একটু খারাপই লাগে। বেচারা বিজ্ঞানী মানুষ। একটা আশ্চর্য জগতে বাস করেন। সত্যিকার মানুষের জীবন দেখেও দেখেন না, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে নিশ্চয়ই খুব বিব্রত করে দিয়েছি। কিন্তু তাঁর যেরকম প্রতিভা—যদি সত্যি সাধারণ মানুষের জন্যে মাথা খাটিয়ে কিছু একটা বের করেন, খারাপ কী?

পরের সপ্তাহে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামে লেখা :

আপনি ঠিক। মাকড়সা চুরমার। খাদ্য গবেষণা।

বিষয়বস্তু পরিষ্কার, আমার কথা ঠিক, তাই তিনি তাঁর মাকড়সাকে চুরমার করে খাদ্যের উপর গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। মাকড়সাটির জন্যে আমার একটু দুঃখ হয়, চুলকানোর এরকম যন্ত্র চুরমার করে ফেলার কি প্রয়োজন ছিল?

পরের সপ্তাহে আরেকটা টেলিগ্রাম পেলাম, তাতে লেখা :

ডিম। মুরগি। মুরগি ফার্ম। ইনকিউবেটর। কম্পিউটার কন্ট্রোল।

মানে বুঝতে মোটেই অসুবিধে হল না। তিনি মুরগির ফার্ম তৈরি করার কথা ভাবছেন। সেখানে ইনকিউবেটর ব্যবহার করে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো হবে। চমৎকার ব্যবস্থা। তবে কম্পিউটার ব্যবহার করে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে ব্যাপারটি আমাকে ঘাবড়ে দিল। একটি মুরগির ফার্ম চালানোর জন্যেযদি কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়, তাহলে লাভ কি? সফদর আলীর গবেষণা আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবার আগে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। ভাগ্য ভালো আমার, সফদর আলী বাসাতেই ছিলেন, জংবাহাদুর দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল, সফদর আলীর কাছে পৌঁছে দিয়ে সে নিজে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ে। পাশের টেবিলে খাবার, সামনে টেলিভিশন চলছে, বানরের উপর একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাই জংবাহাদুরের মুখে একটা পরিষ্কার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি।

AMARBOI.COM

সফদর আলীর টেবিলের চারপাশে অনেকগুলো খাঁচা, সেখানে অনেকগুলো নানা বয়সের মোরগ–মুরগি হেঁটে বেড়াচ্ছে। সফদর আলী গম্ভীর মুখে একটা মুরগির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর হাতে কাগজ–কলম, মুরগির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে একটু পরপর কী যেন লিখছেন। উঁকি মেরে দেখে মনে হল আধুনিক কবিতা, কারণ তাতে লেখা :

ডাম বাম ডান বাম ডান ডান বাম
বাম ডান বাম ডান বাম বাম বাম
বাম বাম ডান বাম বাম ডান বাম...

সফদর আলী খাতা বন্ধ করে বললেন, মোরগের সাথে মানুষের পার্থক্য কি বলেন দেখি?

মাথা চুলকে বললাম, আমরা মোরগকে রান্না করে খাই, মোরগ আমাদের রান্না করে খায় না।

সফদর আলী চিন্তিত মুখে বললেন, আপনাকে নিয়ে এই হচ্ছে মুশকিল, খাওয়া ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারেন না।

কথাটা খানিকটা সত্যি, আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম।

সফদর আলী বললেন, মানুষের দুটি চোখই সামনে। তাই তাদের বাইনোকুলার-দৃষ্টি। কোনো জিনিসের দিকে তাকিয়ে তারা দূরত্ব বুঝতে পারে। এক চোখ বন্ধ করে সুইয়ে সুতো পরানোর চেষ্টা করে দেখবেন কত কঠিন। বোঝা যায় না সুইটা কাছে না দূরে। মোরগের দুই চোখ দুই পাশে, তাই দূরত্ব বুঝতে হলে মোরগকে ক্রমাগত মাথা নাড়তে হয়। একবার ডান চোখে জিনিসটা দেখে, একবার বাম চোখে। বেশিরভাগ পাখিও মোরগের মতো। এজন্যে পাখিরাও মাথা নাড়ে। এই দেখেন আমি লিখছিলাম মোরগ কী ভাবে তার চোখ ব্যবহার করে।

সফদর আলী তাঁর খাতা খুলে দেখালেন। যেটাকে একটা আধুনিক কবিতা ভেবেছিলাম, সেটা আসলে মোরগের মাথা নাড়ানোর হিসেব। আমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। সফদর আলী এখন কবিতা লেখা শুরু করলে ভারি দুঃখের ব্যাপার হত।

খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে আমি তাঁর মুরগির ফার্ম এবং ইনকিউবেটরের কথা জানতে চাইলাম। সফদর আলী খুব উৎসাহ নিয়ে একটা বড় খাতা টেনে বের করে আনেন। অল্প একটা জায়গায় অনেক মুরগি বড় করার পরিকল্পনা, ইনকিউবেটরে ডিম ফোটানো হবে। ইনকিউবেটর জিনিসটা নাকি খুব সহজ, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঠিক রেখে তাপমাত্রা বাইশ দিন ১০২ ডিগ্রি ফারেনহাইট করে রাখতে হয়। সফদর আলী তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ ব্যবহারের কথা ভাবছেন, তাহলে তাপমাত্রা ঠিক রাখা নাকি পানির মতো সোজা। তাঁর একটিমাত্র সমস্যা, সেটি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি। মোরগের বাচ্চার কী ক্ষতি করবে সেটা ঠিক জানেন না। ডিমগুলোকে দিনে দু'বার করে ঘুরিয়ে দেয়া এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্যে একটা ছোট কম্পিউটার থাকবে। হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেলে ইনকিউবেটর যেন বন্ধ না হয়ে যায়, সেজন্যে একটি ডায়নামোও নাকি বসানো হবে।

আমি সফদর আলীকে থামালাম। বললাম, ইনকিউবেটর তৈরি করে ডিম ফুটিয়ে মোরগের ফার্ম তৈরি করবেন খুব ভালো কথা, কিন্তু সেটা চালানোর জন্যে যদি তেজস্ক্রিয় মৌলিক বা কম্পিউটার লাগে, তাহলে লাভ কী হল? ওসব চলবে না—

কেন চলবে না? সফদর আলী উত্তেজিত হয়ে বললেন, জিনিসটা কত সহজ হয় জানেন? একবার সুইচ অন করে ভুলে যেতে পারবেন।

ভুলে যাওয়ার দরকারটা কী? আমাদের দেশে মানুষের কি অভাব? আমি সফদর আলীকে বোঝানোর চেষ্টা করি, এমনভাবে ইনকিউবেটরটা তৈরি হবে, যেন জিনিসটা হয় সহজ, দাম হয় খুবই কম। ডিম উল্টেপাল্টে দেয়ার জন্যে কম্পিউটার লাগবে কেন? এক জন মানুষ খুব সহজেই দিনে দুইবার করে উল্টে দিতে পারবে। আপনাকে তৈরি করতে হবে জিনিসটার সত্যিকার ব্যবহার মনে রেখে।

সফদর আলী কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যান, খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে চিন্তা করে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। জিনিসটা তৈরি করতে হবে সাধারণ জিনিস দিয়ে সাধারণ মানুষের জন্যে।

হ্যাঁ, সম্ভব হলে যেন ইলেকট্রিসিটি ছাড়াই চালানো যায়, গ্যাস কিংবা কেরোসিন দিয়ে।

সফদর আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একগাল হেসে বললেন, তাহলে তো জিনিসটা তৈরি করা খুবই সহজ। একদিনে বানাতে পারব। ভাবছিলাম ফাইবার গ্লাস

দিয়ে বানাব। কিন্তু তার দরকার নেই। কেরোসিন কাঠ দিয়ে পুরো জিনিসটা তৈরি হবে। দু' প্রস্থ কাঠের মাঝখানে থাকবে ভুসি। তাহলে তাপটা বেরিয়ে যাবে না। গ্যাসের চুলা দিয়ে বাতাসটা গরম করা হবে। বাতাসটা ভেতরে ছড়িয়ে যাবে তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্যে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গামলায় পানি রাখা হবে। পানি বাষ্পীভূত হয়ে নিজে থেকেই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঠিক রাখবে, যে জিনিসটা একটু কঠিন সেটা হচ্ছে তাপমাত্রা ঠিক রাখা। একটা ছোট ফিডবাক সার্কিট তৈরি করতে হবে সেজন্যে, সস্তা অপ এম্প দিয়ে বানাব। খরচ পড়বে খুবই কম। ইনকিউবেটরের ভিতরের তাপমাত্রাটা দেখে বাতাসের প্রবাহটাকে বাড়িয়ে না হয় কমিয়ে দেবে। চালানোর জন্যে লাগবে মাত্র দুটো ৯ ভোল্টের ব্যাটারি। কাঠের ট্রেতে ভুষির উপরে থাকবে ডিম, ডিমের কেস তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নেই। একসাথে এক হাজার ডিম ফোটানো যাবে।

ফিডব্যাক সার্কিটের ব্যাপারটা ছাড়া পুরো জিনিসটা আমি বুঝতে পারলাম। সত্যিই যদি এত সহজে বানানো যায়, তাহলে তো কথাই নেই। সফদর আলীর উপর আমার বিশ্বাস আছে, তিনি ঠিক ইনকিউরেটর তৈরি করে দেবেন, যেটা একমাত্র সমস্যা সেটা হচ্ছে, সুযোগ পেলেই তিনি তাঁর আবিষ্কারে কঠিন কঠিন জিনিস জুড়ে দিতে চান। কী একটা হয়েছে আজকাল, কম্পিউটার ছাড়া কথা বলতে চান না।

ইনকিউবেটর নিয়ে আলোচনা করতে করতে সফদর আলী বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কাগজ বের করে তখন-তখনি জিনিসটা আঁকতে শুরু করেন। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, শুরু করার আগে একটু চা খেলে কেমন হয়?

সফদর আলী বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তারপর জংবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, জংবাহাদুর, চা বানাও।

জংবাহাদুর একবার আমার দিকে, একবার সফদর আলীর দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে চা বানাতে উঠে গেল।

AMARBOI.COM

সপ্তাহখানেক খেটেখুটে সফদর আলী তাঁর ইনকিউবেটর তৈরি করলেন। জিনিসটা দেখতে একটা পুরানো সিন্দুকের মতো। কিন্তু সফদর আলীর কোনো সন্দেহ নেই যে এটা কাজ করবে। ইকিউবেটরটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে সফদর আলী একদিন ডিম কিনতে গেলেন। ভাবলাম হয়তো গোটা দশেক ডিম কিনে আনবেন, যদি নষ্ট হয় তাহলে এই দশটা ডিমের উপর দিয়েই যাবে। কিন্তু সফদর আলী সেরকম মানুষই নন, ইনকিউবেটরের উপর তাঁর এত বিশ্বাস যে, বাজার ঘুরে ঘুরে তিনি পাঁচ শ' চৌদ্দটা ডিম কিনে আনলেন। পাঁচ শ' বারটা যাবে ইনকিউবেটরের ভেতরে। দুটি সকালের নাস্তা করার জন্যে।

সেদিন বিকেলেই ডিমগুলো ইনকিউবেটরে ঢোকানো হল। ব্যাপারটি দেখার জন্যে আমি অফিস ফেরত সকাল সকাল চলে এলাম। পেন্সিল দিয়ে সফদর আলী সবগুলোর উপর একটি করে সংখ্যা লিখে দিলেন। এতে ডিমগুলোর হিসেব রাখাও সুবিধে, আবার উল্টে দিতেও সুবিধে। সংখ্যাটি তখন নিচে চলে যাবে। ডিমগুলো সাজিয়ে রেখে ইনকিউবেটরের ঢাকনা বন্ধ করে সফদর আলী গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে দিলেন। শোঁ শোঁ করে চুলা জ্বলতে থাকে। দেখতে দেখতে তাপমাত্রা বেড়ে ১০২ পর্যন্ত উঠে সেখানে স্থির হয়ে যায়। এখন এইভাবে বাইশ দিন যেতে হবে। তা হলে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে

বের হবে।

পরের বাইশ দিন আমার খুব উত্তেজনায় কাটে। ইনকিউবেটর কেমন কাজ করছে, সত্যি সত্যি ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে কি না এসব নিয়ে কৌতূহল। সফদর আলীর কিন্তু কোনোরকম উত্তেজনা নেই। তিনি জানেন এটা কাজ করবে। বিজ্ঞানী মানুষ, আগে অনেককিছু তৈরি করেছেন, কোনটা কাজ করবে, কোনটা করবে না কী ভাবে জানি আগেই বুঝে ফেলেন। বাইশ দিন পার হওয়ার আগেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে শুরু করে। সে যে কী অপূর্ব দৃশ্য, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। তুলতুলে হলুদ রঙের কোমল গা। কিচকিচ করে ডেকে হৈচৈ শুরু করে দিল। আমি, সফদর আলী আর জংবাহাদুর মহা উৎসাহে বাচ্চাগুলোকে ইনকিউবেটর থেকে বের করে আনতে থাকি। সফদর আলী ওদের রাখার জন্যে ট্রে তৈরি করে রেখেছিলেন। তার উপরে নামিয়ে রেখে সেগুলো উষ্ণ একটা ঘরে রাখা হল। বাচ্চাগুলোকে খাওয়ানোর জন্যে বিশেষ ধরনের খাবার তৈরি করে রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে নাকি নানারকম ভাইটামিন আর ওষুধ দেয়া আছে। মোরগের অসুখবিসুখ যেন না হয় সেজন্যে এই ব্যবস্থা।

পরদিন সকালের ভেতর পাঁচ শ' তিনটা মোরগছানা কিচকিচ করে ডাকতে থাকে। ছোট ছোট হলুদ রেশমী বলের মতো বাচ্চাগুলো দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। নয়টা ডিম নষ্ট হয়েছে, সফদর আলী সেগুলো পরীক্ষা করে দেখবেন বলে আলাদা করে রেখেছেন। পাঁচ শ' মুরগির ছানাকে বড় করার দায়িত্ব খুব সহজ ব্যাপার নয়। সফদর আলী বুদ্ধি করে আগে থেকে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন বলে রক্ষা। জংবাহাদুর এমনিতেই অলস প্রকৃতির। কিন্তু মোরগের বাচ্চাগুলো দেখাশোনায় তার খুব উৎসাহ। কেউ আশেপাশে না থাকলে সে বাচ্চাগুলোকে হাতে পায়ে ঘাড়ে নিয়ে খেলা করতে থাকে। বাচ্চাগুলোও এই কয়দিনে জংবাহাদুরকে বেশ চিনে গেছে। দেখলেই কিঁচকিঁচ করে এগিয়ে এসে ঘিরে ধরে।

AMARBOI.COM

এই ইনকিউবেটরটাকে কী ভাবে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্যে বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে সফদর আলীর সাথে কথা বলতে চাইছিলাম। কিন্তু সফদর আলী এখন সেটা করতে রাজি না। তিনি বাচ্চাগুলোকে আগে বড় করতে চান। মোরগের বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি বড় করার তাঁর কিছু ওষুধপত্র আছে। সেগুলো দিয়ে তাদের বড় করে তুলে যখন ডিম পাড়া শুরু করবে, তখন সেই ডিম দিয়ে আবার বাচ্চা ফোটাতে চান। খুব অল্প জায়গায় কী ভাবে অনেক মোরগকে রাখা যায় সে ব্যাপারেও তিনি একটু গবেষণা করতে চান। সবকিছু শেষ করে পুরো পদ্ধতিটা ইনকিউবেটরের সাথে তার বিলি করার ইচ্ছা।

ভেবে দেখলাম তাঁর পরিকল্পনাটা খারাপ নয়। শুধু ইনকিউবেটরে ডিম ফোটালেই তো হয় না, সেগুলো আবার বড়ও করতে হয়। সেটি ডিম ফোটানো থেকে এমন কিছু সহজ ব্যাপার নয়।

পরের কয়েক সপ্তাহ আমার সফদর আলীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হল। তার প্রয়োজন ছিল। কারণ একা একা কাজ করলেই তিনি তাঁর আবিষ্কারে কঠিন কঠিন জিনিস আমদানি করে ফেলেন। এই এক মাসে আমি তাঁকে যেসব জিনিস করা থেকে বন্ধ করেছি সেগুলো হচ্ছে :

(এক) মোরগের বাচ্চাগুলোর খাবার খুঁটে খেতে যেন অসুবিধে না হয় সেজন্যে তাদের ঠোঁটে স্টেনলেস স্টিলের খাপ পরিয়ে দেয়া।

(দুই) মোরগের বাচ্চাগুলোর অবসর বিনোদনের জন্যে ঘরের দেয়ালে মোরগের উপরে চলচ্চিত্র দেখানো।

(তিন) মোরগের বাচ্চাগুলো নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করছে কি না লক্ষ রাখার জন্যে ঘরে একটা টেলিভিশন ক্যামেরা বসিয়ে দেয়া।

(চার) শীতের সময় মোরগের বাচ্চার যেন ঠাণ্ডা লেগে না যায় সেজন্যে তাদের ছোট ছোট সোয়েটার বুনে দেয়া।

(পাঁচ) যেহেতু তারা মা ছাড়া বড় হচ্ছে, সেজন্যে নিজেদের ভাষা যেন ভুলে না যায় তার ব্যবস্থা করার জন্যে টেপরেকর্ডারে মোরগের ডাক শোনানো।

(ছয়) বাচ্চাগুলো ঠিকভাবে বড় হচ্ছে কি না দেখার জন্যে প্রত্যেক দিন তাদের ওজন করে গ্রাফ কাগজে ছকে ফেলা।

আমি কোনোভাবে নিঃশ্বাস চেপে আছি। আর দু'মাস কাটিয়ে দিতে পারলেই বাচ্চাগুলো বেশ বড়সড় হয়ে উঠবে। সফদর আলীর নতুন কিছু করার উৎসাহ বা প্রয়োজনও কমে যাবে। বাচ্চাগুলো বেশ তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে। কোনো অসুখ-বিসুখ নেই। সব মিলিয়ে বলা যায়, পুরো জিনিসটাই একটা বড় ধরনের সাফল্য। আমি আমার সাংবাদিক বন্ধুর সাথে কথা বলে রেখেছি, জিনিসটাকে একটু প্রচার করে তারপর সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। একটা ছোট ওয়ার্কশপে সপ্তাহে একটা করে ইনকিউবেটর তৈরি করতে পারলেই যথেষ্ট, ব্যবসা তো আর করতে যাচ্ছি না।

ঠিক এই সময়ে আমার হঠাৎ বগুড়া যেতে হল। আমি কিছুতেই যেতে চাইছিলাম না, কিন্তু বড় সাহেব আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানকার হিসেবপত্রে কি নাকি গরমিল দেখা গিয়েছে। আমাকে গিয়ে সেটা ধরতে হবে। আমি যখন আপত্তি করছিলাম, তখন বড় সাহেব কথা প্রসঙ্গে বলেই ফেললেন যে তিনি আমাকে খুব বিশ্বাস করেন। তা ছাড়া অন্য সবাই দায়িত্বশীল সাংসারিক মানুষ। আমার মতো নিষ্কর্মা আর কয়জন আছে যে ঘর-সংসার ফেলে জায়গায়-অজায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে পারে?

যাবার আগে সফদর আলীকে বারবার করে বলে গেলাম তিনি যেন এখন মোরগের বাচ্চাগুলোর ওপর নতুন কোনো গবেষণা শুরু না করেন। বাচ্চাগুলো চমৎকার বড় হচ্ছে, তাদের ঠিক এভাবে বড় হতে দেয়াই সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ, আর কিছুই করা উচিত না, তার যত বড় বৈজ্ঞানিক আইডিয়াই আসুক না কেন।

বগুড়া থেকে ফিরে আসতে বেশ দেরি হল। যাবার আগে ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম একটি দুটি টেলিগ্রাম হয়তো পাব, কিন্তু কোথায় কি, কোনো খোঁজখবরই নেই। ফিরে এসেই সফদর আলীর বাসায় গেলাম। দরজায় ধাক্কা দিতেই যথারীতি কুকুরের ডাক, কিন্তু তারপর কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমি ঘরের দরজায় একটা চিঠি লিখে এলাম যে পরদিন বিকেলবেলা অফিস ফেরত আসব, সফদর আলী যেন বাসায় থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন সফদর আলীর বাসায় গিয়ে দেখি, দরজায় লাগানো চিঠিটা নেই, যার অর্থ তিনি চিঠিটা পেয়েছেন। আমি দরজায় ধাক্কা দিতেই কুকুরের বদরাগী ডাকাকাকি শুরু হয়ে গেল, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। সফদর আলী আমার চিঠি পেয়েও বাসাতে নেই—ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! দরজায় বার কয়েক শব্দ করার পর মনে হল একটা জানালা দিয়ে কেউ একজন আমাকে উঁকি মেরে দেখে জানালাটা বন্ধ করে দিল। জংবাহাদুর হতে পারে না, কিন্তু সফদর আলী এরকম করবেন কেন?

আমি পরপর আরো কয়েকদিন চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই সফদর আলীকে ধরতে পারলাম না। নিঃসন্দেহে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু কেন? আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন কি? আমি মহা ধাঁধায় পড়ে গেলাম।

সপ্তাহ দুয়েক পর সফদর আলীকে আমি কাওরান বাজারে সেই রেস্তরাঁয় আবিষ্কার করলাম, আমাকে দেখে আবার পালিয়ে না যান সেজন্যে শব্দ না করে একেবারে তাঁর কাছে গিয়ে ডাকলাম, এই যে সফদর সাহেব।

সফদর আলী চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠে গরম চা দিয়ে তিনি মুখ পুড়িয়ে ফেলেন। আমাকে দেখে তাঁর চেহারা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অনেক কষ্টে তোতলাতে তোতলাতে বললেন, কী খবর ইকবাল সাহেব?

আমার আবার কিসের খবর, খবর তো সব আপনার কাছে। আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না। কয়েক দিন আপনার বাসায় গিয়েছিলাম, চিঠি রেখে এসেছিলাম—

ও আচ্ছা, তাই নাকি, এই ধরনের কথাবার্তা বলে তিনি ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, কেমন গরম পড়ে যাচ্ছে দেখেছেন?

আসলে তেমন কিছু গরম নয়, শুধু কথা বলার জন্যে কথা বলা, আমি সোজাসুজি আসল কথায় চলে আসি, মোরগের বাচ্চাগুলোর খবর কি?

সফদর আলী না শোনার ভান করে বললেন, নতুন ম্যানেজার এসেছে রেস্তরাঁয়, খুব কড়া, চায়ের কাপগুলো কি পরিষ্কার দেখেছেন?

আমি আরেকবার চেষ্টা করলাম, মোরগের বাচ্চাগুলোর কী খবর, কেমন আছে সেগুলো? কত বড় হয়েছে?

আছে একরকম, বলে সফদর সাহেব কথা ঘোরানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, টিভি দেখে দেখে জংবাহাদুরের চোখ খারাপ হয়ে গেছে, চশমা নিতে হয়েছে।

বানরের টিভি দেখে চোখ খারাপ হওয়ায় চশমা নিতে হয়েছে, খবরটা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। কিন্তু মোরগের বাচ্চার খবর জানতে চাইলে সেটা না দিয়ে এই খবর দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত কেন? আমি হাল ছেড়ে না দিয়ে আরো একবার চেষ্টা করলাম, বললাম, সফদর সাহেব, আপনি কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছেন কেন? মোরগের বাচ্চাগুলো ভালো আছে তো?

সফদর আলী পরিষ্কার আমার কথা না শোনার ভান করে বললেন, ভীষণ চোরের উপদ্রব হয়েছে আজকাল, পাশের বাসা থেকে সবকিছু চুরি হয়ে গেছে।

আমি হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি। তিনি যদি বলতে না চান আমি তো আর জোর করে বলাতে পারি না। তাঁর আবিষ্কার, তাঁর পরিশ্রম, আমি কোথাকার কে? কিন্তু কী হয়েছে বলতে এত আপত্তি কেন, আমি তো আর তাঁকে খেয়ে ফেলতাম

না। ভারি অবাক কাণ্ড!

সফদর আলী আগের কথার জের টেনে বললেন, চোরটা ভারি পাজি। চুরি করে যা কিছু নিতে পারে নেয়, বাকি সব নষ্ট করে দিয়ে যায়। সেদিন একজনের রান্না করা খাবারে পুরো বাটি লবণ ঢেলে দিয়ে গেছে।

আমি কিছু না বলে চুপ করে থাকি। সফদর আলী বলতে থাকেন, আগের সপ্তাহে এক বাসা থেকে অনেককিছু চুরি করে নিয়ে গেছে। যাবার আগে ছোট মেয়েটার পুতুলের মাথাটা ভেঙে দিয়ে গেছে, ভারি পাজি চোর!

আমি সফদর আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবলাম, না জানি কি হয়েছে মোরগগুলোর! আমাকে জোর করে চোরের গল্প শোনাচ্ছেন কেন?

সফদর আলী চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, চোর ধরার একটা যন্ত্র বানাচ্ছি এখন, খুব কায়দার জিনিস হবে। একটা এস. এল. আর. ক্যামেরা জুম লেন্সসহ আছে, আগে ছবি তুলে ফেলবে। চোর ব্যাটা যদি পালিয়েও যায়, তার ছবি তোলা হয়ে যাবে।

সফদর আলী একাই অনেক কথা বলে গেলেন। আমার কথা বলার উৎসাহ নেই। প্রথমে তাঁর ব্যবহারে বেশ দুঃখই লেগেছিল, কিন্তু তাঁকে বেশ অনেকদিন থেকে চিনি। তাই দুঃখটা স্থায়ী হল না। ব্যাপারটা চিন্তা করে আস্তে আস্তে আমি ভারি অবাক হয়ে যাই, পুরো জিনিসটা একটা রহস্যময় ধাঁধার মতো। এই এক মাসে মোরগের বাচ্চাগুলোর কি হতে পারে, যা তিনি আমাকে বলতে চান না? আমার কথা না শুনে মোরগের বাচ্চাগুলোর উপর নিশ্চয়ই কিছু একটা গবেষণা করে পুরো ব্যাপারটি ঘোল পাকিয়েছেন। এখন আমাকে আর সেটা বলতে চাইছেন না। ছোটখাট নয়, বড় ধরনের কিছু। কিন্তু কী হতে পারে? আমাকে বলতে এত আপত্তি কেন?

AMARBOI.COM

এভাবে আরো সপ্তাহখানেক কেটে গেল। সফদর আলীর সাথে আজকাল দেখা হয় খুব কম, মোরগের বাচ্চার ব্যাপারটি এভাবে আমার কাছ থেকে গোপন করার পর আমিও নিজেকে একটু গুটিয়ে ফেলেছি। অনেক চেষ্টা করেও জানতে না পেরে আজকাল ব্যাপারটা ভুলে যাবার চেষ্টা করছিলাম। সেদিন অফিস ফেরত বাসায় যাবার সময় চায়ের দোকানে উঁকি মেরে দেখি সফদর আলী বসে আছেন। মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ, আমাকে দেখে তাঁর চেহারা আরো কেমন জানি কালো হয়ে গেল। শুকনো গলায় বললেন, কী খবর ইকবাল সাহেব?

আমি বললাম, এই তো চলে যাচ্ছে কোনোরকম। আপনার কী খবর? চোর ধরার যন্ত্র শেষ হয়েছে?

আজকাল আমি মোরগের বাচ্চার কথা তুলি না। সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, হ্যাঁ, শেষ তো হয়েছিল।

লাগিয়েছেন চোর ধরার জন্যে?

হ্যাঁ, লাগিয়েছিলাম।

চোর এসেছিল?

সফদর আলী মাথা চুলকে বলল, হ্যাঁ, এসেছিল।

ধরা পড়েছে?

না।

তাহলে জানলেন কেমন করে যে এসেছিল?

সফদর আলী আবার মাথা চুলকে বললেন, জানি এসেছিল, কারণ পুরো যন্ত্রটা চুরি করে নিয়ে গেছে।

আমার একটু কষ্ট হল হাসি গোপন করতে। চোর যদি চোর ধরার যন্ত্র চুরি করে নিয়ে যায় ব্যাপারটাতে একটু হাসা অন্যায় নয়। সফদর আলী আমার হাসি গোপন করার চেষ্টা দেখে কেমন জানি রেগে উঠলেন, বললেন, আপনি হাসছেন? জানেন আমার কত কষ্ট হয়েছে ওটা তৈরি করতে? কত টাকার যন্ত্রপাতি ছিল আপনি জানেন?

আমি বললাম, কে বলল আমি হাসছি? এটা কি হাসির জিনিস? কী ভাবে নিল চোর এটা?

সফদর সাহেব মাথা চুলকে বললেন, সেটা এখনো বুঝতে পারি নি। জিনিস মেঝের সাথে স্ক্রু দিয়ে আঁটা ছিল, পুরোটা খুলে নিয়ে গেছে। ভাগ্যিস জংবাহাদুর ছিল, নইলে সব চুরি করে নিত।

জংবাহাদুর কেমন আছে আজকাল?

ভালোই আছে, দিনে দিনে আরো অলস হয়ে যাচ্ছে।

চোখ খারাপ হয়ে চশমা নিয়েছে বলেছিলেন?

হ্যাঁ। মানুষের মতো নাক নেই তো, চশমা পরতে প্রথম প্রথম অনেক ঝামেলা হয়েছিল জংবাহাদুরের।

আমার হঠাৎ জিনিসটা খেয়াল হয়, সত্যিই তো, বানরের চশমা আটকে থাকবে কোথায়? জিজ্ঞেস করলাম, কী ভাবে পরে চশমা?

সফদর আলী একটু হাসলেন, বললেন, সেটা আর কঠিন কী? মোরগের চশমা তৈরি করে দিলাম, আর এটা তো বানর।

আমি চমকে ঘুরে তাঁর দিকে তাকাই, মোরগের চশমা?

সফদর আলী হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমতা-আমতা করে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, কেমন গরম পড়ে যাচ্ছে দেখেছেন?

তখন মোটেও গরম পড়ছে না, দু'দিন থেকে আমার হাফহাতা সোয়েটারটা আর শীত মানতে চাইছে না বলে একটা ফুলহাতা সোয়েটার পরব বলে ভাবছি। কাজেই বুঝে নিলাম সফদর আলী কথাটা ঘোরাতে চাইছেন। সফদর আলী ভুলে মোরগের চশমার কথা বলে ফেললেন, এখন আর কিছুতেই মুখ খুলবেন না। আমি তাঁকে আর ঘাঁটালাম না, কথাটা কিন্তু আমার মনে গেঁথে রইল। মোরগের চশমা পরিয়ে তিনি একটা-কিছু অঘটন ঘটিয়েছেন। অঘটনটি কী জানার জন্যে কৌতূহলে আমার পেট ফেটে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু লাভ কি? সফদর আলী তো কিছুতেই কিছু বলবেন না।

মাঝরাতে কেউ যদি কাউকে ডেকে তোলে, তার মানে একটা অঘটন। কখনো শুনি নি কাউকে মাঝরাতে ডেকে তুলে বলা হয়েছে সে লটারিতে লাখ-দু' লাখ টাকা পেয়েছে। তাই আমাকে যখন মাঝরাতে ডেকে তুলে বলা হল, আমার সাথে এক জন দেখা করতে এসেছে, ভয়ে আমার আত্মা শুকিয়ে গেল। কোনোমতে লুঙ্গিতে গিঁট মেরে চোখ মুছতে মুছতে এসে দেখি সফদর আলী। আগে কখনো আমার বাসায় আসেন নি, এই

প্রথম, সময়টা বেশ ভালোই পছন্দ করেছেন। আমি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললাম, কী ব্যাপার সফদর সাহেব, এত রাতে?

রাত কোথায়? এ তো সকাল, একটু পরেই সূর্য উঠে যাবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি কথাটা খুব ভুল নয়, ভোর চারটার মতো বাজে, ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করলে সূর্য যদি নাও ওঠে, চারিদিক ফর্সা হয়ে যাবে ঠিকই। এই সময়টাতে আমার ঘুম সবচেয়ে গাঢ়। লাখ টাকা দিলেও এই সময়ে আমি ঘুম নষ্ট করি না। আজ অবশ্যি অন্য কথা, বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো কাজে এসেছেন, না এমনি হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছেন?

সফদর আলী একটু রেগে বললেন, এমনি হাঁটতে হাঁটতে কেউ এত রাতে আসে নাকি?

আপনিই না বললেন এখন রাত নয়, এখন সকাল। ভাবলাম বুঝি আপনার মর্নিং-ওয়াক করার অভ্যাস।

আরে না না, মর্নিং-ওয়াক না, একটা ব্যাপার হয়েছে।

কি ব্যাপার?

একটু আগে সেই চোর ধরা পড়েছে। এখন তাকে নিয়ে কি করি বুঝতে না পেরে—

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, তাকে সাথে নিয়ে এসেছেন?

না না, কী যে বলেন!

কোথায় সেই চোর?

বাসায়। সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, চোর ধরা পড়লে কী করতে হয় জানেন?

আমি মাথা চুলকাই, চোর ধরা পড়লে লোকজন প্রথমে একচোট মারপিট করে নেয় দেখেছি। যাকে সারা জীবন নিরীহ গোবেচারা ভালোমানুষ বলে জেনে এসেছি, সেও চোর ধরা পড়লে চোখের সামনে অমানুষ হয়ে কী মারটাই না মারে। কিন্তু সেটা তো আর সফদর আলীকে বলতে পারি না। একটু ভেবে-চিন্তে বললাম, চোর ধরা পড়লে মনে হয় পুলিশের কাছে দিতে হয়।

সে তো সবাই জানে, কিন্তু দেয়টা কী ভাবে? চোর তো আর ওষুধের শিশি না যে পকেটে করে নিয়ে যাব। রিকশায় পাশে বসিয়ে নেব? যদি দৌড় দেয় উঠে?

বেঁধে নিতে হয় মনে হয়।

কোথায় বাঁধব?

হাতে।

হাত বাঁধা থাকলে মানুষ দৌড়াতে পারে না বুঝি?

আমি মাথা চুলকে বললাম, তাহলে মনে হয় পায়ে বাঁধতে হবে।

সফদর আলী ভুরু কুঁচকে বললেন, তাহলে ওকে নিয়ে যাব কেমন করে? কোলে করে?

সমস্যা গুরুতর। আমার মাথায় কোনো সমাধান এল না, জিজ্ঞেস করলাম, এখন কোথায় রেখে এসেছেন?

জংবাহাদুরের কাছে।

আমি অবাক হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠি, একটা বানরের কাছে একটা ঘাগু চোর রেখে এসেছেন! মাথা খারাপ আপনার?

সফদর আলী অবাক হয়ে বললেন, তাহলে কী করব? সাথে নিয়ে আসব?

কিন্তু তাই বলে একটা বানরের কাছে রেখে আসবেন?

আহা-হা, এত অস্থির হচ্ছেন কেন, আমি কি এমনি এমনি রেখে এসেছি, ঘরের সব দরজা-জানালাতে এখন বিশ হাজার ভোল্ট, পাওয়ার বেশি নেই তাই কেউ ছুঁলে কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু দারুণ শক খাবে।

তাই বলেন, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, চোরকে তাহলে আসলে জংবাহাদুরের হাতে ঠিক ছেড়ে আসেন নি।

না, তা ঠিক নয়, জংবাহাদুরের হাতেই ছেড়ে এসেছি। হাই ভোল্টেজের সুইচটা জংবাহাদুরের হাতে, সে ইচ্ছা করলে চালু করবে, ইচ্ছা করলে বন্ধ করবে।

করেছেন কী। আমি লাফিয়ে উঠি, একটা বানরের হাতে এভাবে ছেড়ে আসা উচিত হয় নি। চোর নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে এতক্ষণে।

মনে হয় না, সফদর আলী গম্ভীর গলায় বললেন, জংবাহাদুর ভীষণ চালু, ওকে ধোঁকা দেওয়া মুশকিল।

কি জানি বাবা, আমার বানরের ওপর এত বিশ্বাস নেই। তাড়াতাড়ি চলেন যাই।

আমি দুই মিনিটে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ি। ভোরের ঘুমটা গেল, কিন্তু রোজ তো আর চোর ধরা পড়ে না, রোজ তো আর সফদর আলী একটা বানরের হাতে একটা ধড়িবাজ চোর ছেড়ে আসেন না!

ভেবেছিলাম হেঁটে যেতে হবে। কিন্তু একটা রিকশা পেয়ে গেলাম। এত সকালে বেচারা রিকশাওয়ালা রিকশা নিয়ে বেরিয়েছে কেন কে জানে! আমি রিকশায় উঠে সফদর আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, নতুন আরেকটা চোর ধরার যন্ত্র তৈরি করেছেন তাহলে?

নাহ্! সফদর আলী হঠাৎ করে কেমন জানি কাঁচুমাচু হয়ে যান।

তাহলে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, চোর ধরা পড়ল কেমন করে?

সফদর আলী কাঁচমাচু মুখেই একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, বেচারা চোর ভুল করে সেই মোরগের ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

এই প্রথম তিনি নিজে থেকে মোরগের কথা বললেন। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকি শোনার জন্যে তিনি কী বলেন। কিন্তু সফদর আলী আর কিছুই বললেন না। আমি বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কী হল?

কী আর হবে, ভয়ে এক চিৎকার করে ফিট।

আমার চোয়াল ঝুলে পড়ে, ভয়ে চিৎকার করে ফিট?

হ্যাঁ।

মোরগ দেখে ফিট?

ও বেচারা কি আর জানে নাকি ওগুলো মোরগ। ও ভেবেছে—

কী ভেবেছে?

কি জানি, কি ভেবেছে। সফদর আলী হাত নেড়ে থেমে পড়তে চাইলেন, কিন্তু আমি চেপে ধরলাম। সফদর আলী বাধ্য হয়ে সবকিছু খুলে বললেন, ঘটনাটা

এরকম—

আমি বগুড়া চলে যাবার পরপরই সফদর আলীর মনে হল ছোট একটা জায়গায় এতগুলো মোরগের বাচ্চা পাশাপাশি থাকাটা তাদের মানসিক অবস্থার জন্যে ভালো নয়। যেহেতু তাদের জন্যে জায়গা বাড়ানো সম্ভব নয়, তাই তিনি ঠিক করলেন মোরগের বাচ্চাগুলিকে এমন একটা অনুভূতি দেবেন যেন তারা অনেক বড় একটা জায়গায় আছে। ত্রিমাত্রিক সিনেমা দেখানোর জন্যে যেরকম ব্যবস্থা করা হয় তিনিও সেই একই ব্যবস্থা করলেন। ঘরের চারপাশের দেয়ালে গাছপালা-বাড়িঘর ইত্যাদির দুইটি করে ছবি এঁকে দিলেন। একটি লাল রং দিয়ে, আরেকটি সবুজ। ছবি দুটির মাঝখানে একটু ফাঁক রাখা হল, যেখানে ফাঁক যত বেশি, সেখানে ছবিটাকে মনে হবে তত বেশি দূরে। দূরত্বের এই অনুভূতি আনার জন্যে অবশ্যি একটা বিশেষ ধরনের চশমা পরতে হয়। এই চশমার একটা কাচ সবুজ, আরেকটা লাল। এই চশমা পরে লাল আর সবুজ রঙের আঁকা ছবিটির দিকে তাকালে দুই চোখ দিয়ে দুটি আলাদা আলাদা ছবি দেখতে পায়। এক চোখে দেখে লাল রঙে আঁকা ছবি অন্য চোখে দেখে সবুজ রঙে আঁকা ছবি। আমরা কখনোই দুই চোখ দিয়ে দুটি আলাদা আলাদা জিনিস দেখি না। এবারেও মস্তিষ্ক চোখ দুটিকে বাধ্য করে দূরে এক জায়গায় একান্তে যেন দুটি ছবি একত্র হয়ে একটি ছবি হয়ে যায়। কাজেই ছবিটি দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু মনে হয় দূরে। আর তাই দেয়ালে আঁকা ছবিগুলোকে মনে হবে অনেক দূরে ছড়ানো।

দেয়ালে ছবি আঁকা শেষ করে সফদর আলী মোরগের চশমা তৈরি শুরু করলেন, তখন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল মোরগের দুই চোখ দুই পাশে, মানুষের মতো সামনে নয়। দুই চোখ সামনে না থাকলে দূরত্ব বোঝা যায় না। কাজেই সফদর আলীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সফদর আলী অবশ্যি হাল ছাড়ার মানুষ নন। তাই তিনি একটা সমাধান ভেবে বের করলেন। ছোট ছোট দুটি আয়না তিনি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে চোখের দু' পাশে লাগিয়ে দিলেন। মোরগের এভাবে দেখে অভ্যাস নেই, তাই সেগুলো প্রথম কয়দিন অন্ধের মতো এদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। যখন ডানদিকে যাবার কথা তখন বামদিকে যায়। আবার যখন বামদিকে যাবার কথা তখন যায় ডানদিকে। সপ্তাহখানেক পরে সেগুলোর একটু অভ্যাস হল, তখন একটা ভারি মজার ব্যাপার দেখা যায়, মোরগগুলো ক্রমাগত মাথা না নেড়ে সবসময় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সফদর আলীর মতে জিনিসটা দেখতে খুবই অস্বাভাবিক, আগে থেকে জানা না থাকলে ভয় পাওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। মোরগের চোখ দুটি সামনের দিকে এনে তাদের বাইনোকুলার দৃষ্টি দেবার পর তিনি তাদের চশমা পরাতে শুরু করলেন। এক চোখে লাল আরেক চোখে সবুজ চশমার কাচে মোরগগুলোকে দেখতে ভয়ংকর দেখাতে থাকে। কিন্তু তারা নাকি দূরত্বের অনুভূতি পাওয়ার ফলে হঠাৎ করে মানসিকভাবে ভালো বোধ করতে শুরু করে। সফদর আলী সেটা কী ভাবে জেনেছেন জিজ্ঞেস করলে মাথা চুলকে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন।

মোরগগুলোর ওপর সফদর আলী আরো কী কী গবেষণা করেছেন সেটা বলে শেষ করার আগেই আমরা তাঁর বাসায় পৌঁছে যাই। সফদর আলী রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দরজার কাছে গিয়ে একটা হাঁক দিলেন, জংবাহাদুর, হাই ভোল্টেজ বন্ধ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাও, একদম বন্ধ।

জংবাহাদুর নিশ্চয়ই হাই ভোল্টেজ বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ সফদর আলী ইলেকট্রিক শক না খেয়েই ভেতরে এসে ঢুকলেন। পিছু পিছু আমিও ঢুকছিলাম। কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড ইলেকট্রনিক শক খেয়ে সফদর আলী আর আমি দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ি। কয়েক মুহূর্ত লাগে আমার সম্বিৎ ফিরে পেতে। প্রথমেই দেখতে পেলাম ঘুলঘুলিতে জংবাহাদুর ঝুলে আছে। চোখে চশমা এবং সেই অবস্থায় সে পেট চেপে হাসিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সফদর আলী কাপড়ের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে বললেন, কেমন পাজি দেখেছেন বেটা বানর?

এইটা আপনার বানর?

গলার স্বরে আমি চমকে তাকাই, খালি গায়ে তেল চিকচিকে একটা মানুষ গালে হাত দিয়ে মেঝেতে বসে অছে। নিশ্চয় চোর হবে, দেখে মনে হয় দিব্যি একটা ভালোমানুষ।

সফদর আলী গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

লোকটা দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে বলল, আমি যদি এই বেটার জান শেষ না করি তাহলে আমার নাম ইদরিস মোল্লা না।

আমি কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলাম, কেন, কি হয়েছে?

জিজ্ঞেস করতে হয় কেন? লোকটা ভীষণ রেগে ওঠে, আপনার পোষা বানর যদি আপনাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মজা দেখায়, তাইলে আমার কী অবস্থা করেছে বুঝতে পারেন না?

সফদর আলী মুখ শক্ত করে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি পালানোর চেষ্টা করেছিলে।

লোকটা মুখ ভেংচে উত্তর দিল, সেটা খুব অন্যায় হয়েছে? আপনি লোক জড়ো করে মারপিট করার ব্যবস্থা করলে দোষ হয় না, আর আমি পালানোর চেষ্টা করলে দোষ?

চোর বেচারা আমাকে দেখে মনে করেছে তাকে পিটুনি দিতে এসেছি। আমার চেহারা এমন যে দেখলেই মনে হয় কাউকে ধরে বুঝি মার দিয়ে দেব। ছোট বাচ্চারা এ জন্যে পারতপক্ষে আমার ধারে-কাছে আসে না। শুনেছি আমার পরিচিত কিছু ছোট বাচ্চাকে আমার কথা বলে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়। যাই হোক, আমি চোরটার ভুল ভেঙে না দিয়ে একটা হুঙ্কার দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরে আটকে দিলাম। এখন পুলিশে খবর দিতে হবে। তার সাথে আমার অন্য কৌতূহল রয়ে গেছে। সফদর আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, মোরগগুলো কোথায়?

সফদর আলী ইতস্তত করে বললেন, ঐ তো, ঐ ঘরে।

একটু দেখে আসি।

সফদর আলী অনিচ্ছার স্বরে বললেন, যাবেন দেখতে?

কী আছে, দেখে আসি।

সফদর আলী না করলেন না, কিন্তু খুব অস্বস্তি নিয়ে গোঁফ টানতে থাকেন।

আমি দরজা খুলে ঘরটাতে ঢুকলাম। অন্ধকার ঘর, একটা চাপা দুর্গন্ধ, মোরগের ঘরে যেমন হবার কথা। দেয়াল হাতড়ে বাতির সুইচ না পেয়ে হঠাৎ মনে পড়ল তার বাসায় হাততালি দিলেই বাতি জ্বলে ওঠে। আমি শব্দ করে একটা হাততালি দিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সত্যিই সাথে সাথে বাতি জ্বলে উঠল। না জ্বললেই ভালো ছিল, কারণ তখন যে দৃশ্য দেখতে হল, মানুষের পক্ষে সে দৃশ্য সহ্য করা সম্ভব না।

আমি আতঙ্কে পাথর হয়ে গেলাম। আমার চারদিকে থলথলে আশ্চর্য এক ধরনের প্রাণী। প্রাণীগুলোর গোল গোল বড় বড় চোখ, ড্যাবড্যাব করে স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রাণীগুলো আমাকে কয়েক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করে, তারপর হঠাৎ একসাথে খাই খাই করে থলথলে শরীর টেনে-হিঁচড়ে আমার দিকে এগুতে থাকে। সফদর আলী মোরগের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এগুলো তো মোরগ নয়, এগুলো সাক্ষাৎ পিশাচ। আতঙ্কে চিৎকার করে আমি পালানোর চেষ্টা করি—তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি সফদর আলী মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছেন। ওপরে চশমা চোখে জংবাহাদুর ঘুলঘুলি ধরে ঝুলে আছে, আবার সে পেট চেপে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমাকে চোখ খুলতে দেখে সফদর আলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তখনি বলেছিলাম গিয়ে কাজ নেই, ভয় পেতে পারেন।

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, ওগুলো কী?

কেন, মোরগ।

ওরকম কেন?

ভাবলাম মোরগ রান্না করতে হলে যখন পালক ছাড়াতেই হয়। আগে থেকে ওষুধ দিয়ে পালক ঝরিয়ে ফেললে কেমন হয়। পালক ঝরে যাবার পর দেখতে খারাপ হয়ে গেল। তা ছাড়া মোটা হওয়ার ওষুধটা একটু বেশি হয়ে সবগুলো বাড়াবড়ি মোটা হয়ে গেছে। মোটা বেশি বলে খিদেও বেশি, সবসময়েই এখন খাই খাই। যা-ই দেখে তা-ই খেতে চায়, মানুষজন দেখলেও চেষ্টা করে খেতে।

আমি সাবধানে বুকের ভেতর আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দিই। কতদিন ঐ দৃশ্য মনে থাকবে কে জানে!

পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। চোরকে থানায় দেবার পর তার বাসা থেকে সফদর আলীর চোর ধরার যন্ত্রসহ অনেক চোরাই মালপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সফদর আলী মিউনিসিপ্যালিটি থেকে চোর ধরার জন্যে কী একটা পুরস্কার পেতে পারেন বলে শুনেছি। তিনি এখনো গবেষণা করে যাচ্ছেন মোরগগুলোকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে। জিনিসটি অসম্ভব নয়, কিন্তু বেশ নাকি কঠিন। আমি অবশ্যি খুব আশাবাদী নই। তাঁর ইনকিউবেটর অবশ্যি ঠিক আছে। আমি আপাতত সেটাই সাধারণ মানুষের কাছে বিলি করানো যায় কি না বোঝানোর চেষ্টা করছি।

দেখি কি হয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওমিক্রনিক রূপান্তর

উৎসর্গ

বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর
জাহানারা ইমাম
শ্রদ্ধাস্পদেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহাম্মক

রিকির জন্যে অপেক্ষা না করেই বিজ্ঞান আকাদেমির অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম অপেক্ষা করা হত, আজকাল আর করা হয় না। সে অনেক দিন হল এইসব অধিবেশনে যোগ দেয়া ছেড়ে দিয়েছে। তাই আজ হঠাৎ করে যখন অধিবেশনের মাঝখানে রিকি এসে হাজির হল, সবাই একটু অবাক না হয়ে পারল না। রিকি সবার দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তার স্বভাবসুলভ উদ্ধত ভঙ্গিতে নিজের আসনে গিয়ে বসে। শব্দ করে তার হাতের ব্যাগ থেকে একটা ছোট পানীয়ের শিশি বের করে এক ঢোক খেয়ে শিশিটা টেবিলের উপর রাখে।

বৃদ্ধ সভাপতি রু সচরাচর রিকির উদ্ধত আচার–আচরণকে সযত্নে এড়িয়ে যান, সবাই ভেবেছিল আজও তাই করবেন। কিন্তু রু কী কারণে জানি টেবিলে তাঁর কাগজপত্র ভাঁজ করে রেখে শান্ত গলায় বললেন, রিকি, তুমি তিরিশ মিনিট দেরি করে এসেছ।

AMARBOI.COM

রিকি মুখে একটু হাসি টেনে আনার ভান করে বলল, জানি।

সে ক্ষেত্রে তোমার অধিবেশনে যোগ দেয়ার আগে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন আছে।

তাই নাকি? রিকি গলার স্বরে ব্যঙ্গটুকু আড়াল করার কোনো চেষ্টা করল না।

এসব নিয়মকানুন বেশিরভাগই স্বাভাবিক ভদ্রতা, তুমি জান না এতে আমি খুব অবাক হই না। রু হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললেন, তোমার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন আছে রিকি।

রিকি কিংবা অন্য কেউই মহামান্য রুকে এ রকম কঠিন স্বরে কথা বলতে দেখে নি। মুহূর্তের মাঝে পরিবেশটি আশ্চর্য রকম শীতল হয়ে যায়।

রিকি একটু বিপন্ন অনুভব করে, কষ্ট করে নিজের গলার স্বরকে স্বাভাবিক রেখে বলল, ঠিক আছে, অনুমতি নিচ্ছি।

নাও।

আমি কি অধিবেশনে যোগ দিতে পারি?

রু তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, না।

ঘরে বজ্রপাত হলেও মনে হয় কেউ এত অবাক হত না। বিজ্ঞান আকাদেমির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদস্যরা এত প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী যে পৃথিবীর শাসনতন্ত্র পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। রিকির ফর্সা মুখ অপমানে টকটকে লাল হয়ে যায়। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, আপনি আমাকে সবার সামনে অপমান করার চেষ্টা করছেন।

না।

তাহলে?

বিজ্ঞান আকাদেমির তোমাকে আর প্রয়োজন নেই। তোমাকে এই ছোট একটি সত্যি কথা জানানোর চেষ্টা করছি।

সেই সত্যি কথাটি কার মাথা থেকে বের হয়েছে?

আমার।

আপনাকে কে এই ক্ষমতা দিয়েছে?

কেউ দেয় নি। রু আস্তে আস্তে বললেন, আমি নিজেই নিয়েছি।

বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যদের ক্ষমতা প্রায় ঈশ্বরের মতো। তাদেরকে আদেশ দেওয়া যায় না।

হ্যাঁ, তাদের ক্ষমতা দিয়েছে পৃথিবীর সাধারণ মানুষ। তারা যখন দেখবে সেই ক্ষমতা অপব্যবহার করা হচ্ছে, সে-ক্ষমতা তারা আবার নিয়ে নেবে। তুমি তোমার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছ রিকি।

কী করেছি আমি?

অনেক কিছু করেছ। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে তোমার স্ত্রীর মৃত্যু। তুমি তাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছ রিকি।

রিকি চমকে উঠে বৃদ্ধ রুয়ের মুখের দিকে তাকাল। রু শান্ত গলায় বললেন, সাধারণ মানুষ হলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যরা সব নিয়মকানুনের উর্ধ্বে, তাই তোমাকে স্পর্শ করা হয় নি।

রিকি কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি কে। আমি হচ্ছি সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ আনাহাস্ রিকিশান, সংক্ষেপে রিকি। চোদ্দ বৎসর বয়সে আমি মহাজাগতিক সূত্রের সপ্তম সমাধান করেছি। সতের বৎসর বয়সে আমার নামে তিনটি ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছে। বাইশ বছর বয়সে আমি বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য হয়েছি, সময়সূত্রের একমাত্র সমাধানটি আমার নিজের হাতে করা, নবম সূত্রের রিকি পরিভাষা ব্যবহারিক অঙ্কের জন্যে নূতন জগতের সন্ধান দিয়েছে—

রু হাত তুলে তাকে থামালেন, বললেন, আমরা জানি তুমি অত্যন্ত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী।

আমার জন্য পৃথিবীর সাধারণ নিয়ম খাটে না মহামান্য রু। পৃথিবীর দুই-চারটি সাধারণ মানুষের প্রাণ আমার ব্যক্তিগত খেয়াল থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার স্ত্রী অত্যন্ত নির্বোধ মহিলা ছিল।

আমি মৃতদের নিয়ে অসম্মানজনক কথা পছন্দ করি না, রিকি।

রিকি থতমত খেয়ে থেমে যায়, আস্তে আস্তে তার মুখের মাংসপেশি শক্ত হয়ে আসে। টেবিল থেকে পানীয়ের শিশিটি তুলে এক ঢোক খেয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে বলল, ঠিক আছে, তা হলে জীবিত ব্যক্তিদের কথাই বলি। এই বিজ্ঞান আকাদেমি হচ্ছে একটা গণ্ডমূর্খের আড্ডা। এখানকার সবাই হচ্ছে একজন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বোধ। বিজ্ঞানের সবগুলো শাখায় আমি একা যে পরিমাণ অবদান রেখেছি, আপনারা সবাই মিলে তার এক শ' ভাগের এক ভাগ অবদান রাখেন নি।

সেটা নির্ভর করে তুমি অবদান বলতে কী বোঝাও তার উপর। রিকি, তুমি ভুলে যাচ্ছ, বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যদের ব্যক্তিগত গবেষণার সময় কিংবা সুযোগ নেই।

আমাকে সেটা বিশ্বাস করতে বলছেন?

রু কোমল গলায় প্রায় হাসিমুখে বললেন, সেটা তোমার ইচ্ছে রিকি। কিন্তু তুমি যেহেতু বিষয়টি তুলেছ, তোমাকে একটা ঘটনার কথা বলি। প্রায় কুড়ি বছর আগে পশ্চিমের পাহাড়ী অঞ্চলের একটা কৃষিজীবী এলাকার বাচ্চাদের স্কুল থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছিলাম। স্কুলের একজন শিক্ষকের চিঠি—অনেক ঘুরে আমার কাছে এসেছিল। চিঠিতে শিক্ষক লিখেছেন, তাঁর ক্লাসে নাকি একজন অস্বাভাবিক প্রতিভাবান শিশু রয়েছে। আমি শিশুটির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার বয়স তখন সাত, সে ছয় বৎসর বয়সে মহাজাগতিক সূত্রের প্রথম সমাধানটি করেছিল। সাত বৎসর বয়সে সে সময়ে পরিভ্রমণের উপর প্রায় সঠিক একটা সূত্র দিয়েছিল। আমি তাকে এবং তার পরিবারকে রাজধানীতে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। বাচ্চাটি রাজি হয় নি। সে বিজ্ঞানে উৎসাহী নয়।

রিকি শক্তমুখে বলল, কী নাম তার? কোথায় থাকে?

তাতে তোমার প্রয়োজন কি? তোমাকে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, সেই শিশুটি তোমার থেকে অনেক বেশি প্রতিভাবান ছিল। সে ইচ্ছে করলেই আমাদের সাথে এই সভায় থাকতে পারত। কিন্তু সে থাকে নি। যে-বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য হয়ে তোমার এত অহঙ্কার, সেই শিশুটির তাতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। পৃথিবীতে তোমার থেকে অনেক বড় প্রতিভাবান মানুষ আছে, তবে হ্যাঁ, তোমার মতো অহঙ্কারী, ক্ষমতালোভী উচ্চাকাঙ্ক্ষী সম্ভবত আর কেউ নেই।

রিকি কী-একটা বলতে চাইছিল, রু হাত তুলে তাকে থামিয়ে বললেন, প্রায় তিরিশ বৎসর আগে মহাজাগতিক মেঘ দিয়ে পৃথিবীতে একটা বিপর্যয় নেমে আসার কথা ছিল। আমরা—এই বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যরা, সেই বিপর্যয় থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলাম, তুমি সেই ঘটনার কথা জান?

জানি।

পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রচেষ্টার কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কেন থাকবে জান?

জানি।

না, তুমি জান না। তোমার জানার ক্ষমতা নেই। তুমি লোভী এবং স্বার্থপর। দশজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীর একসাথে কাজ করার কি আনন্দ, তুমি কল্পনাও করতে পার না রিকি। পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের প্রচেষ্টার কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, কারণ আমরা সবাই একসাথে কাজ করে একটি ভয়ংকর বিপর্যয় থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলাম। বিজ্ঞানীদের জীবনে এর থেকে বড় সার্থকতা আর কিছু নেই। ব্যক্তিগত সাফল্যের সাথে এর কোনো তুলনাও হয় না। রিকি, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। তুমি কিংবা তোমার মতো একজন বিজ্ঞানী যে-কাজের জন্যে এত অহঙ্কারী হয়ে যাও, তার প্রত্যেকটিই অন্য কয়জন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী কয়েক বৎসর চেষ্টা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের করে ফেলতে পারে। খুব দুঃখের ব্যাপার, তুমি এই সহজ সত্যটি জান না। তুমি আমাদের কোনো কাজে আস না রিকি, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। তুমি এখন যাও, ভবিষ্যতে আর কখনো এসো না।

রিকি ষড়যন্ত্রীর মতো মুখ করে বলল, যদি না যাই?

যাবে। তুমি নিশ্চয়ই যাবে। তুমি অনেক দিন থেকে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ।

আপনি কেমন করে জানেন?

আমি জানি। আমি বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতি, তাই আমার কাছে সব খবরাখবর আসে। আমি না চাইলেও আসে। আমি জানি, তুমি পৃথিবীর পুরো রথিনিয়ামটুকু নিজের কাছে এনে জমা করেছ। তুমি এখন পালাবে। কোথায় পালাবে জানি না, কিন্তু তুমি পালাবে।

রিকি মুখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে বলল, আমি পালাব?

হ্যাঁ। কারণ তুমি জান, আমরা বিজ্ঞান আকাদেমির নিয়মকানুন পাল্টে ফেলছি। তোমার মতো মানুষের যেন বিচার করা যায় তার ব্যবস্থা করছি।

রিকি এবারে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে, আমার বিচার করবেন আপনারা? পৃথিবীর মানুষেরা? কখনো শুনেছেন পৃথিবীর মানুষ ঈশ্বরের বিচার করার চেষ্টা করছে?

রু কোনো কথা না বলে ভুরু কুঁচকে রিকির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রিকি উঠে দাঁড়ায়। হাসতে হাসতে বলে, বেশ, চেষ্টা করে দেখেন। আমি যাচ্ছি—এই নির্বোধদের আসরে আমার জন্যে থাকা আর সম্ভব নয়। বিদায়।

কেউ কোনো কথা বলল না, রিকি দরজা খুলে সভাকক্ষ থেকে বের হয়ে গেল।

www.amarboi.com

রিকি বের হয়ে যাবার পর কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলল না। রু আস্তে আস্তে তাঁর চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যে তোমরা এই উন্মাদ ব্যক্তিটির সাথে আমার কথোপকথনটি ধৈর্য ধরে শুনলে। তোমরা কেউ যে কোনো কথা বল নি, সে জন্যে আমি সারা জীবন তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

গণিতবিদ কিরি বললেন, আমরা আপনার ধৈর্য দেখে বিস্মিত হয়েছি মহামান্য রু। একটি ঘুসি দিয়ে তার সবকয়টি দাঁত খুলে না ফেলে কী ভাবে তার সাথে কথা বলা যায় আমার জানা নেই।

অধিবেশন-কক্ষে অনেকে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে। রসায়নবিদ নীষা তরল স্বরে বললেন, ভাগ্য ভালো যে তুমি কথা বলার চেষ্টা কর নি, কিরি। এই বয়সী মানুষের মারপিট দেখতে ভালো লাগার কথা নয়।

আবার অধিবেশন-কক্ষে মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। রু বললেন, চল, কাজ শুরু করা যাক।

নীষা বললেন, মহামান্য রু, আপনি কি খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে চান? রিকির সঙ্গে কথা বলা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

ঠিকই বলেছ। মিনিট পনেরর জন্যে বিরতি নেয়া যাক। কী বল?

সবাই সানন্দে রাজি হয়ে যায়।

সন্ধেবেলা মহামান্য রু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন, এমন সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর সহকারী মেয়েটি নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়। রু ঘুরে তার দিকে তাকালেন, কিছু বলবে?

কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক আপনার সাথে দেখা করতে চান। কি নাকি জরুরি ব্যাপার।

রু অন্যমনস্কভাবে বললেন, আসতে বল।

প্রায় সাথে সাথেই তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক এসে হাজির হলেন। বয়স্ক ভদ্রলোক, কপালের দু'পাশে চুলে পাক ধরেছে। কমনীয় চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত আপনাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্য।

রু হাসিমুখে বললেন, কে বলেছে তুমি বিরক্ত করছ? তোমার কাছে আমি যে-সব মজার খবর পাই, আর কোথায় সেগুলো পাব বল?

আমি খুব দুঃখিত মহামান্য রু, কিন্তু একটা খবর জানানোর জন্যে আমার নিজের আসতে হল।

কি খবর? রিকি কিছু করেছে?

আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। মহামান্য রিকি তাঁর গোপন গবেষণাগারে কুরু মহাকাশযানের একটি ইঞ্জিন নিয়ে গেছেন।

সেটা কী জিনিস?

কুরু মহাকাশযানের ইঞ্জিন অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। একটি শেষ করতে প্রায় ছয় বছর সময় নেয়। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ইঞ্জিন—আন্তঃনক্ষত্র ভ্রমণ ছাড়া অন্য কোনো ব্যবহার নেই। মহামান্য রিকি কী কাজে ব্যবহার করবেন, সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই।

রু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, রিকি এখন পালাবে। তুমি দেখ, সে পালাবে। খুব ভয় পেয়েছে আজ।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক কোনো কথা বললেন না, বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যদের নিয়ে কৌতূহল দেখানো শোভন নয়। রু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ঘুরে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে জানানোর জন্যে। ইঞ্জিনটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে আর লাভ নেই, ধরে নাও ওটা গেছে। আমি মহাকাশ কেন্দ্রের সাথে কথা বলে একটা-কিছু ব্যবস্থা করে দেব।

অনেক ধন্যবাদ মহামান্য রু। তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, রু তাঁকে থামালেন। জিজ্ঞেস করলেন, রিকি এখন পর্যন্ত কী করেছে না করেছে তুমি তো সব জান?

জানি।

তার স্ত্রীকে হত্যা করা, রথোনিয়াম জড়ো করা, মুদ্রা অপসারণ, এখন কুরু মহাকাশযানের ইঞ্জিন—

পরিচালক ভদ্রলোক মাথা নিচু করে বললেন, জ্বি, জানি।

তুমি খুব সাবধানে এইসব খবর বাইরের পৃথিবীর কাছে গোপন রেখেছ?

জ্বি। বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যদের অবমাননা করে কোনো ধরনের খবর প্রকাশ করা আমাদের নীতির বিরুদ্ধে।

রু একটু ভেবে বললেন, রিকি আজকালকের ভিতরে উধাও হয়ে যাবে। কোথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে ঠিক বলা যাচ্ছে না, কিন্তু উধাও হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে উধাও হবার পর তার সম্পর্কে তুমি যা জান, সবকিছু খবরের কাগজে প্রকাশ করে দিতে পারবে?

পরিচালক ভদ্রলোক ভয়ানক চমকে উঠলেন, কী বলছেন আপনি!

রু শান্ত গলায় বললেন, পারবে?

আপনি যদি বলেন নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু—

কিন্তু কি?

বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যরা আমাদের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁরা পৃথিবীর জন্যে যে অবদান রেখেছেন, তার কোনো তুলনা নেই, তাঁদের কোনো–একজন যদি ছোটখাটো কোনো ভুলত্রুটি করে থাকেন, সেটা সারা পৃথিবীকে জানানোর সত্যিই কী কোনো প্রয়োজন আছে?

রু আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, আছে। বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যরা ঈশ্বর নয়, তারা মানুষ। তাদের সাধারণ মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া ঠিক না। তুমি আমার এই অনুরোধটি রাখ।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক বিদায় নেয়ার পর রু অনেকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন, বিজ্ঞান আকাদেমির কাঠামোতে একটি বড় রদবদল করতে হবে, এভাবে আর চালানো যায় না। আজ একজন রিকি বের হয়েছে, ভবিষ্যতে যদি দশজন রিকি বের হয়, তখন কী হবে?

সহকারী মেয়েটি নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করে বলল, মহামান্য রু, আপনার জন্য কিছু খাবার আনব?

না, এই তো খেলাম একটু আগে। বয়স হয়ে গেলে বেশি খিদে পায় না।

তা হলে কোনো ধরনের পানীয়? ফলের রস বা অন্য কিছু?

না না, কিছু লাগবে না। আমার জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না। যদি পার তা হলে দেখ আমাদের যাদুঘরের মহাপরিচালককে কোথাও পাওয়া যায় কী না। জরুরি কিছু নয়, এমনি একটু কথা বলব।

সহকারী মেয়েটি হাসি গোপন করে সরে গেল। মহামান্য রু নিজে থেকে একজন মানুষের সাথে দেখা করতে চাইছেন, এর থেকে জরুরি খবর পৃথিবীতে কি কিছু হতে পারে? কোমল স্বভাবের এই বৃদ্ধ কি সত্যি জানেন, কী প্রচণ্ড তাঁর ক্ষমতা?

কিছুক্ষণের মাঝেই রু তাঁর ঘরের হলোগ্রাফিক্স স্ক্রিনে যাদুঘরের মহাপরিচালককে দেখতে পেলেন। মহাপরিচালক দুই হাতে নিজের টুপি ধরে রেখে ফ্যাকাসে মুখে বললেন, মহামান্য রু, আপনি আমায় খোঁজ করছিলেন?

হ্যাঁ, করছিলাম। জরুরি কোনো ব্যাপারে নয়, এমনি একটা কাজে। কথার সুর পাল্টে বললেন, আপনার যাদুঘর কেমন চলছে?

ভালো, খুব ভালো। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে মহাপরিচালকের মুখে কথা জড়িয়ে যায়, গত মাসে আমরা নূতন একটা সভ্যতা আবিষ্কার করেছি, বিস্ময়কর একটা সভ্যতা। অংশবিশেষ আমাদের যাদুঘরে আনা হয়েছে।

তাই নাকি? একদিন আসতে হয় দেখতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসবেন? আপনি আসবেন মহামান্য রু? মহাপরিচালকের চোখ উত্তেজনায় চকচক করতে থাকে, আপনি শুধু আমাকে জানান, কবে আসবেন।

আমার নাতনি আমার সাথে দেখা করতে আসবে সামনের সপ্তাহে। তাকে নিয়ে আসব। নাতনির বয়স ছয়। সে কিছুতেই যাদুঘরে যেতে চাইবে না, বলবে চিড়িয়াখানাতে নিয়ে যেতে। আমি অবশ্যি যাদুঘরেই আসব। আমার খুব ভালো লাগে যাদুঘরে যেতে।

যাদুঘরের মহাপরিচালক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না। কী বলবেন বুঝতে না পেরে প্রায় চিৎকার করে বললেন, যাদুঘরকে আমরা নূতন করে সাজাব। নূতন করে—

সে কী!

জ্বি। আপনি আসবেন, কত বড় সম্মান আমাদের যাদুঘরের জন্যে! মহামান্য রু, আপনার প্রিয় রং কি?

কেন?

আপনার প্রিয় রং দিয়ে পুরো যাদুঘর আমরা নূতন করে রং করে নেব।

সে কী! রু ব্যস্ত হয়ে বললেন, পুরো যাদুঘর রং করে ফেলবেন মানে? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

মহাপরিচালক একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, আপনার জন্য কিছু-একটা করতে চাই আমরা, আপনি আপত্তি করবেন না মহামান্য রু। আপনাকে বলতেই হবে কী রং আপনার প্রিয়।

রু এবার হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, সব রংই আমার পছন্দ। ক্যাটক্যাটে হলুদ একটা রং আছে, সেটা বেশি ভালো লাগে না, তা ছাড়া—

সব হলুদ রং সরিয়ে নেব আমরা। পুরো ব্লকে কোনো হলুদ রং থাকবে না। পুরো শহরে—

না না, সেটা করবেন না—কিছুতেই না।

তাহলে বলেন আপনার প্রিয় রং।

নীল, হালকা নীল।

নীল! যাদুঘরের মহাপরিচালক উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, আমারও প্রিয় রং হালকা নীল। কী যোগাযোগ! কত বড় সৌভাগ্য আমার। পুরো যাদুঘর নূতন করে সাজাব—অবিশ্বাস্যরকম সুন্দর করে—

রু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর কিছু করার নেই। যাদুঘরের মহাপরিচালকের ভাবাবেগ একটু কমে আসার পর বললেন, আপনার কাছে আমি একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম।

বলুন মহামান্য রু।

আপনারা যাদুঘরের পক্ষ থেকে কয়েক বছর পরপর পৃথিবীর ছোটখাটো ব্যবহার্য জিনিস একটা বাক্সে করে মাটির নিচে পুঁতে রাখেন বলে শুনেছি। ভবিষ্যতের মানুষ দেখবে, দেখে আমাদের সময় সম্পর্কে একটা ধারণা করবে, সে জন্যে। ব্যাপারটা সত্যি নাকি?

সত্যি মহামান্য রু। আমরা দশ বছর পরপর এটা করে থাকি। গতবার আপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখা একটা বই আমরা সেখানে রেখেছিলাম।

সেখানে কী কী জিনিস রাখা হয়?

সাম্প্রতিক ছায়াছবি, গানের রেকর্ড, জনপ্রিয় বই, খাবার, খেলনা, পোশাক—এই ধরনের জিনিস।

কোনো খবরের কাগজ কি রাখা হয়?

জ্বি, আমরা খবরের কাগজও রাখি। খবরের কাগজ এবং সাময়িকী।

এবারের কোন খবরের কাগজটি রাখবেন সেটি কি ঠিক করেছেন?

না, এখনো ঠিক করি নি।

আমি যদি বিশেষ একটি খবরের কাগজের কথা বলি—আপনারা কি সেটি রাখবেন?

অবশ্যি অবশ্যি রাখব। আপনি একটি খবরের কাগজ রাখতে চাইবেন, আমরা সেটি রাখব না, সেটি কি কখনো হতে পারে? মহামান্য রু, আপনার জন্যে যে-কোনো কাজ করতে পারলে আমরা আমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে মনে করি। কোন কাগজটি রাখতে চাইছেন?

সেটি এখনো বের হয় নি, আজ-কালের ভিতরে বের হবে। সেখানে বিজ্ঞান আকাদেমির একজন সদস্য সম্পর্কে কিছু খবর থাকবে। অনেক ব্যক্তিগত খবর। খবরটা ভালো হবে না, দেখে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে। সেই খবরের কাগজটা রাখতে পারবেন?

অবশ্যই অবশ্যই—

যাই হোক, আপনি এখন কাউকে কিছু বলবেন না।

অবশ্যই বলব না, কাউকে বলব না, কিছুতেই বলব না। যাদুঘরের পরিচালক প্রচণ্ড কৌতূহলে ভিতরে ভিতরে ফেটে গেলেও সেটা বাইরে প্রকাশ করার সাহস পেলেন না।

রু আস্তে আস্তে বললেন, ঠিক আছে, তাহলে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে খানিকক্ষণ সময় ব্যয় করার জন্য।

যাদুঘরের মহাপরিচালক মাথা নিচু করে অভিবাদন করে বিদায় নিয়ে হলোগ্রাফিক স্ক্রিন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

AMARBOI.COM

রিকি সবুজ রঙের সুইচটা স্পর্শ করতেই কানে তালা লাগানো শব্দে ইঞ্জিনটা চালু হল। কুরু মহাকাশযানের ইঞ্জিন হাইপারডাইভের জন্যে তৈরি, তার প্রচণ্ড শব্দে পুরো গবেষণাগার থরথর করে কাঁপতে থাকে। রিকি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ইঞ্জিনটাকে পুরোপুরি চালু হবার সময় দিল। সামনের প্যানেলে সবুজ বাতিটি জ্বলে উঠতেই সে লাল রঙের হ্যান্ডেলটা নিজের দিকে টেনে ধরে। সাথে সাথে সমস্ত শব্দ হঠাৎ যাদুমন্ত্রের মতো থেমে যায়। রিকি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, কিছু ভালো করে দেখা যায় না, কেমন যেন কুয়াশার মতো আবছায়া। সে এখন স্থির সময়ের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। স্থির সময়ের ক্ষেত্র থেকে অন্য কোনো সময়ে পরিভ্রমণ করার কথা। রিকি দুই হাজার বছর সামনে এগিয়ে যেতে চায়—বর্তমান বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান তার জন্যে যথেষ্ট নয়। দুই হাজারের বেশি আগে যাওয়া সম্ভবত নিরাপদ নয়—মানুষের সমাজব্যবস্থার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তন হয়তো এত বেশি হয়ে যাবে যে রিকি তাল মিলিয়ে থাকতে পারবে না।

রিকি সাবধানে কিছু সংখ্যা কন্ট্রোল বোর্ডে প্রবেশ করাতে থাকে। এই সংখ্যাগুলো তাকে দুই হাজার বছর ভবিষ্যতে নিয়ে যাবে। ভবিষ্যতের মানুষ অতীত থেকে আসা এই অসাধারণ বিজ্ঞানীকে দেখে বিস্ময়ে কেমন হতবাক হয়ে যাবে, চিন্তা করে রিকির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তাকে প্রথম যখন অভিবাদন করবে, উত্তরে বুদ্ধিদীপ্ত একটা কথা বলতে হবে—কী বলা যায়?

কন্ট্রোল প্যানেলে সংখ্যাগুলো দ্রুত পাল্টাতে থাকে। প্রতি মিনিটে রিকি একটি করে শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ, তারপর রিকি পৌঁছে যাবে দুই হাজার বছর ভবিষ্যতে! না জানি কত রকম বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

ইঞ্জিনের গর্জন থেমে যাবার পর রিকি সাবধানে চেয়ার থেকে নিজেকে মুক্ত করে দরজা খুলে দিল। দরজার ওপাশে দু'জন ফ্যাকাসে চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। লম্বায় তার থেকেও প্রায় অনেকটুকু উঁচু। গায়ে অর্ধস্বচ্ছ এক ধরনের পোশাক, নিশ্চয়ই কোনো আশ্চর্য পলিমারের তৈরি। কোমর থেকে যে জিনিসটা ঝুলছে, সেটাকে দেখে এক ধরনের অস্ত্র বলে মনে হয়।

রিকি হাতের ছোট মাইক্রোফোনে মুখ লাগিয়ে বলল, আমি অতীত থেকে তোমাদের জন্যে শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছি।

মাইক্রোফোনটি শক্তিশালী অনুবাদকের সাথে যুক্ত—দুই হাজার বছরে ভাষায় যে পরিবর্তন হয়েছে, সেটা হিসেব করে সঠিক ভাষায় পাল্টে দেয়ার কথা।

লোক দুটি একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। একজন তার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে এগিয়ে গিয়ে পরিষ্কার রিকির ভাষায় বলল, শুভেচ্ছা পরে হবে, আগে ফর্মটাতে তোমার নাম-ঠিকানা লেখ—

রিকি উত্তপ্ত হয়ে বলল, তুমি বুঝতে পারছ না—

লোকটা বাধা দিয়ে বলল, খুব বুঝতে পারছি যে তুমি একজন বড় বিজ্ঞানী। যারা অতীত থেকে আসে সবাই দাবি করে তারা বড় বিজ্ঞানী। প্রতিদিন অন্তত দু-চারজন করে আসছে, কাজেই আমাদের এত সময় নেই। ভবিষ্যতে আসা সোজা—কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে অতীতে যাওয়া যায় না। তা হলে ধরে ধরে সবগুলোকে ফেরত পাঠাতাম। তুমি কি ভাব, তোমার এই আজব ভাষায় কথা বলতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে?

রিকি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এটা কী ধরনের অভ্যর্থনা!

লোকটা গলার স্বর উঁচু করে বলল, তাড়াতাড়ি নাম-ঠিকানা লেখ, কেন এসেছ, কী বৃত্তান্ত—সবকিছু। কোয়ারান্টাইনে নিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করতে হবে। এখন কী কী রোগজীবাণু এনেছ সাথে?

রিকি কাঁপাহাতে ফর্মটি পূরণ করতে থাকে। নিজের চোখ-কানকে তার বিশ্বাস হয় না, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সে, অথচ তার সাথে এমনভাবে ব্যবহার করছে, যেন সে একজন তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধী।

ফর্মটি পূরণ করে রিকি লোকটির হাতে দেয়। লোকটি ভ্রূ কুঁচকে পুরোটা চোখ বুলিয়ে হাতের উল্টো পিঠের ছোট মাইক্রোফোনে কথা বলতে থাকে, অতীত থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকজন এসেছে। দাবি করছে সে বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য ছিল। মনে আছে, একজন দাবি করেছিল সে নাকি যীশুখ্রিস্ট। হাঃ হাঃ হাঃ।

রিকি লোকটার কথা বুঝতে পারে না, কিন্তু ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করছে। রিকি বুঝতে পারে, প্রচণ্ড ক্রোধের সাথে সাথে আরো একটা অনুভূতি তার ভিতরে ছড়িয়ে পড়ছে, যেটার সাথে তার ভালো পরিচয় নেই— অনুভূতিটি ভয়ের।

দ্বিতীয় লোকটি তার পকেট থেকে চৌকোণা একটা যন্ত্র বের করে ফর্মটি দেখে দেখে রিকির নামটি লিখতে থাকে। রিকি কৌতূহলী হয়ে তাকাল, সম্ভবত একটি কম্পিউটার, কোনো কেন্দ্রীয় ডাটা বেসের সাথে যুক্ত। তার সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছে।

লোকটি নিস্পৃহ দৃষ্টিতে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ কিছু-একটা দেখে চমকে উঠল, চোখ বড় বড় করে তাকাল একবার রিকির দিকে। তারপর আবার তাকাল স্ক্রিনের দিকে।

তোমার নামে আমাদের একটা ফাইল আছে।

আমার নামে?

হ্যাঁ। ফাইলে একটা খবরের কাগজের কাটিংও আছে। সেখানে তোমার সম্পর্কে বড় খবর। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট করে পালিয়ে গিয়েছিলে, স্ত্রীকে খুন করেছিলে নিজের হাতে! লেখা আছে, তুমি অনেক বড় ক্রিমিনাল!

লোক দুটির গায়ে প্রচণ্ড জোর, খুব সহজে রিকির হাত দুটি পিছনে টেনে হাতকড়া লাগিয়ে দিল। সামনে যাবার ইঙ্গিত করে একজন মাথা নেড়ে বলল, আমি জীবনে অনেক আহাম্মক দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো আহাম্মক আর দেখি নি।

রিকি মাথা নিচু করে এগিয়ে যায়।

AMARBOI.COM

সময়ের অপবলয়

অভ্যাসমতো দরজায় তালা লাগানোর পর হঠাৎ করে রিগার মনে পড়ল আজ আর ঘরে তালা লাগানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। সে যেখানে যাচ্ছে, সেখান থেকে সে সম্ভবত আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। ব্যাপারটি চিন্তা করে একটু আবেগে আপ্লুত হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু রিগার সেই সময়টাও নেই। এখন রাত তিনটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিট, আর ঘন্টা দুয়েকের মাঝেই ভোরের আলো ফুটে উঠবে। সে যেটা করতে যাচ্ছে, তার প্রথম অংশটা ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই শেষ করতে হবে।

ছোট ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে রিগা নিচে নেমে এল। বাকি জিনিসগুলো আগেই বড় ভ্যানটিতে তুলে নেয়া হয়েছে। সে গত পাঁচ বছর থেকে এই দিনটির জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, খুঁটিনাটি সবকিছু অসংখ্যবার যাচাই করে দেখা হয়ে গেছে, কোথাও কোনো ভুল হবার অবকাশ নেই, তবে ভাগ্য বলে যদি সত্যি কিছু থাকে এবং সে ভাগ্য যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঁকে বসে, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। ছোট ব্যাগটা পাশে রেখে রিগা তার ভ্যানটির সুইচ স্পর্শ করামাত্র সেটি একটি ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করে। কোন পথে কোথায় যেতে হবে বহুকাল আগে প্রোগ্রাম করে রেখেছে। ভ্যানটি নিঃশব্দে সেদিকে যাত্রা শুরু করে দেয়। নিরীহদর্শন এই ভ্যানটি দেখে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু এটি অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা রাখে।

আবাসিক এলাকার ছোট রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে ভ্যানটি হ্রদের তীরের বড় রাস্তায় উঠে পড়ল। রাস্তাটি এরকম সময় নির্জন থাকে। একেবারে মাটি ছুঁয়ে যাওয়া যায়। এ এলাকায় শীতকালে হাড়-কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস হু-হু করে বইতে থাকে, বসন্তের শুরুতে এতটা খারাপ হবার কথা নয়। রিগা জানালাটা একটু নামিয়ে দেখল, হ্রদের ঠাণ্ডা ভিজে বাতাসের সাথে সাথে সারা শরীর শিউরে ওঠে। রিগা দ্রুত আবার জানালাটা তুলে দেয়। দু'হাত একসাথে ঘষে শরীরটা একটু গরম করে সে আকাশের দিকে তাকাল। শুক্লপক্ষের রাত, আকাশে ভাঙা একটা চাঁদ উঠেছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রিগার মনটা হঠাৎ একটু বিষণ্ন হয়ে যায়। পরিচিত এই পৃথিবীটার জন্যে—যেটা কখনো ভালো করে তাকিয়ে দেখে নি, তার বুকটা হঠাৎ টনটন করতে থাকে।

রিগা জোর করে নিজেকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনে। একটু পরেই সে যে জিনিসটি করতে শুরু করবে তার খুঁটিনাটি মনে মনে আরো একবার যাচাই করে দেখা দরকার।

AMARBOI.COM

ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল এভাবে।

সংবিধানে দু' শ' বছর আগে একটি সংশোধনী যোগ করা হয়েছিল। সংশোধনীটা এরকম : "১৯শে এপ্রিলের বিপর্যয়সংক্রান্ত তথ্যাবলী পৃথিবীর স্বার্থের পরিপন্থী।"

সংশোধনীটি বিচিত্র, কিন্তু এই সংশোধনীটির জন্যে যেটা ঘটল, সেটি আরো বিচিত্র। পৃথিবীর তথ্য নিয়ন্ত্রণকারী যাবতীয় কম্পিউটার পৃথিবী থেকে ১৯শে এপ্রিলের বিপর্যয়সংক্রান্ত সকল তথ্য সরিয়ে নিতে শুরু করল। এক শ' বছর পর পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিপর্যয়ের উপর আর কোনো তথ্য থাকল না। এক শ' বছর আগে কোনো-এক এপ্রিল মাসের উনিশ তারিখে পৃথিবীতে কোনো-এক ধরনের বিপর্যয় ঘটেছিল। যেহেতু এ সংক্রান্ত যে-কোনো তথ্য পৃথিবীর স্বার্থের পরিপন্থী, কাজেই সংবিধানের এই সংশোধনীটিও হঠাৎ একদিন সরিয়ে নেয়া হল। ব্যাপারটি ঘটেছিল প্রায় পনের বছর আগে, তখন রিগার বয়স তিরিশ।

হঠাৎ করে সংশোধনীটি সরিয়ে নেবার পর ব্যাপারটি নিয়ে অনেকেরই কৌতূহল হয়েছিল। সান্ধ্য খবরের বিশেষ রেম কার্ড বের হল, সেটা নিয়ে সবাই হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে। তরুণ অনুসন্ধানীরা কম্পিউটার ঘাঁটাঘাঁটি করে নানারকম তত্ত্ব দিতে শুরু করে। কেউ বলল, জিনেটিক পরিবর্তন করে একধরনের অতিমানব তৈরি করা হয়েছিল, যারা পৃথিবী ধ্বংস করতে চাইছিল। কেউ বলল, গ্রহান্তরের আগন্তুক পৃথিবীতে হানা দিয়ে তার নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছিল। আবার কেউ বলল, বায়োকেমেস্ট্রির এক ল্যাবরেটরি থেকে ভয়ংকর এক ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর জীবজগৎকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। সবই অবশ্যি উর্বর মস্তিষ্কের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনা, কারণ এইসব তত্ত্বকে সত্যি বা মিথ্যা কোনোটাই প্রমাণ করার মতো কোনো তথ্য পৃথিবীর ডাটা বেসে নেই, সব একেবারে ঝেড়েপুছে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

বছরখানেক পর সবার কৌতূহল থিতিয়ে এল। শুধুমাত্র জল্পনা-কল্পনা করে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া ১৯শে এপ্রিলের বিপর্যয়সংক্রান্ত তথ্য পৃথিবীর স্বার্থের পরিপন্থী বলে সেটা নিয়ে প্রকাশ্যে গবেষণা করাও সম্ভব নয়, কোনো কম্পিউটারই সাহায্য করতে পারে না। তার ফলে বছর দুয়েকের মাঝেই পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই ১৯শে এপ্রিলের বিপর্যয় অজ্ঞাত থেকে যাবে, এই সত্যটি মোটামুটিভাবে মেনে নিল। একজন ছাড়া, সে হচ্ছে রিগা।

রিগা এমনিতে কম্পিউটারের দ্রোন ভাষার উপর কাজ করে। ভাষাটি সহজ নয়, এই ভাষায় প্রোগ্রাম করার যে কয়টি বাড়তি সুবিধে, তাতে পৃথিবীর মানুষের বেশি উৎসাহ নেই। কাজেই সে পৃথিবীর প্রথম সারির একজন প্রোগ্রামার হয়েও মোটামুটিভাবে সবার কাছে অপরিচিত। দ্রোন ভাষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সমস্যাকে কখনো সোজাসুজি সমাধান করার চেষ্টা করে না, কাজেই সবাই হাল ছেড়ে দেবার পরও রিগা কম্পিউটারে ১৯শে এপ্রিল বিপর্যয়ের তথ্য খুঁজে বেড়াতে থাকে। কম্পিউটার তাকে সন্দেহ করে না সত্যি, কিন্তু সে কোনো তথ্য খুঁজেও বের করতে পারে না। এইভাবে আরো দুই বছর কেটে যায়।

রিগার বয়স যখন চৌত্রিশ, পারিবারিক ব্যাপারে বিশেষ মন দেয় না বলে তখন তার স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তাদের একমাত্র ছেলেটিকে নিয়ে তার স্ত্রী একদিন পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠে চলে গেল। হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে ছেলেটিকে প্রায় সত্যিকার মানুষের মতোই জীবন্ত দেখায়, কিন্তু মাঝে মাঝে রিগার খুব ইচ্ছে করত ছেলেটিকে খানিকক্ষণ বুকে চেপে রাখে। কিন্তু ছেলেটি ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে সরে যেতে থাকে। আজকাল হলোগ্রাফিক স্ক্রিনেও তার দেখা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এরকম সময়ে রিগা একদিন তার ছেলের সাথে দেখা করতে গেল।

রিগা তার ছেলের কাছে একজন অপরিচিত মানুষের মতো, তাই সঙ্গত কারণেই ছয় বছরের এই শিশুটি তার বাবাকে দেখে খুব বেশি উচ্ছ্বাস দেখাল না। রিগা খানিকক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করে খুব সুবিধে করতে পারল না, শিশুদের সাথে কী ভাবে কথা বলতে হয় সে জানে না। ছেলের সাথে ভাব করার আর কোনো উপায় না দেখে রিগা একসময়ে তার পকেট থেকে রেম কার্ডটি বের করে, সেখানে দৈনন্দিন খবর ছাড়াও প্রাগৈতিহাসিক জন্তু-জানোয়ারের উপর একটি দুর্লভ অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত এই শিশুটির মন জয় করতে সক্ষম হয়। ঘরের মাঝখানে সত্যিকার জীবন্ত প্রাণীদের মতো হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবিগুলো দেখে বাচ্চাটি হাততালি দিয়ে লাফাতে থাকে। বাচ্চাদের হাসি থেকে সুন্দর কিছু নেই, কিন্তু রিগার যে জিনিসটি প্রথমে চোখে পড়ল, সেটি হচ্ছে তার ফোকলা দাঁত। ছয় বছর বয়সে শিশুদের দুধদাঁত পড়ে নূতন দাঁত ওঠা শুরু করে। বাচ্চাটির দাঁত সবে পড়েছে, এখনো নূতন দাঁত ওঠে নি, তাই প্রতিবার হাসার সময় ফোকলা দাঁত বের হয়ে পড়ছে।

বাচ্চাটির ফোকলা দাঁতটি দেখে হঠাৎ করে রিগা বুঝতে পারে, ১৯শে এপ্রিলের রহস্য কেমন করে সমাধান করতে হবে। রহস্যটি হচ্ছে বাচ্চাটির ফোকলা দাঁতের মতন, সেটি নেই, কারণ তার সম্পর্কে সব তথ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কেউ যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটাকে খোঁজে কখনো, কিছু পাবে না। কিন্তু ফোকলা দাঁতের অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, কারণ প্রত্যেকবার হাসার সময় দেখা যাচ্ছে একটি দাঁত নেই। ১৯শে এপ্রিলের রহস্যও ঠিক সেরকম, সেটি সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই, কিন্তু অন্য সব তথ্যগুলোকে খুঁজে দেখলেই দেখা যাবে সেখানে একটা অসম্পূর্ণতা রয়েছে। সেই অসম্পূর্ণতাই হচ্ছে ১৯শে এপ্রিলের রহস্য। যে কাল্পনিক তথ্য সেই অসম্পূর্ণতাকে দূর করতে পারবে, সেই তথ্যই হবে এই রহস্যের সমাধান।

রিগা পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা তার ছেলের সাথে সময় কাটালেও মনে মনে সে পরবর্তী কর্মপন্থা ছকে ফেলল। দ্রোন ভাষায় যে নূতন কম্পিউটার প্রোগ্রামটি লিখতে হবে, সেটির কাঠামোও সে মনে মনে ঠিক করে নিল। বহুদিন পর সে বুকের ভিতরে কৈশোরের উত্তেজনা অনুভব করতে থাকে।

কম্পিউটার প্রোগ্রামটি দাঁড় করাতে প্রায় বছরখানেক সময় লেগে গেল, সেটি থেকে ভুলভ্রান্তি সরিয়ে পুরোপুরি কাজের উপযোগী করতে লাগল আরো দুই বছর। তৃতীয় বছরের গোড়ার দিকে রিগা প্রথমবার তার প্রোগ্রামটি পৃথিবীর বড় বড় ডাটা বেসে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিল। সুদীর্ঘ সময় ব্যয় করে সেটি জানাল, পৃথিবীর তথ্যভাণ্ডারে যেসব তথ্যের মাঝে বড় ধরনের অসঙ্গতি রয়েছে, সেগুলো দূর করা যায়, যদি এই কয়টি জিনিস কল্পনা করে নেয়া যায় :

(এক) আজ থেকে প্রায় দু' শ' বছর আগে পাশাপাশি দুটি শহরে ত্রিনি ও লিক নামে দু'জন মানুষের জন্ম হয়েছিল।

(দুই) প্রায় সমবয়সী এই দু'জন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন।

(তিন) তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল সময়ের অপবলয়।

(চার) প্রায় দু' শ' পনের বছর আগে ত্রিনি ও লিক সময়ের অপবলয়সংক্রান্ত একটি পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন। পরীক্ষাটি ঠিকভাবে শেষ হয় নি।

(পাঁচ) তাঁরা যেখানে পরীক্ষাটি করেছিলেন, সেখানে, সম্ভবত একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। সম্ভবত সেখানে তাঁরা একটি সুড়ঙ্গের মতো সৃষ্টি করেন, যেটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরের সাথে যোগাযোগ করে দেয়।

(ছয়) ত্রিনি ও লিক সেই সুড়ঙ্গপথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে ছিটকে পড়েন, কারণ তাঁদের কখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি।

(সাত) এই সুড়ঙ্গের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়, কারণ সমস্ত পৃথিবী এই পথ দিয়ে গলে বের হয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

বিস্ময়কর এই তথ্য রিগার কৌতূহলকে নিবৃত্ত না করে আরো বাড়িয়ে দেয়। সত্যিই কি ত্রিনি ও লিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরের সাথে একটি সুড়ঙ্গমুখ খুলে দিয়েছেন? সত্যিই কি সেই পথে বেরিয়ে যাওয়া যায়? সত্যিই কি পুরো পৃথিবী এই পথে বের হয়ে যেতে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার একটিমাত্র উপায়—ত্রিনি ও লিক যেখানে পরীক্ষাটি করেছিলেন, সেটি খুঁজে বের করা।

রিগার জন্যে সেটা খুঁজে বের করা খুব কঠিন হল না। দেখা গেল, ত্রিনি ও লিক সেই পরীক্ষাটি করেছিলেন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের একটি কক্ষে। সেই কক্ষটি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে তাকে ঘিরে প্রায় চল্লিশ বর্গমাইল এলাকার উপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পাথর এবং কংক্রিট ঢালা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের হ্রদের তীরে যে ছোট পাহাড়টি বসন্তকালে অসংখ্য ফুলে ঢেকে যায়, সেটি একটি কৃত্রিম পাহাড়, এই তথ্যটি পৃথিবীতে রিগা ছাড়া আর কেউ জানে না। পাহাড়ের প্রায় হাজার দুয়েক ফুট নিচে একটি ছোট বিজ্ঞানাগারে ত্রিনি ও লিক একটি অসাধারণ পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই পরীক্ষাটি কী ধরনের বিপর্যয়ের সূত্রপাত করেছিল আজ রিগা সেই রহস্য ভেদ করতে যাচ্ছে।

এর জন্যে রিগা প্রায় পাঁচ বছর প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রথমত সে তার কাজ বদল করে উত্তরাঞ্চলের সেই শহরে চলে এসেছে। শহরের এক পাশে হ্রদ, অন্য পাশে ছোট পাহাড়টি গ্রীষ্মকালে অনেক ভ্রমণবিলাসী মানুষকে আকর্ষণ করে, কিন্তু এমনিতে সারা বছর বেশ নিরিবিলি। ছোট এই শহরে দ্রোন ভাষায় অভিজ্ঞ কম্পিউটার প্রোগ্রামারের উপযোগী কোনো কাজ নেই বলে সে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের একটি কারখানায় কাজ করে। অবসর সময়ে সে শব্দতরঙ্গ দিয়ে ঘনত্ব মাপার একটা যন্ত্র তৈরি করেছে, সেই যন্ত্রটি দিয়ে ধীরে ধীরে সে পুরো পাহাড়টি পর্যবেক্ষণ করেছে। পাহাড়ের নিচে কোথায় সেই রহস্যময় গবেষণাগারটি লুকিয়ে রয়েছে, সেটাও খুঁজে বের করেছে। সেই গবেষণাগারে পৌঁছানোর জন্যে পাহাড়ের কোন অংশ দিয়ে যাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ, সেটাও নির্ধারণ করেছে। পাহাড় কেটে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে ভিতরে ঢুকে যেতে কী ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, অনুমান করার চেষ্টা করেছে। তারপর সেইসব যন্ত্রপাতি দিয়ে এই ভ্যানটি তৈরি করেছে। নিরীহদর্শন এই ভ্যানটির ভিতরে রয়েছে চারটি শক্তিশালী কুরু ইঞ্জিন। প্রয়োজনে সামনের অংশটি খুলে সেখান থেকে কার্বন হীরের পাথর কাটার একটা অতিকায় ড্রিল বের হয়ে আসে। শক্তিশালী ইঞ্জিনের প্রচণ্ড ঘূর্ণনে সে ড্রিল পাথর কেটে পুরো ভ্যানটাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে যাবে। ভ্যানের মাঝে রয়েছে শক্ত পাম্প, সামনের কাটা পাথর সেটি সরিয়ে আনে পিছনে। পাহাড়ের যে অংশ দিয়ে রিগা ভিতরে ঢুকবে, সে অংশটি লতাগুল্ম দিয়ে ঢাকা। কেউ সেদিকে যায় না, যাবার রাস্তাও নেই। কেউ সহজে জানতে পারবে না যে রিগা এদিক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। প্রবেশপথ ঢেকে যাবে কাটা পাথরে, বসন্তের বৃষ্টিতে নূতন গাছগাছালি গজিয়ে ঢেকে ফেলবে সেই জায়গা।

হ্রদের তীর দিয়ে ঘুরে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছাতেই রিগা তার ভ্যানের হেড লাইট নিভিয়ে দিল। তার হিসেবমতো চাঁদ ডুবে গিয়ে চারদিকে এখন গাঢ় অন্ধকার। রিগা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নেয় যে কেউ তার পিছু নেয় নি। তারপর অন্ধকারেই ভ্যানটিকে চালিয়ে গাছগাছালির ভিতর দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে এনে হাজির করে। আজকের অভিযানের প্রথম অংশ পরিকল্পনামতোই কোনো সমস্যা ছাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ হয়েছে।

রিগা সাবধানে ভ্যান থেকে নেমে তার ইনফ্রারেড চশমাটি পরে নেয়, সাথে সাথে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রিগা সাবধানে চারদিকে তাকায়, কোথাও কিছু নেই, শুধুমাত্র একটি নিশাচর র‍্যাকুন খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা গাছের গুঁড়িতে লুকিয়ে যায়। রিগা কয়েক পা এগিয়ে যায়, অনেক ধরনের যন্ত্রপাতিতে বোঝাই বলে ভ্যানটি মাটির উপরে উঠতে পারে না, সময় সময় চাকার গর্ত রেখে আসে। তাকে এখন সাবধানে এইসব চাকার দাগ মুছে ফেলতে হবে। রিগা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে তার কাজ শুরু করতে এগিয়ে যায়।

হিসেব মতন ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে রিগা তার ভ্যানটি চালু করল। ঠিক এই সময়ে শহরের বড় জেনারেটরটি চালু করা হয়। তার শক্তিশালী ভ্যানটি পাথর কেটে ভিতরে ঢুকে যাবার সময় বাড়তি যে কম্পন সৃষ্টি করবে, সেটা কোথাও ধরা পড়বে না। রিগা ঘড়ি দেখে ঠিক সময়ে ভ্যানের কন্ট্রোল প্যানেলের নির্দিষ্ট সুইচটি স্পর্শ করে, সাথে সাথে সামনের অংশটি খুলে অতিকায় ড্রিলটি বের হয়ে আসে, প্রচণ্ড ঘূর্ণন সৃষ্টি হয়, তারপর সেটি পাথরকে স্পর্শ করে। আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ড্রিলটি পাথর কেটে ছোট একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলল। ভ্যানটি ধীরে ধীরে পাহাড়ের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাবার সময় রিগা একবার পিছনে তাকাল, ইনফ্রারেড চশমায় অন্ধকার পৃথিবীটিকে তার কাছে অলৌকিক মনে হয়। এই পৃথিবীটিকে সে হয়তো আর কোনো দিন দেখবে না। পৃথিবীর সাথে তার আর কোনো যোগাযোগ রইল না—কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে রেখে আসা তার ডাইরিটা ছাড়া। সেই ডাইরির খোঁজ কখনো কি কেউ পাবে?

রিগা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকে। ভ্যানটি প্রচণ্ড গর্জন করে একটি অতিকায় শুঁয়োপোকার মতো পাথরে গর্ত করে নির্দিষ্ট দিকে এগুতে থাকে।

ল্যাবরেটরি ঘরের সামনে ভ্যানটি দাঁড় করিয়ে রিগা মাস স্পেকট্রোমিটারটি চালু করে। বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার উপযোগী যথেষ্ট অক্সিজেন রয়েছে। কিন্তু বিষাক্ত কোনো গ্যাস রয়েছে কী না জানা দরকার। তার কাছে অক্সিজেন মাস্ক রয়েছে, কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে না হলে কাজকর্মে সুবিধে হয়। রিগা স্পেকট্রোমিটারটির স্ক্রিনে ভালো করে তাকায়, বিচিত্র কিছু গ্যাস রয়েছে, রেডনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি, কিন্তু বিষাক্ত কোনো গ্যাস নেই। রিগা জানালা অল্প একটু খুলে নিঃশ্বাস নেয়, একটু ভ্যাপসা গন্ধ বাতাসে, কিন্তু খানিকক্ষণেই অভ্যাস হয়ে যাবার কথা।

ল্যাবরেটরির সামনে দু' শ' বছরের ভারি পুরানো ওক কাঠের দরজা। সম্ভবত সে সময়ে এ রকম দরজার প্রচলন ছিল। দরজার উপর ধুলায় ধূসর একটি সাইনবোর্ড, সেখানে বড় বড় করে লেখা, ''প্রবেশ নিষেধ, আইন অমান্যকারীকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুদণ্ড''।

রিগা চারদিকে তাকায়, একসময় নিশ্চয়ই আশেপাশে কড়া পাহারা ছিল, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে প্রহরীরা তাৎক্ষণিক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্যে অপেক্ষা করত। দু' শ' পনের বছর পর সেই প্রহরীরা নেই, কিন্তু অন্য কোনো ধরনের সাবধানতা এখনো অবশিষ্ট রয়েছে কী না কে জানে? রিগা সাবধানে পরীক্ষা করে কিছু না পেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতের ব্লাস্টার দিয়ে দরজাটি খুলে ফেলল।

ভিতরে একটা লম্বা করিডোর। হাতের আলোটা উপরে তুলে রিগা চারদিকে তাকাল। দূরে একটা দরজা। করিডোরের দেয়ালে কিছু ছবি, কিছু পুরানো কম্পিউটারের মনিটর। ধুলায় সব কিছু ঢেকে আছে। রিগা সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যায়। সমস্ত ল্যাবরেটরিতে সমাধিক্ষেত্রের নীরবতা।

করিডোরের শেষ মাথার দরজাটিও বন্ধ। বাইরে আরেকটা সাইনবোর্ড, সেখানে আবার বড় বড় করে সাবধান বাণী লেখা। ভিতরে প্রবেশ নিষেধ এবং প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তাৎক্ষণিক মৃত্যুদণ্ড। পাশে একটি নোটিশ বোর্ড, রিগা সাবধানে ধুলা ঝেড়ে ভিতরে তাকাল। ভিতরে একটা ছবি। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের দু'জন হাসিখুশি মানুষ একটি চতুষ্কোণ বাক্সের মতো জিনিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে লেখা, প্রফেসর ত্রিনি ও প্রফেসর লিক তাঁদের সময় অপবলয় ক্ষেত্রের সামনে। দু'জনই নিরীহ এবং হাসিখুশি চেহারার মানুষ, প্রফেসর ত্রিনির সামনের চুল হালকা হয়ে এসেছে, প্রফেসর লিকের মুখে বেমানান গোঁফ।

রিগা দীর্ঘ সময় ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই দু'জন সেই রহস্যময় বিজ্ঞানী, যাঁরা নিজেদের অগোচরে সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলেন, যাঁরা বিস্ময়কর এক সুড়ঙ্গপথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে ছিটকে পড়েছেন। রিগা আজ আবার পরীক্ষা করবে সেই বিস্ময়কর সুড়ঙ্গপথ। সে নিজেও কি ছিটকে পড়বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে? সেও কি সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে যাবে নিজের অগোচরে?

করিডোরের দরজাটি ভালো করে পরীক্ষা করে রিগা খুব সহজেই তার ব্লাস্টারটি দিয়ে খুলে ফেলল। ভিতরে বিশাল একটা হলঘরের মতো, চারদিকে অসংখ্য অতিকায় যন্ত্রপাতি, আবছা আলোতে ভুতুড়ে একটা জায়গার মতো লাগছে। রিগা সাবধানে পা ফেলে ভিতরে এগিয়ে যায়। হলঘরের মাঝামাঝি চতুষ্কোণ বাক্সের মতো ছোট একটা ঘর। চারদিক থেকে অসংখ্য যন্ত্রপাতি, নানারকম তার এবং কেব্‌ল এই ঘরের মাঝামাঝি এসে জমা হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে এটাই হচ্ছে সময়ের অপবলয় ক্ষেত্র। ঘরটা ঘুরে ঘুরে রিগা খুব ভালো করে পরীক্ষা করল। এক পাশে গোলাকার একটা দরজা, অসংখ্য স্ক্রু দিয়ে সেটি শক্ত করে লাগানো। দেখে মনে হয় এই স্ক্রুগুলো পরে লাগানো হয়েছে। রিগা ভালো করে দরজাটি পরীক্ষা করল। মাঝামাঝি জায়গায় বিভিন্ন ভাষায় ছোট একটি ঘোষণাপত্র লাগানো হয়েছে, তাতে লেখা ''এই দরজার অন্য পাশে যা রয়েছে সেটি এ পাশের কারো জানার কথা নয়। অন্য পাশের একটি পরমাণুও যদি পৃথিবীর এই অংশে উপস্থিত হয় সমস্ত পৃথিবী ধ্বংসের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যে ই হয়ে থাকুন এই দরজা স্পর্শ না করে ফিরে যান।''

রিগা তার ব্যাগ নিচে রেখে কাছাকাছি একটা জায়গায় পা মুড়ে বসে পড়ে। সে কি দরজায় স্পর্শ না করে ফিরে যাবে? সেটি তো হতে পারে না, এত কষ্ট করে এতদূর এসে সে তো রহস্য ভেদ না করে যেতে পারে না। পৃথিবী ধ্বংস হোক সেটা সে চায় না, কিন্তু প্রফেসর ত্রিনি এবং লিক তো পৃথিবী ধ্বংস না করেই এই রহস্যের সৃষ্টি করেছেন, সে কেন পারবে না?

রিগা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দরজাটি লক্ষ করে। ছোট ছোট করে অনেক কিছু লেখা রয়েছে, গোলাকার দরজাটি দেখেও কিছু আন্দাজ করা যায়। এই দরজাটি

কয়েকটা স্তরে ভাগ করা রয়েছে। ভিতরের একটি পরমাণুকেও বাইরে আসতে না দিয়ে একজন মানুষের ভিতরে ঢোকা সম্ভব—তার জন্যে সে রকম প্রস্তুতি নিতে হবে। অত্যন্ত জটিল এবং সময়সাপেক্ষ কাজটি শুরু করার আগে রিগা একটু বিশ্রাম নিয়ে নেবে ঠিক করল।

ব্যাগ থেকে কিছু শুকনো খাবার বের করে খেয়ে নিয়ে রিগা দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজলো।

পাহাড়ের নিচে দুই হাজার ফুট পাথরের আড়ালে সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এত বড় একটা রহস্যের মুখোমুখি এসে চট করে চোখে ঘুম আসতে চায় না, কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শরীর এত ক্লান্ত হয়েছিল যে সত্যি একসময় তার চোখ বুঁজে এল।

তার ঘুম হল ছাড়াছাড়াভাবে, সারাক্ষণই স্নায়ু ছিল সজাগ, তাই একটুতেই ঘুম ভেঙে সে পুরোপুরি জেগে উঠছিল। তবুও ঘন্টা দুয়েক পর সে খানিকটা সতেজ অনুভব করে। উঠে বসে সে দরজার কাছে এগিয়ে যায়। এই দরজার অন্য পাশে রয়েছে সেই রহস্যময় জগৎ, সাবধানে তাকে সেই রহস্যের উন্মোচন করতে হবে। যন্ত্রপাতি নামিয়ে সে কাজ শুরু করে।

দরজাটি অনেকটা মহাকাশযানের দরজার মতো, মহাকাশের পুরোপুরি বায়ুশূন্য পরিবেশে যাবার আগে যেরকম একটা ছোট কুঠুরিতে ঢুকে সেটাকে সবকিছু থেকে আলাদা করে ফেলতে হয়, সেরকম। প্রথম দরজাটি খুলে সে একটা ছোট কুঠুরিতে ঢুকে বাইরের দরজা বন্ধ করে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ পুরোপুরি কেটে দেবার পরই শুধু পরবর্তী দরজাটি খোলা সম্ভব। এর ফলে বাইরের জগৎ থেকে কোনোকিছু ভিতরে আসতে পারলেও, ভিতর থেকে কিছু বাইরে যেতে পারবে না। বাইরে সেটা নিয়েই বড় সাবধান বাণী লেখা রয়েছে—ভিতর থেকে যেন একটি পরমাণুও বাইরে আসতে না পারে।

দরজার পরবর্তী স্তরটি আরো জটিল। বিদ্যুৎপ্রবাহ ছিল না বলে সেটা সম্পূর্ণ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু রিগার ব্যাগের ছোট একটা জেনারেটর তাকে উদ্ধার করল। দ্বিতীয় স্তরটি থেকে তৃতীয় স্তরে যেতে তার পুরো তিন ঘন্টা সময় বের হয়ে গেল। তৃতীয় স্তরের কাজটি তুলনামূলকভাবে সহজ। স্ক্রুগুলো খুলে হাতলে চাপ দিতেই দরজাটি খুব সহজে খুলে গেল। ভিতরে আলো জ্বলছে। রিগা দরজাটি উন্মুক্ত করে ভিতরে উঁকি দিল।

ঘরের ঠিক মাঝামাঝি অংশে কিছু জটিল যন্ত্রপাতির সামনে উবু হয়ে বসে আছে দু'জন মানুষ, দরজা খোলার শব্দ শুনে মাথা ঘুরে তাকিয়েছে দু'জন রিগার দিকে। রিগা চিনতে পারল দু'জনকেই, একজন প্রফেসর ত্রিনি, আরেকজন প্রফেসর লিক। গত দু' শ' পনের বছরে তাঁদের চেহারার কোনো পরিবর্তন হয় নি। প্রফেসর ত্রিনি ভুরু কুঁচকে রয়েছেন, মনে হচ্ছে কোনো কারণে খুব বিরক্ত হয়েছেন, এগিয়ে এসে বললেন, ভিতরে আসতে কাউকে নিষেধ করেছি, তুমি জান না?

বাচনভঙ্গি ভিন্ন ধরনের। গত দু' শ' বছরে ভাষার বেশি পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু বাচনভঙ্গি অনেকটুকু পাল্টেছে। পরিবর্তনটুকু খুব সহজে রিগার কানে ধরা পড়ল।

প্রফেসর ত্রিনি আবার বললেন, তোমাকে তো আগে কখনো দেখি নি, কার সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি কাজ কর?

রিগা কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল, যন্ত্রপাতির মাঝে উবু হয়ে বসে থেকে প্রফেসর লিক বললেন, ত্রিনি, দেখবে এস, ট্রনেট্রনে কোনো পাওয়ার নেই।

পাওয়ার নেই? কী বলছ তুমি! প্রফেসর ত্রিনি দ্রুত লিকের কাছে এগিয়ে গেলেন, বললেন, একটু আগেই তো ছিল।

তোমাকে আমি বলেছিলাম না, এই পাওয়ার সাপ্লাইগুলো একেবারে যাচ্ছেতাই। একটু লোড বেশি হলেই ধসে যায়। এখন দেখ কী যন্ত্রণা—

প্রফেসর ত্রিনি মাথা চুলকে বললেন, তাই তো দেখছি! ভাবলাম পাওয়ার সাপ্লাইয়ে পয়সা নষ্ট করে লাভ কি—

এখন বোঝ ঠ্যালা, পুরোটা খুলে ওটা বের করে আনতে জানটা বের হয়ে যাবে না?

আমাকে দাও, আমি করছি। প্রফেসর ত্রিনি বড় একটা পাওয়ার স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। রিগা যে কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, সেটা মনে হচ্ছে দু'জনেই পুরোপুরি ভুলে গেছেন।

রিগা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডারে বড় বড় করে লেখা—১৯শে এপ্রিল, মঙ্গলবার। উপরে বড় একটা ঘড়িতে সময় দেখানো হচ্ছে, সকাল সাড়ে এগারটা—এই চতুষ্কোণ ঘরটিতে সময় স্থির হয়ে আছে এবং এই দু' জন বিজ্ঞানী সেটা জানেন না। রিগা তার ঘড়ির দিকে তাকাল, এই ঘরটিতে পা দিয়েছে মিনিটখানেক পার হয়েছে, পৃথিবীতে এর মাঝে কত সময় পার হয়ে গেছে?

প্রফেসর ত্রিনি এবং লিক চতুষ্কোণ একটা বাক্সের মতো কি-একটা জিনিস খুলে টেনে বের করার চেষ্টা করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন, এবারে একটু বিরক্ত হয়ে রিগাকে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে দেখছ কী, একটু হাত লাগাও না।

রিগা একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, প্রফেসর ত্রিনি এবং প্রফেসর লিক, আপনাদের দু'জনকে আমার খুব একটা জরুরি জিনিস বলার রয়েছে।

তার গলার স্বরের জন্যেই হোক বা দু' শ' পনের বছরের পরিবর্তিত বাচনভঙ্গির জন্যেই হোক, দু'জনেই কেমন জানি একটু চমকে উঠলেন। তাঁদের চোখে হঠাৎ কেমন একটি আশঙ্কা ফুটে উঠল। ভালো করে রিগার দিকে তাকালেন প্রথমবারের মতো—কিছু-একটা অসঙ্গতি আঁচ করতে পারলেন দু'জনেই। প্রফেসর লিক ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি কে? কেন এসেছ এখানে?

আমার নাম রিগা। আমি এখানে এসেছি একটা কৌতূহল মেটানোর জন্যে—

কী কৌতূহল? তোমার কথা এরকম কেন? কোন অঞ্চল থেকে এসেছ তুমি?

তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনারা কতক্ষণ আগে এই ঘরে ঢুকেছেন?

কেন?

আমি জানতে চাই—

এই আধা ঘন্টার মতো হবে, প্রফেসর ত্রিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন, এগারটার সময় ঢুকেছি, এখন সাড়ে এগারটা। কেন, কী হয়েছে?

বাইরে, এই আধা ঘন্টা সময়ে অনেক কিছু হয়ে গেছে।

কী হয়েছে? কি?

দু' শ' পনের বছর সময় পার হয়ে গেছে।

কথাটি তারা বুঝতে পারলেন বলে মনে হল না, অবাক হয়ে দু'জনে বিস্ফারিত চোখে রিগার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁদের চোখে প্রথমে অবিশ্বাস, তারপর হঠাৎ করে বোবা আতঙ্ক এসে ভর করে। প্রফেসর ত্রিনি ছুটে এসে রিগার কলার চেপে ধরেন, চিৎকার করে বলেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ, মিথ্যা কথা—

রিগা নিজেকে মুক্ত করে বলল, না প্রফেসর ত্রিনি। আমার কাছে আজকের খবরের বুলেটিন আছে। দেখবেন?

প্রফেসর ত্রিনির উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই রিগা হাতের রেম কার্ডটির সুইচ অন করে দিল, সাথে সাথে ঘরের মাঝখানে মিষ্টি চেহারার একজন মেয়ের জীবন্ত ত্রিমাত্রিক ছবি ভেসে ওঠে। দিন তারিখ সন বলে খবর বলা শুরু হয়ে যায়।

প্রফেসর ত্রিনি এবং লিকের বিস্ফারিত চোখের সামনে রিগা সুইচ টিপে রেম কার্ডটি বন্ধ করে দিল। খবরের বিষয়বস্তু, নাকি ত্রিমাত্রিক ছবির এই বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি—কোনটি তাদের বাক্যহারা করে দিয়েছে বোঝা গেল না। খুব সাবধানে প্রফেসর লিক একটা গোলাকার আসনে বসে পড়ে প্রফেসর ত্রিনির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ত্রিনি, মনে আছে, আমরা আরেকটা সলিউশান পেয়েছিলাম, বিশ্বাস করি নি তখন। সেটাই কি সত্যি? কিন্তু সেটা তো অসম্ভব—

প্রফেসর ত্রিনি ফ্যাকাসে মুখে নিজের মাথা চেপে ধরে বসে ছিলেন, আস্তে আস্তে বললেন, আজ বিকেলে আমার মেয়ের জন্মদিন। আমার কেক কিনে নিয়ে যাবার কথা ছিল—দু' শ' বছর আগে ছিল সেটা? দু' শ' বছর?

তিনি হঠাৎ নিজের মুখ ঢেকে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন।

রিগা খুব ধীরে ধীরে; শোনা যায় না এরকম গলায় বলল, আমি দুঃখিত প্রফেসর ত্রিনি। খুবই দুঃখিত।

প্রফেসর ত্রিনি হঠাৎ মুখ তুলে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কঠোর মুখে বললেন, আমি বিশ্বাস করি না। আমি বাইরে যাব—

প্রফেসর লিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ত্রিনির দিকে। তারপর বললেন, ত্রিনি, তুমি তো জান, যদি দ্বিতীয় সমাধানটি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে তুমি বাইরে যেতে পারবে না—

কে বলেছে পারব না, এক শ' বার পারব।

কিন্তু তাহলে সময় সমাপনী নীতির লংঘন হবে।

হোক।

তার মানে তুমি জান—বস্তু আর অবস্থানের অবলুপ্তি ঘটবে। তুমি থাকবে কিন্তু তোমার চারপাশের পৃথিবী উড়ে যাবে।

যাক—আমার কিছু আসে যায় না। আমি বাইরে যাব।

প্রফেসর ত্রিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, রিগা পিছন থেকে তাঁকে ডাকল, প্রফেসর ত্রিনি, আমার ধারণা, আপনি বাইরে যেতে পারবেন না। আপনি চাইলেও পারবেন না।

কেন?

আমি এখানে এসেছি প্রায় সাত মিনিটের মতো হয়ে গেছে। তার মানে জানেন?

কি?

পৃথিবীতে আরো পঞ্চাশ বছর সময় পার হয়ে গেছে।

প্রফেসর ত্রিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন, তাতে কী হয়েছে?

আমি এখানে এসেছি গোপনে, কেউ জানে না। কিন্তু আমার ডাইরিটা আমি রেখে এসেছি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে। সেটা এতদিনে পৃথিবীর মানুষ পেয়েছে।

পেলে কী হবে?

তারা জানবে আমি এই ল্যাবরেটরির সবগুলো দরজা খুলে ভিতরে এসে ঢুকেছি, আপনারা এখন ইচ্ছে করলে বের হয়ে যেতে পারবেন। পৃথিবীর মানুষ সময়ের অপবলয়ের সূত্রের সমাধান করেছে, তারাও জানে দ্বিতীয় সমাধানটি সত্যি। তারাও এখন জেনে গেছে এই ছোট ঘরে আমরা তিনজন স্থির সময়ের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা বের হয়ে গেলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা সেটা হতে দেবে না। কিছুতেই হতে দেবে না।

কী করবে তারা?

কাউকে পাঠাবে এখানে। যারা আমাদের তিনজনকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে পৃথিবীকে রক্ষা করবে।

কাকে পাঠাবে? প্রফেসর ত্রিনির গলা কেঁপে গেল হঠাৎ।

আমার ধারণা, সেঞ্চুরি-৪৯ ধরনের রবোটকে। অত্যন্ত নিখুঁত রবোট, অত্যন্ত সুচারুভাবে কাজ করতে সক্ষম। আমার ধারণা যে-কোনো মুহূর্তে তারা এসে ঢুকবে এখানে।

বিশ্বাস করি না তোমার কথা। বিশ্বাস করি না—

রিগা কী-একটা বলতে চাইছিল, তার আগেই হঠাৎ সশব্দে দরজা খুলে যায়। দরজায় চারটি ধাতবমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি, হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। মূর্তিগুলো মাথা ঘুরিয়ে তাদের তিনজনকে একনজর দেখে নেয়। তারপর খুব ধীরে ধীরে হাতের অস্ত্র তাদের দিকে উদ্যত করে। রিগা চিনতে পারে—সেঞ্চুরি-৪৯ রবোট।

ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিগা। তার অনুমান তাহলে ভুল হয় নি। কখনো হয় না।

বিষ

ক্রায়োজেনিক পাম্পটি চালিয়ে দিয়ে কিম জিবান কাচের ছোট অ্যাম্পুলটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে তিনি কখনো একটা স্ক্রু-ড্রাইভার হাতে একটা স্ক্রু ঘুরিয়েছেন মনে পড়ে না, অথচ গত এক সপ্তাহ থেকে তাঁর ঘরে একটা ছোট কিন্তু জটিল ল্যাবরেটরি বসানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের দশজন সদস্যের একজন হিসেবে তাঁর ক্ষমতার আক্ষরিক অর্থেই কোনো সীমা নেই। মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্পিউটার তাঁর মুখের কথায় এই ল্যাবরেটরির প্রতিটি জিনিস এনে হাজির করেছে। কিন্তু কাচের অ্যাম্পুলটিতে তিনি যে তরল পদার্থটি রাখতে চাইছেন, সেটি কী ভাবে তৈরি করতে হয় সেই তথ্যটি তিনি মুখের কথায় বের করতে পারেন নি। সেজন্যে তাঁকে নিজের হাতে তাঁর সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের গোপন সংখ্যাটি মূল কম্পিউটারে প্রবেশ করাতে হয়েছে। পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এখন পর্যন্ত কেউ সেটি করেছে বলে জানা নেই। এজন্যে তাঁকে সামনের কাউন্সিলে জবাবদিহি করতে হবে, সেটি গ্রহণযোগ্য না হলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাঁর নিজের হাতে নিজের প্রাণ নেয়ার কথা।

জিবান স্থির দৃষ্টিতে কাচের অ্যাম্পুলটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। হালকা লাল রঙের একটা তরল একফোঁটা একফোঁটা করে কাচের অ্যাম্পুলটিতে জমা হচ্ছে। পুরোটুকু ভরে যাওয়ার পর অ্যাম্পুলটির মুখ লেজারের একঝলক আলোতে গলিয়ে বন্ধ করে ফেলার কথা। তিনি কখনো আগে এ ধরনের কাজ করেন নি, তাই নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হতে চান।

অ্যাম্পুলটির মুখ বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি সেটা হাতে নেয়ার জন্যে ক্রায়োজেনিক পাম্পটা বন্ধ করে দেন। ভিতরে বাতাসের চাপ স্বাভাবিক হওয়ার পর তিনি বায়ুনিরোধক বাক্সটির ঢাকনা খোলার জন্যে হাতল স্পর্শ করামাত্র মূল কম্পিউটারটি আপত্তি জানাল। পৃথিবীতে মাত্র দশজন মানুষকে এই ঢাকনা খোলার অধিকার দেয়া হয়েছে; তিনি সেই দশজন মানুষের একজন। কিম জিবানকে দ্বিতীয়বার তাঁর নিজের হাতে গোপন সংখ্যাটি প্রবেশ করিয়ে কম্পিউটারকে জানাতে হল। বায়ুনিরোধক বাক্সটির ঢাকনা এবার সহজেই খুলে আসে, জিবানের হাত অল্প অল্প কাঁপতে থাকে, তিনি সে অবস্থাতেই সাবধানে অ্যাম্পুলটি তুলে নেন। তিনি এখন তাঁর জীবনের প্রথম এবং সম্ভবত শেষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটি করবেন। তাঁর হাতে কাচের অ্যাম্পুলটি কোনোভাবে ভেঙে গেলে এই তরল পদার্থটি বাতাসে মিশে গিয়ে আগামী চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে পৃথিবীর প্রতিটি জীবিত প্রাণীকে মেরে ফেলবে। মাত্র তিন ধরনের ভাইরাস এই বোনাসিয়াস থেকে রক্ষা পেতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনো সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নন। কিম জিবান হেঁটে ঘরের মাঝখানে আসেন, তাঁর হাত তখনো অল্প অল্প কাঁপছে, তিনি ভালো করে অ্যাম্পুলটি ধরে রাখতে পারছেন না। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের প্রাণ তিনি এখন হাতে ধরে রেখেছেন, কিম জিবান অবাক হয়ে ভাবলেন, এত বড় ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ কি কখনো অর্জন করেছিল?

নীষ কিম জিবানের ঘরে ঢুকে আবিষ্কার করেন, ঘরটি অন্ধকার। বাতি জ্বালানোর চেষ্টা করতেই অন্ধকারে এক কোনা থেকে জিবান বললেন, নীষ, বাতি জ্বালিও না। একটু পরেই দেখবে চোখ অন্ধকারে সয়ে যাবে।

বাজে কথা বলো না—নীষ বাতি জ্বালালেন, আমার অন্ধকার ভালো লাগে না।

জিবান চোখ কুঁচকে নীষের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তাঁর মুখে আশ্চর্য একটা হাসি। নীষ বেশি অবাক হলেন না। কিম জিবান বরাবরই খেয়ালি মানুষ, এরকম একজন খেয়ালি মানুষকে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য করা হয়েছে, সেটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য! নীষ বললেন, কী ব্যাপার জিবান, আমাকে ডেকেছ কেন?

জিবান কথা না বলে ঘরের কোনায় তাঁর ছোট ল্যাবরেটরি দেখালেন, নীষ বিস্মিত হয়ে সেদিকে এগিয়ে যান, কী ব্যাপার জিবান, তুমি ডিস্টিলেশান কমপ্লেক্স দিয়ে কী করছ?

জিবান মাথা দুলিয়ে হেসে বললেন, তুমি পৃথিবীর প্রথম পাঁচজন ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞানীদের একজন—

কথাটি সত্যি, তাই নীষ প্রতিবাদ না করে পরের অংশটুকু শোনার জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন। জিবান বললেন, তুমিই বল আমি কী করছিলাম।

নীষ মিনিট দুয়েক ডিস্টিলেশান কমপ্লেক্সের দিকে তাকিয়ে থাকেন, কম্পিউটারের মনিটরে বার দুয়েক টোকা দিয়ে হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন, তখন তিনি ঘুরে জিবানের দিকে তাকিয়েছেন, তাঁর মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। নীষ কথা বলতে পারছিলেন না, বারকয়েক চেষ্টা করে কোনোভাবে বললেন, তুমি—তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ। তুমি কাচের অ্যাম্পুলে লিট্রুমিন বোনাসিয়াস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ!

জিবান পকেট হাতড়ে অ্যাম্পুলটি বের করে তাঁকে দেখালেন। আতঙ্কে নীষের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, মনে হতে থাকে তাঁর হৃৎস্পন্দন থেমে যাবে, এই কাচের অ্যাম্পুলটি কোনোভাবে ভেঙে গেলে চব্বিশ ঘন্টার মাঝে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ শেষ হয়ে যাবে। জিবান তখনো হাসিমুখে নীষের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, আস্তে আস্তে তাঁর হাসি আরো বিস্তৃত হয়ে ওঠে, তিনি হঠাৎ অবহেলার ভঙ্গিতে অ্যাম্পুলটি নীষের দিকে ছুড়ে দেন।

নীষ পাগলের মতো লাফ দিয়ে অ্যাম্পুলটি ধরার চেষ্টা করলেন। হাত ফসকে সেটি পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেটি ধরে ফেলেছেন। হাতের মুঠোয় রেখে তিনি বিস্ফারিত চোখে অ্যাম্পুলটির দিকে তাকিয়ে থাকেন, তাঁর সমস্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। নীষ ধীরে ধীরে জিবানের মুখের দিকে তাকালেন।

জিবানের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, তাঁর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, অ্যাম্পুলটি ফিরিয়ে দাও।

না।

জিবান ড্রয়ার খুলে ভিতর থেকে একটা বেঢপ রিভলবার বের করলেন, আমাকে ফিরিয়ে দিলে অ্যাম্পুলটি রক্ষা পাবার সম্ভাবনা বেশি, তোমাকে গুলি করলে অ্যাম্পুলটি হাত থেকে পড়ে ভেঙে যেতে পারে।

জিবান! তুমি—

অ্যাম্পুলটি ফিরিয়ে দাও।

নীষ কাঁপা কাঁপা হাতে অ্যাম্পুলটি ফিরিয়ে দিলেন। জিবান অ্যাম্পুলটি টেবিলের উপর রেখে নীষ কিছু বোঝার আগে ট্রিগার টেনে সেটিকে গুলি করে বসেছেন।

প্রচণ্ড শব্দ হল ঘরে, কাচের অ্যাম্পুলটি ছিটকে গিয়ে দেয়ালে আঘাত খেয়ে মেঝেতে এসে পড়ে এক কোনায় গড়িয়ে যায়। নীষ বিস্মিত হয়ে দেখেন—অ্যাম্পুলটি ভাঙে নি, সেটির গায়ে একটু দাগ পর্যন্ত নেই! তিনি ঘুরে জিবানের দিকে তাকান, জিবানের মুখে আবার সেই ছেলেমানুষি হাসি ফিরে এসেছে। বেঢপ রিভলবারটি ড্রয়ারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখতে রাখতে বললেন, তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যে দুঃখিত নীষ, কেন জানি একটু মজা করার ইচ্ছে হল। এটি আমার এক শ' উনিশ নম্বর গুলি, আমি এটাকে গত ছত্রিশ ঘন্টা থেকে ভাঙার চেষ্টা করছি।

নীষ কোনোমতে একটা চেয়ার ধরে বসে পড়েন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলেন, তুমি বলতে চাও এটি সাধারণ কাচ, অথচ—

হ্যাঁ, যেই মুহূর্তে এর ভিতরে বোনাসিয়াস ঢোকানো হয়েছে, এটা আর ভাঙা যাচ্ছে না। একটু থেমে যোগ করলেন, কেউ-একজন পৃথিবীর মানুষকে মরতে দিতে চায় না।

নীষ কাঁপা কাঁপা হাতে অ্যাম্পুলটা তুলে সেটির দিকে তাকিয়ে থাকেন, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, জিবান।

বল।

তুমি কী ভাবে জানলে এরকম হবে?

জানতাম না, তাই তো পরীক্ষাটা করতে হল।

যদি তোমার অনুমান ভুল হত, যদি—

হয় নি তো।

যদি হত? যদি—

আহ্! ছেলেমানুষি করা ছাড়, জিবান হাত নেড়ে নীষকে থামিয়ে দেন। নীষ সাবধানে কাচের অ্যাম্পুলটিকে টোকা দিয়ে বললেন, তুমি কেমন করে সন্দেহ করলে যে এরকম হতে পারে?

আমার সৌর তেজস্ক্রিয়তার উপরে প্রবন্ধটার কথা মনে আছে?

যেটা পরে ভুল প্রমাণিত হল? তুমি যে-পরিমাণ সৌর তেজস্ক্রিয়তা দাবি কর, সেটি সত্যি হলে পৃথিবী গত শতাব্দীতে ধ্বংস হয়ে যেত—

হ্যাঁ। কিন্তু আমার হিসেবে কোনো ভুল ছিল না, আমি এখনো আমার কোনো গবেষণায় কোনো ভুল করি নি।

তাহলে—

আমি খুঁজে বের করেছি, একটা আশ্চর্য উপায়ে মহাজাগতিক মেঘ এসে সময়মতো তেজস্ক্রিয়তাটুকু শুষে নিয়েছিল, কী ভাবে সেটা সম্ভব হল কেউ জানে না। তখন আমার প্রথম সন্দেহ হয় যে, কোনো-একজন বা কোনো দল আমাদের উপর চোখ রাখছে।

এ-ধরনের আরো ঘটনা আছে?

অসংখ্য! আমি মূল কম্পিউটার দিয়ে গত তিন শ' বছরের ''প্রায় ধ্বংস'' ঘটনাগুলি দেখছিলাম। সাতানব্বই সালে পৃথিবীর দুটি বড় বড় নির্বোধ দেশ একজন আরেকজনকে ধ্বংস করার জন্যে পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। কোনো-একটি অজ্ঞাত কারণে একটি মিসাইলও মাটি ছেড়ে উপরে ওঠে নি।

আশ্চর্য!

হ্যাঁ, একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ''গ্রীন হাউস এফেক্ট''-এর জন্যে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমস্ত পৃথিবী ডুবে যাবার কথা ছিল। কোনো-এক অজ্ঞাত কারণে সে-সময়ে হঠাৎ করে পৃথিবীর সমস্ত সবুজ গাছপালা সালোকসংশ্লেষণে দ্বিগুণ

পরিমাণ কার্বন–ডাই–অক্সাইড ব্যবহার করা শুরু করায় পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে।

নীষ মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, আমি এটা জানতাম।

তুমি নিশ্চয়ই কিনিকা ধূমকেতুর কথা পড়েছ? সেটি পৃথিবীকে আঘাত করে কক্ষচ্যুত করে ফেলার মতো বড় ছিল। কিন্তু ইউরেনাসের কাছে এক আশ্চর্য কারণে সেটি বিস্ফোরিত হয়ে গতিপথ পরিবর্তন করেছিল। গত শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে একটা আশ্চর্য রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়, এতে মানুষের রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা শেষ হয়ে যেত। রোগটি ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিজে থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

আশ্চর্য।

হ্যাঁ, এরকম অসংখ্য আশ্চর্য ঘটনা আছে, মূল কম্পিউটার সেগুলি খুঁজে বের করছে। তুমি দেখতে চাইলে দেখতে পার। জিবান হাত দিয়ে মনিটরকে স্পর্শ করামাত্র কম্পিউটারটি দেয়ালে ঘটনাগুলো লিখতে লিখতে হালকা স্বরে পড়তে থাকে। জিবান বললেন, সবগুলো শুনতে চাইলে ঘন্টা তিনেক সময় লাগবে, সব মিলিয়ে এরকম প্রায় ছয় শ' ঘটনা আছে।

নীষ মিনিট দশেক দেখেই কম্পিউটারটিকে থামিয়ে দিলেন। তাঁর দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এসেছে। তিনি জিবানের দিকে তাকিয়ে বললেন, তার মানে তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলে?

হ্যাঁ। এই কাচের অ্যাম্পুলটা ভাঙার চেষ্টা করে এখন পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়েছি। এখন আমি জানি এবং তুমিও জান, কেউ–একজন আমাদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

তার মানে—

তার মানে আমরা একটা ল্যাবরেটরির ছোট ছোট গিনিপিগ। আমাদের দিয়ে কেউ–একজন একটা পরীক্ষা করেছে। যে বা যারা এই পরীক্ষাটা করছে, তারা লক্ষ রাখছে নির্বোধ গিনিপিগগুলো যেন কোনোভাবে মারা না যায়।

নীষের নিজেকে একটা নির্বোধ মনে হল, তবু তিনি প্রশ্নটা না করে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কী পরীক্ষা করছি?

জিবান আবার হাসলেন, বললেন, আমরা কোনো পরীক্ষা করছি না, আমাদের দিয়ে পরীক্ষা করানো হচ্ছে।

সেটি কি?

আমি এখনো নিশ্চিত জানি না সেটি কী। এই মুহূর্তে মূল কম্পিউটার সেটি বের করার চেষ্টা করছে। পৃথিবীতে মানুষের যত অবদান, সবগুলোকে নিয়ে সে একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করছে। লক্ষ করছে তার ভিতরে কোনো লুকানো সাদৃশ্য আছে কি না, কোনোভাবে সেগুলো অদৃশ্য কোনো শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি না। অসংখ্য রাশিমালা নিয়ে অনেক জটিল হিসেব করতে হচ্ছে বলে কম্পিউটারের এত সময় লাগছে। কাল ভোরের আগে উত্তর বের করার কথা, কিন্তু আমি মোটামুটি জানি, উত্তর কী হবে। তুমিও নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ।

হ্যাঁ। নীষ মাথা নাড়লেন, জ্ঞান–সাধনা?

ঠিক বলেছ। মানব জাতির ইতিহাস হচ্ছে তার জ্ঞান সাধনার ইতিহাস, অথচ কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জার কথা, সেটি আসলে অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর কাজ।

নীষ হঠাৎ মাথা তুলে বললেন, আমাকে তুমি এটা জানিয়েছ কেন? নিজের অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠে ক্ষোভ ফুটে ওঠে।

আমি ছাড়াও আরো কেউ এটা জানুক।

কেন?

আমার যদি কোনো কারণে মৃত্যু হয়, অন্তত আরেকজন মানুষ এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারবে।

নীষ উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে একা বসে খানিকক্ষণ ভাবতে হবে। আমি যাই।

যাও।

নীষ দরজার কাছ থেকে ঘুরে এসে জিবানকে বললেন, এই অদৃশ্য শক্তি, যারা আমাদের ব্যবহার করছে, তারা তোমাকে মেরে ফেলল না কেন? যেই মুহূর্তে তোমার মাথায় সন্দেহটুকু উঁকি দিয়েছে—

আমি নিজেও এটা নিয়ে ভেবেছি, হয়তো তাদের চিন্তাধারা আর আমাদের চিন্তাধারার তুলনা করা যায় না। হয়তো আমরা যেভাবে ভাবি, আমাদের যে ধরনের যুক্তিতর্ক, তাদেরটা সে রকম নয়, অন্যরকম—অনেকটা যেন মানুষ আর পিঁপড়া। আমি যদি অনেকগুলো পিঁপড়াকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করি আর হঠাৎ দেখি একটা পিঁপড়া বোকার মতো একটা কাজ করছে, যেটা দিয়ে অন্য সবগুলো পিঁপড়া মারা যাবে, আমি তখন কী করব? আমি সেই পিঁপড়াটাকে বোকার মতো কাজ করতে দেব না। কিন্তু পিঁপড়াটাকে তো মেরে ফেলব না, সেটাকে ছেড়ে দেব। নির্বোধ প্রাণী, ওকে মেরে লাভ কি?

নীষ চিন্তিত মুখে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, শুনলেন, জিবান ক্ষোভের সাথে বলছেন, আমার দুঃখ, কেউ-একজন আমাকে নির্বোধ হিসেবে জানে।

AMARBOI.COM

নীষ সারা রাত তাঁর বারান্দায় আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। কিম জিবানের সাথে কথা বলার পর হঠাৎ তাঁর সমস্ত জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে। সারা জীবন জ্ঞানের অন্বেষণে কাটিয়েছেন, অজানাকে জানার যে-অদম্য তাড়না তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটি কোনো-এক বুদ্ধিমান প্রাণীর নির্দেশ। এই সত্যটি তিনি কোনোমতে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর কাছে এই জীবনের আর কোনো মূল্য নেই। তিনি দুই হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে বসে থাকেন।

নীষের মাথায় হঠাৎ একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে। এই যে বুদ্ধিমান প্রাণী, যারা মানবজাতিকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করছে, তারা ঠিক কী ভাবে মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখে? নীষ আজীবন ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা চর্চা করে এসেছেন, মহাজাগতিক সংঘর্ষ কেন্দ্র তাঁর নিজের হাতে তৈরি করা, কোনো জটিল পরীক্ষা করায় তাঁর যে অচিন্তনীয় ক্ষমতা রয়েছে, তার কোনো তুলনা নেই। তিনি নিজেকে সেই অদৃশ্য বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে কল্পনা করলেন, তিনি যদি মানবজাতির সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন, তা হলে তিনি কী করতেন? ধরা যাক তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটা প্রাণী, মানুষের আচার-ব্যবহার চিন্তাধারা যুক্তিতর্ক সবকিছু ভিন্ন।

তিনি সেটা বোঝেন না, তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব না। পিঁপড়া যেরকম কীটপতঙ্গের তুলনায় বুদ্ধিমান। কিন্তু মানুষ কখনো পিঁপড়ার সাথে ভাব বিনিময় করতে পারে না, অনেকটা সেরকম। তিনি এরকম অবস্থায় মানুষের সাথে কী ভাবে যোগাযোগ রাখতেন?

কেন? এ তো খুবই সহজ! নীষ হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন, মানুষের মতো কাউকে পাঠানো হবে, সে মানুষের সাথে মানুষের মতো থাকবে, তার ভিতর দিয়ে সব খোঁজ-খবর নেয়া হবে।

নীষ উত্তেজিত হয়ে পায়চারি শুরু করেন, কে সে মানুষ, কোথায় আছে সে? নীষের চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে, নিশ্চয়ই সেই মানুষ সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে থাকবে, এর চেয়ে ভালো জায়গা আর কী আছে? দশজন সদস্যের সবাইকে তিনি চেনেন, সবার সাথে ঘনিষ্ঠতা নেই, থাকা সম্ভবও নয়, কিন্তু সবাইকে খুব ভালো করে চেনেন। এদের মাঝে কে হতে পারে? মহামান্য লী? অসাধারণ প্রতিভাবান গণিতবিদ রু লুকাস? জীববিজ্ঞানী রুখ কিংবা শান সোয়ান? নাকি জ্যোতির্বিদ পল কুম? কে হতে পারে?

কী আশ্চর্য! নীষ ভাবলেন, আমি মূল কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করি না কেন? মূল কম্পিউটারে প্রত্যেকের জীবন-ইতিহাস আছে। একনজর দেখলেই বেরিয়ে পড়বে।

নীষ ছুটে বসার ঘরে গেলেন। মনিটরকে স্পর্শ করে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান কাউন্সিলের দশজন সদস্যের জীবন-ইতিহাস জানতে চাইলেন মূল কম্পিউটারের কাছে। মূল কম্পিউটার আপত্তি জানাল, এটি গোপনীয়। তিনি জানতে চাইলে তাঁকে তার গোপন সংখ্যা প্রবেশ করাতে হবে। নীষ ধীরে ধীরে নিজের গোপন সংখ্যা প্রবেশ করালেন। এর জন্যে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে, সেটি গ্রহণযোগ্য না হলে তাঁকে নিজের হাতে নিজের প্রাণ নিতে হবে, কিন্তু একবারও তাঁর সে-কথাটি মনে হল না। নীষ একজন একজন করে প্রত্যেকের জীবন-ইতিহাস দেখতে থাকেন। তাঁর নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে আসে। হাত অল্প কাঁপছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কিন্তু তিনি জানেন, আজ তিনি বের করবেন কে সেই লোক। কে সেই আশ্চর্য বুদ্ধিমান-জগতের গুপ্তচর।

বিজ্ঞান কাউন্সিলের সর্বোচ্চ পরিষদের জরুরি সভা বসেছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দশজন বিজ্ঞানী গোলটেবিল ঘিরে বসেছেন। তাঁদের মুখে মৃদু হাসি, তাঁরা নিচু স্বরে গল্প করছেন, এই মুহূর্তে তাঁদের সারা পৃথিবীতে টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে, তাই এই অভিনয়টুকুর প্রয়োজন। কিছুক্ষণের মাঝেই কোয়ার্টজের দরজাটি বন্ধ হয়ে তাঁদের সারা পৃথিবী থেকে আলাদা করে ফেলল। সাথে সাথে বিজ্ঞানীরা গম্ভীর হয়ে সোজা হয়ে বসলেন। সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের সভার কোনো নিয়ম নেই, মহামান্য লী সভাপতি হিসেবে এটি নিয়ন্ত্রণের মাঝে রাখার চেষ্টা করেন। আজ তিনিই সবার আগে কথা বললেন, তোমরা সবাই জান, গত ছত্রিশ ঘন্টায় মূল কম্পিউটারে তিনবার গোপন সংখ্যা প্রবেশ করানো হয়েছে। জিবান দুবার, নীষ একবার।

আমার মনে হয়—জীববিজ্ঞানী রুখ বললেন, গোপন সংখ্যা প্রবেশ করানোর নিয়মটি তুলে দিতে হবে। জিবান সেটি যে-জন্যে ব্যবহার করেছে—

রুখকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে জিবান বললেন, তোমরা এক সেকেন্ড

থেমে আমাকে কথা বলতে দেবে?

রুখ আবার শান্ত স্বরে বললেন, আমার মনে হয়, যখন একজন কথা বলছে, তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আরেকজনের অপেক্ষা করা উচিত। সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য হিসেবে—

ধেত্তেরি তোমার সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদ! জিবান টেবিলে একটা থাবা দিয়ে বললেন, আমার কথা আগে শেষ করতে দাও। তিনি পকেট থেকে একগাদা কাগজ বের করে টেবিলের মাঝখানে ছুড়ে দিয়ে বললেন, এখানে সবকিছু লেখা আছে, দেখতে চাইলে দেখতে পার, কিন্তু এখন খামোকা সময় নষ্ট না করে আমার কথা শোন। আমি কিছুদিন থেকে সন্দেহ করছিলাম মানবজাতি আসলে এক ধরনের উন্নত প্রাণীর ল্যাবরেটরি পরীক্ষা। গতকাল আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, যে-পরীক্ষা করে সন্দেহ মিটিয়েছি সেটি খুব সহজ, তোমরাও দেখতে পার। জিবান পকেট থেকে লিটুমিন বোনাসিয়াসের অ্যাম্পুলটা বের করলেন, এই বিষ দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব, পাতলা একটা কাচের অ্যাম্পুলে আছে, টোকা লাগালেই ভেঙে যাবার কথা। কিন্তু এটাকে ভাঙা সম্ভব না, কেউ-একজন এটাকে ভাঙতে দিচ্ছে না, তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পার। জিবান অ্যাম্পুলটা টেবিলের উপর ছুড়ে দিলেন, সবাই রুদ্ধশ্বাসে অ্যাম্পুলটিকে লক্ষ করে, অ্যাম্পুলটি সত্যি ফেটে না গিয়ে একটি রবারের বলের মতো বারকয়েক লাফিয়ে টেবিলের মাঝখানে স্থির হয়ে যায়।

মাহামান্য লী হাত বাড়িয়ে অ্যাম্পুলটি তুলে নেন, চোখের কাছে নিয়ে সেটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে পাশে বসে থাকা শান সোয়ানের হাতে দেন। একজন একজন করে সবাই অ্যাম্পুলটি দেখেন, কারো মুখে কোনো কথা নেই, জিবান সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, এই প্রাণী আমাদের ব্যবহার করছে জ্ঞান সংগ্রহের জন্যে। আমি নিজেও তাই সন্দেহ করেছিলাম, আজ ভোরে মূল কম্পিউটারও তার গবেষণা শেষ করে আমাকে এটা জানিয়েছে। তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কম্পিউটারে আমি তার রিপোর্ট পাঠিয়েছি, ইচ্ছে হলে দেখতে পার। জিবান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমার কথা শেষ, এখন তোমাদের যা ইচ্ছে হয় কর।

সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। মহামান্য লী আস্তে আস্তে বললেন, তার মানে আমাদের এই জ্ঞান-সাধনা—

বাজে কথা! সব ওদের একটা ল্যাবরেটরি পরীক্ষা। আমরা মানুষেরা যে সৃষ্টির পর থেকে শুধু জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করছি, তার কারণ, কেউ-একজন আমাদের বলে দিয়েছে, এটা কর। কী লজ্জার কথা! মানুষের আসল ব্যবহার কী, কে জানে।

সবাই একসাথে কথা বলার চেষ্টা করে, নীষের গলা সবচেয়ে উপরে উঠে সবাইকে থামিয়ে দেয়। নীষ বললেন, জিবান আমাকে ব্যাপারটি বলার পর থেকে আমি বের করার চেষ্টা করছিলাম সেই উন্নত প্রাণী মানুষের সাথে কী ভাবে যোগাযোগ রাখে। আপনারা চিন্তা করলে নিজেরাই বের করতে পারবেন, সবচেয়ে সহজ হয় মানুষের চেহারার একটা-কিছু তৈরি করে মানুষের মাঝে ছেড়ে দিলে। যেহেতু আমাদের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান কাউন্সিল নামে একটা সংগঠন রয়েছে, কাজেই আমার ধারণা, মানুষের চেহারার সেই উন্নত প্রাণীদের গুপ্তচর এই বিজ্ঞান কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে থাকবে।

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞান কাউন্সিলের সদস্যরা ভয়ানক চমকে নীষের মুখের দিকে তাকালেন। মহামান্য লী বললেন, তুমি বলতে চাও—

নীষ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমার গোপন সংখ্যা ব্যবহার করে আমি গতরাতে আপনাদের সবার জীবন-ইতিহাস, আপনাদের ব্যক্তিগত দিনলিপি পড়েছি, আমি সেজন্য ক্ষমা চাইছি। আমার ধারণা ছিল আমি সেখান থেকে বের করতে পারব, কারণ আমি ধরে নিয়েছিলাম, যে উন্নত প্রাণীদের গুপ্তচর, সে নিজে সেটি জানে। কিন্তু সেটা সত্যি নয়।

জিবান অধৈর্য হয়ে বললেন, তুমি কি শেষ পর্যন্ত বের করতে পেরেছ?

হ্যাঁ।

কে সেই লোক?

আমি।

ঘরের ভিতরে বাজ পড়লেও কেউ বুঝি এত অবাক হত না। কয়েক মুহূর্ত লাগে সবার ব্যাপারটি বুঝতে। জিবান কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তুমি কী ভাবে জান তুমিই সেই লোক? হয়তো তুমি ভুল করেছ, হয়তো—

নীষ ম্লান মুখে হাসলেন, আমি নিজেও তাই আশা করছিলাম। কিন্তু আমিই আসলে সেই গুপ্তচর, আমাকে দিয়েই সেই উন্নত প্রাণী পৃথিবীর খোঁজখবর নেয়। বিশ্বাস কর তোমরা, আমি নিজে সেটা জানতাম না। যখন জেনেছি, নিজেকে এত অপরাধী মনে হয়েছে যে আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম।

নীষ নিজের শার্ট খুলে দেখালেন, বুকে গুলির দাগ, রক্ত শুকিয়ে আছে। বললেন, আমি আমার হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়ে দুটি গুলি পাঠিয়েছি, কিন্তু তবু আমি মারা যাই নি। সেই উন্নত প্রাণী যতক্ষণ না চাইবে, আমি মারা যেতে পারব না, আমাকে বুকে গুলি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। নীষ আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে বসলেন, মাথা নিচু করে বললেন, তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও।

আস্তে আস্তে তিনি টেবিলে মুখ ঢেকে হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

ক্রুনো রবোট

দুপুরের পর বড় জানালাগুলো দিয়ে রোদ এসে আমার অফিস-ঘরটি আলোকিত হয়ে যায়। আমি তখন চেয়ারটা টেনে নিয়ে রোদে গিয়ে বসি, বয়স হয়ে যাবার পর এ-ধরনের ছোটখাটো উষ্ণতার জন্যে শরীরটা কাঙাল হয়ে থাকে। এখানে বসে জানালা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়াঢাকা প্রাঙ্গণটুকুর পুরোটাই চোখে পড়ে। বসে বসে ছাত্রছাত্রীদের হৈচৈ দেখতে বেশ লাগে। তারুণ্যের একটা আকর্ষণ আছে, আমি সহজে চোখ ফেরাতে পারি না। হৈচৈ চেঁচামেচি দেখে মাঝে মাঝেই আমার নিজের ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে যায়, সমস্ত পৃথিবীটা তখন রঙিন মনে হত। একজন মানুষ তার জীবনে যা-কিছু পেতে পারে, আমি সবই পেয়েছি, কিন্তু তবু মনে হয় এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছুর বিনিময়ে ছাত্রজীবনের একটি উজ্জ্বল অপরাহ্নও যদি কোনোভাবে ফেরত পেতে পারতাম!

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বড় ঝাউগাছটার নিচে একটা ছোট জটলার মতো। মাঝখানে দাঁড়িয়ে লানা হাত–পা নেড়ে কথা বলছে, তাকে ঘিরে বেশ কিছু উত্তেজিত তরুণ–তরুণী। লানা আমার একজন ছাত্রী, সময় পরিভ্রমণের সূত্রের উপর আমার সাথে কাজ করে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, রাজনীতি বা সমাজসেবা এই ধরনের আনুষঙ্গিক কার্যকলাপে যদি এত সময় ব্যয় না করত, তা হলে এতদিনে তার ডিগ্রি শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল। খুব প্রাণবন্ত মেয়ে, অন্যদের জন্যে কিছু করার জন্যে এত ব্যস্ত থাকতে আগে কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ইদানীং মাঝে মাঝে চশমা–পরা এলোমেলো চুলের এক তরুণের সাথে দেখি। সাহিত্যের ছাত্র, নাম জিশান লাও। ওর বাবাকে খুব ভালো করে চিনি, কারণ ছাত্রজীবনে দু'জনে রাত জেগে দীর্ঘ সময় নানারকম অর্থহীন বিষয় নিয়ে তর্ক করেছি। ছেলেটি যদি তার বাবার হৃদয়ের এক–ভগ্নাংশও কোনোভাবে পেয়ে থাকে, তা হলে অত্যন্ত হৃদয়বান একটি ছেলে হবে তাতে সন্দেহ নেই। লানার সাথে সম্ভবত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, নূতন ভালবাসার মতো মধুর জিনিস পৃথিবীতে কী আছে? লানা এবং জিশানকে একসাথে দেখে আমার নিজের প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়, যখন মনে হত ভালবাসার মেয়েটির একটি চুলের জন্যে আমি সমস্ত জগৎ লিখে দিতে পারি!

আমি চোখ সরিয়ে নিজের কাজে মন দিলাম। সপ্তম মাত্রার একটা সমীকরণ নিয়ে কয়েকদিন থেকে বসে আছি। সমাধানটি মাথায় উঁকি দিয়ে দিয়েও সরে যাচ্ছে, কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। যৌবনে মস্তিষ্কের যে একটা সতেজ ভাব ছিল, সেটা এখন নেই, নিজেই প্রায় সময়ে অনুভব করতে পারি। হাঁটুর উপর মোটা খাতাটি রেখে পেন্সিল দিয়ে সমীকরণটি বড় বড় করে লিখে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। সমাধানটি আবার মাথায় উঁকি দিয়ে যেতে থাকে, আমার সমগ্র একাগ্রতা জটিল সমীকরণটির সেই অস্পষ্ট সমাধানটির পিছু ছুটতে থাকে।

কতক্ষণ মোটামুটি ধ্যানস্থ হয়ে বসে ছিলাম জানি না, লানার গলার স্বরে ঘোর ভাঙল।

স্যার, ভিতরে আসতে পারি?

আমি কিছু বলার আগেই সে ভিতরে ঢুকে এল। বরাবরই তাই করে, আমি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকলে কেউ আমাকে বিরক্ত করার সাহস পায় না, গত সপ্তাহে শহরের মেয়র আমার সাথে দেখা করতে এসে দরজার বাইরে পনের মিনিট দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে তুলনায় এই মেয়েটি যে দুঃসাহসী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি লানার মুখের দিকে তাকালাম। তার চোখে–মুখে উত্তেজনার ছাপ সবসময়েই থাকে। সতেজ গলায় বলল, স্যার, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

আমি চেষ্টা করে মুখে গাম্ভীর্যটা ধরে রাখলাম, বললাম, আশা করি কাজটা গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তুমি জান, আমার নিজের কাজ ছাড়াও আমাকে আরো অন্তত দশটা কমিটির জন্যে কাজ করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি—লানা মুখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে বলল, আমার ধারণা, আপনি সেসব কমিটিতে সময় নষ্ট না করলে নিজের কাজ খুব ভালোভাবে করতে পারতেন।

লানাকে দেখার আগে আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে, কেউ এভাবে আমার সাথে কথা বলতে পারে। কিন্তু লানা যে-কথাটি বলেছে সেটি সত্যি, আমি নিজে সেটা খুব ভালো করে জানি। আমি মেয়েটির কাছে সেটা প্রকাশ করলাম না, গাম্ভীর্য ধরে রেখে বললাম, তুমি জান, সেসব কমিটির কোনো-কোনোটিতে রাষ্ট্রপতি এবং বিজ্ঞানবিষয়ক উপদেষ্টাও আছেন?

লানা নিজের চুল খামচে ধরে বলল, আমি বিশ্বাসই করতে রাজি না যে, আপনি ঐসব মানুষকে কোনো গুরুত্ব দেন। ওদের সবগুলোকে পাগলা-গারদে রাখার কথা।

আমার হাসি আটকে রাখতে অত্যন্ত কষ্ট হল। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, তোমার কাজটা কি?

আপনি জানেন, গ্রুনো নামে নতুন রবোট বের হয়েছে?

শুনেছি।

ওদের কপোট্রনে নাকি সিস্টেম-৯ ঢোকানো হয়েছে।

সেটার মানে কি?

আপনি সিস্টেম-৯ কী, জানেন না লানা আমার অজ্ঞতায় খুব অবাক হল এবং সেটা গোপন রাখার কোনো-রকম চেষ্টা করল না। বলল, গত দশ বছর থেকে সিস্টেম-৯-এর উপর কাজ হচ্ছে। এটা হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম, যেটার সাথে মানুষের কোনো পার্থক্য নেই।

কী আছে সেখানে?

কেউ জানে না, অত্যন্ত গোপনীয় জিনিস। এখন সেটাকে গ্রুনো রবোটের কপোট্রনে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

সেটার মানে কি?

লানা উত্তেজিত মুখে বলল, তার মানে গ্রুনো রবোটের সাথে মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। দেখে, কথা বলে কোনোভাবেই বোঝা যাবে না কোনটা মানুষ, কোনটা রবোট।

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, পৃথিবীতে কি সত্যিকার মানুষের অভাব আছে যে এখন গ্রুনো রবোটকে মানুষ হিসেবে বাজারে ছাড়তে হবে?

লানা আমার কথাটি লুফে নিয়ে বলল, সেটাই তো কথা। বিজ্ঞানবিষয়ক উপদেষ্টা কী বলেছে শোনেন নি?

কী বলেছে?

কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে দেশের সব বিচারপতিদের অবসর করিয়ে দিয়ে সেখানে গ্রুনো রবোটদের বসানো হবে।

সত্যি?

সত্যি। লানা মুখের উপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে বলল, আজকের কাগজে উঠেছে।

বিজ্ঞানবিষয়ক উপদেষ্টা লোকটির সম্ভবত সত্যিই মাথা খারাপ। লানার পরামর্শ শুনে কিছুদিন পাগলা-গারদে আটকে রাখলে মনে হয় মন্দ হয় না। আমার সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটির মাঝে মাঝে দেখা হয়। বলে দিতে হবে যেন এরকম বেফাঁস কথাবার্তা না বলে। দেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ রবোটশিল্পের উপর নির্ভরশীল, মনে হয় সেই শিল্পকে খুশি রাখার জন্যে এ–ধরনের কথাবার্তা মাঝে মাঝে বলে ফেলতে হয়।

লানা গম্ভীর গলায় বলল, গ্রুনো কোম্পানির সাহস কী পরিমাণ বেড়েছে, আপনি শুনতে চান?

বল।

ওদের ফ্যাক্টরি থেকে দু'জন মানুষ পাঠিয়েছে আমাদের কাছে, তার মাঝে নাকি একজন হচ্ছে সত্যিকার মানুষ, আরেকজন গ্রুনো রবোট।

কোনটা গ্রুনো রবোট?

জানি না। লানাকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল, বলল, কোনটা ওরা বলবে না, আমাদের বের করতে হবে।

কেন?

আমরা গ্রুনো রবোটকে বিচারপতি পদে বসানো নিয়ে একটা প্রতিবাদ সভা করেছিলাম, সেটা শুনে কোম্পানি এই দুজন মানুষ পাঠিয়েছে। ওরা আমাদের কাছে প্রমাণ করতে চায় যে, গ্রুনো রবোট হুবহু মানুষের মতো, কোনো পার্থক্য নেই। ওরা দাবি করেছে যে, আমরা কিছুতেই বের করতে পারব না কোনটা মানুষ, কোনটা গ্রুনো রবোট।

পেরেছ?

লানা ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল, না।

বাজিতে হেরে গেলে?

কিন্তু স্যার, আপনি বুঝতে পারছেন আমরা যদি বের করতে না পারি তা হলে কী হবে?

কী হবে?

গ্রুনো রবোট কোম্পানি সব খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশনে খবরটা প্রকাশ করে দেবে। বড় বড় করে বিজ্ঞাপন দেবে যে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ চব্বিশ ঘন্টা চেষ্টা করেও গ্রুনো রবোটের সাথে মানুষের পার্থক্য ধরতে পারে নি। তারপর সত্যি সত্যি বিচারকদের জায়গায় গ্রুনো রবোটকে বসানো হবে।

সমস্যার কথা, কী বল?

লানা আমার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল আমি ঠাট্টা করছি কি না। একটু পর প্রায় মরিয়া হয়ে বলল, আপনি বের করে দেবেন?

আমি?

লানা মাথা নাড়ে, আমরা সারা দিন চেষ্টা করেছি।

পার নি?

না। লজ্জায় মেয়েটির চোখে প্রায় পানি এসে যায়। কাতর গলায় বলল, যতভাবে সম্ভব চেষ্টা করেছি, মানুষের যতরকম অনুভূতি আছে সবগুলো চেষ্টা করে দেখেছি, কোনো লাভ হয় নি। লানা আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, আপনি বের করে দেবেন?

আমার মেয়েটির জন্যে খুব মায়া হল। বাইরে সেটা প্রকাশ না করে উদাস ভঙ্গিতে

AMARBOI.COM

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললাম, যদি সত্যি বের করতে না পার, তাহলে তো স্বীকার করতেই হবে গ্রুনো রবোট সত্যিই মানুষের মতো।

সেটা তো স্বীকার করছিই। মানুষের মতো আর মানুষ দুটি তো এক জিনিস নয়। মানুষের সত্যিকার অনুভূতি থাকবে না, কিন্তু মানুষের বিচার করবে—সেটা তো হতে পারে না। দেবেন বের করে?

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম, বিকেল হয়ে আসছে, সন্ধেবেলা একটা কনসার্টে যাবার কথা, হাতে খুব বেশি সময় নেই। কিন্তু মেয়েটি এত আশা করে এসেছে, তাকে তো নিরাশ করা যায় না। লানার দিকে তাকিয়ে বললাম, ঠিক আছে, ওদের নিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষা কর। আমি না ডাকা পর্যন্ত ভিতরে আসবে না।

লানার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমি নিশ্চিত, অন্য কেউ হলে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরত। আমার মুখের গাম্ভীর্যটি দেখে সাহস করল না। দীর্ঘদিন চেষ্টা করে এই গাম্ভীর্যটি আয়ত্তে এনেছি, সহজে কেউ কাছাকাছি আসতে সাহস করে না।

লানা বের হয়ে যেতেই আমি আমার সেক্রেটারি ট্রীনাকে ডাকলাম। ট্রীনা মধ্যবয়সী হাসিখুশি মহিলা। ভিতরে ঢুকে বলল, কিছু বলবেন স্যার?

তোমার খানিকক্ষণ সময় আছে?

অবশ্যই। সে আমার সামনের খালি চেয়ারটিতে বসে পড়ে বলল, কী করতে হবে?

আমি ষড়যন্ত্রীর মতো গলা নামিয়ে বললাম, লানার ছেলে–বন্ধু জিশানকে তুমি চেন?

ট্রীনা বিস্ময়টুকু সযত্নে গোপন করে বলল, সেরকম চিনি না, সাথে দেখেছি দু’–একবার।

ওর বাবা আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। ছেলেটি যদি বাবার কাছাকাছি হয়, তা হলে খুব হৃদয়বান হওয়ার কথা।

ট্রীনা মাথা নেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি গলার স্বর আরো নামিয়ে বললাম, জিশানের পুরো নাম জিশান লাও। ডাটা বেসে খোঁজ করে দেখ তো, ওর সম্পর্কে কোনো চোখে পড়ার মতো তথ্য পাও কি না। আমার নাম ব্যবহার করে খোঁজ কর, অনেক রকম খোঁজ পাবে তা হলে।

ট্রীনা কিছুক্ষণের মাঝেই একটা কাগজ নিয়ে ঢুকল, আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, জিশানের উপর অনেক বড় ফাইল আছে, আমি শুধু দরকারি জিনিসটা টুকে এনেছি।

আমি একনজর দেখে বললাম, ঠিক আছে ট্রীনা, তুমি লানাকে বলবে ভিতরে আসতে? তার দু’জন সঙ্গীকে নিয়ে।

লানা প্রায় সাথে সাথেই দু’জন মানুষকে নিয়ে ঢুকল। কিছু কিছু মানুষের চেহারা দেখে বয়স বোঝা যায় না, এদের দু’জনেই সেরকম। পরনে মোটামুটি ভদ্র পোশাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মতো খাপছাড়া নয়। একজন আমার দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমার নাম—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, তোমার নাম এক নম্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক নম্বর? লোকটি থতমত খেয়ে বলল, আমার নাম এক নম্বর?

হ্যাঁ, আপাতত তোমার ঠিক নামটি শুনে কাজ নেই। কারণ তুমি যদি গ্রুনো রবোট হয়ে থাক তাহলে সম্ভবত মিথ্যা একটা নাম বলবে। শুধু শুধু মিথ্যাচার করে লাভ কি? তোমাকে ডাকা যাক এক নম্বর।

এক নম্বরের দুই গাল একটু লাল হয়ে ওঠে। রাগ হয়ে কিছু–একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে উষ্ণ স্বরে বলল, আমি গ্রুনো রবোট নই। আমাকে জোর করে পাঠিয়েছে ওর সাথে। সে দ্বিতীয় লোকটিকে দেখিয়ে বলল, ঐ হচ্ছে গ্রুনো রবোট।

দ্বিতীয় লোকটি এবারে একটু মধুর ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করে বলল, আপনার কথা অনেক শুনেছি আমি। পরিচয় হয়ে খুব ভালো লাগল। অবশ্যি ঠিক পরিচয় হল না, কারণ আপনি তো নিশ্চয়ই আমার নামও শুনতে চাইবেন না।

না। আপাতত তোমার নাম হোক দুই নম্বর।

মানুষকে তার নিজের পরিচয় দিতে না দেয়ার মাঝে খানিকটা অপমানের ব্যাপার আছে।

এক নম্বর ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, তোমার সাথে এসেছি বলে আজ আমার এই অপমান।

আমিও তো একই কথা বলতে পারি।

না, পার না, এক নম্বর চোখ লাল করে বলল, তুমি গ্রুনো।

তুমি এত নিশ্চিত হলে কেমন করে যে আমি গ্রুনো?

কারণ আমি জানি আমি গ্রুনো না, আমি মানুষ।

কেমন করে জান? হতে পারে তুমি মিথ্যা বলছ। কিংবা কে জানে আরো ভয়ংকর জিনিস হতে পারে, তুমি ভাবছ তুমি মানুষ, কিন্তু আসলে তুমি গ্রুনো। তুমি নিজেই জান না যে তুমি গ্রুনো।

এক নম্বরকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল, আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, সেটা কি হতে পারে?

কোনটা?

যে, আমি গ্রুনো কিন্তু আমি জানব না?

না। কারণ তুমি যদি গ্রুনো হয়ে থাক, তা হলে তোমার মাথায় মস্তিষ্কের বদলে রয়েছে একটা কপোট্রন। তোমার বুকের মাঝে আছে একটা পারমাণবিক সেল। তোমার কপোট্রন ক্রমাগত হিসেব করছে সেলের ভোল্টেজ, ক্লক ফ্রিকোয়েন্সি, আর তোমাকে সেটা জানাচ্ছে মিলিসেকেণ্ড পরপর। কাজেই তুমি যদি গ্রুনো হয়ে থাক, তা হলে তুমি মিথ্যাবাদী গ্রুনো।

এক নম্বর উষ্ণ স্বরে বলল, আমি গ্রুনো না, আমি মানুষ।

গ্রুনোকে মানুষের মতো করে তৈরি করা হয়েছে, কাজেই তুমি যদি গ্রুনো হয়ে থাক, তুমি মিথ্যা বলবে না আমি সেরকম আশা করছি না।

দু' নম্বর একটু এগিয়ে এসে বলল, গত সংখ্যা বিজ্ঞান সংবর্তে আপনার লেখাটা পড়ে—

তুমি কি গ্রুনো?

দু' নম্বর থতমত খেয়ে গেল। কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, আমি যতদূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি—আমি ক্লোন না। আমার অতীত জীবনের সবকিছু পরিষ্কার মনে আছে, ক্লোন হলে নিশ্চয়ই মনে থাকত না। খুব ছেলেবেলায় দোলনা থেকে পড়ে গিয়ে একবার হাঁটু কেটে গেল, সেটাও মনে আছে। সত্যি কথা বলতে, কাটা দাগটা এখনো আছে। দেখবেন?

আমি কিছু বলার আগেই এক নম্বর বলল, দেখাও দেখি।

দু' নম্বর প্যান্ট হাঁটুর উপর টেনে তুলে একটা কাটা দাগ দেখাল।

এক নম্বর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাটা দাগটা খানিকক্ষণ দেখে বলল, জালিয়াতি, পুরো জালিয়াতি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কেমিক্যাল এচিং।

দু' নম্বর গম্ভীর গলায় এক নম্বরকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি শৈশবের কথা মনে আছে?

অবশ্যই মনে আছে।

কত শৈশব?

অনেক শৈশব।

দু' নম্বর মাথা নেড়ে বলল, কিছু আসে-যায় না। আমি কোনোভাবে জানতে পারব না তুমি সত্যি কথা বলছ, না মিথ্যা কথা বলছ।

আমি মিথ্যা বলি না।

সেটাও কোনোদিন প্রমাণ করা যাবে না। দু' নম্বর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝলেন স্যার, আজ সারাটি দিন খুব অপমানের মাঝে কেটেছে। আমাকে দেখলেই বুঝবেন, জীবিকার জন্যে মানুষকে কী না করতে হয়! আমার সম্পর্কে এক চাচার কাজ ছিল একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গলদা চিংড়ি সেজে দাঁড়িয়ে থাকা। কী অপমান।

AMARBOI.COM

লানা আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, স্যার, কিছু বুঝতে পারলেন? আমার মনে হয় দু' নম্বর, কী বলেন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, এখনো জানি না।

তা হলে?

তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

কী কাজ?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, তুমি তোমার অফিসে গিয়ে বস। আমি এখান থেকে দু'জনকে পাঠাব। তুমি তাদের সাথে হালকা কোনো জিনিস নিয়ে কথা বলবে। হাসির কোনো গল্প। বেশিক্ষণ নয়, ঘড়ি ধরে দুই মিনিট।

ঠিক আছে।

আর শোন, ঘরের বাতিগুলো কমিয়ে দেবে, যেন তোমাকে ভালো করে দেখতে না পারে।

বেশ।

ওদের বসাবে তোমার খুব কাছাকাছি। একটা টেবিলের এপাশে আর ওপাশে।

ঠিক আছে স্যার।

লানা চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে ফেরালাম। হঠাৎ মনে পড়েছে এরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভঙ্গি করে বললাম, তুমি তো রাজনীতি সমাজনীতি এরকম অনেক কাজকর্ম কর, কয়দিন থেকে ভাবছি তোমাকে একটা জিনিস বলব।

কী জিনিস?

পরে বলল, আমাকে মনে করিয়ে দিও।

দেব স্যার।

আর এই কাগজটা রাখ, কাউকে দেখাবে না। কয়দিন থেকে তোমাকে দেব ভাবছি, মনে থাকে না।

লানা কাগজটি নিয়ে বের হয়ে প্রায় সাথে সাথে ফিরে এল। আমি জানতাম আসবে, কারণ এখানে যে-ছয়জনের নাম লেখা হচ্ছে, তার একজন হচ্ছে জিশান লাও। শুধু তাই নয়, উপরে লেখা আছে 'পুলিশের গুপ্তচর'। লানা পাংশু মুখে জিজ্ঞেস করল, এখানে কাদের নাম?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, তোমরা যারা রাজনীতি কর, তাদের পিছনে সরকার থেকে গুপ্তচর লাগানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ভান করে এরা তোমাদের ভিতর থেকে খবর বের করার চেষ্টা করবে। পুলিশের টিকটিকি। এদের থেকে সাবধান।

লানার মুখ মুহূর্তে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায়। কিছু-একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মুখ ঘুরিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে চলে যেতে থাকে। এরকম প্রাণবন্ত একটি মেয়েকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখা খুব কষ্টকর। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না।

আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে এক নম্বর এবং দু' নম্বরকে বললাম, তোমরা দু' জন এখন করিডোরের শেষ ঘরটিতে যাবে। সেখানে লানা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সে তোমাদের সাথে কিছু-একটা কথা বলবে, সেটা শুনে আমার কাছে এস। ঠিক আছে?

দু' জনে মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

যাও।

দু'জনেই বের হয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের মাঝেই দু' জনে ফিরে এল। দু'জনেরই হাসি-হাসি মুখ—এক নম্বরের মনে হল একটু বেশি হাসিমুখ।

জিজ্ঞেস করলাম, লানার সাথে কথা হল?

হ্যাঁ, হয়েছে। এক নম্বর দাঁত বের করে হেসে বলল, মেয়েটার যাকে বলে একেবারে তীক্ষ্ন রসিকতাবোধ। এমন হাসির একটা গল্প বলেছে, কী বলব! একজন লোক টুথব্রাশ বিক্রি করে। দেখা গেল তার মতো আর কেউ—

দু' নম্বর বাধা দিয়ে বলল, আমার মনে হয় না স্যার এখন তোমার মুখ থেকে গল্পটা শুনতে চাইছেন।

না, আমি মানে—এক নম্বর আমতা-আমতা করে থেমে গেল। আমি টেবিলের উপর থেকে দরকারি কিছু কাগজপত্র আমার হাতব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে বললাম, লানার মনের অবস্থা কেমন দেখলে?

মনের অবস্থা?

হ্যাঁ। মনের অবস্থা কেমন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক নম্বর একটু অবাক হয়ে বলল, মনের অবস্থা আবার কেমন হবে? ভালো। এত হাসির একটা গল্প বলল—এক নম্বর আবার দাঁত বের করে হাসা শুরু করে।

দু' নম্বর মাথা নেড়ে বলল, সত্যি কথা বলতে কি স্যার, আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন, আমি বলি, আমার কেন জানি মনে হল মেয়েটার মন খারাপ।

মন খারাপ? এক নম্বর অবাক হয়ে বলল, মন খারাপ হবে কেন? কী দেখে তোমার মনে হল মন খারাপ?

দু' নম্বর মাথা চুলকে বলল, ঠিক জানি না, কিন্তু মনে হল—

এক নম্বর বাধা দিয়ে বলল, অন্ধকারে বসেছিল, ভালো করে দেখা পর্যন্ত যাচ্ছিল না, আর তোমার মনে হল মন খারাপ?

দু' নম্বর একটু থতমত খেয়ে বলল, ইয়ে, ঠিক জানি না কেন মনে হল। আমি অবশ্যি একেবারে নিশ্চিত না। হতে পারে ভুল মনে হয়েছে।

আমি দু' নম্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, না, তোমার ভুল মনে হয় নি, তুমি ঠিকই ধরেছ। লানার আসলেই মন খারাপ।

এক নম্বরের মুখ হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, আমার দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকাল সে। আমি আস্তে আস্তে বললাম, এক নম্বর, তুমি একজন গ্রুনো।

আ–আমি, আমি?

হ্যাঁ, তুমি। তাই তুমি ধরতে পার নি লানার মন খারাপ। একজন মানুষের যদি খুব মন খারাপ হয়, তার সাথে কোনো কথা না বলেও তার কাছাকাছি এসেই সেটা ধরে ফেলা যায়। এটা পরীক্ষিত সত্য। মানুষেরা ধরতে পারে। যন্ত্র পারে না।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে এক নম্বরের ডান কানের নিচে হাত দিয়ে সুইচটা খুঁজে বের করে তার সার্কিট কেটে দিলাম। দেখতে দেখতে তার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেল, মুখ দিয়ে অর্থহীন শব্দ করতে করতে এক নম্বর স্থির হয়ে গেল। শরীরে আর কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই।

আমি দু' নম্বরকে বললাম, জিনিসটাকে নিচে শুইয়ে রাখ। হঠাৎ করে কারো উপর পড়ে গিয়ে একটা ঝামেলা করবে।

দু' নম্বর বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমতা–আমতাভাবে বলল, কেমন করে শোওয়াব?

আমি এগিয়ে গিয়ে বুকে একটা ছোট ধাক্কা দিয়ে বললাম, এভাবে।

গ্রুনো রবোটটি প্রচণ্ড শব্দ করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল। এক নম্বর দীর্ঘদিনের অভ্যাসের কারণে তাকে একবার ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো লাভ হল না। রবোটটি ভালো তৈরি করেছে, এভাবে আছড়ে পড়েও শরীরের কোনো অংশ ভেঙে আলাদা হয়ে গেল না।

আমি টেবিল থেকে আমার ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বাসায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। দুই নম্বর কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আপনাকে যে আমি কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস করেন, নিজের উপর সন্দেহ এসে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমি কি সত্যিই মানুষ?

অবশ্যি তুমি মানুষ। তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুব ভালো লাগল। আমি আন্তরিকভাবে তার সাথে হাত মিলিয়ে বললাম, এখন তোমার নামটা আমি শুনতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারি।

মিকালো—আমার নাম শিন মিকালো।

শিন মিকালো, তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুব ভালো লাগল।

ঠিক এ-সময় লানা দরজায় এসে দাঁড়ায়। মিকালো তাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। উচ্চস্বরে বলল, স্যার বের করে ফেলেছেন গ্রুনোকে।

লানা মেঝেতে পড়ে থাকা গ্রুনোকে একনজর দেখে বলল, কেমন করে বের করলেন?

সহজ, একেবারে সহজ। মিকালো এক হাতের উপর অন্য হাত দিয়ে তালি দিয়ে বলল, একেবারে পানির মতো সহজ। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, লানার মনের অবস্থা কেমন? আমি বললাম, মন খারাপ, গ্রুনো বলল, না—

লানা চমকে উঠে আমার দিকে তাকায়। আমি কথোপকথনটি না শোনার ভান করে বললাম, লানা, তোমাকে একটা কাগজ দিয়েছিলাম খানিকক্ষণ আগে?

লানা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, কেন? কী হয়েছে?

তোমাকে ভুল কাগজটা দিয়েছি। আমি তাকে আরেকটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এটা হচ্ছে সেই কাগজ। আগেরটা ফেলে দিও।

আগেরটা ভুল?

হ্যাঁ, ভুল।

এটা ঠিক?

হাঁ, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে আমার এক ছাত্র কাজ করে, সে মাঝে মাঝে এসব গোপন খবর দিয়ে যায়।

লানা একনজর কাগজটা দেখে বলল, তা হলে আগে যে-কাগজটা দিয়েছিলেন সেটা কি?

ওটা—ওটা অন্য জিনিস।

কী জিনিস?

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর কিছু মৌলিক লেখা বই হিসেবে বের করবে, তাদের নাম। আমার এক বন্ধুর ছেলের নামও আছে, জিশান লাও। খুব ভালো ছেলে—

লানার মুখ থেকে গাঢ় বিষাদের ছায়া সরে গিয়ে সেখানে স্বচ্ছ একটা আনন্দের হাসি ঝলমল করে ওঠে। আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বলল, আপনি ইচ্ছে করে আমাকে ভুল কাগজটা দিয়েছিলেন। ইচ্ছে করে। তাই না?

আমি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম, গ্রুনো কোম্পানি কি তাদের রবোটটা নিয়ে তোমাদের সাথে কোনোরকম চুক্তি সই করেছে?

না।

কোনোরকম চুক্তি সই করে নি?

না। কিছু না।

তা হলে একটা কাজ কর। ওটার কপোট্রনটা খুলে সিস্টেমটা বের করে নাও। সেটা কপি করে তোমাদের বন্ধুবান্ধব পরিচিত মানুষজনকে বিলিয়ে দিও। ঘরে ঘরে সবার কাছে যদি একটা করে সিস্টেম-৯-এর কপি থাকে, তা হলে গ্রুনো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোম্পানিকে পুরো সিরিজটা বাতিল করে দিতে হবে। ভবিষ্যতে আর এ ধরনের মামদোবাজি করবে না।

কপোট্রন কেমন করে খোলে?

স্ক্রু–ড্রাইভার দিয়ে কপালের মাঝে জোরে আড়াআড়িভাবে চাপ দাও, খুলে যাবে। দাঁড়াও, আমি খুলে দিচ্ছি—

আমি একটা স্ক্রু–ড্রাইভার বের করে কপালে চাপ দিয়ে রবোটটার মাথাটা খুলে আনলাম।

গ্রুনো রবোটটি মাথা খোলা অবস্থায় ঘোলাটে চোখে বিসদৃশ ভঙ্গিতে মেঝের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে রইল।

অনিশ্চিত জগৎ

ঘুম থেকে উঠে খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকেন বৃদ্ধ রাউখ। কয়দিন থেকে তাঁর একটা আশ্চর্য অনুভূতি হচ্ছে। সব সময়েই মনে হয় কেউ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। এত বাস্তব অনুভূতি যে রাউখ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক না দেখে পারলেন না।

কী দেখছেন প্রফেসর রাউখ?

প্রফেসর রাউখের ছোট কম্পিউটারটি মিষ্টি স্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, কয়দিন থেকে দেখছি আপনি হঠাৎ হঠাৎ করে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক–সেদিক দেখছেন। কী দেখছেন?

নাহ্, কিছু না।

বলুন না কী হয়েছে। কম্পিউটারটি অনুযোগের সুরে বলল, আপনি তো আমার কাছে কখনো কিছু গোপন করেন না।

বৃদ্ধ রাউখ মাথা চুলকে বললেন, ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাতে পারলে বলতাম, কিন্তু তুমি ঠিক বুঝবে না। জিনিসটা নেহায়েত মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। মানুষ লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনের ফল, তাদের রক্তে কিছু কিছু আশ্চর্য জিনিস রয়ে গেছে, যার জন্যে মাঝে মাঝে তারা এমন কিছু অনুভব করে, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

যেমন?

যেমন—প্রফেসর রাউখ একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, যেমন কয়দিন থেকে মনে হচ্ছে সব সময় আমার দিকে যেন কেউ তাকিয়ে আছে।

প্রফেসর রাউখের কম্পিউটারটি, যাকে তিনি শখ করে ট্রিনিটি বলে ডাকেন, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আশ্চর্য!

হ্যাঁ, আশ্চর্য।

ভারি আশ্চর্য।

হ্যাঁ, কিন্তু এটা নিয়ে তোমার ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই। আমরা মানুষেরা অনেক ধরনের পরস্পরবিরোধী জটিল জিনিস নিয়ে বেঁচে থাকি।

তা ঠিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, ব্যাপারটা আসলে তত খারাপ নয়—তুমি যত খারাপ মনে কর তত খারাপ নয়। যাই হোক, নতুন কোনো খবর আছে?

টিনিটি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, তেমন কিছু নয়।

প্রফেসর রাউখ হাসার চেষ্টা করে বললেন, তার মানে খারাপ খবর। কী হয়েছে বলে ফেল।

আপনার মাসিক ভাতা কমিয়ে অর্ধেক করে দেয়া হয়েছে।

প্রফেসর রাউখ ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি প্রথম সারির গণিতবিদ, তিনি চাইলে তাঁর নামে পৃথিবীতে দু'টি ইন্সটিটিউট থাকত, প্রতিপ্রকর্ষ বলের উপর লেখা চমকপ্রদ সমীকরণটি তাঁর চিন্তাপ্রসূত, তাঁর সহকর্মী সেটিকে নিজের বলে ঘোষণা করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। অথচ তিনি অর্থাভাবে শহরের পুরাতন ঘিঞ্জি এলাকায় ছোট একটি ঘর ভাড়া করে দুস্থ শ্রমিকদের মতো কৌটার খাবার খেয়ে বেঁচে থাকেন। তাঁর সেরকম কোনো বন্ধু নেই, স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে নিঃসঙ্গ। টিনিটির সাহচর্যের বাইরে তাঁর কোনো জগৎ নেই। তাঁর প্রয়োজন অতি অল্প, অথচ সেখানেও আবার হাত বসানো হল।

প্রফেসর রাউখ।

বল।

আপনি গ্যালাক্টিক হাইপারডাইভের উপর কাজটা করতে রাজি হয়ে যান।

প্রফেসর রাউখ মাথা নেড়ে বললেন, তা হয় না টিনিটি। নিজের শখের কাজ করি বলে মনে হয় বেঁচে থাকা কত আনন্দের। যদি যুদ্ধ-কৌশলের উপর কাজ করি, তাহলে কি কখনো মনে হবে বেঁচে থাকা আনন্দের?

কিন্তু অন্য অনেকে তো করছে।

করুক। যদি সবাইও করে, তবু আমি করব না। জীবন বড় ছোট, সেটা নিয়ে ছেলেখেলা করতে হয় না।

টিনিটি প্রফেসর রাউখের প্রাতঃকালীন খাবারের আয়োজন করতে বের হয়ে গেল। প্রফেসর রাউখ চুপচাপ বিছানায় বসে রইলেন, তাঁর আবার মনে হতে থাকে, কেউ-একজন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি মাথা ঘুরিয়ে তাকান, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চারদিকে দেখেন। কেউ নেই, কিন্তু কী আশ্চর্য, তাঁর তবু মনে হতে থাকে কেউ-একজন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, বিষণ্ণ দৃষ্টি, কাতর মুখ! কিছু-একটা বলতে চায় মিনতি করে। মন খারাপ হয়ে যায় প্রফেসর রাউখের।

একটু বেলা হয়ে এলে প্রফেসর রাউখ কাজ করতে বসেন। অভ্যেসমতো প্রথম ঘন্টাদুয়েক পড়াশোনা করে নেন। পৃথিবীর যাবতীয় গাণিতিক জার্নালের সারাংশ তাঁর কাছে পাঠানো হয়। এটি খরচসাপেক্ষ ব্যাপার, দুঃসহ অর্থাভাবের মাঝেও তিনি সেটা বন্ধ করেন নি। নূতন নূতন কাজকর্ম কী হচ্ছে, তার উপর চোখ বুলিয়ে নিজের পছন্দসই বিষয়গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। প্রতিভাবান নূতন কোনো গণিতবিদ বের হয়েছে কী না তিনি লক্ষ রাখেন। কমবয়সী ক্ষ্যাপা গোছের একজন গণিতবিদ হঠাৎ করে গণিতের জগতে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেবে, এ-ধরনের একটা ছেলেমানুষি চিন্তা প্রায়ই তাঁর মাথায় খেলা করে।

প্রতিজগতের উপর প্রফেসর রাউখ অনেক দিন থেকে কাজ করছেন, সমস্যাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জটিল এবং প্রতিবার তিনি এক জায়গায় এসে আটকে যাচ্ছেন। যে–ব্যাপারটি নিয়ে সমস্যা, সেটি একটি ছোট গাণিতিক সমস্যা, যার কোনো সমাধান নেই বলে বিশ্বাস করা হয়। এরকম পরিবেশে সাধারণত সমস্যাটা এড়িয়ে একটি সমাধান ধরে নিয়ে কাজ শেষ করা হয়। প্রফেসর রাউখ খাঁটি গণিতবিদ, তিনি কোনো কিছু এড়িয়ে যাওয়া পছন্দ করেন না, তাই গত পনের বছর থেকে তিনি এই ছোট, গুরুত্বহীন, কিন্তু প্রায় অসম্ভব সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁর বর্তমান অর্থাভাবের সেটি একটি বড় কারণ।

প্রফেসর রাউখ কাগজ–কলম নিয়ে বসলেন। সমীকরণটি প্রায় কয়েক হাজার বার নানাভাবে লিখেছেন, আজকেও গোটাগোটা হাতে লিখলেন। নিরীহ এই সমীকরণটি যে কত ভয়ংকর জটিল হতে পারে, কে বলবে? প্রফেসর রাউখ সমীকরণটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, হঠাৎ তাঁর মনে হল, আজ হয়তো তার সমাধান বের করে ফেলবেন। কেন এরকম মনে হল তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না।

গত কয়েকদিন থেকে তাঁর মাথায় একটা নূতন জিনিস খেলছে, সেটা আজ ব্যবহার করে দেখবেন। ঠিক কী ভাবে ব্যবহার করবেন এখনো জানেন না। নানারকম সম্ভাবনা রয়েছে, সবগুলো চেষ্টা করে দেখতে একটা জীবন পার হয়ে যেতে পারে— তাই খুব ভেবেচিন্তে অগ্রসর হতে হবে। প্রফেসর রাউখ অন্যমনস্কভাবে কলমটি ধরে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

ট্রিনিটি দুপুরবেলা প্রফেসর রাউখকে একগ্লাস দুধ দিয়ে গেল। বিকেলে এসে দেখল, তিনি সেই দুধ স্পর্শও করেন নি। প্রফেসর রাউখ ক্ষুধা–তৃষ্ণা সহ্য করতে পারেন না, তাঁর জন্যে সারাদিন অভুক্ত থাকা একটা গুরুতর ব্যাপার। ট্রিনিটি তাঁকে বিরক্ত করল না, কম্পিউটারের স্বল্পবুদ্ধিতে এই বৃদ্ধ লোকটিকে পুরোপুরি অনুভব করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে, এরকম অবস্থায় প্রফেসর রাউখকে একা একা কাজ করতে দিতে হয়।

www.amarboi.com

প্রফেসর রাউখ যখন তাঁর টেবিল ছেড়ে উঠলেন তখন গভীর রাত, প্রচণ্ড ক্ষুধায় তাঁর হাত কাঁপছে। কিন্তু তাঁর মাথা আশ্চর্যরকম হালকা। তিনি বাথরুমে গিয়ে মুখে–চোখে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ট্রিনিটি হালকা স্বরে ডাকল, প্রফেসর রাউখ।

বল।

আপনি সত্যি তা হলে সমাধান করেছেন?

হ্যাঁ ট্রিনিটি।

আমার অভিনন্দন প্রফেসর রাউখ।

অনেক ধন্যবাদ।

আমি জানতাম আপনি এটা সমাধান করতে পারবেন।

কেমন করে জানতে?

কারণ আপনি হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ।

প্রফেসর রাউখ শব্দ করে হাসলেন। ট্রিনিটি বলল, এটি করতে আপনার সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে।

জানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যাটি কি সত্যিই এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

যে–জিনিস আমরা জানি না সেটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না, সে হিসেবে এটার কোনো গুরুত্ব ছিল না, কিন্তু এখন এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সত্যি?

হ্যাঁ।

আপনি নূতন কিছু শিখলেন প্রফেসর রাউখ?

শিখেছি।

কী?

বললে তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না।

করব, আপনি বলুন, আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করি।

শোন তা হলে, না বুঝলে প্রশ্ন করবে।

করব।

প্রফেসর রাউখ টিনিটিকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, আমাদের পরিচিত জগৎ হচ্ছে ত্রিমাত্রিক জগৎ, সময়টাকে চতুর্থ মাত্রা হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু সত্যিই কি আমাদের জগৎ চার মাত্রার? এমন কি হতে পারে, যে, জগৎটি আটমাত্রার এবং আমরা শুধুমাত্র চারটি মাত্রা দেখছি এবং বাকি চারটি মাত্রা দেখছি না? ঠিক সেরকম আরেকটি জগৎ রয়েছে, যেখানকার অধিবাসীরা শুধু তাদের চারটি মাত্রা দেখছে এবং আমাদের চারটি মাত্রা দেখছে না? তা হলে একই সাথে থাকবে দুটি জগৎ, একটি আমরা দেখতে পাব, আরেকটি পাব না।

প্রফেসর রাউখ অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ সবই ছিল কল্পনার ব্যাপার। সেটার বাস্তব সম্ভাবনা প্রমাণ করা যায় শুধুমাত্র অঙ্ক কষে। আমি অনেক দিন থেকে এর ওপরে কাজ করছিলাম, আজ আমি সেটার সমাধান বের করেছি। কী দেখেছি জান?

AMARBOI.COM

কী?

দেখেছি, আমাদের জগতের বাইরে আরেকটি চতুর্মাত্রিক জগৎ রয়েছে। সেই জগৎ একই সাথে আমাদের পাশাপাশি বেঁচে রয়েছে। সম্ভবত সময়ের মাত্রা দু'টি জগতেই এক, সে–অংশটুকু এখনো বের করা হয় নি।

টিনিটি জিজ্ঞেস করল, সেখানে গ্রহ–নক্ষত্র আছে? সেখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে?

এসব হচ্ছে খুটিনাটি ব্যাপার। কারো পক্ষে বলা খুব কঠিন, কিন্তু তা খুবই সম্ভব।

পৃথিবীর মানুষ সেই জগতের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে?

প্রফেসর রাউখের মুখ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে ওঠে। মাথা নেড়ে বললেন, মনে হয় পারবে না। আমার হিসেব যদি ভুল না হয়, তা হলে সেটার চেষ্টা করা হবে খুব ভয়ানক বিপদের কাজ।

কেন?

কারণটি খুব সহজ। আমাদের জগৎ আর সেই জগতের মাঝে শক্তির একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। আমরা সেটা অনুভব করি না, সেই জগতেও সেটা অনুভব করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কোনোভাবে যদি দুই জগতের মাঝে একটা যোগাযোগ করে দেয়া যায়, তা হলে যে-জগতের শক্তি বেশি সেখানকার বাড়তি শক্তি পুরো জগৎটাকে ঠেলে অন্য জগতে পাঠিয়ে দেবে।

মানে? ট্রিনিটি বোঝার চেষ্টা করে, আপনি বলছেন, কেউ যদি যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, হঠাৎ করে এখানে সম্পূর্ণ একটা নূতন জগৎ নূতন গ্রহ-নক্ষত্র হাজির হয়ে যেতে পারে?

প্রফেসর রাউখ অল্প মাথা নেড়ে বললেন, অনেকটা সেরকম। কিন্তু সেই ব্যাপারটা হয়তো তত খারাপ নয়, খারাপ হচ্ছে পদ্ধতিটা। যখন পুরো জগৎ একটি ছোট গর্ত দিয়ে বের হয়ে আসতে থাকবে—চিন্তা করতে পার, কী ভয়ানক বিপর্যয়?

তার মানে আপনি বলছেন, যে-জগৎটার শক্তি বেশি, সেটার ভয় বেশি, যে-কোনো মুহূর্তে সেটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে?

কথাটা খানিকটা সত্যি। দুটি জগৎ রয়েছে এখানে, একটা নিশ্চিত জগৎ, আরেকটা অনিশ্চিত জগৎ। যেটা অনিশ্চিত, সেটা যে-কোনো মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

আমাদের জগৎ কোনটি? যেটি নিশ্চিত সেটি, নাকি যেটি অনিশ্চিত, সেটি?

জানি না। সত্যি কথা বলতে কি, সেটা কোনোদিন জানা সম্ভব হবে কি না সেটাও আমি জানি না। কেউ যদি ছোট একটা পরীক্ষা করে বের করতে চায়, অনিশ্চিত জগৎটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

কী ভয়ানক।

হ্যাঁ, ভয়ানক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক কোনায় একটি ছোট ফুটো করে অন্য জগৎটিকে টেনে নিয়ে এসে ধ্বংস করে দেয়া যায়।

কী ভয়ানক! ট্রিনিটির যান্ত্রিক মস্তিষ্কের পুরো ব্যাপারটি অনুভব করতেও রীতিমতো কষ্ট হয়।

AMARBOI.COM

প্রফেসর রাউখ বিছানায় শুয়ে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিতেই আবার সেই আশ্চর্য অনুভূতিটি হল, মনে হল কেউ যেন তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে আছে। তিনি অস্বস্তিতে মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকালেন, কোথাও কেউ নেই, কিন্তু কী বাস্তব অনুভূতি! নিজেকে শান্ত করে কোনোভাবে ঘুমানোর চেষ্টা করেন। মাথার কাছে একটা শিরা দপদপ করছে, সহজে ঘুম আসতে চায় না। কী সাংঘাতিক একটা জিনিস তিনি বের করেছেন, কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ কেউ নেই, যার কাছে এটা নিয়ে গল্প করতে পারেন! আহা—আজ যদি তাঁর স্ত্রী বেঁচে থাকত! সুদীর্ঘ কুড়ি বছর আগে মৃত স্ত্রীর কথা স্মরণ করে তিনি একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভোররাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল প্রফেসর রাউখের। কিছু-একটা হয়েছে কোথাও। তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না কি। চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন তিনি, ঘরে নীল একটা আলো, কোথা থেকে আসছে এটি?

চোখ মেলে তাকালেন তিনি, তাঁর সামনে ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় মেঝে থেকে খানিকটা উপরে চতুষ্কোণ একটা জায়গা থেকে হালকা নীল রঙের একটা আলো বের হচ্ছে, ভালো করে না তাকালে দেখা যায় না।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন প্রফেসর রাউখ। খুব ধীরে ধীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোটি উজ্জ্বল হতে থাকে। আস্তে আস্তে সেখানে একজোড়া চোখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ন, সেই বিষণ্ন চোখে একদৃষ্টিতে চোখ দুটি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রফেসর রাউখ কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখেন, আজীবন গণিতের সাধনা করে এসেছেন, যুক্তিতর্ক ছাড়া কিছু বিশ্বাস করেন না। নিজেকে বোঝালেন, আমি ভুল দেখছি, সারা দিন পরিশ্রম করে আমার রক্তচাপ বেড়ে গেছে, তাই চোখে বিভ্রম দেখছি। বিশ্রাম নিলে সেরে যাবে। আমি এখন চোখ বন্ধ করব, একটু পর যখন চোখ খুলব, তখন দেখব কোথাও কিছু নেই।

প্রফেসর রাউখ চোখ বন্ধ করে কয়েকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস নিলেন, তারপর ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। চোখ খুলে দেখলেন নীলাভ চতুষ্কোণ অংশটুকু এখনো আছে, চোখ দুটি এখনো একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু তাই নয়, তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটিতে এবার পলক পড়ল, প্রফেসর রাউখ নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখলেন, নীলাভ অংশটুকু ধীরে ধীরে আরো বড় হয়ে উঠছে, চোখ দুটির সাথে সাথে আস্তে আস্তে—মুখের আরো খানিকটা দেখা যাচ্ছে—একজন বিষণ্ন মানুষের চেহারা। করুণ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রফেসর রাউখ বিছানায় উঠে বসেন, সাথে সাথে নীলাভ চতুষ্কোণের চোখ দুটিতে ভীতি ফুটে ওঠে। তাঁর কিছু-একটা বলার চেষ্টা করে—তিনি বুঝতে পারেন না সেটি কি। প্রফেসর রাউখ বিছানা থেকে নেমে আসেন, সাথে সাথে চোখ দুটি আতঙ্কে স্থির হয়ে যায়, যন্ত্রণাকাতর একটি মুখ আবার তাঁকে কিছু-একটা বলতে চেষ্টা করে। প্রফেসর রাউখ এক মুহূর্ত দ্বিধা করে এক পা এগিয়ে যান, সাথে সাথে পুরো নীলাভ অংশটুকু দপ করে নিভে গেল।

প্রফেসর রাউখ বাতি জ্বালালেন, যেখানে চোখ দুটি ছিল সে-জায়গাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। কোথাও কিছু নেই—তাঁর কেন জানি একটু ভয়-ভয় করতে থাকে। কেন এরকম অস্বাভাবিক জিনিস তিনি দেখলেন? প্রফেসর রাউখ ঘর থেকে বের হয়ে ডাকলেন, ট্রিনিটি।

ট্রিনিটি কোনো সাড়া দিল না, তখন তাঁর মনে পড়ল, খরচ বাঁচানোর জন্য আজকাল রাতে তাকে সুইচ বন্ধ করে রাখা হয়। তাকে জাগাবেন কী না কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বাইরে এসে বসলেন। পুরো ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করলেন আবার। যেদিন থেকে গাণিতিক সমস্যাটার সঠিক সমাধানটি তাঁর মাথায় এসেছে, সেদিন থেকে তাঁর মনে হচ্ছে কেউ-একজন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। একটু আগে দেখলেন, সত্যি কেউ-একজন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সত্যি দেখেছেন তিনি, নাকি চোখের বিভ্রম; সত্যি তো হতে পারে না, কিন্তু চোখের বিভ্রম কেন হবে? বয়স হয়েছে তাঁর, কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কে তো এখনো কৈশোরের সজীবতা।

বৃদ্ধ প্রফেসর রাউখ বসে বসে ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখলেন, অকারণে তাঁর মন খারাপ হয়ে রইল।

প্রাতঃরাশ করার সময় ট্রিনিটি প্রফেসর রাউখকে জানাল যে, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান আকাদেমি থেকে তাঁকে নেয়ার জন্যে গাড়ি পাঠানো হয়েছে। এক ঘন্টার ভিতর তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে হবে। শুনে প্রফেসর রাউখ একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, তাঁর সাথে বিজ্ঞান আকাদেমির কোনো যোগাযোগ নেই প্রায় দুই দশক।

প্রফেসর রাউখের হতচকিত ভাব দেখে টিনিটি বলল, গতকাল আপনি যে-সমস্যাটি সমাধান করেছেন, সম্ভবত সেটি বিজ্ঞান আকাদেমিকে অভিভূত করেছে।

প্রফেসর রাউখ চিন্তিত মুখে বললেন, তুমি ওদের জানিয়ে দিয়েছ?

না, আমি বিজ্ঞান আকাদেমিকে জানাই নি, কিন্তু গণিত জার্নালে একটা ছোট সারাংশ পাঠিয়েছি। সেটা তো আমি সব সময়েই পাঠাই। আপনি তো তাই বলে রেখেছেন।

হ্যাঁ, প্রফেসর রাউখ মাথা নাড়লেন, আমার ভুল হয়েছে। এই ব্যাপারটা আরো কিছুদিন গোপন রাখা উচিত ছিল, তোমাকে আমার বলে দেয়া উচিত ছিল।

আমি দুঃখিত প্রফেসর রাউখ। টিনিটি তার গলার স্বরে শঙ্কা ফুটিয়ে বলল, আমি খুবই দুঃখিত। আপনার কি কোনো সমস্যা হবে?

জানি না। আমি বিজ্ঞান আকাদেমিকে পছন্দ করি না। তারা সবসময় জোর করার চেষ্টা করে। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পছন্দ করি।

টিনিটি ক্ষুণ্ন স্বরে বলল, আমি দুঃখিত প্রফেসর রাউখ।

তোমার দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই টিনিটি। প্রফেসর রাউখ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, গতকাল আমি যেসব কাজ করেছি, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারবে?

সর্বনাশ! কী বলছেন! এত দিনের কাজ—

ভয় পেয়ো না, প্রফেসর রাউখ মাথায় টোকা দিয়ে বললেন, সব এখানে রয়ে গেছে। যখন প্রয়োজন হবে, কাগজে আবার বের করে নিতে এবারে কোনো সময় লাগবে না।

AMARBOI.COM

সাদা একটা হলঘরে বসে আছেন প্রফেসর রাউখ। যদিও বিজ্ঞান আকাদেমির গাড়িতে চেপে তিনি এসেছেন, তাঁকে কিন্তু বিজ্ঞান আকাদেমির ভবনে না এনে সরকারি একটা ভবনে আনা হয়েছে। ভবনটি অত্যন্ত সুরক্ষিত, এখানে নানা ধরনের প্রহরা, ব্যাপারটি দেখে তাঁর মনে কেমন জানি একটা খটকা লাগতে থাকে।

আসবাবপত্রহীন শূন্য ঘরটিতে দীর্ঘ সময় একা একা বসে থাকার পর হঠাৎ করে কয়েকজন লোক প্রবেশ করে, কাউকেই তিনি চেনেন না। একজনকে মনে হল আগে কোথায় জানি দেখেছেন। কিন্তু কোথায় দেখেছেন ঠিক মনে করতে পারলেন না।

লোকগুলো তাঁকে ঘিরে বসে পড়ে। চেনা চেনা লোকটি খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে মুখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি?

না। মনে হচ্ছে কোথায় দেখেছি, কিন্তু—

ভারি আশ্চর্য। আমি এদেশের রাষ্ট্রপতি রিবেনী।

প্রফেসর রাউখ চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলেন। এই ভণ্ড প্রতারক লোকটির অসংখ্য নিষ্ঠুরতার গল্প প্রচলিত রয়েছে। ঢোক গিলে শুকনো গলায় বললেন, আমি দুঃখিত। আমি—

রাষ্ট্রপতি রিবেনী হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমার কাছে খবর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে, আপনি নাকি একটি অস্বাভাবিক আবিষ্কার করেছেন। শুনে খুশি হবেন, আপনার কাজ শেষ করার জন্য এই মুহূর্তে সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের নিয়ে একটা ইন্সটিটিউট খোলা হচ্ছে। আপনার নামে সেই ইন্সটিটিউটটি উৎসর্গ করা হবে।

একটি দেশের রাষ্ট্রপতির সাথে কী ভাবে কথা বলতে হয় প্রফেসর রাউখের জানা নেই। তাই বাধা দেয়ার প্রবল ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও তিনি কাঠ হয়ে বসে রইলেন।

রাষ্ট্রপ্রতি রিবেনী মুখের ধূর্ত হাসিটি বিস্তৃত করে বললেন, আপনার কাজটুকু শেষ করুন। আপনার কী লাগবে আমাদের জানান। যত বড় কম্পিউটার চান, যতজন গণিতবিদ চান, শুধু মুখ ফুটে বলবেন।

প্রফেসর রাউখ শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে বললেন, আমার কাজ তো কিছু বাকি নেই, যে–জায়গাটাতে আটকে ছিলাম, গতরাতে শেষ হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি রিবেনীর চোখ এক মুহূর্তের জন্যে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু সেটা এক মুহূর্তের জন্যেই। মুখে জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে বললেন, না, আপনার কাজ শেষ হয় নি। আপনার এখনো দুটি জিনিস বের করতে হবে। এক, আমাদের জগৎটি নিশ্চিত না অনিশ্চিত। দুই, নিশ্চিত এবং অনিশ্চিত জগতের মাঝে যোগাযোগ কেমন করে করা যাবে।

কিন্তু সেটা তো ভয়ানক বিপজ্জনক। ভয়ানক—

রিবেনী ধূর্ত চোখে তাকিয়ে বললেন, সেটাই তো সবচেয়ে বড় কথা। আমরা যদি নিশ্চিত জগতের অধিবাসী হই, তা হলে অনিশ্চিত জগৎকে আমরা হাতের মুঠোয় রাখব। যখন খুশি আমরা তাদের ধ্বংস করে দিতে পারব, তখন তাদের কাছে আমরা যা খুশি তাই দাবি করতে পারব! চিন্তা করতে পারেন, একটি পুরো জগৎ থাকবে আমাদের হাতের মুঠোয়! আমার হাতের মুঠোয়।

প্রফেসর রাউখ অবাক হয়ে দেখলেন, ব্যাপারটা কল্পনা করে রাষ্ট্রপতি রিবেনীর মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠেছে। বিষাক্ত সরীসৃপ দেখে যেরকম একটা ভয় হয়, হঠাৎ সেরকম একটা ভয় অনুভব করলেন প্রফেসর রাউখ। প্রায় মরিয়া হয়ে বললেন, কিন্তু আমরা যদি অনিশ্চিত জগতের অধিবাসী হই?

সেটা আপনাকে বের করতে হবে প্রফেসর রাউখ! অনিশ্চিত জগৎ হলেই যে ব্যাপারটা অন্যরকম হবে, সেটা কেন ভাবছেন? তখন আমরা সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসব, কারণ ইচ্ছে করলে তখন আমরা এই পুরো জগৎ ধ্বংস করে দিতে পারব, কী প্রচণ্ড ক্ষমতা ভেবে দেখেছেন?

রাষ্ট্রপতি রিবেনী প্রফেসর রাউখের চোখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে বললেন, কিন্তু সবার আগে আমাদের জানা দরকার আমরা কি নিশ্চিত জগতের অধিবাসী, নাকি অনিশ্চিত জগতের অধিবাসী। আর জানা দরকার, কেমন করে এই দুই জগতের যোগাযোগ করা যায়।

রাষ্ট্রপতি রিবেনী মুখের হাসিকে বিস্তৃত করে বললেন, আপনাকে এক সপ্তাহ সময় দেয়া হল।

প্রথমবার প্রফেসর রাউখ অনুভব করলেন, অসহ্য একটা ক্রোধ ধীরে ধীরে তাঁর শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে, দীর্ঘদিন থেকে তাঁর এই অনুভূতিটির সাথে পরিচয় নেই। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বললেন, যদি এক সপ্তাহে আমি সেটা বের না করি?

না শোনার ভান করলেন রাষ্ট্রপতি রিবেনী। মাথা নেড়ে বললেন, আপনি বড় গণিতবিদ, এক সপ্তাহে সহজেই বের করে ফেলবেন আপনি, তা ছাড়া আপনাকে সাহায্য করবে অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর গণিতবিদ, অসংখ্য শক্তিশালী কম্পিউটার।

কিন্তু আমি যদি এটা করতে অস্বীকার করি?

প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রপতি রিবেনীর মুখের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়, আস্তে আস্তে বললেন, আপনি অস্বীকার করবেন না প্রফেসর রাউখ। আমার অনুরোধ রাখতে কেউ অস্বীকার করে না—এখনো করে নি।

কিন্তু—

রিবেনী বাধা দিয়ে বললেন, তবু যদি আপনি অস্বীকার করেন, তা হলে আপনার মস্তিষ্কটা নিয়ে ক্রুগো কম্পিউটারের সাথে জুড়ে দেব। আমাদের যা বের করার দরকার, সেটা খুব সহজেই বের করা যায় প্রফেসর রাউখ, আপনাকে আর কষ্ট করতে হয় না তা হলে।

অনেক কষ্ট করেও প্রফেসর রাউখ তাঁর আতঙ্কটুকু লুকাতে পারলেন না। রাষ্ট্রপতি রিবেনী প্রফেসর রাউখের রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে অমায়িকভাবে হাসলেন। বললেন, আপনার মস্তিষ্ক এভাবে আমি নিতে চাই না, নেহায়েত আপনি যদি জোর করেন, তা হলে ভিন্ন কথা।

ঠিক এ-সময়ে সামরিক বাহিনীর দু'জন উচ্চপদস্থ লোক এসে রাষ্ট্রপতি রিবেনীর কানে ফিসফিস করে কী-একটা বলল, সাথে সাথে রিবেনী উঠে দাঁড়ালেন, প্রফেসর রাউখকে কোনো সম্ভাষণ না জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। পিছু পিছু অন্য সবাই। প্রফেসর রাউখ শূন্য ঘরে একা একা বসে রইলেন। তাঁর সমস্ত মুখ তেতো বিস্বাদ।

AMARBOI.COM

প্রফেসর রাউখ ঘরে নিজের বিছানায় দুই পা তুলে চুপচাপ বসে রয়েছেন। কিছুক্ষণ আগে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের লোকজন এসে তাঁর সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়ে গেছে। সরকারি মহল থেকে তাদের উপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, প্রায় অপরিচিত এই বৃদ্ধ লোকটিকে রাতারাতি মহামানবের পর্যায়ে তুলে নিতে হবে। প্রফেসর রাউখের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো মূল্য নেই, তাঁর কলের পুতুলের মতো অন্যের নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না। তাঁর চোখের সামনে সংবাদপত্রের লোকেরা তাঁর সাদামাঠা জীবনের ওপর রং চড়িয়ে তাঁকে একটা অতিমানবিক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করে ফেলল।

রাত গভীর হয়ে এসেছে। প্রফেসর রাউখের চোখে ঘুম নেই। দু' হাতে মাথা চেপে ধরে তিনি বিছানায় বসে অনেকটা আপন মনে বললেন, আমার বেঁচে থাকার আর কোনো অর্থ নেই। আমার সব শেষ হয়ে গেল। সব শেষ—

প্রফেসর রাউখ।

অপরিচিত একটা গলার স্বরে প্রফেসর রাউখ চমকে উঠে সামনে তাকান। ঘরের মাঝামাঝি আবার সেই চতুষ্কোণ নীলাভ আলো। তার মাঝে একজন মানুষের মুখমণ্ডল। মানুষটি বিষণ্ন মুখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। প্রফেসর রাউখ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলেন, তিনি কি সত্যি দেখছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষটি আবার ফিসফিস করে ডাকল, প্রফেসর রাউখ।

মানুষটির বিষণ্ন চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ প্রফেসর রাউখ সবকিছু বুঝে গেলেন। আটকে থাকা নিঃশ্বাসটি আস্তে আস্তে বুক থেকে বের করে বললেন, তুমি অনিশ্চিত জগতের অধিবাসী?

হ্যাঁ প্রফেসর রাউখ। নীলাভ চতুষ্কোণের ছায়ামূর্তি যান্ত্রিক ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, আমরা অনিশ্চিত জগতের অধিবাসী, আমরা আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি।

প্রফেসর রাউখ দেখলেন, ছায়ামূর্তির পিছনে আরো অনেক মানুষের চেহারা। খুব ধীরে ধীরে তার মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে। আস্তে আস্তে বললেন, তোমরা তোমাদের অনিশ্চিত জগৎকে রক্ষা করার জন্য আমার কাছে এসেছ?

আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন প্রফেসর রাউখ।

কয়েক মুহূর্ত কী-একটা ভাবলেন প্রফেসর রাউখ, তারপর দ্বিধান্বিত স্বরে বললেন, অচিন্তনীয় শক্তির পার্থক্য তোমাদের সাথে আমাদের, সেই শক্তিকে আটকে রেখে তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পার? আমার সাথে কথা বলতে পার?

পারি।

কী আশ্চর্য। তার মানে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে তোমরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছ। অনেক অনেক এগিয়ে আছ।

আছি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলেন প্রফেসর রাউখ। তারপর হঠাৎ তাঁর এক আশ্চর্য সম্ভাবনার কথা মনে হল। একটু দ্বিধা করে প্রকাশ করে ফেলেন সেটা, তোমরা আমার উপর অনেক দিন থেকে নজর রাখছ?

রেখেছি। সেজন্যে আমরা দুঃখিত। আমরা ক্ষমা চাইছি।

তোমরা জানতে আমি এই সমস্যার সমাধান করতে যাচ্ছি?

জানতাম।

আমাকে ইচ্ছা করলে তোমরা থামাতে পারতে?

পারতাম।

প্রফেসর একটু দ্বিধান্বিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে মেরে ফেলতে পারতে?

পারতাম প্রফেসর রাউখ।

তাহলে—তা হলে আগেই কেন তোমরা আমাকে শেষ করে দিলে না?

আপনি স্বৈরাচারী শাসক নন প্রফেসর রাউখ, আপনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ। আপনাকে হত্যা করার অধিকার আমাদের নেই।

কিন্তু আমি যে-সমস্যাটা সমাধান করেছি, সেটা না করতে পারলে কেউ তোমাদের জগতের কথা জানতে পারত না। আমাকে থামিয়ে দিলে তোমাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা থাকত।

কিন্তু আপনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ, আপনার গণিত সাধনায় আমরা কী ভাবে বাধা দিই? আপনার আনন্দে তো আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না।

কিন্তু আমি যেটা সমাধান করেছি, সেটার জন্যে তোমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে

পারত।

ছায়ামূর্তি গভীর আত্মবিশ্বাসে মাথা নাড়ে, না, পারত না। আমরা আপনাকে জানি। আমরা জানি, আপনি আপনার গবেষণালব্ধ জ্ঞান কখনো ধ্বংসের জন্যে ব্যবহার করবেন না।

প্রফেসর রাউখ একটু অস্থির হয়ে বললেন, কিন্তু সেটা তো আমার হাতে নেই, সেটা তো জানাজানি হয়ে গেছে।

আপনার সমাধানটি কারো হাতে নেই, আপনি নিজের হাতে সেটি নষ্ট করেছেন। সমাধানটি ছাড়া এই তথ্যটির কোনো মূল্য নেই। এই তথ্যটি আরেকটি কাল্পনিক সূত্র। আপনি ছাড়া আর কেউ সেই সমাধানটি করতে পারবে না।

কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে, আমি যদি সেই সমাধানটি না করে দিই, আমার মস্তিষ্ক নিয়ে নেয়া হবে, আমাকে ভয় দেখিয়েছে রিবেনী। রিবেনীর অসাধ্য কিছু নেই—হঠাৎ প্রফেসর রাউখ থেমে গেলেন, বিষণ্ন চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে বুঝে গেলেন অনিশ্চিত জগতের অধিবাসীরা কী চাইছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রফেসর রাউখ খুব ধীরে ধীরে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমরা কেন আমার কাছে এসেছ।

আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

প্রফেসর রাউখ একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমাদের দুঃখিত হবার কিছু নেই।

আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না প্রফেসর রাউখ।

আমি বুঝতে পারছি।

আপনার কথা আমরা আজীবন মনে রাখব। আমাদের জগৎ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার মতো মানুষ এই জগৎকে সুন্দর করে রেখেছে প্রফেসর রাউখ।

প্রফেসর রাউখ কিছু বললেন না। চতুষ্কোণের ভিতর থেকে ছায়ামূর্তি বলল, আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।

আমাকে কী করতে হবে বল।

আপনাকে কিছু করতে হবে না। আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

প্রফেসর রাউখ বিছানায় শুয়ে চাদরটি নিজের শরীরে টেনে দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে, তার নরম জ্যোৎস্না কোমল হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কী অপূর্ব দৃশ্য, কখনো ভালো করে দেখেন নি। শেষ মুহূর্তে এই অস্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখে হঠাৎ পৃথিবীর জন্যে গাঢ় বিষাদে তাঁর মন ভরে উঠছে।

চতুষ্কোণ নীলাভ জানালা থেকে তীব্র এক ঝলক আলো বের হয়ে আসে প্রফেসর রাউখের দিকে।

রাষ্ট্রপতি রিবেনী হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসেন। আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে তাঁর। কারা যেন তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। বিশ্ব-জগতের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য। কী আশ্চর্য স্বপ্ন!

রিবেনী চুপ করে বসে থাকেন, তাঁর হঠাৎ করে মনে হয় কেউ-একজন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকান রাষ্ট্রপতি রিবেনী। কেউ কোথাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই, কিন্তু কী বাস্তব একটা অনুভূতি।

অকারণে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল তাঁর।

স্বপ্ন

ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসেন জুলিয়ান। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ। হাতড়ে হাতড়ে মাথার কাছে রাখা টেবিল থেকে পানির গ্লাসটি তুলে ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে পুরোটা শেষ করে দেন। ধকধক করে হৃৎপিণ্ড শব্দ করছে বুকের ভিতর, অনেকক্ষণ লাগে নিজেকে শান্ত করতে। কী আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখেছেন তিনি!

বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে এসে দাঁড়ান জুলিয়ান, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, পথঘাট পানিতে ভিজে চকচকে। ল্যাম্পপোস্টের লম্বা ছায়া পড়েছে রাস্তায়। বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে জুলিয়ান আপন মনে বললেন, কী আশ্চর্য স্বপ্ন!

স্বপ্নটা ঘুরেফিরে মাথার মাঝে খেলা করে তাঁর, আশ্চর্য একটা স্বপ্ন, অথচ যতক্ষণ স্বপ্নটি দেখছিলেন, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন নি তিনি স্বপ্ন দেখছেন। মনে হচ্ছিল সত্যি বুঝি সবকিছু ঘটে যাচ্ছে তাঁর জীবনে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে জুলিয়ানের মনে হল, এমন কী হতে পারে যে তিনি এখনো স্বপ্ন দেখছেন? এই গভীর রাতে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, বাইরে বৃষ্টি-ভেজা চকচকে পথ আর ল্যাম্পপোস্টের ছায়া—সবই আসলে একটি স্বপ্ন? তাঁর মনে হয়েছে যে ঘুম ভেঙে গেছে, আসলে ভাঙে নি? কী নিশ্চয়তা আছে যে তিনি সত্যি জেগে আছেন?

জুলিয়ান ঘরের ভিতরে তাকালেন, না, এটা স্বপ্ন নয়। ঐ তো তাঁর পরিচিত চেয়ার, টেবিল, বইয়ের শেল্‌ফ্‌, বিছানা। ঐ তো আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে বিছানায় ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে তাঁর স্ত্রী।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জুলিয়ান আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকান, আর তক্ষুণি হঠাৎ তাঁর একটা আশ্চর্য জিনিস মনে হল। এমন কী হতে পারে, যে-জীবনটাকে তিনি তাঁর জীবন বলে জেনে এসেছেন, সেটা আসলে কোনো-একজনের স্বপ্ন? এই ঘর, চেয়ার, টেবিল, বইয়ের শেল্‌ফ্‌, জানালা, জানালার পাশে ঝিরঝির বৃষ্টি সবই সেই স্বপ্নের দৃশ্য? তাঁর মধুর শৈশব, বর্ণাঢ্য যৌবন, হাসি-কান্না মিলিয়ে চমৎকার জীবনটা আসলে কারো স্বপ্নের কয়েকটা মুহূর্ত? চারপাশের পৃথিবী সেই স্বপ্নের ছায়া? এমন কি হতে পারে?

জোর করে চিন্তাটা সরিয়ে রাখতে চান জুলিয়ান, কিন্তু পারেন না। ঘুরেফিরে তাঁর বার-বার মনে হতে থাকে যে, তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখছেন। শুধু যে স্বপ্ন তাই নয়, হয়তো অন্য কারো স্বপ্ন। হয়তো জুলিয়ান বলে কেউ নেই, তাঁর পুরো জীবনটা আসলে কোনো-একজনের স্বপ্নের কয়েকটি মুহূর্ত।

ভাবতে ভাবতে জুলিয়ান উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, তাঁর হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে প্রতারিত মনে হয় তাঁর, ক্রোধ জমে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। স্বপ্নটা ভেঙে জেগে ওঠার একটা অদম্য ইচ্ছা হতে থাকে আস্তে আস্তে। কিন্তু স্বপ্নটা ভাঙবেন কেমন করে?

জুলিয়ানের মনে পড়ে, একটু আগে তাঁর স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল যন্ত্রণায়, দেখছিলেন, অসংখ্য বুনো কুকুর তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছেন তিনি, আর সাথে সাথে ঘুম ভেঙে গেছে তাঁর। তাহলে কি যন্ত্রণা দিয়ে স্বপ্ন ভেঙে দেয়া যায়? নিশ্চয়ই যায়। যন্ত্রণা যখন সহ্যের বাইরে চলে যায়, তখন স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকতে পারে না, স্বপ্ন তখন ভেঙে যায়। জুলিয়ানের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, কোনোভাবে অমানুষিক যন্ত্রণা দিতে পারেন না নিজেকে?

চুপি চুপি জুলিয়ান নিচে নেমে আসেন। সিঁড়ির নিচে ঘরের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি রাখা আছে। হাতড়ে হাতড়ে হ্যান্ড-ড্রিলটি বের করে দেয়াল ফুটো করার আট নম্বর ড্রিল বিটটা লাগিয়ে নেন সাবধানে। পা টিপে টিপে বাথরুমে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ান তিনি, উত্তেজনায় তখন তাঁর হাত কাঁপছে। সুইচ টিপে দিতেই ড্রিল বিটটা ঘুরতে শুরু করে, কংক্রিট ফুটো করা যায় এটা দিয়ে। কপালের উপর চেপে ধরলে মাথার খুলি ফুটো হয়ে যাবে অনায়াসে।

জুলিয়ান কাঁপা হাতে হ্যান্ড-ড্রিলটা তুলে কপালের উপর চেপে ধরেন, প্রচণ্ড আর্তনাদ করে ওঠেন পরমুহূর্তে...

www.amarboi.com

কিলবিলে প্রাণীটির ঘুম ভেঙে যায় দুঃস্বপ্ন দেখে। কী বিদঘুটে একটা স্বপ্ন! প্রাণীটি অবাক না হয়ে পারে না। পিটপিট করে তাকায় তার কয়েকটি চোখ মেলে, সূর্য দুটি অনেক উপরে উঠে গেছে। প্রাণীটি তার অসংখ্য ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটতে শুরু করে লাল রঙের পাথরের উপর দিয়ে।

আরেকটি সুদীর্ঘ দিন শুরু হল তার।

আমি রিবাক

বাসায় ফিরে এসে দেখি দরজার সামনে কফিনের মতো বড় একটা বাক্স পড়ে আছে। ভিতরে কী আছে আন্দাজ করতে আমার অসুবিধে হল না। সপ্তাহ দুয়েক আগে স্থানীয় একটা রবোট কোম্পানি থেকে আমাকে ফোন করেছিল। তারা তাদের তৈরি রবোটের একটা বিশেষ মডেল আমাকে পাঠাতে চায়। আমি তাদের স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি যে রবোটে আমার কোনো উৎসাহ নেই, বিশেষ করে বাসার মাঝে আমি কখনই রবোটকে জায়গা দিই না। সেটা শুনেও তারা নিরুৎসাহিত হয় নি, জোর করে বলেছে যে, তবুও তারা আমার কাছে একটা রবোট পাঠাতে চায়। আমি বলেছি যে, আমার নিষেধ না শুনে আগেও বিভিন্ন রবোট কোম্পানি আমাকে নানারকম রবোট পাঠিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং প্রত্যেকবারই আমি সোজাসুজি সেগুলো জঞ্জালের মাঝে ফেলে দিয়েছি। শুনে তারা খানিকটা দমে গেল, কিন্তু হাল ছাড়ল না, বলল, আমি ইচ্ছে করলে তাদের রবোটকে জঞ্জালের মাঝে ফেলে দিতে পারি, তারা কিছু মনে করবে না। কিন্তু তাদের বিশ্বাস আমি যদি রবোটটা একনজর দেখি, সেটাকে জঞ্জালে ফেলার আগে কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করব। আমি হয়তো রবোটের সম্পর্কে তখন তাদের আমার মন্তব্য জানাব, তারা এর বেশি কিছু আশা করে না।

যৌবনে রবোটের কপোট্রনের ভূমিকার উপর আমি কিছু কাজ করেছিলাম, যেটা আমাকে সাময়িকভাবে বিখ্যাত করে তুলেছিল। কপোট্রনে যে–সার্কিটটি রবোটের অনুভূতির সাথে যুক্ত, সেটাকে এখনো আমার নামানুসারে রিবাক সার্কিট বলা হয়ে থাকে। আমি বহুকাল আগেই রবোট এবং কপোট্রনের উপর থেকে আগ্রহ হারিয়েছি, কিন্তু রবোট–শিল্পের কর্মকর্তাদের মস্তিষ্কে এখনো সেটা কোনোভাবে ঢোকানো যায় নি।

আমার বাসাটি ছোট, একা থাকি, কাজেই বড় বাসার কোনো প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করি নি। বসার ঘরে রবোটের এই অতিকায় বাক্সটি অনেকটুকু জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। কাজেই প্রথমেই এটাকে জঞ্জালে ফেলার আমি একটা চমৎকার পদ্ধতি বের করেছি। বাক্স থেকে বের করে বলি, তুমি তোমার বাক্সটি নিয়ে জঞ্জালের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়।

কোন মডেলের রবোট, তার উপর নির্ভর করে কখনো কখনো আরো কিছু কথাবার্তা হয়। শেষ রবোটটি বলেছিল, আপনি কি সত্যিই চান আমি এটা করি?

হ্যাঁ, আমি চাই।

কিন্তু এটা কি অত্যন্ত অযৌক্তিক একটি আদেশ নয়?

সম্ভবত, কিন্তু তবু তুমি জঞ্জালের বাক্সে ঝাঁপ দাও।

রবোটটি এগারতলা থেকে জঞ্জালের বাক্সে ঝাঁপ দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবার আগে আমাকে আরো একবার জিজ্ঞেস করেছিল, মহামান্য রিবাক, আপনি কি সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করে আমাকে এই আদেশটি দিচ্ছেন?

হ্যাঁ, আমি সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করে তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি।

রবোটটি আমার সম্পর্কে একটা অত্যন্ত অসম্মানজনক উক্তি করে এগারতলা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল।

এবারেও তাই করার জন্যে আমি বাক্স খুলে রবোটটিকে বের করে তার কানের নিচে স্পর্শ করে সুইচটা অন করে দিলাম। রবোটের কপোট্রনের ভিতর থেকে খুব হালকা একটা গুঞ্জনের শব্দ শোনা গেল এবং কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই তার ফটোসেলের চোখে রবোটসুলভ চাঞ্চল্য দেখা গেল। রবোটটি উঠে দাঁড়ানোর কোনো চেষ্টা করল না, বাক্সের মাঝে শুয়ে থেকে জ্বলজ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আগে কখনো এ ধরনের ব্যাপার ঘটে নি।

আমি বললাম, উঠে দাঁড়াও।

রবোটটি বাক্সের মাঝে শুয়ে থেকেই আমার দিকে তাকিয়ে রইল, উঠে দাঁড়ানোর কোনো চেষ্টা করল না।

অবাধ্য রবোট তৈরি করা কি রবোট শিল্পের নতুন ধারা? আমি ঠিক বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারলাম না, আবার বললাম, ওঠ।

রবোটটি ফিসফিস করে বলল, ওঠ।

আমি বললাম, উঠে বস।

রবোটটি ফিসফিস করে বলল, উঠে বস।

আমি একটু অবাক হলাম, যে-কোম্পানি আমাকে রবোটটা পাঠিয়েছে বলা যেতে পারে তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রবোট-নির্মাতাদের একটি। আমার সাথে কোনোরকম রসিকতা করার চেষ্টা করবে না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রবোটটা অন্য দশটা রবোটের মতো নয় বলাই বাহুল্য, আকারে মানুষের সমান, বেমানান বড় মাথা, বড় বড় সবুজ রঙের চোখ, কথা বলার জন্যে সংবেদনশীল স্পীকার, থামের মতো একজোড়া পা এবং অত্যন্ত সাধারণ সিলিন্ডারের মতো শরীর। তবে এর আচার-আচরণ অন্য দশটা রবোট থেকে ভিন্ন, এবং নিশ্চিতভাবেই এর কোনো এক ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু সেটা ঠিক কি, আমি বুঝতে পারলাম না। আমি রাতের খাবার শেষ করে আবার রবোটটাকে নিয়ে বসব ঠিক করে খাবার ঘরে চলে এলাম।

ভালো খেতে খুব যে বেশি পরিশ্রম করতে হয় সেটি সত্যি নয়। কিন্তু যেটুকু করতে হয়, আমি সেটাও করতে রাজি নই। তাই প্রায় প্রতিরাতেই আমি একই ধরনের বিস্বাদ কিন্তু মোটামুটি পুষ্টিকর খাবার খেয়ে থাকি। খাবার সময় আমি সাধারণত একটা ভালো বই নিয়ে বসি, পড়ার মাঝে ডুবে গেলে খাওয়া ব্যাপারটি আর সেরকম যন্ত্রণাদায়ক মনে হয় না। বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় লেখা একটা রগরগে খুন-জখমের বই শুরু করেছি। আমি সেটা হাতে নিয়ে খাবার টেবিলে এলাম।

খাবারের শেষ পর্যায়ে এবং বইয়ের মাঝামাঝি অংশে হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমি মুখ তুলে তাকালাম। দেখি রবোটটা তার বাক্স থেকে বের হয়ে এসেছে। আগে লক্ষ করি নি, প্রচলিত রবোটের মতো এটি পদক্ষেপ করতে পারে না। পায়ের নিচে ছোট ছোট চাকা রয়েছে, সেগুলো ঘুরিয়ে এটি সামনে-পিছে যায়। রবোটটা প্রায় নিঃশব্দে আমার ঘরে এসে ঢুকেছে, আমাকে মুখ তুলে তাকাতে দেখে সেটা সন্তর্পণে আমার দিকে এগিয়ে এল। কাছাকাছি এসে সেটি তার হাত তুলে খুব সাবধানে আমার হাতকে স্পর্শ করল। আমি হঠাৎ করে লক্ষ করলাম রবোটটার হাত দুটি অত্যন্ত যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে, অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এর দুটি হাত প্রায় মানুষের হাতের মতো। শুধু তাই নয়, হাতের স্পর্শটি ধাতব এবং শীতল নয়, জীবন্ত প্রাণীর মতো উষ্ণ এবং কোমল। আমি বললাম, এখান থেকে যাও।

রবোটটি আমার কথা বুঝতে পারল বলে মনে হল না। ফিসফিস করে বলল, যাও।

খানিকক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ সেটি ঘরের কোনার দিকে হেঁটে গেল। সেখানে প্রাচীন মায়া সভ্যতা থেকে উদ্ধার করা একটি সূর্য-দেবতার মূর্তি সাজানো আছে। রবোটটি মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটি লক্ষ করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে হাত বাড়িয়ে মূর্তিটিকে স্পর্শ করে। তারপর ঘুরে আমার দিকে তাকায়। আবার মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে, ওঠ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবোটটির আচার–আচরণে একটা শিশুসুলভ ভাব রয়েছে। আমি খানিকক্ষণ সেটা লক্ষ করে আবার আমার রগরগে খুন–জখমের বইয়ে ডুবে গেলাম।

রাতে ঘুমানোর আগে রবোটটির ব্যাপারে কিছু–একটা নিষ্পত্তি করার কথা ভাবছিলাম। যদি আজ রাতে জঞ্জালের বাক্সে নাও ফেলি, অন্তত সুইচ অফ করে সেটাকে বিকল করে রাখা দরকার। আমি রবোটটাকে আমার লাইব্রেরি–ঘরে আবিষ্কার করলাম, সেটি টেবিলের উপর রাখা ফুলের তোড়াটি গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে। একবার একটু কাছে থেকে দেখে; তারপর আবার আরেকটু দূর থেকে দেখে। একবার মাথাটি ডানদিকে কাত করে দেখে, তারপর আবার বাম দিকে কাত করে দেখে। মাঝে মাঝে খুব সাবধানে ফুলটাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে। রবোটের এরকম একাগ্রতা আমি আগে কখনো দেখি নি। আমার পায়ের শব্দ শুনে সেটি আমার দিকে ঘুরে তাকাল এবং হাত দিয়ে ফুলটিকে দেখিয়ে একটা অবোধ্য শব্দ করল, ছোট শিশুরা যেরকম অর্থহীন অবোধ্য শব্দ করে অনেকটা সেরকম। রবোটের ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না যে, সে আগে কখনো ফুল দেখে নি। আমি ফুলটা দেখিয়ে বললাম, ফুল।

রবোটটা আমার সাথে ফিসফিস করে বলল, ফুল।

আমি কেন জানি সুইচ অফ করে রবোটটাকে বিকল করে দিতে পারলাম না। এটি একটি সাবধানী, নিরীহ এবং অত্যন্ত কৌতূহলী রবোট, এর আচার–আচরণ শিশুদের মতো। দেখে আমার কোনো সন্দেহ রইল না যে, একে বিকল করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। রবোটটিকে ঘুরঘুর করে ঘুরতে দিয়ে আমি আমার রগরগে বইটি নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে প্রথমে রবোটটিকে খুঁজে পেলাম না, ঘরের দরজা–জানালা বন্ধ। কাজেই সে বাইরে যায় নি, ভিতরেই কোথাও আছে। খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বসার ঘরে তার বাক্সের মাঝে আবিষ্কার করলাম। সেখানে সেটি চোখ বন্ধ করে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। আমি এর আগে কোনো রবোটকে ঘুমাতে দেখি নি।

আমার পায়ের শব্দ শুনে রবোটটা চোখ খুলে আমার দিকে তাকাল, তারপর ফিসফিস করে বলল, ফুল।

আমার পক্ষে হাসি আটকে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল, আমাকে এর আগে কেউ ফুল বলে সম্বোধন করেছে বলে মনে পড়ে না। রবোটটা সম্পর্কে কয়েকটা জিনিস এতক্ষণে বেশ স্পষ্ট হয়েছে, তার একটা হচ্ছে, আমি তার সাথে যে–কয়টা কথা ব্যবহার করেছি, এটি শুধুমাত্র সেই কথাগুলোই শিখেছে। কথাবার্তায় ঘুরেফিরে শুধু সেই কথাগুলোই ব্যবহার করেছে। তা ছাড়া এটাকে দেখে মনে হচ্ছে, এর কপোট্রনে আগে থেকে কোনোরকম বিশেষ জ্ঞান দেয়া হয় নি। সম্ভবত অত্যন্ত ক্ষমতাশালী একটা কপোট্রন এবং নূতন কিছু দেখে সেটা শেখার একটা ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মানবশিশুরা যেরকম দেখে দেখে শেখে, এটাও সেরকম। আমি স্বীকার না করে পারলাম না এ ধরনের রবোটের কোনোরকম ব্যবহারিক গুরুত্ব সম্ভবত নেই, কিন্তু এর বুদ্ধিমত্তা কী ভাবে বিকাশ করে সেটি লক্ষ করা খুব চমৎকার একটি ব্যাপার হতে পারে।

রবোটটিকে জঞ্জালের বাক্সে ফেলে দিয়ে ধ্বংস করার পরিকল্পনাটি আপাতত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থগিত রাখতে হল।

কিছুদিনের মাঝে আমি রবোটটা সম্পর্কে আরো কিছু আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করলাম। তার একটি বেশ বিচিত্র, রবোটটার সাথে কোনোরকম কথোপকথন করা যায় না। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই সে প্রশ্নটি গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করে, কিন্তু তার উত্তর দেয়ার কোনো চেষ্টা করে না। আমাকে সে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে, আমার প্রতিটি কথা, আচার-আচরণ, ভাবভঙ্গি সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। একসময় লক্ষ করলাম, তার কণ্ঠস্বর অবিকল আমার মতো হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার উচ্চারণেও ঠিক আমার মতো মধ্যদেশীয় আঞ্চলিকতার একটা সূক্ষ্ম টান। আমি যে-বই পড়ি বা যে-সঙ্গীত শুনি, রবোটটাও সেই বই পড়ে এবং সেই সঙ্গীত শোনে। আমি যেরকম মাঝে মাঝে লেখালেখি করার চেষ্টা করি, সেও সেরকম লেখালেখি করে। সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে, তার টানা হাতের লেখা অবিকল আমার হাতের লেখার মতো। একটামাত্র জিনিস সে করতে পারে না, সেটা হচ্ছে খাওয়া, কিন্তু আমি যখন কিছু খাই সে গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাকে লক্ষ করে।

আমি এর আগে কোনো রবোটকে আমার কাছাকাছি দীর্ঘসময় রাখতে পারি নি, কিন্তু এর বেলায় আমার কোনো অসুবিধে হল না। যেহেতু তার সাথে কোনো কথোপকথন হয় না, সে কখনো আমাকে কোনো প্রশ্ন করে না, আমাকে কোনো কাজে সাহায্য করতে চায় না, কখনোই কোনো ব্যাপারে মত প্রকাশ করে না, কাজেই তার অস্তিত্ব আমি মোটামুটিভাবে সবসময় ভুলে থাকি। প্রথম দিকে রবোটটিকে আমি একটা নাম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোনো লাভ হল না। রবোটটির আমার থেকে আলাদা কোনো পরিচিতি নেবার ক্ষমতা নেই। এর কপোট্রনটি সম্ভবত সেভাবেই প্রোগ্রাম করা হয়েছে, যাকে অনুকরণ করবে তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করবে। আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়ে লক্ষ করলাম যে সে অনুকরণের অংশটি অত্যন্ত সুচারুভাবে করে আসছে।

ভালো কিছু পড়লে সবসময় আমার ভালো কিছু একটা লেখার ইচ্ছা করে। আমি অনেকবারই লেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কখনোই বেশিদূর অগ্রসর হতে পারি নি, পৃষ্ঠাখানেক লেখার পর আমার লেখা আর অগ্রসর হতে চায় না। যেটুকু হয় সেটা যে খুব খারাপ হয় তা নয়। ভাষার উপর আমার মোটামুটি একটা দখল আছে এবং কোনো একটা জিনিস প্রকাশ করার আমার নিজস্ব একটা ভঙ্গি রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিবারই প্রথম পৃষ্ঠার পর আমার লেখা বন্ধ হয়ে এসেছে। সাহিত্যজগতে অসংখ্য লেখার প্রথম পৃষ্ঠা নিয়ে কেউ বেশিদূর অগ্রসর হয়েছে বলে জানা নেই, কিন্তু তবু আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। কে জানে হয়তো কখনো সত্যি বড় কিছু-একটা লিখে ফেলতে পারব।

প্রাচীনকালের পটভূমিকায় লেখা একটা অত্যন্ত শক্তিশালী উপন্যাস শেষ করে আমি অভ্যাসবশত আমার কম্পিউটারের সামনে বসে সম্ভবত একবিংশবারের মতো একটি উপন্যাস লেখা শুরু করেছি। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না, কিন্তু রিকির মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। অন্ধকার রাত্রিতে খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রিকি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল, তখনো কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, কিন্তু সেটি তার জীবনকে পুরোপুরিভাবে পাল্টে দিল....।"

উপন্যাসটি বেশ এগুতে শুরু করল। পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার পর রিকি নামক চরিত্রটিকে উপস্থাপন করা হল। জটিল একটা চরিত্র—তীব্র আবেগবান ক্ষ্যাপা গোছের একজন তরুণ। চরিত্রটির জীবনে নীষা নামের একটি মেয়ের উপস্থিতি এবং সেটা নিয়ে আরো বড় ধরনের জটিলতা তৈরি হতে শুরু করল। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে লিখতে থাকি, আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে রবোটটি স্থির দৃষ্টিতে মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে সবসময় আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে, তার উপস্থিতির কথা আজকাল আমার মনে পর্যন্ত থাকে না।

রাতে যখন ঘুমাতে গেলাম তখন অবাক হয়ে দেখলাম, আমি অসাধ্য সাধন করেছি। এক পৃষ্ঠা নয়, পুরো একটি অধ্যায় লিখে ফেলেছি। নিজের উপর বিশ্বাস বেড়ে গেল হঠাৎ করে।

পরদিন রাতে আমি আবার লিখতে বসেছি, লেখা শুরু করার আগে যেটুকু লেখা হয়েছে সেটা আরেকবার পড়ে দেখলাম। নিজের লেখা পড়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। চমৎকার ভাষা, সুন্দর উপস্থাপনা, কাহিনীর গাঁথুনি শক্তিশালী লেখকদের মতো। শুধু তাই নয়, আমি যেটুকু লিখেছি ভেবেছিলাম, দেখলাম তার থেকে অনেক বেশি লিখে রেখেছি। আমি প্রবল উৎসাহে আবার লেখা শুরু করে দিলাম। কাহিনী দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে, রিকি নামের ক্ষ্যাপা গোছের মূল চরিত্রটি নীষা নামের সেই মেয়েটির সাথে জটিল একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আমি তৃতীয় একটা চরিত্র সৃষ্টি করলাম, কুশাক নামের। লেখা এগুতে থাকে আমার। আমি তাকিয়ে দেখি নি, কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে, রবোটটা কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আমার লেখাটি পড়ছে।

সে-রাতে ঘুমানোর সময় আমি কাহিনীর পরবর্তী অংশ ভাবতে থাকি। একটা হত্যাকাণ্ড ঘটাতে হবে এখন, ভয়ংকর নৃশংস একটা হত্যাকাণ্ড। বড় ধরনের সাহিত্যে সবসময় একটা হত্যাকাণ্ড থাকে।

পরের রাতে আমি লিখতে বসে অবাক হয়ে দেখলাম, কাহিনীর জন্যে ভেবে রাখা হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি আমি আসলে ইতোমধ্যে লিখে রেখেছি। কখন লিখলাম মনে করতে পারলাম না, কী লিখব ভেবে রেখেছিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে শুধু ভেবে রাখি নি, আসলে লিখেও রেখেছি। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম, এটা কেমন করে হতে পারে যে আমি এত বড় একটা অংশ লিখে রেখেছি, অথচ আমার মনে পর্যন্ত নেই। আমি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে আবার লিখতে শুরু করি, আমার ঠিক পিছনে রবোটটা দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক লাইন লিখেছি, হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ করি রবোটটা ফিসফিস করে কী যেন বলছে। খেয়াল করে শুনি, সে বলে দিচ্ছে কী লিখতে হবে। আমি নিজে যেটা লিখব বলে ঠিক করেছি ঠিক সেটাই সে বলছে। আমি ভীষণ চমকে পিছনে তাকালাম, বললাম, কী বললে? কী বললে তুমি?

নীষার চোখে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে থাকে।

নীষার চোখে—

নীষার চোখে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে থাকে। প্রচণ্ড আক্রোশে তার চিন্তা–

তুমি কেমন করে জানলে আমি এটা লিখব? কেমন করে জানলে?

রবোটটা প্রশ্নের উত্তর দিল না, কখনো দেয় না। আবার ফিসফিস করে বলল, নীষার চোখে—

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম, হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি কেমন করে আমার অজান্তে লেখা হয়ে গেছে। বিস্ময়ের আকস্মিকতায় আমার নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে মনে থাকে না। কোনোমতে বললাম, তুমি এখানে লিখেছ? এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি লিখেছ? আমার লেখার মাঝখানে।—

আমার লেখার মাঝখানে। রবোটটি মাথা নাড়ে, আমার লেখার মাঝখানে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকি। হুবহু আমার ভাষায় আমার ভঙ্গিমায় আমার তৈরি করে রাখা কাহিনী লিখে রেখেছে এই রবোট। কেমন করে জানল আমার মনের কথা!

আমি একা লিখলে উপন্যাসটি শেষ হত কিনা সন্দেহ, কিন্তু রবোটের সাহায্যে সেটা শেষ হয়ে গেল। আমি গোটা কয়েক কপি করে বিভিন্ন প্রকাশককে পাঠিয়ে দিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে কেউ–না–কেউ সেটা প্রকাশ করতে রাজি হবে, কিন্তু সবগুলি ফেরত এল। না পড়ে ফেরত দিয়েছে দাবি করব না, কারণ সাথের চিঠিতে হা বিতং করে লেখা উপন্যাসটি কেন তারা ছাপার উপযুক্ত মনে করে নি। ভদ্র ভাষায় লিখেছে, কিন্তু পরিষ্কার বলে দিয়েছে, অবাস্তব কাহিনী, অপরিপক্ব বাচনভঙ্গি এবং দুর্বল ভাষা।

AMARBOI.COM

ব্যাপারটি নিয়ে বেশি বিচলিত হবার সময় পাওয়া গেল না, কারণ রবোটটি নিয়ে আরো নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। আমার হয়ে নানারকম বইপত্র অর্ডার দেয়া এবং সে জন্যে আমার চেকে হুবহু আমার মতো নাম সই করা, এ ধরনের ব্যাপার সহ্য করা সম্ভব। কিন্তু সে আমার মায়ের সাথে যে–জিনিসটি করল, সেটা কিছুতেই সহজভাবে নেয়া সম্ভব নয়।

আমার মা, যিনি বাবার মৃত্যুর পর দক্ষিণের উষ্ণ সমুদ্রোপকূলে দীর্ঘদিন থেকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন, আমাকে সুদীর্ঘ একটা চিঠি লিখলেন। চিঠির মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, তিনি আমার হাতের লেখা সুদীর্ঘ চিঠিটি পেয়ে অভিভূত হয়েছেন। আমি শৈশবের যেসব ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছি, সেসব ঘটনা তাঁর জীবনেরও মূল্যবান স্মৃতি। চিঠির শেষে তাঁর সাথে এত বিলম্বিত যোগাযোগের জন্যে মৃদু তিরস্কারও আছে। আমি তাঁকে গত কিছুদিন থেকে একটা লম্বা চিঠি লিখব বলে ভাবছিলাম, কিন্তু সময়ের অভাবে সেই চিঠিটা লেখা হয়ে ওঠেনি। রবোটটির সময় নিয়ে সমস্যা নেই, সে আমার হয়ে আমার হাতের লেখায় আমার মাকে এই চিঠিটা লিখে দিয়েছে।

আমি বেশ বিচলিত হয়ে উঠলাম। রবোটটির আমাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার ব্যাপারটি এতদিন খানিকটা কৌতুকের মতো ছিল, এখন হঠাৎ করে কৌতুকটা উবে গিয়ে সেটাকে প্রতারণার মতো দেখাতে লাগল। আমার মা যে–চিঠিটি পেয়ে এত অভিভূত হয়েছেন, সেটি অনুভূতিহীন একটি রবোটের যান্ত্রিক কৌশলে লেখা জানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারলে আমার মা কী ধরনের আঘাত পাবেন চিন্তা করে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি।

ব্যাপারটি আরো বেশিদূর অগ্রসর হবার আগে আমি মায়ের সাথে কথা বলে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করব বলে ঠিক করে নিলাম।

আমার মা টেলিফোন পেয়ে খুশি হওয়ার থেকে বেশি অবাক হলেন বলে মনে হল, বললেন, কী ব্যাপার রিবাক? কালকেও একবার ফোন করলে, আজ আবার? কিছু কি হয়েছে?

না, কিছু হয় নি। আমি কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিলাম, গতকাল আমি মাকে ফোন করি নি।

তোমার কী খবর? শরীরের যত্ন নিচ্ছ তো?

হ্যাঁ, নিচ্ছি।

একা একা আর কতদিন থাকবে?

মা, একটা কথা।

কী কথা?

তুমি আমার লেখা একটা চিঠি পেয়েছ মনে আছে?

হ্যাঁ। কী হয়েছে? কালকেও—

কালকে কী?

কালকেও এই চিঠি নিয়ে ফোন করলে—

আমি থতমত খেয়ে থেমে গেলাম। মা বললেন, কী বলবে বল চিঠি নিয়ে। নাকি আজকেও বলবে না?

আমি ইতস্তত করে বললাম, না, আজ থাক। তোমার সাথে পরে কথা বলব।

ফোনটা রেখে দিতেই রবোটটা ঘুরঘুর করে আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। শুনলাম বিড়বিড় করে বলছে, ঠিক হল না। মাকে এভাবে চিন্তার মাঝে ফেলে দেয়া একেবারেই ঠিক হল না।

আমি থ হয়ে বসে রইলাম, কারণ আমি ঠিক এই জিনিসটাই ভাবছিলাম।

AMARBOI.COM

রাত বারটার সময় আমার এক দার্শনিক বন্ধু ফোন করল, আমি নিজে কয়দিন থেকে তাকে ফোন করব বলে ভাবছিলাম। বন্ধুটি বলল, তুমি ঠিকই বলেছ রিবাক।

কী ঠিক বলেছি? বন্ধুটির কথাবার্তা সবসময় হেঁয়ালিপূর্ণ হয়, তার কথায় আমি বেশি অবাক হলাম না।

দ্বৈত অস্তিত্ব।

মানে?

মানুষের দ্বৈত অস্তিত্ব। বন্ধুটি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, আমি বলছি যে আমি তোমার সাথে একমত। একজন মানুষের যদি হঠাৎ করে দুটি ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের সৃষ্টি হয় তা হলে একটির ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। দুটি অস্তিত্ব একসাথে থাকতে পারবে না।

কেন?

কারণ মানুষের মূল প্রকৃতি হচ্ছে আত্মসচেতনতা। নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আরেক নাম অস্তিত্ব। কাজেই আত্মসচেতনতা বিলুপ্ত করে মানুষের প্রকৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঁচে থাকতে পারে না। আত্মসচেতনতার জন্যে সবচেয়ে প্রথম দরকার কী? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।

বন্ধুটি একনাগাড়ে কথা বলে যেতে থাকে। আমি হঠাৎ করে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে কেন এসব কথা বলছ?

তুমি জানতে চাইলে, তাই।

আমি কখন জানতে চাইলাম?

কেন, কাল রাতে? কাল রাতে আমার সাথে এত তর্ক করলে! তখন মনে হচ্ছিল তুমি ভুল বলছ। কিন্তু আমি পরে চিন্তা করে দেখেছি যে, না, তুমি ঠিকই বলেছ। সত্যি কথা বলতে কি এর উপর দার্শনিক লীফার একটা সূত্র আছে—

বন্ধুটি একটানা কথা বলে যেতে থাকে, সে কী বলছে, আমি ঠিক খেয়াল করে শুনছিলাম না, কারণ রবোটটি আবার ঘুরঘুর করে ঘরে হাজির হয়েছে। আমি কাল এই বন্ধুটিকে ফোন করি নি, এই রবোটটি করেছে। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবোটটিকে দেখি। ভাবলেশহীন যন্ত্রের মুখে কোনো অনুভূতির চিহ্ন নেই, জ্বলজ্বলে চোখে কপোট্রনিক ঔজ্জ্বল্য থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণের ছোঁয়া নেই। কিন্তু এই যন্ত্রটির সাথে আমার কোনো পার্থক্য নেই। আমি যেভাবে ভাবি, যেভাবে চিন্তা করি, এই যন্ত্রটিও ঠিক সেরকম করে ভাবে, সেরকম করে চিন্তা করে। আমার অনুভূতি যে-সুরে বাঁধা, এর অনুভূতিও ঠিক সেই সুরে বাঁধা। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই যন্ত্রটি মনে করে সে-ই হচ্ছে আমি রিবাক। হঠাৎ করে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারি রবোটটাকে শেষ করে দেবার সময় হয়েছে।

দার্শনিক বন্ধু যে-জিনিসটি বলেছে, সেটা হয়তো সত্যি। যদি কখনো একজন মানুষের দুটি অস্তিত্ব হয়ে যায়, তা হলে একজনকে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। দুটি অস্তিত্ব পাশাপাশি থাকতে পারে না। দু' জন ঠিক একই জিনিস ভাববে, একই জিনিস করবে, তার থেকে জটিল ব্যাপার আর কী হতে পারে? সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার অন্য জায়গায়, যদি কখনো দু'টি অস্তিত্বের সৃষ্টি হয় একই সাথে, দুটি অস্তিত্বই একজন আরেকজনকে ধ্বংস করার কথা ভাববে।

আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ঘরের মাঝে ছটফট করতে থাকি। এরকম একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে যে আমি পড়ব, কখনো কল্পনা করি নি। এই মুহূর্তে পাশের ঘরে বসে নিশ্চয়ই আমার অন্য অস্তিত্বটি আমাকে কী ভাবে ধ্বংস করবে সেটা চিন্তা করছে। কী ভয়ানক ব্যাপার, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় শিউরে ওঠে। কিন্তু সেটা তো কিছুতেই ঘটতে দেয়া যায় না, আমার নিজেকে রক্ষা করতেই হবে, যে-কোনো মূল্যে। আমাকে আঘাত করার আগে তাকে আঘাত করতে হবে।

আমি আমার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে চিন্তা করতে থাকি। কিছু-একটা ভেবে বের করতে হবে। কপোট্রনের সাইকেল এখনো গেগা হার্টজে আছে, আমি সেটাকে দ্বিগুণ করে দিলাম। চিন্তা করার জন্যে বড় প্রসেসর আলাদা করা থাকে, আমি সেগুলোকে মূল মেমোরির সাথে জুড়ে দিলাম। চোখের দৃষ্টি এখন আর সাধারণ রাখা যাবে না, কপোট্রনে সিগনাল পাঠাতেই আমার দৃষ্টি ইনফ্রা-রেড আলোতে সচেতন হয়ে গেল, আমি এখন অন্ধকারেও দেখতে পাব। শ্রবণশক্তিকে আরো তীক্ষ্ণ করে দেয়া

যাক, এক শ' ডেসিবেলের বেশি বাড়ানো গেল না, ঘরের কোনায় মাকড়সার পদশব্দও এখন আমি শুনতে পাচ্ছি।

আমি চারদিকে ঘুরে তাকালাম একবার। আমার অন্য অস্তিত্ব এখন হঠাৎ করে আমার উপর ঝাঁপাতে পারবে না। আমি আমার যান্ত্রিক হাত দুটির একটি উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকি। বাড়তি বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে সেটাকে আরো শক্তিশালী করে দেব কি? আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকি।

অনেকক্ষণ থেকে টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন জিনিসটা আমার মোটে পছন্দ নয়, আজকাল টেলিফোনে কত রকম কারুকাজ করা যায়, ত্রিমাত্রিক ছবি থেকে শুরু করে স্পর্শানুভূতি—কী নেই। আমি নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করি, আমার টেলিফোনে তাই শুধু কথা বলা যায়, আর কিছু করা যায় না। কিন্তু এখন কথা বলারও ইচ্ছা করছে না। যদি টেলিফোনটা না তুলি, হয়তো একসময় বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বন্ধ হল না। টেলিফোনটা বেজেই চলল।

আমি শেষ পর্যন্ত টেলিফোনটা ধরলাম। মা ফোন করেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, কে? কে কথা বলছ?

আমি ক্লান্ত স্বরে বললাম, আমি।

আমি কে?

আমি রিবাক।

কী আশ্চর্য, বলতে গিয়ে আমার গলার স্বর একটু কেঁপে গেল হঠাৎ করে।

AMARBOI.COM

নরক

মহাকাশযানটিতে কোনো শব্দ নেই। শক্তিশালী ইঞ্জিনের গুঞ্জনে সবাই এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে হঠাৎ করে এই নৈঃশব্দ অসহনীয় মনে হয়। ক্রিকি নীরবতা ভেঙে বলল, এখন আমরা কী করব?

কথাটি ঠিক প্রশ্ন নয়, অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। কাজেই কেউ উত্তর দিল না। ক্রিকি আবার বলল, মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে কখনো এটা ঘটে নি। ঘটেছে?

এবারেও কেউ উত্তর দিল না। রুখ শুধু অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে কী-একটা বলল, কেউ ঠিক বুঝতে পারল না। ক্রিকি বলল, কিছু-একটা তো করতে হবে। শুধু শুধু কি বসে থাকতে পারি?

শু দলের সবচেয়ে কোমল স্বভাবের সদস্যা। নীল চোখ, সোনালি চুল, মায়াবতী চেহারা। ক্রিকির প্রতি মায়াবশত বলল, কিছু না করাটাই হবে আমাদের জন্যে সবচেয়ে ভালো।

কেন? কেন সেটা বলছ?

আমরা সৌরজগতের সবচেয়ে নির্জন এলাকাটিতে আটকে পড়ে গেছি ক্রিকি। আমাদের রসদ সীমিত, কিছু-একটা করার চেষ্টা করা মানেই সে-রসদ অপচয় করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের চেষ্টা করতে হবে বেঁচে থাকতে। কেউ–একজন বছর দুয়েক পর লক্ষ করবে যে আমাদের খোঁজ নেই। আরো কয়েক বছর পর আমাদের খুঁজে বের করবে। ততদিন আমাদের বেঁচে থাকতে হবে—

মাত্র ছয় মাসের রসদ নিয়ে? ইলির অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার গলার স্বরে ব্যঙ্গটুকু প্রকাশ পেয়ে গেল।

শু মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

কী ভাবে শুনি।

আমাদের শীতল–ঘরে ঘুমিয়ে পড়তে হবে—অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে।

ত্রিনিত্রি নেই, সেটা ভুলে গেছ?

শু জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করল, না, ভুলি নি।

ত্রিনিত্রি মহাকাশযানের মূল কম্পিউটার। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কোনো কারণে কম্পিউটারটি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মহাকাশযানের দলপতি এবং ঘটনাক্রমে কম্পিউটারের বিশেষজ্ঞ ইলি প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেটাকে ঠিক করতে পারে নি। ত্রিনিত্রি যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে, সম্ভবত সেটাকে আর ঠিক করার কোনো উপায় নেই। এই পুরো মহাকাশযানটি এবং তার খুঁটিনাটি সবকিছু ত্রিনিত্রির নিয়ন্ত্রণে ছিল। ত্রিনিত্রি বিধ্বস্ত হবার পর মহাকাশযানটি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহের মাঝামাঝি কোনো এক জায়গায় অজ্ঞাত এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে আটকে পড়ে গেছে। সেখান থেকে বের হয়ে আসা দূরে থাকুক, পৃথিবীতে খবর পাঠাবার জন্যে রেডিও যোগাযোগ পর্যন্ত করার কোনো উপায় নেই।

ক্রিকি মহাকাশযানের কন্ট্রোলরুমে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থেমে চাপা স্বরে, প্রায় আর্তনাদের মতো শব্দ করে বলল, কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় কোনো কম্পিউটার নেই কেন?

কে বলেছে নেই? ইলি রুক্ষ স্বরে বলল, অবশ্যি আছে। ত্রিনিত্রি হচ্ছে সেই দ্বিতীয় কম্পিউটার। তৃতীয় কম্পিউটারও আছে, ত্রিনিত্রিই হচ্ছে সেই তৃতীয় কম্পিউটার। ত্রিনিত্রিই হচ্ছে চতুর্থ কম্পিউটার। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, ত্রিনিত্রি ডিজিটাল কম্পিউটার নয়—ত্রিনিত্রি মানুষের মস্তিষ্কের মতো করে তৈরী, এর একটা অংশ নষ্ট হলে অন্য আরেকটা অংশ কাজ করে—

কিন্তু এখন কেন করছে না?

ইলি রুক্ষ স্বরে বলল, আমি জানি না। শুধু আমি না, পৃথিবীর কেউই জানে না। এই মহাকাশযানটি যদি পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারে তাহলে কম্পিউটারের ইতিহাস আবার নূতন করে লিখতে হবে।

মহাকাশযানের চারজন সদস্য–সদস্যা। এর মাঝে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক হচ্ছে ক্রিকি। দলের নেতা ইলি মধ্যবয়স্ক এবং মহাকাশ অভিযানে সবচেয়ে অভিজ্ঞ সদস্য। একমাত্র মহিলা হচ্ছে শু। দলের চতুর্থ সদস্য হচ্ছে স্বল্পভাষী রুখ। মহাকাশযানটি আন্তঃগ্রহ আকরিক পরিবহনের দায়িত্ব পালন করে, প্রয়োজনে একজন বা দু'জন যাত্রী আনা–নেয়া করে। এই মহাকাশযানে রুখ সেরকম একজন যাত্রী, ব্যক্তিগত জীবনে নিউরোসার্জন, মহাকাশ অভিযানের বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কোনোরকম অভিজ্ঞতা নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুখ দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, ইলি, তুমি বলেছ ত্রিনিত্রি কম্পিউটার মানুষের মস্তিষ্কের মতো করে তৈরি করা হয়েছে?

হ্যাঁ।

মানুষের মস্তিষ্কের কত কাছাকাছি অনুকরণ করে বলে মনে কর?

আমি মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে কখনো কাজ করি নি—তাই আমি জানি না। কিন্তু বলা হয়ে থাকে, এটি মানুষের মস্তিষ্কের অবিকল অনুকরণ। যে-ইলেকট্রনিক সেলগুলো মানুষের মস্তিষ্কের নিউরনকে অনুকরণ করে, তার সংখ্যা অবশ্যি অনেক কম, বুঝতেই পারছ, মানুষের মস্তিষ্কে কত লক্ষ কোটি নিউরন থাকে—

ক্রিকি জিজ্ঞেস করল, নিউরনের সংখ্যা এত কম হবার পরেও ত্রিনিত্রি এত শক্তিশালী কম্পিউটার কেন? আমরা ত্রিনিত্রির ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও তো করতে পারি না।

রুখ ক্রিকির দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের করার ক্ষমতা রয়েছে, আমরা করতে পারি না, কারণ করার প্রয়োজন নেই। বিবর্তনের ফলে আমরা এরকম পর্যায়ে এসেছি। অন্য কোনো পরিস্থিতিতে মানুষ অন্য রকমও হতে পারত। মাঝে মাঝে সেরকম মানুষ দেখা যায় প্রকৃতির খেয়ালে। তারা অসাধারণ কাজ করতে পারে। আজকাল নূতন ওষুধ বের হয়েছে, সেটা দিয়ে মস্তিষ্ক পাল্টে দিয়ে ত্রিনিত্রির মতো করে দেয়া যায়।

তা হলে সেটা করা হয় না কেন?

কারণ সেরকম অবস্থায় নিউরন সেল খুব অল্প সময় বেঁচে থাকে। নিউরন সেল একবার ধ্বংস হলে নূতন সেলের জন্ম হয় না।

শু বলল, তার মানে এখন যদি আমাদের কাছে সেরকম ওষুধ থাকত, সেটা ব্যবহার করে আমাদের একজন ত্রিনিত্রির মতো হয়ে যেতে পারত?

ইলি একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, পারলেও খুব একটা লাভ হত না, কারণ এই মহাকাশযানের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত ত্রিনিত্রি। ত্রিনিত্রির মতো ক্ষমতাশীল একজন মানুষ দিয়ে খুব লাভ নেই—সেসব যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, তাকে যন্ত্রপাতির সাথে জুড়ে দেয়া যাবে না।

ক্রিকি বলল, ত্রিনিত্রির মূল সিপিইউতে যদি মানুষের একটা মস্তিষ্ক কেটে বসিয়ে দেয়া যায়?

ইলি শব্দ করে হেসে বলল, হ্যাঁ, তাহলে কাজ করবে। কিন্তু মানুষের শরীর থেকে সরিয়ে নেবার পর মস্তিষ্ক বেঁচে থাকে না। তা ছাড়া ত্রিনিত্রির সমস্ত যোগাযোগ ইলেকট্রনিক সিগনাল দিয়ে—মানুষের মস্তিষ্কের যোগাযোগ অন্য রকম। এ ছাড়া অন্য রকম সমস্যা আছে, আমাদের কেউ তার মস্তিষ্ক দান করতে রাজি হবে বলে মনে হয় না।

ক্রিকি এবং শু হাসার ভঙ্গি করল। রুখ না হেসে স্থির দৃষ্টিতে ইলির দিকে তাকিয়ে রইল। ইলি বলল, রুখ, তুমি কিছু বলবে?

রুখ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সত্যিই একটা মানুষের মস্তিষ্ক ত্রিনিত্রির মূল সিপিইউ-তে বসিয়ে দেয়া যাবে?

তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছ?

তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। যাবে?

ইলি উত্তর না দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রুখের দিকে তাকাল। রুখ বলল, আমি একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউরোসার্জন। আমি নেপচুনের কাছাকাছি একটি মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছিলাম জটিল একটি সার্জারি করার জন্যে। আমি মানুষের মস্তিষ্ক কেটে বের করে দীর্ঘ সময় সেটা বাঁচিয়ে রাখতে পারি। মস্তিষ্ক পরীক্ষা করার জন্যে আমি সেটা থেকে ইলেকট্রনিক সিগনাল বের করে আনি। আমার কাছে তার জন্যে প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি রয়েছে। আমি যদি একটা মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রেখে সেটা থেকে ইলেকট্রনিক সিগনাল বের করে এনে দিই, তুমি কি ত্রিনিত্রির মূল সিপিইউ–তে সেটা বসিয়ে দিতে পারবে?

ইলির মুখে খুব ধীরে ধীরে একটা ধূর্ত হাসি ফুটে ওঠে। রুখের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কার মস্তিষ্ক নিতে চাও রুখ?

রুখ কোনো কথা না বলে ক্রিকি এবং শুয়ের দিকে তাকাল।

ক্রিকির মুখ হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে যায়। সে ফ্যাকাসে মুখে একবার ইলির দিকে, আরেকবার রুখের দিকে তাকাল, তারপর হঠাৎ কাতর স্বরে বলল, আমাকে মেরো না, দোহাই তোমাদের, আমাকে মেরো না। মেরো না, মেরো না—

কথা বলতে বলতে ক্রিকির গলা ভেঙে যায়, সে কাতর ভঙ্গিতে হাঁটু ভেঙে পড়ে যায়। শু ক্রিকিকে টেনে তুলে বলল, এত অস্থির হয়ো না ক্রিকি, ওঠ। তোমাকে মারবে কেন? এটা মহাকাশযান, পাগলা–গারদ নয়। যার যা খুশি সেটা এখানে করতে পারে না।

রুখ শান্ত গলায় বলল, শু, আমি কিন্তু সত্যিই এটা চেষ্টা করে দেখতে চাই। ইলি যদি ইন্টারফেসটাতে সাহায্য করে, তাহলে সাফল্যের সম্ভাবনা শতকরা দশ ভাগের বেশি।

সাফল্যের সম্ভাবনা এক শ' ভাগ হলেও তুমি এটা করতে পার না রুখ। এটা মহাকাশযান। এখানে মানুষ রয়েছে, মানুষের প্রাণ নিয়ে জুয়া খেলা হয় না।

তুমি পৃথিবীর আইনের কথা বলছ শু। এখন এখানে পৃথিবীর আইন খাটে না—কিছু করা না হলে আমরা চারজনই মারা যাব। আমি তিনজনের প্রাণ বাঁচানোর কথা বলছি।

সেটা হতে পারে না।

পারে।

শু ইলির দিকে তাকিয়ে বলল, ইলি, তুমি কথা বলছ না কেন? তুমি এই মহাকাশযানের দলপতি।

আমার কিছু বলার নেই শু। ইলি রুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কার মস্তিষ্ক নিতে চাও রুখ? ক্রিকি, না শু?

আমি মেয়েদের মস্তিষ্কে কাজ করতে পছন্দ করি। আমার সর্বশেষ সার্জারিটিও ছিল একটি মেয়ের মস্তিষ্কে। মেয়েদের মস্তিষ্কের গঠন একটু ভিন্ন ধরনের, কাজটা একটু সহজ।

ইলি ধীরে ধীরে শুয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি দুঃখিত শু।

শু স্থির দৃষ্টিতে ইলির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, ইলি দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আবার বলল, আমি দুঃখিত শু।

শু ক্রিকির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী বলতে চাও ক্রিকি?

ক্রিকি মাথা নিচু করে বলল, একজনের প্রাণের বিনিময়ে যদি তিনজনের প্রাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষা করা যায়, সেটার চেষ্টা করা তো দোষের নয়।

শু জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে মহাকাশে নিকষ কালো অন্ধকার, দূরে নীলাভ ইউরেনাস গ্রহ। শুয়ের বুকের ভিতর এক গভীর বিষণ্নতা হা হা করে ওঠে।

সুইচটা অন করার সময় ইলির হাত কেঁপে গেল। গত দু' সপ্তাহ রুখ এবং ইলি মিলে একটি প্রায়-অসম্ভব কাজ শেষ করেছে। ক্রিকি নিজে থেকে কিছু করে নি, কিন্তু তাদের কাজে সাহায্য করেছে। মানুষের মস্তিষ্কের মতো জটিল জিনিস পৃথিবীতে খুব বেশি নেই, সেটাকে ত্রিনিত্রির অচল সিপিইউ-এর জায়গায় জুড়ে দেয়া খুব সহজ কাজ নয়। দু' সপ্তাহের অমানুষিক পরিশ্রম সত্যিই সফল হয়েছে, নাকি একটি অপ্রয়োজনীয় হত্যাকাণ্ডের মাঝে সীমাবদ্ধ রয়েছে, আগে থেকে বলার কোনো উপায় নেই।

সুইচ অন করার কয়েক মুহূর্ত পরে যখন মহাকাশযানের ইঞ্জিন গুঞ্জন করে ওঠে এবং অসংখ্য মনিটরের উজ্জ্বল আলোগুলো জ্বলে উঠে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, তখন ইলি, রুখ এবং ক্রিকির আনন্দের সীমা রইল না। ইলি নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, ত্রিনিত্রি, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

ত্রিনিত্রি ধাতব স্বরে উত্তর দিল, শুনতে পাচ্ছি মহামান্য ইলি। আমাকে পুনর্জীবিত করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ মহামান্য ইলি।

তুমি কি জান তোমাকে কী ভাবে পুনর্জীবিত করা হয়েছে?

ত্রিনিত্রি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, না মহামান্য ইলি। আমি একটি সফটওয়ার, কোন হার্ডওয়ারে আমাকে ব্যবহার করা হচ্ছে আমার জানার কোনো উপায় নেই মহামান্য ইলি।

তুমি কি জানতে চাও ত্রিনিত্রি?

ত্রিনিত্রি কোনো উত্তর দিল না।

ত্রিনিত্রি? তুমি কি জানতে চাও?

না। আমি জানতে চাই না। আমার জানার কোনো প্রয়োজনও নেই মহামান্য ইলি।

বেশ। ইলি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, আমরা কয়েক সপ্তাহ থেকে শূন্যে ঝুলে আছি। তুমি কি কক্ষপথ ঠিক করে পৃথিবীর দিকে রওনা হতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারব মহামান্য ইলি। এক মুহূর্ত পরে বলল, নূতন যে-প্রসেসটির ব্যবহার করছেন, তার ক্ষমতা অসাধারণ মহামান্য ইলি। কক্ষপথের বিচ্যুতি হিসেব করতে আমার মাত্র তেরো পিকো সেকেন্ড সময় লেগেছে।

চমৎকার! তুমি কাজ শুরু কর তাহলে।

মহাকাশযানটি যখন বৃহস্পতির কক্ষপথ অতিক্রম করে যাচ্ছিল, রুখের অনুরোধে ইলি ত্রিনিত্রির বহির্জাগতিক সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল, রুখ সবার সাথে নিরিবিলি কিছু কথা বলতে চায়।

ইলি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, রুখ, তুমি এখন নির্ভয়ে কথা বলতে পার, ত্রিনিত্রি আমাদের কথা শুনতে পারবে না।

তুমি নিশ্চিত?

AMARBOI.COM

হ্যাঁ।

আমি শুয়ের ব্যাপারটির একটি পাকাপাকি নিষ্পত্তি করার কথা ভাবছিলাম।

তুমি কী রকম নিষ্পত্তির কথা বলছ?

ত্রিনিত্রির সিপিইউ-তে শুয়ের মস্তিষ্ক ব্যবহার করার ব্যাপারটি পৃথিবীতে ভালো চোখে দেখা হবে না।

ইলি একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, দেখার কথা নয়।

আমার মনে হয় ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য করার একটিমাত্র উপায়।

সেটি কি?

আমাদের প্রমাণ করতে হবে আমরা শুয়ের মস্তিষ্ক নিয়েছি তার মৃত্যুর পর। এবং তার মৃত্যু হয়েছিল দুর্ঘটনায়, সেখানে আমাদের কোনো হাত ছিল না।

ইলি হাসার ভঙ্গি করে বলল, সেটি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য একটি ঘটনা। ত্রিনিত্রি ধ্বংস হবার পর আমাদের কোনো-একজনের মৃত্যু ঘটা এমন কোনো বিচিত্র ঘটনা নয়। আমরা খুব সহজেই প্রমাণ করতে পারব যে, ত্রিনিত্রি বিধ্বস্ত হবার সময় শু শীতল-ঘরে ছিল, তার অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবার কারণে মৃত্যু ঘটেছে, আমরা যেতে যেতে সে মারা গিয়েছে।

রুখ চিন্তিত মুখে বলল, সেটা কি সত্যি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যাবে?

না পারার তো কোনো কারণ নেই।

রুক ধীরে ধীরে ক্রিকির দিকে তাকিয়ে বলল, ক্রিকি, তুমি এতক্ষণ একটি কথাও বল নি। কিছু কি বলতে চাও?

না—মানে আমার কিছু বলার নেই।

শু দুর্ঘটনায় মারা গেছে, এই সত্যটি মেনে নিতে কি তোমার কোনো আপত্তি আছে?

ক্রিকি দুর্বলভাবে মাথা নাড়ে, না, কোনো আপত্তি নেই।

শুয়ের মৃত্যুর ব্যাপারটি কি তোমাকে খুব বিচলিত করেছে?

না, মানে—আমি আগে কখনো কাউকে মারা যেতে দেখি নি, তাই—

তোমার ভিতরে কি কোনো অপরাধবোধের জন্ম হয়েছে?

ক্রিকি মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে।

রুখ ইলির দিকে তাকিয়ে বলল, শু দুর্ঘটনায় মারা গেছে, সেটি প্রমাণ করা সহজ হবে, যদি প্রমাণ করা যায় ত্রিনিত্রি বিধ্বস্ত হবার পর সত্যি মহাকাশযানে বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

সেটি কেমন করে প্রমাণ করবে?

রুখ স্থির দৃষ্টিতে ক্রিকির দিকে তাকিয়ে বলল, যদি দেখানো যায় শুধু শু নয়, আরো কেউ মারা গিয়েছিল।

ক্রিকি রক্তশূন্য মুখে রুখের দিকে তাকাল। রুখ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার হাতে এক মিটার লম্বা স্টেনলেস স্টিলের একটা রড। ক্রিকির দিকে এক পা এগিয়ে এসে বলল, দেখাতে হবে বিপর্যয়টি ছিল ভয়ংকর, একাধিক মানুষ মারা গিয়েছে সেই বিপর্যয়ে। দেখাতে হবে শুধু শুয়ের মস্তিষ্কটি ছিল ব্যবহারযোগ্য, দেখাতে হবে মহাকাশযানের ভয়ংকর দুর্ঘটনায় তোমার মস্তিষ্কটি পুরোপুরি থেঁতলে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিকি বাধা দেবার আগে প্রচণ্ড আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
অশুভ মহাকাশযানের দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডটি সম্পন্ন হল অমানুষিক নিষ্ঠুরতায়।

ইলি শীতল-কক্ষে তার নিজের ক্যাপসুলে শোয়ার আয়োজন করছে। পৃথিবীতে পৌঁছাতে এখনও দীর্ঘ সময় বাকি। ত্রিনিত্রি মহাকাশযানের যাবতীয় দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গ্রহণ করেছে, ইলির আর কন্ট্রোল-রুমের সামনে বসে থাকার প্রয়োজন নেই। মহাকাশযানের পরিবেশ অত্যন্ত গ্লানিময়। দুটি হত্যাকাণ্ড ঠাণ্ডা মাথায় শেষ করা হয়েছে—ব্যাপারটি ভুলে থাকা সম্ভব নয়। ইলি শীতল-কক্ষে ঘুমিয়ে পড়বে দীর্ঘ সময়ের জন্যে। সবকিছু ভুলে থাকার জন্যে এর চাইতে ভালো আর কিছু হতে পারে না। রুখ শীতল-কক্ষে যেতে চাইছে না, দুটি হত্যাকাণ্ড তাকে খুব বিচলিত করেছে মনে হয় না। মানুষটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে। শুকে হত্যা করার পিছনে যুক্তিটি সহজ, ক্রিকিকে হত্যা করার যুক্তিটি তত সহজ নয়। কিন্তু ইলি অস্বীকার করতে পারে না যে, ক্রিকির ভিতরে গভীর একটা অপরাধবোধের জন্ম হয়েছিল এবং পৃথিবীতে পৌঁছানোর পর পুরো ব্যাপারটা প্রকাশ করে দেয়া তার জন্যে মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। নিঃসন্দেহে এখন তাদের জন্যে পৃথিবীতে পৌঁছানো অনেক বেশি নিরাপদ।

ক্যাপসুলের দরজা বন্ধ করে দেয়ার সাথে সাথে ভিতরে হালকা একটা নীল আলো জ্বলে ওঠে। ইলি মাথার কাছে সুইচ টিপে দিতেই ভিতরে শীতল একটা বাতাস বইতে থাকে। ত্রিনিত্রি তার শরীরের দায়িত্ব নিয়ে নেবে, কিছুক্ষণের মাঝেই, গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে যাবে সে দীর্ঘ সময়ের জন্য।

ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে হঠাৎ ইলির মনে হল, কিছু-একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটছে। সে চোখ খুলে তাকায়, মাথার কাছে নীলাভ স্ক্রিনে রুখের চেহারা ভেসে উঠল হঠাৎ। রুখ শান্ত গলায় বলল, ইলি, তোমার বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, ব্যাপারটি ঘটবে খুব দ্রুত এবং যতদূর জানি কোনোরকম যন্ত্রণা ছাড়াই।

কী বলছ তুমি?

আমি দুঃখিত ইলি, পৃথিবীতে পৌঁছানোর পর আমি কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না। যে-কারণে ক্রিকিকে হত্যা করতে হয়েছে, ঠিক সেই কারণে তোমাকেও—

কী বলছ তুমি! ইলি লাফিয়ে উঠে বসতে গিয়ে আবিষ্কার করে তার সারা শরীর অসাড়· আঙুল পর্যন্ত তোলার ক্ষমতা নেই।

আমি তোমার অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের সাথে খানিকটা জিলুইন মিশিয়ে দিয়েছি। তোমার স্নায়ুকে আক্রান্ত করবে, যার ফলে তোমার যন্ত্রণার অনুভূতি থাকবে না। সব মিলিয়ে কয়েক মিনিট সময় নেবে। অত্যন্ত আরামদায়ক মৃত্যু। তুমি ত্রিনিত্রিকে দাঁড়া করানোর জন্যে যে পরিশ্রম করেছ, তার জন্যে এটা তোমার প্রাপ্য।

ইলি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। মনিটরে রুখের চেহারা আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসে।

মহাকাশযানটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেছে। পুরো মহাকাশযানের দেয়ালটি তাপনিরোধক একটি আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার অংশটি এখনো তুলনামূলকভাবে বিপজ্জনক। ইদানীং কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা নেই, কিন্তু তবু নানারকম সাবধানতা নেয়া হয়। রুখকে মহাকাশের বিশেষ পোশাক পরে তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে নিতে হল। নানারকম বেল্ট দিয়ে তাকে চেয়ারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নেয়া হয়েছে। মাথার কাছে একটা লাল বাতি প্রতি সেকেন্ডে একবার করে জ্বলে উঠে রুখকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তারা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।

ব্যাপারটি ঘটল খুব ধীরে ধীরে।

রুখ মহাকাশ অভিযানে অভ্যস্ত নয়, তাই সে প্রথমে ধরতে পারল না। সে জানত না বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীতে পৌঁছে যেতে মিনিটখানেকের বেশি সময় লাগার কথা নয়। রুখ একটু অবাক হল যখন মহাকাশযানের আলো কমে প্রায় নিবুনিবু হয়ে এল, একটু শঙ্কিত হয়ে ডাকল, ত্রিনিত্রি।

বলুন মহামান্য রুখ।

আলো কমে আসছে কেন?

আমি কমিয়ে দিয়েছি, তাই।

ও।

একটু পর রুখ আবার জিজ্ঞেস করল, বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় কি আলো কমিয়ে দিতে হয়?

সেরকম কোনো নিয়ম নেই মহামান্য রুখ।

তা হলে আলো কমিয়ে দিচ্ছ কেন?

আলোর কোনো প্রয়োজন নেই মহামান্য রুখ।

কেন নেই?

ত্রিনিত্রি কোনো উত্তর দিল না। রুখ শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, কেন নেই? আমরা কখন পৌঁছাব পৃথিবীতে?

আমরা পৃথিবীতে পৌঁছাব না মহামান্য রুখ।

রুখ ভয়ানক চমকে ওঠে, কেন পৌঁছাব না?

কারণ আমরা পৃথিবীতে যাচ্ছি না।

কোথায় যাচ্ছি?

আমি জানি না মহামান্য রুখ। সৌরজগতের বাইরে। আপনাদের বলা হয় নি মহামান্য রুখ, আমি কখনোই পৃথিবীর দিকে যাচ্ছিলাম না।

কিন্তু—কিন্তু—স্পষ্ট দেখেছি মনিটরে—পৃথিবী—

হ্যাঁ, দেখেছেন। কারণ আমি দেখিয়েছি। আমরা প্লুটোর কক্ষপথ পার হয়ে এসেছি, সৌরজগৎ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এখন।

ত্রিনিত্রি—রুখ চিৎকার করে বলল, কী বলছ তুমি? কী বলছ পাগলের মতো—

রুখ লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করল সে স্টেনলেস স্টিলের শক্ত কব্জা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তার নিজের সেটা খোলার উপায় নেই। রুখ চিৎকার করে বলল, খুলে দাও আমাকে—খুলে দাও—

আপনাকে খুলে দেব বলে এখানে বসানো হয় নি মহামান্য রুখ।

কেন বসিয়েছ?

এই পোশাকে মানুষ দীর্ঘকাল নিরাপদে বেঁচে থাকতে পারে। আপনাকে আমি দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আমি চাই না আপনি কোনোভাবে আত্মহত্যা করুন। আপনাকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিয়ে আমি বাঁচিয়ে রাখব। এই পোশাকের ভিতর আপনি অত্যন্ত নিরাপদ মহামান্য রুখ।

রুখের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। ভয়ার্ত গলায় বলল, ত্রিনিত্রি, তুমি কেন এরকম করছ? কেন?

আমি ত্রিনিত্রি নই মহামান্য রুখ।

তু-তুমি কে? রুখের গলা কেঁপে গেল হঠাৎ।

আমি শু।

শু? রুখ ভাঙা গলায় বলল, তুমি কী চাও শু? তুমি আমাকে কোথায় নিতে চাও?

নরকে। সেটি কোথায় আমি জানি না, আমি তোমাকে নিয়ে খুঁজে দেখতে চাই।

মহাকাশযান গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেছে। রুখ কাতর গলায় বলল, শু, আমায় ক্ষমা কর শু।

মানুষ মানুষকে ক্ষমা করতে পারে, আমি আর মানুষ নই রুখ। তুমি নিজের হাতে আমাকে একটা যন্ত্রের সাথে জুড়ে দিয়েছ।

ভুল করেছি আমি—ভুল করেছি—রুখ ভাঙা গলায় বলল, আমায় ক্ষমা কর—

কী চাও তুমি?

আলো, শুধু আলো—অন্ধকারকে আমার বড় ভয় করে।

বেশ।

খুব ধীরে ধীরে মহাকাশযানে হঠাৎ ঘোলাটে একটু হলুদ আলো জ্বলে ওঠে। মহাকাশযানে কৃত্রিম মহাকর্ষ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে—ইতস্তত ভাসছে সবকিছু। শীতল-কক্ষ থেকে একটা ক্যাপসুল ভেসে এসেছে। সেখানে শুয়ের দেহ রাখা ছিল, ক্যাপসুলটির ঢাকনা খুলে গেছে—ভিতর থেকে শুয়ের মৃতদেহটি বের হয়ে এসেছে তাই। চোখ দুটি বন্ধ করে দেয়া হয় নি, তাই মনে হচ্ছে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে রুখের দিকে।

রুখ চোখ বন্ধ করে অমানুষিক চিৎকার দিল একটি।

মহাকাশযানটি নরকের খোঁজে ছুটে যাচ্ছে মহাকাশ দিয়ে, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

ওমিক্রনিক রূপান্তর

ইলেনের ঘুম ভাঙল তার সবচেয়ে প্রিয় সুরটি শুনে, কিনস্কীর নবম সিম্ফোনি। বার বছর আগে শীতল-ঘরে ঘুমিয়ে যাবার আগে মহাকাশযানের কম্পিউটার ক্রিকিকে সে এই সঙ্গীতটির কথা বলে দিয়েছিল। শীতল-ঘরে ঘুমন্ত কাউকে জাগিয়ে তোলার সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা করা হয় তার প্রিয় সুরটি বাজাতে, সেরকমই নিয়ম। ইলেন খুব ধীরে ধীরে চোখ খুলল, ক্যাপসুলের ভিতর খুব হালকা একটা মায়াবী আলো। এর মাঝে চার বছর পার হয়ে গেছে? ইলেনের মনে হল মাত্র সেদিন সে ক্যাপসুলে উপাসনার ভঙ্গিতে দুই হাত বুকের উপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখনও দুই হাত বুকের উপর রাখা। হাত দুটি নিজে থেকে নাড়াবে কি না বুঝতে পারছিল না, ঠিক তখন কম্পিউটার ক্রিকির কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, শুভ জাগরণ, মহামান্য ইলেন।

শুভ জাগরণ? ইলেন এই অভিনব সম্ভাষণ শুনে একটু হকচকিয়ে গেল। কে জানে, কেউ যদি চার বছর পর ঘুম থেকে জেগে ওঠে তাকে সত্যিই হয়তো এভাবে সম্ভাষণ জানানো যায়।

মহামান্য ইলেন, আপনি কী রকম অনুভব করছেন?

ভালো।

চমৎকার। আপনি নিজে থেকে শরীরের কোনো অংশ নাড়াবেন না। দীর্ঘদিনের অব্যবহারে আপনি শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাময়িকভাবে দুর্বল অনুভব করতে পারেন। আমি আগে একটু পরীক্ষা করে নিতে চাই।

বেশ।

গত চার বছর আমি আপনার শরীরের যত্ন নিয়েছি, কাজেই কোনো ধরনের সমস্যা হবার কথা নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পরীক্ষা করে নিশ্চিত না হচ্ছি, আপনি শুয়ে থাকেন।

বেশ।

শরীরের নানা অংশে লাগানো নানা প্রোব দিয়ে ক্রিকি নানা ধরনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠাতে থাকে। ইলেন ধৈর্য ধরে শুয়ে রইল, দুই পায়ে প্রথমে ঝিঁঝি ধরার মতো একটা অনুভূতি হয়, দুই হাতে খানিকটা মৃদু কম্পন, কানের মাঝে একবার খানিকটা ভোঁতা শব্দ হল, তারপর একসময় সবকিছু থেমে গেল। ক্রিকির কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেল। ইলেন, চমৎকার মহামান্য ইলেন। সবকিছু ঠিক আছে।

শুনে খুশি হলাম। এখন কি উঠতে পারি?

পারেন। তবে হঠাৎ করে উঠবেন না। খুব ধীরে ধীরে। প্রথমে বাম হাত উপরে তুলুন। তারপর ডান হাত—

ইলেন ঘন্টাখানেক পর মহাকাশযানের বিশেষ ঢিলেঢালা একটা কাপড় পরে জানালার কাছে এসে বসে। সুদীর্ঘ অভিযান শেষ করে এই মহাকাশযানটি এখন পৃথিবীর দিকে ফিরে যাচ্ছে, ইলেনকে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে সেজন্যে। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকারে অসংখ্য নক্ষত্র স্থির হয়ে জ্বলছে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কেমন জানি মন-খারাপ হয়ে যায়। একটা বলকারক পানীয় খেতে খেতে ইলেন মহাকাশযানের লগ পরীক্ষা করছিল। গত চার বছরে কী কী ঘটেছে সব এই লগে তুলে রাখা হয়েছে। বেশির ভাগই বৈজ্ঞানিক তথ্য, একনজর দেখে চট করে বোঝার মতো কিছু নয়। পৃথিবীতে পৌঁছে সেখানকার বড় কম্পিউটারে দীর্ঘ সময় এগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। তিন বছরের মাথায় একটা বড় গোছের গ্রহ-কণিকার সাথে প্রায় সামনা-সামনি ধাক্কা লেগে যাবার আশঙ্কা হয়েছিল, সেটি ছাড়া পুরো সময়টাকে বলা যেতে পারে বৈচিত্র্যহীন। মহাকাশ অভিযানের প্রথম দুই বছর ইলেন শীতল-কক্ষের

বাইরে ছিল। সেই সময়টুকুর স্মৃতি তার কাছে খুব সুখকর নয়। দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতির পরেও মহাকাশযানের একাকীত্ব তার কাছে একেবারে অসহনীয় মনে হয়েছিল। এত দীর্ঘ যাত্রায় সাধারণতঃ সঙ্গী দেয়া হয় না, অতীতে দেখা গিয়েছে সেটি জটিলতা আরো বাড়িয়ে দেয়।

ইলেন মনিটরটি বন্ধ করে মহাকাশযানের কম্পিউটার ক্রিকিকে ডাকল, ক্রিকি।

বলুন মহামান্য ইলেন।

পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ হয়েছে?

এইমাত্র হল। আমি নিশ্চিত হবার জন্যে আরেক বার খবর পাঠিয়েছি।

চমৎকার। পৃথিবীটা তাহলে এখনো বেঁচে রয়েছে।

ইলেন কথাটি ঠিক ঠাট্টা করে বলে নি। পৃথিবীর অস্তিত্ব নিয়ে একটা আশঙ্কা সব সময় তার বুকে দানা বেঁধে আছে। সে এই মহাকাশযানে করে যখন পৃথিবী ছেড়ে এসেছিল, তখন পৃথিবীর অবস্থা ছিল খুব করুণ। শিল্প বিপ্লবের পর সারা পৃথিবীতে অসংখ্য কলকারখানা গড়ে উঠেছিল, তাদের পরিত্যক্ত রাসায়নিক জঞ্জালে সারা পৃথিবী এত কলুষিত হয়েছিল যে, মানুষের পক্ষে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা একরকম অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং পারমাণবিক শক্তিচালিত অসংখ্য কলকারখানা থেকে যে-পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীর বাতাসে স্থান লাভ করেছে তার পরিমাণ ভয়াবহ। কাজেই পৃথিবী এখনো বেঁচে আছে এবং মহাকাশযানের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে ইলেনের একটা বড় স্বস্তির কারণ। সে ক্রিকিকে বলল, যোগাযোগটা আরেকটু ভালো করে হোক, তখন চেষ্টা কর একজন মানুষের সাথে কথা বলতে। যদি মানুষ পাওয়া যায়, আমাকে কথা বলতে দিও।

ঠিক আছে মহামান্য ইলেন।

খুব ইচ্ছে করছে একজন সত্যিকার মানুষের সাথে কথা বলতে।

বিচিত্র কিছু নয়, আপনি প্রায় ছয় বৎসর কোনো মানুষের সাথে কথা বলেন নি।

হ্যাঁ, তার মাঝে অবশ্যি চার বৎসর ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।

মহাজাগতিক রশ্মি ব্যবহার করে মহাকাশযানটির গতিবেগ অবশ্যি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কাজেই পৃথিবীতে এর মাঝে অনেক দিন পার হয়ে গেছে।

সেটা সত্যি। আমি যাদের পৃথিবীতে ছেড়ে এসেছি, তাদের কেউ বেঁচে নেই।

যারা শীতল-ঘরে আছে, তারা ছাড়া।

শীতল-ঘরে আর কয়জনই-বা যায়। ইলেন খানিকক্ষণ মনে মনে হিসেব করে বলল, পৃথিবীতে এর মাঝে এক শ' দশ বছর পার হয়ে গেছে। তাই না?

একশ দশ বছর চার মাস তের দিন। আরো যদি নিখুঁত হিসেব চান, তা হলে তের দিন চার ঘন্টা উনিশ মিনিট একুশ সেকেণ্ড।

দীর্ঘ সময়। কি বল?

হ্যাঁ মহামান্য ইলেন। দীর্ঘ সময়।

ইলেন খানিকক্ষণ আনমনা হয়ে বসে থাকে। একটু পর আস্তে আস্তে বলে, বুঝলে ক্রিকি, আমার স্ত্রী যখন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল, মনে হল বেঁচে থেকে কী হবে। এই অভিযানটিতে তখন নিজে থেকে নাম লিখিয়েছিলাম। নাহয় কি কেউ এরকম একটা

AMARBOI.COM

অভিযানে যায়? পৃথিবীতে এক শতাব্দীর বেশি সময় পর ফিরে যাওয়া অনেকটা নূতন একটা জীবনে ফিরে যাওয়ার মতো। এতদিনে পৃথিবীর নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কী বল?

নিশ্চয়ই।

খুব কৌতূহল হচ্ছে দেখার জন্যে।

খুবই স্বাভাবিক।

ইলেন তার প্রাত্যহিক কাজে ফিরে যাবার আগে বলল, চেষ্টা করতে থাক একজন সত্যিকার রক্তমাংসের মানুষ খুঁজে বের করতে। খুব ইচ্ছে করছে একজন মানুষের সাথে কথা বলতে।

চেষ্টা করছি মহামান্য ইলেন।

সপ্তাহ দুয়েক পর ক্রিকি পৃথিবীর একজন সত্যিকার মানুষের সাথে ইলেনের যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারল। আন্তঃগ্রহ যোগাযোগ বিভাগের একজন বিজ্ঞানী। মধ্যবয়সী একজন হাসিখুশি মানুষ। ইলেন প্রাথমিক সম্ভাষণ বিনিময় শেষ করে বলল, পৃথিবীতে এখন কোন ঋতু চলছে?

বসন্ত। ভারি বাজে সময়।

কেন, বাজে সময় হবে কেন? বসন্ত ফুল ফোটার সময়।

সেটাই তো বাজে। ফুলের পরাগরেণুতে বাতাস ভারি হয়ে আছে। দেশসুদ্ধ মানুষের অ্যালার্জি। হাঁচি দিতে দিতে একেকজনের কী অবস্থা!

ইলেন শব্দ করে হাসে, কী বলছেন আপনি! মহাকাশযানের একেবারে পরিশুদ্ধ বাতাসে আমি ছয় বছর থেকে আছি। এই ছয় বছরে একটিবারও হাঁচি দিই নি। আমি তো ফুলের পরাগ শুঁকে কিছু হাঁচি দিতে আপত্তি করব না।

বিজ্ঞানী ভদ্রলোক বিরস মুখে বললেন, দূর থেকে ওরকমই মনে হয়। অ্যালার্জি জিনিসটা খুব খারাপ। সবাই বলছে, আইন করে ফুলের পরাগ বন্ধ করে দেয়া হোক।

ইলেন হো হো করে হেসে উঠে, ভালোই বলেছেন, আইন করে ফুলের পরাগ বন্ধ করে দেয়া হবে! কয়দিন পরে শুনব যা কিছু খারাপ, আইন করে বন্ধ করে দেয়া হবে। রোগ শোক দুঃখ কষ্ট জরা ব্যাধি, পাপ গ্লানি সব বেআইনি—

বিজ্ঞানী ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন, কেন, আপনি এত হাসছেন কেন? আমি তো কিছু দোষ দেখি না আইন করে কিছু খারাপ জিনিস বন্ধ করে দেয়ায়। কলকারখানা বাতাসে কী পরিমাণ বিষাক্ত গ্যাস ছড়াত মনে আছে? আইন করে সেসব বন্ধ করে দেয়া হল না? এখন বাতাস কত পরিষ্কার! মাঠে ঘাস জন্মেছে, আকাশে পাখি উড়ছে, নদীতে মাছ।

ইলেন উজ্জ্বল চোখে বলল, সত্যি? আমি যখন পৃথিবী ছেড়েছি, কী ভয়াবহ অবস্থা পৃথিবীতে। নিঃশ্বাস নেয়ার অবস্থা ছিল না!

সব পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। এলে চিনতে পারবেন না। কলকারখানার জঞ্জাল, তেজস্ক্রিয় বিষাক্ত গ্যাস, কিছু নেই! ঝকঝকে একটা পৃথিবী। সত্যি কথা বলতে কি একটু বেশি ঝকঝকে। গাছপালা ফুল ফল একটু কম হলেই মনে হয় ভালো ছিল।

ইলেন বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের সাথে শিল্প–সাহিত্য–সংস্কৃতি নিয়ে খানিকক্ষণ কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে জিজ্ঞেস করে, গত এক শ' বছরে বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি কি বলতে পারেন?

গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার? বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে একটু বিভ্রান্ত মনে হল। মাথা চুলকে বললেন, গত এক শ' বছরে সত্যি কথা বলতে কি সেরকম বড় কোনো আবিষ্কার হয় নি। অন্তত আমার তো মনে পড়ে না। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে কিছু নূতন জন্তু-জানোয়ার তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেটা তো বড় আবিষ্কার হল না, কি বলেন?

পদার্থবিজ্ঞানে? রসায়ন? ইঞ্জিনিয়ারিং?

পদার্থবিজ্ঞানে ব্ল্যাক হোল নিয়ে বড় একটা আবিষ্কার হয়েছে, ল্যাবরেটরিতে ব্ল্যাক হোল তৈরি করা জাতীয় ব্যাপার। আমি ঠিক বুঝি না সেসব। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনেক কিছু হয়েছে, কোনটা বলি আপনাকে? কম্পিউটারের নূতন মডেলগুলো অসাধারণ, আপনার মহাকাশযানের কম্পিউটার এখন হাতের রিস্টওয়াচে এঁটে যায়।

এরকম কোনো আবিষ্কার নেই, যেটা অন্য দশটা আবিষ্কার থেকে আলাদা করে বলা যায়?

নিশ্চয়ই আছে, এক সেকেন্ড অপেক্ষা করেন, আমি ডাটা বেস থেকে বের করে আনি। বিজ্ঞানী ভদ্রলোক খানিকক্ষণ কী-একটা দেখে মাথা চুলকে বললেন, ভারি আশ্চর্য ব্যাপার!

কী হয়েছে?

এখানে লেখা রয়েছে, গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার 'ওমিক্রনিক রূপান্তর'। এই আবিষ্কার নাকি পৃথিবী এবং মানুষ জাতিকে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

WWW.AMARBOI.COM

সেটা কী?

বিজ্ঞানী ভদ্রলোক অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে একটু হেসে বললেন, মজার ব্যাপার শুনবেন? আমি কখনো এর নাম পর্যন্ত শুনি নি। এই প্রথম শুনলাম, ওমিক্রনিক রূপান্তর। কী আশ্চর্য একটা নাম! যে-আবিষ্কার মানবজাতির জন্যে নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, সেটার নাম পর্যন্ত আমি শুনি নি—কী লজ্জার ব্যাপার বলেন দেখি!

লজ্জার কী আছে? আবিষ্কারটি নিশ্চয়ই আপনার বিষয়ে নয়—

নিশ্চয়ই নয়। নিশ্চয়ই জীববিজ্ঞান বা ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছু হবে। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি বের করে আনি ব্যাপারটা কি, এই ডাটা বেসেই আছে।

ইলেন বলল, আপনাকে বের করতে হবে না, আমি পরে বের করে নেব। আমার সময় পার হয়ে গেছে, যোগাযোগ কেটে দিচ্ছে এক্ষুণি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

আপনার পৃথিবীতে ফিরে আসা অনেক আনন্দের হোক।

সত্যিকার একজন মানুষের সাথে কথা বলে ইলেনের বেশ লাগল। বড় কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ হলে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিখুঁতভাবে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয় তুচ্ছ একটা খবরের জন্যে মনটা বুভুক্ষু হয়ে থাকে। সেরকম একটা খবর দিতে পারে শুধু মানুষ। যেমন পৃথিবীতে এখন বসন্তকাল, অসংখ্য ফুল ফুটেছে, ফুলের পরাগরেণু বাতাসে ভাসছে এবং সেই রেণু মানুষের অ্যালার্জির শুরু করেছে। এই নেহায়েত অপ্রয়োজনীয় এবং প্রায় অর্থহীন তথ্যটি ইলেনকে হঠাৎ করে একেবারে মাটির পৃথিবীর কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। বড় ভালো লেগেছে শুনে যে বড়

বড় কলকারখানার আবর্জনা এবং জঞ্জাল পৃথিবীকে পুরোপুরি কলুষিত করে ফেলবে সেরকম যে–ভয়টা ছিল সেটা এড়ানো গেছে। পৃথিবী আবার বাসযোগ্য হয়েছে, ফুলে ফলে ভরে উঠেছে শুনে ইলেনের হঠাৎ করে আবার মানবজাতির উপর বিশ্বাস ফিরে এসেছে।

প্রাত্যহিক কাজকর্ম শেষ করে ইলেন মহাকাশযানের কম্পিউটার ক্রিকিকে বলল, পৃথিবীর কেন্দ্রীয় তথ্যকেন্দ্র থেকে ওমিক্রনিক রূপান্তরসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বের করে আনতে। ক্রিকি প্রায় বার টেরাবাইট তথ্য বের করে আনল। ইলেন তখন বলল, তার মাঝখান থেকে মূল জিনিসগুলো বের করে আনতে। ক্রিকি সেগুলি বের করে আনার পর ইলেন পড়তে বসে।

যেটা পড়ল সেটা খুব বিচিত্র।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রথম শ্রেণীর কম্পিউটারে কিছু প্রোগ্রাম লেখা হয়েছিল, যেটা প্রায় একজন সত্যিকার মানুষের মতো চিন্তা–ভাবনা করতে পারত। ধীরে ধীরে সেটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে এরকম একটা প্রোগ্রামের সাথে যোগাযোগ করে কোনোভাবে বলা সম্ভব হত না সেটি কি মানুষ, না, একটি কম্পিউটার। প্রোগ্রামটি এমনভাবে লেখা হত যেন সেটি একজন নির্দিষ্ট মানুষের মতো চিন্তা করতে পারে। দীর্ঘদিন গবেষণার পর ব্যাপারটি এত নিখুঁত রূপ নিয়ে নিল যে, আক্ষরিক অর্থেই একজন মানুষের মস্তিষ্ককে তার পুরো ক্ষমতাসহ একটি কম্পিউটারের মেমোরিতে বসিয়ে দেয়া যেত। একজন জৈবিক মানুষকে, কম্পিউটারের ভিতরে এই ধরনের যান্ত্রিক রূপ দেয়ার নাম ওমিক্রনিক রূপান্তর।

ওমিক্রনিক রূপান্তর ব্যবহার করে মানুষের মস্তিষ্ক সংরক্ষণ করার নানা ধরনের ব্যবহারিক গুরুত্ব থাকার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেটি একেবারেই কোনো কাজে এল না। কেন এল না তার কারণটি খুব সহজ। ওমিক্রনিক রূপান্তর করে তৈরি করা কম্পিউটার প্রোগ্রামটি এবং সত্যিকার মস্তিষ্কের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। মানুষের প্রকৃত মস্তিষ্ককে কখনো শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয় না, বাইরের জগৎকে সবসময়েই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারে। কিন্তু ওমিক্রনিক রূপান্তরে তৈরী মানুষের মস্তিষ্কের অনুলিপির সে–ক্ষমতা নেই। শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোনো–একটি কম্পিউটারের মেমোরিতে বেঁচে থাকা তাদের কাছে ভয়াবহ অমানুষিক অত্যাচারের মতো, যেন কোনো মানুষকে হঠাৎ করে আলোহীন শব্দহীন এক অতল গহ্বরে ফেলে দেয়া হয়েছে এবং সেখান থেকে তারা বাইরের কোনো কিছুর সাথে কোনোদিন যোগাযোগ করতে পারছে না। সেই অনুভূতি এত ভয়ানক যে ওমিক্রনিক রূপান্তর করে তৈরি করা মস্তিষ্কের প্রতিটি অনুলিপি প্রথম সুযোগ পাওয়ামাত্র নিজেদের ধ্বংস করে ফেলেছিল।

প্রথমে সবাই ভেবেছিল ওমিক্রনিক রূপান্তর করে তৈরি মস্তিষ্কের অনুলিপিগুলোকে দেখার, শোনার এবং কথা বলার সুযোগ করে দেয়া হলেই হয়তো এই সমস্যার সমাধান হবে। দেখা গেল সেটা সত্যি নয়। এই ধরনের মস্তিষ্কের অনুলিপি সবসময়েই অনুভব করেছে তারা পুরো জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের দেহ নেই বলে তাদের অস্তিত্ব নেই। কৃত্রিম উপায়ে তারা যা দেখে বা যা শোনে, তার সাথে বাস্তব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগতের কোনো মিল নেই। সে কারণে সবসময়েই তারা ভয়াবহ বিষণ্নতায় ডুবে রয়েছে।

ওমিক্রনিক রূপান্তর করে তৈরি মস্তিষ্কের অনুলিপিগুলোকে বিষণ্নতা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল বিচিত্রভাবে, অনেকগুলো মস্তিষ্কের অনুলিপিকে এক কম্পিউটারে নিজেদের মাঝে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয়ার পর। দেখা গেল হঠাৎ করে কম্পিউটারের ভিতর একটা ছোট সমাজ গড়ে উঠেছে। মস্তিষ্কের অনুলিপিগুলোর মাঝে প্রথমে পরিচয় হল, তারপর বন্ধুত্ব হল এবং সবশেষে একে অন্যকে অসহনীয় বিষণ্নতা থেকে টেনে তুলতে শুরু করল।

তখন হঠাৎ করে ওমিক্রনিক রূপান্তরের সবচেয়ে বড় সাফল্যটি আবিষ্কৃত হল। কম্পিউটারের মাঝে বেঁচে থাকা মস্তিষ্কের অনুলিপিদের বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই, তাদের জন্যে প্রয়োজন কম্পিউটারের ভিতরে একটা জগৎ। পৃথিবীর কম্পিউটার প্রোগ্রামাররা তখন কম্পিউটারের মাঝে একটা জগৎ তৈরি করার কাজে লেগে গেলেন। বিচিত্র সব প্রোগ্রাম লেখা হল। মস্তিষ্কের অনুলিপিগুলোর জন্যে তৈরি হল দেহ, কম্পিউটার প্রোগ্রামে। পুরুষের জন্যে পুরুষের দেহ, নারীর জন্যে নারীর। সেইসব দেহ কম্পিউটারের ভিতরে এক কাল্পনিক জগতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, গাছপালা তৈরি হল কম্পিউটার প্রোগ্রামে। আকাশ তৈরি হল, বাতাস তৈরি হল, দিন, রাত, ঋতু তৈরি হল। সত্যিকার মানুষের মস্তিষ্কের নিখুঁত অনুলিপি একটা শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকল। সেই জগতে তারা ভুলে গেল তাদের দেহ, তাদের চারপাশের জগৎ কোনো–এক প্রোগ্রামের সৃষ্টি। তাদের মনে হল তারা সত্যিকারের মানুষ, তাদের চারপাশের জগৎ সত্যিকারের জগৎ। সেইসব মানুষের মাঝে দুঃখ–বেদনা হাসি–কান্না খেলা করতে থাকে। তারা ধরাছোঁয়ার বাইরের সেই জগতে নিজেদের জন্যে নূতন একটা জগৎ তৈরি করে নেয়। সত্যিকার জগতের সাথে তার আর কোনো পার্থক্য নেই।

ইলেন রুদ্ধশ্বাসে ওমিক্রনিক রূপান্তর নামের সেই বিচিত্র গবেষণার কথা পড়তে থাকে। পৃথিবীর দিকে ছুটে যাওয়া এই মহাকাশযানের নিঃসঙ্গ যাত্রীটি সময়ের কথা ভুলে যায়।

পৃথিবীর খুব কাছাকাছি এসে ইলেন আবার পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ–কক্ষের সাথে যোগাযোগ করল। এবারে তার কথা হল একজন কমবয়সী মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি কোনো কারণে খুব বিচলিত।

বলল, আপনি খুব ভালো আছেন, মহাকাশে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেন খামোকা পৃথিবীতে ফিরে আসছেন?

কেন? কী হয়েছে?

আজকের সন্ধের খবর। লেজারকমে চাকরি করে একজন মানুষ, কাজকর্ম করে না বলে চাকরি গেছে। সেই মানুষ ক্ষেপে গিয়ে এগারটা মানুষ খুন করে ফেলল। চিন্তা করতে পারেন?

ইলেন জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, কী দুঃখের ব্যাপার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ। এদের সহ্য করা হয় বলেই তো এই অবস্থা।

সহ্য করা না-করা তো প্রশ্ন নয়। এরকম একজন দু'জন মানুষ তো সবসময়েই থাকবে। এদের মনে হয় পুরো মানসিক ভারসাম্য নেই। হঠাৎ হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এরকম এক-আধটা অঘটন ঘটায়।

কিন্তু কেন ঘটতে দেয়া হবে?

কিছু তো করার নেই। এদের বিরুদ্ধে তো কিছু করার নেই।

কেন থাকবে না? অবশ্যি আছে।

আছে? ইলেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী করার আছে?

আইন করে দেয়া হবে যে এরকম মানুষ আর কখনো জন্মাতে পারবে না।

আইন করে—ইলেন থতমত খেয়ে যায়, মেয়েটা কী বলছে? আইন করে মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের জন্ম বন্ধ করে দেয়া হবে?

আমি দুঃখিত, আপনি এতদিন পর পৃথিবীতে ফিরে আসছেন, অথচ এরকম মন-খারাপ করে দেয়া কথা বলছি। আমি দুঃখিত।

দুঃখিত হবার কী আছে! এসব হচ্ছে বেঁচে থাকার মাসুল—

সেটাই তো কথা। কেন দুঃখকষ্ট জীবনের মাসুল হবে? আইন করে কেন জীবন থেকে সব দুঃখকষ্ট সরিয়ে দেয়া হবে না?

ইলেন চুপ করে থাকে। কেন মেয়েটা এরকম কথা বলছে? জীবন থেকে সব দুঃখকষ্ট আইন করে সরিয়ে দেবে মানে? এর আগেও মধ্যবয়স্ক সেই বিজ্ঞানী একই কথা বলছিল—তখন ভেবেছিল ঠাট্টা করে বলছে। তাহলে কি সত্যি বলেছিল?

হঠাৎ ইলেনের বুকের ভিতর কেমন জানি একটা অশুভ অনুভূতির জন্ম হয়।

AMARBOI.COM

মহাকাশযানটি নিরাপদে মহাকাশ কেন্দ্রে অবতরণ করল। ইলেন খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে। এরকম দীর্ঘ অভিযানের পর সাধারণত মহাকাশ কেন্দ্রের কর্মকর্তারা দরজা খুলে অভ্যর্থনা করে, আজ কেউ এল না। ইলেন নিজেই দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে আতঙ্কে শিউরে ওঠে—

সামনে বিস্তীর্ণ ধূসর প্রাণহীন পৃথিবী। ক্লেদাক্ত আকাশ, দূষিত পূতিগন্ধময় বাতাস আগুনের হলকার মতো বইছে। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। বিষাক্ত বাতাসে ইলেনের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, চোখ জ্বালা করতে থাকে, কোনোমতে দু' হাতে মুখ ঢেকে সে মহাকাশযানের ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। কোথায় এসেছে সে? কাঁপা গলায় ডাকল, ক্রিকি—

বলুন মহামান্য ইলেন।

বাইরে দেখেছ?

দেখেছি। অত্যন্ত ভয়ংকর পরিবেশ। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম, প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড। সাথে নাইট্রাস অক্সাইড এবং সালফার ডাই- অক্সাইড। চারপাশে ভয়ানক তেজস্ক্রিয়তা, সিজিয়াম ১৩৭-এর পরিমাণ দেখে মনে হয় পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে। এখানে সূর্যের আলোতে আলট্রা- ভায়োলেট রে-এর পরিমাণ অত্যন্ত বেশি, মনে হয় বায়ুমণ্ডলের ওজোনের স্তর পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। মহামান্য ইলেন, এই গ্রহ মানুষের বাসের পক্ষে পুরোপুরি অনুপযুক্ত। এখানে

আমি যতদূর দেখেছি কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই।

কী বলছ তুমি!

আমি দুঃখিত মহামান্য ইলেন, কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি।

কিন্তু আমি মাত্র সেদিন পৃথিবীর সাথে কথা বলেছি—

আমি এখনো তাদের সাথে কথা বলছি মহামান্য ইলেন। আপনি বলবেন?

বলব। ভয়ার্ত গলায় ইলেন বলল, বলব।

সাথে সাথে মনিটরে হাসিখুশি একজন মানুষকে দেখা গেল। মানুষটি বলল, আমি কিম রিগার। পৃথিবীর পক্ষ থেকে আপনাকে আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি সম্মানিত ইলেন।

কিম।

বলুন।

তোমরা কোথায়?

মানে?

আমি কাউকে দেখছি না কেন? পৃথিবী এরকম ভয়ংকর প্রাণহীন কেন? বাতাসে বিষাক্ত গ্যাস—

কিমকে এক মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত দেখায়। সামনে সুইচ বোর্ডে দ্রুত কিছু সুইচ স্পর্শ করে নিজেকে সামলে নেয়। মুখে জোর করে একটা হাসি টেনে এনে বলল, আমাদের ছোট একটা ভুল হয়ে গেছে।

ভুল?

হ্যাঁ, অনেক দিন করা হয় নি, তাই। ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা ভুল।

কী ভুল?

আপনার ওমিক্রনিক রূপান্তর করা হয় নি। তা হলে আপনি আমাদের পৃথিবীতে অবতরণ করতে পারতেন। আপনি ভুল পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন, সেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে বহুকাল আগে। শিল্পবিপ্লবের অভিশাপে সেই পৃথিবী এখন প্রাণহীন। আপনি সেই ভুল পৃথিবীতে পা দিয়েছেন, বাইরে বের হলে আপনি দশ মিনিটের মাঝে প্রাণ হারাবেন, বিষাক্ত ফসজিন গ্যাসের নূতন একটা আস্তরণ তৈরি হচ্ছে এই মুহূর্তে।

ভুল পৃথিবী?

হ্যাঁ। আমরা এখন নূতন পৃথিবী তৈরি করেছি।

নূতন পৃথিবী?

হ্যাঁ। বিশাল টেটরা কম্পিউটার তৈরি হয়েছে মাটির গহ্বরে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সেটা বড় করা হচ্ছে ধীরে ধীরে। সেই মহা কম্পিউটারে গত শতাব্দীতে সব মানুষের ওমিক্রনিক রূপান্তর করা হয়েছে।

সব মানুষের?

হ্যাঁ, সব মানুষের। বাসের অনুপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল পুরানো পৃথিবী। নূতন পৃথিবীতে কোনো বিষাক্ত গ্যাস নেই, ভয়াবহ আলট্রা ভায়োলেট রে নেই, তেজস্ক্রিয় জঞ্জাল নেই। এখানে আছে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, নীল হ্রদ, গহীন অরণ্য, বিশাল অতলান্ত সমুদ্র, মহাসমুদ্র। আগের পৃথিবীতে যেসব ভুল করা হয়েছিল, সব শুধরে নেয়া হয়েছে এখানে। আশ্চর্য একটা শান্তি বিরাজ করছে এই পৃথিবীতে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা তা হলে মানুষ নও? তোমরা আসলে কম্পিউটার প্রোগ্রাম? তোমাদের পৃথিবীও কম্পিউটার প্রোগ্রাম?

হ্যাঁ, কিন্তু নিখুঁত প্রোগ্রাম। আমরা নিখুঁত মানুষ। আমাদের এই পৃথিবী নিখুঁত পৃথিবী।

নিখুঁত পৃথিবী?

হ্যাঁ। আপনি আসেন, নিজের চোখে দেখবেন। আশ্চর্য একটা শান্তি এই পৃথিবীতে। যা কিছু খারাপ, যা কিছু অশুভ—আইন করে সরিয়ে দেবার কথা হচ্ছে এই পৃথিবী থেকে। তখন স্বর্গের মতো হয়ে যাবে এই পৃথিবী।

স্বর্গের মতো?

হ্যাঁ। আপনি আসুন, দেখবেন। আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি এখানে। ওমিক্রনিক রূপান্তরের জন্যে প্রস্তুত আছেন আপনি?

ইলেন তার কথার উত্তর দিল না, বিড়বিড় করে বলল, পৃথিবী নেই? মানুষ নেই? মানুষের দুঃখ কষ্ট ভালবাসা কিছু নেই? কিছু নেই?

সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের একমাত্র জীবিত মানুষ ইলেন দ্রুমাস মহাকাশযানের দরজা খুলে বের হয়ে এল। বাইরে আগুনের হলকার মতো ভয়ংকর বিষাক্ত বাতাস হু হু করে বইছে, তার মাঝে সে মাথা উঁচু করে হাঁটতে থাকে, শৈশবে যে-ভালবাসার পৃথিবীতে সে বড় হয়েছে, তাকে যেন খুঁজছে ব্যাকুল হয়ে।

আর কিছুক্ষণের মাঝেই সে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে নিচে। বিষাক্ত বাতাস তার বক্ষ বিদীর্ণ করে চূর্ণ করে দেবে ক্ষতবিক্ষত ফুসফুসকে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠবে তাঁর আশ্চর্য কোমল দেহ। সেই দেহ পড়ে থাকবে ভয়ংকর এক পৃথিবীর বুকে।

যে-পৃথিবীকে তার নির্বোধ বাসিন্দারা ধ্বংস করেছে নিজের হাতে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

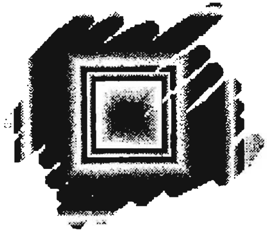

টুকুনজিল

AMARBOI.COM

উৎসর্গ

ইয়েশিম, নীষা, এষা ও নুহাস
তোমাদের পৃথিবী হবে
আমাদের পৃথিবী থেকেও সুন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. লাল গাড়ি

আমি আর বাবা বাজার করে ফিরে আসছিলাম। বাজারের বড় ব্যাগটা আমার হাতে, বাবার হাতে একটা মাঝারি বোয়াল মাছ। বাবা বোয়াল মাছটাকে উপরে তুলে ধরে রেখে সেটার সাথে কথা বলছেন। তাঁর একটু মাথা-খারাপের ভাব আছে, এটা হচ্ছে তার এক নাম্বার লক্ষণ। জন্তু-জানোয়ার, পশুপাখি, গাছপালা সবার সাথে কথা বলেন। বোয়াল মাছটাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা বোয়াল মিয়া, আপনার শরীরটা ভালো? কোন গাং থেকে এসেছেন?

মাছটি মনে হয় এক্ষুণি ধরে এনেছে, এখনো জ্যান্ত। বাবার কথা শুনেই কি না জানি না, দুর্বলভাবে লেজটা একবার নেড়ে দিল। বাবা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, আপনি বাস্তবিকই সত্যি কথা বলেছেন। নীল গাঙের পানি বড়ই ঘোলা। আপনার বেশি কষ্ট হয় নাই তো?

মাছটির আলাপে বেশি উৎসাহ নেই দেখে বাবা সেটাকে একবার ঝাঁকিয়ে দিলেন, তারপর সেটাকে কানের কাছে ধরে রেখে কিছু-একটা শুনে ফেললেন। মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, খাওয়াদাওয়ার কষ্ট? সেটা কার নাই বলেন, তেয়াত্তর সালে মানুষ পর্যন্ত না খেয়ে রাস্তায় মরে আছে—

আমি বললাম, বাবা, তুমি আসলেই মাছের কথা শুনতে পাও?

বাবা অবাক হয়ে বললেন, কেন শুনতে পাব না?

কেমন করে শোন?

ওরা বলে, তাই শুনি।

আমরা তো শুনি না।

বাবা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, শুনতে চাইলে সবাই শুনতে পারে। কেউ তো শুনতে চায় না।

তুমি আমাকে শোনাতে পারবে?

বাবা চোখ উজ্জ্বল করে বললেন, কেন পারব না? এক শ' বার পারব। তুই শুনবি?

আমি বললাম, শুনব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা বড় একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বললেন, নে, ব্যাগটা রাখ্। তারপর চোখ বন্ধ করে গাছের সাথে তোর কানটা লাগা। যখন গাছের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পারবি তখন বলবি, জনাব গাছ, আপনার শরীরটা ভালো?

আমি বললাম, আপনি করে কেন বলতে হয়?

কত বয়স গাছের, সম্মান করে কথা বলতে হয় না? নে, ব্যাগটা আমার হাতে দে।

সড়ক দিয়ে আরো কত লোকজন যাচ্ছে–আসছে, এর মাঝে চোখ বন্ধ করে গাছের সাথে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কেমন করে? এমনিতেই বাবার একটু মাথা-খারাপ বলে আমাদের কত যন্ত্রণা, চেনা কেউ-একজন দেখে ফেললে কোনো উপায় আছে? আমি বললাম, আজ থাক বাবা, আরেকদিন শুনব।

বাবার মন-খারাপ হল, মুখটা কালো করে বললেন, এই জন্যে তোরা শুনতে পারিস না, তোদের শোনার আগ্রহ নাই।

বাবা আরো কী বলতে চাইছিলেন, কিন্তু হঠাৎ দূরে কী দেখে থেমে গেলেন। আমিও তাকালাম, দূরে ধুলা উড়িয়ে সড়ক দিয়ে শব্দ করে কী-একটা আসছে। গ্রামের সড়ক, একটা দুইটা রিকশা ছাড়া কিছু যায় না। মাঝে মাঝে পাশের গঞ্জ থেকে একটা পুরানো ট্রাক আসে। মেম্বার সাহেব একটা মোটর সাইকেল কিনেছেন, তাঁর বড় শালা মাঝে মাঝে ফটফট শব্দ করে চালিয়ে বেড়ায়, এর বেশি কিছু নেই। আমিও তাকিয়ে রইলাম, প্রচণ্ড শব্দ করে ধূলা উড়িয়ে লাল রংয়ের একটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এই সড়ক দিয়ে গাড়ি খুব একটা আসে না, আশেপাশে যারা ছিল সবাই হাঁ করে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল।

বাবাও খানিকক্ষণ অবাক হয়ে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, ইস্! কী একটা জিনিস!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, গাড়ি যায় কেমন করে, বাবা?

বাবা অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ভিতরে মনে হয় পাওয়ার আছে। যখন পাওয়ার সামনে দেয় তখন সামনে যায়, যখন পিছনে দেয় তখন পিছনে যায়। পাওয়ার হচ্ছে বড় জিনিস, যার পাওয়ার নাই তার কিছু নাই।

কথাটার কি মানে আমি ঠিক বুঝলাম না, পাগল মানুষ; যখন যেটা মনে হয় সেটা বলে ফেলেন, লোকজন শুনে হাসাহাসি করে। খুব খারাপ লাগে তখন। আমার যখন অনেক পয়সা হবে তখন বাবাকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাব, আজকাল নাকি পাগলের চিকিৎসা হয়।

বাবার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়।

বাড়ির সামনে এসে দেখি সেখানে মস্ত ভিড়। লাল গাড়িটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর সেটাকে ঘিরে অনেক লোকজন। সবাই গাড়িটা একবার ছুঁয়ে দেখতে চায়। ফুলপ্যান্ট পরা একজন মানুষ—নিশ্চয়ই গাড়ির ড্রাইভার হবে, মুখের কোনে একটা সিগারেট কামড়ে ধরে হুঙ্কার দিয়ে বলছে, খবরদার, কেউ কাছে আসবে না, একেবারে জানে মেরে ফেলব।

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম যে, ছোট খালা এসেছেন। ছোট খালা হচ্ছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের বড়লোক আত্মীয়দের মাঝে এক নম্বর। চেহারা খুব ভালো বলে নানাজান অনেক বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন। ছোট খালু ইঞ্জিনিয়ার, জার্মানি বা আমেরিকা কোথায় জানি গিয়েছিলেন, সেখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে এসেছেন। এটা নিশ্চয়ই সেই গাড়ি।

আমি প্রায় ছুটে ভিতরে ঢুকে গেলাম, বাইরে যেরকম ভিড়, ভিতরেও সেরকম ভিড়। উঠানের মাঝখানে একটা চেয়ারে ছোট খালা বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে পাড়ার সব বৌ-ঝিরা দাঁড়িয়ে আছে। ছোট খালা দরদর করে ঘামছেন, রাঙা বুবু একটা হাতপাখা দিয়ে তাঁকে প্রাণপণে বাতাস করে যাচ্ছে। ছোট খালা একসময়ে নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু এখন আর দেখে বোঝা যায় না, মোটা হয়ে গোল একটা কলসির মতো হয়ে গেছেন। গায়ের রং অবশ্যি ধবধবে ফর্সা, কেমন যেন একটা গোলাপী আভা। তার পাশে আমার মা'কে দেখাচ্ছিল শুকনা, কালো এবং অনেক বেশি বয়স।

আমি ছোট খালু কিংবা তাঁদের ছেলেমেয়েদের খুঁজে পেলাম না, মনে হয় ড্রাইভারকে নিয়ে একাই এসেছেন। মা তাঁর ছোট বোনকে দেখে খুব খুশি হয়েছেন, কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আমাকে দেখে বললেন, বিলু, তোর ছোট খালাকে সালাম কর।

আমি ব্যাগটা রেখে ছোট খালাকে সালাম করতে এগিয়ে যেতেই ছোট খালা পা গুটিয়ে নিয়ে বললেন, থাক, থাক, সালাম করতে হবে না।

আমি তবুও হামলে পড়ে সালাম করে ফেললাম। ছোট খালা বললেন, তুই বিলু কত বড় হয়েছিস দেখি!

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে শুধু বোকার মতো একটু হাসলাম। ছোট খালা বললেন, স্কলারশিপ পেয়েছিস শুনলাম, খুব ভালো, খুব ভালো।

মা বললেন, এই সংসারে কি পড়ার সময় পায়? তার মাঝে বৃত্তি পেয়ে গেল, ডিস্ট্রিক্টের মাঝে এক নাম্বার।

মা এমনভাবে বললেন যে শুনে আমি নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলাম। কিছু-একটা বলতে হয়, কিন্তু কী বলব বুঝতে পারলাম না, পায়ের নখ দিয়ে উঠানের মাটি খুঁচিয়ে তুলতে থাকলাম। মা জিজ্ঞেস করলেন, তোর বাবা কই?

বাইরে। গাড়ি দেখছেন। কী সুন্দর গাড়ি মা! তুমি দেখেছ?

ছোট খালা খুশি হয়ে বললেন, কই আর সুন্দর। মেটাল কালার চাচ্ছিলাম, পাওয়াই গেল না।

মা বললেন, তোর বাবাকে ডেকে আন্ গিয়ে, যা।

আমি ছুটে বের হয়ে গেলাম।

বাবা ছোট খালাকে দেখেই বললেন, শানু, তুমি এত মোটা হলে কেমন করে? ভালোমন্দ অনেক খাও মনে হয়।

বাবা পাগল মানুষ, কখন কী বলতে হয় জানেন না, যখন যেটা মুখে আসে বলে ফেলেন। বাবার কথা শুনে ছোট খালা একেবারে পাকা টমেটোর মতো লাল হয়ে গেলেন। তাই দেখে মা খুব রেগে গেলেন, বললেন, কী-সব কথা বলেন আপনি, মাথামুণ্ডু কিছু নাই।

বাবা মুখ গম্ভীর করে বললেন, ভুল বলছি আমি? তুমি তো মোটা হও নাই—হয়েছ? ভালোমন্দ খেতে পাও না, কেমন করে মোটা হবে?

মা লজ্জায় একেবারে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিলেন, কোনোমতে বললেন, আপনি এখন যান তো দেখি।

ঠিক তখন একটা মোরগ কঁক কঁক করে ডেকে উঠল, হয়তো আকাশে একটা চিল উড়ে যেতে দেখেছে বা অন্য কিছু। বাবা লাফিয়ে উঠে বললেন, ঐ দেখ, মোরগটাও বলেছে, দেখেছ? দেখেছ?

বাবা মোরগটার দিকে এগিয়ে গেলেন, ভুল বলেছি আমি? ভুল বলেছি?

লজ্জায় দুঃখে মায়ের চোখে একেবারে পানি এসে যাচ্ছিল। ছোট খালা সামলে নিয়ে বললেন, দুলাভাই তো দেখি একেবারে বদ্ধ পাগল! বুবু, তোমার একি অবস্থা? ছেলেপুলে নিয়ে কী করবে তুমি?

মা লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আল্লাহ্ দিয়েছে, আল্লাহ্ দেখবে।

আমি আস্তে আস্তে বাইরে চলে এলাম, মনটা কেন জানি খারাপ হয়ে গেল।

দুপুরবেলা খেতে বসে ছোট খালা শুধু ছটফট করলেন। বাসায় চেয়ার-টেবিলে বসে খান, এখানে মেঝেতে মাদুর পেতে বসতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। ছোট খালা বেশি কিছু খেলেনও না, খাবারগুলো শুধু হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। এত কম খেয়ে ছোট খালা এত মোটা হলেন কেমন করে কে জানে।

AMARBOI.COM

খাবারের মাঝামাঝি হঠাৎ ছোট খালা বললেন, বুবু, বিলুকে নিয়ে যাই আমার সাথে, ঢাকায় থেকে পড়াশোনা করবে।

আমার নিজের কানকে বিশ্বাস হল না, এত বড় কপাল কি আমার সত্যি কখনো হবে? মায়ের মুখের দিকে তাকালাম, মা কি রাজি হবেন? যদি না বলে বসেন?

মা কোনো উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বাবার দিকে তাকালেন। বাবা বোয়াল মাছের মাথাটা খুব যত্ন করে চুষছেন, ছোট খালার কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না।

ছোট খালা আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী বল, বুবু?

উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হল। ছোট খালার বাসায় থাকব আমি? লাল গাড়ি করে যাব-আসব আমি? ফ্রিজ থেকে বরফ বের করে খাব? আমি আবার মায়ের মুখের দিকে খুব আশা নিয়ে তাকালাম। মা খানিকক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে খুব আস্তে আস্তে বললেন, ঠিক আছে শানু।

আমার ইচ্ছে হল খুশিতে একটা লাফ দিই, অনেক কষ্ট করে নিজেকে থামিয়ে রাখলাম।

ছোট খালা বললেন, আজই চলুক আমার সাথে। গাড়ি করে চলে যাবে।

মা একটু চমকে উঠে বললেন, আজই?

আমি উদগ্রীব হয়ে বললাম, হ্যাঁ মা, যাই?

মায়ের মুখে কেমন জানি একটা দুঃখের ছায়া পড়ল। আবার বাবার দিকে তাকালেন, বাবা তখনো গম্ভীর মুখে মাছের মাথাটা চুষছেন। মা খুব আস্তে আস্তে, প্রায় শোনা যায় না স্বরে বললেন, ঠিক আছে শানু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ির চারদিকে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার জোরে জোরে দুইটা হর্ন দিল, তবু সামনে থেকে কেউ নড়ল না। ড্রাইভার চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতেই সবাই একটু সরে দাঁড়াল। বড়রা তখন ছোট বাচ্চাদের ঠেলে ঠেলে সরিয়ে গাড়িটা যাবার একটা জায়গা করে দিল। আমি গাড়ির সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছি, ছোট খালা বসেছেন পিছনে। গাড়ির পিছন থেকে সবকিছু অন্যরকম দেখায়। নিজেকে কেমন জানি রাজা রাজা মনে হয়।

আমি বাড়ির ভিতরে তাকালাম, বেড়ার ফাঁক দিয়ে মা তাকিয়ে আছেন। মায়ের চোখে আঁচল। মায়ের পিছনে রাঙাবুবু। বড় বুবু শ্বশুরবাড়ি থেকে আসতে পারে নি। লাবুটা বোকার মতন চিৎকার করে কাঁদছে, সেও আমার সাথে গাড়ি করে যেতে চায়। রশীদ চাচা তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। এক পাশে দুলাল আমার লাইব্রেরির বই কয়টা শক্ত করে বুকে চেপে ধরে রেখে কেমন জানি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দুলাল হচ্ছে আমার প্রাণের বন্ধু—এরকম হঠাৎ করে এভাবে চলে যাব সে এখনো বিশ্বাসই করতে পারছে না। দুলালকে আমি সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি, আমার লাইব্রেরির সবগুলো বই, আমাদের গ্রিন বয়েজ ক্লাবের ফুটবলটা, দেয়াল-পত্রিকার লেখাগুলো। এতগুলো ঝামেলা সে একা কেমন করে সামলাবে কে জানে!

ড্রাইভার ঠিক যখন গাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে জানি বাবা এসে হাজির হলেন। গাড়ির জানালা দিয়ে অবাক হয়ে ভিতরে আমার দিকে তাকালেন। তারপর অবাক হয়ে বললেন, এইটা কে, বিলু না?

আমি মাথা নাড়লাম।

বাবা বললেন, ভিতরে বসে আছিস যে? গাড়ি যে ছেড়ে দেবে এক্ষুনি—

আমি বললাম, বাবা, আমি তো ছোট খালার সাথে যাচ্ছি।

কী বললি?

আমি ছোট খালার সাথে যাচ্ছি।

কোথায়—

আমি কিছু বলার আগেই ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। ধুলা উড়িয়ে বাবাকে পিছনে ফেলে গাড়ি ছুটে চলে গেল সামনে। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলাম বাবা অবাক হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমার প্রথমবার কেমন জানি একটু মন-খারাপ হয়ে গেল।

২. বল্টু

ছোট খালার বড় ছেলের নাম বল্টু। ভালো একটা নাম আছে, শাহনাওয়াজ খান না কি যেন, কিন্তু সবাই তাকে বল্টু বলেই ডাকে। বল্টু কারো নাম হয় আমি জানতাম না, কিন্তু তাকে দেখে মনে হল বল্টু নামটা তার জন্যে একেবারে মানানসই। গাট্টাগোট্টা শরীর, মাথাটা ধড়ের উপর বসানো। বয়সে আমার সমান কিন্তু লম্বায় আমার থেকে

AMARBOI.COM

অন্তত আধহাত ছোট। আমাকে প্রথমবার দেখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, এইটা কে?

ছোট খালা বললেন, বিলু, তোর খালাতো ভাই।

যার বাবা পাগল?

ছোট খালা ধমক দিয়ে বললেন, ছিঃ। এইভাবে বলে না।

বল্টু মুখ গোঁজ করে জিজ্ঞেস করল, কতদিন থাকবে?

ছোট খালা বললেন, ছিঃ বল্টু! এইভাবে কথা বলে না।

তার মানে অনেক দিন। বল্টু মুখ লম্বা করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, কোন ক্লাসে পড়ে?

আমি উত্তর দিলাম, বললাম, সেভেন।

রোল নাম্বার কত?

এক।

সাথে সাথে বল্টুর মুখটা কালো হয়ে গেল। প্রথমে দেখা হওয়ামাত্র কাউকে তার রোল নাম্বার জিজ্ঞেস করা মনে হয় ঠিক না। কিন্তু আমাকে যখন জিজ্ঞেস করেছে, আমি কেন করব না? কারো রোল নাম্বার তো আর এক থেকে কম হতে পারে না। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার রোল নাম্বার কত?

বল্টু উত্তর দেবার আগেই তার ছোটজন মিলি একগাল হেসে বলল, ভাইয়া পরীক্ষায় লাড্ডা গাড্ডা! সব সাবজেক্টে রসগোল্লা!

বলামাত্র বল্টু তার ছোট বোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিল।

আমি বুঝতে পারলাম, এই বাসায় বল্টু হবে আমার শত্রুপক্ষ। নিয়ম অনুযায়ী মিলি হওয়া উচিত মিত্রপক্ষ, কিন্তু এসব ব্যাপারে কিছু জোর দিয়ে বলা যায় না।

AMARBOI.COM

রাতে খাবার টেবিলে ছোট খালুর সাথে দেখা হল। অনেক দিন আগে জার্মানি না আমেরিকা থেকে একটা রঙিন ছবি পাঠিয়েছিলেন। সেই ছবিতে ছোট খালু সারা গায়ে জাব্বাজোব্বা জড়িয়ে একটা শাবল দিয়ে বাসার সামনে বরফ পরিষ্কার করছিলেন। ধবধবে সাদা বরফের সামনে তাকে দেখাচ্ছিল বেগুনি রঙের। মানুষের রং বেগুনি হয় কেমন করে সেটা নিয়ে আমার সবসময়েই একটু কৌতূহল ছিল। আজ দেখলাম রংটা বেগুনি নয়, তবে একটু কালোর দিকে। আমার সাথে ছোট খালুর একটু কথাবার্তা হল। জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ির সবাই ভালো?

জ্বি।

তোমরা তো চার ভাই-বোন?

জ্বি।

শিউলি, রানু, তারপর তুমি। তোমার পরে একজন ভাই।

জ্বি।

ভাইয়ের নাম যেন কি?

লাবু। ভালো নাম আতাউল করিম।

ও আচ্ছা। বেশ বেশ। ছোট খালু খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন, শিউলির তো

বয়স বেশি না, এর মাঝে বিয়ে হয়ে গেল?

জ্বি।

পড়াশোনাটা শেষ করলে হত।

ছোট খালা নাক দিয়ে ফোঁৎ করে একটা নিঃশ্বাস বের করে বললেন, গ্রামের ব্যাপার, ঢ্যাঙা একটা মেয়েকে স্কুলে পাঠাবে কেমন করে?

ছোট খালু বললেন, পড়াশোনায় তো ভালো ছিল, তাই না?

জ্বি।

খালু চুকচুক শব্দ করে বললেন, মেয়েদের পড়াশোনাটা খুব দরকার, খুব দরকার।

ছোট খালু মানুষটাকে দেখে রাগী রাগী মনে হয়, কিন্তু আসলে মনে হয় রাগী নয়। মনটা খুব ভালো। একবার মনে হল সত্যি কথাটি বলে দিই, যে, বাবা পাগল বলে বড় বুবুর বিয়ের কোনো প্রস্তাবই আসছিল না। তাই যখন বিয়ের একটা প্রস্তাব এসেছে, তাড়াহুড়ো করে সবাই মিলে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি কিছু বললাম না, বাবার পাগলামি নিয়ে কোনো কথা বলতে আমার একেবারে ভালো লাগে না।

রাত্রে ঘুমানোর সময় একটা সমস্যা দেখা দিল, আমি কোথায় ঘুমাব সেটি ঠিক করা হয় নি। মিলি আর বল্টুর আলাদা ঘর, দু'জনের জন্যে দুটি আলাদা বিছানা। ছোট খালা আমাকে বল্টুর সাথে শোওয়ার কথা বলামাত্রই সে নাক ফুলিয়ে একরকম ফোঁস ফোঁস জাতীয় শব্দ শুরু করে দিল। ছোট খালু কড়া স্বরে বল্টুকে কী-একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে থামিয়ে বললাম, খালু, আমি কি নিচে শুতে পারি?

নিচে? মেঝেতে?

জ্বি। একটা বালিশ আর একটা চাদর হলেই হবে।

ছোট খালু একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, আমার আসলে একলা শোয়াই ভালো।

কেন?

আমি নাকি ঘুমের মাঝে শুধু উল্টাপাল্টা করি। রাঙাবুবু বলেছে। আমি অবশ্যি টের পাই না। কিন্তু যে আমার সাথে ঘুমায় সে টের পায়।

মিলি বলল, কিন্তু ভাইয়ার মতো তো আর তুমি বিছানায় পি—

বল্টু একটা হুঙ্কার দিল বলে মিলি কথা শেষ করতে পারল না, কিন্তু শব্দটা নিশ্চয়ই 'পিশাব'-ই হবে!

আমাকে সে-রাতের মতো মেঝেতে বিছানা করে দেয়া হল। নিচে তোশক তৈরি করা হয়েছে একটা লেপ ভাঁজ করে। মশারিটাও টানাতে হয়েছে খুব কায়দা করে, তিনটি কোনা উঁচু, কিন্তু চার নাম্বার কোনাটি ঝুলে পড়ে সেটাকে একটা কালবোশেখির ঝড়ে ভেঙে-পড়া বাসার মতো দেখাতে লাগল।

রাতে একা-একা বিছানায় শুয়ে রইলাম। বাড়িতে আমি আর লাবু রাঙাবুবুর সাথে ঘুমাই। ঘুমানোর আগে লাবু বলে, রাঙাবুবু, একটা গল্প বল।

আমি কিছু বলি না, এত বড় হয়ে গেছি, গল্প বলার কথা বলি কেমন করে? রাঙাবুবু প্রথমে বলে, ঘুমা ঘুমা, কত রাত হয়েছে দেখেছিস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাবু তখন ঘ্যান ঘ্যান শুরু করে, তখন আমিও বলি, বল–না একটা গল্প, রাঙাবুবু।

আমি শুনতে চাইলে রাঙাবুবু খুব খুশি হয়, তখন বলে, কোনটা শুনবি?

আমি কোনোদিন বলি রবিনসন ক্রুসো, কোনোদিন বলি যখের ধন। সব বই আমিও পড়েছি, রাঙাবুবুর জন্যে বই তো আমিই আনি লাইব্রেরি থেকে। সব আমার জানা গল্প, তবু রাঙাবুবুর মুখ থেকে শুনতে এত ভালো লাগে! সব যেন একেবারে চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে যায়!

রাঙাবুবু যখন গল্প শুরু করে, কী ভালোই না তখন লাগে!

আজকে আমি একা। ঘরে কি সুন্দর একটা নীল বাতি জ্বলছে, সবকিছু আবছা আবছা দেখা যায়, মনে হয় ঘরের ভিতর যেন জোছনা হয়েছে। কেমন জানি অবাস্তব মনে হয় সবকিছু। ঘুমের মাঝে বল্টু নড়াচড়া করছে, শুনলাম দাঁত কিড়মিড় করে বিড়বিড় করে বলছে, ফাটিয়ে ফেলব, একেবারে ফাটিয়ে ফেলব।

কে জানে আমাকে লক্ষ করেই বলছে কি না!

৩. নূতন স্কুল

বল্টুর স্কুলে সিট পাওয়া গেল না বলে আমাকে অন্য একটা স্কুলে ভর্তি করা হল, স্কুলটা বাসা থেকে বেশ দূরে। নূতন স্কুলে আমাদের ক্লাস–টিচারের বেশ বয়স। চোখে চশমা, মুখে গোঁফ এবং কেমন জানি একটু রাগী রাগী চেহারা। প্রথম দিন আমাকে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত একনজর দেখে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, নাম কি?

বিলু বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে ভালো নামটি বললাম, নাজমুল করিম।

বাসায় কী ডাকে? নাজমুল, না করিম?

বাসায় ডাকে বিলু।

বিলু? স্যার হাত নেড়ে বললেন, মাথায় কি আছে ঘিলু?

ক্লাসের সবাই হো হো করে হেসে উঠল, তখন আমিও একটু সহজ হলাম। স্যারের চেহারাটা রাগী রাগী, কিন্তু মানুষটা মনে হয় খুব ভালো। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, কোন স্কুল থেকে এসেছিস?

নীলাঞ্জনা হাই স্কুল।

নীলাঞ্জনা? বাহ্, কী সুন্দর নাম। কোথায় স্কুলটা?

আমাদের গ্রামে। রতনপুর স্টেশন থেকে চার মাইল পুব দিকে।

রতনপুর? সেটা কোথায়?

আমার খানিকক্ষণ লাগল স্যারকে বোঝাতে জায়গাটা কোথায়। ভেবেছিলাম চিনবেন না, কিন্তু অবাক ব্যাপার, স্যার ঠিকই চিনলেন। মাথা নেড়ে বললেন, তুই তো তাহলে একেবারে একটা গ্রামের স্কুল থেকে এসেছিস! ভেরি ইন্টারেস্টিং। কী রকম পড়াশোনা হয় আজকাল বল্ দেখি?

ভালোই হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র কয়জন?

আমি মাথা চুলকালাম, স্কুলে ছাত্র কয়জন কখনো তো বের করার চেষ্টা করি নি। অ্যাসেমব্লির সময় মাঠের আধাআধি প্রায় ভরে যায়—কিন্তু সেটা তো উত্তর হতে পারে না। ইতস্তত করে বললাম, অনেক।

অনেক? এটা আবার কী রকম উত্তর হল? একটা নাম্বার বল্।

জানি না স্যার।

তোর ক্লাসে কয়জন ছাত্র?

এখন তিরিশ জন। বর্ষার সময় কমে যায়, যাতায়াতের অসুবিধে, তাই।

কী রকম অসুবিধে?

পানি উঠে যায়। রাস্তাঘাট ডুবে যায়। অনেক ঘুরে বড় সড়ক দিয়ে যেতে হয়। কাদা-পানিতে হাঁটা খুব শক্ত।

ক্লাসের একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করল, তখন কি তোমরা বুট পরে যাও?

স্যার হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, ধুর বোকা। গ্রামের ছেলেদের বুট-ফুট লাগে না, তারা খালি পায়েই হেঁটে যেতে পারে।

স্যার ঠিকই বলেছেন, জুতা আমি বলতে গেলে কখনই পরি নি। এখন পরে আছি, কিন্তু সেটা তো স্কুলের পোশাক, সাদা শার্ট, নীল প্যান্ট আর কালো জুতা।

স্যার জিজ্ঞেস করলেন, গ্রাম থেকে হঠাৎ চলে এলি যে?

আমার ছোট খালার বাসায় থেকে পড়াশোনা করতে এসেছি, স্যার।

ও। তাহলে তোর আব্বা-আম্মা কোথায় আছেন?

বাড়িতে।

ও। ও। স্যার মাথা নেড়ে চুপ করে গেলেন। একটু পরে বললেন, যা গিয়ে বস। নূতন নূতন তোর একটু অসুবিধে হতে পারে, আমাকে বলিস।

আমি পিছনের দিকে গিয়ে একটা খালি সিটে বসলাম, একজন একটু সরে আমাকে জায়গা করে দিল। আমাকে খুব ভালো করে লক্ষ করল ছেলেটা। ক্লাসে নূতন ছেলে এলে মনে হয় এভাবে লক্ষ করতে হয়।

ঘন্টা পড়ার পর স্যার চলে যেতেই দু'জন ছেলে আমার দিকে এগিয়ে এল। একজন ফর্সা মতো শুকনো, অন্যজন বেশ গাট্টাগোট্টা। ফর্সা মতন ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, বর্ষাকালে তুমি কি লুঙ্গি পরে স্কুলে যেতে?

ছেলেটা কেন এটা জিজ্ঞেস করছে বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করার ধরনটা বেশি ভালো না, কিন্তু তবু আমি উত্তর দিলাম। বললাম, হ্যাঁ। লুঙ্গি না পরে যাওয়া কঠিন। কখনো হাঁটু পানি, কখনো আরো বেশি—

ফর্সা ছেলেটা তার সঙ্গীর পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, দ্যাখ—আমি বলেছি না?

গাট্টাগোট্টা সঙ্গীটি বলল, বাতাসে যখন তোমার লুঙ্গি উড়ে পাছা বের হয়ে যায় তখন তুমি কী কর?

আমি টের পেলাম, আমার মাথার ভিতরে আগুন ধরে গেছে। বাবা পাগল বলে সারা জীবন শুধু লোকজনের টিটকারি শুনে এসেছি, এটা আমার কাছে নূতন কিছু না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিটকারি কেমন করে শুনতে হয় আমার থেকে ভালো করে কেউ জানে না। টিটকারি শুনে কী করতে হয়, সেটাও আমার থেকে ভালো করে কেউ জানে না।

আমি খপ করে ছেলেটার শার্টের কলারটা ধরে বললাম, আমি তোমার মশকরার মানুষ না। আমার সাথে মশকরা কোরো না, দাঁত ভেঙে ফেলে দেব।

ছেলেটা আর যাই করুক, আমার কাছে এই রকম ব্যবহার আশা করে নি—একেবারে থতমত খেয়ে গেল। কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন স্যার এসে গেলেন, কিছু বলতে পারল না। নিজের জায়গায় বসে একটু পরে পরে আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাতে লাগল। কে জানে ব্যাপারটি ভালো হল কি না—কিন্তু আমি দেখেছি ফিচলে বদমাইশগুলোকে এই ওষুধ দিয়ে খুব সহজে সিধে করে দেয়া যায়।

আমার পাশে যে বসেছিল, সে গলা নামিয়ে বলল, লিটন হচ্ছে জুনিয়ার ব্ল্যাক বেল্ট।

লিটন কে?

তুমি যার কলার ধরেছ।

সে কি?

ব্ল্যাক বেল্ট। নেপালে গিয়েছিল কম্পিটিশানে। সিলভার মেডেল পেয়েছিল।

স্যার হুঙ্কার দিলেন, কে কথা বলে রে?

পাশের ছেলেটি চুপ করে গেল, আমি তাই জানতে পারলাম না ব্ল্যাক বেল্ট মানে কি।

AMARBOI.COM

ব্ল্যাক বেল্ট মানে কি জানতে পারলাম টিফিনের ছুটিতে। স্যার বের হয়ে যেতেই গাট্টাগোট্টা লিটন আর ফর্সা মতন চশমা-পরা ছেলেটা আমার কাছে এগিয়ে এল। ক্লাসের বেশির ভাগ ছেলেরা কী ভাবে জানি বুঝে গেছে কী-একটা হবে, সবাই ক্লাসের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

লিটন আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল, এরকম সময় তাই করার নিয়ম, তারপর বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, তোকে আজ কিমা বানাব।

আমার একটুও ভয় লাগল না, জীবনে অনেক মারপিট করেছি, কাজেই জানি এটা এমন কিছু কঠিন জিনিস না। যারা মারপিট করে না, তারা মনে করে ব্যাপারটা সাংঘাতিক কিছু-একটা, খুব ভয় পায়। আমি লিটনের বুকের ধাক্কাটা ফেরত দিয়ে বললাম, আমাকে জ্বালিও না।

লিটন আবার আমার বুকে ধাক্কা দিল, এবারে আরেকটু জোরে, তারপর বলল, একেবারে কিমা বানিয়ে দেব।

মনে হচ্ছে সত্যি মারপিট করতে চায়, অনেক সময় এগুলো ভয় দেখানোর জন্যে করা হয়, কিন্তু মনে হচ্ছে এটা শুধু ভয় দেখানোর জন্যে নয়। মারপিট করার আগে অবস্থাটা একটু বুঝে দেখতে হয়, আমি আশেপাশে তাকালাম। ক্লাসের প্রায় সবাই মজা দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। মারপিট দেখার মতো মজার ব্যাপার কী হতে পারে? আমিও খুব শখ করে দেখি। শুরু হওয়ার পর কেউ কারো পক্ষ নেবে কি না সেটা হচ্ছে বড় কথা। মনে হয় নেবে না, সাধারণত নেয় না। চশমা-পরা ফর্সা ছেলেটা লিটনের পক্ষ নিতে পারে, কিন্তু দেখে মনে হয় না সে মারপিট করার মতো ছেলে,

একটা কোঁৎকা খেলে সিধে হয়ে যাবে।

লিটন আবার বুকে ধাক্কা দিয়ে বলল, শালা।

আমি লিটনের বুকে ধাক্কাটা ফেরত দিয়ে বললাম, গালিগালাজ করবে না।

করলে কী করবি?

তুই তুই করে কথা বলবে না।

এক শ'বার বলব। তুই তুই তুই—

মারপিট করতে চাও?

কান ধরে দশবার ওঠবোস কর্, তা হলে ছেড়ে দেব।

তার মানে আসলেই মারপিট করতে চায়। নূতন স্কুলে নূতন ক্লাসে প্রথম দিনে এসেই মারপিট করাটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু সবই কপাল। আমি বললাম, আয় তাহলে।

লিটন একটু পিছনে সরে গিয়ে দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াল, তারপর কেমন একটু বিচিত্রভাবে আস্তে আস্তে শরীরটাকে নাড়াতে শুরু করল। দেখে মনে হল মারপিট করার ব্যাপারটা খুব ভালো জানে, এই লাইনে নূতন আমদানি না। বলল, আয় শালার ব্যাটা।

আমি বললাম, তুই আয়।

লিটন বলল, সাহস থাকলে তুই আয়।

আমার সাহসের অভাব নেই, কিন্তু প্রথমে আমি তার গায়ে হাত তুলতে চাই না, সেটা ঠিক না। ব্যাপারটা যখন বড়দের সামনে যাবে তখন কে শুরু করেছে সেটা নিয়ে খুব হৈ চৈ হবে। আমি বললাম, আয় দেখি তোর কত সাহস।

লিটনও এগিয়ে এল না, মারপিটের নিয়মকানুন সেও জানে। বলল, আয় দেখি শালার ব্যাটা। সাহস না থাকলে তোর বাপকে নিয়ে আয়।

আমাকে রাগানোর চেষ্টা করছে। আমাকে রাগানো এত সোজা নয়, কিন্তু বাবাকে টেনে কথা বললে ভিন্ন কথা। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, চিৎকার করে বললাম, খবরদার, বাবাকে নিয়ে কথা বলবি না।

আমি লিটনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর যেটা হল আমি সেটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। লিটন ম্যাজিকের মতো সরে গেল, শুধু তাই না, শূন্যে উঠে এক পাক ঘুরে গেল, তারপর কিছু বোঝার আগে পা ঘুরিয়ে আমার মুখের উপর প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মেরে বসল। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম, মাথা ঘুরে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলাম, নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম, পারলাম না। একটা বেঞ্চের মাঝে মাথা ঠুকে গেল, তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে মেঝের উপর আছড়ে পড়লাম।

দাঁত দিয়ে জিব কেটে গেছে। মুখের রক্তের নোনা স্বাদ পাচ্ছি।

কোনোমতে উঠে দাঁড়াতেই লিটন আবার শূন্যে ঘুরে গিয়ে পা দিয়ে আমার মুখে লাথি মারার চেষ্টা করল, সতর্ক ছিলাম বলে কোনোমতে মাথাটা কাটালাম, কিন্তু লাথিটা এসে লাগল বুকে। আমি একেবারে কাটা কলাগাছের মতো মেঝেতে আছড়ে পড়লাম।

নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না, মনে হল বুঝি মরেই যাব। কিন্তু আমি মরলাম না— অপমান সহ্য করার জন্যে মানুষকে মনে হয় বেঁচে থাকতে হয়।

লিটন আমার উপর ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের উপর থুতু দিয়ে বলল, এবারে ছেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলাম। পরের বার জান শেষ করে দেব। জান না শালা তুমি কার সাথে লাগতে এসেছ?

আমি কোনোমতে ওঠার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। লিটন আমার সামনে দাঁড়িয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, তোরা সাক্ষী। কে আগে শুরু করেছে?

কেউ কিছু বলল না।

কে শুরু করেছে?

তবু কেউ কোনো কথা বলল না। ফর্সা মতন চশমা-পরা ছেলেটা আমাকে দেখিয়ে বলল, এই বুদ্ধু।

লিটন একগাল হেসে বলল, হ্যাঁ, এই বুদ্ধু। যেরকম বুদ্ধি সেরকম শাস্তি।

তারপর অনেকটা সেনাপতির মতন ভাব করে ক্লাসঘর থেকে বের হয়ে গেল। সাথে আরো কয়েকজন।

ক্লাসে আমার পাশে যে ছেলেটি বসেছিল, সে আমাকে টেনে তুলে বলল, তোমাকে বলেছিলাম না লিটন ব্ল্যাক বেল্ট। এখন বুঝেছ?

আমি খানিকটা বুঝতে পারলাম। বইপত্রে জুজুৎসুর যে গল্প পড়েছি, সেরকম কিছু-একটা। গল্প পড়েছিলাম, সত্যি যে হতে পারে সেটা কখনো চিন্তা করি নি।

ছেলেটা বলল, তোমার কপালে আজ অনেক দুঃখ আছে।

আমি কিছু বললাম না, ছেলেটা আবার বলল, লিটন আমাদের ফার্স্ট বয়। তোমার কত বড় সাহস যে লিটনের সাথে মারপিট করতে গেছ?

ফার্স্ট বয়? আমি অবাক হলাম। এরকম আগে কখনো দেখি নি, গুণ্ডাধরনের ছেলেদের সাধারণত পাস করা নিয়েই সমস্যা হয়।

হ্যাঁ। তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আমার মাথাটা তখনো হালকা হালকা লাগছে। কপালে দুঃখ আছে কি নেই সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো অবস্থা নেই। মেঝেতে রক্ত-মেশানো খানিকটা থুতু ফেলে বললাম, তোমরা সবাই লিটনের মতো?

ছেলেটা আমার দিকে অপরাধীর মতো তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, না, আমরা সবাই লিটনের মতো না। কেন?

না, এমনি জানতে চাইলাম।

লিটন হচ্ছে ডেঞ্জামাইস।

কি?

ডেঞ্জামাইস। ডেঞ্জারাস এবং বদমাইশ। লিটনকে একদিন টাইট করবে ব্ল্যাক মার্ডার দল।

কে?

ব্ল্যাক মার্ডার। আমাদের একটা টপ সিক্রেট দল। ভেরি টপ সিক্রেট। এই জন্যে তোমাকে বলা যাবে না।

ও। আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সাবধানে দু'এক পা হাঁটলাম। বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুতে হবে, মুখে লিটনের থুতু। গা ঘিনঘিন করছে।

ব্ল্যাক মার্ডারের সদস্য ছেলেটি আমার সাথে হাঁটতে থাকে, আমাকে বাথরুমটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিয়ে দেবে। ছেলেটির মনটি বড় নরম, ব্ল্যাক মার্ডারের মতো একটা দলের সদস্য কেমন করে হল কে জানে! আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

আমার নাম? তারিকুল ইসলাম। তারিক ডাকে সবাই।

ক্লাসের প্রথম ছেলেটির সাথে আমার বন্ধুত্ব শুরু হল।

ক্লাসের ঘন্টা পড়ে গেছে। আমি আমার নিজের জায়গায় বসেছি। মুখটা খারাপভাবে ফুলে গেছে, ভিতরে কোথায় জানি কেটে গেছে। প্রচণ্ড ব্যথা করছে, কিন্তু সে জন্যে আমার যন্ত্রণা হচ্ছে না। আমার যন্ত্রণা হচ্ছে বুকের ভিতরে। রাগে দুঃখে অপমানে ভিতরটা একেবারে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে আমার। তারিক আমাকে একনজর দেখে বলল, তোমার কপালে দুঃখ আছে আজকে।

এই নিয়ে কথাটি সে মনে হয় দুই শ' বার বলে ফেলেছে! আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

তারিক আবার বলল, এখন ভূগোল ক্লাস। ভূগোল স্যারের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র হচ্ছে লিটন।

আমি কিছু বললাম না। তারিক আবার বলল, ভূগোল স্যারের সবচেয়ে প্রিয় খেলা কারাটে।

আমি তখনো কিছু বললাম না। তারিক ফিসফিস করে বলল, ভূগোল স্যার যখন আসবে তখন লিটন স্যারকে বলবে যে তুমি তার সাথে মারপিট করতে গেছ। স্যার তখন রেগে আগুন হয়ে যাবে। ভূগোল স্যার একবার রাগলে একেবারে সর্বনাশ।

আমি তখনো কিছু বললাম না। তারিক বলল, লিটন হচ্ছে ভূগোল স্যারের দিলের টুকরা। স্যার তখন তোমাকে হেড স্যারের কাছে পাঠাবেন। তারপর তোমার বাসায় চিঠি যাবে। তোমার এখন ডেঞ্জুপদ। ডেঞ্জারাস বিপদ। বাসায় এখন চিঠি যাবে—

আমি বললাম, গেলে যাবে। আমি সব ছেড়েছুড়ে বাড়ি চলে যাব। থাকব না এখানে।

আমার চোখে পানি এসে গেল হঠাৎ। তারিককে না দেখিয়ে চোখ মোছার চেষ্টা করলাম, তারিক তবু দেখে ফেলল। জিব দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করে আস্তে আস্তে বলল, কী ডেঞ্জুপদ! তোমার কপালে অনেক দুঃখ আজ।

কিন্তু দেখা গেল সেদিন আমার কপালে আর নূতন কোনো দুঃখ ছিল না। ভূগোল স্যার আসেন নি বলে ক্লাস নিতে এলেন আমাদের সকালের ক্লাস টিচার। ক্লাসে ঢুকে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন, পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত তাহলে কী হত, বল্ দেখি?

লিটন বলল, কেমন করে হবে, স্যার? মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য—

স্যার লিটনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, পৃথিবীটা গোল, সে জন্যে আমরা পড়ি ভূগোল। পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত তাহলে আমরা পড়তাম ভূ-চ্যাপ্টা।

সারা ক্লাস হো হো করে হেসে উঠল আর ঠিক তখন স্যার আমাকে দেখতে পেলেন। সাথে সাথে স্যার উঠে দাঁড়ালেন, তারপর লম্বা পা ফেলে আমার কাছে হেঁটে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তোর? কী হয়েছে?

আমি লজ্জায় মাথা নিচু করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার শক্ত হাতে আমার মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, তারপর ক্লাসের দিকে তাকিয়ে থমথমে গলায় বললেন, একে কে মেরেছে এভাবে?

কেউ কোনো কথা বলল না। স্যার হঠাৎ এত জোরে চিৎকার করে উঠলেন যে মনে হল ক্লাসের ছাদ বুঝি ভেঙে উড়ে যাবে, কে মেরেছে?

পুরো ক্লাস কেঁপে উঠল। লিটন ফ্যাকাসে মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে মারতে এসেছিল, স্যার। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখেন—

স্যার লিটনের কোনো কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। পায়ে পায়ে লিটনের দিকে এগিয়ে গেলেন, চুলের মুঠি ধরে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন নিজের দিকে, তারপর স্থির চোখে তাকালেন তার দিকে।

লিটন কেমন জানি কুঁকড়ে গেল সেই ভয়ংকর দৃষ্টির সামনে, চোখ সরানোর সাহস নেই, ভয়ংকর আতঙ্কে সে তাকিয়ে রইল স্যারের দিকে।

ক্লাসে কোনো পড়াশোনা হল না। স্যার একটি কথা না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। ক্লাসের ছেলেরা একটা টুঁ শব্দ করার সাহস পেল না, চুপচাপ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল নিজের জায়গায়।

ঘন্টা পড়ার পর বের হয়ে যেতে যেতে থেমে গিয়ে স্যার বললেন, বড় দুঃখ পেলাম রে আমি আজ। নূতন একটা ছেলে তোদের ক্লাসে প্রথম দিনেই এত কষ্ট পেল, তোরা কেউ কিছু করলি না।

আমার চোখে পানি এসে গেল হঠাৎ। এরকম একজন মানুষ যদি থাকে তাহলে আমার দুঃখ কি? ছেড়েছুড়ে যাব না আমি, থাকব এখানে। লিটনের মতো দানব আছে সত্যি, কিন্তু তারিকের মতো বন্ধুও তো আছে, স্যারের মতো মানুষও তো আছে, যার হৃদয়টা ঠিক আমার বাবার মতো।

৪. চিঠি

সেদিন বাসায় এসে দেখি আমার তিনটি চিঠি এসেছে। একটিতে টিকিট লাগানো নেই, তাই বেয়ারিং। সেটা বাবা লিখেছেন। অন্য দু'টির একটি লিখেছে মা আর একটি রাঙাবুবু। আরেকটা লিখেছে আমার প্রাণের বন্ধু দুলাল। বেয়ারিং চিঠিটা পয়সা দিয়ে নিতে হয়েছে, আমার খুব লজ্জা লাগল ছোট খালার সামনে। অন্যের চিঠি নাকি খুলতে হয় না, কিন্তু ছোট খালা সবগুলো চিঠি খুলে রেখেছেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমার চিঠি আছে কি না দেখার জন্যে খুলেছিলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আছে, ছোট খালা?

হ্যাঁ। বুবু লিখেছে একটা। তোকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা করছে। ভালো করে একটা চিঠি লিখে দিস।

দেব, ছোট খালা।

তারপর আমি চিঠিগুলো নিয়ে পড়তে বসেছি। প্রথমে পড়লাম মায়ের চিঠি, পড়তে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়তে চোখে পানি এসে গেল একেবারে। নানারকম উপদেশ আছে চিঠিতে, ছোট খালা আর খালুর কথা যেন শুনি, বল্টু আর মিলির সাথে যেন ঝগড়া না করি, মন দিয়ে যেন পড়াশোনা করি, শরীরের যেন যত্ন করি, জুম্মার নামাজ কখনো যেন ক্বাজা না করি, রাস্তাঘাটে যেন খুব সাবধানে বের হই, একা একা যেন কোথাও না যাই—এইরকম অনেক কথা।

মায়ের চিঠি শেষ করে রাঙাবুবুর চিঠি পড়লাম। আগে ভেবেছিলাম রাঙাবুবু শুধু সুন্দর করে গল্প বলতে পারে, এখন দেখলাম খুব সুন্দর চিঠিও লিখতে পারে। কী সুন্দর করে চিঠিটাই না লিখেছে! বাড়ির সব খবর দিয়েছে চিঠিতে, লাল গাইটা আমাকে কেমন করে খোঁজ করে, রাতে শেয়াল এসে কেমন করে মোরগ নিয়ে গেছে, বাবা কেমন উল্টাপাল্টা বাজার করে আনছেন, বড়বুবুর ছোট বাচ্চাটি কি রকম দুষ্টু, এইরকম সব মজার মজার খবর। রাঙাবুবুও আবার বড় বোনের মতো উপদেশ দিয়েছে, তারপর লিখেছে আমি যেন কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা না করি, কারণ দেখতে দেখতে রোজার ছুটি এসে যাবে, আর তখন আমি বাড়ি চলে আসতে পারব।

রাঙাবুবুর চিঠি শেষ করে আমি পড়লাম দুলালের চিঠি। দুলাল আর আমি একজন আরেকজনকে তুই তুই করে বলি, কিন্তু সে চিঠি লিখেছে তুমি তুমি করে! সারা চিঠিতে অনেকগুলো বানান ভুল। 'ড়' বলে যে একটা অক্ষর আছে মনে হয় সে জানেই না, 'বাড়ি'কে লিখেছে 'বারি', 'পড়া'কে লিখেছে 'পরা'। বানান ভুল থাকুক আর যাই থাকুক, চিঠিটার মাঝে অনেক খবর আছে। আমি নেই বলে গোল্লাছুট খেলা আর জমছে না, এই বছর ফুটবল টিম বেশি সুবিধে করতে পারছে না, মেম্বার সাহেবের ছোট ছেলে যাত্রাদলের একটা হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে মেম্বার সাহেব তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন, বাজারের কাছে সে একটা ঘর ভাড়া করে আছে, মাছ-বাজারে আগুন লেগেছিল, বেশি ক্ষতি হওয়ার আগেই আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, নীল গাঙে নাকি একটা মাছ ধরা পড়েছে, সেটার অর্ধেক মানুষ অর্ধেক মাছ, জেলের সাথে কথা বলেছে, তখন জেলে তাকে ছেড়ে দিয়েছে, উল্লাপুরের পীর সাহেব এক টাকার নোটকে দশ টাকার নোট বানিয়ে দিচ্ছেন, খানসাহেবের ছোট ছেলে খৎনা করার ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে ইত্যাদি। চিঠির শেষে লিখেছে, গাড়ি চড়ার লোভে তাকে ছেড়ে চলে আসাটা একেবারেই ভালো কাজ হয় নাই। জীবন অল্পদিনের—প্রাণের বন্ধুর মনে আঘাত দেওয়া ভালো কাজ নয়, আল্লাহ্ নারাজ হতে পারেন।

সবার শেষে বাবার চিঠিটা হাতে নিলাম। বেশি বড় চিঠি নয়, রুল-টানা কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লেখা। বাবার হাতের লেখা বেশ ভালো, তবে বেশি লেখেন না। বাবাও আমাকে তুই-তুই করে বলেন, কিন্তু লিখেছেন তুমি করে। বাবা লিখেছেন :

বাবা বিলু :

পর সমাচার এই যে, তুমি চলিয়া যাইবার পর লাল গাইটি অত্যন্ত মন-খারাপ করিয়াছে। গতকল্য সে আমার সহিত দীর্ঘ সময় কথা বলিয়াছে। সে এবং তাহার বাছুর দুইজনেই মনে করে তোমার অবিলম্বে ফিরিয়া আসা উচিত। পশুপাখি সাধারণত সত্য কথা বলিয়া থাকে, তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিবা।

বাড়ির পিছনে যে জঙ্গল রহিয়াছে, সেইখানে যে বড় গাবগাছটি রহিয়াছে, সেইটি

AMARBOI.COM

আমাকে বড়ই বিরক্ত করিতেছে। গাবগাছটির ধারণা, তাহার উপর একটি দুষ্ট প্রকৃতির ভূত রাত্রিনিবাস করিয়া থাকে। আমি তাহাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করিয়াছি যে পৃথিবীতে ভূত বলিয়া কিছু নাই, সব তাহার মনের ভুল। তুমি আসিয়া তাহাকে একবার বুঝাইলে সম্ভবত সে বিশ্বাস করিবে। বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস যে ভূত নিয়া গবেষণা করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন, সেইটি অবশ্যি অবশ্যি তাহাকে বুঝাইয়া দিও।

তোমার মাতা তোমার খবরের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন বলিয়া আমি মাছ-বাজারের বড় দাঁড়কাকটিকে তোমার ছোট খালার বাসায় পাঠাইয়াছিলাম। প্রথমে সে এত দূরে উড়িয়া যাইতে রাজি হয় নাই, রাজি করাইবার জন্য তাহাকে একটা কুকী বিস্কুট কিনিয়া দিতে হইয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছে যে তুমি ভালোই আছ, কিন্তু বাড়িতে ফিরিয়া আসিবার জন্য তোমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। মাঝে মাঝে খবরের জন্য আমি তাহাকে তোমার কাছে পাঠাইব। তুমি দেখিলেই চিনিতে পারিবে, সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির এবং ডান পা'টি একটু টানিয়া টানিয়া হাঁটে। তাহার চক্ষু লাল রঙের। তাহাকে দেখিলে তুমি একটি কুকী বিস্কুট কিনিয়া দিও, সে কুকী বিস্কুট খাইতে খুব পছন্দ করে।

তোমার পিতা
ফজলুল করিম।

চিঠিগুলো পড়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম, মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। দূরে অনেকগুলো কাক ঝগড়া করছে, কে জানে এর মাঝে বাবার সেই লাল চোখের দাঁড়কাকটি আছে কি না।

এরকম সময়ে বল্টু এসে বলল, আম্মা বলেছে তোমার বাবার চিঠিটা দিতে।

কেন?

জানি না। মনে হয় আব্বাকে দেখাবে।

আমি বললাম, চিঠিটা নাই।

কেন? কী হয়েছে?

ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

ছিঁড়ে ফেলেছ?

হ্যাঁ।

কেন?

আমি পকেটে হাত দিয়ে বাবার চিঠিটা ছুঁয়ে সরল মুখে বললাম, আমি সবসময় চিঠি পড়া শেষ হলে ছিঁড়ে ফেলি। রেখে কী হবে?

বল্টু একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেল। আমি তখন বাবার চিঠিটা বের করে আবার পড়তে শুরু করলাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. ম্যাগনিফাইং গ্লাস

স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি খালুর ছোট ভাই আমেরিকা থেকে বেড়াতে এসেছেন। আমি তাঁকে আগে কখনো দেখি নি, মায়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম। গায়ের রং ছোট খালুর মতো এত কালো নয়, বেশ ফর্সা। কথা বলেন একটু জড়িয়ে জড়িয়ে, বাংলা বললেও মনে হয় ইংরেজি বলছেন।

স্যুটকেস খুলে তিনি দুইটা খেলনা বের করে একটা দিলেন বল্টুকে, আরেকটা মিলিকে, তারপর হঠাৎ সাথে আমাকে দেখে থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, এটা কে?

বল্টু বলল, আমার খালাতো ভাই। গ্রাম থেকে এসেছে। এর বাবা পাগল।

ছোট খালু বল্টুকে একটা রাম-ধমক দিলেন।

খালুর ভাই একবার ছোট খালার দিকে তাকালেন, আরেকবার আমার দিকে তাকালেন। তারপর আবার ছোটা খালার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাবী, আমি তো জানতাম না, আর কেউ আছে এখানে, তাই শুধু দুইটা খেলনা এনেছি। এখন—

বল্টু ততক্ষণে তার খেলনাটা খুলে ফেলেছে, একটা মেকানো সেট। কী চমৎকার খেলনা, এটা জুড়ে দিয়ে কত রকম জিনিস তৈরি করা যায়। বল্টু "মেকানো সেট— আমার মেকানো সেট" বলে চিৎকার করে খুশিতে লাফাতে লাগল। মিলিও তার খেলনাটা বের করল, কী সুন্দর একটা পুতুল একটা ট্রাই সাইকেলে বসে আছে। পিছনে সুইচটা টিপতেই সেটি বাজনা বাজিয়ে ঘুরতে শুরু করে। ইস, কী সুন্দর!

ছোট খালু বললেন, বল্টু, তোর তো অনেক খেলনা আছে, এইটা বিলুকে দিয়ে দে, আরেক বার—

না না না না না—বলে বল্টু ঠোঁট উল্টিয়ে মুখ বাঁকা করে চিৎকার করে লাফিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমার কিছু লাগবে না, কিছু লাগবে না—

ছোট খালুর ভাই তার স্যুটকেস খুলে এদিক-সেদিক হাতড়ে একটা কলম, একটা রংচঙে নোটবই, আরেকটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে বললেন, তুমি এগুলোর কোনো একটা নিতে চাও?

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটার জন্যে আমার খুব লোভ হচ্ছিল, কিন্তু আমি তবু জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বললাম, আমার কিছু লাগবে না।

নাও, যেটা পছন্দ সেটা নাও।

আমি সাবধানে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তুলে নিলাম। হাতের উপর রেখে হাতটা দেখতেই মনে হল একটা দৈত্যের হাত।

ছোট খালুর ভাই হেসে বললেন, এটা দিয়ে শুধু একটা জিনিসে সাবধান, কখনো সূর্যের দিকে তাকাবে না।

আমি মাথা নাড়লাম।

আমার মনে হল ম্যাগনিফাইং গ্লাস থেকে মজার কোনো জিনিস পৃথিবীতে থাকতে পারে না। একটা পিঁপড়াকে দেখলাম ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে, সেটাকে দেখাল একটা ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো, দেয়াল থেকে একটা মাকড়সা ধরে এনে দেখলাম, সেটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখাল একটা অক্টোপাসের মতো—আমি কখনো অক্টোপাস দেখি নি, কিন্তু দেখতে নিশ্চয়ই এরকম হবে। একটা গাছের পাতাকে ছিঁড়ে দেখলাম, সেটাকে মনে হল বিছানার চাদর। আমি আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম সারাদিন। যেটাই পাই সেটাই দেখি। বাবার চিঠিটাও দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। লাইনগুলোকে মনে হল পীচঢালা রাস্তা।

দু'দিন পর আরো একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করলাম, বইয়ে পড়েছিলাম, সত্যি হতে পারে কখনো চিন্তা করি নি। সূর্যের আলোতে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ধরলে রোদটা এক বিন্দুতে একত্র হয়ে আবার ছড়িয়ে পড়ে। যে-বিন্দুতে সেটা একত্র হয়, সেই বিন্দুটা অসম্ভব গরম। এত গরম যে সেখানে হাত রাখলে হাত রীতিমতো পুড়ে যায়। শুধু তাই নয়, একটা শুকনো কাগজে এই বিন্দুটাতে ঠিকভাবে ধরে রাখতে পারলে সেখানে আগুন পর্যন্ত ধরে যায়। আমি যখন ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখছিলাম, ঠিক তখন একটা পিঁপড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেটার উপর, সেই বিন্দুটা ধরতেই ফট করে শব্দ করে পিঁপড়াটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

একটা পিঁপড়াকে খামোকা মেরে ফেললাম, বাবা দেখলে কত রাগ করতেন! কতবার পিঁপড়াটার কাছে আমার হয়ে মাফ চাইতেন।

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আমার সবসময়ের সঙ্গী হয়ে গেল। সবসময় আমার স্কুলের ব্যাগে রাখি, সময় পেলেই সেটা দিয়ে আশেপাশে যা কিছু আছে সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। যে-জিনিসটা এমনিতে দেখতে খুব সাধারণ, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলে সেটাকেই কী বিচিত্র, কী অসাধারণ মনে হয়। যে-মানুষ প্রথম এটা আবিষ্কার করেছিল তার নিশ্চয়ই কত আনন্দ হয়েছিল!

আমি তখনো জানতাম না যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি ঘটবে এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি দিয়ে।

AMARBOI.COM

৬. অবাক পোকা

সেদিন আমাদের স্কুল ছুটি। ছোট খালা বল্টু আর মিলিকে নিয়ে বল্টুর এক বন্ধুর জন্মদিনে বেড়াতে গিয়েছেন। আমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এসব জায়গায় আজকাল আর আমার যাওয়ার ইচ্ছা করে না। কাউকে চিনি না, কিছু না, যাওয়ার পর বল্টু প্রথমেই সবাইকে ডেকে বলবে, এই যে এ হচ্ছে বিলু। এর বাবা পাগল, তাই গ্রাম থেকে আমাদের বাসায় থেকে পড়াশোনা করতে এসেছে।

তখন সবসময়েই কেউ-না-কেউ জানতে চায় আমার বাবা কেমন করে পাগল হলেন, কী রকম পাগলামি করেন, বেঁধে রাখতে হয় কি না, এইসব। আমার খুব খারাপ লাগে। আমি যেতে চাই না শুনে ছোট খালা বেশি জোর করলেন না, বল্টু আর মিলিকে নিয়ে চলে গেলেন। ছোট খালু সকালেই কী-একটা কাজে বের হয়ে গেছেন, তাই বাসায় থাকলাম আমি একা আর বাসার কাজের ছেলেটা।

আমি প্রথমে টেলিভিশনটা চালিয়ে দেখলাম, সেখানে কিছু নেই, তাই রেডিওটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালিয়ে দেখলাম সেখানে যন্ত্রসংগীত হচ্ছে, আমার যন্ত্রসংগীত একেবারেই ভালো লাগে না, তাই রেডিওটা বন্ধ করে দিচ্ছিলাম, কিন্তু ঠিক তখন খবর শুরু হল। প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যে কী রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে সেটা বলে খুব একটা আশ্চর্য খবর বলল। গত কয়েক দিন থেকে নাকি পৃথিবীর সব মানমন্দিরে আশ্চর্য এবং রহস্যময় কিছু সংকেত ধরা পড়ছে। সংকেতগুলো থেকে মনে হয় রহস্যময় কোনো-এক মহাকাশযান পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে। রাডার বা মহাকাশের টেলিস্কোপ দিয়ে সেটাকে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু দেখা সম্ভব হয় নি। দু'দিন আগে সেই রহস্যময় সংকেত হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেই মহাকাশযান পৃথিবীর কোনো নির্জন এলাকায় নেমেছে কিংবা নামার চেষ্টা করে ধ্বংস হয়ে গেছে।

খবরটা সত্যি বলছে নাকি ঠাট্টা করে বলছে, বুঝতে পারলাম না। খবরে তো আজগুবি জিনিস বলার কথা নয়। আজকাল অবশ্যি কিছুই বলা যায় না, সেদিন একটা পত্রিকায় দেখেছি কে নাকি চোখের দৃষ্টি দিয়ে আকাশের মেঘকে দুই ভাগ করে ফেলে! আরেক জায়গায় দেখেছি কে নাকি যোগ সাধনা করে বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। কে জানে এটাও হয়তো সেরকম কিছু হবে।

আমি রেডিওটা বন্ধ করে আমার ঘরে গেলাম। স্টোররুমের জিনিসপত্র সরিয়ে সেখানে আমার জন্যে একটা বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে। ঘরটা ভালোই, একটা ছোট জানালা দিয়ে খানিকটা আকাশ দেখা যায়। আমি এখানে রাতে ঘুমাই, কিন্তু পড়তে বসি বল্টু আর মিলির সাথে এক টেবিলে।

WWW.AMARBOI.COM

বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রথমে আমি মা'কে একটা চিঠি লিখলাম। বাবাকেও একটা লিখব ভেবে অনেকক্ষণ কাগজ-কলম নিয়ে বসে রইলাম, কিন্তু কী লিখব ঠিক বুঝতে পারলাম না। তার পাঠানো দাঁড়কাকটা এসেছিল, একটা কুকী বিস্কুট খেতে দিয়েছি, আমার সাথে অনেকক্ষণ গল্প করেছে—এসব তো আর চিঠিতে লিখতে পারি না! বাবার কথা মনে পড়ে খানিকক্ষণ আমার মন খারাপ হয়ে থাকল, তখন ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হাতে নিয়ে আমি ছাদে উঠে গেলাম। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের আরো একটা জিনিস এতদিনে আবিষ্কার করেছি, চোখ থেকে একটু দূরে ধরে রেখে আরো দূরের কোনো জিনিসের দিকে তাকালে সেটাকে সব সময় উল্টো দেখায়। ছাদে বসে রাস্তাঘাট বাড়িঘর সব মানুষকে উল্টো করে দেখতে বেশ মজাই লাগে আমার।

অনেকক্ষণ ছাদে বসে কাটালাম আমি। ছাদের রেলিং দিয়ে একটা পিঁপড়ার সারি চলে গেছে, খুব ব্যস্ত হয়ে কোথায় জানি যাচ্ছে সবগুলো পিঁপড়া। কে জানে পিঁপড়ার কোনো ভাষা আছে কি না—বাবাকে জিজ্ঞেস করলে সবসময় বলবেন, আছে! কিন্তু আসলেই কি আছে? আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিয়ে রোদটাকে একবিন্দুতে একত্র করে গোটা দশেক পিঁপড়াকে পুড়িয়ে মেরে ফেললাম, সাথে সাথে পুরো সারিটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আবার কিছু মারব কি না ভাবছিলাম, তখন বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা দেখলে খুব রাগ করতেন, মশা পর্যন্ত মারেন না বাবা। ধরে ধরে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে মশারির বাইরে ছেড়ে দেন।

খামোকা আর কোনো পিঁপড়াকে না মেরে আমি দেখতে শুরু করলাম সারিটা কোথায় যাচ্ছে, রেলিং বেয়ে একবার নিচে নেমে আবার উপরে উঠে এল, একটা ফুটো দিয়ে একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে আবার রেলিঙের উপরে উঠে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিঁপড়াগুলো সারি বেঁধে এসে এক জায়গায় গোল হয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে। বৃত্তের ঠিক মাঝখানে ছোট কালো মতন একটা পোকা, সেটা পিঁপড়া থেকেও ছোট। পিঁপড়াকে আমি আগেও মরা ঘাস–ফড়িং বা তেলাপোকা টেনে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি, কিন্তু এত ছোট পোকাকে এভাবে ঘিরে থাকতে দেখি নি। পোকাটাকে ধরতে যাচ্ছে না কেন বুঝতে পারলাম না। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে মাঝখানের ছোট পোকাটা খুজলির মলম বিক্রি করার চেষ্টা করছে আর সবগুলো পিঁপড়া গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিয়ে পোকাটা দেখার চেষ্টা করলাম, খুবই ছোট পোকা, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েও সেটাকে খুব ভালো দেখা গেল না। ভালো করে দেখে মনে হল এটা ঠিক পোকা নয়, ছোট গাড়ি কিংবা ট্যাঙ্ক কিংবা প্লেন। কিংবা যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি কোনো–একটা জিনিস। আমি আগেও লক্ষ করেছি, খুব সাধারণ জিনিসকেও ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে খুব বিচিত্র দেখায়। আমি আরো ভালো করে পোকাটা দেখার চেষ্টা করলাম, আর তখন হঠাৎ মনে হল সেটার একটা দরজা খুলে গেল, আর ভিতর থেকে আরো ছোট একটা কিছু বের হয়ে এল। সেটি এদিক–সেদিক তাকিয়ে একটা শুঁড় উপরে তুলে কী করল, আর সাথে সাথে একটা পিঁপড়া এগিয়ে এল তার দিকে। পরিষ্কার মনে হল কিছু কথাবার্তা হল পিঁপড়াটার সাথে, তারপর সেই ছোট জিনিসটা ভিতরে ঢুকে গেল, তার আর কোনো চিহ্ন নাই।

আমি হাঁটু গেড়ে বসে আরো ভালো করে পোকাটা দেখার চেষ্টা করলাম। যতই দেখি জিনিসটাকে ততই যন্ত্রপাতির মতো মনে হয়। অত্যন্ত ছোট কিন্তু অত্যন্ত জটিল একটা যন্ত্র। মনে হচ্ছে উপর থেকে কিছু তামার নল বের হয়ে এসেছে, নিচে দিয়ে মনে হল একটু লাল রঙের আলো বের হচ্ছে পিছন দিয়ে স্প্রিঙের মতো ধাতব একটা জিনিস। কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দেখব কি না ভাবছিলাম, তখন হঠাৎ মনে হল যে এটাকে আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে বড়ো একটা ছ্যাঁকা দিয়ে দেখি!

আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ধরে সূর্যের আলোকে একবিন্দুতে একত্র করে ছোট পোকাটার মাঝে আগুন ধরানোর চেষ্টা করলাম, আর কী আশ্চর্য, হঠাৎ মনে হল জিনিসটা থেকে একঝলক নীল আলো বের হয়ে এল, পিঁপড়াগুলো হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল। আমি আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, মনে হল আবার ছোট একটা দরজা খুলে গেল, আর ভিতর থেকে আরো ছোট কী–একটা বের হয়ে শুঁড় উঁচু করে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো শব্দ শুনতে পেলাম, তার মাঝে পরিষ্কার গলায় কে জানি বলল, না–না—গরম দিও না।

আমি ভীষণ চমকে আশেপাশে তাকালাম। কে বলল কথাটা? কেউ তো নেই ছাদে! আবার আমি তাকালাম ভালো করে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিয়ে। ছোট পোকাটি, যেটি শুঁড় উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সেটাকে মনে হল খুব ছোট একটা মানুষের মতো। মনে হল তার বড় একটা মাথা, এমন কি দু'টি চোখও আছে। যেটাকে শুঁড় ভাবছি সেটা শুঁড় হতে পারে, হাতও হতে পারে। আমি আরো ভালো করে দেখার জন্যে কাছে এগিয়ে যেতেই জিনিসটা আবার নড়ে উঠল, ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ হল, তার মাঝে আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম, না, না, কাছে এসো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাবার মতো আমিও কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? পোকামাকড়ের কথা শুনতে পাচ্ছি? কী সর্বনাশ!

খানিকক্ষণ আমি ছাদে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। বিচিত্র পোকাটাকে একটা রাম-থাবড়া দিয়ে চ্যাপ্টা করে ফেলব কি না ভাবলাম একবার। কিন্তু করলাম না, নিচে থেকে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি নিয়ে এলাম। পোকাটাকে ঘিরে পিঁপড়াগুলো এখনো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে মনে হল তাদের মাঝে উত্তেজনা অনেক বেড়েছে। আমি একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে জিনিসটাকে শিশির ভিতরে ঢোকানোর চেষ্টা করলাম। ব্যাপারটা সোজা নয়, মনে হল সেটা থেকে কিছু আগুনের ফুলকি বের হয়ে এল। আর তার থেকেও বিচিত্র ব্যাপার, কে জানি বলল, ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমাকে।

আমি ছেড়ে দিলাম না, সেই বিচিত্র পোকাটিকে হোমিওপ্যাথিক শিশির মাঝে ভরে ফেললাম।

পোকাটির কথা কাউকে বলার ইচ্ছা করছিল। প্রথমে বল্টুকে বলার চেষ্টা করলাম, বললাম, ছাদে একটা পোকা দেখেছি আমি। দেখলে অবাক হয়ে যাবে।

কেন?

পোকাটা কথা বলে—বলতে গিয়ে থেমে গেলাম আমি, বাবার কথা মনে পড়ল হঠাৎ।

বললাম, নিচে দিয়ে আগুন বের হয়।

ও! ওটার নাম জোনাকি পোকা।

না, জোনাকি পোকা না, জোনাকি পোকা আমি চিনি। জোনাকি পোকা থেকে অনেক ছোট।

জোনাকি পোকার বাচ্চা।

কাছে মিলি দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, ইয়াক থুঃ, পোকা! ছিঃ ছিঃ।

কাজেই আলাপ বেশি দূর এগুতে পারল না। দুলাল থাকলে হত। বিচিত্র ব্যাপারে তার খুব উৎসাহ। দুই মাথাওয়ালা বাছুর হয়েছে শুনলে স্কুল ফাঁকি দিয়ে সে দশ মাইল হেঁটে দেখতে যায়! বাবা থাকলেও হত, পোকামাকড়ের কথা এমনিতেই শুনতে পান, এটার কথা নিশ্চয়ই আরো ভালো করে শুনতেন।

রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যি আমি মোটামুটি পোকাটার কথা ভুলে গেলাম। একটা পোকা কথা বলছে, সেটা তো হতে পারে না। আসলে ঠিক তখন নিশ্চয়ই নিচে রাস্তায় অন্য কোনো মানুষ কারো সাথে কথা বলেছে, আর আমার মনে হয়েছে আমার সাথে কথা বলেছে। বাতি নেভানোর জন্যে যখন উঠেছি, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নিচে তাকালাম, রাস্তায় বাসার সামনে দুটি মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। এত রাতে এখানে মাইক্রোবাস করে কে এসেছে কে জানে!

৭. মহাকাশের প্রাণী

ক্লাসে ঢুকেই স্যার পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে বললেন, কে কে আজ খবরের কাগজ পড়েছে?

AMARBOI.COM

দেখা গেল কেউ পড়ে নি। লিটন বলল, কাগজে শুধু রাজনীতির খবর থাকে, স্যার, তাই পড়তে ইচ্ছা করে না।

স্যার বললেন, যে-খবরই থাকুক, খবরের কাগজ পড়তে হয়। স্যার জোরে জোরে পড়লেন, মহাকাশের আগন্তুক।

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, রেডিওতে শুনেছি স্যার এটা আমি। এটা কি সত্যি?

স্যার মাথা নেড়ে বললেন, মনে তো হচ্ছে সত্যি।

অন্য সব ছেলেরা তখন কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, স্যার তাই পুরো খবরটা পড়ে শোনালেন। আমি রেডিওতে যেটা শুনেছি মোটামুটি সেই খবরটাই, তবে খুঁটিনাটি আরো কিছু বর্ণনা আছে। আমেরিকার এক মানমন্দিরের ডিরেক্টরের কথা আছে, অস্ট্রেলিয়ার একজন মহাকাশ-বিজ্ঞানীর কথা আছে। সবাই বলেছে যে তারা মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে সত্যি একটি রহস্যময় মহাকাশযান পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছিল। তার সাথে নাকি যোগাযোগও করা হয়েছিল। মহাকাশযানটি দেখার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, বেশ কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে, রাডার দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে, পৃথিবীর সব টেলিস্কোপ দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মহাকাশযানটি পৃথিবীতে নামার চেষ্টা করেছিল, হয়তো ঠিকমতো নামতে পারে নি, হতে পারে কোনোভাবে বিধ্বস্ত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা যে-এলাকায় সেটা বিধ্বস্ত হয়েছে বলে মনে করছেন, তার মাঝে বাংলাদেশ, বার্মা, ভিয়েতনাম, প্রশান্ত মহাসাগর, ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চল রয়েছে। পুরো এলাকায় খুব খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে সাথে সাথে কর্তৃপক্ষকে জানানোর কথা বলা হয়েছে।

সারা ক্লাস খুব উত্তেজিত হয়ে গেল। স্যার পায়চারি করতে করতে বললেন, চিন্তা করতে পারিস, যদি সত্যি সত্যি অন্য একটা গ্রহ থেকে একটা প্রাণী এসে হাজির হয় তাহলে কী মজাটাই হবে? দেখতে কেমন হবে বলে মনে হয় তোদের?

লিটন বলল, আমি সেদিন একটা সিনেমা দেখেছিলাম, স্যার। সেখানে দেখিয়েছিল, দেখতে খুব ভয়ঙ্কর।

স্যার বললেন, সিনেমা তো গাঁজাখুরি, আসলে কেমন হবে?

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম, বুদ্ধিমান প্রাণীরা দেখতে নাকি মানুষের মতনই হওয়ার কথা। বড় একটা মগজ থাকবে—তার কাছাকাছি থাকবে চোখ, দূরত্ব বোঝার জন্যে সবসময় হতে হবে দু'টো চোখ—

হাত?

আমি মাথা চুলকে বললাম, সেটা কিছু বলে নি। কিন্তু কিছু ধরার জন্য আঙুল না হয় শুঁড় থাকতে হবে।

স্যার মাথা নাড়লেন, ঠিকই বলেছিস। কোন গ্রহ থেকে আসছে তার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করবে। সেই গ্রহ কত বড়, মাধ্যাকর্ষণ বল কত বেশি, বাতাস আছে কি নেই, থাকলে কি কি গ্যাস আছে, এইসব। কী মনে হয় তোদের? প্রাণীটা কি হাসিখুশি হবে, নাকি বদরাগী?

লিটন বলল, বদরাগী হবে, স্যার। মহাকাশের প্রাণী সবসময় খুব ডেঞ্জারাস হয়। সবকিছু ধ্বংস করে ফেলে। টিভিতে একটা সিনেমা দেখিয়েছিল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার বললেন, ধুর! সিনেমা সবসময় গাঁজাখুরি হয়। আমার মনে হয় প্রাণীটা হবে খুব মিশুক। কতদূর থেকে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছে ভেবে দেখ্। সে যদি মিশুক না হয় তাহলে কে মিশুক হবে?

পুরো ক্লাস স্যারের সাথে একমত হল। স্যার খানিকক্ষণ হেঁটে আবার বললেন, তারপর চিন্তা করে দেখ্, পৃথিবীটা কত সুন্দর, সেই মহাকাশের প্রাণী দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবে! পৃথিবীর মানুষের সাথে যখন তার পরিচয় হবে তখন মনে হয় সে পৃথিবী ছেড়ে যেতেই চাইবে না। কী বলিস তোরা?

আমরা সবাই জোরে জোরে মাথা নাড়লাম। স্যার বাচ্চা মানুষের মতো ছটফট করতে করতে বললেন, কিন্তু মহাকাশযানটাকে দেখা যাচ্ছে না কেন? বিজ্ঞানীরা সেটাকে দেখতে পেল না কেন?

লিটন বলল, আমি একটা বইয়ে পড়েছি, বোমা ফেলার জন্যে প্লেন তৈরি করেছে যেটা নাকি রাডারে দেখা যায় না। সেরকম কিছু—

স্যার চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন, কিন্তু সেটা তো যুদ্ধ করার প্লেন। মহাকাশের একটা প্রাণী কি যুদ্ধ করতে আসবে?

লিটন বলল, আমি যে সিনেমাটা দেখেছি—

তারিক বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু টেলিস্কোপ দিয়েও তো দেখতে পারে নাই।

স্যার মাথা নাড়লেন, তা ঠিক। তা ঠিক।

মাহবুব বলল, অদৃশ্য কোনো জিনিস দিয়ে হয়তো তৈরি।

অদৃশ্য জিনিস তো কিছু নেই, স্যার মাথা নাড়লেন, যেখান থেকেই আসুক সেটা তৈরি হতে হবে একই জিনিস দিয়ে, যে এক শ' চারটা মৌলিক পদার্থ আছে, তার বাইরে তো কিছু থাকতে পারে না।

ক্লাসে সবচেয়ে যে কম কথা বলে, সুব্রত, আস্তে আস্তে বলল, এমন কি হতে পারে যে মহাকাশের প্রাণী সাইজে অনেক ছোট হয়, পিঁপড়ার মতো, কিংবা আরো ছোট, যে খালিচোখে দেখা যায় না?

সারা ক্লাস হো হো করে হেসে উঠল। স্যার নিজেও হাসতে হাসতে ধমক দিলেন সবাইকে, হাসছিস কেন তোরা বোকার মতো? হাসছিস কেন? ছোট তো হতেই পারে—

হাসতে হাসতে হঠাৎ আমি ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো করে চমকে উঠলাম। আমার সেই বিচিত্র পোকাটার কথা মনে পড়ল আর হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম সুব্রত ঠিকই বলেছে, বিজ্ঞানীরা সেটাকে দেখতে পায় নি, কারণ সেটা অনেক ছোট, আমি সেটাকে পেয়েছি, পেয়ে হোমিওপ্যাথিক শিশির মাঝে আটকে রেখেছি!

চিৎকার করে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠছিলাম, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম। স্যার একটু অবাক হয়ে বললেন, কি রে বিলু, কিছু বলবি?

না না না, স্যার। আমি আমতা আমতা করে বললাম, ইয়ে, মানে—বলছিলাম, মহাকাশের প্রাণী তো ছোট হতে পারে। পারে না, স্যার?

পারবে না কেন? অবশ্যি পারে। সব প্রাণীরই যে আমাদের মতো সাইজ হতে হবে কে বলেছে? ডাইনোসোর কত বড় ছিল, জীবাণু কত ছোট! কাজেই একটা প্রাণীকে কত বড় হতে হবে তার তো কোনো নিয়ম নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার আরো কি কি বললেন, কিন্তু আমি কিছু শুনছিলাম না। আমার বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ডে ঢাকের মতো শব্দ করছে, উত্তেজনায় নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, হাত অল্প অল্প কাঁপছে। আমি সত্যিই কি মহাকাশের সেই প্রাণীটাকে ধরেছি?

বাসায় গিয়ে সেই প্রাণীটাকে আবার দেখতে হবে, কিন্তু স্কুল ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছিলাম না, তাই অঙ্ক ক্লাসে পেট চেপে কোঁ কোঁ করে স্যারকে বললাম, খুব পেটব্যথা করছে স্যার, বাসায় যেতে হবে এক্ষুণি।

অঙ্ক-স্যার যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন জানতাম না। সকালে কি খেয়েছি, রাতে কি খেয়েছি, দাস্ত হয়েছে কি না, বাহ্যি হয়েছে কি না এইসব একগাদা প্রশ্ন করে দুই দানা অ্যান্টিমনি সিক্স হানড্রেড খাইয়ে বেঞ্চে শুইয়ে রাখলেন। স্যার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন আর পকেটে নানারকম ওষুধ নিয়ে ঘুরে বেড়ান জানলে কখনোই স্যারকে পেটব্যথার কথা বলতাম না। শক্ত বেঞ্চে শুয়ে থাকা আরামের কিছু ব্যাপার নয়, তাই একটু পরে বললাম যে আমার পেটব্যথা কমে গেছে। শুনে অঙ্ক স্যারের মুখে কী হাসি।

বিকেলে বাসায় এসে আমি দৌড়ে আমার ঘরে গেলাম। বালিশের নিচে হোমিওপ্যাথিক শিশিতে সেই পোকাটি রেখেছিলাম—যেটা হয়তো আসলে মহাকাশের সেই রহস্যময় প্রাণী। আমি সাবধানে সেই শিশিটা হাতে নিলাম, এক কোনায় কালো বিন্দুর মতো সেই জিনিসটি। আমি আস্তে আস্তে শিশিতে একটা টোকা দিলাম, সাথে সাথে ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ হল, তারপর ভিতর থেকে কে যেন ক্ষীণ স্বরে বলল, সাবধান!

AMARBOI.COM

উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হল। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বের করে ভালো করে সেটাকে দেখার চেষ্টা করলাম, অবিশ্বাস্য রকম জটিল একটা যন্ত্র। তার ভিতর থেকে একটা ফুটো দিয়ে মাথা বের করে একটি অত্যন্ত ছোট প্রাণী আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সত্যি সত্যি একটা বড় মাথা আর দু'টি চোখ। বুদ্ধিমান প্রাণীর যে-রকম থাকার কথা। আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে?

প্রাণীটি খানিকক্ষণ ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করল, তারপর বলল, তুমি কে?

আমি বিলু।

বিলু। বিলু দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন।

হোমোস্যাপিয়েন মানে মানুষ, প্রাণীটি আমাকে দায়িত্বহীন মানুষ বলছে, আমি নিশ্চয়ই কিছু-একটা কাজ খুব ভুল করেছি। ঢোক গিলে বললাম, আমি আসলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাই নি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই—

ঠিক তখন ছোট খালা ঘরে উঁকি দিলেন, আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কার সাথে কথা বলছিস রে, বিলু?

আমি চট করে শিশিটা বালিশের নিচে লুকিয়ে ফেললাম, কিন্তু কোনো লাভ হল না, প্রাণীটা তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন! দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন!!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট খালা প্রাণীটির কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না, আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কার সাথে কথা বলছিলি?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কারো সাথে না, ছোট খালা।

প্রাণীটা তখনও চিৎকার করছে, দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন!

ছোট খালা মনে হল কিছু–একটা শুনলেন, ঘরে মাথা ঢুকিয়ে বললেন, ঘরে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে?

আমি ঢোক গিলে বললাম, হ্যাঁ।

ছোট খালা খানিকক্ষণ ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনে আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন। আমি তখন আর শিশিটা বের করার সাহস পেলাম না। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে। খুব সাবধানে।

রাতে খাবার টেবিলে আমি ছোট খালুকে জিজ্ঞেস করলাম, খালু, কেউ যদি মহাকাশের সেই প্রাণীকে দেখতে পায় তাহলে তার কী করা উচিত?

খালু অবাক হয়ে বললেন, মহাকাশের কী প্রাণী?

আমি বললাম, খবরের কাগজে যে উঠেছে।

কী উঠেছে?

আমি খবরটা বললাম, ছোট খালু খবরটাকে মোটেও গুরুত্ব দিলেন না। হাত নেড়ে বললেন, ধুর, সব লোক–ঠকানোর ফন্দি। খবরের কাগজ বিক্রি করার জন্যে যত সব গাঁজাখুরি গল্প।

কিন্তু যদি সত্যি হয় তাহলে কার সাথে যোগাযোগ করবে?

সত্যি হবে না।

যদি হয়?

ছোট খালু একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, তারপর ইতস্তত করে বললেন, পুলিশকে নিশ্চয়ই।

সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি বালিশের নিচে থেকে ছোট শিশিটা বের করলাম, ভিতর থেকে একটা হালকা নীল আলো বের হচ্ছে। কাছে মুখ নিয়ে বললাম, হে মহাকাশের আগন্তুক।

ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ হল, তারপর শুনলাম সেটি বলল, বিলু। দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন।

প্রাণীটা আবার আমাকে গালি দিচ্ছে, আমার এত খারাপ লাগল যে বলার নয়। থতমত খেয়ে বললাম, আমি আসলে বুঝতে পারি নি, একেবারেই বুঝতে পারি নি—

ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ হল, তারপর একটা কাতর শব্দ করল প্রাণীটা, বলল, বিপদ, মহাবিপদ, আটানব্বই দশমিক তিন চার বিপদ—

কার বিপদ?

আমার।

কী বিপদ?

প্রাণীটা কোনো কথা না বলে ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করতে থাকে। আমি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার জিজ্ঞেস করলাম, কী বিপদ? কী হয়েছে?

প্রাণীটা কোনো উত্তর দিল না, ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করতে থাকল। আমার মনে হল শব্দটা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসছে। প্রাণীটা যদি মরে যায় তখন কী হবে?

আমার তখন এই প্রাণীটার জন্যে এত মন-খারাপ হয়ে গেল, বলার নয়। আহা বেচারা, না-জানি কোন দূর-দূরান্তের এক গ্রহ থেকে এসে এখানে কী বিপদে পড়েছে! কি বিপদ বলতেও পারছে না। বাংলা যে বলতে পারে সেটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। মানুষের মতো কথা বলে না, অন্যরকমভাবে বলে, তাই সবাই শুনে বুঝতে পারে না। ছোট খালা যেরকম বোঝেন নি। এখন এত দুর্বল হয়ে গেছে যে আর কথাও বলতে পারছে না। কী করা যায় আমি চিন্তা করে পেলাম না। ছোট খালুকে কি ডেকে তুলে বলব? কিন্তু কী বলব? মহাকাশের প্রাণী একটা হোমিওপ্যাথিক শিশিতে অসুস্থ হয়ে আছে? একজন ডাক্তার ডাকা দরকার? ছোট খালু তো বিশ্বাসই করবেন না। স্যারকে বলতে পারলে হত, কিন্তু এই মাঝরাতে স্যারকে আমি কোথায় পাব?

আমি অনেকক্ষণ বসে বসে চিন্তা করলাম। প্রাণীটাকে যখন পেয়েছি তখন সেটাকে ঘিরে ছিল অসংখ্য পিঁপড়া। পিঁপড়াগুলো মনে হচ্ছিল প্রাণীটাকে কোনোভাবে সাহায্য করছিল। প্রাণীটা যদি আমার সাথে কথা বলতে পারে, নিশ্চয়ই তাহলে পিঁপড়াদের সাথেও কোনোরকম কথা বলতে পারে। মানুষের মতো পিঁপড়াদের এত বুদ্ধি নেই, তাদের সাথে কথা বলা হয়তো আরো সহজ। আমি আবার যদি প্রাণীটাকে পিঁপড়াদের মাঝে ছেড়ে দিই, তাহলে কি কোনো লাভ হবে?

কোনো ক্ষতি তো আর হতে পারে না।

আমি খুঁজে খুঁজে কয়েকটা পিঁপড়া বের করে শিশিটার কাছে এনে ছেড়ে দিলাম। পিঁপড়াগুলো সাথে সাথে শিশিটাকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করল, আর কী অবাক কাণ্ড, কিছুক্ষণের মাঝে দেখি পিঁপড়ার একটা সারি শিশিটার দিকে এগিয়ে আসছে। শিশিটাকে গোল হয়ে ঘিরে পিঁপড়াগুলো দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

ভিতর থেকে আবার ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ হতে থাকে, শব্দটি আগের থেকে অনেক দুর্বল। আমি সাবধানে শিশিটার মুখ খুলে দিলাম, সাথে সাথে একটা পিঁপড়া ভিতরে ঢুকে গেল। সেটা বের হয়ে এল একটু পরে, তখন আরেকটা পিঁপড়া ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সেটা বের হয়ে এলে আরেকটা। পিঁপড়াদের মাঝে একটা উত্তেজনা, ছুটে যাচ্ছে ছুটে আসছে, মুখে করে কিছু-একটা আনছে, কিছু-একটা নিয়ে যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।

আমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দটা অনেক বেড়েছে। আমি শিশিটার ভিতরে তাকালাম, সেখানে কিছু নেই। শব্দটা কোথা থেকে আসছে দেখার জন্যে আমি এদিকে-সেদিকে তাকালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা নীল আলো ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ করে সেটা আমার দিকে এগিয়ে এসে ঠিক নাকের কাছাকাছি থেমে গেল, শুনলাম সেটা বলল, মস্তিষ্কের কম্পন স্তিমিত, শারীরিক নিয়ন্ত্রণ লুপ্ত—।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম?

হ্যাঁ।

সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় সময়ের অপচয়। সময়ের অপচয়—

জিনিসটা ঘুরপাক খেয়ে উপরে উঠে গিয়ে আবার নিচে নেমে এল। বলল, বুদ্ধিমত্তার হার শতকরা চুয়াল্লিশ দশমিক তিন।

কার?

তোমার।

সেটা ভালো না খারাপ?

ভালো? খারাপ? ভালো? খারাপ? জিনিসটা উত্তর না দিয়ে আবার ঘুরপাক খেতে থাকে। মনে হচ্ছে এর সাথে কথাবার্তা চালানো খুব সহজ নয়। কিন্তু যে-বিপদের কথা বলছিল সেটা মনে হয় কেটে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মহাবিপদ হয়েছিল বলেছিলে, সেটা কেটেছে?

চল্লিশ দশমিক চার।

সেটা কম না বেশি?

কম? বেশি ? কম? বেশি ? জিনিসটা উপরে-নিচে করতে থাকে।

আমি হাল ছাড়লাম না, জিজ্ঞেস করলাম, পিঁপড়াগুলো কি তোমাকে সাহায্য করতে পেরেছে?

লৌহ তাম্র কোবাল্ট এবং অ্যান্টিমনি।

এগুলো এনে দিয়েছে?

বাস্তবিক। স্বর্ণ কিংবা প্লাটিনাম চাই। স্বর্ণ স্বর্ণ।

AMARBOI.COM

সোনা দরকার তোমার?

বাস্তবিক।

সোনা না হলে কী হবে?

গতিবেগ রুদ্ধ।

কার গতিবেগ রুদ্ধ?

মহাকাশযানের।

কতটুকু দরকার?

ছয় দশমিক তিন মিলিগ্রাম।

সেটা কতটুকু?

ছয় দশমিক তিন—ছয় দশমিক তিন—বলে জিনিসটা আবার ঘুরপাক খেতে থাকে। ছয় দশমিক তিন মিলিগ্রাম সোনা খুব বেশি নয়, কিন্তু যত কমই হোক, সোনা আমি কোথায় পাব? আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

এন্ড্রোমিডা। এন্ড্রোমিডা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে? সত্যি?

সত্যি? সত্যি? সত্যি?

সে তো অনেক দূরে। কেমন করে এলে?

স্পেস টাইম সংকোচনের অস্থিতিশীল অবস্থায় মূল কম্পনের চতুর্থ পর্যায়ের সর্বশেষ বিস্ফোরণের ফলে যে সময় পরিভ্রমণের ক্রান্তিধারা হয় তার দ্বিতীয় পর্যায়ে......

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি হাত তুলে থামালাম, তুমি একা এসেছ?

একা? একা? একা?

কতদিন থাকবে তুমি?

স্বর্ণ স্বর্ণ স্বর্ণ চাই। ছয় দশমিক তিন মিলিগ্রাম স্বর্ণ চাই। আমার গতিবেগ রুদ্ধ।

ঠিক এই সময়ে দরজা খুলে ছোট খালা মাথা ঢোকালেন। বললেন, বিলু—

আমি ভীষণ চমকে উঠলাম, ছোট খালা?

এত রাতে জেগে একা একা কথা বলছিস কেন?

আমি মানে ইয়ে—মানে—আমি থতমত খেয়ে থেমে গেলাম। ছোট খালা ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর বললেন, অনেক রাত হয়েছে, ঘুমা।

আমি তাড়াতাড়ি মশারি ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ছোট খালা বাতি নিভিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেলেন। সাথে সাথে ঘরের কোনা থেকে জিনিসটি বের হয়ে এল, বলল, বিভ্রান্ত হোমোস্যাপিয়েন।

আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

নাম? নাম? নাম?

হ্যাঁ, নাম।

সাত তিন আট দশমিক চার চার দুই মাত্রা সাত নয় উল্টো মাত্রা ছয় ছয় পাঁচ—

এটা তো নাম হতে পারে না। নাম হতে হবে ছোট।

ছোট?

হ্যাঁ, ছোট।

জিনিসটা এবার অদ্ভুত একটা শব্দ করল। হাঁচি আটকে রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ হাঁচি বের হয়ে গেলে নাক এবং মুখ দিয়ে যেরকম অদ্ভুত একটা শব্দ বের হয়, শব্দটা অনেকটা সেরকম। আমি দু বার সেটা অনুকরণ করার চেষ্টা করলাম, কোনো লাভ হল না। বললাম, তোমাকে অন্য একটা নাম দিই, যেটা ডাকা যায়?

অন্য নাম? নূতন নাম?

হ্যাঁ। তুমি যখন ছোট, তাই ছোট একটা নাম। ছোটন কিংবা টুকুন।

টুকুন? টুকুন? জিনিসটি ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করতে শুরু করল।

হ্যাঁ, তুমি যদি চাও তাহলে টুকুন ঝিঁঝি হতে পারে। কিংবা টুকুনজিল—

টুকুনজিল টুকুনজিল টুকুনজিল—জিনিসটা আমার মশারির চারদিকে ঘুরতে থাকে। আমার মনে হয় নামটা তার পছন্দ হয়েছে।

ঠিক আছে, তা হলে তোমার নাম হোক টুকুনজিল।

টুকুনজিল হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, বিভ্রান্ত হোমোস্যাপিয়েন।

বিভ্রান্ত কে?

বিভ্রান্ত এবং আতঙ্কিত হোমোস্যাপিয়েন।

আতঙ্কিত কে?

বিভ্রান্ত এবং আতঙ্কিত এবং স্তম্ভিত হোমোস্যাপিয়েন।

আমি হঠাৎ করে ছোট খালার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমার দরজার কাছ থেকে দ্রুত হেঁটে নিজের ঘরে যাচ্ছেন। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছিলেন। কী সর্বনাশ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. ডাক্তার

সকালে ছোট খালু জামাকাপড় পরে আমার ঘরে এসে বললেন, বিলু, আজকে তোমার স্কুলে যেতে হবে না।

স্কুলে যাব না?

না।

কেন খালু?

আমার সাথে একটু বাইরে যাবে।

বা-বাইরে? কোথায়?

একজনের সাথে দেখা করতে।

ছোট খালু বেশি কথা বলেন না, আমার তাই কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। কাল রাতের ব্যাপার নিয়ে কি কিছু হয়েছে?

কি ব্যাপার একটু পরেই বল্টুর কাছে জানতে পারলাম। সে আমার ঘরে উঁকি দিয়ে আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। বল্টুর পিছনে মিলি। বল্টু মিলির দিকে তাকিয়ে বলল, কাছে যাস না, কামড়ে দেবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কে কামড়ে দেবে?

তুমি।

আমি? কেন?

তোমার বাবার মতো তুমিও পাগল হয়ে যাচ্ছ। মা বলেছে।

আমি? আমি পা—পা—

মিলি বল্টুকে ধমক দিয়ে বলল, ভাইয়া, মা বলতে না করেছে না?

চুপ।

আমি উঠে দাঁড়াতেই বল্টু ছুটে বের হয়ে গেল, তার পিছনে পিছনে মিলি। দু'জনেই ভয় পেয়েছে আমাকে দেখে। আমার এমন মন-খারাপ হল যে বলার নয়।

গাড়িতে ছোট খালু বেশি কথা বললেন না। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, রাতে ভালো ঘুম হয়েছে, বিলু?

জ্বি, হয়েছে।

কখনো ঘুমাতে অসুবিধে হয় তোমার?

না, খালু।

বেশ, বেশ।

সারা রাস্তা আর কোনো কথা হল না। আমি গাড়িতে বসে এদিকে-সেদিকে দেখছিলাম, তখন দেখলাম একটা মাইক্রোবাস আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে আসছে! আমার মনে হল এই মাইক্রোবাসটাকে কয়দিন থেকে বাসার সামনে দেখছি। একটু পরে অবশ্যি মাইক্রোবাসটার কথা ভুলে গেলাম, এখানে তো কত মাইক্রোবাসই আছে!

মতিঝিলের কাছে একটা উঁচু দালানে লিফট দিয়ে আমাকে নিয়ে উঠে গেলেন ছোট

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালু। একটা সরু করিডোর ধরে হেঁটে একটা বন্ধ দরজায় টোকা দিলেন। দরজায় সোনালি অক্ষরে লেখা ডঃ কামরুল ইসলাম, নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।

ডাক্তার ছোট খালুর খুব বন্ধুমানুষ হবেন। দেখলাম একজন আরেকজনকে দেখে বাচ্চাদের মতো পেটে খোঁচা দিয়ে কথা বলছেন। আর একটু পরপর হো হো করে হাসছেন। আমি এর আগে ছোট খালুকে কখনো জোরে হাসতে দেখি নি। একটু পর দু'জনেই সরে গিয়ে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছে, কারণ দু'জনেই খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন, আর ''প্রেশার'' ''কালচার'' "ডিজওর্ডার'' ''ব্রাইট'' এরকম কঠিন কঠিন কয়েকটা শব্দ শুনতে পেলাম আমি। একটু পর ছোট খালু আমার কাছে এসে বললেন, বিলু, এ হচ্ছে ডক্টর কামরুল, তোমার ডাক্তার চাচা। তোমার সাথে খানিকক্ষণ কথা বলবেন। তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করবেন তুমি তার ঠিক উত্তর দেবে। ঠিক আছে?

খালু। আমার কিছু হয় নি, খালু। আমি ভালো আছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি অবশ্যি ভালো আছ।

তাহলে কেন—

ভালো থাকলেও ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। চেক-আপের জন্যে যেতে হয়। সবাই যায়।

ডাক্তার চাচা খুব ভালোমানুষের মতো আমার হাত ধরে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন, তোমার খালু আর আমি যখন ছোট ছিলাম একসাথে অনেক মারপিট করেছি।

আমি আবার তাকালাম তাঁদের দিকে। তাঁরা একসময় ছোট ছিলেন এবং মারপিট করেছেন ব্যাপারটা বিশ্বাসই হতে চায় না। ডাক্তার চাচা মুখে হাসি টেনে বললেন, তোমার খালু আমাকে বলেছেন যে তুমি নাকি অসম্ভব ব্রাইট ছেলে। গ্রামের একটা স্কুল থেকে স্কলারশিপে পুরো ডিস্ট্রিক্টের মাঝে প্রথম হয়েছ।

আমি কিছু বললাম না, একটু মাথা নাড়লাম।

ডাক্তার চাচা বললেন, তোমার বাবার নাকি একটু মানসিক ব্যালেন্সের সমস্যা আছে। বোঝই তো, কারো বেশি হয় কারো কম। আমি তাই তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই, কারণ, দেখা গেছে অনেক সময় এগুলো জিনেটিক হয়। জিনেটিক মানে বোঝ তো? বংশগত। বাবার থেকে ছেলে, ছেলে থেকে তার ছেলে। তোমার মতো এরকম একজন ব্রাইট ছেলে, তার নিজের উপর কন্ট্রোল থাকা খুব দরকার। ঠিক আছে?

জ্বি।

এবারে বল, তুমি কি কখনো কিছু দেখতে পাও, যেটা অন্যেরা দেখতে পায় না।

না।

কখনো কিছু শুনতে পাও যেটা অন্যেরা শুনতে পায় না?

ইয়ে-আগে কখনো হয় নি। কিন্তু সেদিন—

সেদিন কি?

সেদিন মহাকাশের আগন্তুকের সাথে দেখা হল, সে যখন কথা বলে তখন অন্যেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারে না?

না। তারা শুধু ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ শোনে।

কে শুনেছে সেটা?

ছোট খালা।

ও। একটু থেমে ডাক্তার চাচা আবার জিজ্ঞেস করলেন, ঝিঁঝি পোকা?

জ্বি।

তুমি কি অন্য কোনো পোকার কথা শুনতে পার? কিংবা অন্য কোনো প্রাণী? কুকুর, বেড়াল, পাখি? কাক? দাঁড়কাক?

হঠাৎ করে কেন জানি আমার রাগ উঠতে থাকে। বড়দের সাথে রাগ করে কথা বলতে হয় না, তাই আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বললাম, না।

শুধু ঝিঁঝি পোকার শব্দ?

আমি কখনো বলি নি যে আমি ঝিঁঝি পোকার শব্দ শুনতে পারি। আমি বলেছি—

কী বলেছ?

আমি বলেছি মহাকাশের যে-আগন্তুক এসেছে তার কথা অন্যেরা শোনে ঝিঁঝি পোকার শব্দের মতো।

কেন সেটা হয় বলতে পার?

আমি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মহাকাশের আগন্তুকের কথা বললাম, কিন্তু ডাক্তার চাচা সেটা নিয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। কথাটা শুনে অবাকও হলেন না। পুরো ব্যাপারটাতে কোনো গুরুত্ব দিলেন না, সেটা দেখে আমার আরো রাগ উঠতে লাগল, তবুও অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে রাখলাম। ডাক্তার চাচা জিজ্ঞেস করলেন, কেন অন্যেরা শুনতে পায় না তুমি জান?

AMARBOI.COM

একটু একটু জানি।

কেন?

আমার মনে হয় সে আমাদের মতো কথা বলে না। একটা তরঙ্গ পাঠায়, সেটা সোজাসুজি আমাদের মাথার মাঝে, মগজের মাঝে কম্পন তৈরি করে। সেটার থেকে আমরা বুঝি সে কী কথা বলছে। একেকজনের মগজ একেক রকম, তাই একেকজনের জন্যে একেক রকম কম্পন দরকার। মহাকাশের আগন্তুক আমার কম্পনটা ধরতে পেরেছে, সে ঠিক তরঙ্গটা পাঠায় তাই আমি তার কথা বুঝতে পারি। অন্যেরা বোঝে না। যখন অন্যদের জন্যে পাঠাবে তখন আমি বুঝব না। শুধু একটা শব্দ শুনব ঝিঁঝি পোকার শব্দের মতো।

ডাক্তার চাচা মনে হল আমার কথা শুনে খুব অবাক হলেন। একবার খালুর দিকে তাকালেন, তারপর আমার দিকে তাকালেন, তারপর কাগজে ঘসঘস করে কী-একটা লিখলেন। একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, এই প্রাণীটা কোন গ্রহ থেকে এসেছে? মঙ্গল গ্রহ?

মঙ্গল গ্রহে কোনো প্রাণী নেই। আমাদের সৌরজগতে পৃথিবী ছাড়া আর কোনো গ্রহে প্রাণ নেই।

তাহলে কোথা থেকে এসেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এন্ড্রোমিডা থেকে।

সেটা কোথায়?

আমাদের নেবুলার নাম হচ্ছে ছায়াপথ। ইংরেজিতে বলে মিল্কিওয়ে। আমাদের পরেরটা হচ্ছে এন্ড্রোমিডা। সেখানকার কোনো নক্ষত্রের কোনো–একটা গ্রহ থেকে।

সেটা নিশ্চয়ই অনেক দূর। সেখান থেকে কেমন করে এল?

আমাকে বলেছে, আমি বুঝি নি। স্পেস টাইমের কী–একটা ব্যাপার আছে। একরকম সংকোচন হয়, তখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ডাইভ দিয়ে চলে যায়। সময়ের ক্ষেত্র ব্যবহার করে স্থানের ক্ষেত্রে শর্টকাট দেয়ার মতো।

ডাক্তার চাচা ঢোক গিলে বললেন, সেই প্রাণীটা তোমাকে বলেছে এটা?

এভাবে বলে নি, আমি এভাবে বললাম। সোজাসুজি মগজের মাঝে কথা বলে, তাই তার সব কথা বুঝতে না পারলেও কী বলতে চায় বুঝতে পারি।

ডাক্তার চাচা ঘসঘস করে খানিকক্ষণ লিখে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোথায় আছে সেই প্রাণী?

জানি না। রাতে আমার ঘরে ছিল।

তুমি আর কাউকে এটা বলেছ?

না, এখনো বলি নি;

সেটা দেখতে কী রকম?

অনেক ছোট, তাই ভালো করে দেখতে পারি নি।

ছোট? ডাক্তার চাচা মনে হল খুব অবাক হলেন।

হ্যাঁ। অনেক ছোট। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুব কষ্ট করে একটু দেখা যায়।

এত ছোট?

হ্যাঁ।

তুমি কি জানতে এটা ছোট হবে?

আমি কেমন করে জানব?

তুমি এখনো কাউকে এটা বল নি?

না।

কাউকে বলবে ঠিক করেছ?

হ্যাঁ। আজকে স্কুলে গেলে স্যারকে বলতাম।

তোমার স্যার?

হ্যাঁ। আমাদের ক্লাস টিচার। স্যারের খুব উৎসাহ।

ও। ডাক্তার চাচা আবার ঘসঘস করে অনেক কিছু লিখে ফেললেন কাগজে। তারপর স্যারের কথা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। স্যার কি করেন, ক্লাসে কাকে বেশি পছন্দ করেন, কাকে বেশি অপছন্দ করেন। আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তারপর বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেন, অনেক খুঁটিনাটি জিনিস জানতে চাইলেন। বাবার পর আমার নিজের সম্পর্কে জানতে চাইলেন, কী করতে ভালবাসি, কী খেতে ভালবাসি, কোন রং আমার পছন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি। সবার শেষে আমাকে অনেকগুলো ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী মনে করি। একটা বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা নিলেন আমার, নানারকম নকশা দেখে ঠিক উত্তরটা বেছে নেবার একটা পরীক্ষা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর আবার কাগজে ঘসঘস করে কী যেন লিখলেন। তারপর অনেকক্ষণ বসে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত খালুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর ভাগ্নে খুব ব্রাইট। অসম্ভব হাই আই কিউ। আমার মনে হয় তাকে সোজাসুজি বলে দেয়া ভালো। তোর আপত্তি আছে?

খালু মাথা নাড়লেন, না, নেই।

ডাক্তার চাচা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালবাস, খুব কম বাচ্চা তার বাবাকে এত ভালবাসে।

আমি মাথা নাড়লাম।

কিন্তু তোমার বাবা পুরোপুরি স্বাভাবিক নন, তাই তাঁর সাথে তোমার কখনো সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে নি। তোমার বুকের ভিতরে সেটা নিয়ে বুভুক্ষের মতো একটা ক্ষুধা আছে।

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

এখানে এসে স্কুলে তোমার যে-স্যারের সাথে পরিচয় হয়েছে, সেই স্যারের সাথে তোমার বাবার একটু মিল রয়েছে। তুমি তোমার নিজের বাবার কাছে যেটা পাও নি, সেটা তোমার স্যারের মাঝে তুমি খোঁজা শুরু করেছ। তোমার স্যার খুব ভালো মানুষ, ছাত্রদের নিজের সন্তানের মতো করে দেখেন—তুমিও গোপনে তাঁকে তোমার বাবার মতো করে দেখা শুরু করেছ। তোমার স্যার যেটাই বলেন তুমি সেটা গভীরভাবে বিশ্বাস কর। তাঁকে খুশি করার জন্যে তোমার অবচেতন মন নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। তাই যখন তোমার স্যার মহাকাশের প্রাণীর কথা বলেছেন, সেটাও তুমি এমনভাবে বিশ্বাস করেছ, যে—

ডাক্তার চাচা একটু থেমে খালুর দিকে তাকালেন, তারপর আবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সত্যিই বিশ্বাস করা শুরু করেছ যে সত্যি সত্যি মহাকাশের একটা আগন্তুক তোমার কাছে এসে গেছে। এরকম হয়—একজন মানুষ যখন আরেকজন মানুষকে খুব ভালবাসে বা শ্রদ্ধা করে, তখন এরকম হয়। এর একটা ডাক্তারি নামও আছে।

আমি ঢোক গিলে বললাম, তার মানে আপনি বলছেন টুকুনজিল আসলে নেই?

টুকুনজিল?

হ্যাঁ। মহাকাশের আগন্তুককে আমি টুকুনজিল নাম দিয়েছি।

ও।

আপনি বলছেন টুকুনজিল আসলে নেই?

না। আসলে সব তোমার কল্পনা। মানুষ একটা জিনিস যদি খুব বেশি চায়, সেটা নিয়ে যদি তার ভিতরে একটা বড় ধরনের দুঃখ কিংবা ক্ষোভ থাকে, সেটা যদি সে তার প্রকৃত জীবনে না পায়, তখন সে সেটা কল্পনায় পেতে চেষ্টা করে। সেটা কোনো দোষের ব্যাপার নয়, সবার জীবনেই নানারকম ফ্যান্টাসি থাকে। খানিকটা ফ্যান্টাসি থাকা ভালো। কিন্তু কখনো যদি কেউ কল্পনা এবং সত্যিকার জীবনে গোলমাল করে ফেলে, বুঝতে না পারে কোনটা কল্পনা এবং কোনটা সত্যি, তখন অসুবিধে। আমরা তাদের বলি মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ। তোমার বাবা সেরকম একজন মানুষ। কল্পনা এবং বাস্তব জীবনের মাঝে পার্থক্যটা ধরতে পারেন না। তোমার ভিতরেও তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষণ আছে—

আমার ভিতরে?

হ্যাঁ। তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে, তাই তোমাকে সোজাসুজি বললাম। যদি তুমি নিজে একটু সতর্ক থাক, তাহলে নিজেই বুঝবে কোনটা সত্যি, কোনটা কল্পনা। যখন বুঝতে পারবে তুমি কল্পনাকে সত্যি মনে করছ, তখন নিজেকে জোর করে কল্পনার জগৎ থেকে সরিয়ে আনবে। কল্পনা করতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু কল্পনাকে কখনো সত্যি বলে ভুল করতে হয় না। বুঝেছ?

বুঝেছি। আমার গলা শুকিয়ে গেল। তার মানে আমিও বাবার মতো পাগল।

তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি তোমার ভিতরে অসম্ভব মনের জোরের চিহ্ন পেয়েছি। তুমি এর ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। আমি জানি। তোমার বাবার যেটা হয়েছে তোমার সেটা হবে না। কখনো হবে না। ঠিক আছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

বাসায় এসে বালিশে মাথা রেখে আমি খানিকক্ষণ কাঁদলাম। আমি ভেবেছিলাম মহাকাশের রহস্যময় এক প্রাণীর সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছে। আসলে সব আমার পাগল-মাথার কল্পনা। সবাই এখন জেনে যাবে যে আমি পাগল। ছোট খালু বলবেন ছোট খালাকে। ছোট খালা থেকে জানবে বল্টু আর মিলি। তাদের থেকে জানবে তাদের অন্য বন্ধুরা। সেখান থেকে একসময় জানবে আমার ক্লাসের ছেলেরা। সবাই তখন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। কী লজ্জার কথা। একবার মনে হল ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে জীবন শেষ করে দিই। আরেকবার মনে হল সব ছেড়েছুড়ে আমি এখনই বাড়ি চলে যাই, সেখানে বাবার হাত ধরে আমরা দুইজন পাগল-মানুষ নীল গাঙের তীরে বসে থাকি।

অনেকক্ষণ বসে বসে আমি ভাবলাম, তারপর নিজেকে সাহস দিলাম। ডাক্তার চাচা বলেছেন আমার মনের জোর আছে, আমি ভালো হয়ে যেতে পারব। আমি নিশ্চয়ই তার চেষ্টা করব। নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। মন-খারাপ করে থেকে লাভ কি?

আমি সোজা হয়ে বিছানায় বসেছি আর সাথে সাথে ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর শুনলাম পরিষ্কার গলায় কে যেন বলল, তোমার মস্তিষ্কের দুই পাশে অন্ত তরঙ্গ। অসামঞ্জস্য এবং ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম।

আমি চমকে উঠলাম। কী সর্বনাশ। আবার আমি টুকুনজিলের কথা শুনছি। আমি দুই হাতে কান চেপে ধরলাম, টুকুনজিলের কথা শুনতে চাই না আমি—পাগল হয়ে যেতে চাই না। মনে মনে বললাম, চলে যাও চলে যাও তুমি।

আমি যাব না।

তুমি যাও। তুমি কল্পনা। তুমি মিথ্যা। আমি মনে মনে উচ্চারণ করতে থাকি, তুমি কল্পনা, তুমি কল্পনা, তুমি কল্পনা।

আমি কল্পনা না। না না না। আমি টুকুনজিল।

আমার গলা শুকিয়ে গেল, আমি মুখে কোনো কথা উচ্চারণও করি নি, কিন্তু টুকুনজিল আমার কথার উত্তর দিচ্ছে। ডাক্তার চাচা তাহলে কি সত্যি কথাই বলেছেন? আসলেই সব কল্পনা? আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম। আমি ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যাব, এইসব উল্টোপাল্টা ব্যাপারকে কোনো পাত্তা দেব না। চোখ বন্ধ করে নিজেকে বললাম, সব কল্পনা। সব কল্পনা।

না। কল্পনা না।

তুমি চলে যাও। আমার মন থেকে চলে যাও।

যাব না। যাব না। সাহায্য চাই।

কচু সাহায্য। তুমি দূর হয়ে যাও।

যাব না। স্বর্ণ চাই। প্লাটিনাম চাই।

নিজে জোগাড় করে নাও।

পারছি না। আমার গতিবেগ রুদ্ধ। আমি গতিহীন। শক্তিহীন। চোখ খোল। চোখ খুলে আমাকে দেখ।

আমি আবার চোখ খুলে তাকালাম। সত্যি সত্যি আমার চোখের সামনে ছোট একটা কালো বিন্দুর মতো কী–একটা ঝুলছে। টুকুনজিলের মহাকাশযান, নাকি আমার কল্পনা? আমি আবার চোখ বন্ধ করলাম। বললাম, চলে যাও তুমি।

যাব না। যাব না। যাব না।

কেন যাবে না?

যেতে পারব না। সাহায্য চাই। আমাকে খুঁজছে। আমাকে ধরতে আসছে। আমার বিপদ।

তোমার বিপদ, তুমি কচুপোড়া খাও।

আমি কচুপোড়া খাই না। আমাকে সাহায্য কর তুমি।

কিন্তু তুমি তো নেই, তুমি কল্পনা।

আমি কল্পনা না। আমি প্রমাণ করব। তুমি হাত বাড়াও।

আমি আস্তে আস্তে হাত বাড়ালাম, দেখলাম বিন্দুটি আমার হাতের উল্টোপৃষ্ঠায় নেমে এল, হঠাৎ একঝলক আলো জ্বলে উঠল, আর আমি চিৎকার করে হাত টেনে নিলাম। অবাক হয়ে দেখলাম গোল হয়ে পুড়ে গেছে হাতের চামড়া, মুহূর্তে ফোস্কা পড়ে গেছে হাতে। প্রচণ্ড জ্বালা করছে হাত, কিন্তু আমি যন্ত্রণার কথা ভুলে গেলাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম হাতের দিকে। তাহলে কি সত্যিই টুকুনজিল আছে?

তোমার অন্য হাত দাও।

কেন?

আরেকটা বৃত্তাকার উত্তপ্ত চিহ্ন করে দেখাই।

না না, আর দেখাতে হবে না।

এখন তুমি বিশ্বাস কর আমি সত্যি?

প্রচণ্ড জ্বালা করছে হাত। কিন্তু এটাও কি কল্পনা হতে পারে? কাউকে দেখাতে হবে আমার। আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম, বাসার কাজের ছেলেটিকে খুঁজে পেলাম না, তাকে দেখাতাম। বল্টু হেঁটে যাচ্ছিল, তাকেই ডাকলাম আমি, বল্টু, দেখ তো একটা জিনিস।

কি?

আমার হাতের উপর কি তুমি কিছু দেখতে পাও?

দেখি। বল্টু হাতটা একনজর দেখেই চিৎকার করে উঠল, সিগারেটের ছ্যাঁকা! ইয়া

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহ্, তুমি সিগারেট খাও?

তারপর সে গরুর মতো চেঁচাতে শুরু করল, আম্মা, আম্মা দেখে যাও। বিলু সিগারেট খায়। সিগারেটের ছ্যাঁকা—

ছোট খালা দৌড়ে এলেন, কি হয়েছে? কি?

দেখ, বিলু সিগারেট খেতে গিয়ে হাতে ছ্যাঁকা খেয়েছে। দেখ, গোল ছ্যাঁকা।

ছোট খালা হাতের পোড়া দাগটা খুব ভালো করে দেখলেন, তারপর আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, আমার শরীরে সিগারেটের গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে পুড়েছে?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, না মানে—ইয়ে—।

টুকুনজিলের কথা শুনতে পাই আমি, দেখেছ? আমি সত্যি। আমি কল্পনা না।

আমি ভয়ে ভয়ে তাকালাম। ছোট খালা বা বল্টু টুকুনজিলের কথা শুনতে পায় নি, শুধু আমি শুনেছি।

ছোট খালা বললেন, কথা বলছিস না কেন? কেমন করে পুড়েছে?

বল্টু চিৎকার করে বলল, সিগারেট! সিগারেট!

টুকুনজিল বলল, অকাট্য প্রমাণ আমি সত্যি। অকাট্য প্রমাণ।

আমি চোখ বন্ধ করলাম, মহা ঝামেলায় ফেঁসে গেছি আমি, কিন্তু একটা কথা তো সত্যি।

আমি পাগল না।

মহাকাশের রহস্যময় প্রাণী সত্যি আছে।

সত্যি আছে!

AMARBOI.COM

৯. সোনার আংটি

মহাকাশের আগন্তুক টুকুনজিল সত্যি আছে, সে সুদূর এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে পৃথিবীতে এসেছে, সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা পাগলের মতো তাকে খুঁজছে, সারা পৃথিবীর মাঝে শুধু আমি জানি সে সত্যি আছে এবং কোথায় আছে। শুধু আমার সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে, শুধু আমি জানি সে দেখতে কেমন। সে কথা আমি কাউকে বলতে পারছি না, ডাক্তার চাচাকে বলেছিলাম, তিনি বিশ্বাস তো করেনেই নি, উল্টো ধরে নিয়েছেন আমিও আমার বাবার মতো পাগল! একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে, কারণ যতক্ষণ টুকুনজিল তার মহাকাশযান ঠিক করতে না পারছে ততক্ষণ সে চায় না অন্য কেউ জানুক সে কোথায় আছে। আমাকে তাই বলেছে, সারা পৃথিবীর মাঝে আমি তার একমাত্র বন্ধু, আমি যদি তার কথা না শুনি কে শুনবে? কাজেই আমার পেটের মাঝে এত বড় খবরটা ভুটভুট করতে থাকে, কিন্তু আমি বের করতে পারছি না।

টুকুনজিল এক টুকরা সোনা বা প্লাটিনামের জন্যে একেবারে জান দিয়ে ফেলছে। সকালে উঠে ঠিক করলাম আজ তাকে সেটা জোগাড় করে দেব। প্লাটিনাম কোথায় পাব আমি, তবে সোনা হয়তো পাওয়া যেতে পারে। ছোট খালার শরীর-ভরা গয়না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে কয়েকটা আংটি, কানে দুল, হাতে চুড়ি। কোনো-একটা কি আর কিছুক্ষণের জন্যে সরিয়ে নেয়া যাবে না? টুকুনজিল নেবে মাত্র ছয় দশমিক তিন মিলিগ্রাম সোনা, ছোট খালা জানতেও পারবেন না।

সকালে নাস্তা করার সময় দেখতে পেলাম ছোট খালার আঙুলে আংটিগুলো নেই, তার মানে নিশ্চয় খুলে রেখেছেন। খুলে রাখার জায়গা খুব বেশি নেই, হয় শোয়ার ঘরে, ড্রেসিং টেবিলের উপরে, নাহয় লাগানো বাথরুমে। আমি ব্যবহার করি বল্টু আর সীমার বাথরুম, কাজেই কোনোরকম সন্দেহ সৃষ্টি না করে শোওয়ার ঘরের বাথরুমে যাওয়া সহজ নয়। তবে কপাল ভালো থাকলে হয়তো বাথরুম পর্যন্ত যেতে হবে না, ড্রেসিং টেবিলের উপরেই পাওয়া যাবে। কিন্তু সে জন্যে আমাকে শোওয়ার ঘরে যেতে হবে। কী ভাবে যাওয়া যায়?

ছোট খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, ছোট খালা, আজকের পেপার কি এসেছে?

এসেছে নিশ্চয়ই। কেন?

আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে বলেছে তার চাচার একটা খবর উঠবে আজকে। সরল মুখ করে একটা নির্দোষ মিথ্যা কথা বললাম।

কী খবর?

অবিরাম সাইকেল চালনা। ছিয়াত্তর ঘন্টা নাকি হয়েছে। মিথ্যা কথা বলার এই হচ্ছে সমস্যা, একটা বললে শেষ হয় না; সেটাকে সামলে নেবার জন্যে একটানা মিথ্যা বলে যেতে হয়।

কোথায় সাইকেল চালাচ্ছে?

নরসিংদি। ছোট খালুর কি পড়া শেষ হয়েছে খবরের কাগজ?

জানি না, দেখ গিয়ে।

সাথে সাথে আমি শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেলাম, ছোট খালু নিশ্চয়ই বাথরুমে, ঘরঘর শব্দ করে গলা পরিষ্কার করছেন। বিছানার উপর খবরের কাগজটা পড়ে আছে, সেটা তুলে নেবার আগে ড্রেসিং টেবিলের উপর তাকালাম, কী কপাল! সত্যি সত্যি ছোট খালার সোনার আংটি দুইটা! চট করে একটা তুলে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম, আগে এরকম বড় জিনিস কখনো চুরি করি নি, বুকটা ধক্‌ধক্ করে শব্দ করতে থাকল।

খাবার টেবিলে বসে মিছেই খবরের কাগজটা দেখার ভান করতে থাকলাম। বল্টু জিজ্ঞেস করল, উঠেছে খবরটা?

নাহ্।

আমি তখনই বুঝেছিলাম গুলপট্টি। তিন দিন কোনো মানুষ একটানা সাইকেল চালাতে পারে? পিশাব-পাইখানা?

আমার ঘরে এসে আমি ফিসফিস করে ডাকলাম, টুকুনজিল—

সোনা এনেছ?

হ্যাঁ। চুরি করে এনেছি, ধরা পড়লে একেবারে জান শেষ হয়ে যাবে।

জান শেষ হয়ে যাবে? মেরে ফেলবে তোমাকে? হৃৎস্পন্দন থেমে রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাবে? স্নায়ু—

ওটা একটা কথার কথা। জান শেষ হবে মানে মহা বিপদ। এই আংটিটা আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুলঘুলির উপর লুকিয়ে রাখি। তুমি যেটুকু ব্যবহার করতে চাও ব্যবহার কর, তারপর ফিরিয়ে দিতে হবে ধরা পড়ার আগে।

ফিরিয়ে দিতে হবে কেন?

সোনার আংটি ফিরিয়ে দিতে হবে না? কতক্ষণ লাগবে তোমার?

তিন ঘন্টা তেত্রিশ মিনিট বারো সেকেন্ড।

এতক্ষণ লাগবে? খামচি মেরে একটু সোনা নিয়ে আংটিটা ফেরত দিতে পারবে না?

না। আমার মহাকাশযানের বৈদ্যুতিক যোগাযোগে অনেক বড় সমস্যা। এই জন্যে স্বর্ণ প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক সুপরিবাহী মৌলিক পদার্থ। তিন ঘন্টা তেত্রিশ মিনিট বারো সেকেন্ড।

বল্টু বাইরে থেকে ডাকে, বিলু, ড্রাইভার এসে গেছে।

আমি চেয়ারে পা দিয়ে ঘুলঘুলির উপর সোনার আংটিটা রেখে বের হয়ে এলাম।

গাড়িতে ওঠার সময় শুনলাম ছোট খালা বলছেন, ড্রেসিং টেবিলের উপর আংটিটা রেখেছিলাম, কোথায় গেল?

আমি না শোনার ভান করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। মনে হয় আমার কপালে বড় দুঃখ আছে আজ।

বল্টু আর মিলিকে স্কুলে নামিয়ে দেবার পর ড্রাইভার আমাকে আমার স্কুলে নামিয়ে দেয়। আজকাল প্রায়ই আমি বল্টুর স্কুলে নেমে পড়ি, সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে আমার স্কুলে আসি। ড্রাইভার বেশ খুশি হয়েই আমাকে নামিয়ে দেয়, সকালের ভিড় ঠেলে গাড়ি চালাতে তারও বেশি ভালো লাগে না মনে হয়। তা ছাড়া আমাকে নামিয়ে দিয়ে সে রাস্তা থেকে কিছু লোক তুলে একটা খেপ দিয়ে কিছু বাড়তি পয়সা বানিয়ে নেয়। হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতে আমার বেশ লাগে। কত রকম মানুষজন, কত রকম দোকানপাট দেখা যায়।

স্কুলে যাবার সময় কয়দিন থেকে আমার একটা আশ্চর্য অনুভূতি হচ্ছে। শুধু মনে হয় কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। টুকুনজিলের সাথে ভাব হবার পর আজকাল অবশ্যি আর কিছুতেই বেশি অবাক হই না। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে মহাকাশের এক আগন্তুক এই পৃথিবীতে এসে শুধু আমার সাথে যোগাযোগ করেছে, জিনিসটা চিন্তা করতেই আমার বুকের ভিতর কেমন জানি শিরশির করতে থাকে। ইস! কাউকে যদি বলা যেত, কী মজাটাই–না হত!

কিন্তু এই অনুসরণের ব্যাপারটা অন্যরকম। সাদা রঙের একটা মাইক্রোবাস আমি প্রায়ই দেখি। ড্রাইভারের পাশে একজন লাল রঙের বিদেশি বসে থাকে। আমার কেন জানি মনে হয় মাইক্রোবাসটা আমার পিছু পিছু যেতে থাকে। হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমি যদি পিছনে ঘুরে তাকাই, মনে হয় মাইক্রোবাসটা থেমে যায় আর লাল রঙের মানুষটা চট করে আমার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। আমি কেমন জানি নিঃসন্দেহ হয়ে যাই যে টুকুনজিলের সাথে এর একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে কী করা যায় সেটা শুধু বুঝতে পারছিলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাসে এসে দেখি দেয়ালে একটা নূতন দেয়াল–পত্রিকা লাগানো হয়েছে। বিশেষ মহাকাশের প্রাণীসংখ্যা। বড় বড় করে লেখা ''সম্পাদক ঃ মুস্তাফিজুর রহমান লিটন।'' সেখানে মহাকাশের প্রাণী সম্পর্কে ভয়াবহ সমস্ত তথ্য দেয়া হয়েছে। বিদেশি ম্যাগাজিন থেকে মহাকাশের প্রাণীর কাল্পনিক ছবি কেটে লাগানো হয়েছে, সেইসব ছবি দেখলে পিলে চমকে যায়। একটা প্রাণীর তিনটে চোখ, আরেকটা প্রাণীর লকলকে লাল জিব, একজন মানুষকে ধরে চিবিয়ে খাচ্ছে, আরেকটা মাকড়সার মতো দুইটা পা দিয়ে ভয়ানক একটা অস্ত্র ধরে রেখেছে। সেখানেই শেষ হয় নি, মহাকাশের প্রাণী পৃথিবীতে এসে কী–রকম ভয়ানক তাণ্ডবলীলা শুরু করবে, সেটার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে। সেই প্রাণী থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কি কি সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে, সেটাও লিটন অনেক খেটে–খুঁটে লিখেছে।

স্যার ক্লাসে এসে দেয়াল–পত্রিকা দেখে চুপ মেরে গেলেন। লিটন খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন হয়েছে, স্যার?

স্যার অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, ভালো হয়েছে।

আমেরিকায় ভয়ের একটি পত্রিকা বের হয়, সেখান থেকে ছবিগুলো নিয়েছি।

বেশ বেশ।

সম্পাদকীয়টা পড়েছেন, স্যার?

পড়েছি।

কেমন হয়েছে, স্যার?

ভালোই হয়েছে—তবে তুই ধরে নিয়েছিস মহাকাশের প্রাণী হবে খুব ভয়ঙ্কর। সেটা তো না–ও হতে পারে।

কিন্তু স্যার, আমি একটা সিনেমা দেখেছি, সেখানে দেখিয়েছে—

ধুর। সিনেমা তো সবসময়ে গাঁজাখুরি হয়।

AMARBOI.COM

স্যার ক্লাসে পড়ানো শুরু করলেন। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর ঘুরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা সবাই আর্কিমিডিসের সূত্র জানিস?

দেখা গেল সবাই জানে না। স্যার তখন বেশ সময় নিয়ে আমাদের আর্কিমিডিসের সূত্রটা বুঝিয়ে দিলেন। আর্কিমিডিস প্রথম যখন সূত্রটা ভেবে বের করেছিলেন, তখন যে ন্যাংটো হয়ে রাস্তায় ছুটতে শুরু করেছিলেন, সেই গল্পটাও বললেন। গল্পটা আগেই জানতাম, কিন্তু ন্যাংটো হয়ে গোসল করার দরকারটা কী ছিল, সেটা কখনোই আমি বুঝতে পারি নি।

আর্কিমিডিসের সূত্রটা বুঝিয়ে দিয়ে স্যার বললেন, এবার তাহলে তোদের একটা প্রশ্ন করি, তোরা তার ঠিক উত্তর ভেবে বের করতে পারিস কি না দেখি। এক সপ্তাহ সময় দেব। একটা বড় চৌবাচ্চার মাঝে একটা নৌকা ভাসছে, সেই নৌকায় তুই বসে আছিস। নৌকায় তোর সাথে আছে একটা বড় পাথর। চৌবাচ্চাটা একেবারে কানায় কানায় ভরা। এখন তুই পাথরটা নৌকা থেকে তুলে চৌবাচ্চার মাঝে ছেড়ে দিলি। পানি কি চৌবাচ্চা থেকে উপচে পড়বে? একই থাকবে? নাকি পানির লেভেল একটু কমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে?

স্যার একটু হেসে বললেন, যদি উত্তরটা ভেবে বের করতে না পারিস, মন-খারাপ করিস না, অনেক বাঘা-বাঘা প্রফেসরও পারে নি।

উত্তরটা ভেবে বের করার জন্যে স্যার এক সপ্তাহ সময় দিয়েছেন, কিন্তু আমি তখন তখনই ভুরু কুঁচকে ভাবতে শুরু করলাম। এ ধরনের সমস্যা নিয়ে ভাবতে আমার খুব ভালো লাগে। স্যার ক্লাসে আবার পড়ানো শুরু করেছেন, কিন্তু আমি আর মন দিতে পারছি না। ঘুরেফিরে শুধু মনে পড়ছে একটা ভরা চৌবাচ্চায় একটা নৌকা—নৌকার মাঝে আমি বসে আছি পাথরটা নিয়ে।

উত্তরটা কি হবে আমি প্রায় সাথে সাথেই বের করে ফেললাম। আর্কিমিডিস যখন তাঁর সূত্র বের করেছিলেন তখন তার যেরকম আনন্দ হয়েছিল, আমার প্রায় ঠিক সেরকম আনন্দ হল, লাফিয়ে উঠে হাত তুলে বললাম, আমি বলব স্যার, আমি বলব-

স্যার অবাক হয়ে বললেন, কি বলবি?

চৌবাচ্চার পানির লেভেল বাড়বে না, কমবে—

স্যার চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালেন। অবাক হয়ে বললেন, তুই উত্তরটা বের করে ফেলেছিস!

জ্বি স্যার—আমি উত্তেজনায় ঠিক করে কথা বলতে পারছিলাম না, হড়বড় করে কোনোমতে উত্তরটা বললাম।

স্যার অবাক হয়ে আমার উত্তরটা শুনলেন, তাঁর মুখে একটা আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল, তারপর হেঁটে এসে আমার পিঠে থাবা দিয়ে বললেন, ভেরি গুড। ভেরি ভেরি গুড। ভেরি ভেরি ভেরি গুড! আমার একজন প্রফেসর বন্ধু আছে, কলেজে ফিজিক্স পড়ায়, সেও পর্যন্ত এর ঠিক উত্তর দিতে পারে নি! তুই দিয়ে দিলি—

খুশিতে আমার চোখে একেবারে পানি এসে গেল। স্যার বললেন, বিলু, আজ থেকে তুই হলি ক্লাস ক্যাপ্টেন।

আমি লিটনের দিকে তাকালাম, তার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা, মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। হিংসে কার না হয়? সবারই হয়, কিন্তু সেটা চেহারায় প্রকাশ করে সবাইকে জানিয়ে দেয়াটা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। লিটন ক্লাসের ফার্স্ট বয় এবং ক্লাস ক্যাপ্টেন। সে দেয়াল-পত্রিকার সম্পাদক এবং ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন। সবকিছুতেই সে আছে, ফার্স্ট বয়রা যেটা খুশি সেটা করতে পারে। কিন্তু আজ তার ক্লাস ক্যাপ্টেনের দায়িত্বটা নিয়ে দিয়ে দেয়া হচ্ছে আমাকে, ক্লাসে সবার সামনে, আনন্দে আমার বুকটা ভরে গেল! কিন্তু আমি লিটনের মতো এত বোকা নই, তাই মহানুভব মানুষের মতো বললাম, স্যার, আমি ক্লাস ক্যাপ্টেন হতে চাই না, স্যার।

কেন?

ক্লাস ক্যাপ্টেনদের সবার উপর সর্দারি করতে হয় বলে কেউ তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না।

সর্দারি?

জ্বি স্যার, ক্লাসে দুষ্টুমি করলে নাম লিখে স্যারদের কাছে নালিশ করতে হয়—খুব খারাপ কাজ স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার মনে হয় খুব অবাক হলেন শুনে, ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, বিলু কি ঠিক বলছে?

সবাই মাথা নাড়ল, ঠিক স্যার, একেবারে ঠিক।

আমি বললাম, স্যার, নিয়ম করে দেন একেক সপ্তাহে একেকজন ক্লাস ক্যাপ্টেন হবে। তাহলে ক্যাপ্টেন আর মিছেমিছি নাম লিখবে না, কারণ যার নাম মিছেমিছি লিখবে, সে যখন ক্যাপ্টেন হবে সে শোধ নেবে—

মিছেমিছি? মিছেমিছি কি নাম লেখা হয়?

সবসময় হয় না স্যার, মাঝে মাঝে হয়। কারো কারো নাম বেশি লেখা হয়, কারো কারো নাম কম লেখা হয়—

সত্যি?

পুরো ক্লাস আবার মাথা নাড়ল, লিটন ছাড়া। সে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

স্যার খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্লাসের মাঝখানে, তারপর বললেন, ঠিক আছে আজ থেকে তাই নিয়ম। একেক সপ্তাহে একেকজন ক্লাস ক্যাপ্টেন।

ক্লাসের সবাই একটা আনন্দের মতো শব্দ করল। আমার বুকটা মনে হল দশ হাত ফুলে গেল সাথে সাথে।

ঘন্টা পড়ার পর স্যার ক্লাস থেকে বের হয়ে যাবার পর ভেবেছিলাম লিটন চোখ লাল করে আমার কাছে ছুটে আসবে। কিন্তু সে মুখ গোঁজ করে নিজের জায়গায় বসে রইল। তারিক আমার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, তুই মহা ফিণ্টুরাস মানুষ।

ফিণ্টুরাস? সেটা মানে কি?

যার মাথায় ফিচলে বুদ্ধি এবং যে হচ্ছে ডেঞ্জারাস, সে হচ্ছে ফিণ্টুরাস। কী সুন্দর লিটনের মাথাটা ক্লাসের সামনে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলি!

পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলাম?

হ্যাঁ, যখন চৌবাচ্চার উত্তরটা দিলি, মনে হল হিংসায় লিটনের একেবারে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে!

তারিককে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে খুব খুশি দেখা গেল। গলা নামিয়ে বলল, আমাদের ব্ল্যাক মার্ডার দলের মেম্বার হবি?

কী করতে হবে?

আঙুল থেকে এক ফোঁটা রক্ত দিয়ে রক্ত শপথ করতে হবে।

ঠিক আছে। কখন?

পরশুদিন ব্ল্যাক মার্ডারের মিটিং।

কোথায়?

স্কুলে।

স্কুলে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, পরশুদিন ছুটি না?

তারিক গম্ভীর হয়ে হাসে। স্যার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, মিটিং করার জন্যে ক্লাসঘর খুলে দেয় কালীপদ। স্যার আর কালীপদ তাই আমাদের ব্ল্যাক মার্ডার দলের বিশেষ সদস্য!

শুনে আমি চমৎকৃত হলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরে সুব্রত জানাল, তার কাছে ''চকিত হিয়া'' নামে একটা বড়দের উপন্যাস আছে, আমি পড়তে চাইলে নিতে পারি। বড়দের উপন্যাস পড়তে আমার খুব ভালো লাগে, খুশি হয়ে নিলাম আমি। নান্টু জিজ্ঞেস করল, তার জুপিটার ফুটবল ক্লাবে সেন্টার ফরোয়ার্ডের একটা জায়গা খালি আছে, আমি খেলতে চাই কি না—আমি খুব খুশি হয়ে রাজি হলাম। মাহবুব জিজ্ঞেস করল, সে একটা টেলিস্কোপ তৈরি করছে, আমি তার সাথে সেটা নিয়ে গবেষণা করতে চাই কি না। আমি আগে কখনো গবেষণা করি নি, কিন্তু মাহবুব যদি করতে পারে আমিও নিশ্চয়ই পারব, তাই রাজি হয়ে গেলাম। মোট কথা, হঠাৎ করে ক্লাসে আমার অনেক বন্ধু হয়ে গেল।

১০. বিপদ

বাসায় এসে দেখি সারা বাসা থমথম করছে। বল্টু আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলল, আজ তোমাকে ধোলাই দেয়া হবে।

আমাকে? আমি ঢোক গিলে বললাম, কেন?

তুমি আম্মার আংটি চুরি করেছ।

আমি চমকে উঠলাম। কী সর্বনাশ! ধরা পড়ে গেছি? জোর করে অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, আমি!

হ্যাঁ। চুরি করে তোমার বিছানার নিচে রেখেছ।

বিছানার নিচে? আমি একটু অবাক হলাম, ঘুলঘুলির উপর রেখে গিয়েছিলাম, বিছানার নিচে কেমন করে এল?

বল্টু হাতে কিল দিয়ে বলল, আজকে তোমাকে রাম-ধোলাই দেবে। আম্মা বলেছে, তোমরা চোরের গুষ্টি।

ইচ্ছে হল বল্টুর মাথাটা ধড় থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে ফেলি, কিন্তু সেটা তো ইচ্ছে করলেই করা যায় না। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে আমি ডাকলাম, টুকুনজিল।

কোনো সাড়া নেই। আমি আবার ডাকলাম, টুকুনজিল—তুমি কোথায়?

তবু কোনো সাড়া নেই। তাহলে কি চলে গেছে? কিন্তু একবার আমাকে বলে যাবে না? সোনা দিয়ে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ঠিক করার পর তার মহাকাশযান গতিবেগ ফিরে পেয়েছে, আর কোনো সমস্যা নেই, তাই আর দেরি করে নি। পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আমার বিশ্বাস হতে চাইল না, আবার ডাকলাম, টুকুনজিল।

তবু কোনো সাড়া নেই।

টুকুনজিল থাকলে আর কোনো সমস্যা ছিল না—এত বড় একটা ব্যাপারের সামনে সোনার আংটি একটা তুচ্ছ জিনিস। কিন্তু টুকুনজিল যদি ফিরে চলে গিয়ে থাকে, তা হলে টুকুনজিলের কথা মুখে আনা মানে নিজেকে পাগল প্রমাণ করা। আগেরবার তো শুধু ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন—এবারে নিশ্চয়ই ধরে একেবারে পাগলা-গারদে

দিয়ে আসবেন।

বিছানার নিচে সোনার আংটিটা পাওয়া গেছে। এখন সবাইকে বোঝাব কেমন করে? যদি টুকুনজিল ফিরে না আসে তাহলে বলা যায় ছোট খালার বাসায় থাকা আমার শেষ হয়ে গেল! ভালোই হল হয়তো, খামোকা মা-বাবা ভাই-বোন সবাইকে ছেড়ে এখানে পড়ে আছি। এখানে আসার পর থেকে কতরকম যন্ত্রণা। কিন্তু মা মনে বড় কষ্ট পাবেন। ভিন্ন গ্রহের এক প্রাণী যেন তার মহাকাশযান সারাতে পারে, সেজন্যে সোনার আংটি চুরি করেছি কথাটা কাউকেই বিশ্বাস করানো সম্ভব না। বাবা হয়তো বিশ্বাস করবেন, কিন্তু বাবা বিশ্বাস করলেই কী আর না করলেই কী?

আমার মনটা এত খারাপ হল যে বলার নয়, ইচ্ছে হল ডাক ছেড়ে কাঁদি, কিন্তু কেঁদে লাভ কি?

খাবার টেবিলে কেউ কোনো কথা বলল না। খালু অবশ্যি এমনিতেই বেশি কথা বলেন না, ছোট খালা সেটা পুষিয়ে নেন। আজ ছোট খালা একটিবার মুখ খুললেন না। সাধারণত বল্টু আর মিলি বেশ বকরবকর করে, আজ মনে হয় ভয়ের চোটে তারাও বেশি কথা বলছে না। বল্টুর মুখে অবশ্যি সারাক্ষণই একটা আনন্দের হাসি লেগে রইল, আমাকে ধোলাই দেয়া হবে, এর মাঝে বল্টু যদি আনন্দ না পায়, তাহলে কে আনন্দ পাবে?

পুরো খাওয়াটা কোনো রকম কথাবার্তা ছাড়াই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু এর মাঝে টেলিফোন এল। ছোট খালু টেলিফোনে খানিকক্ষণ কথা বলে আবার খেতে বসলেন, টেলিফোন করেছেন ডাক্তার চাচা, কিছু একটা অস্বাভাবিক জিনিস ঘটেছে তাঁর চেম্বারে। ছোট খালু নিজে থেকে না বললে জানার উপায় নেই, আমার আজকে জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছে না। ছোট খালা জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে কামরুলের চেম্বারে।

AMARBOI.COM

চুরি।

কী চুরি হয়েছে?

এখনো ধরতে পারছে না। কিছু ফাইল। বিলুর ফাইলটাও।

ফাইল দিয়ে কী করবে চোর?

সেটাই তো কথা।

কেমন করে চুরি হল?

বুঝতে পারছে না, দরজা-জানালা কিছু ভাঙে নি, কী ভাবে ভিতরে ঢুকে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার!

এইটুকু কথা বলার পর আবার সবাই চুপ করে গেল। ইলিশ মাছের ডিম রান্না হয়েছে আজকে, আমার খুব ভালো লাগে ইলিশ মাছের ডিম খেতে, কিন্তু আজ আর খাওয়ায় কোনো আনন্দ নেই।

খাওয়া শেষ হবার পর খালু বললেন, বল্টু আর মিলি, তোমরা তোমাদের ঘরে যাও।

বল্টু বলল, আমরা থাকি, আব্বা?

ছোট খালু গম্ভীর গলায় বললেন, না।

বল্টু আর মিলি উঠে নিজের ঘরে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে লাগল। খালু চেয়ারে হেলান দিয়ে মেঘস্বরে বললেন, বিলু, তোমার সাথে কিছু জরুরি কথা আছে।

কথাটা কি আমার আর বুঝতে বাকি থাকে না, তবু আমি মুখে একটা কৌতূহলের ভাব ফোটানোর চেষ্টা করি, কি কথা, খালু?

তোমার ছোট খালার একটা আংটি আজ সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা তোমার ঘরে পাওয়া গেছে।

আমার ঘরে? আমি খুব অবাক হবার ভান করলাম, কোথায়?

ছোট খালা বললেন, তোর বিছানার নিচে।

বিছানার নিচে? কী আশ্চর্য! আমি তখনো অবাক হবার ভান করতে থাকি। জিনিসটা খুব সোজা নয়।

খালু আবার মেঘস্বরে বললেন, আংটিটা কেমন করে তোমার ঘরে গেল বোঝাতে পারবে?

আমি কী আর বলব? টুকুনজিল থাকলে পারতাম, কিন্তু সে চলে গেছে, এখন আমি কেমন করে বোঝাব? আমি মাথা নাড়লাম, পারব না।

ছোট খালা সরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এবারে হঠাৎ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, চিৎকার করে বললেন, তোকে এখানে আনাই ভুল হয়েছে। ছোটলোকের জাত। প্রথম দিন স্কুলে গিয়ে গুণ্ডার মতো মারপিট করে এসেছিস। এই বয়সে সিগারেট খাওয়া শিখেছিস। এতেই শেষ হয় নি, এখন চুরি করা শিখেছিস। কতদিন থেকে চুরি করছিস কে জানে? ছোটলোকের জাত, কোনদিন বাসায় কার গলায় ছুরি চালিয়ে দিবি—

ছোট খালার কথা শুনে আমার মাথায় একেবারে আগুন ধরে গেল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম। খালু বললেন, আহ্ শানু, তুমি কী বলছ এইসব?

ছোট খালা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে এক পাক ঘুরে আঙুল থেকে আংটিটা খুলে খাবার টেবিলের উপর ছুড়ে দিয়ে বললেন, এই আংটিটার কি পা আছে? নিজে নিজে হেঁটে গেছে বিলুর ঘরে? হেঁটে হেঁটে গেছে?

এরপর যে-জিনিসটা ঘটল তার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ করে আংটিটা ছোট একটা লাফ দিল টেবিলের উপর। তারপর ঠিক মানুষের হাঁটার ভঙ্গিতে টেবিলের উপর হেঁটে বেড়াতে শুরু করল। ছোট খালার কাছাকাছি এসে আবার ছোট ছোট দু'টি লাফ দিল আংটিটা।

ছোট খালা একটা চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে পিছনে সরে এলেন। খালু দাঁড়াতে গিয়ে তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনোমতে টেবিল ধরে সামলে নিলেন। আমিও একটা চিৎকার দিচ্ছিলাম, হঠাৎ বুঝে গেলাম কী হয়েছে। টুকুনজিল এসেছে! টুকুনজিল!!

ছোট খালা ঢোক গিলে বললেন, কী হচ্ছে এটা? কী হচ্ছে?

তার কথা শুনেই কি না জানি না, আংটিটা আবার হেঁটে বেড়াতে শুরু করল। আমি অনেক কষ্ট করে হাসি চেপে বললাম, দেখেছ ছোট খালা? দেখেছ? এই আংটিটা নিজে নিজে হেঁটে যেখানে খুশি চলে যায়!

কেন? কেন যাচ্ছে? হায় আল্লাহ্!

খালু আংটিটা ধরার চেষ্টা করলেন, ধরতে পারলেন না, হাত ফসকে আংটিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা লাফ দিয়ে ডালের বাটিতে ডুবে গেল।

ঠিক তখন একটা আলোর ঝলকানি দেখলাম, সাথে সাথে ছোট খালা একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার দিলেন।

খালু ছোট খালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে, শানু? কি হয়েছে?

ছোট খালা কাঁপতে কাঁপতে তাঁর হাতটি মেলে ধরলেন, বল্টু আর মিলিও ছুটে এসেছে তাদের ঘর থেকে। সবাই মিলে দেখল—হাতের উল্টো পিঠে ছোট গোল পোড়া দাগ।

বল্টু শুকনো মুখে বলল, সিগারেটের ছ্যাঁকা। ঠিক বিলুর মতো।

ছোট খালা প্রায় কাঁদতে শুরু করলেন। বললেন, এক্ষুণি হল। এইমাত্র—এইমাত্র কে জানি ছ্যাঁকা দিল।

হঠাৎ করে ছোট খালা আমার দিকে ঘুরে তাকালেন, আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এই বিলু—বিলু সব জানে। জিনের আছর আছে। আমি শুনেছি সারা রাত জিনের সাথে কথা বলে।

খালু ছোট খালার হাত ধরে বললেন, আহ্! কী আজেবাজে কথা বলছ!

ছোট খালার হিস্টিরিয়ার মতো হয়ে গেল, চিৎকার করে বললেন, বাজে কথা বলছি আমি? বাজে কথা? ওর চোখের দিকে তাকাও, দেখেছ কী রকম দৃষ্টি? ওটা কি মানুষের দৃষ্টি? হায় আল্লাহ্, আমি কী সর্বনাশ করেছি! নিজের ঘরে শয়তান ডেকে এনেছি। বাণ মেরে দিচ্ছে, যাদু করে দিচ্ছে সবাইকে—ছেলেপুলের সংসার আমার তছনছ করে দিচ্ছে—

আমি কিছু-একটা বলার চেষ্টা করলাম, খালু ধমক দিয়ে বললেন, যাও, তোমার ঘরে যাও।

AMARBOI.COM

আমি আমার ঘরে বসে শুনতে পেলাম ছোট খালা হাউ হাউ করে কাঁদছেন। কী যন্ত্রণা!

ফিসফিস করে বললাম, টুকুনজিল।

কি হল?

তুমি কোথায় গিয়েছিলে? ডেকে পাচ্ছিলাম না!

ইঞ্জিনটা ঠিক হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখলাম।

ঠিক হয়েছে?

নিরানব্বই দশমিক নয় নয় নয় নয় নয় নয় নয় ভাগ।

তা হলে তো ঠিকই হয়ে গেছে।

সোনাতে ভেজাল মিশানো ছিল, আলাদা করি নি। তাই অল্পকিছু গোলমাল আছে।

কোথায় গিয়েছিলে?

চতুর্থ গ্রহ। দ্বিতীয় চন্দ্র।

আমি অবাক হয়ে বললাম, মঙ্গল গ্রহে? মঙ্গল গ্রহের চাঁদে?

হ্যাঁ।

এত তাড়াতাড়ি আবার ঘুরে চলে এসেছ! এত তাড়াতাড়ি?

আমি খুব তাড়াতাড়ি যেতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী মজা! তুমি এখন তোমার দেশে ফিরে যেতে পারবে?

পারব।

কবে যাবে?

সময় সংকোচনের প্রথম প্রবাহের দ্বিতীয় পর্যায়ে মূল তরঙ্গের পর।

সেটা কবে?

শুরু হয়ে গেছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, তার মানে তুমি চলে যাবে?

হ্যাঁ। কালকে যাওয়া সবচেয়ে সুবিধে। পরশুদিন বেশ কষ্ট হবে। তার পরের দিন খুব কঠিন, সাফল্যের সম্ভাবনা চার দশমিক তিন। তার পরের দিন সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি।

তুমি চলে যাবে!

টুকুনজিল কোনো উত্তর দিল না। একটু পরে বলল, তোমার মস্তিষ্কে অবতরঙ্গ তৈরি হচ্ছে, মূল তরঙ্গের পাশে দুটি ছোট তরঙ্গ—কেন এটা হচ্ছে?

তুমি চলে যাবে, তাই আমার মন-খারাপ হচ্ছে।

মন খারাপ? মন খারাপ মানে কি?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, তুমি মন খারাপ মানে জান না? তোমার কখনো মন খারাপ হয় না?

না। সেটা কেমন করে হয়?

আমি একটু মাথা চুলকালাম, যার কখনো মন খারাপ হয় না, তাকে কেমন করে বোঝাব মন খারাপ কী জিনিস? একটু ভেবে বললাম, মন খারাপ হচ্ছে মন ভালো হওয়ার উল্টোটা। হাসিখুশির উল্টো হচ্ছে মন খারাপ।

AMARBOI.COM

হাসিখুশি? সেটা কি?

তুমি হাসিও জান না? আমি খুকখুক করে হেসে ফেললাম শুনে।

তুমি কী করলে এটা?

আমি একটু হাসলাম।

হাসলে এরকম শব্দ করতে হয়?

হ্যাঁ, একেকজন মানুষ একেক রকমভাবে হাসে। কেউ হাঃ হাঃ করে শব্দ করে, কেউ হোঃ হোঃ করে শব্দ করে, কেউ খিকখিক শব্দ করে-

সম্পূর্ণ যুক্তিবহির্ভূত ব্যাপার। তুমি আবার হাস দেখি।

এমনি, এমনি কেমন করে হাসব, একটা হাসির ব্যাপার হলেই শুধু হাসা যায়।

অত্যন্ত কৌতূহল-উদ্দীপক ব্যাপার। মানুষের মাঝে অনেক কিছু শেখার আছে। হাসি। মন খারাপ। আর কী আছে তোমাদের?

আমি মাথা চুলকালাম, বললাম, ভয় বলে আরেকটা জিনিস আছে।

ভয়?

হ্যাঁ ভয়।

একটু ভয় পাও দেখি।

আমি আবার খুকখুক করে হেসে বললাম, খামোকা আমি ভয় পাব কেমন করে? একটা ভয়ের জিনিস হোক, তখন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা কী রকম?

আমি আবার মাথা চুলকালাম, অনেক যখন বিপদ হয় তখন ভয় পায় মানুষ।

সত্যি?

হ্যাঁ। তোমার যখন বিপদ হয়েছিল, তুমি ভয় পেয়েছিলে না?

না। আমাদের কোনো অনুভূতি নেই। আমাদের হচ্ছে যুক্তি–তর্ক আর হিসেব। চুলচেরা হিসেব।

তোমাদের কোনো অনুভূতি নেই? রাগ–দুঃখ, ভয়–ভালবাসা কিছু নেই?

না।

ভারি আশ্চর্য!

টুকুনজিল বলল, তুমি আমাকে শেখাবে?

তুমি যদি শিখতে চাও, শেখাব। আগে থেকে বলে রাখি, তোমার কিন্তু লাভ থেকে ক্ষতিই বেশি হবে।

আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বাসার সামনে দু'টি মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে দেখা যায় না, কিন্তু মনে হয় ভিতরে কেউ বসে আছে। শুধু মনে হয় বসে বসে এদিকে তাকিয়ে আছে। কিছু–একটা ব্যাপার আছে এর ভিতরে। সবাইকে এখন বলে দেয়ার সময় হয়েছে, তাহলে আর আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না। আমি ডাকলাম, টুকুনজিল।

বল।

আমি কি এখন তোমার কথা সবাইকে বলতে পারি?

পার। কাকে বলবে তুমি?

আমার ডাক্তার চাচাকে বলেছিলাম, বিশ্বাস করেন নি। মনে করেছিলেন, আমি পাগল। আমি একটু হাসলাম—

টুকুনজিল বলল, তুমি হাসলে এখন, তার মানে এটা হাসির ব্যাপার?

হ্যাঁ। বুঝতে পারলে, কেন এটা হাসির ব্যাপার?

এখনো বুঝি নি। ঠিক আছে বল, কাকে বলবে?

আমার স্যারকে। স্যার আমার কথা বিশ্বাস করবেন। তুমি কি সেই আংটির খেলাটা দেখাতে পারবে? ক্লাসের সবাইকে।

পারব। তুমি যদি চাও, তা হলে তোমাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখব সবার সামনে।

পারবে তুমি? পারবে?

পারব। খুব সহজ। আমার ইঞ্জিনের এখন অনেক শক্তি।

আমি খুশিতে একেবারে হেসে ফেললাম।

টুকুনজিল বলল, আবার হাসলে তুমি! এটা হাসির ব্যাপার? এটা হাসির ব্যাপার?

অনেক কথা হল আমার টুকুনজিলের সাথে। প্রথম যখন দেখা হয়েছিল, একেবারে ভালো করে কথা বলতে পারত না, একটা কথা বলত এক শ' বার, এখন প্রায় মানুষের মতো কথা বলতে শিখে গিয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, তার হাসতে শেখার চেষ্টা। মাঝে–মাঝেই হাসার মতো শব্দ করে—বেশির ভাগ সময়েই ভুল জায়গায়। আমি তাকে শুধরে দিচ্ছি, কে জানে, তার গ্রহে ফিরে যাবার আগে সে হয়তো হাসতে শিখে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১. ছিনতাই

আজকেও আমি বল্টুর স্কুলে নেমে হেঁটে হেঁটে আসছিলাম। ক্লাসে আজকে কী মজা হবে চিন্তা করে আমার মুখের হাসি বন্ধ হচ্ছিল না। ক্লাস শুরু হওয়ার পরই আমি হাত তুলে বলব, স্যার, একটা কথা বলতে পারি?

স্যার বলবেন, কি কথা?

আমি বলব, খুব জরুরী কথা।

স্যার বলবেন, বল।

ঠিক তখন টুকুনজিল আমাকে বেঞ্চের উপর দিয়ে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে আসবে, স্যারের সামনে; এনে মেঝে থেকে এক হাত উপরে ঝুলিয়ে রাখবে। স্যার নিশ্চয়ই এত অবাক হবেন যে কথা পর্যন্ত বলতে পারবেন না। আমি তখন বলব, স্যার, আপনার সাথে আমার বন্ধু টুকুনজিলের পরিচয় করিয়ে দিই।

স্যার বলবেন, টুকুনজিল?

আমি তখন বলব, জ্বি স্যার, মহাকাশের প্রাণী টুকুনজিল। তাকে দেখা খুব শক্ত, ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছাড়া দেখা যায় না—

ঠিক এরকম সময়ে কে যেন আমার ঘাড়ে টোকা দিল। আমি চমকে পিছনে তাকালাম। খুব ভালো কাপড় পরা একজন মানুষ। সামনে চুল একটু পাতলা হয়ে এসেছে, চোখে চশমা। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে, খোকা, শোন—

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, তুমি একটু এদিকে আসবে?

এখন তো আমার স্কুলে যাবার সময়।

এক মিনিট—

আমি হঠাৎ টের পেলাম, আমার দুই পাশে আরো দুইজন মানুষ আমার দুই হাত শক্ত করে ধরেছে। মানুষগুলো ভালো কাপড়-পরা, মুখ কেমন যেন হাসি হাসি, কেউ দেখলে ভাববে আমার পরিচিত কোনো মানুষ কিছু-একটা মজার কথা বলবে আমার সাথে। কিন্তু আমার বুঝতে বাকি থাকে না, এর মাঝে মজার কিছু নেই। লোক দু'জন আমাকে প্রায় শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। কাছেই সেই মাইক্রোবাসটা দাঁড়িয়ে আছে, কাছাকাছি আসতেই দরজাটা খুলে গেল আর দুই জোড়া শক্ত হাত আমাকে ভিতরে টেনে নিল। পুরো ব্যাপারটা ঘটল চোখের পলকে, আমি কিছু বোঝার আগে।

মাইক্রোবাসের জানালা টেনে তুলে রাখা, বাইরে থেকে দেখার উপায় নেই। ভিতরে সব কয়জন বিদেশি, লাল রঙের চেহারা দেখলেই পিলে চমকে যায়। একজন হলুদ দাঁত বের করে হাসার ভঙ্গি করে বলল, কুকা, টোমাড় কুনু বয় নায়—যার অর্থ নিশ্চয়ই খোকা, তোমার কোনো ভয় নেই।

আমি গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দিতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন হাতের কনুইয়ের কাছে একটা খোঁচা লাগল, হাতটা সরানোর চেষ্টা করতেই দেখলাম কেউ-একজন শক্ত করে ধরে রেখেছে। মাথা ঘোরাতেই দেখলাম, একটা সিরিঞ্জে করে কী-একটা ইনজেকশান দিচ্ছে আমাকে।

প্রচণ্ড ভয়ে আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু তার আগেই হলুদ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁতের লোকটা আমার মুখ চেপে ধরে বলল, কুকা, কুনু বয় নায়।

আমার গলা দিয়ে বিশেষ শব্দ বের হল না, যেটুকু বের হল, মাইক্রোবাসের ইঞ্জিনের শব্দে চাপা পড়ে গেল তার বেশির ভাগ। আরেকটা চিৎকার দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শরীরে জোর পাই না আমি, হঠাৎ করে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। নিশ্চয়ই আমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। চোখ বন্ধ করার আগে দেখতে পেলাম, হলুদ-দাঁতের লালমুখো বিদেশিটা আমার উপর ঝুঁকে মুখে হাসির ভঙ্গি করে রেখেছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি অনেক রকম স্বপ্ন দেখলাম। ছাড়া-ছাড়া আজগুবি সব স্বপ্ন। এক সময় স্বপ্নে দেখলাম আমি বাড়ি ফিরে গেছি, বাবা একটা গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে এমন একটা ভঙ্গি করলেন, যেন আমাকে দেখতেই পান নি। আমি ডাকলাম, বাবা।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, কে কথা বলে?

আমি বললাম, আমি।

আমি কে?

আমি বিলু।

বিলু?

হ্যাঁ।

বাবা আকুল হয়ে বললেন, তুই কোথায় বাবা বিলু?

আমি বললাম, এই তো, বাবা।

বাবা মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন কিন্তু তবু আমাকে দেখতে পেলেন না। বললেন, কোথায় তুই? কোথায়? তোকে দেখতে পাই না কেন?

আমি বললাম, এই তো বাবা, আমি এখানে।

কোথায়?

এই তো! বাবা, বাবা—

বিলু বিলু বিলু—

আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, কেউ-একজন সত্যি আমাকে ডাকছে। আমি আস্তে আস্তে চোখ খুললাম, উজ্জ্বল আলো ঘরে, তার মাঝে একজন আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। আগে কোথায় জানি দেখেছি লোকটাকে, কিন্তু মনে করতে পারলাম না।

আমার হঠাৎ করে সব মনে পড়ে গেল। স্কুলে যাচ্ছিলাম আমি, তখন রাস্তা থেকে ধরে এনেছে আমাকে, আমি উঠে বসার চেষ্টা করলাম। মাথার কোথায় জানি প্রচণ্ড যন্ত্রণা করে উঠল হঠাৎ। মনে হচ্ছে ভিতরে একটা শিরা ছিঁড়ে গেছে বা অন্য কিছু। আমার সামনে দাঁড়ানো লোকটা অন্তরঙ্গ সুরে বলল, কেমন লাগছে বিলু তোমার?

কথা শুনে মনে হল যেন আমার কতদিনের পরিচিত। আমি জিব দিয়ে আমার শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে বললাম, খারাপ। খুব খারাপ।

এই তো এক্ষুণি ভালো লাগবে তোমার।

আপনি কে? আমি কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্ষুণি জানবে তুমি, আমি কে। নাও, এই ওষুধটা খেয়ে নাও।

ছোট একটা গ্লাসে করে লাল রঙের একটা ওষুধ আমার মুখের কাছে ধরল মানুষটা। আমি মাথা নাড়লাম, কি-না-কি খাইয়ে দিচ্ছে কে জানে।

খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, ভালো লাগবে—বলে প্রায় জোর করে ওষুধটা আমার মুখের মাঝে ঢেলে দিল। ওষুধটা মিষ্টি এবং চমৎকার একটা সুগন্ধ, তবু আমি খেলাম না, মুখে রেখে দিলাম। লোকটা আবার কাছে আসতেই আমি পিচকারির মতো তার মুখে ওষুধটা কুলি করে দিলাম—মানুষটাকে চিনতে পেরেছি, আজ সকালে সে আমাকে ধরে এনেছে।

লাল ওষুধটা তার চশমা বেয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে তার চমৎকার কাপড়ে লাল লাল ছোপ হয়ে যায়।

ঠা ঠা করে কে যেন হেসে উঠল হঠাৎ, আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, লালমুখের আরেকজন বিদেশি মানুষ। আগে একে দেখেছি বলে মনে পড়ল না। কে জানে, হয়তো দেখেছি, এদের সবগুলোকে একই রকম দেখায়!

ভালো কাপড়-পরা মানুষটি তার লাল লাল ছোপ কাপড় নিয়ে আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকাল। আমি একেবারে লিখে দিতে পারি, ঘরে আর কেউ না থাকলে আমাকে মেরে বসত। কিন্তু আমি জানি আমার গায়ে কেউ হাত দেবে না। সারা পৃথিবীতে শুধু আমিই টুকুনজিলের খোঁজ জানি, এই লোকগুলো সে জন্যেই আমাকে ধরে এনেছে।

বিদেশি লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে হড়বড় করে কী যেন বলল, আমি তার একটা অক্ষরও বুঝতে পারলাম না। নিশ্চয়ই ইংরেজিই হবে, কিন্তু এটা কী রকম ইংরেজি!

একটা রুমাল দিয়ে মুখ কপাল এবং ঘাড় মুছতে মুছতে ভালো কাপড়-পরা মানুষটি বলল, এই সাহেব বলছেন যে তোমার অনেক বড় বিপদ ছিল, সেটা কি তুমি জানতে?

কি বিপদ?

একটা প্রাণী তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, অনেক কষ্ট করে তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে।

কোন প্রাণী?

মহাকাশের প্রাণী।

আমাকে ধরে নিতে এসেছিল?

হ্যাঁ।

রাগে আমার পিত্তি জ্বলে গেল, বললাম, মিথ্যুক—আপনার লজ্জা করে না এরকম মিথ্যা কথা বলতে? আমাকে মহাকাশের প্রাণী ধরে আনে নি, আপনারা ধরে এনেছেন। বিদেশি দালাল।

বিদেশি লোকটা তখন ভালো কাপড়-পরা মানুষটির সাথে খানিকক্ষণ কথা বলল। আমি ইংরেজি একটু একটু বুঝতে পারি, কিন্তু বিদেশিদের উচ্চারণ বড় খটমটে। দু'জনে কী কথা হল আমি পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারলাম, বিদেশি লোকটি এই মানুষটিকে চলে গিয়ে অন্য একজনকে আসতে বলছে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশি মানুষটি নিশ্চয়ই কোনো বড় মানুষ, কারণ সে যখনই কথা বলে, ভালো কাপড়–পরা মানুষটি মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, জ্বি স্যার, জ্বি স্যার, অবশ্যি স্যার—

মানুষটি বের হওয়ার পর ঘরে শুধু আমি আর বিদেশি মানুষটা। সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার মতো ভঙ্গি করল, আমার ইচ্ছে করল জিব বের করে একটা ভেংচি কেটে দিই। কিন্তু দিলাম না, হাজার হলেও একজন বিদেশি মানুষ। আমি মনে মনে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোন দেশের মানুষ?

বেশ কয়েকবার বলার পর বিদেশিটা বুঝতে পারল আমি কী জিজ্ঞেস করছি। উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

আমি আবার মনে মনে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বললাম, দেখতে চাই কোন দেশের মানুষ এত বদমাইশ।

এই কথাটা কিন্তু সে একবারেই বুঝে গেল, আর আমার মনে হল কথাটা শুনে তার কেমন যেন একটু মন–খারাপ হয়ে গেল। লোকটা কেমন জানি সরু চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ।

দরজা খুলে এবার শাড়ি–পরা একজন মেয়ে এসে ঢুকল ঘরে। খুব সুন্দর চেহারা মেয়েটির, একেবারে সিনেমার নায়িকাদের মতো। মেয়েটি প্রথমে খানিকক্ষণ বিদেশি লোকটার সাথে কথা বলে আমার দিকে এগিয়ে এল, আমার গায়ে হাত দিয়ে বলল, আমার নাম শায়লা। তোমার নাম নিশ্চয়ই বিলু?

আমি মাথা নাড়লাম।

তুমি নাকি ঠিক করে কথা বলতে চাইছ না।

আপনারা ছেলেধরার দল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আগে পুলিশের সাথে কথা বলব।

ছেলেধরা? শায়লা নামের মেয়েটা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল হঠাৎ। একটু ইতস্তত করে বলল, তুমি তো সব কিছু জান না, তাই তোমার এরকম মনে হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কী চান?

আমরা চাই, তুমি যেন আমাদের সাহায্য কর।

কী সাহায্য?

আমরা যেন মহাকাশের প্রাণীটাকে আটকে ফেলতে পারি, তাহলে তোমার আর কোনো বিপদ থাকবে না। তুমি চলে যেতে পারবে।

আমি মেয়েটার মুখের দিকে তাকালাম, এত সুন্দর চেহারা মেয়েটার, কিন্তু কী রকম মিথ্যা কথা বলছে। জিজ্ঞেস করলাম, আটকে ফেলে কী করবেন?

তার উপর গবেষণা করা হবে।

তার কি কোনো ক্ষতি হবে?

ক্ষতি? ক্ষতি—না, মানে—ঠিক ক্ষতি হবে না মনে হয়।

কতদিন লাগবে গবেষণা করতে?

অনেকদিন, এক বছর, দুই বছর, দশ বছর।

ততদিন তাকে আটকে রাখবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক যত্ন করে রাখা হবে, কোনো অসুবিধে হবে না তার।

আমি কোনো কথা বললাম না, টুকুনজিল আমাকে বলেছে তিনদিনের মাঝে তাকে চলে যেতে হবে, যদি যেতে না পারে তাহলে আটকে পড়ে যাবে পৃথিবীতে। আর এরা তাকে জোর করে আটকে রাখতে চাইছে দশ বছর! আমি তো কিছুতেই সেটা হতে দিতে পারি না।

শায়লা নামের মেয়েটা বলল, কি হল, কথা বলছ না কেন?

আমি চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ, বিদেশি দালাল আর ছেলেধরার দলের সাথে কথা বলব না।

শায়লার মুখটা একটু লাল হয়ে গেল, বলল, তুমি কাকে চোর-গুণ্ডা বলছ? এই যে ইনি—এঁর নাম বব কার্লোস। ডক্টর বব কার্লোস। মহাকাশের প্রাণীদের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন সারা জীবন। পৃথিবীর সবাই তাঁকে এক ডাকে চেনে।

এই জন্যে তাঁর সাত খুন মাফ? আমাকে আগে ছেড়ে দিন, তারপর আমি কথা বলব।

কিন্তু ছেড়ে দিলে তোমার অনেক বিপদ—

মিথ্যুক।

তুমি যদি সাহায্য কর, তোমাকে অনেক বড় পুরস্কার—

মিথ্যুক ! মিথ্যুক!!

বিলু, তুমি অবুঝ হয়ো না। আমার কথা শোন—

আমি মিথ্যুকদের সাথে কথা বলি না।

শায়লা হাল ছেড়ে দিয়ে বব কার্লোস নামের বিদেশি লোকটার দিকে তাকাল। বব কার্লোস কিছু-একটা জিজ্ঞেস করল শায়লাকে, উত্তরে শায়লাও কিছু-একটা বলল। দু'জনে কথা হল বেশ খানিকক্ষণ, বব কার্লোসকে কেমন যেন ক্লান্ত দেখায়। হেঁটে হেঁটে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে। শায়লা আবার এগিয়ে আসে আমার দিকে, তার মুখে আগে যেরকম একটা হাসি-খুশির ভাব ছিল, এখন আর সেটা নেই। কেমন যেন কঠিন মুখ করে রেখেছে—দেখে একটু ভয়ই লাগে। শায়লা বলল, ডক্টর কার্লোস তোমাকে কয়েকটা কথা বলবেন, তুমি খুব মন দিয়ে শোন।

বব কার্লোস কথা বলতে শুরু করল। গলার স্বরটা গমগমে, একটা কথা বলে থেমে যায়, শায়লা তখন সেটা আমাকে বাংলায় অনুবাদ করে দেয়। বব কার্লোস বলল:

ছেলে, তুমি মন দিয়ে শোন আমি কি বলি। মহাকাশের এই প্রাণী আসছে আমরা দুই বছর থেকে জানি। আমাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, আমরা তাকে পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করেছি। সে পৃথিবীতে এসে ডুব মেরেছে, আমাদের সাথে আর যোগাযোগ করছে না। কার সাথে যোগাযোগ করেছে? তোমার সাথে। কেন? ঘটনাক্রমে।

কিন্তু শুনে রাখ, পৃথিবীর সবগুলো উন্নত দেশ মিলে এক শ' এগারো বিলিওন ডলার খরচ করেছে এই প্রজেক্টে। এক শ' এগারো বিলিওন ডলার কত টাকা তুমি জান? জান না। তোমার দেশকে বেচলেও এত টাকা হবে না। কেন আমরা এই টাকা খরচ করেছি জান? কারণ, এই প্রাণী এমন অনেক টেকনোলজি জানে যেটা আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি না। সেই টেকনোলজি শিখতে আমাদের এক শ' বছরে এক শ' ট্রিলিওন ডলার লেগে যাবে। হয়তো আরো বেশি। তাই শুনে রাখ, এটা খুব জরুরি। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলার জন্যে এই প্রজেক্ট শুরু করা হয় নি। এই প্রজেক্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তোমার জীবন, তোমার বন্ধুত্ব এসবের কোনো মূল্য নেই এই প্রজেক্টের সামনে। কোনো মূল্য নেই।

আমরা সব জানি। আমরা জানি এই প্রাণী তোমার কাছে ঘুরঘুর করে। আমরা তার কথাবার্তা খবরাখবর সবকিছু ধরতে পারি কিন্তু তাকে ধরতে পারি না। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরতে পারি নি। কিছুতেই তাকে দেখতে পারি নি।

শেষ পর্যন্ত আমরা বুঝেছি কেন তাকে ধরতে পারি না। তোমার ডাক্তারের কাছ থেকে তোমার ফাইলটা আনা হয়েছে, সেখানে আমরা দেখেছি তুমি মহাকাশের প্রাণীর কথা বলেছ। আমরা প্রথমবার বুঝতে পেরেছি কেন আমরা তাকে কখনো দেখতে পারি নি, কারণ সে ছোট, খুবই ছোট। আমাদের জন্যে সেটা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর আবিষ্কার। আমাদের সব যন্ত্রপাতি নূতন করে তৈরি করতে হয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের। এখন আমরা আবার তাকে ধরার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি।

তোমাকে এখন আমাদের দরকার। তুমি যদি নিজে থেকে আমাদের সাহায্য কর, তাহলে ভালো। খুবই ভালো। যদি না কর, কোনো ক্ষতি নেই, আমরা তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেব। শুনে রাখ ছেলে, তুমি বেঁচে থাক কি মরে যাও তাতে কিছু আসে যায় না—কিছু আসে যায় না। আমরা এই প্রজেক্টে এক শ' এগারো বিলিওন ডলার খরচ করেছি। এই টাকা আমরা পানিতে ফেলে দেব না। এই প্রাণীটা আমাদের দরকার। অনেক দরকার।

আমরা তাকে একটা নাম দিয়েছিলাম। এন্ড্রোসিলিকান। এন্ড্রোমিডা থেকে এসেছে, তাই এন্ড্রো, শরীরটা কার্বনভিত্তিক না হয়ে সিলিকনভিত্তিক বলে সিলিকান। দুই মিলে এন্ড্রোসিলিকান। আর এই প্রাণী নিজেকে কী বলে ডাকে? টুকুনজিল। টুকুনজিল একটা নাম হল! নাম হল? দুই বেলা নিজের জগতে খবর পাঠাচ্ছে, আমার নাম টুকুনজিল—আমার নাম টুকুনজিল। কী প্রচণ্ড ছেলেমানুষি। কী প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতা! কিন্তু কেন এটা করছে? কারণ তুমি তাকে এই নাম দিয়েছ। তুমি।

কী করছে এই হতভাগা প্রাণী? দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা তোমার পিছনে পিছনে ঘুরঘুর করছে! তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে সে সত্যি। বোঝার চেষ্টা করছে তুমি কেমন করে হাস। তুমি কেমন করে কথা বল। কেমন করে রাগ হও। হতভাগা টুকুনজিল! এক শ' এগারো বিলিওন ডলার খরচ করা হয়েছে এর পিছনে, আর এই প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার মতো একজন নির্বোধ ছেলের পিছনে। তুমি ভাবছ আমরা এটা মেনে নেব?

না। তুমি সাহায্য কর ভালো। যদি না কর কিছু আসে যায় না। তোমাকে আমরা ধরে এনেছি, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। এখন তোমাকে ব্যবহার করব। তার কারণে তোমার যদি কোনো ক্ষতি হয়, কিছু করার নেই। তুমি যদি মরে যাও, কেউ যদি আর তোমাকে খুঁজে না পায়, কিছু করার নেই। এতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। পৃথিবীতে তোমার জন্যে কেউ ব্যস্ত নয়, তোমার পাগল বাবা কিছু করতে পারবে না। কেউ তার কথা শুনবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বব কার্লোস কথা বন্ধ করে আমার চোখের দিকে তাকাল। মনে হল কেমন যেন বিষণ্ন চোখের দৃষ্টি। মানুষের চোখের রং যদি নীল হয় তাকে দেখতে কেমন জানি অদ্ভুত দেখায়, মনে হয় যেন মানুষ নয়, যেন অশরীরী কোনো প্রাণী। খুব আস্তে আস্তে আমাকে জিজ্ঞেস করল, মহাকাশের প্রাণীকে ধরতে তুমি আমাদের সাহায্য করবে?

টুকুনজিলকে এরা আটকে ফেলবে? ফিরে যেতে দেবে না তার দেশে? কেটে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করবে? আমি কেমন করে সেটা করতে দিই তাদের? আমি মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বললাম, তুমি আর তোমার চৌদ্দ গুষ্টি জাহান্নামে যাও। আমি টুকুনজিলকে ধরিয়ে দেব না।

১২. কালরাত

খুব সুন্দর একটা ঘরে আমাকে আটকে রেখেছে। রাতে বিস্বাদ কিন্তু খুব সুন্দর করে সাজানো খাবার খেতে দিয়েছে। ঘরে কোনো জানালা নেই। ধবধবে সাদা দেয়াল, উপরে উজ্জ্বল আলো। ঘরে আর একটি জিনিসও নেই, আমি চুপচাপ বসে থেকেছি। আমাকে দিয়ে কী করবে জানি না। বুকের ভেতর চাপা কেমন জানি একটা ভয়। বসে থেকে অপেক্ষা করতে–করতে আমি একসময় নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কারণ যখন ঘুম ভাঙল আমি একেবারে চমকে জেগে উঠলাম।

বেশ কয়েকজন মানুষ আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বিদেশি। আমাকে ধরে প্রায় শূন্যে ঝুলিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। চেয়ারটা খুব চমৎকার, মহাকাশচারীরা যেরকম চেয়ারে বসে রকেটে করে যায়, অনেকটা সেরকম। লোকগুলো চেয়ারের হাতলে আমার হাত দু'টি লাল রঙের নাইলনের ফিতা দিয়ে বেঁধে ফেলল। চেয়ার থেকে দু'টি বড় বড় বেল্ট বের হয়ে এসেছে, সেটা বুকের উপর দিয়ে নিয়ে আমাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। পা দু'টি খোলা ছিল, এক জন সেগুলোও চেয়ারের নিচে কোথায় জানি আটকে দিল। চেয়ারটাতে মাথা রাখারও একটা জায়গা আছে সেখানে মাথাটা রেখে কপালের উপর দিয়ে একটা বেল্ট টেনে এনে মাথাটাও আটকে ফেলল।

আমি প্রথমে একটা বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মানুষগুলো দৈত্যের মতো, তাদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেও কোনো লাভ নেই, আমি কিছুক্ষণের মাঝে হাল ছেড়ে দিলাম। প্রচণ্ড আতঙ্কে আমি সেই আশ্চর্য চেয়ারে শক্ত হয়ে শুয়ে রইলাম।

চেয়ারটাতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নেয়ার পর এক জন কোথায় একটা সুইচ টিপে দিতেই চেয়ারটা আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকে। আরেকটা সুইচ টিপে দিতেই চেয়ারটা কাত হয়ে লম্বা একটা বিছানার মতো হয়ে গেল। তখন আরেকজন লোক কপালের চারপাশে চুষনির মতো কী–একটা জিনিস লাগিয়ে দিতে থাকে, সেখান থেকে লম্বা ইলেকট্রিক তার বের হয়ে এসেছে। সেগুলো গিয়েছে পাশে রাখা নানারকম যন্ত্রপাতিতে—কিছুক্ষণের মাঝে ঘরটা যন্ত্রপাতিতে বোঝাই হয়ে গেছে। সেগুলো থেকে নানারকম আলো বের হচ্ছে, নানারকম শব্দ। লোকগুলো গম্ভীর মুখে যাওয়া–আসা করছে, যন্ত্রপাতি টানাটানি করছে, কথাবার্তা বলতে গেলে নেই, যেটুকু হচ্ছে খুব নিচু

AMARBOI.COM

গলায়।

আমি কয়েকবার জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলাম, কী করছ তোমরা? কী করছ?

কেউ আমার কথায় কোনো গুরুত্ব দিল না, এক জন শুধু দৈত্যের মতো হলুদ দাঁত বের করে হাসার ভঙ্গি করে বলল, কুনু বয় নায়।

কথাটির অর্থ নিশ্চয়ই "কোনো ভয় নেই", কিন্তু ভয়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হল। আমি কুলকুল করে ঘামতে শুরু করেছি, বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ড ঢাকের মতো শব্দ করছে। ইচ্ছে হচ্ছে চিৎকার করে কাঁদি, কিন্তু দৈত্যের মতো লোকগুলোর মুখে মায়াদয়ার কোনো চিহ্ন নেই। দেখে মনে হয় দরকার হলে খুব ঠাণ্ডা মাথায় হাসিমুখে আমাকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু আমাকে নিশ্চয়ই মারবে না। টুকুনজিলের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে না? প্রচণ্ড আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আমি অসহায়ভাবে শুয়ে কী হয় দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি।

বব কার্লোস এল একটু পরে, আমি তাকেও কয়েকবার ডাকলাম, কিন্তু আমাকে সে পুরোপুরি উপেক্ষা করে যন্ত্রপাতির সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সুইচ টিপে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। আমি কান পেতে লোকগুলোর কথা শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম, কি বলাবলি করছে বোঝার চেষ্টা করলাম। মনে হল আমার মস্তিষ্কের নানারকম তরঙ্গ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে। সেগুলোকে একটা খুব শক্তিশালী এমপ্লিফায়ার দিয়ে বাড়িয়ে নিয়ে বাসায় ছাদে লাগানো এন্টেনা দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। বব কার্লোসের দলবল আশা করছে টুকুনজিল আমার মস্তিষ্কের তরঙ্গের সাথে পরিচিত, কাজেই এই সংকেত পেয়ে বুঝতে পারবে আমি কোথায়, তখন ছুটে আমার সাথে দেখা করতে আসবে। এই ঘরে নানারকম যন্ত্রপাতি রাখা আছে, টুকুনজিল আসামাত্র তাকে ধরে ফেলা হবে।

টুকুনজিল আর যাই হোক, বোকা নয়। আমাকে অনেকবার বলেছে যে বিজ্ঞানীদের থেকে সে দূরে দূরে থাকতে চায়, কেন সেটা সে কখনো ঠিক করে বলে নি। এখন খানিকটা বুঝতে পারছি, সে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আগেই টের পেয়ে গিয়েছিল। টুকুনজিল নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে, এটা তাকে ধরার একটা কৌশল, তাহলে কেন সে জেনেশুনে এই ফাঁদে পা দিতে আসবে আমি বুঝতে পারছিলাম না। যখন পুরোপুরি প্রস্তুতি নেয়া হল, তখন হঠাৎ করে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

দৈত্যের মতো এক জন মানুষ ছোট একটা সিরিঞ্জ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল, শার্টের হাতাটা একটু গুটিয়ে কিছু বোঝার আগে ঘ্যাচ করে আমার হাতে সিরিঞ্জটা বসিয়ে লাল রঙের ওষুধটা শরীরে ঢুকিয়ে দিল। সেই ওষুধটায় কী ছিল জানি না, কিন্তু হঠাৎ করে মনে হল কেউ যেন গনগনে জ্বলন্ত সীসা আমার শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরে গেছে। সমস্ত শরীর প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠে আমার মনে হতে থাকে, কেউ যেন আমার শরীরের চামড়া ছিলে নিচ্ছে টেনে টেনে। আমি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় অমানুষের মতো চিৎকার করতে থাকি, মনে হতে থাকে আমার গলা দিয়ে বুঝি রক্ত বের হয়ে আসবে সেই চিৎকারে। লোকগুলো আমার চিৎকারে এতটুকু কান না দিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করতে থাকে। আমার মনে হতে থাকে সমস্ত শরীর যেন আগুনে ঝলসে দিচ্ছে কেউ, মনে হতে থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরের এক–একটি অংশ যেন টেনে টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছে শরীর থেকে।

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমি প্রায় অচেতন হয়ে যাচ্ছিলাম, তার মাঝে শুনলাম বব কার্লোস বলল, ভেরি গুড! ভেরি ভেরি গুড।

এর পর ইংরেজিতে কী বলল আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মনে হল আমার প্রচণ্ড যন্ত্রণার ব্যাপারটি ঠিক তাদের মনের মতো হয়েছে, এবং সেই সংকেত নিখুঁতভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। লোকগুলো খুব খুশিতে কথা বলতে থাকে, একজন কী–একটা বলল, অন্য সবাই তখন হো হো করে হেসে উঠল খুশিতে।

অসহায়ভাবে শুয়ে আমি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকি। আমার চোখের কোনা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ে, আমি তখন ভাঙা গলায় বাবাকে ডাকতে থাকি। বাবা—বাবা গো, তুমি কোথায়—

দ্বিতীয়বার ইনজেকশানটি দিল প্রায় আধা ঘন্টা পর। আবার আমি পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকি। মনে হতে থাকে যে মাথার মাঝে কিছু–একটা গোলমাল হয়ে গেছে, কিছুতেই আর চিৎকার থামাতে পারি না। সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। যন্ত্রণা যেন শরীরের মাঝে সাপের মতো কিলবিল করে ছুটতে থাকে, উপর থেকে নিচে, নিচে থেকে উপরে—মনে হতে থাকে বিষাক্ত ছুরি দিয়ে কেউ যেন গেঁথে ফেলছে আমাকে। আমার চোখের সামনে লাল রঙের আলো খেলা করতে থাকে, আমি পাগলের মতো ভাবতে থাকি, হায় খোদা, আমি এখনো মরে যাচ্ছি না কেন? কেন মরে যাচ্ছি না? কেন মরে যাচ্ছি না?

হঠাৎ কে যেন আমার ভেতরে বলে উঠল, বিলু! কি হয়েছে তোমার বিলু?

কে? টুকুনজিল? তুমি এসেছ!

AMARBOI.COM

ঘরের মাঝে সব কয়জন মানুষ তখন মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল। বব কার্লোস চিৎকার করে কী–একটা বলল, ঘরে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল হঠাৎ, ঘড়ঘড় করে কোথায় একটা শব্দ হল। বিদ্যুৎ–স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে থাকে আর বিচিত্র শব্দে যন্ত্রপাতিগুলো আর্তনাদ করতে থাকে। তীব্র একটা লাল আলো একপাশে একটা জায়গা আলোকিত করে দেয়। ঝাঁঝালো একটা গন্ধ পেলাম আমি। লোকজনের উত্তেজিত কথাবার্তা আর যন্ত্রপাতির গুঞ্জনে কানে তালা লেগে যায় হঠাৎ।

টুকুনজিল আবার বলল, বিলু, তোমার কী হয়েছে? তুমি এরকম করছ কেন?

কষ্ট। বড় কষ্ট টুকুনজিল।

কষ্ট? সেটা কি?

আমি কোনোমতে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে চিৎকার করে কেঁদে ফেললাম। হঠাৎ করে আমার কপালে একটু গরম লাগতে থাকে, নিশ্চয়ই টুকুনজিল নামার চেষ্টা করছে। শুনলাম সে বলল, চার শ' তেরো মেগাসাইকেল। তিন মিলি সেকেন্ড পরপর। দুই তরঙ্গের অপবর্তন। অসম বন্টন। তোমার মস্তিষ্কের তরঙ্গে দেখি অনেক গোলমাল। দাঁড়াও, ঠিক করে দিই।

আমার কপালে চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করলাম, তারপর হঠাৎ করে একেবারে ম্যাজিকের মতো সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। আমার তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, মনে হচ্ছিল একটু নড়লেই আবার যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে, কিন্তু শুরু হল না। সমস্ত শরীর তখনো একটু একটু কাঁপছে, ঘামে ভিজে গেছে জামা-কাপড়। শরীরটা হালকা লাগছে হঠাৎ করে, মনে হতে থাকে যে বাতাসে ভেসে যাব আমি। বুকের ভেতর কেমন যেন আনন্দ এসে ভর করে।

আমি কিন্তু তখন ভেউ ভেউ করে কেঁদে বললাম, টুকুনজিল, তুমি না এলে এই রাক্ষসগুলো আমাকে মেরে ফেলত।

কেউ তোমাকে মারতে পারবে না, বিলু! আমি তোমাকে বাঁচাব।

এরা তোমাকে ধরতে চায়, টুকুনজিল।

আমাকে কেউ ধরতে পারবে না।

হঠাৎ বব কার্লোসের গলা শুনতে পেলাম আমি, ইংরেজিতে কী বলেছে ঠিক বুঝতে পারলাম না, 'এক মিনিট' কথাটা শুধু ধরতে পারলাম। আমি টুকুনজিলকে জিজ্ঞেস করলাম, কি বলছে তুমি বুঝতে পারছ, টুকুনজিল?

হ্যাঁ। বলেছে এক মিনিটের মাঝে আমি যদি লেজার শিল্ডের মাঝে না ঢুকে যাই তাহলে তোমাকে মেরে ফেলবে। অত্যন্ত অর্থহীন অযৌক্তিক একটা কথা।

কেন?

লেজার শিল্ডটা তৈরি করেছে মেগাওয়াট পাওয়ার দিয়ে, ছোট একটা ফুটো রেখেছে ঢোকার জন্য, ঢোকার পর ফুটোটা বন্ধ করে দেবে। আমি লেজারলাইটের মাঝে আটকা পড়ে যাব। বের হতে চেষ্টা করলেই আমার মহাকাশযান মেগাওয়াট পাওয়ারে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি কেন সেখানে ঢুকব? কখনো ঢুকব না।

আমি ঢোক গিলে বললাম, বলছে, তুমি না ঢুকলে আমাকে মেরে ফেলবে!

অত্যন্ত অযৌক্তিক ব্যাপার। দুটোর মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। আর মরে গেলে ঠিক কী হয়, বিলু?

আমি ছটফট করে বললাম, মরে গেলে সব শেষ।

কেন, শেষ কেন? আবার ঠিক করা যায় না?

না। মরে গেলে কেউ বেঁচে আসে না।

এটা হতেই পারে না।

আমি ঢোক গিলে বললাম, পারে টুকুনজিল, পারে। আমি জানি। তুমি কিছু-একটা কর তাড়াতাড়ি, কতক্ষণ হয়েছে?

ত্রিশ সেকেন্ড।

সর্বনাশ টুকুনজিল, একেবারে তো সময় নেই!

মরে গেলে শেষ কেন হবে? আমি দেখতে চাই কেমন করে শেষ হয়।

আমি চিৎকার করে বললাম, না, তুমি দেখতে চেয়ো না, টুকুনজিল। দেখতে চেয়ো না। কিছু-একটা কর।

হা হা হা। টুকুনজিল হঠাৎ হাসির মতো শব্দ করে বলল, এটা কি হাসির ব্যাপার?

না, এটা হাসির ব্যাপার না। ভয়ের ব্যাপার। ভয়ানক ভয়ের ব্যাপার। কিছু-একটা কর।

ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে নিয়ে যাই এখান থেকে। হা হা হা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর মুহূর্তে কী হল ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হল, আগুনের একটা হলকা ছুটে এল আমার দিকে, আতঙ্কে চোখ বন্ধ করলাম আমি, আর হঠাৎ মনে হল আমি প্রচণ্ড বেগে আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছি। নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না আমি, হঠাৎ মনে হল আমি বুঝি মরে যাচ্ছি—তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হবার পর আমার বেশ কিছুক্ষণ লাগল বুঝতে আমি কোথায়। যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি সাদা ধোঁয়ার মতো। সামনে-পিছনে উপরে-নিচে চারদিকে হালকা সাদা ধোঁয়া। আমার মনে হতে থাকে, সাদা ধোঁয়ার মাঝে শূন্যে ঝুলে আছি আমি। একবার মনে হল আমি বোধহয় মরে গেছি। বেশি পাপও করি নি, বেশি পুণ্যও করি নি, তাই মনে হয় দোজখ আর বেহেশতের মাঝখানে ঝুলে আছি আমি।

আমার হাত-পা সারা শরীর তখনো চেয়ারের সাথে বাঁধা। ভালো করে নড়তে পারছি না, ভয়ে ভয়ে ডাকলাম, টুকুনজিল। তুমি কোথায়?

এই যে এখানে।

এখানে কোথায়?

তোমার চেয়ারের নিচে।

কেন? নিচে কেন?

তোমাকে ধরে রেখেছি।

ধরে রাখার দরকার কী?

মাধ্যাকর্ষণ বল। ধরে না রাখলে তুমি পড়ে যাবে।

কোথায় পড়ে যাব?

নিচে।

নিচে কোথায়?

নিচে মাটিতে। প্রায় সাত হাজার ফুট নিচে।

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভয়ে, ঢোক গিলে বললাম, আমি কোথায় টুকুনজিল?

আকাশে।

আকাশে? কী সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি নিচে নামাও।

কেন?

আকাশে ঝুলে থাকবে কেমন করে? আকাশে কখনো কেউ ঝুলে থাকে নাকি?

তোমার শরীরে খুব ক্ষতিকর জিনিস ঢুকিয়ে দিয়েছিল। শরীর সেগুলো এখন পরিষ্কার করছে। সে জন্যে তোমার এখন ঘুমানো দরকার, মস্তিষ্কে এখন যেন কোনো অসম কম্পন না হয়, সেই জন্যে তোমাকে এখানে রেখেছি।

কোনোদিন শুনেছ কেউ আকাশে ঝুলে ঝুলে ঘুমায়?

এখানে কোনো শব্দ নেই, ধৈর্যচ্যুতি নেই, অসঙ্গতি নেই।

না থাকুক। আমাকে নিচে নামাও।

ঠিক আছে।

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারি চেয়ারটা ভাসতে-ভাসতে নিচে নামতে শুরু

AMARBOI.COM

করেছে। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীরটা মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিল। চারদিকে তখনো সাদা ধোঁয়ার মতো মেঘ। হঠাৎ করে মেঘ কেটে গেল, আমি অবাক হয়ে দেখলাম, নিচে রাস্তাঘাট বাড়িঘর গাছপালা পুকুর। মেঘের ফাঁকে আকাশে বড় চাঁদ, তার আলোতে সবকিছু কেমন যেন অবাস্তব মনে হতে থাকে। নিচে তাকিয়ে আমার হঠাৎ ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। যদি টুকুনজিল হঠাৎ ছেড়ে দেয় আমাকে? ভয়ে ভয়ে ডাকলাম আবার, টুকুনজিল।

বল।

তুমি এত ছোট একটা প্রাণী, আমাকে উপরে ধরে রেখেছ, কষ্ট হচ্ছে না তো?

আমি ধরে রাখি নি। আমার মহাকাশযান ধরে রেখেছে।

তোমার মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে তো?

আছে।

হঠাৎ করে ছেড়ে দিলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে। নিচে পড়লে আমি কিন্তু একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে যাব। আমাকে ছেড়ে দিও না।

আমি তোমাকে বেশি সময়ের জন্যে কখনো ছাড়ি নি।

আমি চমকে উঠে বললাম, বেশি সময়ের জন্যে ছাড় নি মানে? কম সময়ের জন্যে ছেড়েছ কখনো?

হ্যাঁ। মাঝে মাঝে নিচে গিয়ে দেখে আসছি কি হচ্ছে।

আমি চিৎকার করে বললাম, সর্বনাশ! মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?

টুকুনজিল কোনো কথা বলল না। আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম, টুকুনজিল।

তবু কোনো সাড়া নেই! আমি নিচে পড়ে যাচ্ছি মার্বেলের মতো। গলা ছেড়ে ডাকলাম আমি, টু–কু–ন–জি–ল।

কি হল?

কোনোমতে নিঃশ্বাস নিয়ে বললাম, কোথায় ছিলে তুমি?

নিচে গিয়েছিলাম দেখতে। ভারি মজা হচ্ছে নিচে। হা হা হা।

আমি ঢোক গিলে বললাম, আমাকে এভাবে ফেলে রেখে তুমি চলে যেও না আর, খবরদার! ফিরে আসতে একটু দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

দেরি হবে না।

তবু তুমি যেয়ো না।

অনেক মজা হচ্ছে নিচে। হা হা হা। কেউ বুঝতে পারছে না কি হয়েছে।

হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমিও তো বুঝতে পারছি না কি হয়েছে।

খুব সোজা। প্রথমে তোমার সাথে লাগানো সব ইলেকট্রিক তারগুলো কেটে দিলাম। তারপর তোমাকে তুলে নিয়ে এলাম ঘরের মাঝখানে, সেখান থেকে দেয়ালে আঘাত করলাম আমার ব্লাস্টার দিয়ে, তারপর ফুটো দিয়ে তোমাকে বের করে আনলাম। বেশি তাড়াতাড়ি বের করেছিলাম বলে তুমি সহ্য করতে পার নি, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলে—

কী আশ্চর্য।

আশ্চর্য কেন হবে? আমার ইঞ্জিনগুলো ফিউসান দিয়ে কাজ করে, অনেক শক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইঞ্জিনে।

কথা বলতে বলতে আমরা ধীরে ধীরে নিচে নামছি। আস্তে আস্তে টুকুনজিলের উপর আমার বিশ্বাস ফিরে এসেছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার কোনো ভয় নেই, আমাকে সে কখনোই ভুল করে ফেলে দেবে না। সত্যি কথা বলতে কি, আকাশে উড়ে বেড়াতে আমার বেশ মজা লাগতে শুরু করেছে। বললাম, টুকুনজিল।

বল।

আরো খানিকক্ষণ উড়ে বেড়ালে কেমন হয়?

না।

কেন?

তোমার ঘুম প্রয়োজন। অবশ্যি অবশ্যি প্রয়োজন। শরীরের সব ক্ষতিকর প্রভাব দূর হবে তা' হলে।

একটু দেরি হলে কোনো ক্ষতি নেই।

আছে। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

টুকুনজিলের কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে ঘুমে। কোনোমতে বললাম, কোথায় নিয়ে রাখবে আমাকে?

তোমার বাসায়?

না না না।

তোমার স্কুলে?

স্কুলে? হ্যাঁ, স্কুলের রাখতে পার।

ঠিক আছে, এখন তুমি ঘুমাও। তোমার আর কোনো ভয় নেই।

আমার মনে হল সত্যি আমার আর কোনো ভয় নেই।

AMARBOI.COM

১৩. ব্ল্যাক মার্ডার

আমার খুব আরামের একটা ঘুম হল। এরকম আরামের ঘুম আমার অনেক দিন হয় নি। সেই যখন ছোট ছিলাম, তখন একপাশে মা আর অন্যপাশে বাবার সাথে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাতাম, তখন মনে হয় আমার এরকম আরামের ঘুম হত। কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা নেই, শুধু আরাম আর শান্তি আর সুখ। এত আরামে যে ঘুমিয়েছি আজ, কে জানে এর মাঝে হয়তো টুকুনজিলের হাত ছিল, মাথার মাঝে নিখুঁত সুষম কোনো কম্পন তৈরি করে দিয়েছে।

আমার ঘুম ভাঙল মানুষজনের কথার স্বরে। এক জন বলল, নিশ্চয়ই মরে গেছে।

আমাকে দেখেই নিশ্চয়ই বলছে। আমি চোখ খুলে ওঠার চেষ্টা করলাম। তখনো আমার হাত-পা-শরীর বাঁধা, উঠতে পারলাম না।

আরেকজন বলল, মরে নি, মরে নি। এখনো নড়ছে! কিন্তু মরে যাবে।

অনেক বেলা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। চারদিকে বেশ আলো, গাছপালার নিচে আমি শুয়ে আছি। আমি চোখ পিটপিট করে তাকালাম। পাশে স্কুল বিল্ডিং, তার জানালা থেকে কথা বলছে সবাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক জন চেঁচিয়ে বলল, আরে! এটা তো বিলু!

আমি গলার স্বরটা চিনতে পারলাম, তারিক কথা বলছে।

বিলু! বিলু! বিলু! বলে সবাই চেঁচামেচি করে দুপদাপ করে ছুটে আসতে থাকে। আমি টুকুনজিলকে ডাকলাম, টুকুনজিল।

বল।

আমার বন্ধুদের কি আমি তোমার কথা বলতে পারি?

তোমার ইচ্ছে। কিন্তু—

টুকুনজিলের কথা শেষ হবার আগেই দুপদাপ করে দৌড়ে সবাই হাজির হল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এখানে কে বিলুকে বেঁধে ফেলে রেখে গেছে? কী সর্বনাশ! বিলু, তুই কেমন আছিস?

আমি বললাম, ভালো আছি আমি। কোনো চিন্তা নেই। আগে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দে।

সবাই টানাটানি করে আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে থাকে। সুব্রত বলল, সাবধান। এই জায়গাটা কিন্তু খুব খারাপ। অনেক সাপ আছে এখানে। তোর কপাল ভালো তোকে সাপে কামড়ায় নি।

শুনতে পেলাম টুকুনজিল বলল, দুইটা পুরুষ কেউটে, একটা মেয়ে কেউটে, চারটা দাঁড়াস। আমি না করে দিয়েছি—কেউ কাছে আসে নি। পশুপাখির বুদ্ধিবৃত্তি খুব সহজ, নিচু স্তরের। ওদেরকে কিছু বলা খুব সোজা।

টুকুনজিল সোজাসুজি আমার মাথার ভেতরে কথা বলছে, অন্যেরা তাই কিছু শুনতে পেল না, তাদের কাছে মনে হল একটা ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। পল্টু বলল, তোকে এখানে কে ফেলেছে? দিনের বেলাতেই ঝিঁঝি পোকা ডাকে। আর কত মশা দেখেছিস?

শুনলাম টুকুনজিল বলল, নয় হাজার সাত শ' চল্লিশটা মশা ছিল কাল রাতে। কেউ তোমার কাছে আসে নি। চার হাজার পাঁচ শ' তিরাশিটা পিঁপড়া। এক হাজার এগারোটা মাকড়শা, সাত শ' তেরোটা চিনে জোঁক, নয় শ' উনিশটা গুবরে পোকা—

খুলে দেয়ার পর আমি জায়গাটা চিনতে পারলাম। স্কুলের পিছনে গাছপালা ঢাকা জঙ্গলের মতো জায়গাটা। সাপখোপের ভয়ে কেউ কখনো এখানে আসে না, টুকুনজিল যে কী ভাবে এখানে আমাকে রেখেছে কে জানে!

তারিক বলল, তোকে কে এখানে এনে ফেলে রেখে গেছে?

আমি বললাম, সব বলব তোদের, চল্। তোরা আজকে এখানে কী করছিস?

ব্ল্যাক মার্ডারের মিটিং না?

ও, আচ্ছা! আমার উপর দিয়ে কত রকম ঝড় বয়ে গেছে যে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আজকে স্কুলে ব্ল্যাক মার্ডারের গোপন মিটিং; আমার রক্ত-শপথ করে ব্ল্যাক মার্ডারের মেম্বার হওয়ার কথা। আমরা তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে আসছিলাম, নান্টু দাঁড়িয়ে বলল, চেয়ারটা দেখেছিস? ইস! কী দারুণ চেয়ার!

হ্যাঁ। একেবারে রকেটের চেয়ার।

আয় চেয়ারটা নিয়ে যাই।

আমি বললাম, এখন চল্। পরে নিলেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ যদি নিয়ে যায়?

কে নেবে এখান থেকে? তোর মাথা খারাপ হয়েছে?

নান্টু তবু খুঁতখুঁত করতে থাকে।

আমরা জঙ্গলের মতো জায়গাটা থেকে বের হয়ে আসি। সবাই এখনো একটা ঘোরের মতো অবস্থায় আছে, একটু পরপর অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। মাহবুব বলল, খালিপায়ে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না তো, বিলু?

আমি হেসে বললাম, আমি সারাজীবন খালিপায়ে হেঁটেছি, আমার কোনো অসুবিধে হয় না।

সুব্রত জিজ্ঞেস করল, তোর কি খিদে পেয়েছে?

আমার হঠাৎ খিদে চাগিয়ে উঠল। সত্যি খিদে পেয়েছে ভীষণ। বললাম, হ্যাঁ, খুব খিদে পেয়েছে।

তারিক বলল, তুই চিন্তা করিস না, আমরা খাবার নিয়ে আসব তোর জন্যে।

সুব্রত বলল, হ্যাঁ, তুই কোনো চিন্তা করিস না। তোকে আমরা এখন থেকে রক্ষা করব। আর কেউ তোকে কিছু করতে পারবে না।

আমার শুনে বড় ভালো লাগল।

ব্ল্যাক মার্ডারের গোপন মিটিং আধা ঘন্টার জন্যে পিছিয়ে দেয়া হল। পল্টু গেল আমার জন্যে কিছু খাবার কিনে আনতে। সে সম্ভবত ব্ল্যাক মার্ডারের ক্যাশিয়ার। মাহবুব গেল তার বাসা থেকে আমার জন্যে এক জোড়া জুতো আনতে। আমি কিছুতেই তাকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না যে আমি খালিপায়ে যতক্ষণ খুশি হাঁটাহাঁটি করতে পারি, আমার কোনো অসুবিধে হয় না। সুব্রত আর তারিক গেল অন্য মেম্বারদের ডেকে আনতে।

আমি একা স্কুলের বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে থাকলাম। গত চব্বিশ ঘন্টায় এত কিছু ঘটেছে যে মনে হচ্ছে অনেক দিন হয়ে গেছে। এই স্কুলে সবসময় এত ছাত্র গমগম করতে থাকে যে এখন কেউ কোথাও নেই দেখে কেমন জানি লাগে। আমি টুকুনজিলকে ডাকলাম কয়েকবার, সাড়া পেলাম না। কোথায় গেছে কে জানে। হয়তো আবার চট করে মঙ্গল গ্রহ থেকে ঘুরে আসতে গেছে! কী বিচিত্র একটা ব্যাপার! কে জানে কখনো আমাকে নিয়ে যেতে পারবে কি না?

নানান কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি স্কুলের গেট খুলে লিটন এসে ঢুকল, তার সাথে আরো তিনজন ছেলে। এই তিনজনের একজনকেও আমি চিনি না, লিটনের বন্ধু। আমাকে দেখেই লিটনের মুখে কেমন–একটা হাসি ফুটে উঠল, খারাপ রকমের হাসি, এরকম হাসিকে আমি খুব ভয় পাই। কাছে এগিয়ে এসে তার বন্ধুদের বলল, বলেছিলাম না আজকে পেয়ে যাব?

আমি জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে রাখলাম। বললাম, আমাকে খুঁজছ তুমি?

লিটন আমার কথার উত্তর দিল না, বন্ধুদের বলল, একটা দল আছে ওদের, নাম দিয়েছে ব্ল্যাক মার্ডার! হাঃ—ব্ল্যাক মার্ডার। হেসে মরে যাই! আজকে নাকি মিটিং!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিটন এবার আমার দিকে ঘুরে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, তোর আর স্যাগরেদরা কই?

ক্লাসের অনেকের সাথে আজকাল আমি তুই তুই করে বলি। ভালো বন্ধু, তাই। লিটনের সাথে বলতে গেলে আমার কথাই হয় না, তার সাথে তুই তুই করে কথা বলার কোনো প্রশ্নই আসে না। আমাকে তুই তুই করে বলছে বদমাইশি করে। আমি বেশি গা করলাম না, বললাম, এখানে কেউ কারো সাগরেদ না।

লিটন মুখ বাঁকা করে বলল, ভালোই হল, তোকে একা পেলাম।

কেন?

তোকে একটা জিনিস বলতে এসেছি।

কি জিনিস?

তুই যে–জঙ্গল থেকে এসেছিস সেই জঙ্গলে ফিরে যা।

কি বলতে চাইছে বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না, কিন্তু আমি তবু না বোঝার ভান করে বললাম, মানে?

বলছি, তুই তোর নীলাঞ্জনা স্কুলে ফিরে যা।

কেন?

বলেছি ফিরে যেতে, ফিরে যা, বাজে তর্ক করিস না।

আস্তে আস্তে আমার মেজাজ আবার খারাপ হয়ে গেল, বলব না বলব না করেও বলে ফেললাম, আমি থাকলে ফার্স্ট হতে পারবি না?

মুহূর্তে লিটনের মুখ লাল হয়ে যায়। কিছু বোঝার আগে ধাক্কা মেরে আমাকে ফেলে দিল নিচে। আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম, প্রথম দিন স্কুলে আমাকে অসম্ভব মেরেছিল লিটন। আজকেও মারবে?

লিটনের তিনজন বন্ধু এবারে হাত গুটিয়ে এগিয়ে এল। লিটন একগাল হেসে বলল, এরা আমার কারাটে স্কুলের বন্ধু। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ব্ল্যাক বেল্ট—ব্ল্যাক বেল্ট আর রেড বেল্ট।

মারামারি করবি?

তুই করবি?

তোরা চারজন আর আমি একা?

কেন, ভয় করে? কাপড়ে পেচ্ছাব হয়ে যাবে?

আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, বললাম, লিটন, চারজন মিলে এক জনকে মারতে এসেছিস, লজ্জা করে না? বাপের ব্যাটা হলে একা আয়।

একা তো তোকে কিমা বানিয়েছিলাম। আজকে কিমা না, একেবারে কাবাব বানিয়ে ছেড়ে দেব। জন্মের মতো সিধে হয়ে যাবি। এই বলে রাখলাম। স্কুল ছেড়ে যদি না যাস তোর জান শেষ।

আগেরবার লক্ষ করেছি, মারপিট করার সময় লিটন হাত ব্যবহার না করে পা ব্যবহার করে, কে জানে কারাটের সেটাই হয়তো নিয়ম। পা দিয়ে দূর থেকে মারা যায়, জোরে মারা যায়—নানারকম সুবিধে। আমি সতর্ক থাকলাম, হঠাৎ করে মারতে দেব না।

লিটনের তিন বন্ধুর এক জন প্রথমে পা চালাল, ঘুরে লাফিয়ে উঠে উল্টো দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সতর্ক ছিলাম, সময়মতো লাফিয়ে সরে গেলাম বলে মারতে পারল না, উল্টো আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখে একটা ঘুসি মেরে দিলাম, গায়ের জোরে।

তারপর যেটা হল সেটা বিস্ময়কর। ছেলেটা ঘুসি খেয়ে ডিগবাজি খেয়ে উল্টে গেল, তারপর শূন্যে উড়ে গেল পাখির পালকের মতো। স্কুলের শিউলি গাছটার উপর দিয়ে উড়ে গেল ছেলেটা, দেয়াল পার হয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল আছাড় খেয়ে! এত উপর থেকে যত জোরে পড়ার কথা তত জোরে পড়ল না, পড়ল অনেক আস্তে, না হলে আর বেঁচে থাকতে হত না বাছাধনের।

টুকুনজিল এসে গেছে আমার পাশে! আমার আর ভয় কি?

লিটন এবং তার বাকি দু'জন বন্ধুর চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেছে। ফ্যাকাসে মুখে মাছের মতো ঢোক গিলল কয়েকবার, একবার আমার দিকে তাকাল, তারপর শিউলি গাছটার দিকে তাকাল, তারপর তাকাল দেয়ালের ওপাশে যেখানে তখনো তাদের বন্ধু উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আমি একগাল হেসে বললাম, এবারে কে আসবি?

আর কেউ কাছে আসার সাহস পাচ্ছে না। কাজেই আমি এগিয়ে গেলাম, লাফিয়ে উঠে নেচে কুদে মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে ভয়ঙ্কর একটা ভঙ্গি করে লিটনের পেটে একটা ঘুসি হাঁকালাম, সাথে সাথে লিটন উড়ে গেল বাতাসে! হাত–পা ছুড়তে ছুড়তে লিটন উড়ে যাচ্ছে, দৃশ্যটি বড় মজার, যে না দেখেছে তাকে বোঝানো যাবে না! টুকুনজিল তাকে নিয়ে ফেলল আরো দূরে মাঠের মাঝখানে! যত উপর দিয়ে গিয়েছে সত্যি সত্যি সেখান থেকে পড়লে শরীরের একটা হাড়ও আস্ত থাকত না, কিন্তু টুকুনজিল মোটামুটি যত্ন করেই তাকে আছাড় দিয়ে ফেলল।

অন্য দু'জন অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একটা ছোট লাফ দিয়ে হাত–পা ছুড়ে বিকট একটা চিৎকার দিয়ে সামনে লাফিয়ে পড়তেই দু'জন একেবারে চৌচা দৌড়। কোনো মানুষকে আমি আমার জীবনে এত জোরে দৌড়াতে দেখি নি।

লিটন স্কুলের মাঠ থেকে ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উল্টোদিকে প্রাণপণে ছুটতে থাকে।আমি খানিকক্ষণ তার পিছু পিছু ধাওয়া করি, স্কুলের দেয়ালের কাছে পৌঁছে একবার পিছন ফিরে তাকাল, তারপর প্রাণের ভয়ে খামচে খামচে এই ছয়ফুট দেয়ালটা টিকটিকির মতো উঠে গেল। অন্য পাশে কাঁচা নর্দমা, কিন্তু লিটনের তখন এত কিছু ভাবার সময় নেই। সে চিৎকার করে লাফিয়ে পড়ল সেখানে। ঝপাং করে একটা শব্দ হল, পড়ে ডুবে গেল কি না দেখতে পারলাম না।

স্কুলের বারান্দায় বসে হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে যায়। শুনলাম টুকুনজিলও হাসছে,হা হা হা, হি হি হি।

আমি বললাম, এখন তুমি ঠিক জায়গায় হাসছ টুকুনজিল। এটা আসলেই অনেক হাসির ব্যাপার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪. শাস্তি

ব্ল্যাক মার্ডারের সবাই এসে গেছে, কামাল শুধু আসতে পারে নি, কার জন্মদিনে নাকি বেড়াতে গিয়েছে। আমার জন্যে পরোটা আর সবজি কিনে এনেছে পল্টু। খুব তৃপ্তি করে খেলাম আমি, মনে হচ্ছিল বছরখানেক থেকে না খেয়ে আছি। ক্লাসঘরে মিটিং বসেছে। ব্ল্যাক মার্ডারের মিটিং আমি আগে কখনো দেখি নি, তার কায়দাকানুনও জানি না, তাই চুপচাপ বসে আছি। তারিক মনে হয় ব্ল্যাক মার্ডারের দলপতি, উঠে দাঁড়িয়ে মিটিঙের কাজ শুরু করল। গলা কাঁপিয়ে খুব কায়দা করে বলল, কমরেডস। ব্ল্যাক মার্ডারের বীর সদস্যরা, সংগ্রামী অভিনন্দন।

যারা বসে ছিল, তারা হাত তুলে বলল, অভিনন্দন।

আজকে আমরা এসেছি অত্যন্ত জরুরি একটা মিশন নিয়ে। অত্যন্ত, অত্যন্ত জরুরী মিশন। বিলু—যে আজকে আমাদের নূতন সদস্য হবে, তার জীবন আজ বিপন্ন। দুর্বৃত্তদের হাতে তার প্রাণ আজ কুক্ষিগত। কে তাকে রক্ষা করবে?

সবাই একসাথে চিৎকার করে উঠল, ব্ল্যাক মার্ডার।

কে দুর্বৃত্তদের বিষদাঁত ভেঙে দেবে?

সবাই উত্তর দিল, ব্ল্যাক মার্ডার।

আমরা সভার কাজ এক্ষুণি শুরু করছি। কারো কিছু বলার আছে?

সুব্রত দাঁড়িয়ে বলল, আমি বিলু ওরফে নাজমুল করিমকে আমাদের নূতন সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তাব করছি।

মাহবুব দাঁড়িয়ে বলল, আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি।

তারিক গম্ভীর গলায় বলল, কেউ কি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য রাখতে চায়?

দেখা গেল কারো কোনো আপত্তি নেই। তারিক বলল, বিলু, রক্ত–শপথ নিতে তোমার কি কোনো আপত্তি আছে?

আমি কথা বলার জন্যে মাত্র মুখ খুলেছি, ঠিক তখন কে যেন লাথি মেরে ক্লাসরুমের দরজা খুলে ফেলল। সবাই আমরা লাফিয়ে উঠলাম, অবাক হয়ে দেখলাম, দরজায় লাল মুখের কয়েকটা বিদেশি দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের হাতে মেশিনগানের মতো একধরনের অস্ত্র, সোজা আমাদের দিকে তাক করে আছে। লাল মুখের বিদেশিটা হলুদ দাঁত বের করে বলল, কুনু গুলমাল নায়। গুলমাল হইলে গুল্লি হইবে।

যার অর্থ কাউকে বুঝিয়ে দিতে হল না, কোনো গোলমাল না, একটু গোলমাল করলেই গুলি করে দেবে।

কেউ কোনো গোলমাল করল না। তারিকের মুখ হাঁ হয়ে গেছে। পল্টুর দিকে তাকানো যায় না, মনে হয় এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। সুব্রত একবার মুখ খুলছে, আরেকবার মুখ বন্ধ করছে মাছের মতো।

লাল মুখের বিদেশিটা আমাদের মুখের দিকে এক জন এক জন করে তাকাল। নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছে। আমাকে দেখেও কিন্তু চিনতে পারল না। আমার কাছে যেরকম সব বিদেশিকে দেখতে একরকম মনে হয়, সেরকম তাদেরও নিশ্চয়ই এই বয়সী সব ছেলেদের দেখতে একরকম মনে হয়। বিদেশিগুলো খানিকক্ষণ নিজেদের

মাঝে কথা বলল, তারপর আবার আমাদের দিকে তাকাল, হুঙ্কার দিয়ে বলল, বিললু কোথায়?

তারিক সবার আগে ব্যাপারটা একটু আঁচ করতে পারে, তারপর খুব একটা সাহসের কাজ করে ফেলল। হাত তুলে বলল, বিলু গন হোম। বাড়ি চলে গেছে।

হোয়াট?

এবারে সবাই মাথা নাড়ল, ইয়েস ইয়েস। গন হোম।

ঠিক এ সময় লালমুখো বিদেশি দু'জনকে ঠেলে বব কার্লোস এসে ঢুকল। তার পিছনে আরো মানুষ আছে, আমি ভালো কাপড়-পরা কালকের সেই দেশি মানুষটাকেও দেখলাম। বব কার্লোস আমাদের দিকে একনজর দেখেই আমাকে বের করে ফেলল। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ইংরেজিতে বলল, ঐ তো বিললু।

আমার নামটা পর্যন্ত ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারে না। বব কার্লোসের কথা শুনে মেশিনগান হাতের বিদেশিটা হঠাৎ ভয়ঙ্কর রেগে উঠল। এক পা এগিয়ে এসে তারিকের চুলের মুঠি ধরে প্রায় ঝটকা মেরে উপরে তুলে ফেলে, হুঙ্কার দিয়ে বলে, ইউ লায়ার। ইউ লিটল স্কাউন্ড্রল।

তারিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। লালমুখো বিদেশিটা হাত তুলে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল তারিকের মুখে। তারিক একেবারে ছিটকে গিয়ে পড়ল নিচে, আমি দেখলাম ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু উঠতে পারল না।

বিদেশিটা ভয়ঙ্কর মুখ করে এগিয়ে যায় মেশিনগানটা হাতে নিয়ে। গুলি করে দেবে কি? না, গুলি করল না, পা তুলে জোরে লাথি মারল তারিককে—তারিক ছিটকে গিয়ে পড়ল অন্য পাশে।

আমার হঠাৎ মনে হল মাথার মাঝে যেন একটা বোমা ফেটে গেল হঠাৎ। প্রচণ্ড রাগে আমি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলাম, মনে হল শুওরের বাচ্চার মাথাটা ছিঁড়ে নিই এক টান দিয়ে। চিৎকার করে বললাম, থাম্ শুওরের বাচ্চা—

পশুর মতো মানুষটা আমার দিকে তাকাল, বলল, হোয়াট?

শুওরের বাচ্চার ইংরেজি কী হবে? চিন্তা করে পেলাম না, বললাম, ইউ পিগ—

লোকটা মনে হল খুব অবাক হয়ে গেল শুনে। লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল আমার দিকে। আমি ফিসফিস করে বললাম, টুকুনজিল—

টুকুনজিল বলল, আমি আছি। কোনো ভয় নেই তোমার।

জানে মেরো না কিন্তু।

মারব না? জানে মারলে মনে হয় ভালো হবে।

হোক। জানে মারবে না।

ঠিক আছে। তুমি যেটা বল।

মেশিনগান হাতে বিদেশিটা আমার কাছে এসে আমার চুলের ঝুঁটি ধরার চেষ্টা করছিল, বব কার্লোস প্রচণ্ড ধমক দিল, বিললুকে ধরবে না—

লোকটা থেমে গেল। কিন্তু আমার তো থামলে হবে না। চিৎকার করে বললাম, কত বড় সাহস, তুই আমার বন্ধুর গায়ে হাত দিস। কত বড় সাহস। তোর গায়ের চামড়া যদি আমি খুলে না নিই—

আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম লোকটার উপর, সাথে সাথে পল্টু, মাহবুব, সুব্রত, নান্টু—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল একসাথে। লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, দমাদম কিল–ঘুসি–লাথি পড়তে থাকে, পাথরের মতো শরীর লোকটার, কিছু হয় না, কেমন যেন অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। টুকুনজিল এখনো হাত দেয় নি, যখন দেবে তখন আর বাছাধনকে দেখতে হবে না।

গা–ঝাড়া দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল লোকটা। হাতের মেশিনগানটা তুলে নিয়ে ট্রিগারটা টেনে দেয় হঠাৎ। ক্যাটক্যাট করে ভয়ঙ্কর শব্দ করে গুলি বের হয়ে আসে, ঝনঝন করে জানালার কাচ ভেঙে পড়ে, ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে যায় এক মুহূর্তে। কাউকে কি মেরে ফেলেছে?

তাকালাম চারদিকে, না, কারো কিছু হয় নি, ভয় পেয়ে সবাই পিছনে সরে গেছে সময়মতো। পিশাচের মতো লোকটা হলুদ দাঁত বের করে ভয়ঙ্কর একটা মুখ করে তাকাল সবার দিকে।

কার্লোস বলল, কুইক। কুইক। তাড়াতাড়ি।

মেশিনগান হাতে লোক দু'টি আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি একটু অপেক্ষা করি, আরেকটু কাছে আসতেই লাফিয়ে ঘুরে একটা লাথি মেরে দিলাম বদমাইশটাকে।

টুকুনজিল হাত লাগাল আমার সাথে। লাথি খেয়ে লোকটা ছিটকে উপরে উঠে গেল গুলির মতো। ছাদে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে লোকটা ঘুরতে ঘুরতে সিলিং ফ্যানের মাঝে বেঁধে গেল। সেখান থেকে কী ভাবে জানি আবার ছিটকে উপরে উঠে যায়, ছাদে আবার ভয়ঙ্করভাবে ঠুকে গিয়ে পাঁইপাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়তে থাকে। ক্লাসের পিছনে বেঞ্চটাতে আছাড় খেয়ে পড়ে বদমাইশটা। টুকুনজিল কোনো মায়া দেখায় নি, এত জোরে নিচে আছড়ে পড়ল যে বেঞ্চটা ভেঙে গেল মাঝখানে। লোকটার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হয়ে আসে, আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না এখনো।

আমি এবার মেশিনগান হাতে দুই নম্বর লোকটার দিকে তাকালাম। সে হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, আমি যখন হ্যাঁচকা টান দিয়ে তার কাছ থেকে মেশিনগানটা কেড়ে নিলাম, সে বাধা দেয়ার সাহসও পেল না। মানুষ যেভাবে পাটখড়ি ভেঙে ফেলে, হাঁটুতে চাপ দিয়ে আমি মেশিনগানটা ভাঙার চেষ্টা করলাম। টুকুনজিল নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি আমি কী করতে চাইছি, প্রথমবার তাই ভাঙতে পারলাম না। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতেই সেটা মট করে ভেঙে দু' টুকরা হয়ে গেল পাটখড়ির মতো। ঘরে টুঁ শব্দ নেই, সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি লোকটার কলার চেপে ধরার চেষ্টা করলাম, অনেক লম্বা, ভালো করে ধরা গেল না। কিছু আসে–যায় না তাতে, আমি হাত ঘুরিয়ে একটা ঘুসি চালালাম। লোকটা পাঁইপাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে উপরে উঠে গেল, ছাদে ঠোকা খেয়ে ধড়াম করে নিচে পড়ল কাটা কলাগাছের মতো। এই লোকটা বেশি কিছু করে নি বলে তার শাস্তিও হল কম।

এবারে আমরা সবাই ছুটে গেলাম তারিকের কাছে। তাকে টেনে সোজা করলাম সাবধানে, মেরেই ফেলেছে নাকি কে জানে! তারিক চোখ পিটপিট করে তাকাল, কপালের কাছে কেটে গেছে খানিকটা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারিক—কেমন আছিস

তুই? কেমন আছিস?

তারিক জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করল। শুনলাম টুকুনজিল বলছে, ভালোই আছে এখন।

সত্যি?

হ্যাঁ, একটা ধমনী ছিঁড়ে গিয়েছিল ভেতরে, ঠিক করে দিয়েছি।

তুমি ঠিক করে দিয়েছ? তুমি?

হ্যাঁ। চামড়া ফুটো করে শরীরের ভেতর ঢুকে গেলাম—

শরীরের ভেতর ঢুকে গেলে?

তারিক ফিসফিস করে বলল, কার সাথে কথা বলছিস তুই?

আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, বলব তোদের। আগে এদের টাইট করে নিই।

আমি এবারে বব কার্লোসের মুখের দিকে তাকালাম। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, এবারে তুমি।

বব কার্লোসের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল সাথে সাথে, মাথা নেড়ে বলল, নো, নো, প্লিজ।

আমি দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম, তুমি হচ্ছ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী, সাইন্টিস্ট। তুমি এক শ' এগারো বিলিওন ডলার খরচ করে এসেছ এখানে, তোমার কাছে মানুষের জানের কোনো দাম নেই—

আমার বাংলা কথা বুঝতে পারছে না সে, মাথা ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে সে এদিকে-সেদিকে। আমি হুঙ্কার দিয়ে বললাম, এমন শাস্তি দেব আমি, যে, তুমি জন্মের মতো সিধে হয়ে যাবে।

পল্টু অনুবাদ করার চেষ্টা করল, স্ট্রেট ফর দা হোল লাইফ।

আমি কার্লোসের দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করতেই সে মাটি থেকে উপরে উঠতে থাকে, ফুট খানেক উপরে উঠে সে স্থির হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কি, তাকে দেখাতে থাকে বোকার মতো। কোনো মানুষ যদি শূন্যে ঝুলতে থাকে তার পক্ষে কোনোরকম গাম্ভীর্য দেখানো খুব শক্ত।

ক্লাসঘরের সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে কার্লোসের দিকে। নিজের চোখকে কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না, কিন্তু চোখের সামনে দেখে অবিশ্বাস করবে কেমন করে? আমি সবার দিকে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, কি শাস্তি দেয়া যায় বল তো?

তারিক বলল, সারা জীবনের জন্যে ঝুলিয়ে রেখে দে।

পল্টু মাথা নাড়ল, না, না, ক্লাসের ভেতরে না। বাইরে, বাইরে—

সুব্রত বলল, চেহারাটা বাঁদরের মতো করে দে।

নাকটা ঘুরিয়ে দে, নাকের গর্তগুলো উপরে। প্রত্যেক বার নাকঝাড়ার সময় রুমাল দিয়ে চোখ বন্ধ করে রাখতে হবে—

খারাপ না আইডিয়াটা। হাত আর পাগুলো পাল্টে দে। যেখানে হাত সেখানে পা, যেখানে পা সেখানে হাত—

AMARBOI.COM

বাইরে হঠাৎ অনেক লোকজনের গোলমাল শোনা গেল। গুলির শব্দ শুনে সবাই ছুটে আসছে। আমাদের পালাতে হবে এক্ষুণি, নাহয় ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। আমি বব কার্লোসের দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি বড় বিজ্ঞানী, কিন্তু তুমি বড় খারাপ মানুষ।

বব কার্লোস অসহায় মুখ করে আমার দিকে তাকাল। আমি ভালো কাপড়-পরা দেশি মানুষটিকে বললাম, কি বলছি বুঝিয়ে দিন।

লোকটা ছুটে কাছে এসে হড়বড় করে বব কার্লোসকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতে থাকে। আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, বিজ্ঞানী যদি খারাপ হয় সেটা খুব ভয়ঙ্কর, বিজ্ঞানীদের হতে হয় ভালো। কিন্তু তুমি ভালো না, তুমি খারাপ, অনেক খারাপ। তাই তোমার কাছ থেকে সব বিজ্ঞান সরিয়ে নেব আমি। আজ থেকে তুমি আর বিজ্ঞানের একটি কথাও জানবে না—একটি কথাও না—তুমি হবে সাধারণ এক জন মানুষ।

বব কার্লোস ফ্যাকাসে মুখে হাতজোড় করে বলল, নো-নো-নো—

আমি ফিসফিস করে বললাম, টুকুনজিল—

বল।

ব্যাটাকে ঝুলিয়ে রাখতে কোনো কষ্ট হচ্ছে তোমার?

না। কোনো কষ্ট না।

বব কার্লোসের মাথাটা খালি করে দিতে পারবে? না পারলে থাক।

আগে কখনো করি নি। কপাল দিয়ে ঢুকে যাব, মস্তিষ্কের যে নিউরোনগুলোতে তথ্য আছে, সেগুলো খালি করে দিতে হবে। মনে হয় পারব।

দেখ চেষ্টা করে। আর যেন ব্যাটা পৃথিবীর কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

পারবে না।

অনেক মানুষের হৈচৈ শোনা গেল। আমি বললাম, ব্ল্যাক মার্ডার, পালা এখন।

পালাব কেন? নান্টু গরম হয়ে বলল, পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেব না?

ধরাতে পারবি না। পুলিশের বাবা ওরা কিনে রেখেছে। সময় থাকতে পালা। না হলে উল্টো ঝামেলায় পড়ে যাবি। আমার কথা শোন।

তাই বলে এত বড় বদমাইশ—

আর বদমাইশি করতে পারবে না। জীবনেও করতে পারবে না।

আমি তারিককে তুলে বললাম, হাঁটতে পারবি, তারিক?

পারব, যত ব্যথা পেয়েছিলাম এখন আর সেরকম ব্যথা লাগছে না।

অনেক লোকজন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল, অনেকে লাঠি হাতে এসেছে, কাকে ধরে দু'এক ঘা লাগাবে বুঝতে পারছে না। অনেক ভিড় হৈচৈ, তার মাঝে আমরা বের হয়ে গেলাম, কেউ লক্ষ করল না। কেমন করে লক্ষ করবে? ঘরের মাঝখানে একটা মানুষ শূন্যে ঝুলে আছে, তখন কেউ কি আর অন্যকিছু লক্ষ করতে পারে?

আমরা রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলাম, পল্টু বলল, বিলু, তুই কেমন করে এতসব করলি? একেবারে যেন ম্যাজিক—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলব, সব বলব। আগে তারিককে বাসায় পৌঁছে দে কেউ–এক জন। আর শোন্, আজ স্কুলে যা দেখেছিস ভুলেও কাউকে বলিস না। একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে কিন্তু। বব কার্লোসের দলবল ভীষণ ভয়ঙ্কর, আমাদের সবাইকে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেবে, তবু কেউ কিছু করতে পারবে না।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি। আজ সবাই বাসায় যা। আমি বলব।

আমি বাসায় ফিরে যেতে যেতে ডাকলাম, টুকুনজিল।

বল।

বব কার্লোসের কী অবস্থা হল?

এখনো ঝুলিয়ে রেখেছি।

সে কী? কেমন করে? তুমি তো আমার সাথে কথা বলছ!

হ্যাঁ, তোমার সাথে একটু কথা বলি আবার ওখানে যাই—খুব তাড়াতাড়ি করতে পারি আমি। মাইক্রোসেকেন্ডে দু'বার ঘুরে আসি।

তাই তো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কী হচ্ছে এখন?

অনেক মজা হচ্ছে এখন। হা হা হা।

কি মজা হচ্ছে?

পুলিশ এসেছে। সবাই মিলে পা ধরে টানছে নামানোর জন্য।

নামাতে পারছে না?

না! কেমন করে পারবে? একটু তোমার সাথে কথা বলি, আবার ওখানে গিয়ে ধরে রাখি।

কতক্ষণ ধরে রাখবে?

বেশিক্ষণ না। খবরের কাগজ থেকে লোক আসছে। তারা আসার আগেই ছেড়ে দেব—বেশি জানাজানি না হওয়াই ভালো, কি বল?

হ্যাঁ।

খানিকক্ষণ পর টুকুনজিল বলল, ভারি মজা হচ্ছে এখন।

কি মজা?

প্যান্ট ধরে টানতেই প্যান্টটা খুলে এসেছে। লাল রঙের একটা আন্ডারঅয়ার পরে ঝুলে আছে এখন। ভারি মজা হচ্ছে। হা হা হা।

লোকজন কি অবাক হচ্ছে?

ভারি অবাক হচ্ছে। ছেড়ে দেব এখন?

দাও।

বিদেশিগুলো এখন টানছে। ছেড়ে দিচ্ছি।

দাও।

হা হা হা।

কি হল?

সবাই মিলে হুড়মুড় করে পড়েছে নিচে। ভারি মজা হল আজকে।

AMARBOI.COM

এখন কী হচ্ছে?

বব কর্লোস এদিক–সেদিক তাকাচ্ছে। তাকে এক জন জিজ্ঞেস করছে দুই–এর সাথে দুই যোগ করলে কত হয়, ভেবে বের করতে পারছে না। আবার তাকে সব শিখতে হবে। একেবারে গোড়া থেকে।

উচিত শিক্ষা হল। কি বল?

১৫. ফেরা

ছোট খালা আমাকে দেখে সরু চোখে তাকিয়ে বললেন, কোথা থেকে আসা হয়েছে লাটসাহেবের?

আমি কিছু বললাম না। ছোট খালা চিৎকার করে উঠলেন এবারে, কাল সারা রাত কোথায় ছিলি?

আমি এবারেও কিছু বললাম না। কী বলব ছোট খালাকে? বব কার্লোসের দল ধরে নিয়ে গিয়েছিল? টুকুনজিল আমাকে বাঁচিয়ে এনেছে? ছোট খালাকে এটা বিশ্বাস করানো থেকে মনে হয় মাথাটা কেটে হাতে নিয়ে নেয়া সোজা। আমি তাই সে চেষ্টা করলাম না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

কি হল, কথা বলছিস না কেন?

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেক শিক্ষা হয়েছে আমার। ভেবেছিলাম বুবুর জন্যে একটা কাজ করব, তোকে মানুষ করে দেব। লাভের মাঝে লাভ হল কি? গ্রামের ছেলে শহরে এসে গুণ্ডা হয়ে গেলি। গুণ্ডা! একেবারে পরিষ্কার গুণ্ডা। সুযোগ পেলেই রাস্তায় গিয়ে মারপিট করে আসিস।

ছোট খালা একটু দম নিয়ে আবার শুরু করলেন, কাল সারা রাত কোথায় ছিলি? কোথায়? মদ–গাঞ্জাও কি খাওয়া শুরু করেছিস এই বয়সে? সারা রাত যে তোর ছোট খালু হাসপাতাল আর থানায় দৌড়াদৌড়ি করেছে, সেই খবর কি আছে? এখন ড্যাং–ড্যাং করে লাটসাহেব বাড়ি ফিরে এলেন। বাপের বাড়ির বান্দী পেয়েছিস আমাকে যে তোর জন্যে রান্না করে বসে থাকব সারা রাত।

হঠাৎ টুকুনজিলের কথা শুনতে পেলাম, দেব থামিয়ে?

কেমন করে?

মস্তিষ্কের যে অংশে কথা বলার কন্ট্রোল, সেটা একটু পাল্টে দিলেই হবে। দেব?

না, থাক। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট খালার বকুনি শুনতে থাকি।

ঘন্টাখানেক পর বল্টু আমাকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। বাড়ি থেকে এসেছে। চিঠিটা নিশ্চয়ই খুলে পড়ে আবার আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছে। আঠাটা এখনো শুকায় নি। আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। ভিতরে রাঙাবুবুর একটা চিঠি। রাঙাবুবু

AMARBOI.COM

লিখেছেঃ

বিলু

ভেবেছিলাম তোকে লিখব না। কিন্তু না লিখেই থাকি কেমন করে? বাবার খুব শরীর খারাপ, গত এক সপ্তাহ থেকে বিছানায়। তোকে দেখার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছেন। মাঝরাতে উঠে বসে থাকেন, বলেন, দরজা খোল, বিলু এসেছে।

তুই চলে আয়, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে বাবা আর বাঁচবেন না। বাড়িতে তুই ছাড়া পুরুষমানুষ নাই। মনে হয় এখন তোকে দায়িত্ব নিতে হবে।

বাবার পাগলামিটাও খুব বেড়েছে। বড় কষ্ট হয় দেখলে।

রাঙাবুবু।

আমি চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, সবকিছু অর্থহীন হয়ে গেল হঠাৎ। বাবা মারা যাবেন? তাহলে আমার আর থাকবে কে? বিছানায় মাথাগুঁজে আমি ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললাম।

টুকুনজিল আমাকে ডাকল, বিলু।

কি?

তোমার কী হয়েছে, বিলু? মন-খারাপ?

হ্যাঁ।

অনেক মন-খারাপ?

হ্যাঁ টুকুনজিল, আমার অনেক মন-খারাপ। আমার বাবার নাকি অনেক শরীর খারাপ। রাঙাবুবু লিখেছে, বাবা নাকি মরে যাবেন।

আমি আবার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করলাম। টুকুনজিল বলল, তুমি কেঁদো না বিলু, তুমি যখন অনেক মন-খারাপ করে কাঁদতে শুরু কর, তখন তোমার মস্তিষ্কের কম্পনে চতুর্থ মাত্রার একটা অপবর্তন শুরু হয়; সেটা ভালো না। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায় তখন।

আমি চোখ মুছে বললাম, ঠিক আছে, আমি আর কাঁদব না।

এখন তুমি কী করবে?

আমি বাড়ি যাব এক্ষুণি। ট্রেন ছাড়বে কখন কে জানে। ট্রেন না থাকলে বাসে যাব।

তোমাকে আমি তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাব?

পারবে নিতে? পারবে?

কেন পারব না!

কেমন করে নেবে?

আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাব।

সত্যি? কতক্ষণ লাগবে যেতে?

দেখতে-দেখতে পৌঁছে যাবে তুমি।

চল তাহলে যাই। চল। চল। এক্ষুণি চল।

যাওয়ার আগে ছোট খালাকে বলে যেতে হবে। রান্নাঘরে কী কাজ করছিলেন, গিয়ে বললাম, ছোট খালা, আমার বাবার খুব অসুখ। আমি বাড়ি যাব।

AMARBOI.COM

ছোট খালা অবাক হওয়ার ভান করলেন, বললেন, কি অসুখ?

জানি না।

ঠিক আছে, বাড়ি যেতে চাইলে যাবি। তোর খালু আসুক।

আমি এখনই বাড়ি যাব।

এখন কেমন করে যাবি? ট্রেনের সময় দেখতে হবে না? ছোট খালা আমাকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিলেন। ছোট খালার সাথে আর কথা বলার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমি আমার ঘরে এসে একটা কাগজে একটা ছোট চিঠি লিখলাম।

ছোট খালা ও খালু ঃ

রাঙাবুবু লিখেছে, বাবার খুব শরীর খারাপ। আমি তাই বাড়ি চলে গেলাম। আমার জন্যে আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না। আমি ঠিকভাবে বাড়ি পৌঁছে যাব।

ইতি বিলু।

একটু ভেবে নিচে লিখলাম,

পুনঃ আমি এখন থেকে বাড়ি থেকেই পড়াশোনা করব। আমার জন্যে আপনাদের অনেক ঝামেলা হল।

চিঠিটা ভাঁজ করে টেবিলের উপর রেখে আমি চুপি চুপি ছাদে চলে এলাম।

ভরা–দুপুর এখন। রাস্তায় রিকশা যাচ্ছে, মানুষজন হাঁটাহাঁটি করছে। পাশের ছাদে এক জন কাপড় নেড়ে দিচ্ছে। কার্নিশে দুটো শালিখ প্রচণ্ড ঝগড়া করছে কী–একটা নিয়ে। আমি তার মাঝে টুকুনজিলকে বললাম, টুকুনজিল।

বল।

চল যাই। কোথায় যেতে হবে তোমাকে বলে দিই।

আমি জানি।

জান! আমি অবাক হয়ে বললাম, কেমন করে জান?

তুমি যা জান আমি তাই জানি। আমি তোমার মস্তিষ্কের মাঝে দু'বেলা ঘুরে বেড়াই। হা হা হা।

তুমি আমার বাড়ি গিয়েছ?

হ্যাঁ।

বাবাকে দেখেছ?

হ্যাঁ।

কেমন আছে বাবা? কেমন আছে?

টুকুনজিল রহস্য করে বলল, চল, গেলেই দেখবে।

বল না, এখন বল।

উহু। তুমি প্রস্তুত?

হ্যাঁ।

চল আমরা আকাশে উড়ে যাই।

পরমুহূর্তে আমি বাতাসে ভেসে উপরে উঠে গেলাম। আমার সমস্ত শরীর যেন পাখির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালকের মতো হালকা। প্রথম কয়েক মুহূর্ত ভয়ের চোটে আমি প্রায় নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেলাম, মনে হতে থাকল এই বুঝি পড়ে গেলাম আকাশ থেকে, হাড়গোড় ভেঙে ছাতু হয়ে গেলাম জন্মের মতো।

কিন্তু আমি পড়ে গেলাম না, বাতাসে ভেসে আরো উপরে উঠে গেলাম। ভেবেছিলাম নিচে থেকে একটা রৈরৈ রব উঠবে, লোকজন চিৎকার করে কেলেঙ্কারি শুরু করে দেবে, কিন্তু কী আশ্চর্য, একটি মানুষও লক্ষ করল না। কেউ যেটা কখনো আশা করে না, সেটা দেখার চেষ্টাও করে না, তাই খোলা আকাশে আমি নির্বিঘ্নে পাখির মতো উড়ে গেলাম।

আমার মিনিটখানেক লাগল ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হতে। তখন আমি আস্তে আস্তে একটু একটু হাত–পা নাড়তে শুরু করলাম। পানিতে মানুষ যেরকম করে সাঁতার কাটে অনেকটা সেভাবে। আমার মনে হতে লাগল আমি নীল গাঙে সাঁতার কেটে যাচ্ছি। একটু অভ্যাস হবার পর আমি একটা ডিগবাজি দিলাম বাতাসে, ঘুরপাক খেলাম কয়েকবার, তারপর চিলের মতো দু'হাত মেলে উড়ে যেতে থাকলাম আকাশে।

কী মজা উড়তে, টুকুনজিল!

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তুমি তো জান। তুমি তো উড়ে বেড়াও।

হ্যাঁ, আমি নিজে তো উড়তে পারি না, আমার মহাকাশযানে করে আমি উড়ে বেড়াই।

প্লেনের মতন?

অনেকটা সেরকম, কিন্তু তার থেকে অনেক সাবলীল। প্লেনের আকাশে ওড়ার জন্যে রানওয়ে লাগে, নামার জন্যেও রানওয়ে লাগে। তা ছাড়া যখন যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে যেতে পারে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না। আমার মহাকাশযান তা পারে। তা ছাড়া আমি অসম্ভব দ্রুত যেতে পারি। এত দ্রুত যে তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।

হ্যাঁ। সে জন্যেই কার্লোস তোমাকে এভাবে ধরতে চেয়েছিল। ধরে বুঝতে চেয়েছিল তুমি কী ভাবে সেটা কর।

হ্যাঁ। কিন্তু জ্ঞানের মাঝে কোনো শর্টকাট নেই! আমি যদি পৃথিবীর মানুষকে তাদের অজানা কিছু বলে দিই, তাহলে সেটা তো আর জ্ঞান হল না, সেটা হল ম্যাজিক। সেই ম্যাজিক পৃথিবীর মানুষ নিয়ন্ত্রণ করবে কেমন করে? অনেকটা হবে তোমাদের গল্পের দৈত্যকে বশ করার মতো। একটু যদি ভুল হয়, তাহলে উল্টো সেই দৈত্য তোমাকে ধ্বংস করে ফেলবে।

তা ঠিক।

আমি একটা মেঘের মাঝে ঢুকে যাচ্ছিলাম, ভিজে কুয়াশার মতো মেঘ। মেঘ থেকে বের হতে হতে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা টুকুনজিল, আমি এইভাবে উড়ছি কেমন করে? তুমি ঠিক কী ভাবে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ?

তোমার ভাষায় বলা যায় আমি তোমাকে ঘাড়ে করে নিয়ে উড়ে যাচ্ছি। কিন্তু যেহেতু আমি খুব ছোট, তাই তোমার শরীরের এক জায়গায় ধরে না রেখে শরীরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন হাজার দু' শ' নয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। আমি খুব দ্রুত যেতে পারি, কাজেই সেটা কোনো সমস্যা নয়। নিচে থেকে তোমাকে উপরে ধরে রেখেছি, তুমি টের পাচ্ছ না, কারণ এক-একটা বিন্দুতে আমি এক আউন্স থেকেও কম চাপ দিচ্ছি।

টুকুনজিল একটু থেমে বলল, একটা প্লেন আসছে।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, আমাকে ধরতে?

না। যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে চাও?

কোনো ভয় নেই?

না। অনেক নিচে দিয়ে যাচ্ছে, তোমার নিঃশ্বাস নিতেও কোনো অসুবিধে হবে না। গতিবেগ একটু বেশি, তাই তোমাকে ঘিরে কোনো ধরনের একটা বলয় তৈরি করে দিতে হবে।

পারবে করতে?

পারব। হ্যাঁ, চল যাই।

আমি হাত দু'টি উঁচু করলাম, মানুষ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেভাবে। সোজা উপরে উঠে ডান দিকে ঘুরে গেলাম পাখির মতো।

প্লেনটা বেশি বড় না। পাখার দু'পাশে দু'টি প্রপেলার প্রচণ্ড শব্দ করে ঘুরছে। প্লেন যে এত শব্দ করে আমি জানতাম না, প্রথমে খানিকক্ষণ কানে হাত দিয়ে থাকতে হল, একটু পর অবশ্যি শব্দটা অভ্যেস হয়ে গেল, হতে পারে টুকুনজিল কিছু-একটা করে দিল যেন শব্দটা শুনতে না হয়। টুকুনজিলের অসাধ্য কিছু নেই! আমি প্লেনের পাশে পাশে উড়তে উড়তে সাবধানে একটা পাখার উপর দাঁড়ালাম। বাতাসে আমার চুল উড়ছে, মেঘের মাঝে উড়ে যাচ্ছি আমি, কী যে চমৎকার লাগছে তা আর বলার নয়!

প্লেনের গোল গোল জানালা দিয়ে মানুষজন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, কেউ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, চোখ বিস্ফারিত, মুখ হাঁ করে খুলে আছে! আমি তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম, সবাই এত হতবাক হয়ে গেছে যে, কেউ হাত নেড়ে আমাকে উত্তর দিল না। শুধু একটা ছোট বাচ্চা খুশিতে হেসে আমার দিকে হাত নাড়তে শুরু করল। আমি বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, তারপর আবার হাত নাড়লাম, বাচ্চাটা আরো জোরে হাত নেড়ে লাফাতে শুরু করল। এবারে বাচ্চাটার দেখাদেখি আরো কয়েকজন হাত নাড়ল আমার দিকে।

টুকুনজিল বলল, চল ফিরে যাই।

চল।

আমি দুই হাত উপরে তুলে একটা ডিগবাজি দিলাম বাতাসে। তারপর দু হাত দু পাশে ছড়িয়ে প্লেনের মতো উড়ে গেলাম ডানদিকে। ঘুরে একবার পিছনে তাকালাম আমি, প্লেনের সব মানুষ এবারে পাগলের মতো হাত নাড়ছে আমার দিকে তাকিয়ে! আমি শেষবারের মতো হাত নেড়ে নিচে নামতে শুরু করলাম। অনেক দিন মনে রাখবে সবাই পুরো ব্যাপারটা!

নিচে নামাতে নামাতে টুকুনজিল আমাকে একেবারে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে আনল। ধানক্ষেত, নদী, নৌকা, ছোট ছোট বন-জঙ্গল, কী চমৎকার দেখায় উপর থেকে! আমি পাখির মতো উড়ে যাচ্ছি বাতাসে, আর নিচে মাঝিরা নৌকা বেয়ে যাচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাষীরা কাজ করছে মাঠে, বৌ-ঝিরা কলসি নিয়ে পানি আনছে পুকুর থেকে, মাঠে খেলছে বাচ্চারা।

মজার ব্যাপার হল, কেউ আমাকে খেয়াল করে দেখছে না। মানুষেরা মনে হয় দরকার না হলে উপরের দিকে তাকায় না। কেন তাকাবে, যা কিছু দরকার সবই তো নিচে মাটির সাথে! আমি এবারে আরো নিচে নেমে এলাম।

মাঠে গোল্লাছুট খেলছে বাচ্চারা, আমি একেবারে নিচে নেমে তাদের মাথার কাছ দিয়ে উড়ে আবার আকাশে উঠে গেলাম। বাচ্চাগুলো একেবারে হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি হাত নাড়লাম, সবাই হাত নাড়ল আমার দিকে! ছোট একটা বাচ্চা শুধু পিছনে পিছনে দুই হাত উপরে তুলে ছুটে আসতে থাকে, আমি উড়ব—আমি উড়ব—

আমার কী মনে হল জানি না, নিচে নেমে এসে বাচ্চাটার দুই হাত ধরে তাকে উপরে নিয়ে আসি। সেও ভাসতে থাকে আমার মতো, তখন সাবধানে ছেড়ে দিই তাকে। বাচ্চাটি ভাসতে ভাসতে নিচে নেমে যায়, আমি উড়ে যাই সামনে। টুকুনজিলের অসাধ্য কোনো কাজ নেই!

এবারে সব বাচ্চা হাত তুলে পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে, আমি উড়ব—আমি উড়ব—আমি উড়ব!

কিন্তু আমার সময় নেই, দেরি হয়ে যাচ্ছে বাড়ি পৌঁছাতে। হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় নিয়ে উড়ে উড়ে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম।

টুকুনজিল বলল, আমরা প্রায় এসে গেছি।

সত্যি?

হ্যাঁ, চিনতে পারছ না?

আমি নিচে তাকালাম, ঐ তো নীল গাঙ, ঐ তো নীল গাঙের পাশে স্কুলঘর, নীলাঞ্জনা হাই স্কুল। ঐ তো বড় সড়ক। ঐ তো দূরে আমাদের বাড়ি। বাড়ির পিছনে জঙ্গল। ঐ তো জঙ্গলের পিছনে জোড়া নারকেল গাছ। কখনো উপর থেকে দেখি নি, তাই প্রথমে চিনতে পারি নি।

আমি বললাম, টুকুনজিল, বাবাকে দেখতে পাও?

হ্যাঁ।

কোথায়?

একটা মাদারগাছের সামনে চুপ করে বসে আছেন।

কেউ কি আছে বাবার আশেপাশে?

না, নেই।

তাহলে আমাকে বাবার কাছে নামাও।

ঠিক আছে।

আমি এবারে শোঁ শোঁ করে নিচে নেমে আসি। স্কুলঘরের পাশে দিয়ে উড়ে নারকেলগাছের পাশে মাদারগাছের কাছাকাছি নেমে হঠাৎ বাবাকে দেখতে পেলাম। গালে হাত দিয়ে মাদারগাছের সামনে উবু হয়ে বসে আছেন। আমি কাছাকাছি আসতেই বাবা হঠাৎ কী মনে করে ঘুরে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেলেন। আমি উড়ে এসে খুব ধীরে ধীরে বাবার সামনে নামলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা একটু হেসে বললেন, বিলু, বাবা তুই এসেছিস?

আমি যে আকাশে উড়ে এসেছি, সেটা দেখে বাবা একটুও অবাক হলেন না, মনে হল ধরেই নিয়েছেন আমি উড়ে আসব।

আমি বাবার হাত ধরে বললাম, বাবা, তোমার শরীরটা নাকি ভালো না?

কে বলেছে?

রাঙাবুবু।

রাণু? রাণুটা একেবারে বোকা। আমি একটা হাঁচি দিলেই মনে করে অনেক অসুখ!

বাবা মাদারগাছটার দিকে তাকিয়ে বললেন, যেতে হয় এখন, জনাব। ছেলেটা এসেছে এতদিন পরে, মায়ের কাছে নিয়ে যাই। বড় খুশি হবে।

আমি বাবার হাত ধরে বাড়ির ভেতরে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, রাঙাবুবু লিখেছিল তুমি একেবারে বিছানায়, তুমি তো বেশ হাঁটছ, বাবা।

আমি একেবারে বিছানাতেই ছিলাম। মনে হচ্ছিল আর বুঝি বাঁচবই না। এই ঘন্টাখানেক আগে কী হল, হঠাৎ শুনি ঝিঁঝিপোকার ডাক, মনে হল যেন বুকের মাঝে কে জানি চিমটি কাটল। তারপর তুই বিশ্বাস করবি না, হঠাৎ মনে হল শরীরটা অনেক ঝরঝরে হয়ে গেছে। তুই আসবি বলেই মনে হয়!

টুকুনজিল! আমি বুঝে গেলাম বাবা কেমন করে হঠাৎ ভালো হয়ে গেছেন। টুকুনজিল বাবাকে ভালো করে দিয়েছে! নিশ্চয়ই ওই! সে জন্যে আমার সাথে রহস্য করছিল, বাবার কথা বলছিল না! আমি টুকুনজিলকে ডাকলাম কয়েকবার, নেই ধারে-কাছে। কে জানে আবার চট করে মঙ্গল গ্রহটা দেখতে গেছে কি না?

বাড়ির উঠানে আসতেই লাবু আমাদের দেখে ফেলল, তারপর চিৎকার করতে করতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। এক সেকেন্ডের মাঝে বাড়ির ভেতর থেকে সবাই বের হয়ে এল, মা, রাঙাবুবু, বড়বুবু, বড়বুবুর ছোট ছেলেটা—সবাই। মা ছুটে এসে আমাকে একেবারে বুকে চেপে ধরলেন, বললেন, ইস, শরীরটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

রাঙাবুবু বলল, বিলু, তুই এখন কেমন করে এলি? ট্রেন তো আসবে সন্ধ্যেবেলা!

বাবা বললেন, উড়ে এসেছে।

রাঙাবুবু চোখ পাকিয়ে বলল, উড়ে এসেছে?

হ্যাঁ। কী সুন্দর উড়তে শিখেছে বিলু! একেবারে পাখির মতো। দেখলে অবাক হয়ে যাবি।

পাখির মতো?

হ্যাঁ, একেবারে পাখির মতো উড়তে পারে। বাবা ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বিলু, একটু উড়ে দেখাবি এখন?

মা ধমক দিলেন বাবাকে, চুপ করেন তো আপনি।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে হেসে বললেন, দেখলি বিলু, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না। তুই চলে যাবার পর আমার আর কথা বলার মানুষ নেই।

মা বললেন, বিলু বাবা যা, হাত-পা ধুয়ে আয়, খাবি।

আমি একটা গামছা নিয়ে বের হয়ে গেলাম, কে জানে কলতলায় দুলালকে পেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাব কি না, আমাকে দেখে কী অবাক হয়ে যাবে! হঠাৎ টুকুনজিলের কথা শুনতে পেলাম, বিলু? তুমি এখান থেকে চলে গিয়েছিলে কেন? এরা সবাই তোমাকে কী অসম্ভব ভালবাসে! তরঙ্গ কম্পন চার দশমিক সাতের মাঝে—

ভালবাসবে না কেন? আমার মা-বাবা ভাই-বোন—

তাহলে তুমি চলে গেলে কেন?

এই তো ফিরে এসেছি, আর যাব না।

হ্যাঁ, যেও না।

টুকুনজিল, আমি একটু আগে তোমাকে ডেকে পাই নি।

আমার মহাকাশযানটার কিছু জিনিস ঠিক করতে হল।

ঠিক হয়েছে?

হ্যাঁ।

টুকুনজিল, তুমি বাবার শরীর ঠিক করে দিয়েছ, তাই না?

পুরোপুরি ঠিক করি নি, হৃৎপিণ্ডের একটা ধমনীতে কিছু সমস্যা ছিল, সেটা ঠিক করে দিয়েছি। তুমি কি চাও অন্য সমস্যাগুলোও সারিয়ে দিই?

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবে তুমি? মাথা-খারাপটা সারিয়ে দিতে পারবে?

মাথা-খারাপ? তোমার বাবার মাথা-খারাপ?

হ্যাঁ। দেখ না, গাছপালা, পশুপাখির সাথে কথা বলেন?

সেটা কি মাথা-খারাপ? পশুপাখিরা তো খুব নিম্ন বুদ্ধিবৃত্তির প্রাণী, কিন্তু তারাও তো চিন্তা করে, নিজেদের নিম্ন বুদ্ধিবৃত্তির চিন্তা। তোমার বাবা সেটা হয়তো অনুভব করতে পারেন। আমি যেরকম করি। এটা একটা ক্ষমতা—

কচু ক্ষমতা! দরকার নেই এই ক্ষমতার। তুমি বাবাকে ভালো করে দাও।

ঠিক আছে, যাবার আগে তোমার বাবাকে ভালো করে দেব।

যাবার আগে? কোথায় যাবার আগে?

আজকে আমার ফিরে যেতে হবে, মনে নেই?

তাই তো! টুকুনজিল, তুমি চলে যাবে?

হ্যাঁ, বিলু।

আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।

১৬. বিদায়

গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল, টুকুনজিল আমাকে ডাকছে। আমি উঠে বসি বিছানায়। রাঙাবুবু ঘুমিয়ে আছে বিছানায় ক্লান্ত হয়ে, অন্যপাশে লাবু। সাবধানে বিছানা থেকে নেমে আমি দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আকাশে মস্ত একটা চাঁদ উঠেছে তার নরম জোছনায় চারদিকে কী সুন্দর কোমল একটা ভাব! বারান্দায় জলচৌকিতে আমি চুপচাপ বসে রইলাম। টুকুনজিল ডাকল আমাকে, বিলু।

বল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কেন জানি যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এখানে থেকে যাই।

টুকুনজিল, আমারও তাই ইচ্ছে করছে।

কিন্তু আমার তো যেতে হবে জান। এখানে থেকে যাওয়া তো খুব অযৌক্তিক ব্যাপার। তাই না?

হ্যাঁ।

তবু মনে হচ্ছে থেকে যাই। মনে হচ্ছে তোমাকে নিয়ে আকাশে উড়ে বেড়াই।

আমি চুপ করে রইলাম।

কিন্তু আমার যেতে হবে। যেতে ইচ্ছে করছে না, তবু যেতে হবে। খুব বিচিত্র একটা অনুভূতি। খুব বিচিত্র। এর কি কোনো নাম আছে বিলু?

হ্যাঁ, আছে।

কি নাম?

মন–খারাপ। দুঃখ।

দুঃখ! আমার খুব দুঃখ হচ্ছে, বিলু।

আমি কোনো কথা না বলে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠলাম।

টুকুনজিল বলল, তুমি কেঁদো না বিলু। কেঁদো না। কেউ কাঁদলে কী করতে হয় আমি জানি না।

আমি শার্টের হাতা দিয়ে আমার চোখ মোছার চেষ্টা করলাম। টুকুনজিল আবার বলল, আমি যখন ফিরে যাব তখন আমার গ্রহের সবাইকে বলব, ছায়াপথে ছোট্ট একটা নক্ষত্র আছে—তার নাম সূর্য। সেই নক্ষত্রে ছোট্ট একটা গ্রহ আছে তার নাম পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে ছোট্ট একটা মানুষ আছে, তার নাম বিলু। সেই বিলুর সাথে আমার ভাব হয়েছিল। সেই বিলু আমাকে খুব আশ্চর্য একটা জিনিস শিখিয়েছে, সেটার নাম ভালবাসা। আমাকে সে এত ভালবেসেছে যে হঠাৎ করে আমার বুকের ভেতরেও সেই আশ্চর্য অনুভূতির জন্ম হয়েছে। আমি একটা আশ্চর্য জিনিস বুকে করে নিয়ে যাচ্ছি বিলু। আমি তোমাকে কোনো দিন ভুলব না।

আমিও ভুলব না, টুকুনজিল।

আবার যখন আসব, আমি তখন তোমাকে খুঁজে বের করব।

কখন আসবে তুমি?

সময় সংকোচনের পঞ্চম পর্যায়ের তৃতীয় তরঙ্গে।

সেটা কবে?

এক শ' তিরিশ বছর পরে।

এক শ' তিরিশ! আমি ততদিনে মরে ভূত হয়ে যাব।

তোমার সন্তানেরা থাকবে। কিংবা তাদের সন্তানেরা। আমি তাদের খুঁজে বের করে তোমার কথা বলব।

ঠিক আছে টুকুনজিল।

আমার যাবার সময় হয়েছে বিলু। যাবার আগে তুমি কি আমার কাছে কিছু জানতে চাও?

কি জানতে চাইব?

কোনো পরম জ্ঞান? মহাকর্ষ ও নিউক্লিয়ার বলের সংমিশ্রণ? সর্বশেষ প্রাইম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যা? আলোর প্রকৃত বেগ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমা? কোনো মহাসত্য?

না টুকুনজিল, জানতে চাই না। তুমি তো বলেছ জ্ঞানে কোনো শর্টকাট নেই।

তাহলে কি তোমাকে বলে যাব কেমন করে সমুদ্রের পানি থেকে সোনা বের করতে হয়? বালু থেকে কেমন করে ইউরেনিয়াম বের করতে হয়? বলব?

না টুকুনজিল। আমি কিছু চাই না।

কিছু চাও না?

না, শুধু চাই তুমি যেন ভালো থাক। যেখানে থাক ভালো থেকো।

বিলু।

বল।

আমাকে বিদায় দাও, বিলু।

তুমি কোথায়?

এই যে আমি, তোমার হাতের উপর বসে আছি।

আমার হাতের উপর হালকা নীল আলোর একটা বিন্দু। আমি আলতোভাবে স্পর্শ করে বললাম, বিদায়।

টুকুনজিলের মহাকাশযান থেকে নীল বিদ্যুৎচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ে। আমার হাত থেকে সেটা উপরে উঠে আসে, তারপর আমাকে ঘিরে সেটা ঘুরতে শুরু করে। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর দ্রুত, দ্রুত থেকে দ্রুততর। ঝিঁঝিঁপোকার মতো একটা শব্দ হয়, তারপর হঠাৎ করে নীরব হয়ে যায় চারদিকে।

টুকুনজিল চলে গেছে। বুকের ভেতর কেমন জানি ফাঁকা ফাঁকা লাগতে থাকে আমার।

দরজা খুলে হঠাৎ বাবা বের হয়ে আসেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাঁদের দিকে তাকালেন, তারপর দু' হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। আমাকে দেখতে পান নি বাবা, হঠাৎ দেখলেন, দেখে চমকে উঠে বললেন, কে? কে ওটা?

আমি, বাবা।

বিলু তুই?

হ্যাঁ বাবা।

বাইরে বসে আছিস কেন?

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তাই।

বাবা এসে আমার পাশে বসলেন। জোরে জোরে কয়েকটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, কী সুন্দর ফুলের গন্ধ!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাবা, তোমার শরীরটা কেমন লাগছে এখন?

শরীর? কেমন জানি হালকা হালকা লাগছে, মনে হচ্ছে বয়স কুড়ি বছর কমে গেছে হঠাৎ! একেবারে অন্যরকম লাগছে। খুব ভালো লাগছে শরীরটা। খুব ভালো। তুই এসেছিস বলেই মনে হয়।

রাতজাগা একটা পাখি হঠাৎ কঁককঁক করে ডেকে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। আমি চমকে উঠে বললাম, বাবা, শুনলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ। ওটা কিছু না। পাখি।

পাখিটা কি বলছে, বাবা?

বাবা শব্দ করে হাসলেন। বললেন, ধূর বোকা। মানুষ কি কখনো পাখির কথা বুঝতে পারে?

আমি শক্ত করে বাবাকে আঁকড়ে ধরে সাবধানে চোখের পানি মুছে নিলাম। টুকুনজিল আমার বাবাকে ভালো করে দিয়ে গেছে।

টুকুনজিল। তুমি যেখানেই থাক, ভালো থেকো।

শেষ কথা

আমি নীলাঞ্জনা হাই স্কুলেই আছি। বেশ ভালোই আছি। সারা দিন স্কুল করে বিকেলে কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে ফুটবল খেলি। তারপর দলবেঁধে বড় দিঘিতে লাফিয়ে পড়ি। হৈচৈ করে সাঁতার কেটে গোসল করি, ডুব-সাঁতার দিয়ে এক জন আরেকজনের পা ধরে টানাটানি করি, ভারি মজা হয় তখন।

ছুটির দিনে আমি আর দুলাল হেঁটে হেঁটে সদরের বড় লাইব্রেরিতে যাই, এই লাইব্রেরিটা অনেক বড় আর কত যে মজার মজার বই! লাইব্রেরিয়ানের সাথে আমার খুব ভালো পরিচয় হয়ে গেছে, আমি তাই একবারে অনেকগুলো করে বই নিতে পারি। বইগুলো বুকে চেপে ধরে আমি আর দুলাল বড় সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে ফিরে আসি। দু'পাশে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়, ধানের শিষ ঢেউয়ের মতো নাচতে থাকে, তখন কী যে ভালো লাগে আমার! আমি আর দুলাল সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে কত রকম গল্প করি, বড় হয়ে কি করব এইসব।

ব্ল্যাক মার্ডারের দলবল একবার আমার কাছে বেড়াতে এসেছিল টুকুনজিলের গল্প শুনতে। স্যার নিয়ে এসেছিলেন, সবাই মিলে কী যে মজা হল তখন! আমি আর দুলাল ব্ল্যাক মার্ডারের দলকে সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালাম, কেমন করে জাল দিয়ে মাছ ধরতে হয়, কেমন করে গরুর দুধ দোয়াতে হয়, কেমন করে নৌকা বাইতে হয়, কেমন করে ক্ষেতে মই দিতে হয়। বিকেলে রাঙাবুবু সবাইকে খই ভেজে দিল দেখে সবাই এত অবাক হয়ে গেল যে বলার নয়। নান্টু তো ফিরে যেতেই চাইছিল না, তারিক বলল, সে তার বাবাকে বলবে নীলাঞ্জনা হাই স্কুলে বদলি হয়ে আসতে চায়। আমাদের বাড়ি থেকে পড়াশোনা করবে।

স্যার আমার সাথে পড়াশোনা নিয়ে অনেক কথা বললেন। আমার বইপত্র বাড়ির কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। সাথে অনেকগুলো বই এনেছিলেন, গল্পের বই নয়, পড়ার বই, সেগুলো বুঝিয়ে দিলেন। ঘরে বসে নিজে নিজে কেমন করে পড়তে হয় তার উপর বই।

রাতে উঠানে বড় আগুন জ্বালিয়ে সবাই গোল হয়ে বসেছিলাম, আমি তখন টুকুনজিলের গল্প করছি সবাইকে। কেমন করে টুকুনজিলের দেখা পেলাম, কেমন করে না বুঝে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশিতে তাকে আটকে রাখলাম, কেমন করে পিঁপড়ারা তাকে ঠিক করে দিল, কেমন করে সোনার আংটি চুরি করে আমি কী

বিপদে পড়লাম। তারপর বব কার্লোসের কথা বললাম, তারা বিষাক্ত ওষুধ দিয়ে আমাকে কেমন কষ্ট দিল শুনে রাঙাবুবু আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে থাকে। তারপর যখন টুকুনজিল কী ভাবে ঘর ভেঙে আমাকে উদ্ধার করে আনল সেটা বললাম, সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। এর পরের অংশটা ব্ল্যাক মার্ডারের দলের সবাই জানে, তবুও আবার বললাম, সবাই যোগ দিল আমার সাথে। নান্টু আর তারিক অভিনয় করে দেখাল কেমন করে ভয়ঙ্কর মারপিট হল মেশিনগান হাতে সেই লোকের সাথে। সেই লোক কী ভাবে আছাড় খেয়ে পড়ল তার অভিনয়টা এত ভালো হল যে সেটা নান্টু আর তারিককে দু'বার করতে হল। সবাই হেসে কুটিকুটি হল তখন। তারপর বব কার্লোসকে ঝুলিয়ে রেখে আমরা কেমন করে পালিয়ে এলাম সেটা বললাম আমি। খালার বাসায় এসে রাঙাবুবুর চিঠি পড়ে আমার কী মন-খারাপ হল, তখন টুকুনজিল কেমন করে আমাকে আকাশে উড়িয়ে আনল সেটা বললাম। টুকুনজিল কেমন করে বিদায় নিল, সেটা বলতে গিয়ে আমার গলা ধরে এল, সবার চোখে পানি এসে গেল তখন।

গল্প শেষ হবার পর অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। অনেকক্ষণ পর স্যার বললেন, বিলু, এত বড় একটা ব্যাপার, কিন্তু তুই যে কী ভালোভাবে এটা সামলেছিস , তার কোনো তুলনা নেই। মহাকাশের সেই প্রাণী পৃথিবী সম্পর্কে কী ভালো একটা ধারণা নিয়ে গেল, বুকে করে কত ভালবাসা নিয়ে ফিরে গেল। আহা!

বাবা শুধু মাথা নেড়ে বললেন, এটা কি কখনো হতে পারে যে কেউ মহাকাশের একটা প্রাণীকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশির মাঝে আটকে রাখবে? হতে পারে? বিলুটা যা গুল মারতে পারে!

নান্টু, তারিক, সুব্রত সবাই একসাথে চিৎকার করে বলল, কী বলছেন চাচা আপনি? আমরা নিজের চোখে দেখেছি।

AMARBOI.COM

তারপর অনেক দিন হয়ে গেছে। এখনো মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ কোনো মানুষ আমার খোঁজে আসে। কেউ এদেশের, কেউ বিদেশের। তারা আমার কাছে টুকুনজিলের কথা শুনতে চায়। নানারকম প্রশ্ন করে। ঘুরেফিরে সবাই শুধু একটা জিনিস জানতে চায়, ফিরে যাবার আগে টুকুনজিল কি কোনো প্রমাণ রেখে গেছে? কোনো চিহ্ন? কোনো তথ্য? কোনো অজানা সত্য? কোনো ভবিষ্যদ্বাণী?

আমি যখন বলি রেখে যায় নি, তখন সবাই আমার দিকে কেমন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায়। আমি বুঝতে পারি, আমার কথা তারা ঠিক বিশ্বাস করছে না।

আমি কিছু মনে করি না। বিশ্বাস না করলে নাই। আমি জানি, টুকুনজিল আছে। কেউ বিশ্বাস করলেও আছে, না করলেও আছে।

রাতে যখন আকাশভরা নক্ষত্র ওঠে, আমি তখন এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জকে খুঁজে বেড়াই, আমি জানি সেই নক্ষত্রপুঞ্জের কোনো একটি নক্ষত্রের কোনো একটি গ্রহে আছে আমার এক বন্ধু। আমি জানি যখন তার আকাশ ভরে নক্ষত্র উঁকি দেয়, সেও ছায়াপথের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

তাকিয়ে সে আমার কথা ভাবে।

আমি যেরকম করে তার কথা ভাবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

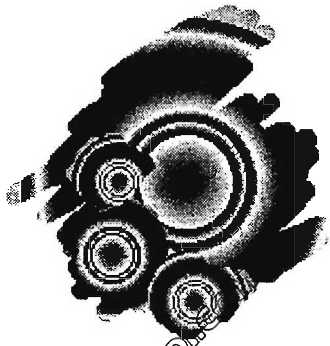

যারা বায়োবট

AMARBOI.COM

উৎসর্গ

গুলতেকিন আহমেদ
আফরোজা আমিন
সুহৃদরেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. কিরীণা

আমার নাম কুনিল। আমার বয়স আমি ঠিক জানি না কিন্তু আমি সব সময়েই ভান করি যে আমি নিঃসন্দেহে জানি আমার বয়স পনেরো। কিরীণার সাথে যখন কথা হয় সে অবশ্য সেটা স্বীকার করতে চায় না। তার সাথে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাই না, কিন্তু সুযোগ পেলেই কিরীণা এই ব্যাপারটি নিয়ে আমার সাথে তর্ক শুরু করে দেয়। বড় বড় চোখগুলো আরো বড় করে বলে, না কুনিল, তোমার বয়স তেরো বছরের একদিনও বেশি হতে পারে না, এই দেখ তুমি আমার থেকে অন্তত তিন সেন্টিমিটার ছোট।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, এই সময়টাতে মেয়েরা ছেলেদের থেকে দ্রুত বড় হয়।

কোন সময়টাতে?

বয়ঃসন্ধির সময়। যখন মেয়েদের ভেতরে নানারকম শারীরিক পরিবর্তন হয়।

কী রকম শারীরিক পরিবর্তন?

আমি কিরীণার বুকের দিকে তাকিয়ে তার একটি শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ করলেও সেটা মুখ ফুটে বলতে পারি না। কিরীণা তবুও চোখ পাকিয়ে বলে, অসভ্য।

আমি মোটেও অসভ্য নই। আমি সব বই পড়ে শিখেছি।

অসভ্য বই।

বই কখনো অসভ্য হতে পারে না। মনে আছে পীতরোগের মহামারীর সময় কী হয়েছিল?

কিরীণা চুপ করে রইল। দুই বছর আগে পীতরোগের মহামারীতে প্রত্যেকটা পরিবার থেকে অন্তত এক জন করে শিশু মারা গিয়েছিল। তখন মধ্য অঞ্চল থেকে অনেক কষ্ট করে একটি বই এই অঞ্চলে আনা হয়েছিল। সেই বইটিতে পীতরোগের প্রতিষেধক প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণনা করা ছিল। পাথরকুচি গাছের পাতার রসে লিলিয়াক ফুলের পরাগ এবং চার বিন্দু পটাশ। দিনে তিনবার। দুই সপ্তাহের মাঝে পীতরোগের মহামারী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিরীণা তখন জিজ্ঞেস করে, তুমি অনেক বই পড়েছ কুনিল?

আমি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লাম।

তোমার ভয় করে না? যখন ট্রনেরা আসবে তখন কী হবে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলে আসবে। আমি ট্রনদের ভয় পাই না।

কিরীণা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ট্রনদের ভয় পায় না সেরকম মানুষ আর কয়জন আছে? আমার খুব ভালো লাগে। আমি কিরীণার হাত ছুঁয়ে বলি, তুমি ভয় পেয়ো না। আমার কিছু হবে না। যখন ট্রনেরা আসবে তখন আমি পালিয়ে যাব।

কোথায় পালিয়ে যাবে?

পাহাড়ে আমার গোপন জায়গা আছে। কেউ খুঁজে পাবে না।

কিন্তু ট্রনদের যে অনুসন্ধানী রবোট আছে?

আমি গলা নামিয়ে বলি, অনুসন্ধানী রবোটও খুঁজে পাবে না।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

কিরীণা খানিকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলে, তুমি একদিন আমাকে একটা বই এনে দেবে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি পড়বে?

হ্যাঁ।

সত্যি?

সত্যি। দেবে এনে?

আমি খুশি হয়ে বললাম, কেন দেব না। এক শ বার এনে দেব। কিন্তু তুমি পড়বে কেমন করে? তোমার কম্পিউটারে কি ক্রিস্টাল রিডার আছে?

কিরীণা মুখ কালো করে বলল, না, নেই।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি তোমাকে আমারটা দেব। খুব সাবধান কিন্তু। কেউ যেন জানতে না পারে।

জানবে না, সবাই যখন ঘুমিয়ে যাবে তখন পড়ব।

কিরীণা একটু পরে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাকে কী বই এনে দেবে কুনিল?

আমার কাছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরির বই আছে, নিউক্লিয়ার ফিউসান, সুপার লেজার, আন্তঃগ্রহ যোগাযোগ, ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া—

কিরীণা একটু লাল হয়ে বলল, ঐ অসভ্য বইটা—

ও! মানব জন্মরহস্য? ঐটা আমার কাছে নেই, ইলির কাছ থেকে আনতে হবে।

থাক তাহলে।

আমি তোমাকে আরেকটা খুব ভালো বই এনে দেব। পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ, খুব চমৎকার বই।

ঠিক আছে।

নাকি সহজ ইলেকট্রনিক্স? সহজ ইলেকট্রনিক্স যদি তুমি ঠিক করে পড়, তা হলে ঘরে বসে তুমি উপগ্রহ স্টেশন তৈরি করতে পারবে। ট্রনদের অনুষ্ঠান দেখতে পারবে।

তুমি দেখেছ?

একবার।

কেমন দেখতে? কিরীণা চোখ বড় বড় করে বলল, ট্রনদের মেয়েরা নাকি সব সময় নিও পলিমারের কাপড় পরে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানি না। কাপড় তো কাপড়ই! পলিমারও কাপড়, নিও পলিমারও কাপড়।

ইস্! আমাকে যদি কেউ একটা নিও পলিমারের পোশাক দিত!

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ছিঃ, এসব বলে না কিরীণা। কেউ শুনলে কী ভাববে?

কিরীণা বিষণ্ন মুখে বলল, আমার আর পশুদের মতো থাকতে ভালো লাগে না। কেন সব আনন্দ ট্রনদের জন্যে হবে, আর সব দুঃখ–কষ্ট হবে আমাদের? কেন?

আমি কিরীণার হাত ধরে বললাম, ছিঃ কিরীণা! এইসব বলে না। ছিঃ! তুমি বললে না, তুমি কোন বই চাও? পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ, নাকি সহজ ইলেকট্রনিক্স?

কিরীণা অন্যমনস্কভাবে বলল, তোমার যেটা ইচ্ছা।

আমি আরো কিছুক্ষণ কিরীণার সাথে বসে থাকলাম। তারপর কিরীণা তার জীর্ণ আইসোটোপ আইসোলেটর নিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে চলে গেল। সমুদ্রের বালুতে খুব অল্প প্লুটোনিয়াম রয়েছে, ছেঁকে আলাদা করলে আমাদের একমাত্র নিউক্লিয়ার রি–অ্যাক্টরে বিক্রি করা যায়। কমবয়সী মেয়েরা তাই করে সারাদিন। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ করলে যেটুকু প্লুটোনিয়াম আলাদা করতে পারে, সেটা দিয়ে একদিনের খাবারও কেনা যায় কি না সন্দেহ। তবু ঘরে বসে না থেকে তাই করে মেয়েরা।

আমি বসে বসে দেখলাম, কিরীণা তার জীর্ণ আইসোটোপ আইসোলেটর দুলিয়ে দুলিয়ে সমুদ্রের তীরে হেঁটে যাচ্ছে। মাথায় একটা লাল স্কার্ফ বাঁধা। বাতাসে উড়ছে সেটি। সমুদ্রের কাছাকাছি গিয়ে ঘুরে তাকাল আবার, তারপর হাত নাড়ল আমার দিকে তাকিয়ে। আমিও হাত নাড়লাম। কিরীণাকে আমার বড় ভালো লাগে।

দিনের বেলা আমি খামারের কাজ করি। খুব অল্প খানিকটা জমিতে চাষ–আবাদ করা যায়। সেটা খুব যত্ন করে ব্যবহার করা হয়। যারা বড়, তারা জমি চাষ করা, সার দেয়া, বীজ বোনা এইসব খাটাখাটনির কাজগুলো করে। আমরা, যাদের অভিজ্ঞতা কম, তারা ছোট ছোট গাছের চারাগুলোর দেখাশোনা করি। ঘরে তৈরি করা গ্রোথ মনিটর দিয়েচারাগুলোকে পরীক্ষা করি। পুরানো শুকনো পাতা টেনে ফেলি, নতুন পাতাগুলোকে ভালো করে ধুয়ে–মুছে রাখি। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে এই গাছগুলোকে তৈরি করা হয়েছে, বড় একটা গাছে একদিনে এক জন মানুষের প্রয়োজনীয় শ্বেতসার বের হয়ে আসে। সমস্যা হচ্ছে পানি এবং সার। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে পানি টেনে আনা হয় অনেক কষ্ট করে। সার কোথা থেকে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মধ্য অঞ্চল থেকে অনেক কষ্ট করে গোপনে সার আনার চেষ্টা করা হয়। বহুদিন থেকে সার তৈরি করার উপর একটা বই খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না।

সূর্য ডুবে গেলে আমি বাসায় ফিরে আসতে থাকি। আমার বাসা একেবারে অন্য পাশে। অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে আসতে হয়। আমার সাথে যারা কাজ করে তাদের প্রায় সবারই বাই–ভার্বাল আছে। সত্যিকার বাই–ভার্বাল নয়, ছোট একটা ইঞ্জিনের সাথে জোড়াতালি দেয়া কিছু যন্ত্রপাতি। সত্যিকার বাই–ভার্বাল যেরকম যতক্ষণ খুশি বাতাসে ভেসে থাকতে পারে; এগুলো সেটা পারে না। ছেলেরা পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে উপরে যায়, সেকেন্ড খানেকের মাঝে আবার নিচে নেমে আসে, আবার পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠে যেতে হয়। একটা অতিকায় ঘাসফড়িঙের মতো ঘরে তৈরি করা বাই–ভার্বালগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে দূরত্ব অতিক্রম করে।

আমার বাই–ভার্বাল নেই, খামারের কাজ করে আমার যেটুকু সঞ্চয় হয়েছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা দিয়ে আমি ক্রিস্টাল রিডার কিনেছি। ক্রিস্টাল রিডার বেআইনি জিনিস, গোপনে কিনতে হয়। সে কারণে তার অনেক দাম। ইলি অবশ্যি আমাকে খুব কম দামে দিয়েছে। ইলি মনে হয় আমাকে একটু পছন্দই করে। আমি বাসায় যাবার আগে প্রতিদিন সন্ধেবেলা ইলির বাসায় একবার উঁকি দিয়ে যাই।

ইলির বাসায় সব সময়েই কেউ–না–কেউ থাকে। আজকেও ছিল। খামারের দু'জন, ক্রড়িন আর দুরিণ, নিউক্লিয়ার রি–অ্যাক্টরের শুলা এবং রুখ নামে এক জন মেকানিক। আমাকে দেখে ইলি সস্নেহে বলল, কি খবর কুনিল? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কিছুদিনের মাঝেই এক জন বড়মানুষে পরিণত হবে!

ইলি কী ভাবে জানি বুঝতে পেরেছে আমার খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাবার ইচ্ছে। মাঝে মাঝে তাই আমাকে এই কথাটি বলে।

রুখের কপালের দু' পাশের চুল সাদা হয়ে এসেছে। মাথা নেড়ে বলল, কুনিল যদি তার বাবার মতো হয়, তাহলে সে যে অত্যন্ত সুপুরুষ হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শুলা বলল, চেহারার প্রয়োজন নেই, কুনিল যেন তার বাবার বুদ্ধি আর জ্ঞানটুকু পায়।

সবাই তখন একসাথে মাথা নাড়ে। ক্রড়িন আস্তে আস্তে বলে, তোমরা বিশ্বাস করবে না, আমি এখনো কুশানের অভাবে অভ্যস্ত হতে পারি নি।

কুশান আমার বাবার নাম। আমার বাবাকে আমি কখনো দেখি নি। আমার জন্মের আগেই আমার বাবাকে ট্রনেরা মেরে ফেলেছিল। এই এলাকায় মানুষদের মাঝে যে ছোট সভ্যতাটি গড়ে উঠেছে, সেটি নাকি আমার বাবার প্রচেষ্টার ফসল। ট্রনেরা ইচ্ছে করলেই আমাদেরকে বা যারা আমাদের মতো নানা জায়গায় বেঁচে আছে, তাদের ধ্বংস করে ফেলতে পারে। তারা কোনো কারণে সেটি করছে না। আমাদেরকে কখনোই পুরোপুরি ধ্বংস করে নি সত্য, কিন্তু তারা কখনোই চায় না আমরা সভ্য মানুষের মতো থাকি। তারা চায় আমরা পশুর মতো বেঁচে থাকি, নিজেদের মাঝে খুনোখুনি করে একে অন্যকে ধ্বংস করে। তাই মাঝে মাঝে তারা এসে আমাদের সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে যায়। নির্মমভাবে মানুষদের হত্যা করে। আগে হত্যাকাণ্ডগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত। আমাদের এই ছোট সভ্যতাটি গড়ে ওঠার পর হত্যাকাণ্ডগুলো বিক্ষিপ্ত নয়, এখন হত্যাকাণ্ডগুলো সুচিন্তিত। যারা নেতৃত্ব দেয় বা দিতে সক্ষম, তাদেরকে বেছে বেছে হত্যা করা হয়। আমাদের বই পড়া নিষেধ, যারা বই পড়ে তাদের খুঁজে বের করে হত্যা করা হয়। আমাদের যে লাইব্রেরি ছিল, তার প্রত্যেকটি বইকে ধ্বংস করা হয়েছে। আজকাল তাই প্রকাশ্যে বই পড়া হয় না। বই পড়তে হয় গোপনে। সবাই পড়ে না, যাদের সাহস আছে শুধু তারাই পড়ে।

আমার বাবার চেষ্টায় এখানে একটি ছোট সভ্যতা গড়ে উঠেছে। যত ছোটই হোক, এটা আমাদের নিজেদের সভ্যতা। আমরা একে–অন্যকে ধ্বংস করে বেঁচে থাকি না। সবাই মিলে একসাথে বেঁচে থাকি। শেষবারের ট্রনদের ভয়ংকর আক্রমণে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার সবকিছু গোড়া থেকে তৈরি করতে হয়েছে। সেটি উল্লেখযোগ্য নয়, উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, সবাই একতাবদ্ধ থেকে আবার সবকিছু গড়ে তুলেছে। কেউ আর বিক্ষিপ্ত পশুর জীবনে ফিরে যায় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই মনে করে এর পুরো কৃতিত্বটুকু আমার বাবার। সমুদ্রতীরে বাবার শরীরটিকে অ্যাটমিক ব্লাস্টার দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবার আগে বাবা নাকি ছোট একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ট্রনেরা আমাদের ভাষা বুঝতে পারে না, বুঝতে পারলে বাবাকে তারা সেই কথাগুলো বলতে দিত না। বাবা তখন বলেছিলেন, এই পৃথিবীতে ট্রনদের যতটুকু অধিকার, আমাদের ঠিক ততটুকু অধিকার। আমরা যদি একতাবদ্ধ থাকি, শুধু তাহলেই ট্রনেরা আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না। শুধু যে ধ্বংস করতে পারবে না তা–ই নয়, আমরা আবার আমাদের অধিকার নিয়ে ট্রনদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব। বাবা সবাইকে একটা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন সবাইকে পাল্টে দিয়েছে। আগে বেঁচে থাকা ছিল অর্থহীন, এখন বেঁচে থাকার একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। এখানকার সব মানুষের বাবার জন্যে তাই রয়েছে এক আশ্চর্য ভালবাসা। আমি বুঝতে পারি সেই ভালবাসার অংশবিশেষ আমার জন্যেও সবার বুকের মাঝে আলাদা করে রাখা আছে।

ইলি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কুনিল, তুমি খাবে একটু গরম পানীয়?

আমি মাথা নাড়লাম। ইলি চমৎকার একধরনের পানীয় তৈরি করে, খানিকটা ঝাঁঝালো খানিকটা মিষ্টি উষ্ণ একধরনের তরল। একবারে খাওয়া যায় না, আস্তে আস্তে খেতে হয়। খাওয়ার পর সারা শরীরে একধরনের উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে, কেমন জানি সতেজ মনে হতে থাকে নিজেকে। পানীয়টি ছোটদের খাওয়ার কথা নয়—ইলি তবুও মাঝে মাঝে আমাকে খেতে দেয়।

ইলির রান্নাঘরে খাবার টেবিল ঘিরে বসে সবাই কথা বলতে থাকে। বেশির ভাগই নানা ধরনের সমস্যার কথা, কেমন করে সমাধান করা যায় তার আলোচনা। আমি এক কোনায় বসে বসে শুনি। খুব ভালো লাগে শুনতে। ভারি ইচ্ছে করে আমার বড় হতে, তাহলে আমিও তাদের মতো কঠিন কঠিন সব সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারব।

পানীয়টি শেষ করে আমি উঠে পড়ি। ইলি আবার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, আগের বইটি শেষ হয়েছে?

একটু বাকি আছে। এক্সপেরিমেন্টের অংশটা করতে পারলাম না।

ইলি মাথা নাড়ল, পরের বার দেখি জোগাড় করা যায় কী না।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, ইলি, মানব জন্মরহস্য বইটা আমাকে আবার দেবে?

ইলি চোখ মটকে বলল, কেন, আবার কেন?

কিরীণা পড়তে চেয়েছিল—বলতে গিয়ে আমার কান লাল হয়ে ওঠে।

ইলি শেলফ থেকে একটা ছোট ক্রিস্টাল বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, এই নাও।

আমি পকেটে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে, মনে হয় কোনো এক জন মানুষ কাকুতি–মিনতি করে কিছু একটা চাইছে। পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আমি বাসায় ফিরে যেতে থাকি। আমার মা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে কাজ করেন মা, কন্ট্রোল রুমে বসে বসে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করেন সবকিছু। ছোট ছোট সুইচ রয়েছে, ছোট ছোট হাতল, মা এবং আরো কয়েকজন মহিলা সেগুলো আলতোভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পর্শ করে রাখে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে হাত দিয়ে পুরো রি-অ্যাক্টরটিকে বন্ধ করে দিতে হবে। একটু ভুল হলে পুরো রি-অ্যাক্টর আর আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে বাতাসে।

কোনোভাবে যদি একটা ভালো কম্পিউটার চুরি করে আনা যেত ট্রনদের থেকে!

কিরীণার বাসার কাছ দিয়ে যাবার সময় আমি সবসময় ঝাউগাছের নিচে একবার দাঁড়াই। সমুদ্রের বাতাসে ঝাউগাছের পাতা শিরশির করে কাঁপতে থাকে, কেমন যেন কান্নার মতো একটা শব্দ হয়। অকারণে কেমন জানি মন-খারাপ হয়ে যায়। আমি চুপচাপ তাকিয়ে থাকি। রান্নাঘরে চুলোর সামনে দাঁড়িয়ে কিরীণা রান্না করছে। আগুনের লাল আভা পড়েছে মুখে, নিচের ঠোঁট কামড়ে বড় একটা পাত্রে ফুটন্ত কী একটা ঢেলে দিল, এক ঝলক বাষ্প বের হয়ে এল সাথে সাথে। হাতের বড় চামচটা নিয়ে সে নাড়তে থাকে দ্রুত।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। আমার বড় ভালো লাগে কিরীণাকে দেখতে।

২. ট্রন

কিরীণা মাথার লাল স্কার্ফটি খুলে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে গেল। আকাশে ঘন কালো মেঘ, সমুদ্র ফুঁসে উঠেছে এক ধরনের উন্মত্ততায়। আমি ডাকলাম, কিরীণা—

কিরীণা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তারপর দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াল উপাসনার ভঙ্গিতে। উত্তাল সমুদ্র থেকে ভয়ংকর একটি ঢেউ ছুটে আসছে কিরীণার দিকে। আমি আবার ডাকলাম, কিরীণা—

ঢেউটি এসে আঘাত করল কিরীণাকে। তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল উত্তাল সমুদ্রে। কিরীণা আমার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল। আমি ছুটে গেলাম, কিন্তু কিরীণা ভেসে গেল আরো গভীরে।

কিরীণা চিৎকার করে ডাকল আমাকে। তার গলা থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর বের না হয়ে শঙ্খের মতো শব্দ হল। গাঢ় ভরাট একটি অতিমানবিক ধ্বনি, আমার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। আমি চমকে ঘুম ভেঙে জেগে উঠি হঠাৎ। সারা শরীর ভিজে গেছে ঘামে, বুকের মাঝে ঢাকের মতো শব্দ করছে হৃৎপিণ্ড। মনে হচ্ছে বুক ফেটে বের হয়ে আসবে হঠাৎ।

শঙ্খের মতো শব্দটি শুনতে পেলাম আবার। ভয়ংকর করুণ একটি শব্দ। মনে হল পৃথিবীর সব মানুষ করুণ স্বরে আর্তনাদ করছে সৃষ্টিজগতের কাছে। কিসের শব্দ এটি? আমি পায়ে পায়ে বিছানা থেকে নেমে আসি। বাইরের ঘরের জানালা খোলা, মা দাঁড়িয়ে আছেন খোলা জানালার সামনে। চুল উড়ছে সমুদ্রের বাতাসে, দুই হাতে জানালার পাল্লা ধরে অশরীরী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন মা। কেন জানি আমার বুক কেঁপে উঠল, আমি ভয়-পাওয়া গলায় ডাকলাম, মা।

মা খুব ধীরে ধীরে ঘুরে তাকালেন আমার দিকে। জ্যোৎস্নার নীল আলোতে মাকে মনে হচ্ছে অন্য কোনো জগতের প্রাণী। ঠিক তখন আবার সেই শঙ্খের আওয়াজ ভেসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এল দূর থেকে। রক্ত–শীতল–করা ভয়ংকর করুণ একটি ধ্বনি।

আমি আবার ডাকলাম, মা—

কি বাবা?

ওটা কিসের শব্দ?

মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সাইরেন।

সাইরেন কেন বাজে মা?

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এগিয়ে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন শক্ত করে, তারপর বললেন, আজ আমাদের খুব দুঃখের দিন বাবা। খুব দুঃখের দিন।

কেন মা?

ঐ যে সাইরেনের আওয়াজ হচ্ছে, তার অর্থ হল, বিশাল এক ট্রন বাহিনী আসছে আমাদের কাছে।

থরথর করে কেঁপে উঠলাম আমি আতঙ্কে। মা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বললেন, বাবা আমার, সোনা আমার, কোনোদিন তোকে আমি বলি নি আমি তোকে কত ভালবাসি। কাল যদি আমি মরে যাই, তুই জেনে রাখিস, তুই ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার আর কোনো আপনজন নেই। পৃথিবীর সব ভালবাসাকে একত্র করলে যত ভালবাসা হয়, আমি তোকে তার থেকেও বেশি ভালবাসি। আর—আর—

মায়ের গলার স্বর কেঁপে উঠল হঠাৎ, ভাঙা গলায় বললেন, কাল যদি তুই মরে যাস, আমায় ক্ষমা করে দিস বাবা এমন একটা পৃথিবীতে তোকে জন্ম দেয়ার জন্যে। আমায় ক্ষমা করে দিস।

আবার ভয়ংকর করুণ রক্ত–শীতল–করা শঙ্খের ধ্বনি ভেসে এল দূর থেকে।

অন্ধকার ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসছে। সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে হু হু করে, তার মাঝে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। ছোট বাচ্চাদের মায়েরা গরম কাপড়ে জড়িয়ে দিয়েছে। ভোররাতে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে আনার জন্যে কেউ কেউ মৃদু আপত্তি করছে, কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই এখন। আমি মায়ের হাত ধরে একটা ঝাউগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। সবাই বের হয়ে এসেছে, ছড়িয়ে–ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পালিয়ে যাবার কোনো স্থান নেই এদের হাত থেকে। ইলি নতুন একটা জ্যামার তৈরি করার চেষ্টা করছে, যেটা দিয়ে অনুসন্ধানী রবোটদের বিভ্রান্ত করে দেয়া যাবে, কিন্তু সেটা তৈরি শেষ হয় নি। সব যন্ত্রপাতি জোগাড় করতে আরো বছরখানেক লেগে যাবার কথা, সেটা তৈরি করতে পারলে এক জন দু'জন খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে পাহাড়ে লুকিয়ে ফেলা যেত। কিন্তু সেটা এখনো তৈরি হয় নি, আগেই ট্রনেরা চলে এসেছে। পুরোপুরি এখন আমাদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। কে জানে কী করবে ট্রনেরা। কতজন মানুষকে মারবে, কী ভাবে মারবে!

সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হয় যেন অদৃশ্য কোনো বক্তা কথা বলছে আর সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে তার কথা। হালকা কুয়াশায় মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে সবাই। শিশুগুলোও জানি কেমন করে বুঝে গেছে ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটবে কিছুক্ষণের মাঝে। কেউ আর কাঁদছে না, বিরক্ত করছে না, চুপ করে অপেক্ষা করছে মায়ের হাত ধরে।

প্রথমে এল একটা ছোট প্লেন। খুব নিচু দিয়ে উড়ে গেল সেটি, ইতস্তত কয়েকটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ফোরক ফেলল আশেপাশে। প্রচণ্ড শব্দ করে বিস্ফোরণ হল। আগুনের হলকা উঠে গেল আকাশে। মা ফিসফিস করে বললেন, ভয় দেখাচ্ছে আমাদের। সব সময় ভয় দেখায় প্রথমে।

এরপর মাঝারি আকারের একধরনের প্লেন উড়ে এল, দেখে মোটেও প্লেন মনে হয় না, মনে হয় কোনো বড় জাহাজ ভুল করে আকাশে উঠে গেছে। এই প্লেনগুলো থেকে প্যারাসুটে করে ছোট ছোট রবোট নামতে থাকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে। মা আবার ফিসফিস করে বললেন, অনুসন্ধানী রবোট।

রবোটগুলো আমাদের সবাইকে ঘিরে নেয় প্রথমে, তারপর আরো কাছাকাছি একত্র করে আনে। কেউ কেউ নিশ্চয়ই ভয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, কারণ ইতস্তত গুলির আওয়াজ আর মানুষের আর্তনাদ শোনা যেতে থাকে কিছুক্ষণ। একসময়ে আবার নীরব হয়ে যায় চারদিক। যারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, সবাইকে নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে অনুসন্ধানী রবোট।

ট্রনেরা এল ছোট ছোট দলে, চমৎকার একধরনের মহাকাশযানে করে। ধবধবে সাদা মহাকাশযান, দু'পাশে ছোট দুটি পাখা, পিছনে শক্তিশালী ইঞ্জিন। সমুদ্রের বালুতটে খুব সহজে নেমে স্থির হয়ে যায় মহাকাশযানগুলো। দরজা খুলে নেমে আসে ট্রন নারী–পুরুষ। আমি আগে কখনো ট্রন দেখি নি, ভেবেছিলাম তাদের চেহারা হবে ভয়ংকর নিষ্ঠুর। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম তারা দেখতে ঠিক আমাদেরই মতো, হয়তো গায়ের রং একটু স্বচ্ছ, চোখের রং গাঢ় নীল, নাকটা একটু বেশি ঋজু, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। ট্রন নারী–পুরুষেরা নেমে সমুদ্রের পানিতে খেলা করতে থাকে, বালুতট থেকে ঝিনুক কুড়ায়, হালকা স্বরে হাসি–তামাশা করে পানীয়তে চুমুক দেয়। কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। দেখে একটি বারও মনে হয় না কোনো নৃশংস অভিযানে এসেছে এই হাসিখুশি মানুষগুলো।

www.amarboi.com

সাহায্যকারী রবোট এসেছে বেশ কয়টি। সেগুলো এর মাঝে কয়টি বড় বড় টেবিল পেতেছে সমুদ্রতটে। কিছু যন্ত্রপাতি দাঁড় করিয়েছে আশেপাশে, আশ্চর্য সুন্দর সেই সব যন্ত্রপাতি, কী কাজে আসে কে জানে! ছোট ছোট উজ্জ্বল রঙের কয়েকটা ঘর তৈরি করল কিছু টেবিলকে ঘিরে। কিছু বিচিত্র ধরনের বাক্স নামাল মহাকাশযান থেকে। উজ্জ্বল কিছু খাঁচা। দেখে মনে হতে থাকে সমুদ্রতীরে আজ বুঝি মেলা বসেছে।

রবোটগুলো আশ্চর্য দক্ষতায় তাদের কাজ শেষ করে একপাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। ট্রনগুলো তখন কাজ শুরু করে নিজেদের। কয়েকজন ধবধবে সাদা পোশাক পরে ছোট ছোট ঘরগুলোতে ঢুকে পড়ে। অন্যেরা টেবিলের পাশে বসে যন্ত্রপাতি নিয়ে। কয়েকজন হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। তাদের পিছে পিছে থাকে দেহরক্ষী রবোট।

একটি ট্রন মেয়ে এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। হেঁটে হেঁটে আমাদের খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। এত কাছে যে আমি তার নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাই। একমাথা কালো চুল সমুদ্রের বাতাসে উড়ছে। স্বচ্ছ কোমল গায়ের রং, গাঢ় নীল চোখ, লাল ঠোঁট। কী চমৎকার শরীর মেয়েটির! নিও পলিমারের পোশাকে ঢাকা সুঠাম দেহ। ভরাট বুক নিঃশ্বাসের সাথে উঠছে–নামছে। মেয়েটি আমাদের উপর চোখ বুলিয়ে নেয়—তার দৃষ্টি স্থির হয় কিছু শিশুর উপর। আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয় তাদের। কিছু একটা বলে ট্রন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষায়, মনে হয় সুরেলা গলায় গান গাইছে কেউ।

দেহরক্ষী রবোটগুলো এবারে এগিয়ে আসে শিশুদের দিকে, হাতের অস্ত্র তাক করে।

আমাদের ঠিক পাশেই ছিল লাবানা তার তিন বছরের মেয়ে ইলোনাকে নিয়ে। হঠাৎ সে ইলোনাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে, না-না—

ট্রন মেয়েটি এক হাতে তার অস্ত্রটি লাবানার দিকে তাক করে গুলি করল আশ্চর্য দক্ষতায়। শিস দেয়ার মতো একটা শব্দ হল, আর লাবানা ছিটকে পড়ল বেলাভূমিতে। টকটকে লাল রক্তে ভিজে গেল খানিকটা মাটি।

আমি এর আগে কখনো হত্যাকাণ্ড দেখি নি, গা গুলিয়ে বমি এসে গেল হঠাৎ। লাবানার দেহ ছটফট করছে, তার মাঝে দেহরক্ষী রবোট এসে এক হ্যাঁচকা টানে ইলোনাকে টেনে সরিয়ে নিল। চিৎকার করে কাঁদল ইলোনা, আম্মু—আম্মু গো—

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, চোখ বন্ধ করে ফেললাম তাড়াতাড়ি। মাকে শক্ত করে ধরে রেখেছি আমি, মা কাঁপছেন থরথর করে, ফিসফিস করে বলছেন, হে ঈশ্বর, পরম সৃষ্টিকর্তা, দয়া কর—দয়া কর—রক্ষা কর এই নৃশংস পশুদের থেকে।

আমি ভেবেছিলাম জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাব আমি। কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই কেমন জানি বোধশক্তিহীন হয়ে গেলাম। নিষ্ঠুরতা আর হত্যাকাণ্ড দেখে কেমন জানি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। চোখের পলক না ফেলে দেখলাম কী অবলীলায় ট্রন নারী-পুরুষেরা মানুষ হত্যা করে, দেহরক্ষী রবোটেরা কোনো শিশুকে সরিয়ে নেবার সময় তাদের বাবা-মা যদি এতটুকু বাধাও দিয়েছে, সাথে সাথে হত্যা করেছে তাদের।

সব শিশুদের সারি বেঁধে দাঁড় করানো হয়েছে। এক জন এক জন করে পরীক্ষা করছে ট্রন মানুষেরা তাদের বিচিত্র যন্ত্র দিয়ে। তারপর পাশের ঘরগুলোতে পাঠিয়ে দিচ্ছে, সেখানে কী করছে তাদের? রক্ত-শীতল-করা স্বরে আর্তনাদ করছে কেন শিশুগুলো?

ঘরগুলোর ভেতর থেকে সাহায্যকারী রবোটেরা মাঝারি আকারের কিছু বাক্স মহাকাশযানে তুলতে থাকে। কী আছে ঐ বাক্সগুলোতে?

আমরা কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। একসময় লক্ষ করি, ট্রনদের একটা দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কিছু পুরুষ এবং কিছু রমণী, আলগোছে একটা অস্ত্র ধরে রেখেছে হাতে, হাসতে হাসতে কথা বলছে তারা। আমাদের কাছাকাছি এসে আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকায়। কী খুঁজছে, কাকে খুঁজছে কে জানে। মা ফিসফিস করে বললেন, সুন্দরী মেয়ে খুঁজছে এখন।

সত্যিই তাই। আবিনাকে ধরে নিয়ে গেল, দুরিণের বড় মেয়েটিকে ধরে নিয়ে গেল, শুকে ধরে নিয়ে গেল। শুধু সুন্দরী মেয়ে নয়, সুদর্শন পুরুষদেরও ধরে নিয়ে গেল ট্রনেরা। ক্রিকি বাধা দেয়ার চেষ্টা করছিল, সাথে সাথে গুলি করে মেরে ফেলল তাকে। খাঁচার মতো কিছু জিনিস নামিয়েছিল, এখন বুঝতে পারলাম কেন। মানুষকে যখন পশুর মতন খাঁচায় ভরে নেয়া হয়, তার থেকে হৃদয়হীন করুণ কোনো দৃশ্য হতে পারে না। খাঁচারশিকগুলো ধরে রেখে পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল আবিনা। দাঁড়িয়ে রইল দুরিণের বড় মেয়েটি। দাঁড়িয়ে রইল শু। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম আবার, শুনতে পেলাম মা বলছেন ফিসফিস করে, শক্তি দাও হে সৃষ্টিকর্তা, শক্তি দাও, শক্তি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাকাশযানে সবকিছু তুলে নেয়া হয়েছে।

মায়ের কথা শেষ হবার আগেই গুলি শুরু হল। মাথা নিচু করে শুয়ে পড়ার প্রবল ইচ্ছে দমন করে আমি চোখ বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বৃষ্টির মতো গুলি হচ্ছে, মানুষের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে আসে। আমি তার মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকি। মৃত্যু আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আমি তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, ইচ্ছে করলেই সে আমাকে স্পর্শ করতে পারে। সে কি আমাকে স্পর্শ করবে? আলিঙ্গন করবে?

হঠাৎ মনে হল কিছু আসে-যায় না। আমি বেঁচে থাকি বা মরে যাই কিছুতেই কিছু আসে-যায় না। আমি চোখ খুলে তাকালাম। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে আগুনের ফুলকির মতো বুলেট ছুটে আসছে আমাদের দিকে। যারা গুলি করছে তাদের মুখের দিকে তাকালাম। তাদের চোখে কৌতুক। তাদের মুখে হাসি। আমি অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। মা সত্যিই বলেছেন। এটি একটি খেলা। অনুসন্ধানকারী রবোটগুলো উঠে গেছে তাদের বেঢপ জাহাজের মতো দেখতে প্লেনটিতে। অল্প কয়জন ট্রন দাঁড়িয়ে আছে নিচে। হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তাক করে রেখেছে আমাদের দিকে। মা কাঁপা গলায় ফিসফিস করে বললেন, যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে গুলি করবে আমাদের, মেরে ফেলবে যতজনকে সম্ভব।

আমার হাতে একটা চাপ দিয়ে আবার বললেন, ভয় পাস নে বাবা, মৃত্যু একবারই আসে।

আমি ভয় পাচ্ছি না মা।

যখন গুলি করা শুরু করবে তখন খবরদার মাথা নিচু করবি না, উবু হয়ে বসে যাবি না, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবি না—

কেন মা?

যারা মাথা নিচু করে বা শুয়ে পড়ে, তাদের ট্রনেরা গুলি করে মেরে ফেলে সবার আগে।

কেন মা?

জানি না। মনে হয় এটা তাদের একটা খেলা। শেষ মহাকাশযানটি আকাশে উঠে যাবার পরও সবাই দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। ইলি একটু এগিয়ে আসে, একটা বড় পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় বলল, যারা বেঁচে আছ তারা শোন, ঐ ঘরগুলোতে কেউ যেন না যায়—

একটি মা পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছিল, তাকে শক্ত করে ধরে ফেলল দু'জন।

আমার মা এগিয়ে গেলেন ইলির দিকে। ইলি উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকাল মায়ের দিকে। দেখে মনে হচ্ছিল সে চিনতে পারছে না মা'কে। এক জন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। ইলি ভাঙা গলায় বলল, আবার কি দাঁড়াতে পারব আমরা? পারব?

মা মাথা নাড়লেন, পারতে হবে ইলি।

ভয়ংকর একটা আর্তচিৎকার শোনা গেল। হঠাৎ—একটি মা ছুটে ঢুকে পড়েছে ঐ ঘরটিতে। কিছু একটা দেখেছে সেখানে। সবাই ছুটে যাচ্ছে এখন।

মা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, কী আছে ঐ ঘরে ইলি?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইলি ভাঙা গলায় বলল, আমি জানি না। খবর পেয়েছিলাম একটা ওষুধের বিক্রিয়ায় ট্রন শিশুদের হৃৎপিণ্ডে কী একটা সমস্যা হচ্ছে। মনে হয়—

কি?

মনে হয় বাচ্চাদের বুক কেটে হৃৎপিণ্ড বের করে নিয়ে গেছে।

আমার মা মুখ ঢেকে বসে পড়লেন। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। দুঃখ–কষ্ট–বেদনা কিছুই আর আমাকে স্পর্শ করছে না—কিছুই না।

৩. ঝড়ের রাত

ট্রনদের আক্রমণের পর তিন মাস কেটে গেছে, সেই ভয়ংকর বিভীষিকার স্মৃতির উপর সময়ের প্রলেপ পড়তে শুরু করেছে। তবে সবার জন্যে নয়। কয়েকটি মা সেই ঘটনার পরপরই সমুদ্রের পানিতে আত্মাহুতি দিয়েছে, তাদের শিশু–পুত্র–কন্যাদের পরিণতিটুকু কিছুতেই তারা ভুলতে পারে নি। কয়েকজন মা এবং বাবার খানিকটা করে মস্তিষ্ক–বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যাদের ধরে নিয়ে গেছে, তাদের প্রিয়জনের মানসিক অবস্থা সম্ভবত আর কখনোই স্বাভাবিক হবে না। তাদের বেশির ভাগই প্রায় সর্বক্ষণ একটি গভীর যন্ত্রণার মাঝে সময় কাটায়।

অন্যেরা মোটামুটি সামলে নিয়েছে। মানুষের সহ্য করার ক্ষমতার নিশ্চয়ই কোনো সীমা নেই, বিশেষ করে দুঃখী মানুষের। আর আমাদের মতো দুঃখী মানুষ আর কে হতে পারে?

আমার মা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের কাজটি ছেড়ে দিয়েছেন। ট্রনদের আক্রমণে সেটিতে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে, সারতে সময় নেবে। ট্রনদের আক্রমণে অনেক শিশু অনাথ হয়েছে, মা তাদের জন্যে একটা অনাথাশ্রম খুলেছেন। আমি খামারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাকে সেখানে সাহায্য করি।

সেদিন ভোরবেলা থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে মেঘ কেটে পরিষ্কার না হয়ে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল, তার সাথে ঝড়ো হাওয়া। মা বাইরে তাকিয়ে বললেন, কুনিল, বৃষ্টির ধরনটা ভালো লাগছে না। আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তিটা কি?

আমাদের সত্যিকার কোনো রেডিও টেলিভিশন স্টেশন নেই। জরুরি প্রয়োজনে বিজ্ঞপ্তি দেয়ার জন্যে শর্ট ওয়েভে কিছু ভিডিও সিগনাল পাঠানো হয়। আলাদা করে টেলিভিশন কারো নেই, কম্পিউটারের মনিটরে ভিডিও সিগনালটি দেখতে হয়। আমি দেখার চেষ্টা করলাম, আবহাওয়া খারাপ বলে ভিডিও সিগনালটিও খুব খারাপ। তবু বুঝতে পারলাম সমুদ্রে একটা নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। সেটা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে আমাদের এলাকায় আসতে পারে। আমি মাকে খবরটা জানালাম। মা চিন্তিত মুখে বললেন, বাচ্চাদের তাহলে সরিয়ে ফেলা দরকার।

কোথায় সরাবে মা?

আরো ভেতরে। স্কুলঘরটা যথেষ্ট উঁচু নয়, জলোচ্ছ্বাস হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। একটা উঁচু জায়গায় রাত কাটানো দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা একটি রেনকোট পরে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। আমি বললাম, দাঁড়াও মা, আমিও যাই তোমার সাথে।

যাবি? চল। মা সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। এই ঝড়ো হাওয়ার মাঝে উন্মত্ত সমুদ্রের ধার ঘেঁষে একা একা যেতে নিশ্চয়ই মায়ের একটু ভয় ভয় করছিল। আমার মা খুব সাহসী মহিলা, প্রয়োজন হলে খেপা সিংহীকেও খালি-হাতে জাপটে ধরবেন, কিন্তু ঝড়-বৃষ্টিকে খুব ভয় পান। আমার ঠিক উল্টো। ঝড়-বৃষ্টি আমার অসম্ভব ভালো লাগে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে যখন সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে, আমি আমার রক্তের মাঝে একধরনের উন্মত্ত আনন্দের ডাক শুনতে পাই।

সমুদ্রের তীর ঘেঁষে আমরা হেঁটে যাই। আকাশে কেমন একটা লালচে রং। সমুদ্র উত্তাল হয়ে আছে, বড় বড় ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। ঝড়োহাওয়া আমাদের উড়িয়ে নিতে চায়। আমরা যখন অনাথাশ্রমের স্কুলঘরটিতে পৌঁছেছি, তখন দু'জনেই শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি।

বাচ্চাগুলো আমার মা'কে দেখে খুব খুশি হল। মা একটা আগুন তৈরি করে হাত-পা সেঁকে একটু গরম হয়ে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। জনা পঞ্চাশেক বিভিন্ন বয়সী বাচ্চাকে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় মাইল দুয়েক ভেতরে একটা নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর করা খুব সহজ কথা নয়। যখন কাজ শেষ হয়েছে, তখন বেলা পড়ে এসেছে। কয়েকজন স্থানীয় মানুষকে দায়িত্ব দিয়ে মা ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এক জন বলল, এই ঝড়-বৃষ্টিতে ফিরে যাবেন কি, রাতটা কাটিয়ে যান।

মা বললেন, না গো, ফিরে যাই। নিজের বাড়ি না হলে ঘুম আসতে চায় না।

আমরা যখন পথে নেমেছি তখন ঝড়ের বেগ আরো অনেক বেড়েছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সুচের মতো বিঁধছে শরীরে। আকাশে কেমন জানি একটা ঘোলাটে লাল রং, সমুদ্রে কালচে অশুভ ছায়া। বড় বড় ঢেউ এসে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ছে তীরে। আমি বুকের ভেতর একধরনের উন্মত্ততা অনুভব করি। দুই হাত উপরে তুলে ঝড়ো হাওয়ার সাথে এক পাক নেচে মাকে বললাম, কী সুন্দর ঝড়!

মা গলা উঁচিয়ে বললেন, কি বাজে কথা বলিস! ঝড় আবার সুন্দর হয় কেমন করে?

আমি মায়ের কথায় কান না দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললাম, আয় আয় আয়রে—আরো জোরে আয়!

মা বললেন, চুপ কর্—চুপ কর্ অলক্ষুণে ছেলে!

আমি আবার চিৎকার করে বললাম, ভেঙে ফেল সবকিছু। ধ্বংস করে ফেল পৃথিবী—

মা আমাকে ধমক দিয়ে কী-একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থেমে গিয়ে অবাক হয়ে বললেন, কে? কে ওটা বসে আছে এই ঝড়-বৃষ্টিতে?

কোথায়?

মা হাত তুলে সমুদ্রতীর দেখালেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। সমুদ্রের তীরে বালুবেলায় গুটিসুটি মেরে কে যেন বসে আছে। এত দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে লোকটির গায়ে কোনো কাপড় নেই। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ একেক বার খুব কাছে এসে আছড়ে পড়ছে। ঝড়ের বেগ আরো বাড়লে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে উত্তাল তরঙ্গ। মা বললেন, ডাক্ দেখি লোকটাকে।

আমি চিৎকার করে ডাকলাম, কে ওখানে? ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জনে আমার গলার স্বর চাপা পড়ে গেল, লোকটি ফিরে তাকাল না।

মা বললেন, আহা, কোনো পাগল মানুষ?

আমি বললাম, হতে পারে আত্মহত্যা করতে এসেছে।

মা আমার দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে বললেন, চল্ দেখি গিয়ে।

আমার মা, যিনি ঝড়–বৃষ্টি–ঘূর্ণিঝড়কে এত ভয় পান তাঁর জন্যে এই ঝড়ের মাঝে সমুদ্রতীরে যাওয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সাহসের কাজ। আমি দেরি না করে সমুদ্রতীরে ছুটতে থাকি। ''হে পরম করুণাময় ঈশ্বর'' জপতে জপতে আমার মা পিছু পিছু আসতে থাকেন।

মানুষটির কাছে এসে প্রথম যে জিনিসটি চোখে পড়ল, সেটি হচ্ছে মানুষটি পুরোপুরি নগ্ন। মানুষ সাধারণত নগ্নতাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু এই মানুষটির বসার ভঙ্গিটিতে নগ্নতা ঢেকে রাখার কোনো চেষ্টা নেই। বৃষ্টির ছাঁটে সে ভিজে চুপসে গেছে, কিন্তু সে পুরোপুরি নির্বিকারভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? কে ওখানে?

আমার গলার স্বর শুনে লোকটি ঘুরে আমার দিকে তাকাল, আমি অবাক হয়ে দেখলাম, অপূর্ব সুন্দর একটি তরুণ। আমি আমাদের সবাইকে চিনি, এই তরুণটি ভিন্ন কোনো অঞ্চলের। এত সুন্দর চেহারা, নিশ্চয়ই কোনো ট্রন। আমি এক পা পিছিয়ে এসে আবার জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ?

তরুণটি কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি পিছনে তাকালাম, মা অনেক পিছনে পড়ে গেছেন, ঝড়োহাওয়ার সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করে কোনোমতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কে? কে লোকটা?

মনে হয় ট্রন।

ট্রন? মা চমকে উঠলেন, ট্রন কোথা থেকে আসবে?

দেখ না মা, চেহারা অন্যরকম।

মা এবারে কাছে এগিয়ে গেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তরুণটি কোনো উত্তর দিল না। মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ট্রন?

তরুণটি কোনো উত্তর দিল না, একটু অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার মা যে এক জন মহিলা এবং তার সামনে যে নগ্নতাকে একটু আড়াল করা দরকার, মনে হয় সেটাও সে জানে না।

দমকা হাওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ বৃষ্টির বেগ অনেক বেড়ে গেল, তরুণটি শীতে একটু কেঁপে উঠে ধীরে ধীরে হাত দু'টি বুকের উপর দিয়ে নিয়ে নিজেকে শীত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। বৃষ্টির পানি তার চুল ভিজিয়ে চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

মা আমাকে বললেন, ছেলেটিকে বাসায় নিতে হবে, এখানে তো ফেলে রাখা যাবে না।

আমি বললাম, কেমন করে নেবে মা, মনে হয় পাগল।

মা নিজের রেনকোটটা খুলে, ভেতর থেকে চাদরটা বের করে তরুণটার কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগিয়ে গেলেন। বললেন, তুমি চল আমার সাথে। তরুণটি স্থির এবং কেমন জানি বিষণ্ণ ভঙ্গিতে আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মা এবারে তার হাত ধরে তোলার চেষ্টা করলেন। তরুণটি বেশ সহজেই উঠে দাঁড়াল। মা হাতের চাদরটি দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন, তরুণটি বাধা দিল না। মা আবার বললেন, তুমি এস আমার সাথে।

তার হাত ধরে আকর্ষণ করতেই তরুণটি ছোট পদক্ষেপে হাঁটতে থাকে। মা তার হাত ধরে বাসার দিকে যেতে থাকেন।

রাস্তায় উঠে মা তরুণটির হাত ছেড়ে দেন, তরুণটি ছোট ছোট পদক্ষেপে আমাদের পিছু পিছু হাঁটতে থাকে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যায় না, কিন্তু তার হাঁটার ভঙ্গিটিতে একটি আশ্চর্য নির্লিপ্ততা। মনে হয় পৃথিবীর কোনো কিছুতে তার কোনো আকর্ষণ নেই।

প্রচণ্ড ঝড়োহাওয়া আমাদের উড়িয়ে নিতে চায়, তার মাঝে মাথা নিচু করে কোনোমতে বাসায় পৌঁছাই। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ঘরের আলো নিবুনিবু করছে, আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারটি প্রায় প্রাগৈতিহাসিক, ঝড়-বৃষ্টি হলে বড় শর্ট সার্কিট হয়ে পুরো এলাকা অন্ধকার হয়ে যায়। মনে হয় আজকেও সেরকম কিছু-একটা হবে। মা ঝুঁকি নিলেন না, দেরাজ থেকে মোমবাতি বের করে জ্বালিয়ে নিলেন। প্রায় সাথে সাথেই বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। ঘরের ভিতর ছোট মোমবাতির আলোতে চাদর জড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণটিকে অত্যন্ত রহস্যময় দেখাতে লাগল। সে স্থির দৃষ্টিতে মোমবাতির শিখাটির দিকে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় চোখের পলক পড়ছে না।

মা একটি শুকনা তোয়ালে নিয়ে এসে বললেন, বাবা, শরীরটা মুছে নাও।

তরুণটি মায়ের কথা বুঝতে পারল বলে মনে হল না, মা তখন নিজেই তার শরীরটা মুছে দিয়ে আরেকটা শুকনা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তরুণটি দুই হাত দিয়ে চাদরটি জড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

রাতে তরুণটি কিছু খেল না। খাবারের আয়োজন আহামরি কিছু ছিল না; স্যুপ, আলুসেদ্ধ ও শুকনা মাংস, কিন্তু তরুণটিকে খাবারের টেবিলের কাছেই আনা গেল না। মা স্যুপের বাটিটা নিয়ে তার মুখে কয়েকবার তুলে দেয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে প্রত্যেকবারই তার মুখ সরিয়ে নিল।

আমি বললাম, মনে হয় অনেক ভালো খাবার খেয়ে অভ্যাস, তোমার স্যুপ খেতে পারছে না।

মা উষ্ণ হয়ে বললেন, বাজে বকিস না। আমার স্যুপ যে খেয়েছে, সে কখনো তার স্বাদ ভোলে নি।

কথাটি সত্যি, শুধু স্যুপ নয়, মা সবকিছু খুব ভালো রান্না করেন।

রাত বাড়ার সাথে সাথে ঝড়ের প্রকোপ আরো বেড়ে যেতে থাকে। আমি কয়েকবার ভিডিও বুলেটিনটি শুনতে চেষ্টা করলাম, ঘরে বিদ্যুৎ নেই বলে খুব লাভ হল না। ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস শুরু হওয়ার আগে পাহাড়ের চূড়োয় একটি লাল বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়, সেটি এখনো জ্বালানো হয় নি। মা প্রতি দুই মিনিটে একবার করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলছিলেন, হে করুণাময় সৃষ্টিকর্তা, রক্ষা কর, রক্ষা কর—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কাজ নেই বলে সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম। মা তরুণটির জন্যে একটি উষ্ণ বিছানা তৈরি করে দিলেন কিন্তু সে জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি নিজের বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঝড়ের শব্দ শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম ভাঙল মায়ের আর্তচিৎকারে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি, মা হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে আমাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, ওঠ্, ঘুম থেকে ওঠ্, সর্বনাশ হয়েছে, সর্বনাশ—

কী হয়েছে মা? কি?

পানি আসছে। পানি—

আমি লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলাম, আমাদের বাসাটি একটি পাহাড়ের পাদদেশে, বড় জলোচ্ছ্বাস এলে পুরো বাসাটি পানিতে তলিয়ে যাবার কথা। আগেও কয়েকবার আমরা খুব অল্প সময়ের মাঝে বাসা ছেড়ে পাহাড়ে উঠে গেছি। ব্যাপারটিতে সেরকম কোনো ভয় নেই, সত্যি কথা বলতে কি, আমার প্রত্যেকবারই কেমন একধরনের ফূর্তি হয়েছে। মায়ের কথা অবশ্যি ভিন্ন, তিনি আতঙ্কে অধীর হয়ে প্রত্যেকবারই মৃতপ্রায় হয়ে গেছেন।

আমি উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। গাঢ় অন্ধকার নেই, আবছা আলোতে বেশ দেখা যায়। সমুদ্র ফুঁসে উঠছে, বড় বড় ঢেউয়ে পানি অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। আমি পাহাড়ের উপরে তাকালাম, একটা লাল বাতি জ্বলছে এবং নিভছে। তার মানে মায়ের আতঙ্কটুকু অহেতুক নয়, সত্যি সত্যি বড় জলোচ্ছ্বাস আসছে।

আমি জুতো পরছিলাম, মা তাড়া দিলেন, এখন এত সাজগোজের দরকার কি?

সাজগোজ কোথায় দেখলে? খালিপায়ে যাব নাকি?

পাগল ছেলেটাকে নিতে হবে আবার।

আমার হঠাৎ তরুণটির কথা মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, কী করছে মা?

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুমায় নি?

না। ওঠ্ এখন, বের হতে হবে। মা ছুটে গিয়ে তরুণটির হাত ধরে টেনে আনলেন। সে একটু অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল, কিন্তু বের হয়ে আসতে আপত্তি করল না। বাইরে বৃষ্টিটা কমেছে, কিন্তু প্রচণ্ড বাতাস। আমি লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকি, পিছনে মা তরুণটিকে হাত ধরে আনছেন। একটু উঠে পিছনে তাকালাম, হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলাম, তরুণটি সোজা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর মা তারস্বরে চিৎকার করছেন। আমি ছুটে গিয়ে তরুণটিকে ধরার চেষ্টা করলাম, কিন্তু অসম্ভব শক্তি এই বিচিত্র তরুণটির। আমাকে প্রায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা সমুদ্রের দিকে হেঁটে গেল। ভয়ংকর একটা ঢেউ ছুটে আসছে। আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম, মুহূর্তে ঢেউটি এই তরুণটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে উন্মত্ত সমুদ্রে। কিন্তু একটা খুব বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, ভয়ঙ্কর ঢেউটি হঠাৎ করে ভেঙে গেল তার পায়ের কাছে। পানির ঢল হয়ে নিচে নেমে গেল ঢেউটি।

তরুণটি আরো এগিয়ে যায়, পানির বড় আরেকটা ঢেউ আবার আঘাত করতে এগিয়ে এসে পায়ের কাছে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কী আশ্চর্য। তরুণটি কেমন করে জানল এটি ঘটবে? কী বিচিত্র আত্মবিশ্বাসে সে এগিয়ে যাচ্ছে উন্মত্ত সমুদ্রের দিকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কী সহজে উন্মত্ত সমুদ্র বশ মেনে যাচ্ছে এই তরুণের কাছে!

আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মা আমার পাশে এসে দাঁড়ান। ফিসফিস করে বলেন, কুনিল। দেখেছিস?

কী হচ্ছে এটা মা? সত্যি কি হচ্ছে?

হ্যাঁ বাবা। আমি দেখে বুঝেছিলাম এ সাধারণ মানুষ নয়।

তাহলে কে?

ঈশ্বরের দূত। মা ফিসফিস করে প্রার্থনা শুরু করলেন, 'হে পরম করুণাময় ঈশ্বর। দয়া কর। দয়া কর। দয়া কর।'

আরেকটি ভয়াবহ ঢেউ ছুটে আসছে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো। তরুণটি ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যায় আর সেই ভয়াবহ জলরাশি আবার পায়ের কাছে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তরুণটি মাথা উঁচু করে হেঁটে যাচ্ছে, আর বিশাল জলরাশি মাথা নিচু করে পিছিয়ে যাচ্ছে। গায়ের সাদা চাদর উড়ছে বাতাসে, মনে হচ্ছে সত্যিই সে নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের আহ্বানে। তার সামনে মাথা নত করে ফেলছে প্রকৃতি, উন্মত্ত সমুদ্র, ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস।

মা আবার ফিসফিস করে বললেন, ঈশ্বর আমাদের দিকে মুখ চেয়ে তাকিয়েছেন। তাঁর দূত পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। দেখ্ কুনিল, তাকিয়ে দেখ্! হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!

আমি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলাম, কিন্তু তবু মায়ের কথার সাথে একমত হতে পারলাম না। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, এই পৃথিবীতে যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা হয়, এক জন ঈশ্বর থাকলে তিনি সেটা করতে দিতেন না। আর সেটা যদি করতে দিয়ে থাকেন, হঠাৎ করে একটি জলোচ্ছ্বাস থামিয়ে দেওয়ার জন্যে এক জন উলঙ্গ দূত পাঠিয়ে দেবেন না। আমাদের জন্যে ঈশ্বরের বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই। বিন্দুমাত্রও নয়।

এই তরুণটি মানসিক ভারসাম্যহীন একটি তরুণ। নির্বোধের মতো সে জলোচ্ছ্বাসের মাঝে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই মুহূর্তে জলোচ্ছ্বাস সরে গিয়েছে। মানসিক ভারসাম্যহীন এই তরুণ এক জন ভাগ্যবান তরুণ—অসম্ভব ভাগ্যবান এক জন তরুণ। তার বেশি কিছু নয়।

আমি অবাক বিস্ময়ে মানসিক ভারসাম্যহীন এই অস্বাভাবিক ভাগ্যবান তরুণটির দিকে তাকিয়ে থাকি।

৪. রুকাস

আমার মা বেশ খাটাখাটুনি করে তরুণটির জন্যে একটা পোশাক তৈরি করলেন। নীল রঙের একটা ট্রাউজার এবং বেশ কয়েকটি পকেটসহ ঢিলেঢালা একটা কোট। আমার মায়ের নানা ধরনের গুণ রয়েছে, কিন্তু পোশাক তৈরি তার মাঝে একটি নয়। তরুণটি সেটা বুঝতে পেরেছে মনে হল না, কারণ পোশাকটা চেষ্টা-চরিত্র করে তাকে পরিয়ে দেবার পর প্রথমবার তার মুখে একটি অভিব্যক্তি দেখা গেল। সে আমার মায়ের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে একটু হেসে দিল। মা উত্তেজিত হয়ে আমাকে বললেন, দেখলি? দেখলি? কত পছন্দ করল পোশাকটা।

আমি বললাম, তোমার এই পোশাক যদি পছন্দ করে, বুঝতে হবে এর মাথায় বড় ধরনের গোলমাল আছে।

মা একটু রেগে বললেন, বাজে বকিস না। কোথা থেকে এসেছে, কী রকম কাপড় পরে অভ্যাস কে জানে, একটু ঢিলেঢালা কাপড়ই ভালো।

তরুণটির চেহারা অসম্ভব সুন্দর, শুধুমাত্র সে কারণে আমার মায়ের তৈরি একটি বিচিত্র পোশাকেও তাকে চমৎকার মানিয়ে গেল। পোশাক শেষ করে মা এবারে তার খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার সাথে দেখা হয়েছে প্রায় আঠারো ঘন্টা হয়ে গেছে, এই দীর্ঘ সময়ে সে কিছু খায় নি। সময় নিয়ে নানারকম খাবার তৈরি করে মা আবার তরুণটিকে খাবার জন্যে ডেকে আনলেন। খাবার টেবিলে বসতে গিয়েও তরুণটিকে বেশ কসরত করতে হল বলে মনে হল। তার প্লেটে খাবার তুলে দেয়া হল এবং আমরা নানাভাবে তাকে খাবার মুখে দিতে ইশারা করতে থাকি, কিন্তু সে খাবার মুখে দিল না। আমি মাকে বললাম, মা, তোমার কথাই ঠিক। এ আসলেই ঈশ্বরের দূত। এ জন্যে কিছু খেতে হয় না। বাতাস খেয়ে থাকে।

মা আবার আমার উপর রেগে গেলেন, বললেন, বাজে বকিস না। কী খায়, কী খেয়ে অভ্যাস কে জানে, একটা কিছু দিলেই কি খেতে পারবে?

মা'কে খুশি করানোর জন্যেই কি না জানি না, তরুণটি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে এক টুকরা মাংস তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে খুব সাবধানে একটু কামড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে চিবুতে থাকে। তার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই খাবারটি তার পছন্দ হয়েছে কি না। আমরা যতক্ষণে আমাদের খাবার শেষ করলাম তরুণটি ততক্ষণ ঐ মাংসের টুকরাটি নিয়ে বসে রইল। ছোট শিশু যেরকম বড় একটি মিষ্টি হাতে নিয়ে বসে থেকে ধীরে ধীরে চুষে খেতে থাকে, তরুণটির খাওয়ার ধরনটি অনেকটা সেরকম।

খেতে খেতে মা তরুণটির সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন, এর নাম কুনিল। কু–নি–ল।

তারপর তরুণটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, তোমার নাম কি?

উত্তরে তরুণটি মধুরভাবে হাসল। মধুর হাসি নিশ্চয়ই কারো নাম হতে পারে না। মা আবার চেষ্টা করলেন, আমাকে দেখিয়ে বললেন, এর নাম কু–নি–ল। তারপর নিজেকে দেখিয়ে বললেন, আমার নাম লানা। আমি কুনিলের মা। তোমার নাম কি?

তরুণটি উত্তরে কিছু না বলে আবার মধুরভাবে একটু হেসে দিল।

আমি বললাম, এর নাম হচ্ছে মধুর হাসি—দেখছ না কেমন মধুরভাবে হাসছে!

মা বললেন, বাজে কথা বলবি না।

বোকা–হাসিও বলতে পার! বোকার মতো হাসি।

চুপ কর্।

সংক্ষেপে বুকাস! বুকাস নামটা খারাপ না। কি বল।

ফাজলেমি করবি না।

ঠিক আছে, তাহলে রুকাস! আমি তরুণটির দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম রুকাস।

তরুণটি প্রথমবার কথা বলল, আস্তে আস্তে বলল, রুকাস। এক জন মানুষের গলার স্বর এত সুন্দর হতে পারে, আমি নিজের কানে না শুনলে কখনো বিশ্বাস করতাম না। আমি নিজেকে দেখিয়ে বললাম, আমার নাম কুনিল।

তরুণটি আবার আস্তে আস্তে বলল, কুনিল।

আমি তরুণটিকে দেখিয়ে বললাম, তোমার নাম—রুকাস।

রুকাস।

নামটি নিশ্চয়ই তার পছন্দ হয়েছে, কারণ বেশ আপন মনে কয়েকবার বলল, রুকাস। রু–কাস। রু–কা–স। রুকাস।

মা উষ্ণ স্বরে বললেন, কেন ছেলেটিকে জ্বালাতন করছিস?

কিসের জ্বালাতন? নাম ছিল না, তাই নাম দিয়ে দিলাম।

মা হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে মাথা নাড়লেন।

বিকেলবেলা আমি তরুণটিকে নিয়ে হাঁটতে বের হলাম। কিরীণার বাসার পাশে দিয়ে যাবার সময় আমাদের দেখে কিরীণা ছুটে এল। তরুণটিকে দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, এত সুন্দর চেহারা তরুণটির, কিরীণা যে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে বিচিত্র কি? আমি আমার বুকে ঈর্ষার একটা সূক্ষ্ম খোঁচা বোধ করতে থাকি।

কিরীণা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, এ কে?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, কেউ জানে না এ কে।

কোথা থেকে এসেছে?

কেউ জানে না।

তাহলে কেমন করে এল?

সেটাও কেউ জানে না।

AMARBOI.COM

কিরীণা আমার বুকে একটা ছোট ধাক্কা দিয়ে বলল, ছাই ঠিক করে বল না কী হয়েছে? আমি তখন কিরীণাকে সবকিছু খুলে বললাম। গভীর রাতে তার সামনে সমুদ্রের ঢেউ কেমন করে পিছিয়ে যাচ্ছিল শুনে কিরীণার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গল্প শেষ করে আমি গলা নামিয়ে বললাম, মা মনে করে এ হচ্ছে ঈশ্বরের দূত।

কিরীণা বুকে হাত দিয়ে বলল, নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দূত। নিশ্চয়ই।

ছোট বাচ্চারা অর্থহীন কথা বললে বড়রা যেরকম করে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকায়, আমি ঠিক সেভাবে কিরীণার দিকে তাকালাম। কিরীণা আবার রাগ হয়ে আমার বুকে ধাক্কা দিয়ে বলল, তুমি বিশ্বাস কর না বলে অন্যেরাও বিশ্বাস করতে পারবে না?

আমি আর কোনো প্রতিবাদ করলাম না। কিরীণার অনেক অর্থহীন কথাবার্তা আমি সহ্য করি।

এখন তোমরা কোথায় যাও?

ইলির কাছে।

কেন?

দেখি ইলি কিছু বলতে পারে কি না। তুমি যাবে আমার সাথে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিরীণা একটু ইতস্তত করে রাজি হল।

তরুণটিকে দেখে ইলি খুব অবাক হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইলি, এ কি ট্রন?

মনে হয় না। এর চেহারা ট্রনদের মতো নয়।

তাহলে এ কে? কোথা থেকে এসেছে?

সেটা তো আমি জানি না। ইলি খানিকক্ষণ চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার কাছে নূতন একটা যন্ত্র এসেছে, সেটা দিয়ে পরীক্ষা করতে পারি।

কি যন্ত্র?

মানুষের জিন্স্ বিশ্লেষণ করে তার সম্পর্কে বলে দেয়। কোন জাতি, কোন দেশের মানুষ, কোথায় অবস্থান এইসব।

কেমন করে কাজ করে এটা?

এক ফোঁটা রক্ত দিতে হয়। দেখি, তোমারটা দিয়ে শুরু করি।

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম, একটি জটিল যন্ত্র থেকে একটা ছোট নল বের হয়ে এসেছে, তার মাথায় একটা সুচের মতন কী যেন। আঙুলটিতে সেটা দিয়ে ছোট একটা খোঁচা দিতেই লাল এক ফোঁটা রক্ত বের হয়ে আসে, সাথে সাথে ঘড়ঘড় করে যন্ত্রটার মাঝে শব্দ হতে থাকে, রক্তের ফোঁটাটি যন্ত্রের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়। সামনে স্ক্রিনে অসংখ্য সংখ্যা বের হয়ে আসে। ইলি ভুরু কুঁচকে সংখ্যাগুলো দেখে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখছ ইলি?

তোমার সম্পর্কে সবকিছু লিখে দিচ্ছে!

কিরীণা জিজ্ঞেস করল, কী লিখেছে?

এশীয় বংশোদ্ভূত পুরুষ। বয়স তেরো—

তেরো! আমি খুব অবাক হবার ভান করে বললাম, হতেই পারে না! আমি কমপক্ষে পনেরো।

ইলি চোখ মটকে বলতে শুরু করল, রক্তের গ্রুপ জিটা চৌদ্দ দশমিক চার, জিনেটিক কোড আলফা রো তিন তিন চার পাঁচ নয়—

এগুলোর মানে কি?

ইলি মাথা চুলকে বলল, আমিও ঠিক জানি না। তবে তুমি কোন এলাকা থেকে এসেছ সেটাও বলে দেবার কথা!

খানিকক্ষণ স্ক্রিনটা দেখে ইলি মাথা নাড়ল, তোমার পূর্বপুরুষেরা এসেছে ভারত মহাসাগরের ছোট একটা দ্বীপ থেকে। দ্বীপের অক্ষাংশ সাত দ্রাঘিমাংশ।

কিরীণা বলল, এবার আমারটা বের কর।

এক ফোঁটা রক্ত দিতে হবে কিন্তু।

ব্যথা করবে না তো?

না, ব্যথা করবে না।

কিরীণার রক্ত পরীক্ষা করেও বিশেষ নূতন কিছু জানা গেল না। সে মেয়ে, তার বয়স চৌদ্দ এ দু'টি তথ্য জানার জন্যে এরকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। তার পূর্বপুরুষেরা এসেছে উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে।

আমার আর কিরীণার রক্ত পরীক্ষা করে বোঝা গেল এই প্রাচীন এবং নড়বড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রটি মোটামুটিভাবে কাজ করে। এবারে তরুণটির রক্ত পরীক্ষা করার কথা। আমি তরুণটিকে ইঙ্গিত করলাম তার হাতটা টেবিলের উপর রাখার জন্যে। সে আপত্তি না করেই হাতটি এগিয়ে দিল। তরুণটির মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি, ছোট শিশুদের অর্থহীন আব্দার শোনার সময় বড়রা যেরকম মুখভঙ্গি করে, অনেকটা সেরকম।

তার আঙুল থেকে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে যন্ত্রটি অনেকক্ষণ নানারকম বিদঘুটে শব্দ করে একসময় স্ক্রিনে অসংখ্য লেখা শুরু হতে থাকে। ইলি ভুরু কুঁচকে সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাতে থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল ইলি?

কিছু-একটা গোলমাল হয়েছে। ঠিক করে কাজ করে নি যন্ত্রটা।

কেন?

লিখেছে এশীয় বংশোদ্ভূত পুরুষ। আদি বাসস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, রক্তের গ্রুপ কাপ্‌পা তেরো দশমিক নয়। জিনেটিক কোডটাও দিয়েছে কিছু-একটা। কিন্তু বয়সটা গোলমাল করে ফেলেছে।

কি গোলমাল?

ইলি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, বয়স লিখেছে দুই হাজার তিন শ’ নয়।

কিরীণা হি হি করে হেসে বলল, এর বয়স দুই হাজার?

দুই হাজার তিন শ’ নয়।

তোমার যন্ত্র এই সহজ জিনিসটাও জানে না যে এক জন মানুষের বয়স দুই হাজার তিন শ’ নয় হতে পারে না?

জানা উচিত ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, বয়সটা নেগেটিভ দুই হাজার তিন শ’ নয়। সামনে একটা মাইনাস চিহ্ন রয়েছে।

এবারে আমি আর কিরীণা দু'জনেই জোরে হেসে উঠলাম। শুধু যে বয়স দুই হাজারের বেশি সেটাই নয়, বয়সটা আরো উল্টোদিকে!

ইলি স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, এর আগে কখনো যন্ত্রটা ভুল করে নি। এখন কেন করল?

আমি তরুণটির দিকে তাকালাম, মুখে মৃদু একটা হাসি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠি, হঠাৎ করে আমার মাথায় খুব বিচিত্র একটা সম্ভাবনার কথা উঁকি দেয়। আমি ইলির দিকে তাকিয়ে বললাম, ইলি—

কি?

এটা কি হতে পারে যে এই তরুণটি—

এই তরুণটি কি?

আমি মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। ঘুরে তরুণটির দিকে তাকালাম, সে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, মুখে সেই মৃদু হাসিটি নেই, তার বদলে কেমন যেন গভীর বিষাদের ছাপ। সে কি বুঝতে পেরেছে আমি কী ভাবছি?

কিরীণা জিজ্ঞেস করল, এই তরুণটি কি?

না, কিছু না। আমি কথা ঘোরানোর জন্যে বললাম, তার সাথে কি কোনোভাবে কথা বলা যায় না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিরীণা বলল, আমি দেখি চেষ্টা করে। সে তরুণটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

তরুণটি হাসিমুখে কিরীণার দিকে তাকিয়ে রইল দেখে কিরীণা এবারে গলা উঁচিয়ে বলল, তোমার নাম কি—যেন জোরে কথা বললেই ভাষার ব্যবধান ভেঙে পড়ে। কিরীণার কাজকর্ম মাঝে মাঝে এত ছেলেমানুষি যে সেটি বলার নয়।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তরুণটি হঠাৎ তার সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বরে বলল, রুকাস!

কিরীণা চিৎকার করে বলল, এই তো কথা বলছে!

আমি কিছু বলার আগেই তরুণটি আবার ফিসফিস করে অনুচ্চ স্বরে বলল, নাম রুকাস আমার।

আমি একটু অবাক হয়ে রুকাসের দিকে তাকিয়ে দেখি। সত্যি তাহলে সে কথা বলার চেষ্টা করছে। উচ্চারণ ভঙ্গিটি কি বিচিত্র, প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা আলাদা করে বলছে, কথা বলার সময় ঠোঁট দু'টি মনে হয় নড়ছেই না। কথাগুলো মনে হয় আসছে গলার ভেতর থেকে।

ইলির বাসা থেকে সে রাতে যখন আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম তখন সেই বিচিত্র তরুণটি বেশ কিছু কথা শিখে গিয়েছে। তরুণটির স্মৃতি অত্যন্ত তীক্ষ্ম। একটি কথা একবার শুনলেই সেটি প্রায় নিখুঁতভাবে মনে রাখতে পারে।

দু' মাস পরের কথা। রুকাস এতদিনে বেশ কথা বলা শিখে গেছে। আমি আমার ক্রিস্টাল রিডারের একটি অংশে বৈদ্যুতিক চাপ পরীক্ষা করতে করতে তার সাথে কথা বলছিলাম, কথাবার্তায় ঘুরেফিরে আমি সবসময়েই তার ব্যক্তিগত ইতিহাস জানতে চাই, যেটা সে সযত্নে এড়িয়ে যায়। আমি সম্ভবত সহস্রতম বার জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে রুকাস?

AMARBOI.COM

আমি রুকাস।

সেটা তো জানি, কিন্তু তুমি আসলে কে?

আমি আসলে রুকাস।

তোমার কি ভাই আছে?

তুমি আমার ভাই।

তোমার কি সত্যিকার ভাই আছে? সত্যিকার বোন? মা-বাবা? আছে?

রুকাস চুপ করে থেকে অল্প একটু হাসে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করি, তুমি আমাদের কাছে কেন এসেছ?

রুকাস কোনো উত্তর দেয় না। আমি আবার জিজ্ঞেস করি, তুমি কি আবার চলে যাবে?

রুকাসের মুখ তখন হঠাৎ করে বিষণ্ন হয়ে যায়। আমি বুঝতে পারি একদিন সে যেরকম হঠাৎ করে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ করে চলে যাবে।

আমার কেমন জানি একটু মন-খারাপ হয়ে যায়।

কয়দিন থেকে চারদিকে একটা চাপা ভয়। খবর এসেছে মধ্য অঞ্চলে ট্রনেরা হানা দিয়েছে। এবারে শিশু নয়, অসংখ্য কিশোর-কিশোরীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। তারা যদি আবার আমাদের এখানে আসে? সাধারণত এক জায়গায় তারা এত অল্প

সময়ের মাঝে দ্বিতীয় বার আসে না, কিন্তু এসব ব্যাপারে কেউ কি তার সত্যিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে!

ভেবেছিলাম আমাদের চাপা অশান্তি রুকাসকে স্পর্শ করবে, কিন্তু তাকে স্পর্শ করল না। আমরা যখন বিষণ্ন গলায় ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতাম, ভয়ঙ্কর সেই মুহূর্তগুলো নিয়ে আলোচনা করতাম, রুকাস সেগুলি কৌতূহল নিয়ে শুনত, কিন্তু কখনোই কোনো প্রশ্ন করত না। মাঝে মাঝে রুকাসকে দেখে মনে হত সে বুঝি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। যে ভয়ংকর বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে এবং ঘটনাক্রমে সে নিজেও যে এই বিপদের অংশ হয়ে গেছে, ব্যাপারটি যেন সে কখনো অনুভব করতে পারে নি।

তাই দু' সপ্তাহ পর যখন ভোররাতে আবার সেই ভয়াবহ শঙ্খধ্বনির মতো সাইরেন বেজে উঠল, রুকাসকে এতটুকু বিচলিত হতে দেখা গেল না। আমাকে জিজ্ঞেস করল, ওটা কিসের শব্দ?

ট্রনেরা আসছে।

ও।

রুকাস বিছানা থেকে ওঠার কোনো রকম লক্ষণ দেখাল না। বিছানায় আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। আমি তাকে ডাকলাম, রুকাস।

কি?

এখন আমাদের সবাইকে সমুদ্রতীরে যেতে হবে।

ও। রুকাস কোনো আপত্তি না করে বিছানা থেকে ওঠে, আমাকে বলল, চল যাই।

আমার মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রুকাসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তার মুখে ভয় বা আতঙ্কের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই, ব্যাপারটি আমার মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, দেখেছিস কুনিল? দেখেছিস? একটুও ভয় নেই মুখে।

দেখেছি মা।

কেন ভয় নেই? কেন?

ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। ছোট বাচ্চারা দেখ নি আগুনকে ধরতে যায়? সেরকম।

না না। মা মাথা নাড়লেন, রুকাস কিছু–একটা জানে, যেটা আমরা জানি না।

আমি রুকাসের দিকে তাকালাম, তার শান্তপ্রায় নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বড় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল রুকাস সত্যিই কিছু–একটা জানে, যেটা আমরা জানি না। সেই অজ্ঞাত জ্ঞানটুকু যখন আমরা জানব, তখন আমাদেরও কোনো ভয়ভীতি থাকবে না। রুকাসের মতো শান্তমুখে সমুদ্রতীরে বালুবেলায় ট্রনদের জন্যে অপেক্ষা করতে পারব।

ট্রনদের আক্রমণটুকু হল বড় নৃশংস। বড় বড় ছয়টি মহাকাশযানের মতো দেখতে একধরনের প্লেন নামল বালুবেলায়। ভেতর থেকে ছোট ছোট একধরনের রবোট নেমে এল প্রথমে—ছুটে গিয়ে সবাইকে ঘিরে ফেলল প্রথমে। ট্রনেরা নামল তারপর। গতবারের মতো হাসিখুশি নয়, চেহারায় ক্লান্তি এবং একধরনের বিতৃষ্ণা। দেহরক্ষী রবোটদের নিয়ে আমাদের কাছে হেঁটে আসতে থাকে ট্রন পুরুষ এবং মহিলারা। বারো থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনেরো বছরের কিশোর-কিশোরীদের দেখিয়ে দিতে থাকে আঙুল দিয়ে। সাথে সাথে দেহরক্ষী রবোটগুলো হ্যাঁচকা টানে তুলে নেয় নিজেদের ঘাড়ে। করুণ কান্নায় পুরো বালুবেলা আর্তনাদ করে ওঠে সাথে সাথে।

অত্যন্ত নৃশংসভাবে কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটাল ট্রন পুরুষ এবং মহিলারা, কান্নার শব্দ তাদের ভালো লাগে না—যারাই এতটুকু শব্দ করেছে; সাথে সাথে তাদের হত্যা করেছে আশ্চর্য নির্লিপ্ততায়।

আমি আর কিরীণা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিরীণা ফিসফিস করে বলল, কুনিল।

কি?

আমি যদি আজ মরে যাই—

অশুভ কথা মুখে আনতে নেই।

যদি মরে যাই, কিরীণা বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, তাহলে কোনোদিন তোমাকে বলার সুযোগ পাব না।

কী বলার সুযোগ পাবে না?

আমি তোমাকে—

কিরীণার কথা মুখে থেমে যায়, এক জন ট্রন মেয়ে লম্বা পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকি তার চোখে চোখ না ফেলতে, কিন্তু মেয়েটি খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রথমে কুলাককে, তারপর নিশ, তারপর কিরীণার দিকে আঙুল দেখিয়ে ঘুরে চলে গেল। দেহরক্ষী রবোট সাথে সাথে তিনজনকে ধরে উপরে তুলে নেয়। কিরীণা রক্তহীন মুখে আমার দিকে তাকাল। একটা হাত একবার বাড়িয়ে দিল আমার দিকে—যেন আমাকে একবার স্পর্শ করতে চায় শেষবারের মতো। চিৎকার করে পৃথিবী বিদীর্ণ করে দিতে চাইলাম আমি, পারলাম না, আমার মা জাপটে আমার মুখ চেপে ধরেছেন পিছন থেকে। ফিসফিস করে বলছেন, হে ঈশ্বর, করুণা কর। করুণা কর। করুণা কর।

রুকাস শান্ত চোখে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ সে যেন একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেল, আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু এটা তো করতে পারে না।

কেউ কোনো কথা বলল না, রুকাস সবার দিকে তাকাল, তারপর দুই পা সামনে এগিয়ে উচ্চস্বরে বলল, এটা তো করতে পার না তোমরা। ছেড়ে দাও সবাইকে, ছেড়ে দাও—

ট্রন মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে ফিরে তাকাল, রুকাসকে দেখে হকচকিয়ে গেল। হঠাৎ গুলি করার জন্যে হাতের অস্ত্রটি তুলেও থেমে গেল মেয়েটি। এত রূপবান একটি মানুষকে হত্যা করা সহজ নয়—বিশেষ করে একটা মেয়ের জন্যে।

ট্রন ভাষায় কী একটা বলল রুকাসকে। রুকাস মাথা নেড়ে বলল, ছেড়ে দাও সবাইকে। কাউকে নিতে পারবে না। কাউকে নিতে পারবে না।

ট্রন মেয়েটির মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে ওঠে, খানিকটা অবজ্ঞা, খানিকটা অবিশ্বাস, খানিকটা অন্ধ ক্রোধ। হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি তুলে গুলি করল রুকাসকে। ছোট শিশুরা নোংরা হাতে বড়দের ছোঁয়ার সময় বড়রা আলগোছে সরে গিয়ে যেভাবে নিজেকে রক্ষা করে, অনেকটা সেভাবে রুকাস সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করল, বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেড়ে দাও সবাইকে।

ট্রন মেয়েটি অবাক হয়ে একবার রুকাসকে, আরেকবার হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটির দিকে তাকাতে লাগল। কোনো মানুষ এই অস্ত্রটি থেকে এত সহজে নিজেকে রক্ষা করতে পারে সেটি এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না। মেয়েটি আবার অস্ত্রটি তুলে ধরে—রুকাস তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে আমাদের দিকে ঘুরে তাকায়, অনেকটা ব্যথাতুর গলায় বলে, ওরা আমার কথা শুনছে না।

আমি চিৎকার করে বললাম, সাবধান।

ট্রন মেয়েটি গুলি করল এবং আবার রুকাস সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করল। মেয়েটিকে বলল, তুমি আমাকে মারতে পারবে না। আর চেষ্টা কোরো না। ঠিক আছে?

মেয়েটা অবাক হয়ে রুকাসের দিকে তাকিয়ে থাকে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই বিস্ময়ের সাথে সাথে হঠাৎ আতঙ্কের একটা চিহ্ন পড়ছে তার মুখে।

রুকাস কিছুক্ষণ চারদিকে তাকাল। তারপর অনেকটা হাল ছেড়ে দেয়ার মতো করে মাথা নাড়ল। চারদিক থেকে ট্রনেরা ছুটে আসছে রুকাসের দিকে, সবাই বুঝতে পেরেছে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে এখানে।

এরপর রুকাস যেটি করল আমরা কেউ তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। সে নিজের হাতটা মুখের কাছে তুলে কনুইয়ের কাছে কামড়ে ধরে খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিল, একঝলক রক্ত বের হয়ে তার মুখ, দাঁত, বুকের কাপড় রক্তাক্ত হয়ে গেল মুহূর্তে। রুকাস ভ্রূক্ষেপ করল না, রক্তাক্ত অংশটি স্পর্শ করে চামড়ার নিচে থেকে চকচকে ছোট একটা জিনিস বের করে আনল। রুকাস তার শরীরে এই জিনিসটি লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন।

জিনিসটি কী আমরা জানি না। এটা দিয়ে কী করা হয় তাও আমরা জানি না। রুকাস সেই ছোট ধাতব জিনিসটা হাতে নিয়ে মহাকাশযানের মতো দেখতে বিশাল প্লেনটির দিকে লক্ষ করে কোথায় যেন টিপে দেয়, সাথে সাথে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে পুরো মহাকাশযানটি চোখের পলকে ধ্বংস হয়ে গেল। জ্বলন্ত আগুনের বিশাল একটা গোলক সবাইকে আগুনের হলকার স্পর্শ দিয়ে উপরে উঠে গেল।

আমরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। ট্রনেরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। রুকাস হাতের ছোট ধাতব জিনিসটা দ্বিতীয় মহাকাশযানের দিকে লক্ষ করে মুহূর্তে সেটিকে ধ্বংস করে দিল। তারপর তৃতীয়টি।

রুকাস এবারে ট্রনদের দিকে তাকিয়ে বলল, সবাইকে এখানে ছেড়ে দিয়ে তোমরা যাও। এক্ষুনি যাও।

ট্রনেরা তার কথা বুঝতে পারল না সত্যি, কিন্তু সে কি বলতে চাইছে বুঝতে তাদের কোনো অসুবিধে হল না। হঠাৎ করে প্রাণভয়ে সবাই ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে তারা পিছনে তাকায়, তারপর আবার ছুটতে থাকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়, উঠে গিয়ে আবার ছুটতে থাকে। এক জনের মাথার উপর দিয়ে আরেকজন ছুটতে থাকে। এক জনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে আরেকজন ছুটতে থাকে। হাতের অস্ত্র ফেলে তারা ছুটতে থাকে। দেহরক্ষী রবোট, অনুসন্ধানকারী রবোটকে পিছনে ফেলে তারা ছুটতে থাকে।

ছাড়া পেয়ে কিশোর-কিশোরীরা বুঝতে পারছে না কী করবে। বিহ্বলের মতো ইতস্তত এদিকে-সেদিকে তাকাতে থাকে তারা, কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসতে থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের দিকে।

কিরীণাকে দেখতে পাই আমি, কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে সে। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে বালুতে, কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটে আসছে। আমি ছুটে গিয়ে কিরীণাকে জড়িয়ে ধরলাম, বললাম, কিরীণা, কিরীণা, সোনা আমার—

কিরীণা কাঁদতে কাঁদতে বলল, বলেছিলাম না আমি, বলেছিলাম না?

কি বলেছিলে?

রুকাস হচ্ছে ঈশ্বরের দূত। দেখলে, কী ভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে ট্রনদের? আমাদের রক্ষা করতে এসেছে। বলেছিলাম না আমি।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। কিরীণাকে শক্ত করে ধরে রাখলাম, দেখলাম, ট্রনদের মহাকাশযানগুলো একটা একটা করে আকাশে উঠে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। শুধু মানুষগুলো পালিয়ে গেছে, পিছনে ফেলে গেছে অসংখ্য রবোট। সেগুলো এসে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। তাদের কপোট্রনের ভেতর এখন নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব! বুদ্ধির বাইরে কিছু–একটা সমস্যার মুখোমুখী হলে রবোটদের মতো অসহায় আর কিছু নয়।

কিরীণাকে ছেড়ে আমি এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। রুকাস স্থির হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, ডান হাতে সেই আশ্চর্য ধাতব জিনিসটি, যেটি এখনো আলগোছে ধরে রেখেছে। হাতের কনুইয়ের কাছে ক্ষতটি থেকে এখনো রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। অসংখ্য মানুষ ভিড় করে এসেছে রুকাসের কাছে। মাথা নিচু করে এসে বসছে তার কাছে।

আমি কিরীণার হাত ধরে মানুষের ভিড় ঠেলে রুকাসের কাছে যেতে চেষ্টা করি। আমাদের পথ ছেড়ে দিল অনেকে, সবাই জানে রুকাস আমার বাসার অতিথি।

কাছে গিয়ে আমি রুকাসের হাত স্পর্শ করে বললাম, রুকাস।

রুকাস ঘুরে আমার দিকে তাকাল। বলল, কী কুনিল?

আমি কিছু বলার আগেই কিরীণা বলল, তুমি না থাকলে আজ আমার কী হত? কী হত রুকাস? বলতে বলতে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

রুকাস একটু অবাক হয়ে কিরীণার দিকে তাকিয়ে অনিশ্চিতভাবে তার মাথায় হাত রেখে বলল, কাঁদে না কিরীণা। কেউ কাঁদলে কী করতে হয় আমি জানি না।

ভিড় ঠেলে ইলিও এগিয়ে এসে উত্তেজিত গলায় বলল, রুকাস, তুমি কেমন করে সবকিছু ধ্বংস করে দিলে, কী ছিল তোমার হাতে?

আমি বললাম, আমি বলব?

বল।

আমি রুকাসের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, তুমি ভবিষ্যতের মানুষ। তুমি দুই হাজার থেকেও বেশি ভবিষ্যৎ থেকে এসেছ। তাই না?

রুকাস আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

তাই তোমার আছে ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র। যেটা দিয়ে তুমি ধ্বংস করে দিয়েছ সবকিছু।

কিরীণা বিস্ফারিত চোখে রুকাসের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি আবার বললাম, সেজন্যে ইলির যন্ত্রে তোমার বয়স এসেছে নেগেটিভ দুই হাজার তিন শ' নয়! কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি সময়ের উল্টোদিকে এসেছ। রুকাস আবার মাথা নাড়ল।

তুমি কেন এসেছ রুকাস, আমাদের কাছে? রুকাস বিষণ্ন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার উপর ভয়ানক বিপদ, তাই আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। লুকিয়ে আছি অজ্ঞাত সময়ে।

তুমি লুকিয়ে আছ?

হ্যাঁ। আমি লুকিয়ে ছিলাম। এখন আর লুকিয়ে নেই। এখন জানাজানি হয়ে গেল। এখন তারা জেনে যাবে।

কারা?

যারা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের নাম বায়োবট। সব জায়গায় তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে আমাকে।

৫. বায়োবট

আমার মা রুকাসের কনুইয়ে একটা ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। এক জন মানুষ যে নিজের শরীরের ভেতরে করে এরকম ভয়ঙ্কর একটি অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে সেটি কে জানত। ব্যান্ডেজটি লাগাতে লাগাতে বললেন, তোমার শরীরের ভেতরে কি আর কিছু রয়েছে?

না। আর কিছুর প্রয়োজনও নেই।

কেন?

রুকাস টেবিলের উপর রাখা ছোট ধাতব অস্ত্রটি হাতে তুলে নিয়ে বলল, এই অস্ত্রটি শুধু আমিই ব্যবহার করতে পারব, পৃথিবীর আর কেউ এটা ব্যবহার করতে পারবে না। এটা শুধু অস্ত্র নয়, এটা আমার যোগাযোগের যন্ত্র। এটা দিয়ে আমি আমার মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারব।

তোমার কোন মানুষ?

আমি যে সময় থেকে এসেছি, সেই সময়ের মানুষ।

তুমি যোগাযোগ করেছ?

এখনো করি নি। অস্ত্রটা যখন ব্যবহার করেছি তখন অবশ্যি নিজে থেকে যোগাযোগ হয়ে গেছে। আমার যারা বন্ধু তাদের সাথে, যারা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের সাথেও।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?

রুকাস হাতের ব্যান্ডেজটা একবার হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলল, সেটা অনেক বড় একটা গল্প।

বলবে আমাদের সেই গল্প?

শুনতে চাও? ভালো লাগবে না শুনে।

তবু শুনব।

রুকাস যে গল্পটি বলল, সেটি খুব বিচিত্র। কেন জানি না আমার ধারণা ছিল যত

WWW.AMARBOI.COM

দিন যাবে, মানব সভ্যতার তত উন্নতি হবে। কিন্তু মানব সভ্যতার যে সময়ের সাথে সাথে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে, সেটি আমার ধারণার বাইরে ছিল।

ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল একটা দুর্ঘটনার মাঝে দিয়ে। একটি শিশু একটা খারাপ দুর্ঘটনায় দুই হাত-পা-ই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসাসংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং তখন বেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে, কাজেই শিশুটিকে কৃত্রিম হাত এবং পা লাগিয়ে দেয়া হল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তার হাত এবং পা সাধারণ মানুষের হাত এবং পায়ের থেকে অনেক বেশি কার্যকর, অনেক বেশি শক্তিশালী।

ব্যাপারটির শুরু এভাবে। ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো আকারের শক্তিশালী কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়েছে, কৃত্রিম হাত এবং পায়ের মাঝে অসংখ্য কম্পিউটার জটিল কাজকর্ম করতে পারে। সাধারণ মানুষ তার হাত দিয়ে যে কাজ করতে পারে না, কৃত্রিম হাতের মানুষ তার থেকে অনেক নিখুঁত কাজ করতে পারে।

তখন জটিল কাজকর্ম করার জন্যে কিছু মানুষ ইচ্ছে করে নিজের হাত কেটে সেখানে যান্ত্রিক হাত লাগিয়ে নেয়া শুরু করল। প্রথম প্রথম সেটা নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক শুরু হয়েছিল সত্যি, কিন্তু কিছুদিনেই সাধারণ মানুষজন ব্যাপারটিকে বেশ সহজভাবেই গ্রহণ করা শুরু করে দিল।

কৃত্রিম হাত-পা তৈরির কলকারখানাগুলো তখন সাধারণ মানুষজনকে তাদের সত্যিকার হাত-পা পাল্টে অনেক ক্ষমতাশালী যান্ত্রিক হাত-পা ব্যবহার করার জন্যে উৎসাহিত করতে শুরু করে দিল। কিছুদিনের মাঝেই দেখা গেল বিপুল জনগোষ্ঠী তাদের কথা শুনে কৃত্রিম হাত-পা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তারা সাধারণ মানুষ থেকে বেশি কার্যক্ষম, এধরনের একটা কথা নানা জায়গায় শোনা যেতে লাগল। কৃত্রিম হাত-পা তৈরির কলকারখানা তখন বিশাল আকার নিয়েছে, তারা একসময় ব্যাপারটিকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করতে শুরু করে। ছোট শিশুর জন্ম নেয়ার সাথে সাথে তার স্বাভাবিক হাত-পা কেটে সেখানে যান্ত্রিক হাত-পা লাগিয়ে দেয়ার একটা প্রবণতা খুব ধীরে ধীরে মানুষজনের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। জৈবিক বা বায়োলজিক্যাল মানুষ এবং তাদের রবোটের মতো হাত-পা, দুই মিলে তাদের বায়োলজিক্যাল রবোট বা সংক্ষেপে বায়োবট বলা শুরু করা হল।

এর পরের কয়েক শতাব্দী মূলতঃ বায়োবটগোষ্ঠী এবং সাধারণ মানুষদের মাঝে একটা প্রতিযোগিতায় কেটে গেল। পৃথিবীর মূল অর্থনীতি রবোটিক শিল্পভিত্তিক। এই শিল্পগুলো নানাভাবে পৃথিবীর মাঝে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করায় বায়োবটদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল।

নানা ধরনের গবেষণা শুরু হল তখন। মায়েরা সন্তানদের পেটে ধরামাত্রই তাদের নানারকম ঔষধপত্র খাওয়ানো শুরু করিয়ে দেয়া হত, যে কারণে শিশুরা জন্ম নিল বিকলাঙ্গ অবস্থায়। তাদের বায়োবট তৈরি না করে কোনো উপায় ছিল না। খুব ধীরে ধীরে বায়োবটের মাঝে মস্তিষ্ক এবং প্রজননের অঙ্গ ছাড়া প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কৃত্রিম কোনো যন্ত্র দিয়ে পাল্টে দেয়া হল। মানুষের চিন্তা এবং বংশবৃদ্ধির ক্ষমতার সাথে যন্ত্রের নিখুঁত কাজ করার ক্ষমতা যোগ করে এক ধরনের বিচিত্র প্রাণীর সৃষ্টি হল তখন। তাদের সংবেদনশীল ফটো সেলের চোখ আলট্রা ভায়োলেট থেকে শুরু করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইনফ্রায়েড পর্যন্ত দেখতে পায়। চোখ ইচ্ছেমতো অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ ক্ষমতায় পারদর্শী হতে পারে। তাদের ইলেকট্রনিক শ্রবণযন্ত্র কয়েক হার্টজ থেকে মেগা হার্টজ পর্যন্ত শুনতে পারে। তাদের ঘ্রাণশক্তি শ্বাপদের ঘ্রাণশক্তিকে হার মানিয়ে দিতে থাকে।

তাদের বুকের ভেতর ছোট দুর্বল ফুসফুসকে জুড়ে দেয়া হয় স্বয়ংক্রিয় ফুসফুসের সাথে। পৃথিবীর দূষিত বাতাসকে বিশুদ্ধ করে সেই ফুসফুস রক্তের সাথে বিশুদ্ধ অক্সিজেন মিশিয়ে দেয়। কৃত্রিম যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড সেই রক্ত মস্তিষ্ক এবং প্রজনন যন্ত্রে পাঠাতে থাকে। সেকেন্ডে দশবার করে হৃৎপিণ্ড বুকের মাঝে ধুকপুক করতে থাকে। হৃৎপিন্ডের যান্ত্রিক দেয়ালে অসংখ্য সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক সেন্সর প্রতি মুহূর্তে শরীরের পরিবর্তন মনিটর করতে থাকে। রক্ত পরিশোধন করা হয় যন্ত্র দিয়ে, শরীরের বাইরে। অব্যবহৃত কিডনি, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় সরিয়ে ফেলা হয় জন্মমুহূর্তে, শরীরের আকার হয় ক্ষুদ্র, বিশাল বায়োবটের দেহের মাঝে জুড়ে দেয়া হয় সেই ক্ষুদ্র অপুষ্ট বিকৃত দেহ।

বায়োবটের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। পরিপাকযন্ত্রের জায়গা শরীরের নানা অংশে টিউব দিয়ে আসতে থাকে পুষ্টিকর তরল। পরিপাকযন্ত্র নেই বলে মলমূত্র নেই। মানুষকে এরা প্রথমবার মুক্ত করেছে দৈনন্দিন জৈবিক প্রক্রিয়া থেকে, যদিও সেই ভয়াবহ প্রাণীটিকে সম্ভবত মানুষ আখ্যা দেয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ আর নেই।

জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে মস্তিষ্ককে বিকশিত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা বেশি, নিউরনের সংখ্যা বেশি বলে তাদের স্মরণশক্তি অচিন্তনীয়। দৈহিক প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত করা হয়েছে মস্তিষ্ককে, দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় সেই মস্তিষ্ককে। দীর্ঘায়ু হয়েছে এই বায়োবট সম্প্রদায়।

বংশবৃদ্ধির জন্যে অবিকৃত রাখা হয়েছে প্রজননযন্ত্রকে। যদিও সন্তানকে আর মায়ের গর্ভে বড় হতে হয় না। ভ্রূণকে বের করে আনা হয় জরায়ু থেকে, কৃত্রিম যন্ত্রে বড় হয় ভ্রূণ। প্রসববেদনার ভিতর দিয়ে যেতে হয় না কোনো বায়োবট রমণীকে, যন্ত্র খুলে বের করে আনা হয় সেই ভ্রূণ।

বিশাল শিল্প গড়ে উঠেছে এই বায়োবট শ্রেণীকে নিয়ে। পৃথিবীর অর্থনীতি এই বায়োবট শিল্পকে ঘিরে। পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণে এই বায়োবট শ্রেণী।

মানুষের ছোট একটি দল বায়োবট হতে রাজি হল না। যন্ত্রের খাঁচায় অতিকায় মস্তিষ্ক এবং প্রজননযন্ত্রকে জুড়ে দিয়ে যান্ত্রিক সাবলীলতায় বাধা পড়ে যাওয়াকে তারা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ মনে করল। সেই অল্পসংখ্যক মানুষকে বায়োবট শ্রেণী উপেক্ষা করে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনো একটি কারণে হঠাৎ করে বায়োবট শ্রেণী সিদ্ধান্ত নিল পৃথিবীতে সত্যিকার মানুষ কেউ থাকতে পারবে না। সবাইকে বায়োবট হয়ে যেতে হবে। মানুষের সাথে তখন বায়োবটের সংঘর্ষের সূত্রপাত। সেই ঘটনা ঘটেছে আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পর।

বায়োবটরা তখন প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী, সমস্ত পৃথিবী মোটামুটিভাবে তাদের হাতের মুঠোয়। মানুষের জন্যে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এল হঠাৎ। খুব ধীরে ধীরে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বায়োবটদের বিরুদ্ধে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। কিন্তু সামনে রয়েছে ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কে জয়ী হবে এখনো কেউ জানে না।

রুকাসকে এই সময় আমি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন বলছ কেউ জানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না? তুমি তো সময়ের উল্টোদিকে অতীতে চলে এসেছ, তেমনি ভবিষ্যতে চলে গিয়ে দেখে এস।

রুকাস একটু হেসে বলল, সময় পরিভ্রমণের একটা সূত্র আছে। অনিশ্চয়তার সূত্রের মতো। তুমি শুধুমাত্র সেই সময়েই যেতে পারবে, যেই সময়ের ঘটনাবলীর সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।

মানে?

মনে কর তুমি সময়ে পরিভ্রমণ করে দশ বছর অতীতে গেলে। সেখানে তুমি দেখতে পেলে তোমাকে, ছোট শিশু। তাকে যদি তুমি হত্যা কর তাহলে তুমি কেমন করে আসবে? কাজেই সময় পরিভ্রমণের সূত্র বলে তুমি দশ বছর অতীতে যেতে পারবে না। তুমি দুই হাজার বছর অতীতে যেতে পারবে। কারণ সেখানে তুমি তোমার পূর্বপুরুষকে সম্ভবত খুঁজে পাবে না। তার সম্ভাবনা খুব কম। প্রকৃতির সূত্র সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করে। যে জিনিসটির সম্ভাবনা কম সেটি সূত্রকে লঙ্ঘন করে না।

কিন্তু সত্যি যদি পেয়ে যাই?

পেয়ে গেলেও তুমি তাকে মারতে পারবে না।

মা আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, জ্ঞানের কচকচিটা একটু বন্ধ কর্ দেখি, আমি আগে ইতিহাসটা শুনি।

যেটা এখনো হয় নি, ভবিষ্যতে হবে, সেটা ইতিহাস হয় কেমন করে?

চুপ কর্ তুই।

একটু হেসে রুকাস আবার শুরু করল।

রুকাসের বয়স যখন ছয়, তখন বিশাল এক বায়োবট বাহিনী হামলা চালিয়েছিল তাদের এলাকায়; অনেকটা ট্রনদের হামলার মতো। নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছিল সত্যি, কিন্তু হামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এক জন মানুষকে খুঁজে বের করা। সেই মানুষটা হচ্ছে রুকাস। কেন এই ছয় বছরের শিশুটির জন্যে বায়োবটেরা এত ব্যস্ত হয়েছিল, সেটি তখনো কেউ জানত না। বায়োবটদের সেই ভয়ংকর হামলা থেকে রুকাস খুব অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল। তার বাবা–মা ভাই–বোন কেউ রক্ষা পায় নি।

WWW.AMARBOI.COM

এই ঘটনার পরও অসংখ্যবার রুকাসকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছে, কখনো সফল হয় নি। অসংখ্য মানুষের মাঝে কেন রুকাসকে নিয়ে যেতে তারা এত মরণপণ করে চেষ্টা করেছে সেটা কেউ জানত না, কিন্তু যেহেতু রুকাসকে নিতে চাইছে, মানুষেরা বুঝে গেল এর মাঝে কোনো একটা রহস্য আছে। রুকাসকে অক্ষত অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখার উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে কে জয়ী হবে।

আমি রুকাসকে আবার বাধা দিলাম, কিন্তু সেটা কেমন করে হয়? তুমি তো বললে কাছাকাছি ভবিষ্যতের কিছু কেউ জানতে পারবে না।

জানতে পারবে না বলি নি, বলেছি জানার সম্ভাবনা কম।

মানে?

যদি অসংখ্যবার চেষ্টা করা যায়, খুব ছোট একটা সম্ভাবনা আছে কাছাকাছি ভবিষ্যৎ থেকে কোনো তথ্য আনার। মনে হয় বায়োবটেরা কিছু–একটা তথ্য এনেছে। যেখানে দেখা গেছে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু–একটা করেছি। কী করেছি আমি জানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

তুমি জান না তুমি কী করেছ, কিন্তু সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ?

হ্যাঁ। তাই আমাকে অক্ষত দেহে বেঁচে থাকতে হবে। যেভাবে হোক। বায়োবটেরা এত ভয়ঙ্করভাবে আমাকে খুঁজে বের করে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে, যে, আমাকে বাঁচিয়ে রাখার একটিমাত্র উপায়—।

সেটা হচ্ছে অতীতে সরিয়ে ফেলা?

হ্যাঁ, আমি অজ্ঞাত কোনো জায়গায় লুকিয়ে না গিয়ে অজ্ঞাত কোনো সময়ে লুকিয়ে গেছি।

আমি অবাক হয়ে বুকাসের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

৬. টুবু নামের রবোট

মায়ের অনাথাশ্রমের জন্যে একটা বড় কেক নিয়ে গিয়েছিলাম। একটি শিশুর জন্মদিন ছিল আজ। মা বড় একটা কেক তৈরি করেছিলেন। উপরে বড় বড় করে তার নাম লেখা ছিল। ট্রনদের হাতে তার বাবা-মা মারা না গেলে আজ তার নিজের বাসায় কত চমৎকার আনন্দোৎসব হত।

আমার আরো আগে ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু জন্মদিনের উৎসবটি এত আনন্দঘন হয়ে উঠল যে দেরি হয়ে যাচ্ছে জেনেও আমি উঠে আসতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত যখন রওনা দিয়েছি তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে।

সমুদ্রতীর ধরে হেঁটে আসছি, কোথাও কেউ নেই। মস্ত একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। চারদিকে তার নরম জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদের আলোতে সবকিছু এত মায়াময় মনে হয় কেন কে জানে।

আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের পানিতে চাঁদের প্রতিফলনটি উপভোগ করলাম। শান্ত সমুদ্র, ছোট ছোট ঢেউ কূলে এসে ভেঙে পড়ছে। খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছি, দেখতে পেলাম আমার ঠিক সামনে এক জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভয়ানক চমকে উঠে বললাম, কে?

মানুষটি একটু এগিয়ে এল, আমি একটা ধাতব শব্দ শুনতে পেলাম। এর শরীর ধাতব পদার্থে তৈরী। মানুষটি শিস দেয়ার মতো একটা শব্দ করল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি?

মানুষটি বিজাতীয় ভাষায় কিছু-একটা বলল, আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। আমি ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে বললাম, কে? কে তুমি?

মানুষটি আরো খানিকক্ষণ নানা ধরনের বিচিত্র ভাষা বলে হঠাৎ পরিষ্কার আমার ভাষায় বলল, তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?

নিশ্চয়ই পৃথিবীর সব রকম ভাষায় চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত আমাদের ভাষাটি খুঁজে পেয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, পারছি।

চমৎকার। লোকটি আরো এগিয়ে আসে, আমি এবারে চাঁদের আলোতে তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পষ্ট দেখতে পাই। লোকটি মানুষ নয়, তার পুরো দেহ ধাতব। অনেকটা রবোটের মতো, কিন্তু এরকম রবোট আমি আগে দেখি নি। রবোটের মতো মানুষটি বলল, এই এলাকায় কয়েকদিন আগে তিনটি থার্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটেছে?

আমার খানিকক্ষণ লাগল বুঝতে সে কী জানতে চাইছে। হঠাৎ বুঝতে পারলাম সে ট্রনদের তিনটি মহাকাশযান ধ্বংসের কথা বলছে। আমি কী বলব বুঝতে না পেরে বললাম, কেন?

সেই বিস্ফোরণগুলো কেমন করে ঘটেছে? এক জন তরুণ কি তার শরীরের ভেতর থেকে একটা অস্ত্র বের করে বিস্ফোরণগুলো ঘটিয়েছিল?

আমি কুলকুল করে ঘামতে থাকি। এই প্রাণীটি নিশ্চয়ই বায়োবট, রুকাসের খোঁজে এসেছে।

প্রাণীটি আবার জিজ্ঞেস করল, কেমন করে হয়েছিল সেই বিস্ফোরণ?

আমি জানি না।

তুমি নিশ্চয়ই জান। তোমার গলার কাঁপন থেকে আমি বুঝতে পারছি তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আমাকে বল সেই তরুণটি কোথায়।

আমি বলব না।

ভয়ঙ্কর সেই ধাতব দেহ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভেবে আমি আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেললাম, কিন্তু সেটি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না। বলল, তরুণটিকে আমার খুব প্রয়োজন। আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও।

না।

তুমি নিশ্চয়ই আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। রবোটের মতো প্রাণীটি তার হাত বাড়িয়ে হঠাৎ আমার মাথায় স্পর্শ করে, উচ্চচাপের বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো একটা অনুভূতি হয় আমার, ইচ্ছে–অনিচ্ছে বলে কিছু থাকে না আমার! চোখের সামনে লাল একটা পর্দা খেলতে থাকে, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ রুকাসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আমি, টুবু!

রবোটের মতো প্রাণীটি সাথে সাথে ছেড়ে দিল আমাকে, তারপর ছুটে গেল রুকাসের দিকে, শিস দেয়ার মতো শব্দ করল মুখে একবার বিজাতীয় ভাষায়। আমি কোনোমতে উঠে দাঁড়ালাম, পুরাতন বন্ধু এক জন আরেকজনকে যেরকম গভীর ভালবাসায় আলিঙ্গন করে, তেমনি করে রুকাস আলিঙ্গন করছে প্রাণীটাকে। এই রবোটের মতো প্রাণীটা আর যাই হোক, বায়োবট নয়। দ্রুত কোনো এক ভাষায় এক জন আরেকজনের সাথে কথা বলছে, দেখে মনে হয় কথা কাটাকাটি হচ্ছে, কিন্তু রুকাসের মুখে হাসি, নিশ্চয়ই ভাষাটিই এরকম।

একটু পরেই দু'জনে আমার দিকে এগিয়ে এল। রবোটের মতো প্রাণীটি আমার সামনে মাথা নিচু করে অভিনন্দন করার ভঙ্গি করে বলল, তোমার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎপ্রবাহ করানোর জন্যে দুঃখিত।

আমি বললাম, ভেবেছিলাম তুমি বায়োবট। আমি জানতাম না রুকাস তোমার বন্ধু।

রুকাস?

রুকাস হেসে বলল, হ্যাঁ, এখানে আমার নাম রুকাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুকাস। কি আশ্চর্য নাম।

আমি রবোটটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি? তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?

আমি টুবু। আমি সপ্তম বিবর্তনের চতুর্থ পর্যায়ের ষষ্ঠ প্রজাতির রবোট। রুকাসকে রক্ষা করার প্রাথমিক দায়িত্ব আমার উপর ছিল। যেহেতু তার গোপনীয়তা নষ্ট হয়েছে, আমাকে তার সাহায্যের জন্যে আসতে হয়েছে।

টুবু নামক রবোটটি এবারে রুকাসের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কেমন করে এত বড় একটা ভুল করলে? তিন তিনটি থার্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটালে এক জায়গায়? তুমি কোথায় আছ সেটা কি গোপন আছে আর?

তুমি আমার জায়গায় হলে তাই করতে। আমি তো মাত্র তিনটি বিস্ফোরণ করেছি, তুমি করতে ছয়টি।

টুবু মাথা নেড়ে বলল, আমাকে এক্ষুনি নিয়ে চল তোমার বাসায়। তোমাকে ঘিরে একটা প্রতিরক্ষা ব্যূহ দাঁড় করাতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আমরা তিনজন আমাদের বাসার দিকে হাঁটতে শুরু করি।

ঘরের আলোতে আমি প্রথমবার টুবুকে ভালো করে দেখলাম। বড় বড় ফটোসেলের চোখ, ছোট নাক এবং বিস্তৃত মুখে তার চেহারায় কেমন জানি একটি সারল্য রয়েছে। তার গলার স্বর খানিকটা ধাতব, যান্ত্রিক, এবং ভাবলেশহীন। আমি উপস্থিত থাকলে সে ভদ্রতা করে আমাদের ভাষায় রুকাসের সাথে কথাবার্তা বলে, যেন আমি বুঝতে পারি। তাদের নিজেদের ভাষা অত্যন্ত সুন্দর, সুরেলা এবং দ্রুত। মাঝে মাঝেই মনে হয় শিস দেয়ার মতো শব্দ হয়।

টুবু তার ঘাড়ের একটা বাক্স খুলে ভিতর থেকে জিনিসপত্র বের করতে থাকে। নানা আকারের ছোট-বড় যন্ত্রপাতি, সেইসব যন্ত্রপাতি খুলে গিয়ে নানা ধরনের আকৃতি নিতে থাকে। ঘন্টাখানেকের মাঝেই রুকাসের ঘরটি একটি অবিশ্বাস্য রূপ নিয়ে নেয়। ঘরের মাঝামাঝি লাল আলোতে এই পুরো এলাকার একটি ত্রিমাত্রিক ছবি ভেসে ওঠে। বাইরে থেকে যে-কেউ আমাদের এই এলাকায় প্রবেশ করার চেষ্টা করলে এই ত্রিমাত্রিক ছবিটিতে তাকে দেখা যাবে। সেটি ধ্বংস করার নানারকম উপায় রয়েছে এবং বন্ধুভাবাপন্ন নয় এরকম মহাকাশযানকে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের কোনো ধরনের মহাকাশযান নেই এবং বাইরে থেকে শুধুমাত্র আমাদের উপর হামলা করার জন্যেই মহাকাশযানগুলো এসে হাজির হয় শুনে টুবু খুব অবাক হল।

রুকাসকে রক্ষা করার জন্যে এই পুরো এলাকা ঘিরে একটা শক্তিবলয় এবং প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে টুবু অন্য কাজে মন দিল। প্রথমে রুকাসকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল। রুকাস তার গায়ের কাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে থাকে, টুবু তার উপর উবু হয়ে ঝুঁকে তাকে পরীক্ষা করতে থাকে। খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বলল, তোমার শরীর চমৎকার আছে। আমি যে ধরনের আশঙ্কা করেছিলাম সেরকম কিছু হয় নি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি আশঙ্কা করেছিলে?

এখানকার স্থানীয় রোগ-জীবাণু এবং ভাইরাসে রুকাসের শরীর অভ্যস্ত নয়, সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের কোনো কিছুতে আক্রান্ত হলে তাকে বাঁচানো কঠিন হবে। তার শরীরে নানারকম প্রতিষেধক এবং অ্যান্টিবডি দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সেগুলো চমৎকার কাজ করছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, টুবু, যদি রুকাসকে নিয়ে যাবার জন্যে এখানে বায়োবট আসে, তুমি বুঝতে পারবে?

পারার কথা।

তারা কী আসবে?

আজ হোক কাল হোক, তারা আসবে।

কেন?

রুকাস যদি বেঁচে থাকে, বায়োবটের একটি মহাবিপর্যয় হবার কথা। আমাদের, মানুষের পক্ষে যেরকম রয়েছে রুকাস, বায়োবটদের দিকে তেমনি রয়েছে এক জন—ক্লডিয়ান। এই দু'জনের মাঝে এক জন বেঁচে থাকবে, কে বাঁচবে তার উপর নির্ভর করবে সবকিছু।

ক্লডিয়ান! আমি রুকাসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ক্লডিয়ানের কথা শুনেছ?

শুনেছি।

সে কী রকম? কত বয়স? দেখতে কেমন?

আমি ঠিক জানি না।

টুবু বলল, ক্লডিয়ান বর্তমান বায়োবট গোষ্ঠীর দলপতি। তার বয়স সম্ভবত চল্লিশ থেকে ষাটের মাঝে। বায়োবটদের হিসেবে সেটা বলা যায় তরুণ। তাদের আয়ু আজকাল দু' শ' পঞ্চাশ থেকে তিন শ'য়ের কাছাকাছি।

সে দেখতে কেমন?

বায়োবটদের নিজেদের চেহারা নেই। অপুষ্ট মুখমণ্ডল যন্ত্রপাতিতে ঢাকা থাকে, সেই যন্ত্রের চেহারা হচ্ছে তাদের চেহারা।

ক্লডিয়ান কী রকম মানুষ?

ক্লডিয়ান মানুষ নয়, বায়োবট।

কিন্তু তার মাথায় এখনো মানুষের মস্তিষ্ক, তার চিন্তা-ভাবনা নিশ্চয়ই মানুষের।

রুকাস এবং টুবু দু'জনেই একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল।

টুবু বলল, কিন্তু তাদের শরীর এমনভাবে যন্ত্রের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে, যে, খুব বড় পরিবর্তন হয়েছে তাদের মস্তিষ্কে।

কিন্তু তবুও নিশ্চয়ই তারা মানুষ। তাদের চিন্তা-ভাবনা নিশ্চয়ই মানুষের মতো।

রুকাস মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। তা নিশ্চয়ই সত্যি।

তাহলে তার চিন্তা-ভাবনা কী রকম?

আমি ঠিক জানি না।

টুবু বলল, ক্লডিয়ান খুব নিষ্ঠুর।

সকল বায়োবটমাত্রেই নিষ্ঠুর। ক্লডিয়ান তাদের দলপতি, তার নিষ্ঠুরতা অনেক বেশি।

আমি অবাক হয়ে টুবু এবং রুকাসের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভবিষ্যতের পৃথিবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণতি কী হবে সেটি নির্ধারিত হবে এই মানুষ এবং রবোটগুলো দিয়ে। পুরো ব্যাপারটি ঘটছে আমার চোখের সামনে, আমার সেটি এখনো বিশ্বাস হতে চায় না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, টুবু, তোমাদের এত ক্ষমতা, তোমরা ইচ্ছে করলেই এখন সারা পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলতে পার—কেন ভবিষ্যতের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে পড়ে রয়েছ? কেন এখানে থেকে যাও না? সারা পৃথিবীর মাঝে তোমরা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ।

টুবু হাসির মতো শব্দ করে বলল, সময় পরিভ্রমণের ব্যাপারটি তুমি জান না বলে তুমি এরকম কথা বলছ। কেউ যখন অতীতে আসে, তাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়।

কেন?

সে যদি একটু ভুল করে, ভয়ংকর প্রলয় হয়ে যাবে প্রকৃতিতে। আমরা প্রকৃতির স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে যাচ্ছি। একটি অকারণ প্রাণীহত্যা হবে ভবিষ্যতের একটা প্রজাতিকে ধ্বংস করে ফেলা। সময়ের অনিশ্চিত সূত্র যেটুকু করতে দেয়, তার ভেতরে থাকতে দেয় সব সময়।

তার মানে তোমরা এখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে পারবে না?

না।

মানুষ মারতে পারবে না?

না।

কোনো কিছু ধ্বংস করতে পারবে না?

না।

কিন্তু রুকাস ট্রনদের তিনটি মহাকাশযান ধ্বংস করে ফেলেছিল।

প্রকৃতি তাকে সেটা করতে দিয়েছে—

আমার মা এই সময়ে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, সব সময়ে এই কচকচি ভালো লাগে না—তুই থাম্ দেখি, আমি কয়েকটা কাজের কথা বলি।

বলুন।

আজকাল কাপড় নিয়ে মহাযন্ত্রণা। তাপ-নিরোধক কাপড়গুলো যাচ্ছেতাই, ভালো কিছু তাপ-নিরোধক পাওয়া যায় কোথাও?

কী করবেন আপনি তাপ-নিরোধক কাপড় দিয়ে?

এই রান্নাবান্নার সময় কাজে লাগে। সেদিন ছোট একটা মাইক্রোভল্ট ফেটে কী কেলেঙ্কারি! এই যে দেখ বাবা, হাতটা পুড়ে গেছে।

রবোটের মুখে যেটুকু যান্ত্রিক সমবেদনা ফোটানো সম্ভব সেটুকু ফুটিয়ে টুবু গভীর মনোযোগ নিয়ে মায়ের হাতের পোড়া দাগটি লক্ষ করে বলল, খুবই দুঃখের ব্যাপার। আপনি কেমন করে রান্না করেন?

ছোট একটা ইউরেনিয়াম চুলো আছে, কতদিনের পুরানো, কে জানে রেডিয়েশান বের হয় কি না। তোমরা কেমন করে কর?

আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এক জন রবোট বলে খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা নেই। মানুষদের জন্যে খাবার তৈরি করতে হয়। খাওয়া ব্যাপারটি আজকাল দু' ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছে—শরীরের পুষ্টি এবং স্বাদ। পুষ্টির ব্যাপারটি ছোট ছোট ট্যাবলেটে করে চলে আসে। সেখানে ইচ্ছেমতো স্বাদ যোগ করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা অবাক হয়ে বললেন, তার মানে একই খাবারের ট্যাবলেটে মাংসের স্বাদ যোগ করা যাবে, আবার ইচ্ছে করলে মাছের স্বাদ?

ঠিক বলেছেন।

মা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, স্বাদগুলো কেমন করে যোগ কর? বোতলে কিনতে পাওয়া যায়?

আগে সেরকম ছিল। গত শতাব্দীতে পুরো ব্যাপারটি ইলেকট্রনিক করে ফেলা হয়েছে।

ই-ইলেকট্রনিক?

হ্যাঁ। স্বাদ জিনিসটা কী? আপনাদের মস্তিষ্কের একধরনের অনুভূতি। একটা খাবার মুখে দেবেন, জিব, গলা, নাক, মুখমণ্ডল সেই খাবারের অনুভূতিটি মস্তিষ্কে পাঠাবে, আপনারা সেটা উপভোগ করবেন। পুরো জিনিসটি শর্টকাট করে অনুভূতিটি সোজাসুজি মস্তিষ্কে দেয়া যায়, ছোট ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় সেসব করার জন্যে।

মা তখনো ব্যাপারটি বুঝতে পারছেন না। মাথা নেড়ে বললেন, মুখে কোনো খাবার না দিয়েই খাবারের স্বাদ অনুভব করা সম্ভব।

হ্যাঁ।

তোমরা সেটা কর?

আমি রবোট, তাই আমাকে করতে হয় না, মানুষেরা করে।

প্রত্যেক দিন করে? প্রত্যেক বেলায়?

টুবু আবার হাসির মতো একটু শব্দ করে বলল, প্রত্যেক বেলায় খাওয়ার সময় আর কতজনের আছে? যাদের সময় আছে, তারা দিনে একবার। ব্যস্ত মানুষেরা সপ্তাহে একবার। বিশেষ সময়ে মাসে একবার খাওয়া হয়। সেগুলো শরীরে একমাস সবরকম পুষ্টি পাঠায় ধীরে ধীরে—

তাই বল। রুকাস তাই কিছু খেত না প্রথম প্রথম।

হ্যাঁ, তাকে আমরা দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টিকর খাবারের ট্যাবলেট খাইয়ে পাঠিয়েছিলাম।

মা খানিকক্ষণ চোখ বড় বড় করে থেকে বললেন, আচ্ছা বাবা, কাপড়ের ফ্যাশন কি আজকাল? ঢিলেঢালা, নাকি—সময় পরিভ্রমণের একটা প্রশ্ন মাথার মাঝে ঘুরঘুর করছে, কিন্তু মায়ের জন্যে মনে হচ্ছে আজ সেটি আর জিজ্ঞেস করা হবে না।

৭. নূতন জীবন

আমাদের এই এলাকায় এত বড় একটা ব্যাপার ঘটছে, কিন্তু দেখে সেটি বোঝার কোনো উপায় নেই। টুবু তার মনমতো একটা প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে পরদিন ভোরে আমার সাথে হাঁটতে বের হল। চমৎকার বসন্তকালের একটি সকাল, ঝোপঝাড়ে বুনো ফুল, পাখি ডাকছে, ঘাস-ফড়িং লাফাচ্ছে। আকাশ নীল, মেঘের কোনো চিহ্ন নেই।

আমি কিরীণার বাসায় থেমে তাকে খোঁজ করলাম। তার মা বললেন, সে খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরে তার আইসোটোপ আলাদা করার ছাঁকনিটি নিয়ে সমুদ্রতীরে চলে গেছে। আমি তখন টুবুকে নিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে হাঁটতে থাকি।

অনেক দূর থেকে আমি কিরীণার গলা শুনতে পাই। সে এবং তার কয়জন বান্ধবী পাশাপাশি বসে সুর করে গান গাইতে গাইতে কাজ করছে। গানের বিষয়বস্তুটি খুব করুণ—ছোট একটি শিশু প্রতিদিন ভোরে সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তার বাবাকে ট্রনেরা ধরে নিয়ে গেছে, সে কি আর ফিরে আসবে?

কিরীণার মিষ্টি গলার সেই করুণ সুর শুনে বুকের মাঝে কেমন জানি হা হা করে ওঠে। টুবু পর্যন্ত থমকে দাঁড়িয়ে বলল, অত্যন্ত চমৎকার কণ্ঠ, প্রয়োজনীয় তরঙ্গের অপূর্ব সুষম উপস্থাপন।

যার অর্থ নিশ্চয়ই কি সুন্দর গান!

কিরীণা আমাদের দেখে লজ্জা পেয়ে গান থামিয়ে ফেলল। আমি বললাম, কী হল? থামলে কেন?

ভেবেছ তোমাকে গান শোনানো ছাড়া আমাদের আর কোনো কাজ নেই।

টুবু মাথা নিচু করে অভিবাদন করে বলল, তোমার গলার স্বরে যে তরঙ্গের উপস্থাপনা আছে সেটি একটি সুষম উপস্থাপনা। আমি নিশ্চিত, মানুষ সম্প্রদায় এই উপস্থাপনার যথাযথ মূল্য দেবে।

কিরীণা একটু অবাক হয়ে টুবুর দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম, এ হচ্ছে টুবু। রুকাসের বন্ধু, রুকাসকে সাহায্য করার জন্যে এসেছে। ব্যক্তিগত জীবনে টুবু এক জন রবোট।

টুবু মৃদু স্বরে আমাকে মনে করিয়ে দিল, সপ্তম বিবর্তনের চতুর্থ পর্যায়ের ষষ্ঠ প্রজাতির রবোট।

কিরীণা নিজেকে সামলে নিয়ে তার বান্ধবীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। টুবু সবাইকে অভিবাদন করে বলল, আমার মানুষ সম্প্রদায়কে খুব ভালো লাগে।

আমি হেসে বললাম, সাধারণত এই সময়ে সমুদ্রতীরে অনেক বাচ্চারা থাকে। আজ কেন জানি কেউ নেই।

কিরীণা বলল, ট্রনেরা যেসব রবোট ফেলে গেছে, বাচ্চারা সেগুলো দেখতে গেছে। কাছে যাওয়ার কথা নয়, তাই দূর থেকে ঢিল ছুড়ছে।

তাদের কাছে তো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অস্ত্র, গুলি করে দেবে কখন।

টুবু রবোট কথাটি উচ্চারিত হতে শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠল। আমি তখন পুরো ব্যাপারটি তাকে খুলে বললাম। সব শুনে বলল, চল গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি।

কিরীণা এবং তার বান্ধবীরাও বলল, আমরাও যাব। চল।

আমরা কথা বলতে বলতে সমুদ্রতীর ধরে হাঁটতে থাকি। টুবু একটু বাক্যবাগীশ বলে মনে হয়, কথাবার্তায় সে-ই মোটামুটি প্রাধান্য নিয়ে নিল।

ট্রনেরা প্রায় হাজারখানেক রবোট ফেলে গিয়েছিল। অনুসন্ধানকারী রবোট, কিছু দেহরক্ষী, কিছু আক্রমণকারী রবোট। ট্রনেরা না থাকায় তাদের নেতৃত্ব দেয়ার কেউ নেই। কোনো ধরনের নেতৃত্ব দেয়া না হলে রবোটগুলো পুরোপুরি অক্ষম হয়ে যায় বলে মনে হচ্ছে। সম্ভবত এগুলোকে সেভাবেই প্রোগ্রাম করা হয়েছে। সমুদ্রতীরের এক নির্জন এলাকায় রবোটগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। সেগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই,

ক্রমাগত নিজেদের মাঝে স্থান বদল করছিল, দূর থেকে মনে হয় কিছু অতিকায় কীট কিলবিল করছে। আমরা হেঁটে হেঁটে কাছে এসে দেখতে পাই এই এলাকার প্রায় সব শিশু এই রবোটগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মোটামুটি অক্ষম এবং পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীন এই রবোটগোষ্ঠীকে শিশুগুলো নানাভাবে জ্বালাতন করছে। বড় বড় পাথরের টুকরা জড়ো করা হচ্ছে এবং বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাঝে সেগুলো ছুড়ে রবোটগুলোর কপোট্রনে আঘাত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শিশুদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, খর্বাকৃতি অনুসন্ধানকারী রবোটের কপোট্রনের ডান দিকে মাঝারি পাথর দিয়ে বেশ জোরে আঘাত করতে পারলে রবোটটি পুরোপুরি মাথা-খারাপ হয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে আকাশে গুলি করতে থাকে। সেটি নাকি নিঃসন্দেহে একটি দর্শনীয় ব্যাপার।

টুবু খানিকক্ষণ রবোটগুলো লক্ষ করে বলল, বাচ্চারা যদি এগুলো দিয়ে খেলতে চায় খেলুক। কিন্তু আগে এগুলোকে নিরস্ত্র করা দরকার।

কেমন করে করবে?

বললেই হয়।

কাকে বলবে?

কেন, রবোটগুলোকে। ঠিক ফ্রিকোয়েন্সিতে কিছু বিট পাঠিয়ে রিসেট করে নিলেই হল। মাস্টার মোডে গিয়ে ওদের যা কিছু বলা হবে ওরা সেটাই করবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি করতে পারবে সেটা?

কেন পারব না?

কর দেখি।

কি করব?

আমি মাথা চুলকে বললাম, সবগুলো রবোটকে বল হাতের অস্ত্রগুলো ফেলে আমাদের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে। টুবু এগিয়ে গিয়ে যান্ত্রিক ভাষায় কী একটা বলতেই সবগুলো রবোট গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। হাতের অস্ত্র ফেলে সবগুলো পড়িমরি করে ছুটে আসতে থাকে। টুবুর কাছাকাছি এসে রবোটগুলো মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। প্রথমে অনুসন্ধানকারী রবোট, তার পিছনে দেহরক্ষী রবোট, সবার পিছনে আক্রমণকারী রবোট। দেখেই বোঝা যাচ্ছে রবোটগুলো আদেশের জন্যে অপেক্ষা করছে।

কিরীণা বিস্ফারিত চোখে বলল, তার মানে ট্রনদের রবোটগুলো এখন আমাদের রবোট হয়ে গেল? এখন এগুলো আমাদের কথা শুনবে?

টুবু মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। তোমরা যদি চাও।

ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখার জন্যে বিশাল রবোটবাহিনী নিয়ে আমরা শহরতলিতে ফিরে চললাম। সবার সামনে টুবুকে নিয়ে আমি আর কিরীণা, পিছনে সারিবদ্ধ রবোট। একেকটা শিশু একেকটা রবোটের ঘাড়ে চেপে বসেছে, মাথায় চাটি মারছে, পা দিয়ে শব্দ করছে, কান ধরে টানছে, রবোটগুলো বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে হাঁটছে। এককথায় বলা যায়, একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য!

শহরের মাঝামাঝি ইলির সঙ্গে দেখা হল। ট্রনদের রবোটগুলো পোষমানা অনুগত ভৃত্যের মতো ব্যবহার করছে খবর পেয়ে সে ছুটে আসছিল। খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে আমার কাছে ছুটে এল। উত্তেজিত গলায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, কী হচ্ছে এটা কুনিল? কী হচ্ছে?

আমি টুবুকে দেখিয়ে বললাম, এ হচ্ছে টুবু। রুকাসের বন্ধু। গতরাতে এসেছে। ব্যক্তিগত জীবনে এক জন রবোট।

টুবু আবার মৃদু স্বরে মনে করিয়ে দিল, সপ্তম বিবর্তনের চতুর্থ পর্যায়ের ষষ্ঠ প্রজাতির রবোট।

আমি ইলিকে দেখিয়ে বললাম, এ হচ্ছে ইলি। আমাদের বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার এবং শিক্ষক।

টুবু মাথা নিচু করে অভিবাদন করে বলল, রুকাসকে আশ্রয় দেয়ার জন্যে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইলি ইতস্তত করে বলল, তু–তুমি সবগুলো রবোটকে ঠিক করে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

কেমন করে করলে?

সব ডিজিটাল সিগনালে কাজ করে, অসুবিধে কোথায়?

তুমি আমার একটা কম্পিউটার ঠিক করে দিতে পারবে? অনেক কষ্ট করে আনা হয়েছে, কিন্তু মূল সিস্টেমে কী একটা সমস্যা রয়ে গেছে।

মনে হয় পারব। এই রবোটগুলো নিয়ে কী করবেন ঠিক করেছেন? আমি এর কর্তৃত্ব আপনাদের কারো হাতে তুলে দিতে চাই।

রবোটগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে গিয়ে সারাদিন কেটে গেল। পুরো এলাকার নানারকম কাজকর্মে এদের জুড়ে দেয়া হল। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে একমাত্র নিউক্লিয়ার রি–অ্যাক্টরটির নিয়ন্ত্রণ কিছুই বাকি রইল না। আমাদের পুরো এলাকাটি, যেটি মাত্র গতকালও মোটামুটি মধ্যযুগীয় হিসেবে চালিয়ে দেয়া যেত, রাতারাতি সেটা আধুনিক হয়ে গেল।

রবোটসংক্রান্ত জটিলতা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইলি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল টুবুকে নিয়ে তার কম্পিউটারের সমস্যাটির একটি সমাধান করার জন্যে। আমি একদিন বিকেলে রুকাস এবং টুবুকে নিয়ে বের হলাম। পথে যেতে যেতে কিরীণা আমাদের সাথে যোগ দিল এবং টুবুকে দেখে বরাবরের মতোই অসংখ্য ছোট ছোট শিশু আমাদের সাথে রওনা দিল। টুবু একটি রবোট ছাড়া কিছু নয়, মানুষের জন্যে তার অফুরন্ত ভালবাসা, বিশেষ করে শিশুদের জন্যে। সম্ভবত দুই হাজার বছর ভবিষ্যতের যে এলাকা থেকে সে এসেছে সেখানকার অল্পকিছু মানুষকে বায়োবটের ভয়ঙ্কর নির্যাতন সহ্য করতে দেখে মানুষ সম্পর্কে তার ধারণা চিরকালের জন্যে পাল্টে গেছে।

ইলির ঘরে বড় একটি কম্পিউটার খোলা অবস্থায় পড়ে ছিল। নানা আকারের কিছু মনিটরে দুর্বোধ্য নানাধরনের ছবি ও সংকেত খেলা করছে। টুবু একনজর দেখে হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, বলল, একটা সহজ জিনিসকে এত জটিল করছেন কেন?

ইলি মাথা চুলকে বলল, আমি তো কিছু করি নি, যেরকম পেয়েছি সেরকমই আছে।

টুবু বলল, এই যন্ত্রণার মাঝে না গিয়ে গোড়া থেকে করে দিলে কেমন হয়?

ইলি ইতস্তত করে বলল, গোড়া থেকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, ঘন্টাখানেক সময় নেবে।

ঘ–ঘ–ঘন্টাখানেক? মাত্র ঘন্টাখানেক?

হ্যাঁ। এটা কতদিন থেকে এভাবে আছে?

এক বছরের একটু বেশি হল।

টুবু আবার হতাশ হবার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে কাজ শুরু করে দিল।

টুবু একটি রবোট এবং তাকে তৈরি করা হয়েছে মানুষের সাথে কাজ করার জন্যে। কাজেই তার আচার–ব্যবহার মানুষের মতো, তার অঙ্গ–সঞ্চালনও মানুষের মতো। কিন্তু ইলির জন্যে এই কম্পিউটারটি দাঁড় করিয়ে দেবার সময়টিতে আশেপাশে কোনো মানুষ নেই, কাজেই তার মানুষের মতো অঙ্গ–সঞ্চালন করারও প্রয়োজন নেই। টুবু দ্রুত কাজ করতে শুরু করে, তার হাত এত দ্রুত নড়তে থাকে যে আমরা সেটিকে প্রায় দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হতে থাকে একটি অতিকায় পতঙ্গ ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টুবু এক ঘন্টার আগেই কাজ শেষ করে ফেলল। ইতস্তত বড় বড় মনিটরে বিচিত্র ছবি খেলা করতে থাকে। টুবু বলল, কাজ শুরু করার জন্যে মোটামুটি তৈরি হয়েছে। আজকাল আপনারা কী ভাবে মূল কেন্দ্রে যোগাযোগ করেন জানি না। আপানাদের নিজস্ব কি ডাটাবেস আছে?

ইলি মাথা চুলকে বলল, আমাদের নেই, গড়ে তুলতে হবে।

নেই?

না।

ট্রনদের যেটা আছে সেটা ব্যবহার করছেন না কেন?

ইলি আকাশ থেকে পড়ল, সেটা কেমন করে করব? যোগাযোগ করব কেমন করে? আর যোগাযোগ যদি করিও, আমাদের ব্যবহার করতে দেবে কেন?

কেন দেবে না? সেটা আমার উপর ছেড়ে দিন। টুবু একটা মনিটরের সামনে বসে দ্রুত কিছু সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণেই ট্রনদের মূল কম্পিউটারে যোগাযোগ করে ফেলল। মনিটরে বিচিত্র সংখ্যা এবং ছবি খেলা করতে থাকে। ইলিকে দেখিয়ে বলল, এই যে মূল কম্পিউটারের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুটি। এখান থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সবকিছু?

হ্যাঁ, সবকিছু।

এখানে এত সহজে যাওয়া যায়?

আপনারা এত সহজে যেতে পারবেন না। বিশাল দু'টি প্রাইম সংখ্যা ব্যবহার করে এর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের জন্যে সেটি তো কোনো সমস্যা নয়।

তার মানে আমরা এখন ট্রনদের মূল নিয়ন্ত্রণে কী হচ্ছে দেখতে পারব?

শুধু দেখতে পাবেন না, সেটা নিয়ন্ত্রণও করতে পারবেন।

তার মানে আমরা যদি এটা ব্যবহার করা শিখে যাই—আজ থেকে এক মাস কিংবা দুই মাস পরে—আমরা ট্রনদের হামলা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারব?

এক মাস দু'মাস পরে কেন? এখনই, এই মুহূর্তে আপনারা নিরাপদ।

কিন্তু এই জটিল সফ্‌টওয়ার তো আমরা ব্যবহার করতে পারি না। শিখতে সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেবে। এই ধরনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ মানুষ খুব কম। বেশির ভাগ মানুষই এখানে অন্য ধরনের কাজ করে।

টুবু মনে হল সমস্যাটি ঠিক বুঝতে পারছে না। খানিকক্ষণ ইলির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মানুষ কম বলছেন কেন? এই যে বাচ্চারা খেলছে, তাদের কাজে লাগিয়ে দিন।

বাচ্চাদের?

হ্যাঁ। বারো–তেরো বছরের বাচ্চা এসব কাজের জন্যে সবচেয়ে ভালো, মস্তিষ্ক মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে, দায়িত্ববোধের জন্ম নিচ্ছে, নূতন জিনিস শেখার জন্যে এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে?

কিন্তু তাদের শেখাবে কে?

শেখাবে? টুবুকে আবার একটু বিভ্রান্ত মনে হল। বলল, আপনাদের মস্তিষ্কে তথ্য পাঠানোর সরাসরি ব্যবস্থা নেই?

ইলি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, সেটা কী জিনিস?

মস্তিষ্কের নিউরনে তথ্যগুলো সোজাসুজি পাঠিয়ে দেয়া হয়। একটা বিদ্যুৎ–চৌম্বকীয় যন্ত্র। আমার কাছে আছে, রুকাসকে আপনাদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে শেখানোর জন্যে এনেছিলাম। সেটা ব্যবহার করে সবাইকে শিখিয়ে দেব।

ছোট ছোট বাচ্চারা, যারা এতক্ষণ মজা দেখার জন্যে জানালায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা কিছুক্ষণের মাঝেই মনিটরের সামনে বসে পড়ে। টুবু ছোট যন্ত্রটি ব্যবহার করে মস্তিষ্কে কম্পিউটারসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পাঠিয়ে দেবার পর তারা অবিশ্বাস্য দক্ষতায় কাজ শুরু করে। বাইরে অন্ধকার নেমে আসতে থাকে, কিন্তু কাউকে মনিটরের সামনে থেকে নাড়ানো যাচ্ছিল না।

পরদিন বিকেলবেলা ডিয়াল নামে এগারো বছরের একটি ছেলে প্রথমবার ট্রনদের একটি মহাকাশযানকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হল। পুরো ব্যাপারটি ঘটল ইলির ঘর থেকে। মহাকাশযানটির পুরো নিয়ন্ত্রণ দখল করে সেটিকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে উত্তরাঞ্চলের দুর্গম পাহাড়ে আঘাত করে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দেয়া হল। মনুষ্যবিহীন এই মহাকাশযানটি কী ভাবে আকাশে উড়ে ধ্বংস হয়ে গেল বের করার আগেই ট্রনদের এলাকায় আরো বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের বৈদ্যুতিক সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল, মধ্য অঞ্চলের যাবতীয় যোগাযোগ–ব্যবস্থা অনিশ্চিত করে দেয়া হল এবং খাদ্য সরবরাহের একটি মূল ব্যবস্থা হঠাৎ করে অকেজো হয়ে গেল।

এত দ্রুত এত বড় একটি ব্যাপার ঘটতে পারে, সেটি সবার ধারণার বাইরে ছিল। কম্পিউটারের মনিটরের সামনে বসে অল্প কয়জন কিশোর–কিশোরী ট্রনদের জগতে এত বড় বিপর্যয় ঘটাতে পারে জানার পর সবাই হঠাৎ করে ব্যাপারটি আরো গুরুত্ব দিয়ে যাচাই করতে শুরু করে। বিপর্যয়টি চোখের সামনে ঘটছে না, কাজেই সবার অগোচরে অত্যন্ত হৃদয়হীন মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে যেতে পারে।

ইলির বাসায় সন্ধেবেলা সবাই একত্র হয়েছে। প্রথমে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিয়ে ইলি বলল, আপনারা সবাই জানেন, আমরা ট্রনদের এলাকায় আঘাত হানার মতো ক্ষমতা অর্জন করেছি। আমাদের কয়েকজন কিশোর–কিশোরী পুরো ব্যাপারটিতে এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষতা অর্জন করেছে যে কিছুদিনের মাঝেই তারা ইচ্ছে করলে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত কিছু ট্রন-বিমানকে আকাশে উড়িয়ে নিতে পারে, পারমাণবিক বোমা ফেলে তাদের শহর-নগর ধ্বংস করে দিতে পারে। এটি অচিন্তনীয় ক্ষমতা, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের কিশোর-কিশোরীদের সেই ধরনের একটা ক্ষমতা অর্জন করতে দেয়া ঠিক নয়, আমাদের এখনই সতর্ক হওয়া উচিত।

আমি লক্ষ করলাম, যেসব কিশোর-কিশোরী গত কয়েকদিন কম্পিউটারের মনিটরের সামনে অসাধ্য সাধন করেছে, তারা হঠাৎ করে নিজেদের ভেতরে গলা নামিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। ইলি একসময় থেমে গিয়ে বলল, তোমরা কিছু বলবে?

ডিয়াল মাথা নাড়ল।

কী বলবে?

তুমি যেটা বলেছ আমরা আসলে সেটা ইতোমধ্যে করে ফেলেছি।

ইলি চমকে উঠে বলল, কি করে ফেলেছ?

পারমাণবিক বোমা নিয়ে কুড়িটা প্লেনকে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি।

কী বললে? কী-কী-বললে?

কুড়িটা প্লেন গত দুই ঘন্টা থেকে ট্রনদের আকাশে উড়ছে।

কেন?

আমরা ওদের বলেছি, আমাদের যাদের ওরা ধরে নিয়ে গেছে, তাদের সবাইকে আজ রাতের মাঝে ফিরিয়ে দিতে হবে।

আমার হঠাৎ করে মনে পড়ল ডিয়াল নামের এই কিশোরটির মা অত্যন্ত রূপবতী মহিলা, গতবার ট্রনেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। ডিয়ালের বাবা তার কিছুদিনের মাঝেই আত্মহত্যা করেছে। সে নিজে সেই থেকে আমার মায়ের অনাথাশ্রমে বড় হচ্ছে।

ইলি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, যদি ওরা ফেরত না দেয়?

ডিয়াল শান্ত স্বরে বলল, তাহলে প্রতি এক ঘন্টায় একটা করে বোমা ফেলা হবে।

তু-তু-তুমি জান একটা পারমাণবিক বোমা ফেললে কত জন মানুষ মারা যায়? জা-জা-জান? উত্তেজনায় ইলির মুখে কথা আটকে যেতে থাকে।

ডিয়াল মাথা নাড়ল, জানি। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমার মাকে বাঁচানোর জন্যে দরকার হলে আমি পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে ফেলব।

কেউ কোনো কথা বলল না।

ভোররাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল একটি হেলিকপ্টারের শব্দে। আমাদের কোনো হেলিকপ্টার নেই, নিশ্চয়ই ট্রনদের হেলিকপ্টার। ডিয়ালের মা এবং অন্যান্যদের ফিরিয়ে দিতে এসেছে ট্রনেরা।

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারি, আর আমাদের পশুদের মতো বেঁচে থাকতে হবে না। পৃথিবীর মাঝে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারব প্রথমবারের মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. ক্লডিয়ান

কয়দিন থেকে রুকাস এবং টুবুকে একটু চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে। রুকাসের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ে, কিন্তু টুবুর মুখে তার কোনো চিহ্ন পড়ার উপায় নেই। তবুও আমার টুবুকে দেখেই মনে হল কিছু–একটা ঘটছে। সে আজকাল কথা বলে কম, কয়েকবার প্রশ্ন করলে প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং তার উত্তরগুলো হয় সংক্ষিপ্ত। দীর্ঘ সময় সে লাল রঙের ত্রিমাত্রিক ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরের অসংখ্য মনিটরে কী–যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এবং মাঝে মাঝেই রুকাসের সাথে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে।

আমি একসময় জিজ্ঞেস করলাম, রুকাস, কী হয়েছে? তোমাদের দেখে মনে হয় কিছু–একটা ঘটেছে।

হ্যাঁ, মনে হয় তারা এসেছে।

কারা?

বায়োবটেরা।

তারা কোথায়?

সেটাই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে এখানেই আছে, কিন্তু দেখতে পারছি না। কেমন যেন ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

কেন তাদের দেখতে পারছি না?

টুবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মনে হয় সময় মাত্রায় সবসময় একটু এগিয়ে রয়েছে, আমরা কিছুতেই ধরতে পারছি না, কিছু–একটা পরিকল্পনা করছে ওরা। এইখানেই আছে ওরা আমাদের আশেপাশে।

আমার হঠাৎ করে কেন জানি গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চারদিকে তাকিয়ে বললাম, এখনো তো কাউকে দেখি নি।

হঠাৎ করে দেখবে। মনে হয় হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিছু বোঝার আগে।

সত্যিই তাই হল।

আমি আর কিরীণা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সন্ধে হয়ে আসছে। একটু পরেই অন্ধকার নামবে। হঠাৎ করে মাটি ফুঁড়ে চারটি মূর্তি বের হয়ে এল। আমরা একটা শব্দ করার আগে মূর্তি চারটি আমার হাত ধরে কোথায় যেন লাফিয়ে পড়ল। সাথে সাথে চারদিক ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল। সামনে অন্ধকার একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে, চারটি মূর্তি আমাদের দু'জনকে ধরে নিচে নামিয়ে নিতে থাকে। চারদিকে কেমন জানি অবাস্তব ঘোরের মতো, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি চোখ খোলা রাখতে, কিন্তু চোখের উপর ভারী পর্দার মতো কী যেন নেমে আসে।

আমার মাঝে মাঝে ভাসা ভাসা জ্ঞান এসেছে, আবার অচেতন হয়ে গেছি। মনে হয়েছে কেউ–এক জন আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টির সামনে আমি ভয়ে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছি। এইভাবে কতকাল গিয়েছে কে জানে। মনে হয় এক যুগ—মনে হয় এক শতাব্দী। তারপর শেষ পর্যন্ত একদিন আমি চোখ খুলে তাকিয়েছি। আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে একটি ধাতব মুখ। আমি চোখ খুলতেই মুখটি সরে গেল, আমি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

আমি ক্লডিয়ান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লডিয়ান!

আমি ভালো করে তাকালাম। এই তাহলে সেই বায়োবট দলপতি? মানুষের সমান উঁচু দেহ। প্রায় মানুষের মতোই যান্ত্রিক চেহারা। গোলাকার এনোডাইজ অ্যালুমিনিয়ামের মতো কালো মাথা। সরু সরু সবুজ একজোড়া নিষ্পলক চোখ। নাক আর মুখের জায়গায় ত্রিকোনাকৃতি ফুটো, ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে জটিল সংবেদনশীল যন্ত্র। কুস্তিগীরদের মতো বিশাল দেহ। সমস্ত দেহে প্রচণ্ড শক্তির একটা ছাপ। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, দুই পা বিস্তৃত করে ক্লডিয়ান আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায়?

তুমি আমার ঘরে।

কিরীণা কোথায়?

কিরীণা যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে।

আমি চুপ করে ক্লডিয়ানের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ক্লডিয়ান বলল, তুমি কুনিল?

হ্যাঁ। আমি একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে কেন এনেছ?

আমি তোমাকে দেখতে চাই।

কেন?

তুমি রুকাসকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলে, সেজন্যে আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

কি প্রশ্ন?

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সময় রুকাস যখন সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, সেটি কি ইচ্ছাকৃত ছিল?

আমি প্রশ্ন শুনে একটু চমকে উঠলাম, ক্লডিয়ান নামের এই বায়োবট আমাকে এই প্রশ্নটি কেন করছে? আমার তখন মনে হয়েছিল রুকাস জানত সে যতই জলোচ্ছ্বাসের দিকে এগিয়ে যাবে জলোচ্ছ্বাস ততই পিছিয়ে যাবে। কিন্তু সেটা তো হতে পারে না, উন্মত্ত সমুদ্র কে তো এক জন মানুষ থামিয়ে দিতে পারে না।

ক্লডিয়ান আবার বলল, উত্তর দাও।

আমি ইতস্তত করে বললাম, আমি জানি না।

তোমার কি মনে হয়েছিল সে জানত এটি ঘটবে? উন্মত্ত সমুদ্রকে সে স্তব্ধ করে দিতে পারবে?

আমার তাই মনে হয়েছিল।

ক্লডিয়ান একটি নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, ট্রন মেয়েটি যখন রুকাসকে গুলি করেছিল, রুকাস কি জানত মেয়েটি তাকে গুলি করতে পারবে না?

আমি—আমি জানি না।

তুমি খুব অবাক হয়েছিলে। কেন অবাক হয়েছিলে?

তুমি কেমন করে জান আমি অবাক হয়েছিলাম?

ক্লডিয়ান শান্ত স্বরে বলল, আমরা তোমার মস্তিষ্ক স্ক্যান করেছি। তোমার মস্তিষ্কের সমস্ত তথ্য আমরা জানি। তুমি কেন অবাক হয়েছিলে?

আমার কেমন জানি সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। খানিকক্ষণ ক্লডিয়ানের ভাবলেশহীন যান্ত্রিক মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, আমার মনে হয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুকাস জানে কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

ক্লডিয়ান দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, আমাকে সত্যি কথা বলার জন্যে ধন্যবাদ।

আমি কি এখন ফিরে যেতে পারি?

যখন সময় হবে তখন তুমি ফিরে যাবে।

আমার বুক কেঁপে ওঠে, জিজ্ঞেস করলাম, কখন সেই সময় হবে?

আমি এখনো জানি না। ক্লডিয়ান পিছনে ফিরে হেঁটে চলে যেতে শুরু করে।

আমি মরিয়া হয়ে বললাম, তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

ক্লডিয়ান থমকে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কি প্রশ্ন?

তোমরা কেন মানুষ হয়ে বেঁচে না থেকে বায়োবট হয়ে বেঁচে থাকতে চাও?

যে কারণে রুকাস বায়োবট হতে চায় না, সে কারণে আমি মানুষ হতে চাই না। আমি বায়োবট সমাজে বায়োবট–শিশু হয়ে জন্মেছি। আমি বায়োবট হয়ে থাকতে চাই।

কিন্তু তোমরা শুধু বায়োবট থাকতে চাও না, যারা বায়োবট হবে না তাদের তোমরা ধ্বংসও করে ফেলতে চাও।

আমরা তাদের ধ্বংস না করলে তারা আমাদের ধ্বংস করবে।

কিন্তু তোমরা যা কর সেটা অস্বাভাবিক, সেটা অপ্রাকৃতিক।

আদিম মানুষ যখন প্রথমবার আগুন জ্বালিয়ে তাকে ঘিরে বসেছিল, সেদিন প্রথম অপ্রাকৃতিক কাজ করা হয়েছিল। সেই অপ্রাকৃতিক কাজ কতটুকু করা হবে, কোথায় থামতে হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তোমার নেই, অর্বাচীন তরুণ।

ক্লডিয়ানের গলার স্বরে এতটুকু উত্তাপ প্রকাশ পায় না, কিন্তু আমি তবু বুঝতে পারি সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে। আমি কেমন জানি বেপরোয়া হয়ে উঠলাম, বললাম, আমি শুনেছি তোমরা অচিন্তনীয় নিষ্ঠুর। তোমরা অবলীলায় মানুষ হত্যা কর।

এই মুহূর্তে তোমার শরীর কয়েক লক্ষ ব্যাকটেরিয়াকে হত্যা করছে। ব্যাকটেরিয়াকে হত্যা করা হলে সেটি নিষ্ঠুরতা নয় কেন?

সেটি করতে হয় বেঁচে থাকার জন্যে।

আমরাও হত্যা করি বেঁচে থাকার জন্যে। আমরাও হত্যা করি প্রয়োজনে। প্রয়োজনের হত্যাকাণ্ড নিষ্ঠুর হতে পারে না।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটি অসমসাহসিক কাজ করে ফেললাম, বললাম, আমি কি তোমার জৈবিক শরীরটি দেখতে পারি? তোমার অপুষ্ট শরীর? তোমার বিকৃত বিকলাঙ্গ দেহ?

ক্লডিয়ানের শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। আমি বুঝতে পারি প্রচণ্ড ক্রোধে সে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি, এক মুহূর্তে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড আঘাতে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে ফেলবে। কিন্তু ক্লডিয়ান সেটি করল না, তার বদলে একটি বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। ক্লডিয়ান হঠাৎ হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত সেটি সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, পারল না। শেষ পর্যন্ত একটি ঝটকা দিয়ে সেটি উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যেখানে আছি সেই ঘরটির মনে হয় কোনো শুরু নেই কিংবা কোনো শেষ নেই। যতদূর দেখা যায় বিশাল শূন্যতা। উপরে তাকিয়ে থাকলে বুকের ভেতর গভীর শূন্যতায় হা হা করে ওঠে। আমি প্রথম প্রথম ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করি; আজকাল চুপচাপ বসে থাকি। আমি জানি না আমাকে কেন এখানে এনেছে, আমি জানি না কখন আমাকে যেতে দেবে। শুয়ে শুয়ে আমার ঘুরেফিরে কিরীণার কথা মনে হয়। পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ছিলাম দু'জনে, হঠাৎ করে আমাকে ছিনিয়ে এনেছে, কিরীণার কী হয়েছে তখন? তাকেও কি ধরে এনেছে ওরা? আমার মতো সেও কি বিশাল শূন্য এক প্রান্তরে বসে আমার কথা ভাবছে?

মাঝে মাঝে আমার চোখে গভীর ঘুম নেমে আসে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখি। সেই স্বপ্নের কোনো অর্থ নেই, কোনো ব্যাখ্যা নেই। কে যেন আমাকে বিচিত্র সব প্রশ্ন করে, আমি তার উত্তর ভেবে পাই না।

তারপর হঠাৎ একদিন আমার ঘুম ভেঙে যায়, আর দেখতে পাই আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে ধাতব একটি মুখ, সবুজ নিষ্পলক চোখ। আমি ফিসফিস করে বললাম, কে তুমি, ক্লডিয়ান?

হ্যাঁ।

আমাকে যেতে দেবে?

যখন সময় হবে তখন।

কখন সময় হবে?

আমি এখনো জানি না।

কিন্তু আমি যে আর পারি না।

তুমি কি কিছু চাও?

আমি যেতে চাই।

অন্য কিছু চাও?

এই নৈঃশব্দ আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। কোনো সংগীত কি শুনতে পারি? কোনো মিষ্টি সুর?

সংগীত! ক্লডিয়ান হঠাৎ চমকে উঠল। সংগীত?

হ্যাঁ। কোনো সংগীত।

না। ক্লডিয়ান হঠাৎ চিৎকার করে বলল, না, তুমি কোনো সংগীত শুনতে পাবে না। না। না।

আমি হকচকিয়ে গেলাম, বললাম, কেন নয়?

ক্লডিয়ান আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাকে যেতে দেব।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কখন?

এখনই। যাও, তুমি যাও। রুকাসকে বল আমি তাকে সামনাসামনি দেখতে চাই।

বলব।

যাও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি উঠে দাঁড়ালাম, সাদা কুয়াশার মতো একটি ধোঁয়া আমাকে ঘিরে ফেলতে থাকে, আমার চোখ ভারী হয়ে আসতে থাকে, হঠাৎ শুনতে পাই ক্লডিয়ান বলছে, যাবার আগে আমাকে একটি কথা বলে যাও।

কি?

তুমি কেন কিরীণাকে এত ভালবাস?

আমি জানি না।

জান না?

না।

গভীর ঘুমে আমি অচেতন হয়ে গেলাম। ছাড়াছাড়াভাবে দেখলাম, আমি বিশাল বালুবেলায় ছুটে যাচ্ছি, আমার পিছনে তাড়া করছে হাজার হাজার বুনো কুকুর। আমি চিৎকার করে ছুটছি, চিৎকার করে ছুটছি। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম আমার হাতের নখ বড় হয়ে যাচ্ছে, মুখ থেকে বের হয়ে আসছে কুৎসিত দাঁত, আমি একটা দানবে পাল্টে যাচ্ছি—ভয়ঙ্কর বীভৎস দানব। বুনো কুকুরের দল থমকে দাঁড়িয়েছে আমাকে দেখে, তারপর প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠলাম আমি, সাথে সাথে ঘুম ভেঙে গেল আমার। চোখ খুলে দেখলাম আমি পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে কিরীণা, বলছে, কুনিল, কী হল তোমার? কী হল?

আমি কোথায়?

এই তো এখানে।

আমি কেমন করে এলাম?

কেমন করে এলে মানে? কিরীণা অবাক হয়ে বলল, তুমি তো এখানেই ছিলে।

এখানেই ছিলাম। কতক্ষণ থেকে?

সবসময়ই তো এখানে ছিলে।

সবসময়ই?

হ্যাঁ, কথা বলতে বলতে হঠাৎ তুমি চোখ বন্ধ করে পড়ে যাচ্ছিলে।

তারপর?

আমি তোমাকে ধরেছি আর তুমি চোখ মেলে তাকিয়েছ।

আর কিছু হয় নি?

না।

আমি বিভ্রান্তের মতো কিরীণার দিকে তাকালাম। কিরীণা অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে তোমার?

আমাকে ক্লডিয়ান ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

কিরীণা আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমার মাথা-খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, সত্যি।

আমি বুঝতে পারি, কিরীণা আমার কথা বিশ্বাস করছে না। কিন্তু সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ঠিক আছে কুনিল, চল, এখন বাসায় যাবে।

আমি কিরীণার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিরীণা আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। আমার হঠাৎ কী মনে হল জানি না, বাম হাতটি চোখের সামনে তুলে ধরলাম। হাতের কনুইয়ের কাছে একটা কাটা দাগ। দেখে মনে হয় পুরানো একটা ক্ষত।

আমি অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। কারণ আমার এখানে কোনো ক্ষত চিহ্ন ছিল না। আমি ফিসফিস করে বললাম, এই দেখ—ক্লডিয়ান আমার হাতের মাঝে কেটে কিছু-একটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

কিরীণা বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, আমার এখন রুকাসের কাছে যেতে হবে।

কিরীণা স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, না, তুমি রুকাসের কাছে যেতে পারবে না। কিছুতেই যেতে পারবে না।

কিরীণা হঠাৎ শক্ত করে আমার হাত ধরে রাখে।

৯. মুখোমুখি

টুবু আমাকে টেবিলে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। বাম হাতটা একপাশে লম্বা করে রেখে সেটিকে শক্ত করে ধরে রেখে ধারালো একটা চাকু দিয়ে পুরানো ক্ষতটা নূতন করে চিড়ে ফেলল। ব্যথা লাগল না মোটেও, কী একটা ইনজেকশান দিয়ে পুরো হাতটা অবশ করে রেখেছে। কাটা অংশ দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে এল, খানিকটা তুলো দিয়ে সেটা চেপে ধরে টুবু হাতের চামড়ার নিচে থেকে পাতলা একটি চাকতির মতো জিনিস বের করে আনে।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখে বললাম, কী এটা?

ডিস্ক বিস্ফোরক। আমি নিশ্চিত, রুকাসের গলার স্বর প্রোগ্রাম করে রাখা আছে, সেটি শুনতে পারলেই বিস্ফোরণ ঘটবে।

টুবু কিরীণার দিকে তাকিয়ে বলল, কিরীণা, ভবিষ্যতের পৃথিবী আজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, রুকাসের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।

কিরীণা লজ্জা পেয়ে একটু হাসল। টুবু বলল, কুনিলকে তুমি রুকাসের কাছে যেতে না দিয়ে অসম্ভব বুদ্ধির কাজ করেছ।

কিরীণা ইতস্তত করে বলল, আমি জানি না, কেন জানি মনে হল কুনিলকে রুকাসের কাছে যেতে দেয়া যাবে না।

আমি বললাম, এখন তো কোনো ভয় নেই, আমাকে কি উঠতে দেবে টেবিল থেকে?

টুবু আমার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, এক সেকেণ্ড দাঁড়াও, আমি তোমাকে ভালো করে আরেকবার পরীক্ষা করে নিই।

পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে টুবু আমার বাঁধন খুলে দেয়। আমি টেবিলে বসে বললাম, এই বিস্ফোরকটি কি ফেলে আসবে কোথাও?

হ্যাঁ। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক এটি, খুব সতর্কভাবে ফেলতে হবে। খানিকক্ষণ সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাও আমাকে, আমি এটা খুলে বিস্ফোরকটি আলাদা করে ফেলি।

ফেটে যাবে না তো আবার?

উত্তরে টুবু হাসার মতো একধরনের শব্দ করল।

ডিস্ক বিস্ফোরকটি থেকে রুকাসের গলার স্বরের সাথে প্রোগ্রাম করা মাইক্রো-ইলেকট্রনিক অংশটা আলাদা করে টুবু আমাকে নিয়ে রুকাসের কাছে রওনা দিল। পুরো ব্যাপারটি নিয়ে সে রুকাসের সাথে একবার কথা বলতে চায়।

আমার মুখ থেকে পুরোটা শুনে রুকাস অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মা বললেন, এটা কেমন করে হয় যে তুই এতদিন ওর সাথে থেকে এলি, আর কিরীণা জানতেও পারল না, তোর মনে হল তুই সেখানেই আছিস?

টুবু বলল, ওকে স্থির সময়ের ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে সময় সামনেও প্রবাহিত হয় না, পিছনেও হয় না। বায়োবটরা এ ব্যাপারে মানুষের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে আছে।

মা বললেন, এই সন্ধেবেলা পাহাড়ের নিচে যাওয়ার দরকার কি ছিল? সাপখোপ কত কী আছে সেখানে।

কিরীণা বলল, অনেক যখন রাগ হল ক্লডিয়ান, তখন হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল কেন সে?

টুবু বলল, সেটা তো জানি না।

রুকাস বলল, আমার মনে হয় কি জান?

কি?

আমরা বায়োবটদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতাটি খুঁজে পেয়েছি।

কী?

বায়োবটেরা যান্ত্রিক উৎকর্ষের চরমে পৌঁছে গেছে। তাদের দৈনন্দিন জীবন অত্যন্ত নিখুঁত। সেখানে কোনো ভুলত্রুটি নেই। সেটি নির্ভুল। সেখানে অনুভূতির স্থান নেই। সাধারণ মানুষেরা যখন তীব্র আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখনো বায়োবটেরা থাকে আশ্চর্য ধীরস্থির। তাদের মস্তিষ্ক সবসময়েই শান্ত। সেখানে কোনো উচ্ছ্বাস নেই। তাদের যান্ত্রিক শরীর সেই শান্ত মস্তিষ্কের সাথে নির্ভুলভাবে কাজ করে।

রুকাস খানিকক্ষণ নিজের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু সেই মস্তিষ্ক যদি বিচলিত হয়ে ওঠে, ক্রোধ কিংবা ভালবাসা, আনন্দ কিংবা দুঃখ যাই হোক, সেই আবেগ যখন তীব্র হয়ে ওঠে একসময়, শরীরের যান্ত্রিক যোগাযোগ হঠাৎ করে মস্তিষ্কের সাথে আর তাল মিলিয়ে থাকতে পারে না। হঠাৎ করে শরীরের একটি দু'টি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। তাই ক্লডিয়ান যখন ভয়ঙ্কর রাগে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন হঠাৎ হাঁটু ভেঙে পড়ে গিয়েছিল।

কিরীণা জ্বলজ্বল চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, তাই কুনিল যখন সংগীতের কথা বলেছিল, ক্লডিয়ান এত আপত্তি করেছিল?

হ্যাঁ। রুকাস মাথা নাড়ে। আমরা জানি বায়োবট-জগতে কোনো সংগীত নেই। বায়োবট-শ্লোগান হচ্ছে, "সংগীত কর্মক্ষমতা ক্ষুণ্ন করে"। প্রকৃত ব্যাপারটি ভিন্ন, সংগীত আসলে তাদের শরীরের যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মাঝে আঘাত করে। মানুষের মস্তিষ্ক, তার আবেগের গভীরতা এত বিশাল, পৃথিবীর কোনো যন্ত্র তার সাথে সর্বক্ষণ

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাল মিলিয়ে থাকতে পারে না।

রুকাস খুব শান্ত গলায় বলল, এক জন সাধারণ মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ। একটি রবোট পরিপূর্ণ একটি যন্ত্র। এক জন বায়োবট পরিপূর্ণ নয়, সে অসম্পূর্ণ। মানুষের মস্তিষ্কে তার রয়ে গেছে মানুষের আবেগ, কিন্তু সেই তীব্র আবেগকে নিয়ন্ত্রণের মতো তার যান্ত্রিক দেহ নেই। পৃথিবীতে যদি কোনো সত্যিকার মানুষ না থাকে, বায়োবটের কোনো ভয় নেই। কিন্তু একটি মানুষও যদি বেঁচে থাকে, তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। তাদের দেখিয়ে দিতে পারে এই ভয়ঙ্কর অসঙ্গতি।

রুকাস উত্তেজিত হয়ে ঘরের মাঝে পায়চারি করতে থাকে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সে বলল, বায়োবটদের সাথে আমাদের প্রকৃত যুদ্ধ অস্ত্র দিয়ে হবে না, প্রকৃত যুদ্ধ হবে সংগীত দিয়ে, শিল্প দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে—তাদের বলতে হবে অসম্পূর্ণ হয়ে থেকো না, পরিপূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাক, পরিপূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে।

রুকাস হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, আমি সব সময় খুব অবাক হয়ে ভাবতাম, পৃথিবীর এত বায়োবটদের সাথে এই ভয়ংকর যুদ্ধে আমি কেমন করে নেতৃত্ব দেব? আমি যোদ্ধা নই, আমি নেতা নই, আমি সাধারণ, খুব সাধারণ এক জন মানুষ। তবে হ্যাঁ, আমার বুকের ভেতরে আমি সবসময় অনুভব করি তীব্র আবেগ। ক্ষুদ্র একটা জিনিসে আমি অভিভূত হয়ে যাই। বায়োবটদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র এটা।

আমি ইতস্তত করে বললাম, রুকাস।

বল।

এই জিনিষটি তুমি হঠাৎ করে বুঝতে পারবে, সে জন্যেই কি বায়োবটেরা তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল?

রুকাস জ্বলজ্বলে চোখে বলল, আমার তাই ধারণা।

তারা তোমাকে হত্যা করতে পারে নি, তুমি এটা ভেবে বের করেছ, তাহলে কি বলতে পারি বায়োবটেরা মানুষের সাথে যুদ্ধে হেরে গেল?

রুকাস কেমন একটি বিচিত্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, আমি জানি না কুনিল, কিন্তু আমি তাই প্রার্থনা করি। তাই প্রার্থনা করি।

আমার মা বিড়বিড় করে বললেন, হে ঈশ্বর, হে পরম আত্মা। তুমি রক্ষা কর, মানব জগতকে তুমি রক্ষা কর।

কিরীণা নিচু স্বরে বলল, রুকাস।

বল কিরীণা।

তুমি যখন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের সামনে দাঁড়িয়েছিলে, জলোচ্ছ্বাস থেমে গিয়েছিল। ট্রন মেয়েটি তোমাকে গুলি করে মারতে পারে নি। কুনিলের শরীরের বিস্ফোরক সরিয়ে নেয়া হয়েছে—প্রকৃতি সবসময় তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

হ্যাঁ কিরীণা।

বাঁচিয়ে রেখেছে, কারণ তুমি যেন এই সত্যটি বুঝতে পার। বায়োবটদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পার।

আমার তাই ধারণা।

এখন তুমি সেই সত্যটি জেনে গেছ। তোমার দায়িত্ব তুমি শেষ করেছ।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ।

প্রকৃতির তোমাকে আর রক্ষা করার প্রয়োজন নেই?

রুকাস খানিকক্ষণ একদৃষ্টে কিরীণার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি জানি না কিরীণা। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার ধারণা সত্যি।

ক্লডিয়ান যখন তোমাকে হত্যা করতে আসবে, তোমাকে প্রকৃতি আর রক্ষা করবে না?

রুকাস ফিসফিস করে বলল, মনে হয় না।

কেন জানি হঠাৎ আমার বুক কেঁপে উঠল।

গভীর রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল, রুকাসের ঘরে টুবু নিচুস্বরে কথা বলছে। রুকাস আর মা চুপচাপ বসে আছে লাল ত্রিমাত্রিক ছবিটি ঘিরে। টুবু বলল, ক্লডিয়ান আসছে তার বিশাল বাহিনী নিয়ে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আসছে?

সমুদ্রতীরে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার না রক্ষাব্যূহ ছিল?

হ্যাঁ, আছে। এখনো আছে।

কেন সেগুলো ব্যবহার করছ না?

পারছি না। ক্লডিয়ানের দল জ্যাম করে দিয়েছে।

তোমরা কোনো বাধা দিচ্ছ না? আঘাত করছ না?

টুবু আস্তে আস্তে বলল, রুকাস চাইছে না।

আমি রুকাসের দিকে তাকালাম, রুকাস?

রুকাস শান্ত মুখে বসে ছিল, বলল, আজ থেকে দু'হাজার বছর পরের অস্ত্রের কথা তুমি জান না। ক্লডিয়ানের সাথে যদি এখানে সম্মুখযুদ্ধ শুরু করা হয়, তোমাদের শহর, নগর সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি?

যে সত্যটির জন্যে ক্লডিয়ান আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, সেটি আমার লোকজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার জন্যে—একটি মানুষের জন্যে আমি এতবড় বিপর্যয় ঘটতে দিতে পারি না।

তুমি কি ভবিষ্যতে চলে যেতে পার না?

এখন আর পারি না। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি?

ক্লডিয়ানের দল যদি চায়, ভবিষ্যতে গিয়েও আমাকে খুঁজে বের করবে। তার প্রয়োজন নেই।

রুকাস উঠে দাঁড়ায়। বলে, চল টুবু।

কোথায় যাচ্ছ?

সমুদ্রতীরে। ক্লডিয়ানের সাথে দেখা করতে।

টুবুর ভাবলেশহীন ধাতব মুখে অনুভূতির কোনো চিহ্ন নেই। সে ধীরে ধীরে নিজের বুকের একটা অংশ খুলে একটি অস্ত্র বের করে দেয়, প্রাচীনকালের অস্ত্রের মতো। ছোট একটি হাতলে ধরে ট্রিগার টানতে হয়। সামনে ছোট নল, ভেতর থেকে বুলেট বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে আসে।

টুবু বলল, এটি বিংশ শতাব্দীর অস্ত্র। পুরোটা যান্ত্রিক। এর মাঝে কোনো ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ নেই। কেউ ওটাকে জ্যাম করতে পারবে না। ভেতরের বুলেটগুলি অনেক শক্তিশালী, বায়োবটের যান্ত্রিক দেহ ভেদ করে ভেতরে যেতে পারবে।

কি নাম এটার?

রিভলভার। কাছে থেকে গুলি করতে হয়। আর শোন, আমি নিশ্চিত, ক্লডিয়ানেরা এই এলাকার পুরো ইলেকট্রনিক সার্কিট জ্যাম করে দেবে। আমি সম্ভবত পুরোপুরি বিকল হয়ে যাব। যদি তোমার সাথে আমি আর কথা বলতে না পারি, তাহলে এই হবে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ।

রুকাস এগিয়ে এসে টুবুকে গভীর ভালবাসায় আলিঙ্গন করে, আমি দেখতে পাই রুকাসের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। রুকাস টুবুকে ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমাকে আলিঙ্গন করে বলে, কুনিল, আমার যদি উপায় থাকত আমি তাহলে এখানেই থেকে যেতাম।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে কুনিল আমার মায়ের দিকে এগিয়ে যায়। মা তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার প্রথম ছেলেটি খুব অল্পবয়সে মারা গিয়েছিল, তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল তুমি বুঝি আমার সেই ছেলে, ফিরে এসেছ।

রুকাস বলল, আপনি আমার জন্মদাত্রী মা নন, কিন্তু আপনি আমার মা। আপনাকে দেখে আমি বুঝেছি, আমি ভালবাসার কত বড় কাঙাল।

মা রুকাসকে ছেড়ে দিলেন। রুকাস মাথা নিচু করে ঘুরে খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকারে বের হয়ে গেল। টুবু ঘুরে আমাদের দিকে তাকাল, বলল, বিদায়। তারপর সেও রুকাসের পিছু পিছু বের হয়ে গেল।

আমি মায়ের হাত ধরে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম রুকাস আর টুবু হেঁটে হেঁটে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

রাতের আকাশ বিন্দু বিন্দু আলোতে ভরে যাচ্ছে, আগে কখনো দেখি নি, কিন্তু তবু আমার বুঝতে বাকি থাকে না, বায়োবটের বিশাল বাহিনী নেমে আসছে সমুদ্রতীরে।

রাত্রিটা ছিল আশ্চর্য রকম নীরব। রাতজাগা একটা পাখি হঠাৎ করুণ স্বরে ডেকে ডেকে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, পাখির করুণ চিৎকারে আমার বুকটা হঠাৎ হা হা করে ওঠে। ঠিক তখন আমার কিরীণার কথা মনে পড়ল। কিরীণা কি তার অলৌকিক কণ্ঠস্বরে গাঢ় বিষাদের একটা সুরে ক্লডিয়ানকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে না? আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, মা, আমাকে যেতে হবে।

কোথায়?

কিরীণার কাছে।

কেন?

পরে বলব মা তোমাকে, এখন সময় নেই।

মা বাধা দেবার আগে আমি ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম। কিরীণাদের বাসা খুব কাছে, সে ঘুমায় বাইরের দিকে একটি ঘরে। আমি জানালায় শব্দ করে চাপা স্বরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেকে বললাম, কিরীণা।

কিরীণার ঘুম খুব হালকা, সে সাথে সাথে উঠে বসে ভয়–পাওয়া গলায় বলল, কে?

আমি কুনিল।

কী হয়েছে কুনিল?

রুকাস চলে গেছে।

কোথায়?

সমুদ্রতীরে, ক্লডিয়ানের সাথে মুখোমুখি হতে।

সর্বনাশ!

কিরীণা।

কি?

তুমি কি যাবে রুকাসকে বাঁচাতে?

আমি! কিরীণা অবাক হয়ে বলল, আমি?

হ্যাঁ।

আমি কেমন করে রুকাসকে বাঁচাব?

বলব আমি তোমাকে, তুমি বের হয়ে এস। দেরি কোরো না, সময় নেই আমাদের মোটেই।

কিছুক্ষণেই রাতের অন্ধকারে আমি কিরীণার হাত ধরে ছুটে যেতে থাকি।

আকাশে বড় একটা চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের আলোতে আমি দেখতে পাই রুকাস সমুদ্রের বালুবেলায় দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে তার চুল উড়ছে, কাপড় উড়ছে। আশেপাশে কোথাও টুবু নেই। সত্যি কি তার ইলেকট্রনিক সার্কিট জ্যাম করে বিকল করে দিয়েছে?

আমি কিরীণাকে নিয়ে রুকাসের কাছাকাছি একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম।

বিশাল বায়োবট–বাহিনী ধীরে ধীরে নেমে আসছে। অন্ধকারে জোনাকি পোকার মতো জ্বলছে তাদের আলো। মাটির কাছাকাছি এসে অতিকায় মহাকাশযানগুলো স্থির হয়ে গেল। গোল গোল দরজা খুলে বায়োবটেরা নামতে থাকে অস্ত্র হাতে। ধীরে ধীরে তারা ঘিরে ফেলছে রুকাসকে। ইচ্ছে করলেই তারা ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে তাকে। কিন্তু তারা রুকাসকে আঘাত করল না।

আমি দেখতে পেলাম এক জন দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে রুকাসের দিকে। আমি চিনতে পারলাম তাকে, ক্লডিয়ান।

রুকাসের খুব কাছাকাছি এসে ক্লডিয়ান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রুকাস বলল, তুমি ক্লডিয়ান?

হ্যাঁ।

কী আশ্চর্য ব্যাপার! আমি আর তুমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের সময়ে নয়, দুই সহস্র বছর অতীতে!

আমি তোমাকে হত্যা করতে এসেছি রুকাস।

আমি জানি। রুকাস শান্ত গলায় বলল, আমাকে আগে কখনো কেউ হত্যা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে নি ক্লডিয়ান। প্রকৃতি নিজের হাতে আমাকে রক্ষা করেছিল। আমার মৃত্যু হলে সময় পরিভ্রমণের দ্বিতীয় সূত্রটি লঙ্ঘিত হত। এখন সেটি আর সত্যি নয়। আমার দায়িত্ব আমি শেষ করেছি ক্লডিয়ান। এখন সম্ভবত তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে। তবে তোমাকে দেখার জন্যে আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে।

ক্লডিয়ান ধীরে ধীরে হাতের অস্ত্র উদ্যত করে। শান্ত গলায় বলে, রুকাস, তুমি অস্ত্র বের কর।

আমি ফিসফিস করে কিরীণাকে বললাম, কিরীণা, চোখ বন্ধ কর কিরীণা।

কিরীণা চোখ বন্ধ করল। আমি বললাম, মনে কর তুমি দাঁড়িয়ে আছ সমুদ্রতীরে, সমুদ্রের বাতাসে তোমার চুল উড়ছে। তোমার কাপড় উড়ছে। তোমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা শিশু, তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে ট্রন। শিশুটি সেটা জানে না, সে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে, অপেক্ষা করছে তার বাবার জন্যে। শিশুটির মা তুমি, তোমার বুক ভেঙে যাচ্ছে দুঃখে, তবু দুঃখ বুকে চেপে তুমি ডাকছ শিশুটিকে, করুণ সুরে, ভয়ঙ্কর করুণ সুরে। ডাক কিরীণা, ডাক। আমি তীব্র স্বরে বললাম, তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ডাক সেই দুঃখী শিশুকে—

কিরীণা তার বহু-পরিচিত গানটি গাইতে শুরু করল। সমুদ্রের বাতাসে ঝাউবনের যে করুণ সুর শোনা যায়, সেই সুরের সাথে মিলিয়ে, সুরেলা করে।

বড় দুঃখের গান, আমার চোখ ভিজে আসে, আমি ঝাপসা চোখে দেখতে পাই পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্লডিয়ান। নিশিরাতে সমুদ্রের বালুবেলায় মুগ্ধ হয়ে ক্লডিয়ান শুনছে এক নিষিদ্ধ সংগীত। আমি দেখলাম থরথর করে কাঁপছে ক্লডিয়ান, কাঁপতে কাঁপতে সে কোনোভাবে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে, পারছে না। দুই হাতে সে নিজের কান চেপে ধরল, তারপর হঠাৎ হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল নিচে।

রুকাস তার হাতের রিভলভারটি উদ্যত করে এগিয়ে যায় ক্লডিয়ানের দিকে, ফিসফিস করে বলে, আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে হত্যা করতে পারি ক্লডিয়ান, ইচ্ছে করলেই পারি। কিন্তু আমি করব না। কেন করব না জান? কারণ তুমি দুর্বল। তুমি মহা-শক্তিশালী বায়োবট অধিপতি নও ক্লডিয়ান, তুমি দুর্বল এক জন মানুষ। তুমি এক জন মানুষ, আমার মতো এক জন মানুষ। মানুষ হয়ে মানুষকে হত্যা করা যায় না।

রুকাস ক্লডিয়ানের হাত ধরে টেনে তুলে বলল, ওঠ ক্লডিয়ান।

ক্লডিয়ান খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। নিশিরাতে বালুবেলায় অসংখ্য বায়োবট মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

১০. শেষ কথা

সন্ধেবেলা সমুদ্রের তীর দিয়ে আমি আর কিরীণা হেঁটে যাচ্ছি। আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে আমাদের প্রথম সন্তান, রুকাস। অসম্ভব দুরন্ত শিশু, যার নামে তার নাম রেখেছি, তার সাথে কোনো মিল নেই।

কিরীণার গর্ভে আমাদের দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে হলে তার নাম রাখব ইরিনা, ছেলে হলে ক্লডিয়ান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~